বাহির হইল বাহির হইল

প্রত্যেক কপি—।৴০

শুকতারা বার্ষিক ৪৲

ফাল্গুনে ১০ম বর্ষে পড়িল

DICTIONARIES
by
A. T. DEV

English to Bengali

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৬৲
Students' Dictionary	৮৲
National Dictionary	৬৲
Jewel Dictionary	৫৲
ঐ পাতলা কাগজে	৪৲
Pocket Dictionary	৪৲

Bengali to English

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৫৲
Students' Dictionary	৬৲
Pocket Dictionary	২॥০

Bengali to Bengali

নূতন বাংলা অভিধান	২০
শব্দবোধ অভিধান	৮৲
ছাত্রবোধ অভিধান	৬॥০
সরল অভিধান	৩৲
পকেট প্রকৃতিবোধ অভিধান	২৲

পূজাবার্ষিকী

কয়েকখানি নাম দিলাম

১। নব পত্রিকা — ৪৲
২। জয়যাত্রা — ৪৲
৩। দেবালয় — ৪৲
৪। ইন্দ্রধনু — ৪৲
৫। বসুধারা — ৪৲
৬। পরশমণি — ৪৲

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর বই

=প্রহেলিকা সিরিজ=
[৪৯ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কুমারিকা সিরিজ=
[১২ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ৸০

=বিশ্বচক্র সিরিজ=
[৫৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ॥০

=বিচিত্রা সিরিজ=
[৩ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ২৲

=জীবন-চরিতাবলী=
[প্রায় ১০০ খানি বই]

=বিশ্ববিজ্ঞান সিরিজ=
[১০ খানি বই]

=ছেলেদের নাটক=
[২২ খানি বই]

=কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ=
[২৪ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কৃষ্ণা সিরিজ=
[৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=অনুপমা সিরিজ=
[৫ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=পিরামিড সিরিজ=
[২৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=জনশিক্ষা গ্রন্থমালা=
[১৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ।৴০

=পৌরাণিক গল্প=
[প্রায় ৪০ খানি বই]

=মেয়েদের নাটক=
[৪ খানি বই]

এবার পুজায় বাহির হইল

১। যত হাসি ততই মজা—শিবরাম চক্রবর্ত্তী— ২৲
২। পূজার দিনের উপহার—সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲

এ ছাড়া

উপন্যাস, ভ্রমণ ও অ্যাড্ভেঞ্চার, শিকার-কাহিনী, রূপকথা, ধর্ম্মগ্রন্থ, উপনিষদ্ গ্রন্থ, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দামোদর ও সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থমালা বাহির হইয়াছে।

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩১শ বর্ষ

১৩৬৫

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

রামধনু কার্য্যালয়

১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫

ফোন : ৪৮-৩১৮১

বার্ষিক ৪ টাকা প্রতি সংখ্যা ৩৭ ন. প. ষাণ্মাসিক ২.২৫ টাকা

রামধনু, ১৩৬৮

সূচীপত্র

(বর্ণানুক্রমিক)

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
অধ্যাপক জোলিও কুরী	(জীবন-কথা)	শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি এস্-সি	৩০৬
অধ্যাপক জোলিও কুরীর আবিষ্কার (বিজ্ঞান)		" ...	৩২৮
আচার্য্য জগদীশ-শতবার্ষিকী	...	... ...	৩৯৬
আজও মনে পড়ে	(স্মৃতিকথা)	অধ্যাপক শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু, এম্. এ	৩১৮, ৩৬৯, ৪০৮, ৪৬৫, ৫৪৩
আবেদন	(কবিতা)	ডাঃ সুশীলকুমার গুপ্ত, এম্ এ, ডি. ফিল্	১৩৬
আমাদের সংবাদপত্র বিভাগ	...	... ...	১০৯
আশ্বিন	(কবিতা)	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্ এ ...	৩০৫
ইলেকট্রিক ট্রেন	(গল্প)	„ সাধনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত, এম্ এ ...	২২
ইংরেজী বাগ্ ধারার গল্প		„ সুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি.এ ...	২৪৪
এই ভাষার ব্যাপারস্যাপার		„ অজিতকুমার তারণ ...	৪৮৭
একটি গোপনীয় কথা	(গল্প)	৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, এম্ এ, বি এল্ ...	৫৬২
এক হাটে লও বোঝা	(গল্প)	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ...	৫২২
এ কেমন বাতি	(বিজ্ঞান)	„ অমরনাথ রায়, বি এস্-সি ...	
এখানে	(কবিতা)	„ শৈলেন দত্ত ...	৯৬
এডেন	(ভ্রমণ-কাহিনী)	„ অজিতকুমার তারণ ...	২৯০
এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেস		„ কুঞ্জবিহারী পাল, বি এস্‌সি ...	৪৫৫
এবারকার শিশুসাহিত্য সম্মেলন		„ কৌটিল্য ...	৫৬০
ওদের বাঁচাও	(বিজ্ঞান)	„ অমরনাথ রায়, বি এস্-সি ...	১৫২
কাশ্মীরী কুসুম	(গল্প)	„ শামুক ...	৩৪৯
কি শুনি	(কবিতা)	„ কানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী ...	৪২
কিশোর	(„)	„ বিভা সরকার, বি এ ...	২৩৮
কুঁজোর গান	(")	৺ কল্যাণী দেবী, বি.এ ...	৫৫৭
ক্যালকাটায়	(গল্প)	৺সুবিনয় রায় ...	১৯২
খুকুর দেশে বাদল	(কবিতা)	৺ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১৩৭
খুকুর ভাবনা	(গল্প)	স্বপনবুড়ো ...	৯
খেলাধূলা		শ্রীকৌটিল্য ...	২৪২

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
খেলাধূলার খবর		... ...	৫৯, ১৪৮
খোকার মন	(কবিতা)	শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ	১৬৩
গড়গড়া গাঙ্গুলীর গল্প	(গল্প)	" বীরু চট্টোপাধ্যায় ...	৬৩
গালার গল্প	(বিজ্ঞান)	অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম্ এস্-সি ...	৫৬৮
গিরগাঁও	(গল্প)	শ্রীশামুক ...	১২৭
গোলযোগ	(গল্প)	৺ তারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ...	৪৩
ঘুম	(কবিতা)	শ্রীশান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৪৪৭
চড়াই	(„)	„ সুকমল দাশগুপ্ত ...	৩১৭
চিঠি	(„)	„ নবগোপাল সিংহ ...	৩৮০
চিঠিপত্র			৫৪, ১০৭, ১৬০ ২০৭, ২৫০, ৩১৫, ৩৫৭, ৪০০, ৪৪০, ৪৮৬, ৫৩২, ৫৭৬
চিঠির উত্তর	(„)	„ সুচেতা ভট্টাচার্য্য ...	৩৮২
চিনতে পার ?	(সচিত্র)	...	৪২৫
চীনে কবিতা	(কবিতা)	„ উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক ...	৬১
চৈতালি রাত	(„)	„ বিমল দত্ত, এম্ এ ...	৫৩৫
ছড়া	(„)	„ দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় ...	৭৮
ছুটি	(গল্প)	„ উৎপল সেনগুপ্ত ...	৪২৭
ছেড়ে আসা দেশ	(কবিতা)	„ যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ...	৩৬১
ছেলেধরা	(গল্প)	„ নীলিমা সেন (গঙ্গোপাধ্যায়) ...	৩৮৪
জয়সমন্দ	(গল্প)	„ শামুক ...	৪১৮
জুজু বুড়ো	(কবিতা)	„ শিবনারায়ণ ঘোষাল ...	৫২৬
জ্যৈষ্ঠ মাসে	(„)	„ উৎপল সেনগুপ্ত ...	৯৬
জ্যৈষ্ঠের ধাঁধা দেখে	(কবিতা)	„ প্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু) ...	২১০
জ্ঞানতপস্বী জ্ঞানচন্দ্র	(জীবনী)	অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম্ এস্-সি	৪৮০
ডাকে আয় আয়	(কবিতা)	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্ এ ...	২৩৭
তুর্কি	(নাটিকা)	„ যামিনীকান্ত সোম ...	৭৩
তুষারতীর্থ শ্রীকৈলাস	(ভ্রমণ-কাহিনী)	তীর্থঙ্কর	১৮, ৭৯, ১২৩, ১৮৩, ৪৩৩, ৪৬৩
তৃতীয় এশিয়ান্ গেম	(খেলাধূলা)	শ্রীঅমিতাভ ভট্টাচার্য, বি. এস্-সি	১৪৮
দরবারী কাহিনী	(গল্প)	" দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় ...	৫৫৮
দুই বন্ধু	(কবিতা)	বন্দে আলী মিয়া ...	১৭৩

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
দুই বোন	(গল্প)	শ্রীশামুক ···	৪৫২
দেশে দেশে নববর্ষ উৎসব	(সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীসূর্য্যাংশু ভট্টাচার্য্য ···	৬
ধাঁধার উত্তর			৫৯, ১১০, ১৬১, ২১০, ২৫৫, ৩১৬, ৩৫৮, ৪০২, ৪৪৫, ৪৮৯, ৫৩৩, ৫৭৯
নতুন বই	(পুস্তক-পরিচয়)	···	১৩৮, ৩০৭, ৩৪৩, ৩৯৫, ৫৩০
নতুন বছরের রামধনু	···	··· ···	৫৮১
নববরষে	(কবিতা)	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্ এ ···	১৭
নামে বিশ্বাস	(ইতিহাস)	ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ···	১৭৯
নিয়তি	(গল্প)	শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায় ···	২৭৬
নিরক্ষর বাদশাহ্	(ইতিহাস)	„ যামিনীকান্ত সোম ···	৫৩৬
নীল শরতে	(কবিতা)	„ রত্নাবলী ভট্টাচার্য ···	২৯৪
নূতন ধাঁধা			৬০, ১১০, ১৬১, ২১১, ২৫৬, ৩১৬, ৩৫৯, ৪০৩, ৪৪৬, ৪৯০, ৫৩৪, ৫৮০
পঞ্চানন্দ	(কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি.এ ···	৮৮
পঞ্চায়ুধ কুমার	(জাতকের গল্প)	” জয়দেব রায়, এম্ এ ···	৩২৫
পড়ার কথা	(কবিতা)	” শিবানী রায় চৌধুরী ···	৪৩১
পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণে	(কবিতা)	সু-মো-দে ···	৪৬৮
পথিক মেঘের দল	(ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীআশা দেবী, এম্.এ, বি.টি	৩৯, ১৭৪, ২৭৯
পরিবর্ত্তন	(গল্প)	৺কল্যাণী দেবী, বি এ ···	২২৩
পশ্চিম দিগন্তে	(ভ্রমণ -কাহিনী)	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	২৭, ৮৩, ১৩১, ২০০, ২৩১, ২৯৬, ৩৩৩, ৩৬৩, ৪২১, ৪৪৮, ৫১৪
পাকাপাকি	(গল্প)	শ্রীসুব্রত সেনগুপ্ত ···	২৩৯
পাঁচটি যমজ ছেলে	(”)	” জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী ···	৫৫০
পাঁচমিশেলী		···	৫১, ৯৯, ১৪৩, ২০২, ৩১১, ৪৪২
পুলিশের কারবারই আলাদা	(”)	শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ···	৩১
প্রকাশচন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা		··· ···	৪৭৮
ফেরার পথে	(ভ্রমণ-কাহিনী)	তীর্থঙ্কর ···	৫২০, ৫৫৪
বন্দী নেপোলিয়ন	(ইতিহাস)	শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত ···	২৬৩
বসন্তের আভাস	(কবিতা)	” সুচেতা ভট্টাচার্য ···	৫৭৮
বিচার	(ইতিহাস)	ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ···	৫১৭
বিপিন স্মরণে	(কবিতা)	শ্রীবিভা সরকার, বি.এ ···	৩৯১
বুক ঢিপ ঢিপ করছে ভয়ে	(”)	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ···	৩০২

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
বোধিসত্ত্বের গল্প	(জাতক)	শ্রীঅমিতাকুমারী বসু ···	৪১১
ভবিষ্যৎবাণী	(গল্প)	” শামুক ···	৩
ভাড়াটে	(”)	৺কল্যাণী দেবী, বি.এ ···	২৬৮
ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক			৫৬, ১০৫, ১৫৭, ২০৫, ২৫৩, ৪০১, ৪৪৪, ৫৩১, ৫৭৯
ভুল ভাঙ্গা	(গল্প)	শ্রীরেণুকা দেবী ···	৪৭৩
ভোম্বামামার গল্প	(স্মৃতিকথা)	” বিমল দত্ত, এম্.এ ···	৫০৮
মনীষী বিপিনচন্দ্রের শতবার্ষিকী		··· ···	৩৯০
মনোচিকিৎসক স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র দাস	(জীবনী)	··· শ্রীকৌটিল্য ···	৪৭৭
মনোরঞ্জন-স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা		··· ···	৫৭৮
মনোরঞ্জন-স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল		···	৯৮
মহাকালের অভিশাপ	(উপন্যাস)	শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত	১২, ৬৮, ১১৮, ১৭০, ২১৯, ৩৩৮, ৩৭৭, ৪১৪, ৪৬০, ৪৯৭, ৫৪৬
মাটির ঘরে জনম আমার	(কবিতা)	শ্রীঅজিতেন্দ্র সিংহ ···	৪৯৬
মায়ের আশীর্ব্বাদ	(ইতিহাস)	” যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ···	৩০৮
মিকির আর চিতা	(গল্প)	” পার্থ দে সরকার ···	১৮৬
মেঘনাদ	(উপন্যাস)	অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম্. এস্-সি	৯৩, ১৫৪, ১৯৭, ২৪৭, ৩৫৩, ৩৯২, ৪৩৫, ৪৮৩, ৫২৭, ৫৭২
ম্যাজিক শেখ	(ম্যাজিক)	যাদুরাজ এস্ ডি. মুখার্জ্জি	৯৭, ১৯১, ৪৭২
যদি একটা বলো	(গল্প)	শ্রীইন্দিরা দেবী ···	২৫৯
যদু-মধুর যুক্তি	(কবিতা)	„ শিবনারায়ণ ঘোষাল ···	৪৩২
যমজ ভাই	(গল্প)	৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, এম্ এ, বি.এল	১৪০
যাদুর খেলা	(ম্যাজিক)	যাদুকর পি কে চৌধুরী ···	৩৮৩
রাজবাড়ীর হাতী	(সচিত্র)	শ্রীঅমিতাকুমারী বসু ···	৪৯৩
রায় বরুয়ার শিকার কাহিনী	(শিকারের গল্প)	ডক্টর হিরণ্ময় ঘোষাল, পি. এইচ.-ডি	৫০২, ৫৩৮
রিপু জয়	(কবিতা)	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক ···	৪০৫
রিমলি	(গল্প)	„ সাগরিকা শ্যাম, এম্.এ, বি.টি	৩৭২
রূপকথা	(কবিতা)	„ অরুণিমা সেনগুপ্ত ···	৫২৫
রূপকথা-রচয়িতা গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়	(জীবন-কথা)	„ অমলশঙ্কর রায় ···	২১৫

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
শতধারা ও শিউলি	(কথিকা)	স্বপনবুড়ো ...	৩০৩
শরৎ	(কবিতা)	শ্রীপ্রভাকর মাঝি ...	২৫৭
শরৎ	(”)	„ সুচেতা ভট্টাচার্য ...	২৯৫
শিশুসাহিত্যিক-পরিচিতি	(পরিচয়)		৫০, ১০৪, ২০৭, ২৪৬, ৩৪২, ৪৭৯
শিশু-সাহিত্যের তিনজন	(কবিতা)	শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত ...	৪৬৯
শিশুসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ	(প্রবন্ধ)	„ নরেন্দ্র দেব ...	১১৩, ১৬৫
শুভ নববর্ষ	(কবিতা)	„ কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি এ ...	১
শ্রাবণ	(কবিতা)	„ সুচেতা ভট্টাচার্য ...	১৯০
শ্রীল শ্রীযুত…বাবু	(কবিতা)	„ অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় ...	২১৩
সংস্কৃত ভাষার গল্প	(প্রবন্ধ)	„ অপর্ণা দাশগুপ্ত, এম্.এ ...	২৩৩
স্বদেশী কুকুর	(গল্প)	„ অরবিন্দ গুহ ...	২৮২
সামান্য একটু দোলা	(„)	„ রেণুকা দেবী ...	৮৯
সাহিত্যিকদের আঁকা ছবি	...	... ...	১৪৭
সাঁতার দিয়ে সাগর পাড়ি	...	শ্রীকৌটিল্য ...	৩৫৬
সূর্য্যদেবের গ্যাস হিলয়ম	(বিজ্ঞান)	অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম্.এস্-সি	৪৫
সেন্ট হেলেনায় বন্দী নেপোলিয়ন	(ইতিহাস)	... শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত ...	৩২৩
সোঁদাচরের মৃত্যু	(কবিতা)	৺ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩৪৫
হরিজন	(সত্য ঘটনা)	শ্রীঅজিতকুমার তারণ ...	৩৭
হাওয়া	(কবিতা)	„ বিমল দত্ত, এম্.এ ...	১১১

'আমরা রাশিয়ায় এসে পৌছলাম।'

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩১শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৬৫ { ১ম সংখ্যা

শুভ নববর্ষ—১৩৬৫

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

হে নববর্ষ, এসো তুমি উল্লাসে,
এসো বেলা, যুঁই,—এসো চম্পকবাসে।
গঙ্গা-সাগরে করিয়া পুণ্য স্নান,
স্নিগ্ধ নূতন আলোক করিয়া দান,
অন্তরীক্ষ, বায়ু ও জলস্থল
করি পবিত্র, নিরাপদ, নির্ম্মল,
মঙ্গলদূত, এসো হে সুপ্রভাতে—
বরাভয় আর শান্তিকলস হাতে।

প্রতি ঘরে ঘরে আনো তুমি উৎসব,
সিদ্ধি, ঋদ্ধি, আনন্দ, জয়রব।
নাশো দুর্ম্মতি, দুর্নীতি, দুর্গতি,
আনো দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে প্রীতি।
সর্ব্বারিষ্ট প্রশমন কর তুমি,
মানুষকে সৎ সমৃদ্ধ কর ভূমি।
অপাপবিদ্ধ রহুক কিশোর মন —
তৃপ্ত হউন, প্রীত হোন নারায়ণ।

শান্ত হউক যারা উচ্ছৃঙ্খল,
হীনবল হোক নষ্ট দুষ্টদল।
শুদ্ধ বিবেক, আনো তুমি সংযম,
কর সব শুচি, সুন্দর, মনোরম।
পঙ্ক-শয্যা পঙ্কজে দাও ভরি,
মগ্নকে তোলো, ভগ্নকে দাও গড়ি।
হাস্য ফুটাও সব বিষণ্ন মুখে,
রামধনু তুমি উঠাও মেঘ্‌লা বুকে।

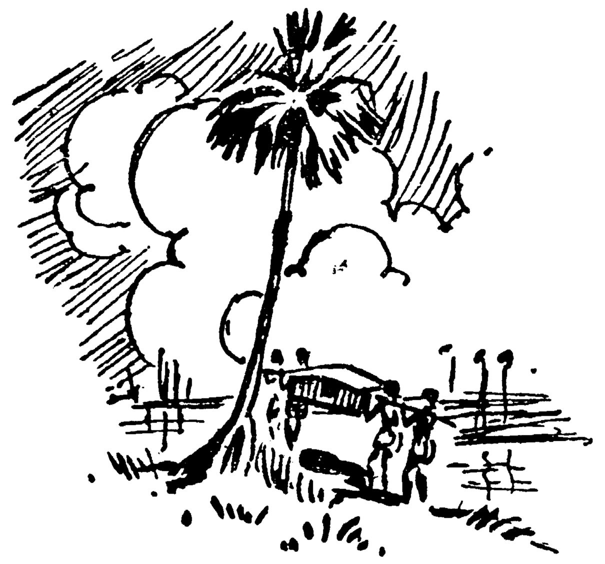

ভবিষ্যৎ-বাণী

শ্রীশামুক

তোমাদের বয়স বেশী না হলেও শহরের এক নম্বর ডাক্তার দেবেশ সেনের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। সকলে বলে, ও মরা মানুষ বাঁচাতে পারে। বিশ্বাস এমনি জিনিস। নিজের ওপর বিশ্বাস থাকলে তবেই অন্যের বিশ্বাস মেলে—নয় কি? ওর ডাক্তারী জীবনের গোড়ার কথা বলি শোন—ভারী মজা পাবে।

অনেক দিন পরে একবার কলকাতায় পৌঁছে খুশিতে মন গড়ের মাঠের দিকে ছুটল। মেট্রোর সামনে দিয়ে রাস্তা পার হতে আকাশ চোখে পড়ে যায়। ঘন কালো মেঘের স্তূপ ধীরেসুস্থে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। বাতাস থম্‌থমে—ঝড়ের আগে ঠিক যেমন হয়। কাজ নেই বেড়াল-ভেজা ভিজে, ফুটপাথে সোজা হাঁটা যাক, গাড়ি-বারান্দায় আশ্রয় মিলবে।

হঠাৎ দেবেশের সঙ্গে দেখা! জড়াজড়ি আর পিঠ থাবড়া-থাবড়ি চলল কিছুক্ষণ। একসঙ্গে ইস্কুলে পড়েছি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। তারপর বাবার সঙ্গে বিদেশে গেলাম, তাই ছাড়াছাড়ি। আগে জেনেছিলাম যে ও ডাক্তার হয়েছে।

খুশিতে মন উপচে পড়ে চ, মাঠেই যাই। দেবেশ বলে,—না না, ভিজে সর্দি করে লাভ কি? তার চেয়ে সামনের হোটেলে চা খেতে খেতে গল্প করা যাক।

চা আনতে হুকুম দিয়ে বলে, একটা জরুরী চিঠি শেষ করে নি; যাবার সময় ফেলে দিতে হবে।

ও চিঠি লেখে আর আমি ওকে দেখি। এবারে ঝড় উঠেছে, বৃষ্টিও সুরু হয়েছে টুপ্‌ টাপ্‌।

চওড়া কপাল, মুখে গম্ভীর অথচ শান্ত ভাব—ভাল ডাক্তারের যেমন হওয়া উচিত। হাতের আঙুল সরু আর লম্বা—সম্ভব কাটাকুটিতে হাত পাকিয়ে নাম করেছে।

বেশ জোরে বৃষ্টি এল। অনেকগুলি মানুষ দৌড়ে ভেতরে এসে ঝুপ ঝুপ বসে পড়ে। বেশ ঠাসাঠাসি জমাট ভীড়।

—ডাক্তার! ডাক্তার আছেন কেউ এর মধ্যে?

একজন ভদ্রলোক হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে টেবিলের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। সকলেই ব্যস্ত, ঠেলাঠেলি, চীৎকার। দেবেশ চিঠি শেষ করে চামড়ার ব্যাগে রাখলে, কিন্তু বলছে না তো কিছু!

আমি উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলি,—এই এখানে ডাক্তার দেবেশ সেন।

হৈ হৈ করে অনেক লোক এগিয়ে আসে। মানুষে মানুষে মিশে যায়। কিন্তু দেবেশ পালাল কেন? ব্যাগটি বুকে চেপে টেবিল চেয়ারের পাশ কাটিয়ে পড়ি-কি-মরি হয়ে ফুটপাথে—তারপর চোঁ চাঁ—ঝড়বৃষ্টির মধ্যে, অন্ধকারে! দু'-তিন জন দৌড়ে পিছু নিল কিন্তু পারলে না ধরতে।

শুনেছি রোগীরা কোন কোন ডাক্তার দেখে প্রাণভয়ে ছুটে পালায়। সহরে কি আজকাল ডাক্তারেরা রোগীর ভয়ে পালাতে আরম্ভ করেছে?

মুখে মাথায় জল চাপড়াতে লোকটি তখুনি সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু বেশ কয়েকজন আমায় ঘিরে এক চোট ঝাল ঝাড়তে থাকল। ডাক্তার ও বন্ধুর নাম করে যা সব বিশেষণ আওড়ালে তা শোনা বড়ই কষ্টকর। কিন্তু উত্তর দেবো কি, অন্যায় নিশ্চয়ই। একজন আবার আস্তিন গুটিয়ে হুকুম করে,—ঠিকানা দাও, ডাক্তারের মাথা ফাটিয়ে রুগী করে তরে ছাড়বো—বুঝবে বাছাধন! গতিক সুবিধের নয় দেখে আমিও সরে পড়তে দেরি করলাম না।

কিন্তু দেবেশ পালালে কেন? পরের দিন ওর বাড়ী গিয়ে ওর মুখ থেকে যা শুনলাম তাতে আরো অবাক্ না হয়ে পারলাম না। ভয় মানুষকে এমনি বিকল করে দেয়? ওর ছোট বয়সের আশা-বাসনার একদম মোড় ফিরিয়ে দিল?

দেবেশ পাশ করে ডাক্তারখানা খুলে বসল। প্রথম থেকেই যে রোগীরা ভীড় করে আসবে না তা সে জানতো।

চার দিনের দিন এক জটা-ওয়ালা সাধু বোম্ বোম্ করতে করতে সটান এসে ঢোকে—পয়সা দাও। কিচ্ছু দেবো না। জুলুম দেখে দেবেশ বেশ গরম হয়েই ভাগিয়ে দেয়। বাজে সাধু তো, শাপমণ্যি সুরু করে,—সর্বনাশ হবে। প্রথম দশ জন রোগীই পট্‌পট্ মরবে তোর হাতে—সব্বাই। তারপর পাততাড়ি গুটিয়ে পালাতে পথ পাবি না।

সাধু চলে গেল। কিচ্ছু নয় জেনেও মন খারাপ হয়ে যায়। যদি সত্যি সত্যি টপাটপ্ যমের টোপ্ গেলে! দশ দশজন! বাপ রে!

কয়েক মিনিট পরে সাধুকে চ্যাং-দোলা করে এনে একদল লোক বেঞ্চির ওপর শুইয়ে দিল। রাস্তা পার হতে মোটর-চাপা পড়েছে। সবচেয়ে কাছে এই নতুন ডাক্তারখানা।

দেবেশ যথাসাধ্য করল কিন্তু সাধু বাঁচল না। সাধুর ভবিষ্যৎ-বাণী কি ফলতে সুরু করেছে? তবে নিজেই যে প্রথম রোগী হবে তার কিছু আন্দাজ পেলে প্রচণ্ড রাগের মাথায়ও কথাটা নিশ্চয়ই বলে ফেলতো না।

কিন্তু এর পর বিস্ময়—আরো বিস্ময়! সত্যি, একটা দুটো করে শেষ হতে থাকলো—যে রোগী আসে।

তারা যে নিতান্ত নিদেন অবস্থায় এসেছে, কারুর সাধ্য নেই বাঁচায়—এ সব কথা মনে লাগে না। দেবেশের মন খুঁত খুঁত করে অষ্ট প্রহর। সেই সাধুর কথা ফলছে। মুখে রোচে না খাওয়া, ঘুম নেই!—ওর অবস্থা ঐ রোগীদের মত মারাত্মক হয়ে যায় আর কি!

ন' নম্বরে পৌঁছে ডাক্তারখানা উঠিয়ে দিয়েছে কয়েক মাস আগে। এক ওষুধ কোম্পানীতে দালালের কাজ নিয়েছে। নিজের বাড়ীতেও কারুর অসুখ হলে ত্রি-সীমানায় যায় না। সামান্য একটু ফোঁড়া চিরে দিতে বা ইন্‌জেক্‌শন্ দিতে কেউ মিনতি করলে স্পুটনিকের মত ছিটকে পালায়।

—কিন্তু ভাই, কাল ঐ হোটেলে—ও তো সামান্য সর্দিগরমি!

চোখ পাকিয়ে খিঁচিয়ে ওঠে,—কি বলতে চাস্? আমি ছুঁলেই ও দশ নম্বর হয়ে যেত না?

বছর দশেক পরে আবার কলকাতায় এসেছি। যেখানে যাই শুনি দেবেশ সেনের মত সার্জেন হয় না। একটা গোটা মানুষকে কেটেকুটে বাঁচিয়ে দিতে পারে। স্বয়ং ধন্বন্তরি! অবাক্ বৈকি। সেই দেবেশ মানুষ কাটছে বেপরোয়া?

বাড়ি গিয়ে দেখি সত্যি কথা বটে। ওর ছুরির তলায় জান দেবার জন্যে বহু লোকের ভীড়। নিরিবিলি হতে, জিজ্ঞেস করি—ব্যাপার কি?

ওষুধ কোম্পানীর আপিস খুলতে দেবেশকে রেংগুন যেতে হ'ল। সবে গুছিয়ে বসেছে আর যুদ্ধের বোমা এল দুদ্দাড়—শহরের ওপর। পালিয়ে আসার সমস্ত ঠিক, কিন্তু শেষে মিলিটারী আসতে দিল না। ওর চিঠির কাগজ থেকে জেনেছে যে ও ডাক্তার। তাই জোর করে হাসপাতালের কাজে দিলে লাগিয়ে। লড়াই-এর মার খাওয়া রোগী, তার ওপর হাসপাতালের চিকিৎসা!

—কতগুলো সাবাড় করলি?

—গোণবার ফুরসৎ ছিল কোথায়? তবে সাধু হিসেবে আরো শূন্য বসাতে ভুলে গেছল রে! আবার বাঁচতেও লাগল কত জন যাদের সম্বন্ধে আশা করা মনে হ'ত নিছক পাগলামি। কিন্তু কাজে মেতে গিয়ে ভয় পালিয়ে গেল বিলকুল। আর ভয় আসে না—চোখ চেয়ে দরদ দিয়ে নিজের হাতের কাজ করে যাই—ব্যস্।

ভাবছি—কত রকমের ভয় পাই আমরা হামেশা, সত্যি মিথ্যে সবেতেই। সে সময়ে কোন কাজ নিয়ে মেতে গেলে বেশ হয়—না?

দেশে দেশে নববর্ষ-উৎসব

শ্রীসূর্যাংশু ভট্টাচার্য

প্রত্যেকের জন্যেই নতুন বছরের সুরুর দিনটি বিশেষ দিন। তা সে পয়লা জানুয়ারীই হোক, আর পয়লা বৈশাখই হোক, বা অন্য আর যে কোন দিনই হোক। এই নতুন বছর উপলক্ষ্যে সর্বত্রই উৎসব প্রতিপালনের রীতি প্রচলিত রয়েছে। নতুন মানেই নতুন আশার আলোক,—যা পাওয়া যায় নি তা পাওয়া যাবে—এমনি আশ্বাসের ইঙ্গিত। নববর্ষের উৎসবের মূলেও রয়েছে এই আশা।

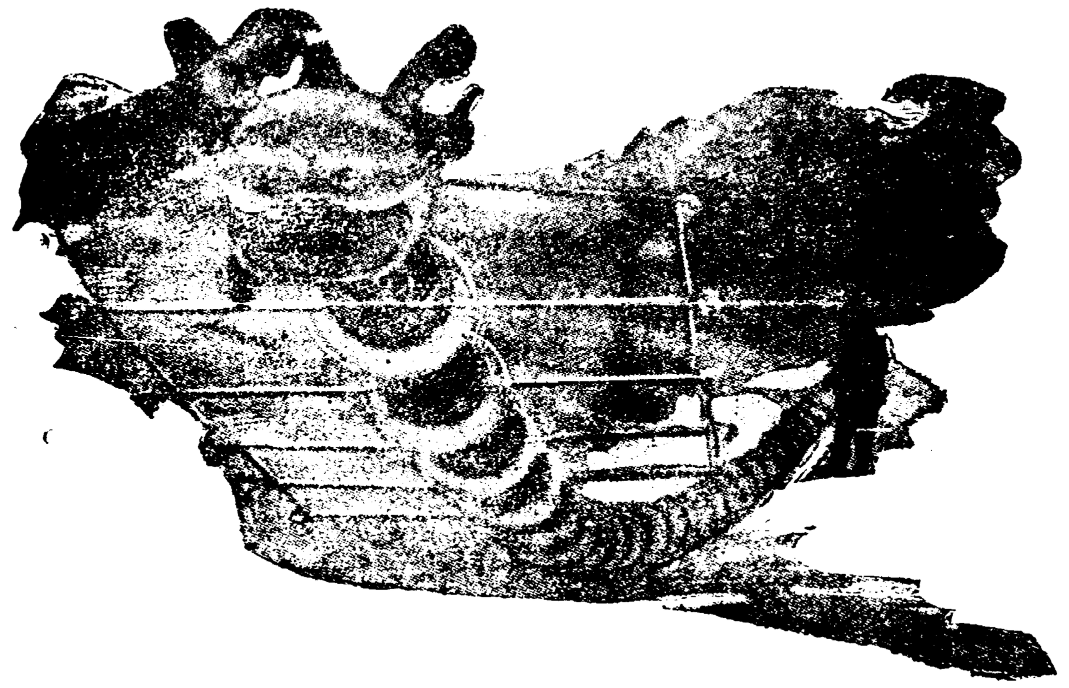

চীনা ছেলেরা নববর্ষে বিরাট ড্রাগনাকৃতি ঘুড়ি ওড়াচ্ছে।

পৃথিবীর সর্বত্র যেমন একই দিনে নববর্ষ গণনা করা হয় না, তেমনি নববর্ষ-উৎসবের রীতিনীতিও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের। যেমন ধর, চীনারা তাদের নববর্ষের আবাহন করে দু' সপ্তাহ ধরে হৈ-হুল্লোড়, আলোকসজ্জা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে। জাপানের নববর্ষ-উৎসবও কম উল্লেখযোগ্য নয়। একজন জাপানী, যত গরীবই হোক না কেন, এই উপলক্ষ্যে নতুন জামা-কাপড় কিনবেই, আর বেশ কিছুদিন ধরে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবে। তাদের বাড়ী গিয়েও দেখা করবে, খাবে। এই উপলক্ষ্যে তারা বাড়ীর সদর দরজা ঘনকৃষ্ণ পাইন পাতা আর হালকা-সবুজ বাঁশ দিয়ে সাজায়, আর দরজায় দরজায় ঝুলিয়ে রাখে লাল পতাকা, কাঁকড়া আর খয়েরী রংয়ের তাদের দেশের নিজস্ব একরকম ফল,—যা নাকি, তাদের মতে, দীর্ঘজীবন ও সুখের চিহ্ন। রাস্তাঘাটে ছেলেমেয়েরা হেসে-খেলে বেড়ায় সারাদিন, আর অভিবাদন জানিয়ে একান্ত অপরিচিত পথচারীকেও শুভকামনা জানায় নববর্ষের।

নববর্ষের আন্তরিকতায় স্কটল্যাণ্ডের একটা নিয়ম হার মানায় সবাইকে। সেখানকার লোকদের বিশ্বাস—নববর্ষে বাড়ীতে যে প্রথম পদার্পণ করবে—সে-ই সে বাড়ীর সারা বছরের ভাগ্য বয়ে নিয়ে আসবে। তাই মাঝ রাতে উঠে কেক্ ও অন্যান্য সুখাদ্য

ও পানীয় নিয়ে বহু লোক রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। ঠিক বারোটা বাজলে যে যেখানে খুসী ঢুকে পড়ে। সে বাড়ীর লোকেরা যাতে তার খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ ক'রে আনন্দ পায় আর পরিণামে তাদের সারা বছর আনন্দে কাটে—তারই জন্যে এই রীতি।

এই উপলক্ষ্যে নতুন বছরে নতুন কিছু করবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করারও রীতি রয়েছে কোন কোন অঞ্চলে। পুরানো বছরের মন-খারাপ-করার মতো সব কিছু ভুলে গিয়ে হৃদয়ে নতুন আশা এনে দেয় এই নতুন প্রতিজ্ঞা। যদিও সবাই যে সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে এমন নয়।

নববর্ষ-উৎসবে সজ্জিত জাপানী মেয়ে

আগেই বলেছি বিভিন্ন অঞ্চলে বছর গণা হয় বিভিন্ন সময় ও দিন থেকে। ইংরেজী ক্যালেণ্ডারের ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ হচ্ছে আরব দেশের ১৩৭৮ সাল। আবার মিশর ও ইথিওপিয়ায় প্রচলিত কপ্ট বছর হিসাবে তা ১৬৭৫ সাল। ইহুদীদের ক্যালেণ্ডার অনুসারে এই বছরকে ধরা হবে ৫৬১৯ সাল। আবার জাপানে এই বছর হচ্ছে ৩৩তম সোয়া (Showa)। বর্তমান সম্রাট্ হিরোহিতো তাঁর মৃত্যুর পর এই নামেই পরিচিত হবেন। ভারতের নানা অঞ্চলে নানা সময় থেকে নতুন বছর ধরা হয়। ইংরেজী নিয়মে (খৃষ্টাব্দ) ১লা জানুয়ারী তো আছেই, সরকারী কাজকর্মে আবার ১লা এপ্রিল (এপ্রিল ফুলের দিন!) নববর্ষ। বাংলা দেশে আগে নববর্ষ ধরা হ'ত অগ্রহায়ণ মাস থেকে—যার অপর নাম মার্গশীর্ষ। এ সময় নতুন ধান ঘরে ওঠে কিনা! এখন অবশ্য ১লা বৈশাখই নববর্ষ। সম্প্রতি আবার পঞ্জিকা সংস্কার করে বছর পাল্টানো

হয়েছে। এতে ১লা চৈত্র থেকে নতুন বছরের স্থরু ধরা হয়েছে। এই সাল হচ্ছে শকাব্দ (যেটা এখন ১৮৮০)। এ ছাড়া আরও অব্দের চল আছে এ দেশে—বিক্রমাব্দ থেকে হালের রবীন্দ্রাব্দ পর্যন্ত।

বালীদ্বীপে বছর ধরা হয় দু'শ' দশ দিনে। তাই ইংরেজী বছর দিয়ে হিসেব করতে গেলে, বালীর নববর্ষের দিন প্রতি বছরই পাল্টাবে। বালীতে তাদের নতুন বছরের প্রথম দিনটিকে বলা হয় "গুলানগান"। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে "সাগরজলে-সিনান-করা সজল এলোচুলে বসে-থাকা" এই দ্বীপটীতে সুরু হয় দশদিন-ব্যাপী উৎসব। দ্বীপবাসীদের বিশ্বাস যে নববর্ষের এই উৎসবে তাদের মৃত আদিপুরুষরা তাদের পুজো নিতে আসেন আর তাদেরকে তাঁদের আশীর্বাদ দিয়ে যান। এই উৎসবের আগে বাড়ীঘর, মন্দির সব নতুন করে সাজানো হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সাজানো হয় ছয় ফুটেরও উপর উঁচু গম্বুজ তৈরী করে। গম্বুজগুলো তৈরী করা হয় খড় দিয়ে। বাইরের দিক্ সুন্দর করা হয় হলুদ, লাল, অথবা সাদা চাউল আর ফ্রান্‌জিপানি ফুল দিয়ে। "গুলানগান" উৎসবের সময় বালীবাসীদের উপকারী জন্তু 'বারঙ্'কে বিভিন্ন পথের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই দানবাকৃতি পশুকে ধাওয়া করে নিয়ে যায় দু'জনে নাচ্‌তে নাচ্‌তে। ছোট-বড় সবাই বারঙের নাচ আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করে। এ নাচ তাদের মতে—ভাল ও মন্দের মধ্যে যুদ্ধ।

আমাদের দেশেও আজকাল ছোটদের এই রকম নৃত্যের ভিতর দিয়ে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়।

পূর্বপুরুষদের অন্য পূজা-উপচার প্রস্তুত করতেও, কম করে, দু' সপ্তাহের বেশী সময় লাগে। প্রস্তুত হলে পর তাদের নিয়ে যাওয়া হয় মন্দিরে, যেখানে সেগুলো সকলকে দেখাবার জন্যে কিছু দিন রাখা হয়। তারপর, বালীবাসীরা সেগুলো বাড়ী এনে প্রসাদরূপে গ্রহণ করে। আমাদের উৎসবের জন্যে যেমন আমরা ভালো ভালো

খাবার তৈরী করে থাকি, বালীবাসীরাও "গুলানগান" উৎসব উপলক্ষ্যে তাদের মনের মতো খাবার-দাবার তৈরী করে। এটাও উৎসবের অঙ্গ। এই জন্য সব চাইতে মোটা-সোটা শূয়োর মারা হয়; তারপর সেগুলোকে ছোট ছোট টুকরো করে কাঠের চোঙের ভিতর রাখা হয়। ছোট শূয়োরগুলোকে আগুনে সেঁকা হয়। এই মাংসের সঙ্গে মশলা দিয়ে চপ্ তৈরী হয়। গন্ধযুক্ত করার জন্য সুগন্ধি ফুলও ব্যবহৃত হয় তার সঙ্গে। শূয়োরের মাংস ওদের প্রিয় খাদ্য।

নববর্ষ-উৎসবে শোভাযাত্রার প্রথমে মেয়েরা রঙ্-বেরঙের পূজা-উপচার বয়ে নিয়ে চলে। মেয়েদের পর চলে পুরুষরা। তাদের ঘাড়ের উপর থাকে বাঁশের মাচাং। মাচাং-এর উপর সাবধানে তৈরী করা থাকে তাদের পূর্বপুরুষেরা যে সব বাড়ীতে বাস করতো তারই নমুনা আর তাদের দেবতার বিগ্রহ। শোভাযাত্রা চলে তাদের পুরোহিত-নির্দ্ধারিত কোন পবিত্র স্থানের দিকে। একজন বিখ্যাত ভ্রমণকারী বলেছেন, নতুন বছরের শুরু উপলক্ষে বালীদ্বীপের অধিবাসীদের মত বিচিত্র ও মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠান তিনি আর কোথাও দেখেন নি।

খুকুর ভাবনা

স্বপনবুড়ো

সত্যি, আমাদের খুকুর ভাবনার অন্ত নেই।

খুকুর দুটি পোষা অবোলা জীব। একটি ছাগল আর একটি কুকুর। ছাগলটির নাম অজারাণী আর কুকুরটির নাম দস্যিরাণী।

খুকু অজারাণী আর দস্যিরাণীকে এত ভালবাসে— কিন্তু মজা দেখেছ?— ওরা একে অন্যের নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত সহ্য করতে পারে না। এ যদি যেতে চায় ডাইনে, ত' ও চলে যাবে সিধে বাঁয়ে। অজারাণীর কাঁঠালপাতা না হলে মুখে রুচ্‌বে না, আর দস্যিরাণী মাংসের হাড় না পেলে মুখ ঘুরিয়ে নেবে।

এমনি যখন দুটি আবোলা জীবের অবস্থা, তখন খুকুর ভাবনা না হয়ে উপায় কি? ও যদি দুটিকে প্রাণ দিয়ে এত ভালোবাস্‌তে পারে, তা হলে ওরাই বা পরস্পরকে আপনার করে নিতে পারবে না কেন?

ওদের দু'জনের কথা ভেবে-ভেবে খুকুর দিনে নেই খাওয়া, আর রাত্রে নেই ঘুম।

খুকু অনেক রকম চেষ্টা করে দেখেছে। দু'টিকে কাছাকাছি বেঁধে রেখে নিজে মাঝখানে বসে ওদের ভাব জমাবার চেষ্টা করেছে। ভাব ত' হয়েছে ঘোড়ার ডিম, মাঝখান থেকে ওদের দু'টির সমবেত চীৎকারে বাড়ী থেকে কাক-চিল উড়ে যাবার উপক্রম! আর সেই সঙ্গে বাড়ীর সকলেও খুকুর ওপর খড়্গহস্ত। পিসিমা ত' একদিন রেগে-মেগে গিয়ে বলেই উঠ্লেন,—দেবো একদিন দুটোকেই দূর করে তাড়িয়ে; তখন একেবারে আপদের শান্তি হবে।

খুকু এ জন্যে নিজেও কিছু কম ভাবে না। সত্যিই ত' সবাই কেন দিন রাত এই ঝামেলা সহ্যি করবে? অনেক সময় খুকুরই ইচ্ছে করে, যে, দুত্তোর বলে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে একেবারে সোজা বনের দিকে চলে যায়!

কিন্তু প্রাণ ধরে সে কাজও ত' করতে পারে না খুকু। ও যদি চলে যায় ত' অজারাণী আর দস্তিরাণীকে কে দেখ্বে? বাড়ীর লোকের ত' তখন সুবিধেই হবে। এমনিতেই ত' সবাই হাড়ে চটে আছে। তখন সকলে মিলে যুক্তি করে ছাগল আর কুকুরটাকে একেবারে দূর করে তাড়িয়ে দেবে।

ভাবনায় চিন্তায় ছোট্ট খুকু যেন আরো শুকিয়ে যাচ্ছে!

আরো কিছুদিন যায়। খুকু ভাবে. ওদের স্বভাব শুধ্রে যাবে।

ছাই! কুকুরটা সুযোগ পেলেই ছাগলটার ঠ্যাং কামড়াতে যায়। একদিন যেই কুকুরটা ভোক্-ভোক্ করে এগিয়ে গেছে—অমনি ছাগলটা মরিয়া হয়ে কুকুরটাকে এমন ভাবে শিং নেড়ে তাড়া করেছে যে সে ব্যাটা তখন প্রাণের দায়ে পালাতে পথ পায় না।

ভাব না—আড়ি, আড়ি—না ভাব,—এই কথা ভেবে ভেবে আমাদের ছোট্ট খুকু বোধ করি পাগলই হয়ে যাবে।

খুকু ওদের মিতালীর আশা এক রকম ছেড়েই দিয়েছিল. এমন সময় বাড়ীর সবাই মহা খুশী হয়ে ওকে একটি খবর দিল।

খবরটি শুন্লে কার না আনন্দ হয়. বলো? সবাই বল্লে. অজারাণী আর দস্তিরাণীর নাকি বাচ্চা হবে। অন্য সকলের মতো প্রথমে খুকুও খুব খুশী হয়ে উঠল। কিন্তু আরো কিছুটা ভালো করে ভেবে দেখে ছোট্ট খুকী আঁত্কে উঠ্ল।

কেন না,—অজারাণীর একদল বাচ্চা আর দস্তিরাণীর এক দঙ্গল ছানা-পোনা যদি দুই দলে বিভক্ত হয়ে দাঙ্গা করতে সুরু করে—তা হ'লে খুকুকেই হয়ত শেষ পর্য্যন্ত বাড়ী-ছাড়া হতে হবে।

খুকু গালে হাত রেখে শুধু আপন মনে ভাবে। খুকুর ভাবনা দেখে বাড়ীর লোকেরাও মহা চিন্তায় পড়ল। তাই ত'! এই ভাবনার হাত থেকে কি করে রক্ষা পাওয়া যাবে?

খুকুর এতগুলো নাতি-নাতনী হবে, - তাদের সামাল দেয়া ত' সোজা কথা নয়!

খুকুর এখন মরবার সময় নেই! দু'-দু'টো আঁতুড় ঘরকে তুল্তে হবে। বাচ্চা-গুলো কিসে থাক্বে? কম্বলে, না ঝুড়ির ভেতর?

এই সব ভাবনা ভেবে ভেবে খুকু কেবলি ঘর-বার করতে লাগ্লো।

অবশেষে দেখা গেল—অজারাণী প্রসব করল চারটি অজ, আর দস্তিরাণীর হ'ল গোটা ছয়েক ছানা।

বাড়ীতে এত দিন বাদে একেবারে হৈ-চৈ পড়ে গেল। দলে দলে পাড়াপড়শী আস্তে লাগলো খুকুর নাতি-নাতনীকে দেখতে।

তাদের ত' আর শুধু মুখে বিদেয় করা চলে না! খুকু অনেক করে ঠাকুমাকে ভজিয়ে পাঁচটি টাকা আদায় করে নিল। আর তাই দিয়ে মিষ্টিমুখ করাতে হ'ল—জনে জনে।

খুকুর খেলার সাথীরা এসে রোজ সন্ধ্যেবেলা ফিরে যায়।

খুকু গিন্নি-বান্নির মতো উত্তর দেয়, আমার কি আর মরবার ফুরসৎ আছে? সংসারের ঝামেলায় একেবারে জড়িয়ে পড়েছি।

ঠাকুমাও একদিন খুশী হয়ে খুকুর নাতি-নাতনীর দৌলতে বাড়ীর সবাইকে পোলাও-মাংস খাইয়ে দিলেন।

কিন্তু এত আনন্দ বুঝি বাড়ীটির ভাগ্যে সইল না।

কুকুরটিকে কি যে কাল-রোগে ধরল! একদিন দস্তিরাণী ছ'টা ছানাকে অনাথ করে সবার অজানতে মারা গেল।

গোটা বাড়ীতে যেন কালো ছায়া নেমে এলো। কেউ খায় না, দায় না,—কথাটি পর্য্যন্ত কয় না!

খুকুর মুখের দিকে যেন আর তাকানো যায় না। এই ছ'টি বাচ্চাকে কি করে বাঁচানো যাবে—সেই হ'ল এক মস্ত বড় ভাবনা। খুকু ভাবে—আর তার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। খুকু দস্তিরাণীর খালি ঘরটার দিকে চোখ মেলে তাকাতে পর্য্যন্ত পারে না।

এরই মধ্যে একদিন খুকু আপন মনে বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা ব্যাপার দেখে একেবারে থম্কে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অজারাণী চলে এসেছে—দস্তিরাণীর ফেলে-যাওয়া ঘরে। সেইখানে সে দস্তিরাণীর বাচ্চাদের মধ্যে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে, আর দস্তিরাণীর বাচ্চারা মহা আনন্দে অজারাণীর বাঁট টেনে টেনে দুধ খাচ্ছে।

এই দৃশ্যটি দেখে আমাদের খুকু আর চোখ ফেরাতে পারে না।

সারা জীবন ওরা পরস্পরকে আপনার করে নিতে পারল না! আজ দস্তিরাণীর অভাবে অজারাণী কুকুরের বাচ্চাদের দুধ-মা হয়ে বসে আছে!

খুকুর দেখে দেখে আর আশ মেটে না। আজ তার সকল ভাবনার শেষ হ'ল।

আজ খুকু নিশ্চিন্ত মনে দুই চোখের পাতা এক করতে পারবে।

এর আগে যা বেরিয়েছে :—

আমাদের গৃহদেবতা পঞ্চানন্দ দেব খুব প্রাচীন ও জাগ্রত মূর্ত্তি। কিন্তু মূর্ত্তি বলতে যা বোঝায় এ ঠিক তা নয়—একটি শিলাখণ্ডের ওপর দু'খানি ভাঙ্গা পা, খুব কারুকার্য্যমণ্ডিত। হঠাৎ এক ভবঘুরে লোক আমাদের বাড়ীতে এল অতিথি হয়ে। নাম বললে পরশুরাম শাস্ত্রবাচস্পতি, বাড়ী বললে নবদ্বীপ। মূর্ত্তিটি সম্বন্ধে তার খুব আগ্রহ দেখা গেল এবং সে চলে যাবার পরই মূর্ত্তিটি উধাও হ'ল। অমঙ্গল-চিহ্ন ভেবে গ্রামের সবাই ভয় পেয়ে গেল। আমি পরশুরামের খোঁজে বেরিয়ে রাণাঘাট হয়ে নবদ্বীপ এলাম। সেখানে ঐ নামে একজন লোকের কথা শুনলাম বটে, কিন্তু তিনি ওখানে থাকেন না। তা ছাড়া তিনি নাকি একজন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত,—প্রায়ই ইয়োরোপ-আমেরিকায় ঘোরেন। বুঝলাম আমি যাকে খুঁজছি ইনি তিনি ন'ন।

এর পর আফিস-সংক্রান্ত এক পার্টিতে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হ'ল বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ রামশাস্ত্রীর সঙ্গে। কিন্তু ইনিই যে সেই পরশুরাম তা বুঝতে আমার ভুল হ'ল না। অনেক কষ্টে, অনেক বাধা এড়িয়ে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখা করলাম। ডাঃ রামশাস্ত্রী আমাকে প্রাচীন বাংলার একটা ঐতিহাসিক কাহিনী শোনালেন। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের আমলের কথা। তাঁরই ভগ্নীপতি গ্রহবর্মার ভাইপো অনন্তবর্মা এক কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে সেটা নিয়ে গৌড়ে পালিয়ে আসেন। গৌড়ে বিপ্লব দেখা দিলে তাঁর নাতি সোমদেবের কাছ থেকে মূর্ত্তিটি চুরি যায়। সোমদেবের নাতি গোবিন্দদেব স্বপ্নাদেশ পেয়ে সাগরদীঘির জল থেকে তার একটা টুকরো—ওপরের অংশ উদ্ধার করেন; পায়ের দিক্‌টা আর পাওয়া যায় না। এর কয়েক শ' বছর পরে নানা ঘটনার পর তাঁরই এক বংশধর রঘুদেব শিরোমণি ফুলিয়ায় সেই বিগ্রহ নিয়ে আসেন এবং এর বিচিত্র কাহিনী একখানি পুঁথিতে লিপিবদ্ধ করেন। রঘুদেবের ছেলে আবার ফুলিয়া ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। প্রায় ৮০০ বছর পরে তাঁরই এক বংশধর সেই পুঁথি থেকে গোপালমূর্ত্তির এই আশ্চর্য্য কাহিনী জানতে পারলেন। তখন তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল—সেই ভাঙ্গা মূর্ত্তির বাকী অংশ—নিম্নাংশ কোথায় গেল? তাই নিয়ে আগ্রহ জাগা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক নয় কি?

আমার বুঝতে কষ্ট হ'ল না,—এই ডাঃ রামশাস্ত্রীই তা হলে সেই অনন্তবর্মার বর্তমান বংশধর। কথা কিন্তু তখনও শেষ হ'ল না। তার পর···

৯

মোহাবিষ্ট কিংবা হিপ্‌নোটাইজ্‌ড্‌—এ কথাটা বহুবার শুনেছি। বাড়ী ফিরে এসে সমস্ত কথাগুলো আগাগোড়া মনের মধ্যে তোলাপাড়া করে আমারও মনে হতে লাগলো আমিও কি হিপ্‌নোটাইজ্‌ড্‌ হয়ে গেলাম? রামশাস্ত্রী বা পরশুরাম শাস্ত্রবাচস্পতির কাছে সে দিনও যাওয়ার আগে আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম যে পঞ্চানন্দ দেবের বিগ্রহ চুরির জন্য তিনিই যে অপরাধী—এ কথাটা সোজাসুজি ভাবেই বলবো। কিন্তু কিছুই বলা হোল না, উপরন্তু একটা গল্প শুনে আসতে হোল। আজগুবি গল্প কিনা তাই বা কে বলতে পারে? সত্যই কি উনি তেরোশো বছর আগেকার সেই অনন্তবর্ম্মার বংশধর? কি জানি, হয়তো হতে পারে। তাঁর নিজের বংশবিবরণী আমার চেয়ে তিনিই ভাল করে জানেন। তবে তাঁর কাহিনী শুনতে শুনতে আমি যে আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলাম তাতে আর ভুল নেই। মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে এই আশ্চর্য্য লোকটির মধ্যে।

কয়েকটি কথা আমার মনের মধ্যে তোলাপড়া করতে লাগলো। গোপালদেবের যে মূর্ত্তি অতীত কালে একদিন সাগরদীঘির জলের তলা থেকে পাওয়া গিয়েছিল, সেই

তিনি হেসে বললেন,—এই ঘটনা উপলক্ষ্য করেই তো তোমার সঙ্গে পরিচয় হোল হে ! তা নইলে—

বাধা দিয়ে বললাম,—সেটা তো বড় কথা নয়। কিন্তু—

তিনিও বাধা দিয়ে বললেন,—সে কি হে ! বড় কথা নয় ? সেইটাই তো হোল মস্ত বড় কথা। তোমার সঙ্গে পরিচয় হোল, ঘনিষ্ঠতা হোল, এটা তোমার পক্ষে বড় কথা না হতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে নেহাৎ ছোট কথা নয়।—বলেই হেসে উঠলেন।

এটা রসিকতা করে বললেন কিনা বুঝলাম না। অনেক সময়ই তাঁর কথার মধ্যে থাকে প্রহেলিকা। বিশ্ববিখ্যাত মনীষী ডক্টর রামশাস্ত্রী আমার মত নগণ্য ব্যক্তিকে বলছেন আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়া তাঁর পক্ষে নেহাৎ ছোট কথা নয়—এটা ঠাট্টা ছাড়া আর কি হতে পারে ? যাই হোক, তা নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই।

তাঁকে সে কথা বললাম সোজা ভাবে। আবার বললাম, আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু পেলাম না। আপনি যে মূর্ত্তির নিম্নাংশ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তার সঙ্গে কি পঞ্চানন্দ বিগ্রহের ঠিক মিললো না ?

তিনি উঠলেন। সামনের একটা বড় আলমারি খুলে বার করলেন বড় একখানা খাম। তার ভেতর থেকে বেরুলো চার-পাঁচখানা বড় সাইজের ফটোগ্রাফ।

পঞ্চানন্দ বিগ্রহের ছায়াচিত্র,—নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন দিক্ থেকে।

তিনি বললেন, পঞ্চানন্দ দেবকে আমি এনেছিলাম নিজের গবেষণার জন্য। তোমাদের মনে বা ধর্ম্মে আঘাত দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ছবিগুলো তুলে নেওয়ায় আমার কাজ মিটে গেল, কাজেই তোমাদের ঠাকুর আবার ফিরে গেলেন যথাস্থানে।

বললাম, গবেষণায় কি পেলেন ? ইনিই কি অনন্তবর্ম্মার গোপালমূর্ত্তির চরণ ত্বটি ?

তিনি বললেন, বলছি তোমাকে। মনে আছে, পঞ্চানন্দ দেবের বেদীতে বসে আমি প্রস্তাব করেছিলাম নীচের সিঁদূর-চন্দনের প্রলেপ ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলবো ?

মনে আছে।

একটা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস চেয়েছিলাম ?

তাও মনে আছে।

দেরাজ থেকে একটা বড় আকারের ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, তিন নম্বর ছবিখানার নীচের দিক্টা দেখো ভাল করে।

দেখলাম। একটা লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে বটে ! পঞ্চানন্দ দেবের আসল শিলাখণ্ডে

এটা আমরা এতদিন কেউ লক্ষ্য করি নি কি ভাষায় খোদিত লিপি সেটা পড়া সম্ভব হোল না আমার। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভাষা এটা ? কি লেখা রয়েছে ?

তিনি বললেন, মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সময়ের অক্ষর। তাঁর সময়ের অক্ষর, এমন কি মহারাজের স্বাক্ষরের প্রতিলিপি আজ অনেক স্কুলপাঠ্য ইতিহাসেও দেখতে পাবে। এতে যা লেখা আছে তার অক্ষরগুলো পড়া যায় না। তবু, যতটুকু পাঠ উদ্ধার করতে পেরেছি, সেটা বাংলা অক্ষরে ছবিখানার উলটো পিঠে দেখতে পাবে।

ছবিখানা উলটে দেখলাম। লেখা রয়েছে : অনন্তবর্ম্মা শ্রীপদ……(খানিকটা লেখা পড়া যায় না) ভগবান্ বিষ্ণো (আবার খানিকটা পড়া যায় না) অশীতি (ত্বু'-একটা অক্ষর ত্বর্ব্বোধ্য) হর্ষাব্দা।

তিনি বললেন, তোমাদের পঞ্চানন্দ দেবই যে তেরোশো বছর আগেকার প্রতিষ্ঠিত অনন্তবর্ম্মার বিষ্ণুমূর্ত্তির নীচের অংশ, তাতে আর সন্দেহ করবার কিছু নেই। 'আশীতি' কথাটার পরে কি লেখা ছিল ঠিক পড়া না গেলেও অশীতি হর্ষাব্দা বলতে মোটামুটি বোঝায় ৬৮৬ খৃষ্টাব্দ।

ঘণ্টার বোতাম টিপলেন তিনি। আবার সেই ব্যক্তিটির আবির্ভাব হোল চা এবং কচুরি নিয়ে। তিনি বললেন, চা খেয়ে নাও, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। (ক্রমশঃ)

নববরষে

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

নবপ্রভাতের সোনা রোদ যায়
আঙিনায় গড়াগড়ি,
সোনামণি সব সারি বেঁধে পথে
চলে হাত ধরাধরি।
জেগেছে জোয়ার হাজার পরাণে,
ভরেছে পবন জাগরণী গানে,
ভুবন, ভবন রামধনু রঙে
যাবে কি রে আজ ভরি ?
মানস-সায়রে উঠুক ফুটিয়া
মিলনের শতদল ;

শত ব্যথিতের বেদনার নীর
প্রীতির পরশে হউক শিশির,
নয়নে সোর স্বপ্ন নামুক, বেপথু বক্ষে বল।
উদয়ের পথে ডাক দিয়ে গেছে আজ
শতভিষা তারা,
আলোর জীবন আনিবি কে ভাই,
সন্ধান দিবি কারা ?
সর্বহারারে কে দিবি রে কোল,
আশাহত পাবে আশ্বাস বোল,
স্বাধীন ভারতে বহাবি কে ভাই, নবজীবনের ধারা ?

তুষারতীর্থ শ্রীকৈলাস

তীর্থঙ্কর

কৈলাস ও মানস সরোবরের উদ্দেশে চলতে চলতে ভারতের শেষ সীমান্ত গাব্বিয়াংএ এসে পৌঁছলাম।

গার্ব্বিয়াং একটি গণ্ডগ্রাম। এখানকার লোকদের বলে "গার্ব্বিয়াল"। এর দু'দিক্ দিয়ে দু'টী নদীর ধারা এসে মিলিত হয়ে যে বেণী রচনা করেছে তা দেখবার মতই। একটি নদীর নাম কালী, আর অন্যটির নাম কুটি। একটির জল কালো, অন্যটীর জল দুধের মত সাদা। দু'টী ধর্ম্মশালা আছে পরিত্যক্ত অবস্থায়। তাই এখানকার অধিবাসী কিচ্‌খাম্পা চেষ্টায় আছেন এখানে একটি ভাল ধর্ম্মশালা গড়ে তুলতে। জায়গাটী কিন্তু বড় নোংরা! একটু বৃষ্টি হলেই পথ এমন পিছল হয় যে তখন যাতায়াত করাই দুষ্কর হয়ে পড়ে। প্রায় ২০০ ভোটিয়ার ঘরবাড়ী থাকলেও স্বভাবে তারাও বেশ নোংরা। আমাদের গাইড কিচ্‌খাম্পাও সপরিবারে এখানেই বাস করেন। কালী নদীর ওপর ছোট্ট একটি কাঠের পুল চোখে পড়ল, নাম তার সীতা পুল। এই পুল পার হয়ে নেপালের দিকে যাবার পথে প্রথমেই পড়ে নেপালী পুলিশ চৌকি এটী নদীর বাঁ-দিকে। ডানদিকে পড়ে সাংতুমা পুল। এই পুল পার হয়ে কালাপানির দিকে যাওয়া যায়।

চিরতুষারাবৃত লিপুলেক পাস

এখানে এসে আমরা কিচ্‌খাম্পার গৃহেই আতিথ্য নিলাম। প্রচুর আদর-যত্ন আর দু'দিনের বিশ্রামেই শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠল।

আগে একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেছে। যেমন আমাদের আগে একদল যাত্রী আসছিলেন, তেমনি আমাদের পিছনেও আরও দুটী দল আসছিলেন। আমাদের আগের দলটীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল আলমোড়ায়, পিছনের দলের একটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল এখানে থাকতে থাকতেই। এই দলে আমার সঙ্গীর এক পরিচিত বন্ধু ছিলেন।

একসঙ্গে আমরা দুই দল সকাল বেলায় রওনা হলাম কালাপানির উদ্দেশে। মোট দূরত্ব ১১ মাইল।

সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথ ধরে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছি আমরা দুই দল যাত্রী। এবারে আমাদের গাইড কিচ্‌খাম্পার ভাইপো আর জামাই। পিছনে আছে কুলীর দল। বেলা ৩টে নাগাদ সবাই এসে পৌঁছলাম কালাপানিতে। পথে চোখে পড়লো গাছপালা সব আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। আশেপাশে মাঠ আর পাহাড়ের শৃঙ্গ। পথ থেকে কিছুটা দূরে একটী গরম জলের উৎস। বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে তার ধারা। ছোট্ট পার্ব্বত্য নদীর আকার ধারণ করে এগিয়ে এসেছে সেই ধারা কালী নদীর সঙ্গে মিলতে। কালী নদীর ওপর একটা কাঠের পুল আছে। পুলটীর নাম পাঞ্চাগড় পুল। আমরা সকলে পুল পার হয়ে চেক্ পোষ্টের তাঁবুর কাছে মাঠের মাঝখানে আমাদের রাত্রিবাসের জন্য তাঁবু ফেললাম। এর পর রান্না-খাওয়ার আয়োজন চললো। এমন প্রচণ্ড শীত এখানে—দেখে মনে হতে লাগলো এই বুঝি সেই গল্পের হিমালয়ী শীত! তলায় কম্বল, ওপরে কম্বল নিয়েও যেন রক্ষা পাওয়া যায় না। কম্বলও সাধারণ কম্বল নয়, বেশ খানিকটা পুরু। এর নাম চুটকা।

লিপুলেক পাসের ওপর আমরা

এখানে এসে চেক পোষ্টে আমাদের নাম লেখাতে হয়েছিল। কর্ম্মচারীদের সদয় ও ভদ্র ব্যবহার ভোলবার নয়।

পরদিন সকালে আবার আমরা কালী নদীর উপর আর একটি পুল, নাম তার বিরথাগড়, পার হয়ে চললাম শাঙচামের উদ্দেশে। পুল পার হতে বাঁ দিকে গারফুগড়ের

ভগ্নাবশেষ চোখে পড়লো। আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে কির্ম্মোকণ্ডয়ের বিশাল চড়াই। চড়াই পার হয়ে ঝুন্নগড়। তারপর তল্লাতরার ধর্ম্মশালা দু'টীর ভগ্নাবশেষ দেখে চোখে জল এলো। আবার পড়লো চড়াই, মাল্লাতরার। এই ভাবে যখন আমরা এগিয়ে চলেছি তখন পিছন থেকে হঠাৎ আমাদের সঙ্গে এসে মিললো কিচ্‌খাম্পা, সঙ্গে আর একদল যাত্রী। কিচ্‌খাম্পাকে দেখে আমরা চমকে উঠলাম কারণ পথে অনেকেই বলেছিলেন কিচ্‌খাম্পা হয়ত আর আসতে পারবে না। আমি কিন্তু মনে মনে চাইছিলাম তার সঙ্গ। বেলা ৩টে নাগাদ আমরা সকলে পৌঁছে গেলাম শাণ্ডচামে। খানিকটা খালি জায়গায় আমাদের তাঁবু ফেলা হ'ল। এখানে ভয়ানক শীত আর বরফের ছড়াছড়ি।

রাতে খাওয়াদাওয়া করে কখন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। মাঝ রাত্রে একটা সোরগোল শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে পড়লাম। গাইড ও কুলীরা ডাকাডাকি করছে। রাত থাকৃতে থাকৃতে বেরিয়ে না পড়লে লিপুলেক পাস অতিক্রম করা অসম্ভব হবে। বরফ কঠিন থাকতে থাকতে তা অতিক্রম করা যতটা সহজ, সূর্য্যের উত্তাপে বরফ গলতে শুরু করলে ততটা সহজ নয়। বরং অসম্ভবই বলা চলে। তাই এই যাবার তাড়াহুড়ো।

আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাত সাড়ে ৩টে নাগাদ আমরা শাণ্ডচাম পার হয়ে লিপুলেক পাসের প্রান্তে এসে উপস্থিত হ'লাম। বরফের উপর রাত্রির আকাশের তারার আলো পড়ে এক সম্পূর্ণ উজ্জ্বলতার শ্রী সৃষ্টি করেছিল। সাদা বরফ যেন আরো সাদা দেখাচ্ছিল। প্রথমেই আমরা যে চড়াইয়ের সম্মুখীন হলাম—তাই পার হতে গিয়েই যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিলো। পাস অর্থাৎ গিরিবর্ত্ম—প্রসার মোটে আঠার ফুট; কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ বরফ-ঢাকা পথটুকু পার হতে যাত্রীদের প্রাণ বেরিয়ে যায়। হাতে লাঠি থাকা সত্বেও গাইডের সাহায্য ব্যতিরেকে পথ চলা যায় না। উৎরাইএর বেলায় আরও বিপদ। প্রতি পদে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সবাই আমরা গাইডের সাহায্যে অতি কষ্টে একটা চরাই-উৎরাই শেষ করেছি, আর পূর্ব্বাকাশে ভোরের আলো দেখা দিল। সেই আলোয় দেখতে পেলাম দূরে মান্ধাতা পাহাড়ের চূড়া। অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য! পথের কষ্ট নিমেষে যেন ধুয়ে মুছে গেল।

উৎরাইয়ের সময় কষ্ট যেন আরও বেশী। পাহাড়ের গা সোজা নেমে গেছে অনেকখানি। তার উপর বরফের চাদর। সুতরাং হাজার লাঠি থাকলেও গাইডের সাহায্য ছাড়া নামা যায় না। গাইডরা আমাদের দু'-এক জন সঙ্গীকে বল্‌ল গায়ের বর্ষাতি খুলে তার ওপর পা ছড়িয়ে দিয়ে বসতে। সেই অবস্থায় বর্ষাতির এক প্রান্ত ধরে তারা

ওদেরকে হিড় হিড় করে টেনে নামিয়ে নিল। এর পর আবার সুরু হ'ল চড়াই। চড়াইয়ের পর আবার উৎরাই। উৎরাই শেষ হতে সূর্য্য উঠে পড়লো,—রৌদ্র এসে পড়ল বরফের গায়ে। আমরা এসে পৌঁছলাম পালাতে।

বলা বাহুল্য এখন আমরা ভারত সীমান্ত ছাড়িয়ে তিব্বতের মধ্যে এসে গেছি। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সকলেই ক্লান্ত, তার উপর আবার রাত্রে ভালু ঘুম হয় নি—তাই সকলেই মনে মনে বিশ্রাম চাইছিলাম। স্থির হ'ল পালাতেই আজ রাত কাটান যাবে। প্রায় এক মাইল দূরে চেক পোষ্টের একটা পরিত্যক্ত ছাউনি চোখে পড়লো। সেখানেই আমরা আশ্রয় নিলাম।

পরদিন সকালে আবার সুরু হ'ল চলা। এবার আমাদের পথ তিব্বতের মালভূমির ওপর গ্রামের ভিতর দিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেছে। এখানে চড়াই উৎরাই আর বিশেষ নেই, এবং কূর্ম্মপৃষ্ঠের মতই মালভূমির আকার। জল ও ঘাস খুব কমই দেখা যায়। মস্ত বড় দলটী চলেছে তো চলেইছে—মরুযাত্রীদের মতই। বেলা দুপুর নাগাদ খানিকটা দূর থেকে সোজা দৃষ্টির সামনে ঝলমলিয়ে উঠলো একটি তিব্বতী গ্রামের দৃশ্য। জিজ্ঞাসা করতে, গাইডরা বল্‌ল ওরই নাম তাকলাকোট। আমাদের সামনে কিছুটা দূরে যাচ্ছিল আর একদল যাত্রী,—তাদেরও বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলাম। প্রায় সকলেই এক সময়ে গিয়ে তাকলাকোটে পৌঁছলাম। আমাদের আগের দলটী সোজা গিয়ে তাকলাকোটের মণ্ডীতে আশ্রয় নিল। মণ্ডী শব্দের অর্থ বাজার। এখানে গ্রামের বেচা-কেনা হয়। গাইডদের পরামর্শ মত আমরা গিয়ে তাঁবু ফেললাম নদীর ধারে। নদীটীর নাম কর্ণালি। বড় চমৎকার তার দৃশ্য। মালপত্র নামিয়ে দিয়ে আমাদের কুলীরা এখন বিদায় চাইলো। তাদের চুক্তি শেষ হয়ে গেছে। এখন তারা ফিরে যাবে গর্ব্বিয়াংয়ে। এখানেই আমরা প্রথম দেখলাম চীনা ডলার—আমাদের টাকার চেয়েও বড় ও ভারী।

জানালা দিয়ে দেখে তিন হাত পিছু হটে এসে বলে, "রাম রাম, সব মর গিয়া!" আর একটি কুলি গাড়ীর মধ্যে যাবার জন্য যেমন গাড়ীটি ছুঁয়েছে, অমনি টলে পড়ে গেল।

খবর শুনে ষ্টেশন মাষ্টার ছুটে এলেন। ডাক দিলেন দমকলকে। ঢং ঢং শব্দ করে দমকল এল। রেলের এঞ্জীনিয়ারও ছুটে এলেন। তাঁরা দেখে-শুনে রায় দিলেন, বিদ্যুতের শক্ লেগে বিদ্যুৎচালিত রেলগাড়ীর যাত্রীরা সব মরে গেছে।

খোকন ঠুকলো দেশমুখকে; বললে, "এর নাম তোমার ইলেকট্রিক ট্রেন? প্রণাম করি বাবা, দূর থেকে। বেঁচে থাক আমাদের পুরোনো ষ্টীম এঞ্জিন। ওতে মাঝে মাঝে দু'-একটা দুর্ঘটনা হয় বটে, কিন্তু এ রকম পাইকারী ভাবে যাত্রীরা মরে না।"

রেলের কর্ম্মচারীরা দমকলের লোকদের সঙ্গে বলাবলি করছেন: "গার্ডও মারা গেছে, ড্রাইভারও মারা গেছে, তবে গাড়ীকে চালিয়ে আনলে কে? গাড়ী থামলই বা কেন?"

এই সময় ইলেকট্রিক ট্রেনটা হঠাৎ নড়েচড়ে উঠল এবং কেউ কিছু বুঝবার আগেই পেছন দিকে চলতে আরম্ভ করল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই ইলেকট্রিক ট্রেনে প্রচণ্ড গতিবেগ আনা যায়, তাই দেখতে দেখতে ট্রেনটা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

হিন্দুস্থানী কুলিরা ভয়ে কাঁপে আর রাম নাম নেয়। খোকন দেশমুখকে বলে, "ওতো ইলেকট্রিক ট্রেন নয়, ও হ'ল ভূতুড়ে ট্রেন। এবার চল বাড়ী। ঢের হয়েছে বাবা! নিশ্চয়ই যাত্রীরা মরে ভূত হয়ে গাড়ীটা চালাচ্ছে।"

পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি খবরের কাগজ খোলে খোকন। বড় বড় অক্ষরে ভূতুড়ে রেলগাড়ীর কথা উঠেছে। স্কুলে ছাত্রদের মুখেও সেই এক কথা। খোকন বলে, "আমি আগেই জানতুম এ রকম কিছু একটা হবেই। সুইচ টিপে আলো জ্বালাতে আর ফ্যান চালাতেই তো আমরা মাঝে মাঝে শক্ খাই, আর এ তো গোটা একটা বিদ্যুতের এঞ্জিন!" দেশমুখ ভয়ে ভয়ে বলে, "আমাদের বোম্বেতে কিন্তু এ রকম হয় নি।" চেঁচিয়ে খোকন উত্তর দেয়, "আরে রেখে দাও তোমার বোম্বে। মনে রেখো এটা কলকাতা, হুঁ।"

মিষ্টার মেহ্‌টা ওদের ক্লাস টিচার,— কোন্নগর থেকে রোজ পড়াতে আসেন। আজ তিনি তিন ঘণ্টা দেরীতে স্কুলে এসে বললেন, "প্রতিদিনের মতই আসছিলাম। রোজ দেখি লিলুয়ার কাছে ৮৮৮ নম্বর আপ্ ট্রেনটা আমাদের পাশ দিয়ে চলে যায়। আজও যাচ্ছিল দেখলাম। হঠাৎ দেখি ওর বিপরীত দিক্ দিয়ে আসছে বাতাসের বেগে আর একটা ট্রেন। চেহারা দেখেই বুঝলাম, ওটা ইলেকট্রিক ট্রেন। গায়ে লেখা আছে ১২৩৪ নং ডাউন। সে ছুটে এসে মারল ধাক্কা আপ্ ট্রেনটাকে। আশ্চর্য্য ব্যাপার! 'আপ্ ট্রেন তো ভেঙ্গে চুরমার। কিন্তু ঐ ইলেকট্রিক ট্রেনের কিছুই হ'ল না। ঝড়ের বেগে

ভাঙা আপ্ রেলগাড়ীটার ওপর দিয়েই চলে গেল। কত লোক যে মরল কি বলব! কিন্তু আরও আশ্চর্য্য এই, যে, ঐ ইলেকট্রিক ট্রেনে কোন যাত্রী দেখলাম না। শেষে হাওড়ায় এসে ভূতুড়ে ট্রেনের কথা শুনলাম। ভগবান্, কালে কালে কতই দেখব-শুনব!"

এর পর ভূতুড়ে ট্রেনের হাতে ক্রমাগত পুরোনো ট্রেনগুলি মারা পড়তে লাগল হাওড়া ষ্টেশনের আশেপাশে। ফলে, হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেন আসা ও ছাড়া বন্ধ হয়ে গেল। দূর পাল্লার ট্রেনগুলি খড়্গপুর, বর্দ্ধমান আর ব্যাণ্ডেল পর্য্যন্ত আসে এবং সেখান থেকেই ফের ফিরে যায়।

সারা দেশে হৈ-চৈ পড়ে গেল। যে, ভূতের কথা কেউ বিশ্বাস করত না সেই ভূত যে আছে তা প্রমাণ হয়ে গেল। খোকন বুক ফুলিয়ে বলে, "তবে দেখছো, এই কলকাতাই প্রমাণ করল যে ভূত আছে। আর সেই কলকাতারই ছেলে আমি।"

বন্ধুরাও মেনে নিল হ্যাঁ, কলকাতা এক আজব সহরই বটে।

কিন্তু অসীম সাহস ছেলেদের। পরের রবিবার সকালে হকি-ম্যাচের দোহাই দিয়ে ওরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে ভূতুড়ে ট্রেন দেখবে বলে। হাতে হকি-ষ্টিক, কোমরে জলের বোতল, পিঠে বাঁধা টিফিন। ওদের দলপতি হয়েছে খোকন।

হাওড়ায় এসে লাইন বরাবর হাঁটে। ভূতের ভয়ে আশেপাশে লোকজন নেই। সব পালিয়েছে ঘরবাড়ী ছেড়ে।

এক ঘণ্টা হাঁটার পর দূর থেকে শাঁখ বাজার শব্দ ভেসে আসে। থমকে দাঁড়ায় ছেলেরা। পরক্ষণেই দেখা যায় ভূতুড়ে ইলেকট্রিক ট্রেনটা আসছে ঝড়ের মত ধূলোবালি উড়িয়ে।

পাথরের মূর্ত্তির মত খোকনরা দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু এ কি, ভূতুড়ে ট্রেনটা হঠাৎ ঝপ্ করে ওদের সামনে থেমে গেল কেন? গাড়ীতে তো একটিও লোক নেই! সকলেরই বুক দুর দুর করছে—কিন্তু মুখে সকলেই সাহস টেনে আনল।

হঠাৎ গাড়ীর জানালা দিয়ে একটা কালো বোর্ড বেরিয়ে এল। ওর মধ্যে চক্ দিয়ে বড় বড় করে লেখা—"তোমরা কে? ভয়-ডর নেই?"

ফিস্ ফিস্ করে মাথুর খোকনকে বলল, "এখন কিন্তু ব'ল না যে তুমি কলকাতার ছেলে।" খোকন বুক ফুলিয়ে উত্তর দিল, "আমরা নতুন ভারতের নতুন ছেলের দল। ভয় করি দেশের আইনকে। ভয় করি গুরুজনকে। ভয় করি শিক্ষককে। আর কাউকে না।"

কালো বোর্ডটি নেমে গেল মুহূর্ত্তেই পাঁচটি জানালা দিয়ে আবার পাঁচটি বোর্ড পর পর বেরিয়ে এল। বোর্ডে লেখা— "তোমরা ইলেকট্রিক ট্রেন চালু করেছ যাত্রীদের শিক্ষা

না দিয়েই। তাই তো কত লোক মরল! প্রথম নম্বর শিক্ষা হচ্ছে যে বৈদ্যুতিক ট্রেনের কামরা থেকে কখনো বাইরে ঝুঁকবে না। কারণ এর কামরাগুলি, দশ ফুট আট ইঞ্চির পুরোনো কামরার বদলে, বারো ফুট চওড়া। ফলে, বাইরে ঝুঁকলে বা হাত বাড়ালে রেল-লাইনের পাশে যে সব লোহার স্তম্ভ আছে, তার ধাক্কায় আহত হতে পার। ঐ সব স্তম্ভগুলি মাত্র পনেরো ইঞ্চি দূরেই থাকে। দু' নম্বর শিক্ষা হচ্ছে যে বৈদ্যুতিক ট্রেন আসবার সময় প্ল্যাটফর্মের ধার ঘেঁষে দাঁড়াবে না কখনো। তিন নম্বর শিক্ষা হ'ল এই যে বৈদ্যুতিক ট্রেন একবার ছাড়লে উঠতে যেও না বা নামবার চেষ্টা ক'রো না। কারণ, এই ট্রেন চোখের পলকে প্রচণ্ড গতিশক্তি লাভ করে। ঐ কারণেই তাড়াতাড়ি নামা-ওঠার জন্য কেবল হাল্‌কা মাল নিয়েই চলবে। চার নম্বর শিক্ষা —বৈদ্যুতিক ট্রেন আসতে দেখলে লাইন পার হবে না। কারণ, কখনও বেশী শব্দ এ ট্রেনে হয় না এবং এর গতি এত দ্রুত যে লাইন পার হবার আগেই তোমাকে ধরে ফেলবে। তার পর শেষ বোর্ডে এই গাড়ী সম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞাতব্য কথা লেখা। এই গাড়ীকে রেলের ভাষায় বলা হয় বৈদ্যুতিক মাল্‌টিপ্‌ল্‌ ইউনিট গাড়ী। এই গাড়ীতে তিন থেকে পাঁচটি কামরা থাকে। কামরার বাইরে পা-দানি বা হ্যাণ্ডেল কিছুই নেই। এই গাড়ীর এলার্ম-চেনও অন্য ধরণের। বাষ্পচালিত ট্রেনের এলার্ম-চেন টানলে গাড়ী সঙ্গে সঙ্গে থামে, কিন্তু এই গাড়ীর এলার্ম-চেন টানলে গাড়ী থামবে না, শুধু মাত্র গার্ড আর ড্রাইভারের কামরায় ঘণ্টা বাজবে।

বোর্ডগুলি নেমে গেল। খোকন বলে, "ধন্যবাদ। তোমার বাণী সবাইকে জানিয়ে দেব। তোমার কথা শুনলাম। এবার আমাদের একটা কথা রাখো। ভূতুড়ে ট্রেনের উপদ্রব থামাও।" সঙ্গে সঙ্গে অন্তরীক্ষ চিরে যেন শত শত লোকের হাসি শোনা গেল আর ধূলো উড়িয়ে ভূতুড়ে ট্রেন ফের ছুটল লাইন বরাবর।

ধূলো চোখে এসে পড়ে। দু' হাত দিয়ে চোখে কচলিয়ে চোখ খুলে খোকন যা দেখল, তা দেখে সে অবাক্! সে এখন হাসপাতালে। তার চারিদিকে ডাক্তার আর নার্স। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে নেহেরুজীর সভার পর হাওড়া ষ্টেশন থেকে য়্যাম্বুলেন্স করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। ভীড়ের চাপে সে ভীষণ আহত হয়েছিল। বিকারের ঘোরে এতক্ষণ সে ভূতুড়ে স্বপ্ন দেখছিল রেলগাড়ীর।

সুস্থ হয়ে খোকন স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের কাছে গল্প করে এই অদ্ভুত স্বপ্নের। তাদের ক্লাস-টিচার শ্রীমেহ্‌টা সব শুনে হেসে বলেন, 'পাগল! ইলেকট্রিক ট্রেনে উঠলে শক্ লেগে কেউ মরতে পারে? ট্রামও তো বিদ্যুতে চলে। ট্রামের যাত্রীদের কখনও বিদ্যুতের শক্ লেগেছে শুনছ? ইলেকট্রিক ট্রেন তো ঐ ট্রামেরই জাতভাই।"

পশ্চিম দিগন্তে

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

আমেদাবাদ।

বালিবহুল শুভ্রামতী (সবরমতী) নদীর তীরে ভারতের পশ্চিম প্রান্তের একটি নামকরা সহর। সহরের মাঝখান দিয়ে বহে গেছে শুভ্রামতী। নদীর উপর দিয়ে তিনটি সেতু এপার-ওপার যোগ করে দিয়েছে—গান্ধী ব্রিজ, প্যাটেল ব্রিজ ও এলিস্ ব্রিজ। আরো তিনটি পুল তৈরী হচ্ছে। সহর ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। এখন ২১ বর্গ মাইল জুড়ে ১১ লক্ষ লোকের বাস, কথা চলছে সহরটিকে আরও ২১ বর্গ মাইল বাড়াবার জন্য।

এই সহরটিকে ভারতবাসীর কাছে পরিচিত করেছে ৬৯টি কাপড়ের কল। এতোগুলি বড় বড় কাপড়ের কল আছে সত্যি, কিন্তু কলের ধোঁয়া এই সহরটির আকাশ কালো করে নি। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে সহর, নতুন নতুন বাড়ী, প্রশস্ত পথ, সুদৃশ্য পার্ক, সুন্দর হ্রদ সহরটিকে মনোরম করেছে। পুরানো নগরের পাশেই নতুন সহর গড়ে উঠছে। মিল-মালিকেরা অজস্র অর্থব্যয় করে চলেছেন সহরকে সুন্দর করার জন্য। বিখ্যাত ফরাসী স্থপতি কর্বুশিয়েরকে এনে এখানে বাড়ী তৈরী করা হয়েছে। এই বাড়ীগুলির মধ্যে বিশেষ দর্শনীয় হলো আটিরা—বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে গবেষণাগার। আমেদাবাদ বস্ত্রশিল্প গবেষণা সমিতি, ইংরাজীতে Ahmedabad Textile Industry Research Association এই কথাটির প্রতিটি শব্দের আদ্যাক্ষর ধরে নামকরণ হয়েছে ATIRA—আটিরা। অজস্র অর্থব্যয়ে তৈরী অপূর্ব প্রাসাদ।

'আটিরা'

ফটো—শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ফরাসী স্থপতির তৈরী আরো দুটি বাড়ী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো—যাদুঘর

ও মিল-মালিক সমিতি ভবন। কোটিপতি মিল-মালিকদের সমিতি-ভবন সুদৃশ্য হবেই, তাতে বিশেষত্ব কিছু নেই। তবে যাতুঘরটির বিশেষত্ব আছে। যাতুঘর দোতলা। নীচের তলাটি উন্মুক্ত, মোটর-গাড়ী রাখার জায়গা। উপর তলায় যাতুঘর। যাতুঘরের কোথাও কোন জানালা নেই। কিন্তু সব ঘরেরই দেয়ালের উপরের অংশটুকু খোলা, সেখান থেকে ঘরের সর্বত্রই সমভাবে আলোকিত। ফরাসী স্থপতির স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য এখানেই লক্ষ্যণীয়।

এই অঞ্চলেই আমেদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে যত কলেজ আর হোষ্টেল। কমার্স কলেজ, বি-টি কলেজ, আর্টস কলেজ, সায়েন্স ইনষ্টিটিউট, ফার্মাসি কলেজ, এন্‌জিনীয়ারিং কলেজ, আর সেই সব কলেজের সংলগ্ন অধ্যাপকদের আবাস ও ছাত্রাবাস এবং খেলার মাঠ। সবের কেন্দ্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সাদা পাথরের তৈরী বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের ঘড়ি-ঘরটি। এ যেন একটি শিক্ষানগরী। স্বাস্থ্যকর মনোরম পরিবেশ; সহরের কোলাহল থেকে দূরে, বিদ্যাসাধনার উপযুক্ত স্থান।

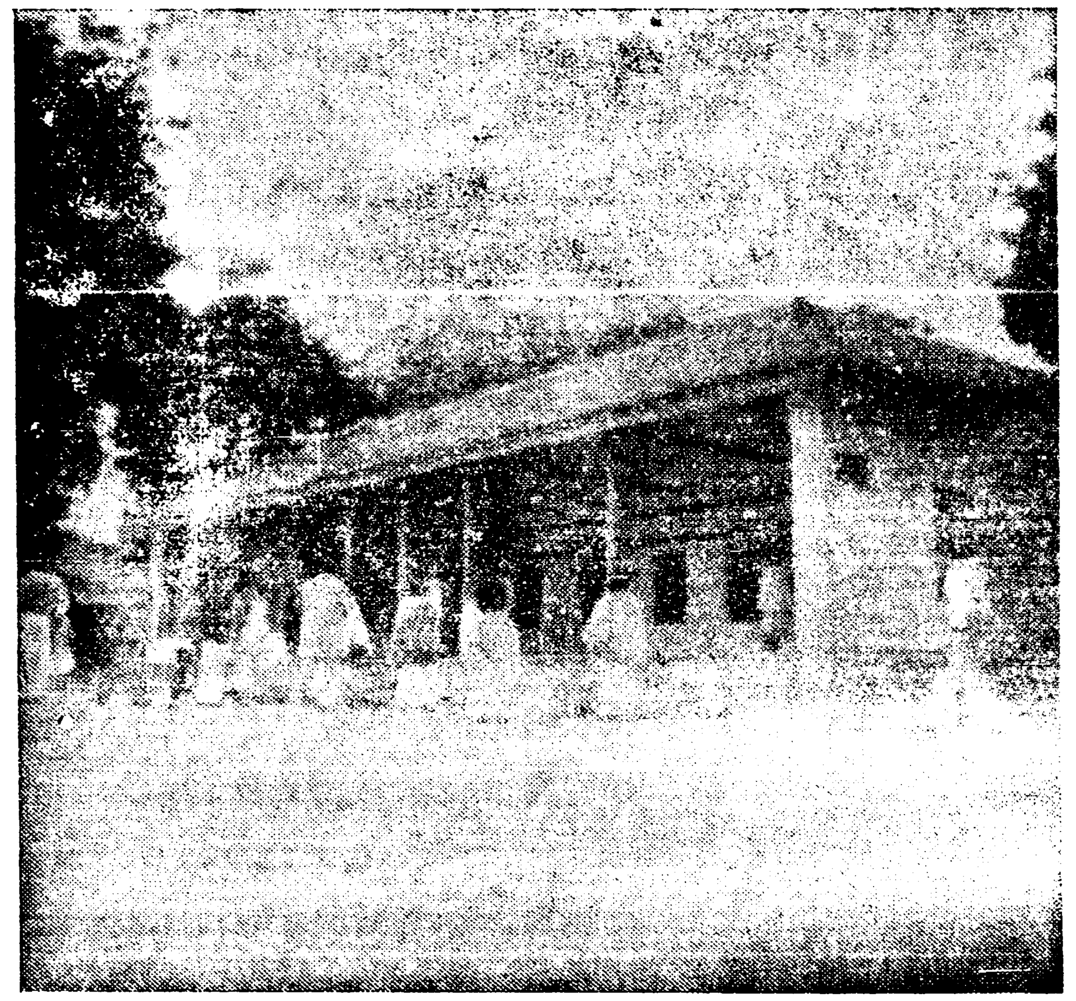
সবরমতী আশ্রমে গান্ধীজীর বাসগৃহ
ফটো—শ্রীভবেশ দাশগুপ্ত

ফেরার পথে পড়লো 'কোচ্‌বার আশ্রম'। সাধারণ পুরানো একখানি বাড়ী। মহাত্মাজী দক্ষিণ আফরিকা থেকে প্রথম যখন এদেশে আসেন তখন এই বাড়ীতেই থাকতেন। এখানে এখন গ্রামোদ্যোগ সংঘের কার্য্যালয়।

আমরা এসে নামলাম 'ভারত সেবাশ্রম সংঘে'। বড় রাস্তা থেকে একটু ভিতরে, একটী বাগানের পিছনে ছোট একখানি দোতলা বাড়ী। পথ থেকে বরাবর সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলে লোকে দোতলায় এসে পড়ে। তারপর নামতে হয় নীচের তলায়। নীচের

তলা পথের সমতা থেকে নীচে। দোতলায় বাঁ দিকের ঘরে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা আছে। পিছন দিকে বাগান। ছোটর উপর সুন্দর ছিম্‌ছাম আশ্রমটী। আশ্রমিক ছাড়াও এখানে জন পাঁচেক আগন্তুক থাকার মত স্থান আছে। আশ্রমিকেরা আমাদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করলেন। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তাঁরা যে ভাবে আমাদের সমাদর জানালেন তা সত্যই প্রশংসনীয়।

সেবাশ্রম থেকে গেলাম সবরমতী। শুভ্রামতী নদীর তীরে সবরমতী আশ্রম। তিন-চারখানি ঘর নিয়ে ছোট অনাড়ম্বর একখানি একতলা বাড়ী। এখানে গান্ধীজী থাকতেন। এই তু'-তিনখানি ঘর আর তার সংলগ্ন বারান্দাটুকু সার্দ্ধ দশক ভারতের বিপ্লবী মনীষার কেন্দ্র ছিল। এই বারান্দার একপাশে একটি চরকায় যে গুঞ্জরণ উঠতো তা আসমুদ্র হিমালয়ের প্রতি নরনারীর হৃদয়ে ঝংকৃত হতো। দেশ-বিদেশের কত জ্ঞানী ও গুণী, কত দাতা ও ত্যাগী, কত মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীর চরণস্পর্শে এই কুটীর পবিত্র। মহাত্মাজীর ঘরখানির মধ্যে ঢুকতে মন ছম্‌ছম্ করে ওঠে; মনে হয় যেন অনধিকার প্রবেশ করছি—এ গৃহের নীরবতা ভঙ্গ করার অধিকার আমার নেই।

ঘরের মধ্যে মহাত্মাজীর হাতে বোনা খদ্দরের একটি জামা রয়েছে। সাজানো রয়েছে কত জনের দেওয়া আন্তরিক শ্রদ্ধার অর্ঘ্য। সিল্কের উপর মহাত্মাজীর ছবি বুনে পাঠিয়েছেন চীনারা। জগতের কত প্রান্ত থেকে কত জন কত রকমের ঠিকানা লিখে চিঠি পাঠিয়েছেন। কেউ লিখেছেন—'হিজ্‌ একসেলেন্‌সি মহাত্মা গান্ধী' (His Excellency Mahatma Gandhi), আবার কেউ লিখেছেন—'গান্ধীজী, যেখানেই তিনি থাকুন' (Gandhiji wherever he lives)। সাজানো রয়েছে তাঁর হস্তাক্ষর, তাঁর হাতের তৈরী চরকা। এই সামান্য কয়েকটি কাঠের টুকরো বৃটিশ সামরিক বাহিনীর প্রচণ্ড দম্ভকে প্রতিরোধ করার শক্তি জুগিয়েছিল একদিন।

বাইরে একপাশে নদীর উপরেই খানিকটা বর্গাকার বালুকাময় স্থান। একপাশে একটি গাছ। এই গাছতলায় বসে গান্ধীজী প্রতি সন্ধ্যায় প্রার্থনা করতেন। দুস্থ, ক্লিষ্ট, দুর্নীতিমলিন জনগণের জন্য তিনি বিশ্বনিয়ন্তার চরণে আবেদন জানাতেন—হে করুণাময়, তুমি সকলের কল্যাণ কর, সকলকে সুমতি দাও, সংঘাত ও দুঃখ থেকে রক্ষা কর, তোমার সন্তানেরা যেন পরস্পরে হানাহানি না করে।

শুভ্রামতীর ওপার থেকে ভেসে আসে পশ্চিমে বাতাস, মাথার উপর গাছের পাতায় জাগে মর্ম্মর মুখরতা, তারই মাঝে যেন অস্ফুট গুঞ্জনে প্রতিধ্বনি ওঠে—

'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম,
সবকো সুমতি দে ভগবান্!'

পাশেই শুভ্রামতীর প্রশস্ত সান-বাঁধানো ঘাট। এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে প্রবহমানা বালুকাময় স্রোতস্বতী। মৃদু কলধ্বনিতে সুর জাগিয়ে যাচ্ছে—

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চল, একলা চল, একলা চল রে—'

মহাত্মাজী নিজের বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়েই সিদ্ধিলাভ করে গেছেন। চিরন্তনের শুভ্রামতী সেই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

সেই একদিন।—

১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ। সকাল সাড়ে ছ'টা।

একষট্টি বছরের বৃদ্ধ শুভ্রামতীর তীরে এসে দাঁড়ালেন। পরনে কটিবাস, হাতে একগাছি লাঠি। সঙ্গে উন-আশী জন আশ্রমিক অনুচর—ষোলো বছরের ছেলেও সেই দলে আছে। তাঁতি আছে, পিওন আছে, রঙ-কার আছে, সম্পাদক আছে, গোপালন-বিশেষজ্ঞ আছে, সংস্কৃত পণ্ডিত আছে। সব জাতির, সর্বশ্রেণীর সমন্বয় ঘটেছে।

সোনালী রোদ সামনের ধূসর পথকে উজ্জ্বল করে তুললো। চল্লিশ কোটি জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মহাত্মাজী দাণ্ডীর পথে অভিযান সুরু করলেন। বললেন, —লবণের শুল্ক যদি না তুলতে পারি, তা হলে আর আমি ফিরবো না, আমার দেহ সাগরের বুকে ভাসবে।

পিছনে চললো উন-আশী জন নির্ভীক সৈনিক। হাতে এক একগাছি লাঠি, কাঁধের থলিতে ঝুলছে নিত্য প্রয়োজনীয় দু'-একটি জিনিষ। তিন জন তিন জন করে এক একটি সারি। পরনে শুভ্র খদ্দরের উপর প্রভাতী সূর্য্যের অরুণালোক রক্তিম আভায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে, বিদ্রোহীদের উপক্রমণকালে জানাচ্ছে আশীর্বাদ। দৃঢ় তাদের পদক্ষেপ, চোখে আত্মবিশ্বাসের দীপ্তি। সেই দীপ্তির প্রতিফলনে উদ্ভাসিত হয়েছিল ভারতের অগণিত জনতা, শুভ্রামতীর দুই তীরে উঠেছিল জয়ধ্বনি—গান্ধীজী কি জয়!

স্বাধীনতার তীর্থযাত্রায় সেদিনকার সেই দুশো মাইল পথ—শুভ্রামতী থেকে দাণ্ডীর প্রাথমিক পদধ্বনি, জেগেছিল এই আশ্রমের বালুকাময় তটভূমি থেকে। সেই মহাদিনের সাক্ষ্য এই আশ্রম, এই ক্ষীণস্রোতা শুভ্রামতীর নদীতট।

আশ্রমের বিপরীত দিকে হরিজন বসতি। ষোলো শো হরিজন এখানে থাকে, হাতের কাজ করে জীবিকা অর্জন করে।

আশ্রমের ভিতরে আছে সাবানের কারখানা ও গোপালনের ব্যবস্থা।

সবই আছে কিন্তু তবু কেমন যেন একটা থম্‌থমে ভাব। যাঁর আবির্ভাব ছিল আশ্রমের প্রাণ তিনিই নেই।

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারংবার।
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে,···তুমি হেথা নাই।"

ধীরে পদক্ষেপে আশ্রম থেকে বেরিয়ে এলাম। বুকের মাঝে কেন জানি না, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস গুমরে উঠলো। বার বার মনে হলো—ভগবান্, তুমি ক্ষমা করো, মহামানবের রক্তপাতের কলংক থেকে জাতিকে পরিত্রাণ করো।

পুলিশের কারবারই আলাদা

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সেই কানে জড়ুলওলা লাল টাই পরা ভদ্রলোক বর্ধমান ষ্টেশনে চা খেতে নেমে যেতেই, ওপরের বাঙ্ক থেকে টুপ করে লাফিয়ে পড়লেন আর এক ভদ্রলোক—যাঁর চুলগুলো খাড়া খাড়া, নাকের নীচে মাছিমার্কা গোঁফ আর হাওড়া থেকে যিনি সটান চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন।

মাছিমার্কা গোঁফ চট্‌ করে আমার পাশে এসে বসে পড়লেন। তার পরেই ফিসফিস করে বললেন, আপনি অ্যাড্‌ভেঞ্চার পছন্দ করেন?

কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি, ডন্‌-বৈঠক করে থাকি, শার্লক্‌ হোম্‌সের গোয়েন্দা-গল্পগুলো আমায় প্রায় মুখস্থ। আমি পছন্দ করব না অ্যাড্‌ভেঞ্চার?

কৌতূহলী হয়ে বললুম, ব্যাপার কী মশাই?

—ব্যাপার?—প্ল্যাটফর্মের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, বেশ করে দেখে-শুনে, মাছি-মার্কা গোঁফ বললেন, ওই যে লোকটা—কানে জড়ুল আর লাল রঙের টাই—এখুনি যে চা খেতে নেমে গেল—ওকে চেনেন?

—না।

—ও হচ্ছে—মাছিমার্কা গোঁফ চোখের তারা দুটো কপালে তুলে বললেন,—দুর্দান্ত ডাকাত আর ঘোরতর জালিয়াৎ। ওর নাম হচ্ছে ছেদীলাল খাঁ। ওকে ধরবার জন্যে আমি—মানে গোয়েন্দা পুলিশের ইনস্‌পেক্‌টার গঙ্গারাম পাকড়াশী, এমনি ঘাপটী মেরে শুয়ে আছি।

—য়্যাঁ!

গঙ্গারাম পাকড়াশী আবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, ওকে পাকড়াতে হবে। আপনি আর আমি। পাঁচশো টাকা রিওয়ার্ড পেয়ে যাবেন। রাজী আছেন?

শুনে আমার রোমাঞ্চ হ'ল। উত্তেজনায় কান কটকট করতে লাগল।

বললুম, আলবাৎ!

—তবে প্ল্যানটা শুনুন। চট্‌পট্‌ বলে ফেলি। আমি এই সীটের তলায় লুকিয়ে থাকব। ট্রেন চলতে আরম্ভ করলে তলা থেকে ছেদীলালের পা ধরে হেঁইয়ো বলে টান লাগাব। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যাবে কুমড়োর মতো। কিন্তু কী জানেন,—লোকটার গায়ে ভীষণ জোর। একা হয়তো ধরে রাখতে পারব না। তখন আপনাকে সাহায্য করতে হবে। তার পর দু'জনে মিলে ওকে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলব, আর আসানসোল এলেই—বুঝলেন না?

—বিলক্ষণ!—আমার নাকের ডগাটা উৎসাহে এবার সুড় সুড় করতে লাগল। যেন একটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

—আজ ওকে পাকড়াতে না পারলে আমার পাকড়াশী-জন্মই বৃথা। ভারী ঘুঘু লোক মশাই, অনেক দিন থেকে জ্বালাচ্ছে। তা হলে আপনি রেডি?

—এখুনি।—আমার তো ইচ্ছে করছিল, নেমে গিয়ে প্ল্যাটফর্মেই ছেদীলালকে পাকড়াও করে ফেলি।

—তবে কথা রইল।—এই বলেই একটা চমৎকার কাণ্ড করলেন গঙ্গারাম। পুলিশের লোক তো—ওঁদের কারবারই আলাদা! ওঁর নিজের সুটকেস্ আর বালিশ বাঙ্কের ওপর লম্বালম্বি সাজিয়ে তার ওপর চাদরটা এমন ভাবে টেনে দিলেন যে ঠিক মনে হ'ল, গঙ্গারামই চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছেন। তার পরেই চট্ করে ঢুকে গেলেন সীটের তলায়।

বাইরে জুতোর শব্দ। আমার বুকের ভেতরটা আঁকুপাঁকু করে উঠল। দরজা খুলে এসে ঢুকল দুর্দান্ত ডাকাত আর দুর্ধর্ষ জালিয়াৎ ছেদীলাল খাঁ।

কুট্ করে আমার পায়ে একটা চিম্‌টি পড়ল। চমকে উঠতে গিয়েও আমি সামলে নিলুম। বুঝলুম, পাকড়াশী আমায় হুঁশিয়ার থাকতে বলছেন। কিন্তু অত জোরে

চিম্‌টি না কাটলেও ক্ষতি ছিল না—পা-টা জ্বালা করতে লাগল। পুলিশের কারবারই আলাদা!

ছেদীলাল এসে ধুপ করে আমার পাশে বসে পড়ল। দিব্যি ভালো মানুষ চেহারা—যেন ভাজা মাছটাও উল্‌টে খেতে জানে না। পরমানন্দে পান চিবুচ্ছে। আমি মনে মনে বললুম, চিবোও—যত খুশি পান চিবোও। এতক্ষণ ঘুঘু দেখছ—একটু পরেই ফাঁদ দেখতে পাবে!

ছেদীলাল জিজ্ঞেস করলে, আপনি কোথায় যাবেন?

বললুম, পাটনা। আপনি?

—আসানসোল নামব।

—অঃ!—মনে মনে বললুম, তোমাকে আর কষ্ট করে নামতে হবে না—আমরাই হাত-পা বেঁধে নামিয়ে দেব এখন।

ছেদীলাল কানের জড়ুলটাকে একবার চুলকে নিলে। লাল রঙের টাইটাকে বার কয়েক নাড়াচাড়া করে গঙ্গারামের চাদরের দিকে তাকিয়ে রইল।

—ও ভদ্রলোক খুব ঘুমোচ্ছেন দেখছি!

—হুঁ!—মনে মনে বললুম, কেমন ঘুমোচ্ছেন একটু পরেই টের পাবে।

—সেই হাওড়া থেকে সমানে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন!

—তাই তো দেখছি।

—কারো কারো ট্রেনে উঠলেই বেয়াড়া রকম ঘুম পায়। সে বেলা আটটাই হোক আর সন্ধ্যে ছ'টাই হোক।—ব'লে বিচ্ছিরি রকম খ্যাঁক খ্যাঁক আওয়াজ করে হাসতে লাগল ছেদীলাল।

আমার গা জ্বালা করতে লাগল। ইচ্ছে হ'ল, এখুনি ক্যাঁচ্ করে টুঁটি চেপে ধরি ছেদীলালের—একেবারে ছেদন করে ফেলি ওকে। কিন্তু গঙ্গারাম রেডি না হলে তো কিছু করা যায় না। নামকরা ডাকাত—গায়ে ভীষণ জোর, ছোরা-পিস্তল কী সঙ্গে আছে কে জানে!

বর্ধমান ছেড়ে ট্রেন ছুটছে। মেল গাড়ী। অন্ধকার ফুঁড়ে উড়ে চলেছে তীরের মতো। হঠাৎ কে যেন এক মুঠো আলো আমাদের গাড়ীর ওপর ছুড়ে মারল—ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল একটা ষ্টেশন।

আমার হাতের বইটার ওপর চোখ পড়ল ছেদীলালের।

—ওটা কী পড়ছেন?

বললুম, গোয়েন্দা-উপন্যাস।

—আপনি বুঝি খুব ডিটেক্‌টিভ্ বই পড়েন ?

—তা পড়ি।

—ডিটেক্‌টিভ্ হতে ইচ্ছে করে ?—ছেদীলাল আর একটা পান মুখে পুরে দিয়ে, জিভে খানিকটা চূণ লাগিয়ে, কেমন একগাল হেসে বললে, ইচ্ছে করে চোর-ডাকাত ধরতে ?

লোকটার সাহস ত্থাখো একবার! যেন ইয়ার্কি দিচ্ছে আমার সঙ্গে। দাঁড়াও,—ধরতে ইচ্ছে করে কিনা দেখিয়ে দেব একটু পরেই।

—সুবিধে পেলে ধরব বই কি। ক্যাঁচ্ করে চেপে ধরব।

—এই তো আজকালকার ইয়ং ম্যানের মতো কথা।—ছেদীলাল জানলা দিয়ে খানিক পানের পিক বাইরে ফেলে বললে, শুনে ভারী খুশি হলুম।

খুশি হলুম! আমার এত রাগ হ'ল যে ওকে ভেংচি কাটতে ইচ্ছে করল। দাঁড়াও,—দাঁড়াও—কত খুশি হতে পারো দেখিয়ে দিচ্ছি খানিক বাদেই।

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ট্রেন উড়ে চলেছে। আবার এক মুঠো আলো ছুড়ে দিয়ে আর একটা ষ্টেশন মিলিয়ে গেল। ছেদীলাল আমার পাশে বসে নিবিষ্ট মনে পান চিবুচ্ছে। আমার কান আবার কটকট করে উঠল, সুড় সুড় করতে লাগল নাকের ডগা। এত দেরি করছেন কেন গঙ্গারাম ? ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ভদ্রলোক ?

আমার কেমন খটকা লাগল। যেই ছেদীলাল বাইরে পিক ফেলবার জন্যে মুখ বাড়িয়েছে, আমি টুপ্ করে সীটের তলায় পায়ের একটা গুঁতো দিলুম। অমনি কোঁক করে আওয়াজ।

ছেদীলাল চমকে উঠল।

—কিসের আওয়াজ বলুন তো ?

কী সর্বনাশ! টের পেয়ে গেল নাকি ? আমি অমনি তাড়াতাড়ি করে বললুম, না-না, কোথায় আওয়াজ ?

—ওই যে কোঁক্ করে শব্দ হ'ল ?—ছেদীলালের তু' চোখে গভীর সন্দেহ।

বললুম, না—না,—ও কিছু না। আমি একটা হেঁচকি তুলেছি কেবল।

—তাই বলুন!—ছেদীলাল একটু চুপ করে থেকে আবার সামনের বাঙ্কের দিকে তাকালো।

—খুব নিঃসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছেন তো ভদ্রলোক!

—তা ঘুমুচ্ছেন।

—এমন ঘুম কি ভালো ? একটু নিঃশ্বাস পর্যন্ত পড়ছে না—দেখেছেন ? মারা গেলেন না তো ?

—খামোকা মারা যাবেন কেন ? হঠাৎ মারা গিয়ে ওঁরই বা লাভ কী ?—আমার ভারী অস্বস্তি বোধ হ'ল।

—কার কিসে লাভ কিছুই বলা যায় না। একটু দেখতে হচ্ছে যে!—বলেই ছেদীলাল উঠে দাঁড়াতে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার পায়ে আবার সেই কটাং করে চিম্‌টি। রাম চিম্‌টি যাকে বলে। আমি আর্তনাদ করে উঠলুম। ছেদীলাল এমন চমকালো যে গলায় পান আটকে বিষম খেয়ে গেল একেবারে।

—অমন চ্যাঁচালেন যে ?

—পায়ে বাত আছে কিনা! হাঁটুতে কটাং করে লাগল,—তাই—

—এই অল্প বয়সে বাত ? লক্ষণ খারাপ। —বলে আমার দিকে যেন কেমন করে তাকালো ছেদীলাল। তারপর বললে, উঁহু, বাঙ্কের ভদ্রলোককে একবার দেখতেই হচ্ছে। এমন ভাবে মরার মতো ঘুমুনো কোনো কাজের কথাই নয়!

বলে, ছেদীলাল যেই দাঁড়াতে যাবে,—তক্ষুণি সেই রোমাঞ্চকর কাণ্ডটা ঘটল। বাঙ্কের তলা থেকে শড়াক্ করে তুটো সাঁড়াশীর মতো বেরিয়ে এল পাকড়াশীর হাত—পটাং করে পাকড়ে ধরল ছেদীলালের পা—সঙ্গে সঙ্গে ছেদীলাল ধড়াম্ করে মেজেতে ফ্ল্যাট্!

তার পরেই গঙ্গারাম একেবারে ছেদীলালের বুকের ওপর। আর ছেদীলাল প্রাণপণে পা ছুড়তে লাগল। আমি লাফিয়ে উঠে ছেদীলালের ঠ্যাং চেপে ধরতে যাব—সঙ্গে সঙ্গে, কী কায়দায়, ছেদীলাল শুশুকের মতো উল্‌টে গেল। আর গঙ্গারাম তার পেটের তলায়!

আমি ছেদীলালকে গাঁট্টা মারতে যাচ্ছি—গঙ্গারাম সঙ্গে সঙ্গে তাকে পটকে দিয়ে ওপরে উঠে পড়লেন। যেই গঙ্গারামকে সাহায্য করতে যাব—সঙ্গে সঙ্গে ছেদীলাল আবার তাঁর ওপর চড়ে বসল।

কিছুই করতে পারছি না। কেবল অবাক্ হয়ে দেখছি তু'জনে কুমড়োর মতো গড়িয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ ছেদীলাল গ্যাঙাতে গ্যাঙাতে বললে, হেল্‌প্—হেল্‌প্—

সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গারাম গোঙাতে গোঙাতে বললেন, হেল্‌প্—হেল্‌প্—

তারপর তু'জনে একসঙ্গে চেঁচাতে আর কুস্তি করতে লাগল। কে যে কী বলছে

আমি ভালো করে বুঝতেই পারছিলুম না। শুধু কানে আসছে—ঝাপটে ধরুন স্যার—চেন টানুন—হেল্‌প্‌—হেল্‌প্‌—

হেল্‌প! কী ভাবে হেল্‌প্‌ করি? সাত-পাঁচ ভেবে নিজের অ্যাট্যাচি কেস্‌টাই তুলে নিলুম। তার পরে 'জয় মা কালী' বলে ধাঁ করে সেটাকে চালিয়ে দিলুম ছেদীলালের মাথায়।

কিন্তু ততক্ষণে ছেদীলালকে পটকে গঙ্গারাম ওপরে উঠে বসেছেন। সুটকেসের ঘা একেবারে গিয়ে লাগল গঙ্গারামের চাঁদির ওপর। আর 'আঁক্‌' করে একটা আওয়াজ তুলে গঙ্গারাম মেজেতে শিবনেত্র হয়ে পড়ে গেলেন। একদম অজ্ঞান।

সর্বনাশ!—এ কী করলুম! ছেদীলালকে মারতে গিয়ে ঠাণ্ডা করে দিলুম গঙ্গারামকে!

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে ছেদীলাল। জামা ধুলোমাখা, টাইটা ছিঁড়ে গেছে—কানের জড়ুলের পাশ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। বিধ্বস্ত হয়েও জয়গর্বে দন্তবিকাশ করছে সে।

সুট্‌কেস দিয়ে ছেদীলালকে এক ঘা বসাব ভাবছি, হঠাৎ ছেদীলাল আমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিলে!

—সাবাস্‌ ছোকরা, মোক্ষম ঘা মেরেছ! দুর্দান্ত ডাকাত ছেদীলাল ছোরা বার করতে যাচ্ছিল—আর একটু হলেই ঘ্যাচ্‌ করে বসিয়ে দিত। এইবার তোমার বিছানার দড়িটা দাও দিকি—ছেদীলালকে বেঁধে ফেলি।

আমার হাত থেকে সুট্‌কেসটা পড়ে গেল।

—কে ছেদীলাল? কার কথা বলছেন আপনি?

—কে আবার? এই মুখে মাছিমার্কা গোঁফ, খাড়া খাড়া চুল,—ছেদীলাল ছাড়া আর কে? এই ট্রেনে পালাচ্ছে জানতুম— কিন্তু এই গাড়ীতেই আছে ঠিক বুঝতে পারি নি। অবশ্যি চাদর ঢাকা দেওয়া দেখে আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল। যাই হোক, তোমার সাহায্য না পেলে ওকে ধরতে পারতুম না—পাল্‌টা আমাকেই খুন করে ফেলত। পাঁচশো টাকা রিওয়ার্ড পাইয়ে দেব তোমায়—নির্ঘাৎ।

ব'লে, দড়ি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাছিমার্কা গোঁফকে বাঁধতে লেগে গেলেন।

আমি বার কয়েক খাবি খেয়ে বললুম, আপনি? আপনি কে?

—আমি ডিটেক্‌টিভ্‌ ইন্‌স্‌পেক্‌টার গঙ্গারাম পাকড়াশী।—কানে জড়ুল আর লাল 'টাই' লোকটি হেসে বললেন।

ট্রেন আসানসোলে পৌঁছুল। পকেট থেকে পুলিশী হুইস্‌ল্‌ বার করে বাজালেন ভদ্রলোক। সঙ্গে সঙ্গে চারপাঁচজন কন্‌ষ্টেব্‌ল ছুটে এল কোথা থেকে।

আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। পুলিশের কারবারই আলাদা!

হরিজন

শ্রীঅজিতকুমার তারণ

প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেকার কথা।

মহাত্মা গান্ধী তখন তাঁর অস্পৃশ্যতা আন্দোলন সুরু করেছেন। হিন্দুসমাজের এই মস্ত বড় কুপ্রথা ধ্বংস করতেই হবে। একই পৃথিবীর মানুষ হয়ে, একই অন্নে—একই রোদে—একই জলে পুষ্ট হয়ে একে অপরকে শুধু তার জাতের জন্য ঘৃণা করবে এ তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে তাঁর আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ছাত্রসমাজ আর যুবকেরা দলে দলে এগিয়ে এল এই আন্দোলনে যোগ দিতে। ঠিক এই রকম এক সময়ের কথা বলছি।

গাঁয়ের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন নিবারণ তর্কবাগীশ। সজ্জন, পণ্ডিত ব্যক্তি। পয়সাকড়িও বেশ আছে। কিন্তু জাতের ব্যাপারে ভারী গোঁড়া। বাড়ীতে বারো মাসে তেরো পার্বণ, লোকটিও ধর্মপ্রাণ, কিন্তু ঐ এক মস্ত দোষ,—জাত নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করতেন। তাঁর চোখে যারা "ছোট জাত" তাদের তিনি একেবারেই মানুষ ব'লে মনে করতেন না। ফলে বাড়ীর এই সব পালা-পার্বণে হরিজনদের কোন স্থান ছিল না।

গান্ধীজীর আন্দোলন দেখতে দেখতে তাঁদের গ্রামেও এসে হাজির হ'ল। বলা বাহুল্য, তর্কবাগীশ মশাই মোটেই ব্যাপারটাকে সুনজরে দেখতে পারলেন না। সনাতন হিন্দুধর্মের দোহাই দিয়ে আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগলেন। ছেলেদের—নাতিদের বললেন, "খবরদার, ও সব মিটিং-ফিটিং গাঁয়ের ত্রিসীমানায় আসতে দিবি না। যত্তো সব……"

গাঁয়ের পাশেই নদী। বেশ চওড়া বড় নদী। খুব জল। ষ্টিমার যাতায়াত করে। নদীর ধার দিয়ে দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে হাটের দিকে।

সেদিন হাটবার। সকাল থেকেই দলে দলে লোক চলেছে হাটের দিকে। এদের

মধ্যে আছে সর্ব ধর্মের লোক—বামুন, কায়েত, বদ্যি, জোলা, নাপিত, নমঃশূদ্র, মুচি, মেথর—সব। হিন্দু এবং মুসলমান।

একদিকে নদীর ঘাট। তর্কবাগীশ মশাই স্নান সেরে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আহ্নিকটা সেরে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ হাটের যাত্রীদের মধ্যে থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, "আরে কত্তা ঠাকুর, শীগ্‌গির পালান! উঠে পড়ুন—উঠে পড়ুন—কুমীর! কুমীর!!"

অনেক দূরে একটা কুমীর, হয়তো ওঁকে লক্ষ্য করেই, জলে ডুব দিয়েছে। অভিজ্ঞ গাঁয়ের লোক দূর থেকেই তা টের পেয়েছে। কাজেই সে চীৎকার করে উঠেছে।

তর্কবাগীশ মশাই আহ্নিকে তন্ময়। চোখ বুঁজে ধ্যান করছেন আর জোরে জোরে মন্ত্র পড়ছেন হাতের অঞ্জলিতে জল তুলে নিয়ে। ঐ সাবধান-বার্তা তাঁর কানে একটুও পৌঁছল না।

দলের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। একজন বল্‌ল, "কিছু বলিস না। বেশ হবে বুড়োকে কুমীরে ধরে নিয়ে গেলে। গাঁয়ের প্রাণ জুড়োবে! উঃ, আমাদের মানুষ বলেই মনে করেন না! আমাদের ছায়া মাড়ালেও উঠে গিয়ে তিন বার স্নান করেন! ও বেটা মরলে ভালই হবে।" লোকটির বয়স কম, রক্তও তাই গরম।

কিন্তু সবাই তো সমান নয়। হঠাৎ দেখা গেল, গাঁয়ের মুচী কালীচরণ কাঁধ থেকে জুতো সেলাইএর যন্ত্রপাতি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জলে। পাগলের মত আহ্নিক রত তর্কবাগীশ মশাইএর হাত ধরে টানতে সুরু করে দিয়েছে সে।

তর্কবাগীশ মশাই চমকে উঠে চোখ খুললেন দেখেন, তাঁর হাত ধরে টানছে গাঁয়ের মুচী কালীচরণ।

"কী! এত বড় আস্পর্দ্ধা! ছোট জাত—মুচী হয়ে তুই কিনা আমায় ছুঁ...."

কথাটা কিন্তু শেষ হ'ল না। "ওরে বাবা রে!" বলতে বলতে তিনি বিরাট এক লাফ দিয়ে একপাশে সরে এলেন।

যে কুমীরটা তাঁকে লক্ষ্য করে জলে ডুব দিয়েছিল সে ভুস করে ঘাটের কাছে ভেসে উঠল। তর্কবাগীশ মশাই তখন একটু সরে গেছেন, কিন্তু কুমীর তার শিকার ফস্‌কাল না। তর্কবাগীশ নেই, কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে আছে অসতর্ক কালীচরণ। কুমীর তাকেই টেনে নিয়ে চল্‌ল।

কালীচরণের জানা ছিল, কুমীরে ধরলে দু' হাত দিয়ে কুমীরের চোখ চেপে ধরতে পারলেই তাকে কাবু করা যায়—যে দিকে খুসি টেনেও আনা যায় তাকে। যন্ত্রণার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সে কুমীরের চোখ টিপে ধরল এবং বুদ্ধির কৌশলে একটু ঘুরপাক

খেয়েই ডাঙ্গার ধারে এসে পড়ল। ডাঙ্গায় কুমীর দেখেই তার সঙ্গীরা ছুটে এল এবং পিটিয়ে কুমীরের ভবলীলা সাঙ্গ করতেও দেরী হ'ল না।

কিন্তু কালীচরণের গায়ে কুমীরের দাঁতের কামড়ে আর লেজের ঝাপটায় অনেকগুলো ঘা হয়ে গেছে। তাকে তখনই ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কিন্তু চিকিৎসা করানো সত্বেও বাঁচানো গেল না তাকে। অস্পৃশ্য কালীচরণ তার নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেল—সে মানুষ হিসাবে মোটেই ছোট নয়—অনেক অনেক বড়।

এর পর? তর্কবাগীশ মশাই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। যাদের তিনি হরিজন বলে দূরে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন তাদেরই একজনের দেওয়া প্রাণ নিয়ে ঘরে ঢুকতেও তাঁর লজ্জা বোধ হচ্ছিল। অনুতাপ আর অনুশোচনার জ্বালায় জ্বলতে লাগলেন তিনি।

সেই থেকে একেবারে বদলে গেলেন নিবারণ তর্কবাগীশ। বাকি জীবনটা তিনি গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা-বর্জন আর হরিজনদের সেবা-উন্নতির কাজে উৎসর্গ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন।*

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে

পথিক মেঘের দল

শ্রীআশা দেবী, এম্. এ, বি. টি

অনেক দিন পর আবার তোমাদের আসরে গল্পের ঝুলি খুলে বসলাম। হয়তো এতদিনে তোমরা আমার বলা গল্পের গোড়ার দিক্‌টা প্রায় ভুলতেই বসেছ। আমার রাশিয়া ভ্রমণের গল্প আবার সুরু করছি।

সুইজারল্যাণ্ড থেকে আমরা ট্রেনেই রওনা হলাম। এখানে বেড়াতে হলে বেডিং—বিছানার দরকার হয় না। কিন্তু আমাদের চিরকালের অভ্যাস—যত রকমের প্রয়োজনীয় বা প্রয়োজনে লাগতে পরে ভবিষ্যতে এমন সব জিনিষে সুটকেস বোঝাই করা। কাজেই ষ্টেশনে পৌঁছে একটা সমস্যা হলো, একে কি করে নেওয়া যায়। কারণ এখানকার মত—"কুলি, ইধার আও" বললেই কুলি মেলে না, কুলি প্রায় দুর্লভ ওখানে। কাজেই কুমড়োর মত সুটকেসটাকে ট্যাকে নিয়েই রওনা হতে হলো। প্রাণপণে টানাটানির ফলে সুটকেসের হ্যাণ্ডেলটা আগেই ছিঁড়ে ছিল কিনা।

ট্রেনগুলো গাড়ী-বারান্দাওয়ালা বাড়ীর মত। শোবার কামরা ও তার সঙ্গে লাগানো বারান্দা, আমাদের দীর্ঘ রেল-ভ্রমণে পথের একঘেয়েমি নষ্ট করার পক্ষে প্রচুর সাহায্য করেছিল।

আমাদের যাবার কিছু দিন আগেই এখানে নেহেরু এসে গেছেন। কাজেই এঁদের

আমাদের ভ্রমণের একটি আনন্দমুখর মুহূর্ত

মধ্যে যে উত্তেজনার প্রাবল্য তা আমরা প্রায় প্রতি ষ্টেশনের অভিনন্দনেই অনুভব করলাম। প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনেই যখন গাড়ী থেমেছে তখন প্রচুর উপহার ও ফুলের রাশ আমাদের গাড়ীর মধ্যে এঁরা পাঠিয়েছেন, এবং এঁদের চোখে-মুখে যে অকৃপণ

আনন্দের ও বন্ধুত্বের আভাস দেখেছি তার মধ্যে, আর যাই থাক, কোন কৃত্রিমতার আভাস লক্ষ্য করি নি। আর দেখেছি শ্যামল শস্যের প্রান্তর—মানুষের প্রাণের প্রাচুর্য্য।

চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগে এক রাত ছিলাম। একটা বিরাট কলকারখানার কর্ম্মমুখর অঞ্চলে ছিল আমাদের হোটেলটি। চারিদিকে বাড়ী আর বাড়ী, আর পথে শ্রমিকদেরই দেখেছি বেশী। দেশটি সুন্দর এবং আমাদের হোটেলটিও প্রায় প্রাসাদের মত—যেমন বিরাট, জমকালোও তেমনি।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আমরা বহু-আলোচিত রাশিয়ায় এসে পৌঁছলাম। এতদিন এ দেশ সম্বন্ধে নানা কথা শুনেছি। শুনেছি লৌহ-যবনিকার অন্তরালের দেশ। আরো নানা কথা। কিন্তু পৌঁছে চমকে গেলাম। ষ্টেশনে দলে দলে নারী-পুরুষ, শিশু আমাদের প্রায় জড়িয়ে ধরলো। অজস্র ফুলের রাশি আর অকৃপণ আদরে আমাদের দীর্ঘ পথের কথা প্রায় ভুলিয়ে দিলো।

মস্কো ষ্টেশনটি বেশ বড় আর সুন্দর। তার বিরাট প্ল্যাটফর্মেই আমাদের অভিনন্দন-বাণী দান করা হলো। একটি ছোট্ট মেয়ে ললিত কণ্ঠে আমাদের স্বাগত জানালো। ভাষা তাদের বুঝলাম না, কিন্তু চোখে-মুখে যে নির্ভীক্ প্রাণ-চঞ্চলতা দেখলাম তাকে প্রশংসা না করে পারি না। ইতিপূর্ব্বে আমাদের ফুলের ভারে বিব্রত দেখে, ষ্টেশনে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকে ছুটে এসে ফুল এবং ওভারকোটের ভারমুক্ত করলেন আমাদের। আমরা অভিনন্দনের পালা শেষ করে তাঁদের আগে-থেকে-ঠিক-করে-রাখা বাসে উঠে পড়লাম। পথে একটি বাঙ্গালীর সঙ্গে হলো দেখা; তিনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু বিনয় রায়। আমাদের সঙ্গে তাঁর বোনও ডেলিগেট হয়ে এসেছেন। উনি ওখানে মস্কো রেডিওতে কাজ করেন।

বাস্ ছেড়ে দিলো আমাদের নিয়ে।

হোটেল মস্কো! সেখানেই আমাদের থাকবার জায়গা হয়েছে। বিরাট হোটেল, বিরাট এর ব্যবস্থা। হোটেলের নিচের বিরাট হল্ ঘরে আমরা বসলাম। ঘর যতক্ষণ না ঠিক হয় ততক্ষণ আমাদের এখানেই বসতে হবে। হোটেলে ঢুকতে ডান দিকে কতগুলো দোকান—ওখানকার সুন্দর সুন্দর ফ্যান্সি জিনিষ-পত্র বিক্রি করবার জন্য। বইও আছে তার মধ্যে। লোক গম-গম করছে—আসা-যাওয়া করছে। আমরা গিয়ে যেখানে বসেছি তার সামনে প্রকাণ্ড একটি ষ্ট্যালিনের মূর্ত্তি। তার পায়ের তলায় অসংখ্য পুষ্প-স্তবক। আরও রয়েছে পাথরের বিরাট গুরুশিষ্য লেনিন এবং ষ্ট্যালিনের আলোচনারত দুটি মূর্ত্তি। আমাদের বয়ে-আনা পুষ্পস্তবক আমরা শ্রদ্ধাভরে দুই যুগনায়কের উদ্দেশে অর্ঘ্য দিলাম।

খবর এলো ছ' তলায় আমাদের ঘর ঠিক হয়েছে। ৪২ নম্বর ঘরের অধিকারিণী আমি। ঘরে গিয়ে দেখি এ যেন অমরাবতী! আমার সুটকেস এসে গেছে। ঘর পরিপাটি করে গোছান হয়েছে। মেড্ সঙ্গে সঙ্গে এসে প্রয়োজনীয় খবরাখবর নিয়ে গেল। ক্লোক রুম, কল, বাথ রুম, বসবার ঘর—সব শুদ্ধ যেন একটা ফ্ল্যাট বাড়ী! বিরাট মোটা মোটা কাচের জানালা, তার ওপর পুরু পুরু নীল পর্দ্দা। প্রত্যেক ঘরে টেলিভিসন রেডিও সেট। গোড়াতে বুঝি নি যে ওটা টেলিভিসন সেট। বার বার মেড্ রেডিওটা খুলে আঙ্গুল দিয়ে আমাকে কি যেন দেখাবার চেষ্টা করছে, আর আমি বার বারই ওটা বন্ধ করে দিচ্ছি। পর দিন অবশ্য সে ভুলটা বুঝতে পারলাম।

একটা খুব মুস্কিলে পড়তাম আমরা দরজা খোলা নিয়ে। এমন বড় বড় দরজা আর তার এমন চাবি যে আমার মত গোটা চারেক লোক জমা না হলে তার কোন ব্যবস্থাই করা যাবে না। কিন্তু মেড্‌রা এত সতর্ক যে তারা আমাদের জুতোর শব্দ পেলেই ছুটে আসতো একমুখ হাসি নিয়ে। দরজা খুলে দিয়ে আবার প্রচণ্ড হাসিতে ভেঙ্গে পড়তো তারা আমাদের রোগা আর খাটো চেহারা দেখে। তাদের চেহারা আর স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ত, হ্যাঁ, এরা হাসলে এদের কিছু দোষ দেওয়া যায় না।

মস্কোর গল্প পরে আরও ভাল করে বলব।

কি শুনি

শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী

অস্ত এবং উদয়-আকাশ
যে কথা চায় বলতে,—
সেই কথা কি শুনতে পেলুম
মাঠের পথে চলতে?
দখিন্ বাতাস তাই কি বলে
ঝিঙের হলুদ ফুলকে?

তাই কি শোনায় ছল্‌ছলিয়ে
ঢেউরা নদীর কূলকে?
আমার মনে গুণগুণিয়ে
যা হ'তে চায় গাওয়া,
শস্য-শোভন মাঠের পথে
তার দেখা যায় পাওয়া!

পুরানো পাতা

গোলযোগ

৺তারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

রায় বাহাদুর হৃষীকেশ দেব মস্ত বড় জমিদার। পাবনা সহরে যদি তোমরা কোন দিন বেড়াইতে যাও তো দেখিবে সেখানে কি চমৎকার তাঁর বাড়ী! চিনিবে কি করিয়া? নাঃ, তাতে গোল হইবে না। প্রকাণ্ড ফটকের গায়ে একধারে লেখা আছে তাঁর বাড়ীর নাম – 'পাবনা হাউস্', আর একধারে লেখা আছে তাঁর নিজের নাম – রায় বাহাদুর হৃষীকেশ দেব।

এ হেন জমিদার হৃষীকেশ বাবু একদিন তাঁর বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন-পারিষদ-মোসাহেবে ঘরখানা একেবারে ভর্ত্তি। তারা জমিদার বাবুর প্রত্যেকটি কথায় সায় দিতেছে। বাবু যেই একবার বলিতেছেন, "হ্যাঁ", অমনি উপস্থিত সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিতেছে, "হ্যাঁ"—ঠিক যেন একেবারে কোরাস্ গান। আবার বাবু হয়তো যেই বলিলেন, "না", অমনি সঙ্গে সঙ্গে কোরাস্ গান—"না"।

এই রকম তো ব্যাপার চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ দ্বারোয়ান আসিয়া জমিদার বাবুকে সেলাম দিয়া জানাইল, "বাহিরে একটা ব্রাহ্‌মণ আইসেছে, সেটি ভারী না-ছোড়্‌-বান্দা আছে, হুজুরের সাথে মোলকাৎ না করিয়ে সেটি না যাবে।"

ব্রাহ্মণ? অমনি জমিদার বাবু বুঝিয়া ফেলিলেন এ ভট্‌চাযের পো নিশ্চয়ই কিছু দক্ষিণার জন্য আসিয়াছে।

মনে মনে বলিলেন—আচ্ছা, বাছা, দাঁড়াও। কথার ফেরে তোমাকে এমনি জব্দ করিয়া দিব যে তুমি পালাইতে পথ পাইবে না। মুখে দ্বারোয়ানকে বলিলেন, "বোলাও হিঁয়া!"

ব্রাহ্মণ ঘরের ভিতরে আসিলেন। একহারা চেহারা, পরনের কাপড়-চোপড় খুবই ময়লা, কিন্তু চোখ দুটি খুব উজ্জ্বল—দেখিলেই বুঝা যায় লোকটী বেশ বুদ্ধিমান্।

ব্রাহ্মণ ঘরে ঢুকিতেই জমিদার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মনে করে এখানে আসা হয়েছে?"

"আজ্ঞে, বড় গরীব আমি, সামনের চৈত্র মাসে আমার বড় ছেলেটির উপনয়ন—হুজুরের কাছে তাই কিছু সাহায্যের জন্যে····"

"সাহায্য ? এখানে কিছু পাবেন আশা করে এসেছেন নাকি ?"

নামেই তো…গোলযোগ বাধিয়েছে

"এসেছি বৈকি হুজুর, অনেক দূর থেকে আপনার নাম শুনে অনেক আশা করেই এসেছি।"

"তবে তো দেখছি আপনি বড়ই ভুল করেছেন। কি আশ্চর্য্য. বাড়ীর সামনে অমন বড় বড় অক্ষরে লেখা দেখলেন, 'পাব না হাউস্', তা দেখেও বুঝতে পারলেন না এখানে কিছুই পাবেন না ?"

কথা শুনিয়া তো মোসাহেবের দল হাসিতে হাসিতে একেবারে মাটীতে গড়াইয়া পড়িল বাবু নিজেও হাসিলেন কিন্তু অত বেশীক্ষণ নয়। মোসাহেবদের হাসি কিন্তু আর থামেই না—ওঃ, বাবু আজ কি কথাটাই না বলিয়াছেন !

ব্রাহ্মণ কিন্তু মোটেই অপ্রস্তুত হইলেন না। চুপ করিয়া খানিকক্ষণ তিনি সকলের হাসি থামিবার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তারপর, সকলের হাসি থামিয়াছে দেখিয়া, বলিলেন, "সত্যি হুজুর, ঐ নামেই তো যত গোলযোগ বাধিয়েছে। ফটকের এধারে আযার দেখলাম লেখা আছে—শ্রীহৃষীকেশ 'দেব'। ভাব্‌লাম, বাবু যখন ফটকের গায়েই লিখে রেখেছেন—'দেব', তখন নিশ্চয়ই ভেতরে গেলে কিছু-না-কিছু তিনি দেবেনই।"

রসিক জমিদার-বাবু হঠাৎ যেন কেমন ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেলেন। আর তাঁর মোসাহেবদেরও যেন কারও মুখে কোন কথা ফুটিল না।

ব্রাহ্মণকে নাকি সেদিন খালি হাতে ফিরিতে হয় নাই।

'সূর্যদেবের গ্যাস'—হিলিয়াম্

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম্. এস্-সি

মাত্র কয়েকটা দিন আগে একটা সূর্যগ্রহণ হয়ে গেল। তোমাদের মধ্যে যারা উৎসাহী তারা হয়তো কাচের গায়ে ভুষো-কালি মাখিয়ে তাই চোখের সামনে উঁচু করে ধরে আড়াল থেকে সূর্য ঠাকুরকে দেখে নিয়েছ ঐ সময়ে। গোল সূর্য কেমন ধীরে ধীরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে—দেখলে ভারী অবাক্ লাগে বই কি ! মনে হয়, সেকালকার লোকেরা যে মনে করত রাহু দৈত্য এসে সূর্যকে গ্রাস করছে, তাই বুঝি ঠিক ! সত্যিই যেন রাহু পাঁউরুটির মত কামড়ে কামড়ে খেয়ে নিচ্ছে সূর্যকে। সূর্যগ্রহণের বৈজ্ঞানিক কারণ জানা সত্বেও ঐ আজগুবি গল্পটাই যেন কল্পনা করতে ভাল লাগে।

কিন্তু ভাল লাগলেও ও কল্পনা চিরকাল কল্পনাই থাকবে। অবশ্য রাহুর গল্প উড়িয়ে দিলেও বিজ্ঞানীরা সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে এমন সব রকমারি সত্যিকার তথ্য বার করেছেন যা তাঁদের কাছে কম রোমাঞ্চকর নয়। তোমাদের কাছেও হয়তো ! তা ছাড়া এই গ্রহণের সময়েই সূর্যকে ভাল করে জানবার—ভাল করে চিনবার—ভাল করে দেখে নেবার সুযোগ হয় কিনা ! অন্য সময় সূর্যের তীব্র জ্যোতিঃতে সব কিছু এমন ধাঁধিয়ে থাকে যে তাকে দূরবীণ দিয়ে ভাল করে দেখা বা ভাল করে তার ফটো তোলা এক রকম অসম্ভবই বলা চলে।

এই জন্যই সূর্যগ্রহণের সময়টা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে পরম মূল্যবান্ মুহূর্ত। বিশেষ করে যখন কোন জায়গায় সূর্যের পূর্ণগ্রহণ হয়। আগে থেকেই তাঁরা আঁকজোক কষে হিসেব করে সেই সময়টা এবং কোথা থেকে সেই পূর্ণগ্রহণ ভাল করে দেখা যাবে সেই জায়গাটা ঠিক করে রাখেন এবং যথা সময়ে যন্ত্রপাতি, ক্যামেরা, দূরবীণ ইত্যাদি নিয়ে সেখানে হাজির হন। এই রকম এক-একটা গ্রহণের পর সূয্যি মামা সম্পর্কে কত নতুন নতুন খবর যে বেরিয়ে পড়ে তার ঠিক নেই।

এই রকম এক সূর্যগ্রহণের কথা বলছি। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের এক পূর্ণ সূর্য গ্রহণ। সেদিনও বিজ্ঞানীরা এই রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে মহা কৌতূহলের সঙ্গে সূর্যকে পরীক্ষা করছিলেন। এখন, তোমরা হয়তো জান, বিজ্ঞানীদের কাছে এমন সব ব্যবস্থা আছে যার সাহায্যে কোন জিনিষের আলো পরীক্ষা করেই তাঁরা বলে দিতে পারেন তার মধ্যে কি কি উপাদান আছে। এই প্রণালীকে বলা হয় 'স্পেক্ট্রাম'-পরীক্ষা। বাংলায় 'বর্ণালী' কথাটা ব্যবহার করা হয় ওর জন্য। যাই হোক, এই পরীক্ষায় প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের দরুণ এতে এক-একটি নির্দিষ্ট জায়গায় একটি করে আলাদা রংএর

রেখা দেখতে পাওয়া যায়; আর মজা এই, এক মৌলিক পদার্থের দরুণ যে রেখা তার সঙ্গে অন্য মৌলিক পদার্থের কোন রেখা কখনও মিশে যায় না। কাজেই এই রেখা দেখে সহজেই বলে দেওয়া যায় আসল জিনিষটির—অর্থাৎ যার আলো পরীক্ষা করা হচ্ছে তার মধ্যে কি কি মৌলিক পদার্থ আছে। যেমন ধর, সোডিয়াম্ ধাতুর জন্য স্পেক্‌ট্রামে পড়ে একটা হলদে রেখা—বিজ্ঞানীরা ওকে বলেন 'ডি' রেখা। যদি কোন জিনিষের আলো নিয়ে তার স্পেক্‌ট্রাম পরীক্ষা করলে এই ডি-রেখা দেখতে পাওয়া যায় তা হলে বুঝতে হবে ঐ জিনিষটি মধ্যে 'সোডিয়াম্' আছে।

এবারে যা বলছিলাম। ঐ দিনও সূর্যগ্রহণের সময়ে বিজ্ঞানীরা ঐ রকম সূর্যের আলো নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ দেখেন, স্পেক্‌ট্রামে ডি-রেখা তো ফুটে উঠেছেই, উপরন্তু তার পাশে আর একটা সম্পূর্ণ নতুন রেখা দেখা যাচ্ছে যা এ যাবৎ কাল আর কখনও ওখানে দেখা যায় নি। তা হলে নিশ্চয়ই ওটাও একটা নতুন মৌলিক পদার্থ। কিন্তু পৃথিবীর কোন কিছুর মধ্যে তো ও জিনিষ নেই। তা হ'লে নিশ্চয়ই ওটা এমন একটা মৌলিক পদার্থ যা কেবল সূর্যের মধ্যেই আছে, পৃথিবীতে নেই।

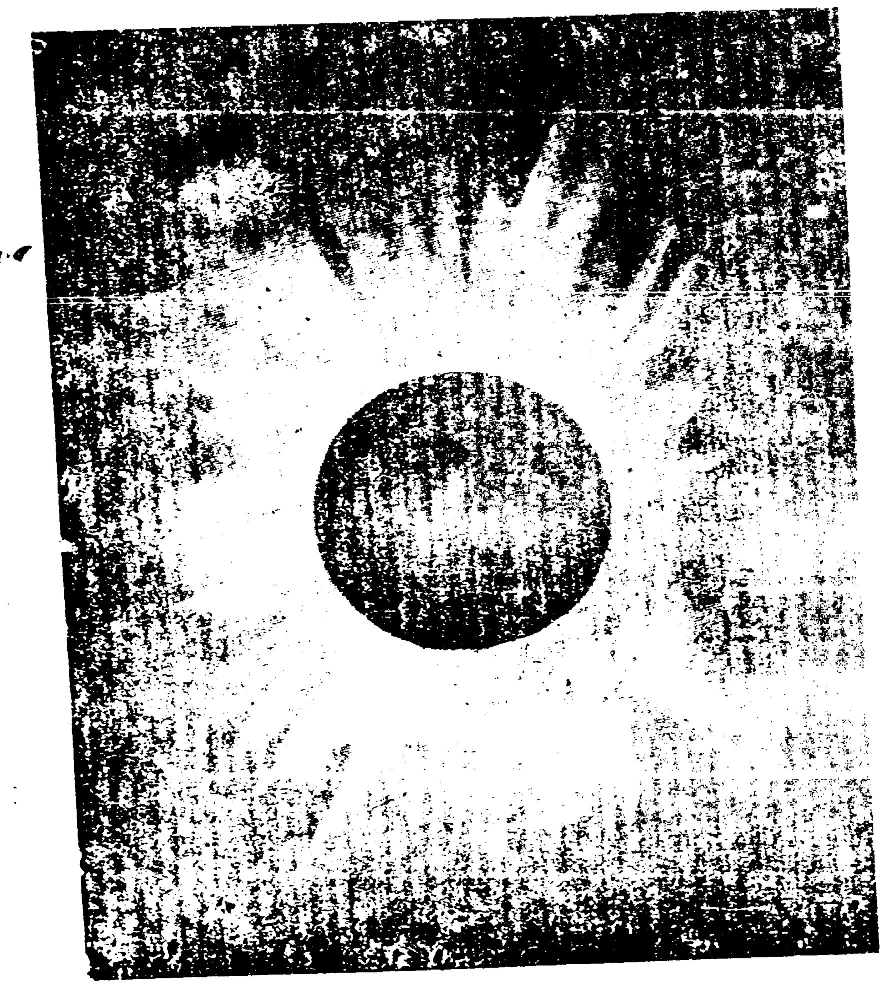

পূর্ণগ্রহণের সময়ে সূর্য

এর পর নামকরণের পালা। কি নাম দেওয়া যায় এই নতুন জিনিষটির? কেবল সূর্যের মধ্যেই যখন ওটি রয়েছে তখন সূর্যের নাম দিয়ে দেওয়াই ভাল। গ্রীক্ ভাষায় সূর্য বা সূর্যদেবের নাম হচ্ছে হিলিয়াস্। তাই ভেবে-চিন্তে এই নতুন জিনিষটির নাম দেওয়া হ'ল হিলিয়াম্। আর হিলিয়ামের দরুণ স্পেক্‌ট্রামে যে রেখা পড়ছিল তার নাম দেওয়া হ'ল ডি-৩।

ব্যস্। তার পর ২৬ বছর বিজ্ঞানীরা চুপ্‌চাপ্। সূর্যের মধ্যে একটা নতুন মৌলিক

পদার্থ রয়েছে যা পৃথিবীতে নেই—এইটুকুই জানা রইল তাঁদের। পৃথিবীতে যদি ওর অস্তিত্ব না থাকে তা হলে ও নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার কি দরকার?

কিন্তু সত্যি কি তাই? ক্লিভাইট্ নামে এক রকম খনিজ পদার্থ আছে, তাই নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী র‍্যামজে সাহেব—ক্লিভাইটের স্পেক্‌ট্রাম নিয়ে। হঠাৎ তিনি অবাক্ হয়ে লক্ষ্য করলেন স্পেক্‌ট্রামে ডি-রেখার জায়গাটির ঠিক পাশে ওটা কি? ডি-৩ রেখা দেখা যাচ্ছে না একটা! ও রেখা তো হিলিয়াম্ না থাকলে আসে না! তা হলে কি পৃথিবীতেও হিলিয়াম্ আছে? বারে বারে পরীক্ষা করলেন র‍্যামজে সাহেব। হ্যাঁ, ঠিক তাই। পৃথিবীতেও হিলিয়াম্ আছে এবং আছে ঐ ক্লিভাইটেরই মধ্যে। নামে সূর্যদেবের গ্যাস হলেও আসলে হিলিয়াম্ সূর্যদেবের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।

কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্য খবর জানা ছিল না তাঁর। যে হিলিয়াম্‌কে এমন একটা অপার্থিব-দুষ্প্রাপ্য জিনিষ বলে মনে করা হ'ত তা আমাদের চোখের সামনেই ছড়িয়ে আছে। কোথায়? কোথায়? কোথায়? কেন, বাতাসের মধ্যে! কিন্তু বাতাস তো শুধু নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন গ্যাস দিয়ে তৈরী! পাঁচ ভাগের চার ভাগ নাইট্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেন—মোটামুটি এই হচ্ছে বাতাসের উপাদান। অবশ্য এ ছাড়াও ওর মধ্যে মেশান আছে সামান্য কিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড আর কিছু জলীয় বাষ্প।

কিন্তু না, আরও আছে। খু-ব সামান্য পরিমাণে আছে। একটা নয়, আরও পাঁচ পাঁচটা গ্যাস। আর্গন, ক্রিপ্‌টন্, জেনন, নিয়ন্ আর এই হিলিয়াম্। এই পাঁচ রকম গ্যাস জড়াজড়ি করে মিশিয়ে আছে আমাদের চোখের সামনে—বাতাসের মধ্যে। বাতাসকে যদি খুব চাপ দিয়ে আর খুব ঠাণ্ডা করে তরল করে ফেলা যায় তা হ'লে এই পাঁচটা গ্যাসকেই আলাদা করে ফেলা সম্ভব। কারণ এর এক একটা এক এক উত্তাপে ফুটতে থাকে। তরল বাতাসকে এক একটা বিশেষ বিশেষ উত্তাপে রাখতে পারলেই এই গ্যাসগুলো পৃথক্ করে ফেলা যায়।

এই পাঁচটি গ্যাস তা হলে জাতভাই? হ্যাঁ, জাতভাইই বটে। তবে বড় অমিশুক। নিজেদের মধ্যে একদম মেলা-মেশা নেই। নিজেদের মধ্যে বলি কেন, কারো সঙ্গেই নেই। আর এই কারণেই এত দিন এরা লোকচক্ষুর আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পেরেছিল।

কথাটা শুনতে কেমন কেমন লাগছে? একটু খুলে বলি তা হলে। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু এক বা একাধিক মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরী তা নিশ্চয়ই জান। যেমন

Correction

ধর, অক্সিজেন একটা মৌলিক পদার্থ। আবার জল নিয়ে দেখ। দেখতে একটা জিনিষ ব'লে মনে হলেও আসলে জল তৈরী হয়েছে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন মিলে। লোহার সঙ্গে অক্সিজেন মিলে তৈরী হয় লোহার মরচে—বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে লোহার অক্সাইড। এই রকম বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ একে অপরের সঙ্গে মিলে এক-একটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ—যৌগিক পদার্থ গড়ে তুলছে। বাতাসের মধ্যেও এই অক্সিজেন আছে, এবং একা একাই আছে—নাইট্রোজেনের সঙ্গে মিলে অর্থাৎ যৌগিক পদার্থ রূপে নেই—পাশাপাশি মিশে আছে। 'মেলা' আর 'মেশা'য় তফাৎ লক্ষ্য ক'র। সুযোগ পেলে অক্সিজেন কিন্তু নাইট্রোজেনের সঙ্গে মিলে একটা নতুন যৌগিক পদার্থও তৈরী করতে পারে। অক্সিজেনের মত সমস্ত মৌলিক পদার্থেরই এই রকম অপর কোনটার সঙ্গে মিলবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু ঐ যে পাঁচটা গ্যাসের কথা বললাম, ওরা একেবারে একাচোরা। পৃথিবীর কোন কিছুর সঙ্গে ওরা কখনও মিলতে পারে না—না কোন মৌলিক পদার্থের সঙ্গে, না কোন যৌগিক পদার্থের সঙ্গে। এই অদ্ভুত স্বভাবের জন্যই ওদেরকে খুঁজে বার করতে এত দেরী হয়েছে। তোমাদের স্কুলেও হয়তো ঐ রকম একাচোরা স্বভাবের ২।১টি ছেলে আছে—যারা কারো সঙ্গে মেলামেশা করে না। বড়দের মধ্যেও দেখা যায় এ রকম স্বভাবের লোক। কবি শ্রীঅজিত দত্ত এই রকম এক একাচোরা লোক সম্বন্ধেই লিখেছিলেন—

"বেঁকাচোরা রাস্তায় একাচোরা সেন
হোগলার বেড়া এঁটে একলা থাকেন।"

এদের সঙ্গে রসায়ন-জগতের এই পাঁচটি গ্যাসের অনায়াসে তুলনা করা যেতে পারে।

কাজেই, বুঝতে পারছ, কি রকম অকেজো—অকর্মণ্য এই গ্যাসগুলো। তার ওপর আবার এদের না আছে গন্ধ, না আছে স্বাদ। কোন গুণেরই বালাই নেই।

তা হ'লে? তা হ'লে কি আর হবে? থাকুক যেমন আছে তেমনি। কে আর ওদের নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী হবে? কেউ না।

এমনি সময়ে ঘটল এক কাণ্ড।

ঘটল আমেরিকায়। আমেরিকায় নানা জায়গায় মাটীর তলায় পেট্রোলিয়াম্ পাওয়া যায়। মাটীর গায়ে গভীর ছিদ্র করে এই সব খনি থেকে পেট্রোলিয়াম তোলা হয়। একবার এক জায়গায় এই রকম পেট্রোলিয়ামের খোঁজ চলছিল। একদিন দেখা গেল, খনি থেকে তেলের বদলে ভুস্ ভুস্ করে রাশি রাশি গ্যাস বেরোচ্ছে। পেট্রোলিয়াম্-খনিতে এ রকম ব্যাপার অবশ্য নতুন কিছু নয়। আর এই সব গ্যাসের জ্বালানী হিসেবে চাহিদাও আছে। কর্তারা তাই ভাবলেন, নাই বা পাওয়া গেল তেল—

এই গ্যাস দিয়ে আশপাশের যত কলকারখানা, ঘর-গৃহস্থালির উনুন জ্বালানো ইত্যাদি সবই তো চালানো যাবে আপাততঃ। তাই বা কম কি? কিন্তু হরি হরি, আগুন জ্বালাতে গিয়ে দেখা গেল—এ গ্যাস তো জ্বলে না! কোন গুণই নেই এর। বিজ্ঞানীরা তখন সে গ্যাস পরীক্ষা করে দেখেন—আরে, এ যে হিলিয়াম্! হিলিয়াম্ তা হ'লে বাতাস ছাড়াও স্বাভাবিক ভাবে খনির মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে, এবং বেশ প্রচুর পরিমাণেই!

তখন সুরু হ'ল পরীক্ষা-নিরীক্ষা,—এই রাশি রাশি অকেজো গ্যাসকে কোনও পাত্রে জমা করে রেখে তাকে দিয়ে কোন কাজ করানো যায় কিনা। হিলিয়ামের স্বভাবের যে সব 'গুণ' এ যাবৎ 'দোষ' বলে মনে করা হ'ত তাই নিয়েই গবেষণা করতে লাগলেন বিজ্ঞানীরা। দোষকে কি সত্যি সত্যি গুণ করা যায় না?

দেখা গেল, হিলিয়াম্ অসম্ভব রকম হাল্কা গ্যাস। এক হাইড্রোজেন ছাড়া অত হাল্কা গ্যাস পৃথিবীতে আর নেই। হাইড্রোজেনের একটা স্বভাব অতি সহজেই তাতে দপ্ করে আগুন ধরে যায়; অথচ হিলিয়াম্ এ দিক্ দিয়ে একেবারে নিরাপদ্। তাই হাইড্রোজেনের বদলে কোন কোন ক্ষেত্রে হিলিয়ামের ব্যবহার সুরু হ'ল। যেমন ধর, বেলুন বা জেপেলিনে হাইড্রোজেন ভরে দেওয়া হ'ত, তাতে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটত। সেখানে হিলিয়াম্ ভরে খুব সুফল পাওয়া গেল। হিলিয়াম্-ভরা বেলুন যাত্রী সমেত ৭২,০০০ ফুট উঁচুতে উঠে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিল।

শুধু তাই নয়,—এরোপ্লেনকে খুব উঁচুতে তুলতে হলে তাকে যতটা সম্ভব হাল্কা করা দরকার। এরোপ্লেনের চাকায় বাতাসের বদলে হিলিয়াম্ ভরে তার ওজন কম করে ২।৩ মণ কমিয়ে ফেলা সম্ভব হ'ল।

হিলিয়ামের অপর 'দোষ' তার নিষ্ক্রিয়তা। এটাও কি ক্ষেত্র বিশেষে মানুষের কাজে লাগানো যায় না? যায় বৈ কি। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সময়ে অনেক সময় অনেক জিনিষ দপ্ করে জ্বলে ওঠে। কল-কারখানায় এ থেকে সময় সময় মারাত্মক কাণ্ড ঘটতে পারে। যে সব ক্ষেত্রে এই রকম জ্বলে ওঠার ভয় আছে সেখানে আগে-ভাগে কিছু হিলিয়াম্ গ্যাস ছড়িয়ে দিলে সেই গ্যাস অনেকটা কম্বলের মত জায়গাটাকে ঘিরে রাখে অত সহজে জ্বলে উঠতে দেয় না। ম্যাগ্নেসিয়াম্, এলুমিনিয়াম্ প্রভৃতি ধাতুকে অন্য ধাতুর সঙ্গে মেশাবার সময় হিলিয়াম্ ব্যবহার করে এই রকম অগ্নিকাণ্ড রোধ করার ব্যবস্থা হ'ল।

এখন চিকিৎসাশাস্ত্রেও হিলিয়াম্‌কে টেনে এনেছেন বিজ্ঞানীরা। মরণাপন্ন রোগীকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে হিলিয়াম্-মেশান অক্সিজেন দিয়ে খুব সুফল পাওয়া গেছে। সাধারণ

বাতাসের চেয়ে ঢের ঢের লঘু হওয়ায় রোগীর পক্ষে এই "তৈরী-করা বাতাসে" শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া অনেক সহজ হয়েছে। অস্ত্রোপচারের সময়ও দাহ্য ওষুধপত্রে হিলিয়াম্ মিশিয়ে তাকে অনেকটা নিরাপদ করা গেছে। ল্যাবরেটারীতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রেও হিলিয়াম্ কম সাহায্য করছে না।

হিলিয়ামের মত তার দোসর আর ৪টি নিস্ক্রিয় গ্যাসকেও ছেড়ে দেন নি বিজ্ঞানীরা। কিন্তু সে গল্প আর একদিন হবে।

শিশুসাহিত্যিক-পরিচিতি

শ্রীসুকুমার দে সরকার :

জন্ম—২রা আগষ্ট, ১৯১০। জন্মস্থান কলকাতা।

ছাত্রজীবন সুরু হয় ভবানীপুর সাউথ সুবারবান্ স্কুলে। সেণ্ট জেভিয়াস্' কলেজ থেকে বি: এস্-সি পাশ করেন। পরবর্তী জীবনে ইনি চার্টার্ড্ য়্যাকাউণ্টেণ্ট হ'ন।

কর্মজীবনেও ইনি হিসাব পরীক্ষকের (অডিটর) পেশাই গ্রহণ করেছেন। কলকাতার একটি বিখ্যাত এঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের হিসাবপত্র বিভাগেরও ইনি প্রধান কর্মকর্তা।

অল্প বয়স থেকেই ছোটদের জন্য লিখতে সুরু করেন—অধুনালুপ্ত সন্দেশ, রামধনু, শিশুসাথী প্রভৃতি পত্রিকায়। জীবজন্তুর জীবন নিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গীতে লেখা এঁর গল্পগুলি বাংলা শিশু-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। এদিক্ দিয়ে ইনি অপরাজেয় বললেই চলে। শিশুসাহিত্য-পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির ইনি একজন সদস্য।

ছোটদের জন্য লেখা এঁর কয়েকখানি বইএর নাম— হিমের দেশে, হানাবাড়ী, অরণ্যরহস্য, দুই খুনী, নিশাচর, ২৪শে এপ্রিল চুপ, হলুদকুঠি, মনটা হুহু করে, ময়ূরকণ্ঠী বন, ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ইত্যাদি।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় :

জন্ম—বাংলা ১৩১৫ সাল। জন্মস্থান চন্দ্রভাগ গ্রাম, হাওড়া।

১৯২৩ সালে ম্যাট্রিক ও ১৯২৪ সালে জুনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করেন। পরে কলকাতার স্কটীশ চার্চ কলেজে ও বিহারের জী. বী. বী. কলেজে বি.এ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন।

কর্মজীবনে ইনি বহুদিন ফিল্ম-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চিত্রশিল্পী হিসাবেও এঁর কিছুটা খ্যাতি আছে। পরবর্তী জীবনে সাহিত্য ও সম্পাদনাই ইনি পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। নানা সাময়িক পত্রে এঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ-সাহিত্যেও এঁর খ্যাতি যথেষ্ট। এ ছাড়া অধুনালুপ্ত মাসিক জলছবি, সাপ্তাহিক রবিবার (শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সহযোগিতায়), সাহানা, রূপরেখা প্রভৃতিও সম্পাদনা করেছেন। বর্তমানে ইনি 'মৌচাক' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসাবে যুক্ত আছেন।

এঁর লেখা ছোটদের বই—সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায়, ওল্ড কিউরিয়সিটি শপ্, আধমণী ঘণ্টেশ্বর, অ্যাডভেঞ্চার অব্ মার্কোপোলো, ডেভিল্স্ আইল্যাণ্ড, নানা দেশের নানা গল্প, রামপড়ুয়ার পাততাড়ি প্রভৃতি। এ ছাড়া বিখ্যাত বিচার কাহিনী, সাকো প্রভৃতি বড়দের বইও ইনি লিখেছেন।

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র :

জন্ম—১১ই নভেম্বর, ১৯০৯। জন্মস্থান—কলকাতা।

ছাত্রজীবন সুরু হয় কাশীতে। সেণ্ট্রাল কাশী ইন্ষ্টিটিউশন্ ও য়্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুলে পড়ার পর কলকাতায় এসে জগদ্বন্ধু ইনষ্টিটিউশন্এ ভর্তি হন ও তার পর সেণ্ট জেভিয়াস্' কলেজ থেকে ছাত্রজীবন শেষ করেন।

কর্মজীবনে ইনি পুস্তক প্রকাশক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন। কলকাতার একটি বিশিষ্ট প্রকাশনা-ভবনের সঙ্গে ইনি যুক্ত।

সাহিত্যজীবন সুরু হয় ১৯২৯ সাল থেকে। ছোটদের ও বড়দের নানা সাময়িক পত্রে এঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে বড়দের সাহিত্যে ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প-লেখক হিসাবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করলেও শিশুসাহিত্যেও ইনি সমান অনুরাগী এবং ছোটদের জন্যও সমানে লিখে চলেছেন। ছোটদের জন্য অনুবাদ-গ্রন্থও লিখেছেন অনেক।

এঁর লেখা কয়েকখানা ছোটদের বই—বীর বালক, রাণা প্রতাপ, বিজ্ঞানের দান, বিদেশী গল্পসঞ্চয়ন, কাউণ্ট অব্ মণ্টেক্রিষ্টো, আরব্যোপন্যাস, ভিক্টর হুগোর গল্প, তরুণ গুপ্তের বিচিত্র কীর্তিকথা, সাহসের নেশা, কল্পলোকের কথা, দেশবিদেশে, পৃথিবীর ইতিহাস, দেশবিদেশের লেখাপড়া, গ্রীমদের গল্প, হ্যাণ্ডারসনের রূপকথা, ইউরোপের সেরা সাহিত্যিক প্রভৃতি।

—সেকালকার চিঠি—অনুতপ্ত পুত্র—

পুরোনো আমলের চিঠি—বিখ্যাত লোকদের লেখা কিংবা বিখ্যাত লোকদের কাছে লেখা চিঠি—পড়তে কেমন লাগে? আমার তো ভারী ভাল লাগে, মজাও লাগে।

ব্যক্তিগত চিঠির ভিতর দিয়ে আসল মানুষটির পরিচয়ও ফুটে ওঠে সময় সময়। এই রকম একখানা চিঠি থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি। চিঠিখানা লিখেছিলেন বিদ্যাসাগর মশাইএর ছেলে বিদ্যাসাগর মশাইকে, প্রায় ৭০ বছর আগে।

"...আপনি আমার প্রতি যতটুকু কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতেই আমি চরিতার্থ। মরণকালে ইহা ভাবিয়াও সুখে মরিব, যে পিতৃদেব অপরাধী অনুতাপযুক্ত সন্তানকে ক্ষমা করিয়াছেন। আপনার চরণে ক্ষমারই ভিখারী ছিলাম, কতবার পদতলে পড়িয়া কাঁদিবার বাসনা করিয়াছি। কিন্তু মহাশয় শোকসন্তপ্ত বলিয়া সাহস করি নাই। আমি আর ঐ চরণ ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। আমার হৃদয়ে যে ভাবটি শুষ্ক হইয়াছিল, সেই ভাবটি মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টিতে সরস ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। আর কি ছাড়িয়া থাকিতে পারি? আপনাকে কিছু মাত্র বিরক্ত করিব না, কর্তৃত্ব, ধন, কিছুরই আশা নাই, আশা পদতলে পড়িয়া থাকিব। মহাশয়ের তামাক সাজিব, বিছানা করিয়া দিব, জুতা মুছিব, বিদেশ গমন করিলে সঙ্গে মোট বহিয়া যাইব।...আপনার বাটীতে যাহাই হউক, আমাকে কেহ লাঞ্ছনা করুক, কাণ থাকিতে শুনিব না, চক্ষু থাকিতে দেখিব না।...আপনার পদসেবার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইব, সকল সুখে জলাঞ্জলি দিব, পূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য দেহ ও প্রাণ আপনার চরণে উৎসর্গ করিয়া রাখিব।

"আমি আপনাকে আর একটি নিবেদন করিব। যদি এক্ষণে একেবারে নিজের নিকট রাখিতে সম্মত না হয়েন, তবে আপাততঃ অপরের মত আমাকে স্কুলে একটি কিছু হউক কর্ম্ম করিয়া দিন।..."

– আর একখানা চিঠি—মাইকেলের—

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ফ্রান্স থেকে বিদ্যাসাগর মশাইকে যে সব চিঠি লিখেছিলেন তার একখানা থেকে কিছুটা তুলে দিচ্ছি। আসল চিঠিটা ইংরেজীতে লেখা, এখানে বাংলা তরজমা দেওয়া হ'ল।

আমার প্রিয় বন্ধু,

গত ২৮শে আগষ্ট রবিবার সকালবেলা আমি আমার ছোট্ট পাঠাগারে বসে আছি, এমন সময় আমার হতভাগিনী স্ত্রী অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে এসে বললেন, ছেলেরা মেলা দেখতে যেতে চাইছে, কিন্তু আমার হাতে মাত্র ৩টি ফ্রাঙ্ক আছে। ভারতের লোকেরা কেন আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন? আমি বললাম, আজ ডাক আসবার দিন, আজ নিশ্চয়ই কিছু খবর আসবে। কারণ যে লোকের কাছে আমি অবস্থা জানিয়ে চিঠি লিখেছি তাঁর জ্ঞান ও প্রতিভা প্রাচীন ঋষিদের মত, কর্মকুশলতা ইংরেজের মত এবং

মনটা ঠিক বাঙ্গালী মায়ের মত। আমি ঠিকই বলেছিলাম, কারণ এক ঘণ্টা পরেই ১৫০০ টাকা সমেত তোমার চিঠি পেলাম। হে মহাপ্রাণ, কীর্তিমান, পরম বন্ধু, কি বলে তোমায় আমার ধন্যবাদ জানাব! তুমি আমায় রক্ষা করেছ...।"

এ চিঠিখানা লেখা হয়েছিল আজ থেকে ৯৪ বছর আগে।

— রবীন্দ্রনাথের লেখা কি পড়েছ—

আর কয়েক দিন পরেই আসছে ২৫শে বৈশাখ মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়তো এখন থেকেই ঐ দিন রবীন্দ্র-জন্মোৎসব করবার জন্য তোড়জোড় সুরু করেছ। রবীন্দ্র-জন্মোৎসব এখন সরস্বতী পূজোর মতই পথেঘাটে দেখা যায়। কিন্তু এখানেও প্রায় সেই একই গলদ। সরস্বতী পূজোয় যারা অংশ নেয় তাদের অনেকেরই মা সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক খুব কম—এমন কি সরস্বতী পূজোর আমন্ত্রণসূচক যে সব চিঠি দেখি তার অধিকাংশই এত অশুদ্ধ ভাষায় ও অশুদ্ধ বানানে লেখা যে ঐ সব বর-পুত্রদের জন্য দুঃখ হয়। অনেকে সরস্বতী বা বীণাপাণি বানানটাও সঠিক জানে না। রবীন্দ্র-জন্মোৎসবেও, দেখি, যারা প্রধান উদ্যোগী তারা কবির লেখার সঙ্গে সামান্যই পরিচিত। আমার তো মনে হয় রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালনের সব চেয়ে প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়া। তোমরাও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবে। কিন্তু সত্যি তোমরা তাঁর লেখা পড় কি? এখানে রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে কয়েকটি করে লাইন তুলে দিচ্ছি। বল দেখি এর কোন্‌টি কোন্ বইএ বা কোন কবিতার মধ্যে আছে?

১। "সকাল বেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণ-মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমৎ কলিকাতার এক গলির ভিতর বসিয়া আফগানিস্থানের এক মরুপর্ব্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।"

২। "ঘুম হইতে উঠিবা মাত্র আমার কেমন মনে হইত যেন দিনটাকে একখানি সোনালি পাড় দেওয়া নূতন চিঠির মত পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কি অপূর্ব্ব খবর পাওয়া যাইবে।"

৩। "কালো কালো মলাটের রাঁড়ার যেন ওৎ পেতে রয়েছে টেবিলের ওপর। মলাটটা ঢলঢলে, পাতাগুলো কিছু ছিঁড়েছে, কিছু দাগী।"

৪ "সত্যরত্ন তুমি দিলে—পরিবর্ত্তে তার কথা ও কল্পনা মাত্র দিনু উপহার।"

৫। "স্থির তাহা নিশিদিন তবু যেন চলে, চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে"

৬। "ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে ভুলগুলি সব আন্ রে বাছা বাছা।"

৭। "আমি ভাবি আমি বুঝি পথের প্রহরী,
পথ দেখাইতে গিয়ে পথ রোধ করি।"

৮। "সেই সেকালের সন্ধ্যা মোদের সন্ধ্যা ছিল সত্যি,
দিন-ভ্যাঙ্গানো ইলেকট্রিকের হয় নিকো উৎপত্তি।"

৯। "ছাতার অবস্থাখানা, জরিমানা-দেওয়া মাইনের মতো,—বহু ছিদ্র তার।"

১০। "এখানে খুব লাগ্‌ল ভালো গাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয়,
আর ভালো এই হাওয়ায় যখন পাইন্‌-পাতার গন্ধ বয়।"

১১। "বাসুকীর শিরশ্চ্যুত বসুধার মত শূন্য হতে শূন্যে পাবে লোপ।"

১২। "আমি কইব মনের কথা তুই পারেরি সাথে,—
আধেক কথা দিনের বেলায়, আধেক কথা রাতে।"

১৩। "কে নিল খোকার ঘুম হরিয়া ?
মা তখন জল নিতে ওপাড়ার দীঘিটিতে গিয়েছিল ঘট কাঁখে করিয়া।"

১৪। "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।"

১৫। "নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর-বিহঙ্গেরা।"

(জবাব ৫৭ পৃষ্ঠায়।)

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

নববর্ষের প্রীতিসম্ভাষণ গ্রহণ ক'র। নতুন বছর তোমাদের প্রাণে নতুন উদ্দীপনা আনুক, আনুক নতুন দিনের আশ্বাস। সুখে, স্বাচ্ছন্দ্যে, আনন্দে মধুময় হয়ে উঠুক তোমাদের দিনগুলি। যা অন্যায় তাকে অন্যায় বলে বুঝতে শেখ—তাকে সহ্য ক'র না। যা সত্য, যা শিব, যা সুন্দর তাকেই গ্রহণ করতে শেখ।

দেখলে, কেমন সুন্দর একটা বাণী দিয়ে ফেললাম! কিন্তু তোমরা কি ভাবছ বলব ? ভাবছ—'এবারেও লেট্! এও অন্যায়। সহ্য করব না একে।' নয় কি ?

তোমরা হয়তো লক্ষ্য করেছ হঠাৎ বাজারে কাগজের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। মনের মত কাগজ তো পাওয়াই যাচ্ছে না, যে কাগজ নিতে মন সায় দেয় না তাও যোগাড় করা রীতিমত কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। বল দেখি, এমনটা হলে কি করে রামধনুকে মনের মত করে সাজাই ? তবু, আশা করি, নতুন বছরের রামধনু পেয়ে তোমরা খুসীই হবে।

এ সংখ্যায় যে সব লেখা দেবার ইচ্ছে ছিল শেষ পর্যন্ত সব কুলিয়ে উঠল না ; বারান্তরের জন্য তোলা রইল সেগুলি। নতুন উপন্যাসখানিও আগামী মাস থেকেই সুরু করব ভাবছি।

ইতিমধ্যে যে সব চিঠি জমে গেছে তার জবাব দেওয়া যাক্। তোমাদের নববর্ষের শুভেচ্ছা-জ্ঞাপক চিঠিও অজস্র পেয়েছি। অন্তর থেকে লেখা সে সব চিঠি, খুসী না হয়ে উপায় আছে ?

শ্রীকৃষ্ণা সুর (কলিকাতা-৪)—বারোয়ারী উপন্যাসের জন্য লেখা আরও বেশী বেশী চাই। একবার না বেরোলে ক্ষতি কি ? পরের বার তো বেরোতে পারে! গল্পের মোড় এবার সত্যি ফেরান দরকার যে! শ্রীমুরারিমোহন মণ্ডল (চন্দননগর)—আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক বাদ বড় জটিল ব্যাপার। রামধনুতে ও সম্বন্ধে আলোচনা চলে না। তোমার প্রশ্নের জবাব তোমাদের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করলেই ভাল জানতে পারবে। ডাঃ বসু তো ওর জন্যই এফ্. আর. এস্ হ'লেন। তাঁর গবেষণার স্বীকৃতির সেই তো প্রমাণ। শ্রীহারাণচন্দ্র সরদার (বৈঁচবেড়িয়া)—ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠকে কেবল মাত্র গ্রাহক-গ্রাহিকারাই লিখতে পারেন। অন্যদের জন্য তো সাধারণ বিভাগ আছেই। লেখা সম্পাদকের নামে কাগজের এক পিঠে লিখে পাঠাতে হয়, আর সেটা যতটা সম্ভব ছোট হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শ্রীঅলোক গুপ্ত (কলিকাতা-২৬)—তুমি বৈজ্ঞানিক হাতের কাজ সম্পর্কীয় লেখা চাও জেনে খুসী হলাম। শীগ্‌গিরই ঐ রকম লেখা দেবার চেষ্টা করব আর সেই সঙ্গে তোমার ফরমাস মত গড়গড়া গাঙ্গুলীকেও ডাকব গল্প শোনাতে। শ্রীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ([illegible])—তোমার ঠিকানা ৬৩ লেক রোড ? ভুল করে প্লেস ছাপা হয়েছে ? বেশ তো, সংশোধন করা যাচ্ছে। কিন্তু তোমার চিঠিটায়ও কি তাই ছিল ? তোমাদের পত্রিকার নাম কাঁচা হাতের 'কাগজ', 'লেখা' নয়। এ ভুলটা অবশ্য আমাদেরই। শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্তী (কৃষ্ণপুর)—তুমি যে শিল্পীর নাম জানতে চেয়েছ তিনি হচ্ছেন ৺ফণিভূষণ গুপ্ত। ছোটদের ছবি আঁকতে তাঁর ছিল অসামান্য দক্ষতা। কিন্তু তিনি আর নেই। রামধনু তোমাকে আনন্দ দিয়েছে এও তো একটা আনন্দ-সংবাদ। শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় (গড়বেতা)—শিশুসাহিত্য-পরিষদ্ই বোধ হয় বাংলা দেশের সমস্ত শিশুসাহিত্যিকদের মেলামেশার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এর নির্বাচন প্রতি বছরই হয়। প্রতিষ্ঠার বৎসরে এর সভাপতি ছিলেন শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তোমাদের সম্পাদক মশাইও সুরু থেকে পর পর আট বছর এর সম্পাদক ছিলেন। ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র বালীগঞ্জের স্থায়ী বাসিন্দা, তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে ভাগলপুরে। আবু কায়ছার (টাংগাইল)—শিশুসাহিত্যিক-পরিচিতি এবারে পাবে। গ্রাহকদের আঁকা ছবি উপযুক্ত বিবেচিত হলে নিশ্চয়ই ছাপা হবে। এর আগেও অনেক হয়েছে। শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত (ভাগলপুর) নেতাজীকে কেউ কখনও ভুলতে পারে ? তাঁর সম্বন্ধে রামধনুতে

আগে অনেক বেরিয়েছে। পড় নি? বাংলা, ইংরেজীতে ওঁর সম্বন্ধে, আত্মজীবনী ছাড়াও, অনেক বই আছে। শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 'আমার বন্ধু সুভাষ' একখানা খুব ভাল বই। শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ সান্যাল (কলিকাতা-৪)—তোমার চিঠিখানা বোধ হয় ডাকের গোলমালে ঠিক মত আসে নি। এবারে নাম ছাপা হ'ল। শিশিরকে জলে ডোবানো একটু কষ্ট-কল্পনা নয় কি? শ্রীরুনঝুন্ দাশগুপ্তা (কলকাতা-২৬)—তোমার নববর্ষলিপির ছবিতে সূর্যোদয় ভারী ভাল লাগল। ছবিটা যত্ন করে রেখে দিলাম। শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা-৪০)—তোমার পরীক্ষার খবরে খুসী হ'লাম। রেডিও-শ্রবণকাহিনী এবং অন্যান্য খবরেও বেশ আনন্দ পেলাম। তোমার মুখে বেশ একটা বিজ্ঞ-ভাব কল্পনা করেও মজা লাগছে। শ্রীশ্যামশ্রী সেন (নিউ দিল্লী)—তোমার চিঠির জবাব কবির ভাষাতেই দেই—"মনেরে আজ কহ যে, ভাল-মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে নাও সহজে।"

কিন্তু আজ এখানেই শেষ। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও কিন্তু।

—তোমাদের সম্পাদক মশাই।

যে গল্প জানা নেই

(গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা বারোয়ারী উপন্যাস)

শ্রীকল্যাণকুমার সেনগুপ্ত

— আঠারো —

প্রথমটা কি হ'ল গোপাল বুঝতে পারে নি, বুঝল একটু পরেই। লোহার শিক বোঝাই একটা লরি আসছিল রাস্তার ডান দিক্ থেকে। সুমিতদের গাড়ীকে পাশ কাটিয়ে আগে বেরিয়ে যাবার মতলব ছিল তার, কিন্তু তাল রাখতে পারে নি—খচাং করে এসে ধাক্কা দিয়েছে। আর তারই একটা শিক একেবারে সুমিতের কপালে বিঁধে গেছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে সুমিত।

লরিওয়ালা পালাবার চেষ্টা করছিল, রাস্তার লোকেরা তাকে ধরে ফেলল। দু'-এক জন এগিয়ে এসে দু'-চার ঘা চড়-চাপড় দিতেও কসুর করল না। পুলিশ এসে নম্বর টুকে নিল। গোপাল হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। কি করবে কিছুই ঢুকছিল না তার মাথায়। রাস্তারই একজন ভদ্রলোক বললেন, "শীগ্‌গির হাসপাতালে নিয়ে যাও।"

ড্রাইভার দ্বিরুক্তি না করে তীব্রবেগে ছুটিয়ে দিল গাড়ী।

এতক্ষণে গোপালের হুঁশ হয়েছে। তার বন্ধু সুমিত গুরুতর রূপে আহত। সঙ্গে দরোয়ান আর ড্রাইভার থাকলেও দায়িত্ব এখন সম্পূর্ণ তারই। এখন ঘাবড়ালে চলবে না তো!

সুমিতের অচেতন দেহটার দিকে তাকাতেই কোথা থেকে যেন একটা অপরিসীম সাহস—আশ্চর্য মানসিক বল জেগে উঠল গোপালের মনে। পাড়াগাঁয়ের ছেলে গোপাল নির্ভয়ে তার বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল। গাড়ী ধীরে ধীরে অপরিচিত হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়ল।

ষ্ট্রেচারে করে সুমিতকে নিয়ে গেল হাসপাতালের লোকেরা। ওপরে ডাক্তারেরা তার চিকিৎসার ভার নিলেন। গোপাল তাড়াতাড়ি সুমিতদের বাড়ীতে একটা টেলিফোন করে দিল।

সুমিতের আঘাত খুব গুরুতর নয়, কিন্তু ভোগান্তি আছে। ২।৩ দিনের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল সে। কিন্তু এখনও দীর্ঘদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হবে। দস্তুর মত শুশ্রূষাও দরকার।

বড়লোকের ছেলে, ডাক্তার-নার্সের অভাব নেই, তবু গোপাল নিজেই যাচিত হয়ে ভার নিল সুমিতের শুশ্রূষার। মন-প্রাণ দিয়ে সে এমন ভাবেই বন্ধুর বিছানার পাশে বিনিদ্র রজনী কাটাতে লাগল যে সুমিতের মা পর্যন্ত অবাক্ হয়ে গেলেন। তিনি নিজেও বোধ হয় এতটা পারতেন না।

সুমিত ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু গোপাল এই সুযোগে আর একটি লোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেল। সে আর কেউ নয়—সুমিতের দিদি দীপা। (ক্রমশঃ)

ভোরের পাখী

শ্রীরত্নাবলী ভট্টাচার্য্য

ভোরের পাখী, ভোরের পাখী.
নীল আকাশে পাখ্‌না মেলে
মিষ্টি সুরে গায় একাকী।
ঘুমভাঙানী ভোরের পাখী!

আকাশ কোণে, সবুজ বনে
যায়—উড়ে যায় ভোরের পাখী;
সোনায় ধোয়া আলোর ছোঁয়া
কোমল তাহার অঙ্গে মাখি'।

সবার চোখে ভোর আলোকে
রোদের কণা ছুঁইয়ে রাখি'
মেঘের ফাঁকে, মধুর ডাকে
পালিয়ে বেড়ায় ভোরের পাখী।

সোনার ভোরের সোনার পাখী।
আলোর পাখী!
ভোরের পাখী!!

৫৩-৫৪ পৃষ্ঠার জবাব :—

১। কাবুলিওয়ালা (গল্পগুচ্ছ) ২। জীবনস্মৃতি ৩। ছেলেবেলা ৪। উৎসর্গ (কথা ও কাহিনী) ৫। নিস্ফল উপহার (মানসী) ৬। সবুজের অভিযান (বলাকা) ৭। আশীর্ব্বাদ (গীতালি) ৮। যোগীন দা (ছড়ার ছবি) ৯। বাঁশি (পরিশেষ) ১০। শিলংএর চিঠি (পূরবী) ১১। বিসর্জ্জন ১২। ইছামতী (শিশু ভোলানাথ) ১৩। ঘুমচোরা (শিশু) ১৪। গীতাঞ্জলি ১৫। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ (ক্ষণিকা)।

সমাধান

ভাবছে মাসী, ভাবছে পিসি,
ঠাকমাও সেই সাথে,
দিদি এবং মামীরাও
হাতটি দিয়ে মাথে।
কালকে খোকার হাতেখড়ি
ভাবনা তো সেই নিয়ে,
খড়ি, শেলেট্ পাতা অচল
হবেই বা কী দিয়ে।
এ যুগেতে, কালি তো চাই
করছে ভালো কারা,
ভাব্‌ছে সবাই ঘামিয়ে মাথা
মা-তো ভেবেই সারা।
বাবা শুনে হেসে যে কন
ভাবছো কেন সবে,
খোকনবাবুর হাতেখড়ি
'সুলেখা'তেই হবে।

খেলাধূলার খবর

কলকাতায় ১ম বিভাগের হকী লীগ্ : এবারেও মোহনবাগান অপরাজিত থেকে পর পর চার বছর অপরাজিত লীগ্ বিজয়ের গৌরব অর্জন করল। রানার্স আপ্ হ'ল মহমেডান স্পোর্টিং।

বোম্বাইএ জাতীয় হকী প্রতিযোগিতায়ও গত বারের বিজয়ী ভারতীয় রেলওয়ে দল ফাইনালে বোম্বাই দলকে হারিয়ে আবার চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছে। শেষ সংবাদ : মোহনবাগান এবার বাইটন কাপ্ও বিজয়ী হয়েছে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

দাদুর সেই বন্ধুটির জন্মের তারিখ ছিল ২৯শে ফেব্রুয়ারী। তাই কেবল মাত্র লীপ্ ইয়ারেই তাঁর জন্মদিন পালন করা সম্ভব হ'ত, অন্য বছরে নয়। এই জন্যই ৮৪ বছর বয়সেও তাঁর জন্মদিন হ'ল ২১তম।

উত্তরদাতাদের নাম : বীরেন্দ্র, ছবি, মণ্টু, ঘণ্টু, বাবলা, দিলু, কাকা, রমলা (নিউ দিল্লী); কৃষ্ণা সুর (কলিকাতা-৪); জয়া রায় (আইজটনগর): অমিতাভ, জয়ন্ত, মুকুলিকা ঘোষ

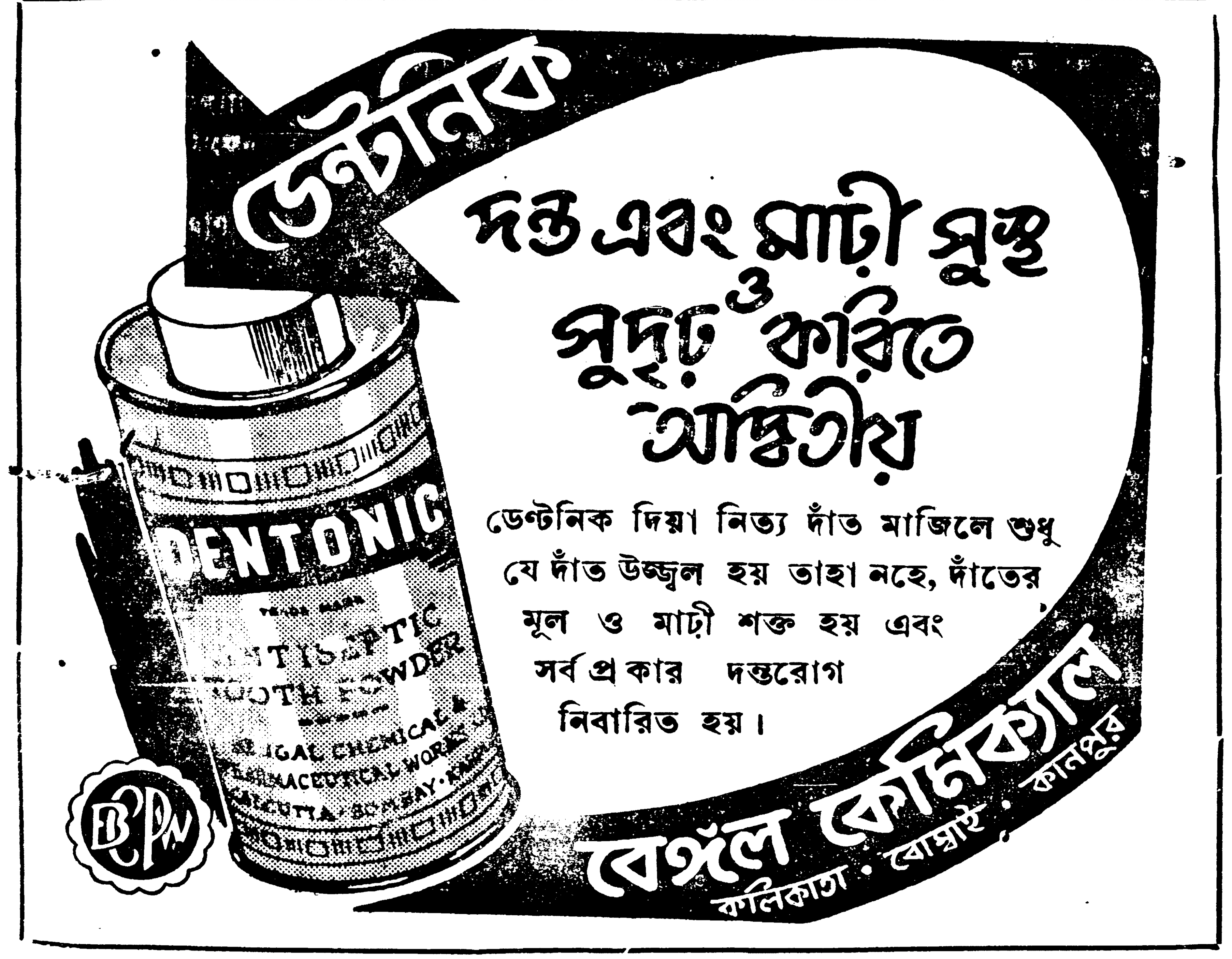

(কলিকাতা-২৫) ; শিকুল, সুস্মিত, স্পুটনিক, টুমা ও সব্যসাচী চক্রবর্তী (ঔরঙ্গাবাদ) ; চম্পা দেবী, সুমিত্রা দেবী, জয়ন্তকুমার, বিমলকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা-৪০), অমিতাভ ও অশোকনাথ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর) ; মুরারিমোহন মণ্ডল (চন্দননগর) ; সঞ্জয় চন্দ (শিলং) ; বিষ্ণুপ্রসাদ সান্যাল (কলিকাতা-৪) ; শৈলেন্দ্রকুমার দত্ত (শ্রীরামপুর) ; সুগত সেনগুপ্ত (কলিকাতা-২৬) ; দিলীপকুমার সমাজদার (কলিকাতা-১২) ; আয়েষা ও আবুল ফজল (ঢাকা) ; কল্যাণী চক্রবর্তী (আগরা) ; সীমা ও সতী (পাটনা) ; কল্পনা বসু (বনারস) ; রাজলক্ষ্মী দেবী (কটক ;)।

নূতন ধাঁধা

নীচের লেখাগুলি কিছু বুঝতে পারছ না তো ? আচ্ছা, এক কাজ কর। ১, ২, ৩…১৯ ইত্যাদি সংখ্যাগুলির জায়গায় একটি ক'রে ভৌগোলিক নাম বসিয়ে দাও দেখি। মাঝে মাঝে পছন্দমত ছেদচিহ্নও বসাতে পার। এবার দেখ পড়া যায় কিনা। যদি সবটা পড়তে পার তবে লিখে পাঠাও (সঙ্গে গ্রাহক নং উল্লেখ করে) ।

রাজা মৃ১য়। ২না দেন। রাজ্য৩ বেদখল হয়। মনের অসন্তোষ ক্রমেই ৪। এখন আর ৫ঢাকি নেই। না বা৬, গবু৭ভাগির মধ্যে নেই। আর ট৮ মিষ্টি মিষ্টি নয়, এবার ঝাল ৯ থেকে বেরিয়েই তিনি অবি১০তে থাকেন মনে মনে স্বপ্ন১১। সেখানে বাঁধছে যে ১২তে তাকে হ১৩ এর তলায় নয়, রসের ওপরে। "হার১৪, কি যায় আসে, যদি খেল১৫, কিন্তু যদি হয় রে ১৬ বেগে তোর আশা।" ১৭ম-সে গান ধরলেন মন্ত্রীবর। এদিকে সামনে যে ছিল একটা ১৮ তার খেয়াল নেই। ১৯র কি হ'ল না বলাই ভাল।

আগামী সংখ্যা থেকে **আরও একখানি নতুন উপন্যাস** ধারাবাহিক ভাবে রামধনুতে প্রকাশিত হবে।

শ্রীচরণেষু

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

* নতুন আদর্শ এবং পরিকল্পনা নিয়ে প্রতি মাসে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
* প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকদের রচনায় প্রতি সংখ্যা সুসমৃদ্ধ।
* ষাণ্মাসিক চাঁদা ১৷৹ এবং বার্ষিক ৩৲। যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া চলে।

অন্যান্য বিষয়ের জন্য পত্রালাপ করুন।

'শ্রীচরণেষু' কার্য্যালয়,
৪বি, রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৫
ফোন : ৫৫-৪০৪৬

লে—খা—চা—ই

অভিনব কিশোর-মাসিক। ২য় বর্ষ (১৩৬৫—বৈশাখ হইতে)। বার্ষিক, সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸৵০, প্রতি সংখ্যা।১০, নমুনা বিনা মূল্যে।

—শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল, সম্পাদক ; দেবালয়—২৪পরগণা

তোমাদের নিতি সঙ্গী

সুনির্মল বসু রচিত জীবনী-গ্রন্থমালা। এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে
১। রামমোহন, ২। বিদ্যাসাগর, ৩। মধুসূদন,
৪। শ্রীরামকৃষ্ণ, ৫। বঙ্কিমচন্দ্র।
প্রতিটি বই ১·০০ ॥

* ছড়া ছবি রূপকথা গল্প উপন্যাস *

মনোজ বসু	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
যুগান্তর ২·০০	ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব ১·২৫
পরিমল গোস্বামী	সুভাষ মুখোপাধ্যায়
আষাঢ়ে দেশে ১·০০	দেশ-বিদেশের রূপকথা ২·৫০
প্রবোধকুমার সান্যাল	অমরেন্দ্রকুমার সেন
দুর্গমের ডাক ১·৫০	ডাকটিকিট ১·২৫
চারুচন্দ্র চক্রবর্তী	বিক্রমাদিত্য
গল্প লেখা হল না ১·৫০	খুনী দরওয়াজা ১·৫০
যামিনীকান্ত সোম	আশা দেবী
পুথিপুরাণের গল্প ২·০০	ঘুমতি নদীর ঢেউ ১·০০
তেজেশচন্দ্র সেন	মৌমাছি
হারানো ছেলে ১·২৫	টুনটুনি আর ঝুনঝুনি ২·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র	রেবতীভূষণ ঘোষ
কুহকের দেশে ২·২৫	সবুজ টিয়া ০·৭৫

জানবার কথা

দশ খণ্ডে 'বুক অব নলেজ'। সহজ ভাষা, সুপরিকল্পিত বিষয়বিন্যাস, উপযোগী চিত্র। মতামত : "বিষয় নির্বাচন উত্তম হয়েছে, এক-একটি বিজ্ঞান ও শিল্পের বিস্তর তথ্য না দিয়ে বাছাবাছা উদাহরণ দিয়েছেন।… বর্ণনার পদ্ধতিও ভাল, ছেলেবুড়ো সকলেই উপভোগ করবে।" রাজশেখর বসু ॥ "প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীর পড়ার টেবিলে স্থান পাবার মতো বই।" নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥

সম্পাদনা : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রতি খণ্ড ২·৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ॥৹ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১॥৹ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বিএ

সুরিনা স্পেশাল
কালি
স্থায়ী কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রীজ • কলিকাতা

বিশুদ্ধতায়, স্বাদে ও গন্ধে
অতুলনীয়

লক্ষ্মী ঘি

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর সর্ব্বত্র
সমাদৃত

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষায় অদ্বিতীয়

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন-২২-৭২৪৩

রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩০শ বর্ষ

১৩৬৪

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

রামধনু কার্য্যালয়
১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫
ফোন : ৪৮-৩১৮১

বার্ষিক ৪ টাকা | প্রতি সংখ্যা ৩৭ ন. প. | ষাণ্মাসিক ২.২৫ টাকা

রামধনু

বার্ষিক সূচী (বর্ণানুক্রমিক)

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
অকালে রেনি ডে	(কবিতা)	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	৩৮৪
অঙ্ক মাথায় ঢুকবে না তা করব কি ?	(ঐ)	শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ	৫৯৬
অভিমান	(ঐ)	" জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য	৮১
অমুর অভিযান	(ঐ)	" বেণু গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ	৩৫৩
আজব কাণ্ড	(সচিত্র)	...	৪২৯
আজব চুল দাড়ি গোঁফ	(প্রবন্ধ)	" অমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্	৫৪০
আজব নেশা	(কাহিনী)	" অজিতকুমার তারণ	৪৫৯
আফগানিস্থানের ফুটবল খেলা	(খেলাধূলা)	অধ্যাপক শ্রীঅমলকুমার মিত্র, এম্. এড	৪৭৯
আফ্রিকার জুজু	(প্রবন্ধ)	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি এল্	১৪৮
আমাদের সংবাদপত্র বিভাগ		...	৬০, ৩৮৯, ৬৩৪
ইচ্ছাপূরণ	(গল্প)	শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী	৫৪১
ইন্দোচীনের গল্প	(ভ্রমণ)	শ্রীঅজিতকুমার তারণ	১১
ইংরেজী বারের নাম কোথা থেকে এল		..	৩৭৬
উদয় মাঝারে অস্ত	(কবিতা)	শ্রীহিমালয়নির্ঝর সিংহ	৪৭৮
একখানি ফটো	(গল্প)	সৈয়দ আব্দুল বারি	১০৪
একজন নতুন ধরণের শিল্পী	(সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	১৬৭
একটি সত্যিকার বাঘের গল্প	(শিকার-কাহিনী)	" এস্. ডি. মুখার্জ্জী	৬১২
এক যে ছিল	(সচিত্র কবিতা)	শ্রীচণ্ডী লাহিড়ী	২৯৬
এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেস	(প্রবন্ধ)	শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস্-সি	৫৬২
কেলো ভুলো	(গল্প)	" জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী	২০
কেশকলাপ	(ঐ)	" অরবিন্দ গুহ	৫৯০
খেলাধূলা	(খেলাধূলা)	" অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য্য	৯২১
খেলোয়াড়দের কাহিনী	(ঐ)	অধ্যাপক অমলকুমার মিত্র. এম্. এড্	৫৭৮
খোকন এলে	(কবিতা)	শ্রীআদিত্যনাথ মিশ্র	৪৪৯
খোকনমণি	(কবিতা)	সৈয়দ আব্দুল বারি	২৫৪
গড়গড়া গাঙ্গুলীর গল্প	(গল্প)	শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়	১৩৩, ৪৯৪
গান ভাসাস প্রাণ	(গল্প)	" আশা দেবী, এম্. এ, বি. টি	৩২০
গানের আসর	(কাহিনী)	" ইন্দিরা দেবী	২৯৭
গোপাল ভট্ট	(জীবন-কথা)	শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৬৪
ঘুম পাহাড়ের বাড়ী	(কবিতা)	" উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	৪৩৯
চন্দ্র বাবুর ব্রিজ	(গল্প)	" কল্যাণী দেবী	৩৪৪
চল দিল্লী	(ভ্রমণ)	" কুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস্-সি	৩৬১
চলো ভাই চাঁদে যাই	(বিজ্ঞান)	ঐ	৪২১
চিঠিপত্র			৬২, ১২০, ১৭৫. ২২৬, ২৭৬, ৩৩৭, ৩৮৭, ৪৩৬, ৪৮০, ৫২৯, ৫৭৯, ৬৩৭
চিরদিনের বোনটী	(কবিতা)	৺ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৮৩
জগত্তারিণী সুবর্ণ পদক প্রাপ্তিতে	(কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৪৮৫
জিজ্ঞাসা	(ঐ)	" নবগোপাল সিংহ	৫৩৩
ঝন্ ঝন্ ঝন্	(সত্য কাহিনী)	" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২৮১
ঝুম্‌না বনে	(কবিতা)	" সুচেতা ভট্টাচার্য্য	৫৭১
টিকিট কোথায়	(নাটিকা)	" সমর চট্টোপাধ্যায়	৪৯৭
টেলিফোনেও এল ছবি	(বিজ্ঞান)	" ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	২২৪
ট্রেন ছুটে যায় সাগর-জলে	(দেশবিদেশ)	" মাধব পাল	১৮৫
তটস্থ	(কবিতা)	" অলক চক্রবর্ত্তী	৫০৯
তাসের রাজা তাসের রাণী	(ম্যাজিক)	যাদুকর এ. সি. সরকার	৪৭৭
তিন চোর	(গল্প)	শ্রীযামিনীকান্ত সোম	৯৪৪
তুষারতীর্থ শ্রীকৈলাস	(ভ্রমণ)	তীর্থঙ্কর	৪৬৮, ৫২০, ৫৫৫, ৫৮৫
দক্ষিণারঞ্জন স্মরণে	(কবিতা)	শ্রীপলাশ মিত্র	৩৬
দাস রঘুনাথ	(জীবনকথা)	" পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৩১৫, ৩৫৪, ৩৯৬. ৪৫০, ৪৯০
দেবতার রোষ	(গাথা)	বন্দে আলী মিয়া	৩৫২
দৃষ্টির বাইরে	(গল্প)	শ্রীরেণুকা দেবী	২৪৫
ধরিত্রীর সৃষ্টি	(গল্প)	শ্রীতপনকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫৭২
ধাঁধার উত্তর			৬৩, ১২২. ১৭৮, ২২৭, ২৭৮, ৩৩৭, ৩৯০, ৪৩৮, ৪৮৪. ৫৩১ ৫৮১, ৬৩৯
নতুন দিনের প্রার্থনা	(কবিতা)	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্ এ	৩৫
নতুন বই	(সমালোচনা)	...	৫৫, ২১৮, ৩২৫, ৪৭৩
নববর্ষ	(কবিতা)	স্বপনবুড়ো	১
নববরষায়	(রূপক)	বেগম জেবু আহমদ	১৫৩
নানা প্রসঙ্গ	(প্রবন্ধ)	শ্রীকৌটিল্য	১৩৭
নালন্দা	(ভ্রমণ)	" ধীরেন্দ্রলাল ধর	২৪০, ৩১২, ৩৪০, ৪৯৪
নীল পায়রা	(গল্প)	" অরবিন্দ গুহ	৪০১
নূতন ধাঁধা			৬৩, ১২২, ১৭৮, ২২৮, ২৭৮, ৩৩৮, ৩৯০. ৪৩৮, ৪৮৪, ৫৩২, ৫৮২, ৬৪০

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
পথিক মেঘের দল	(ভ্রমণ)	শ্রীআশা দেবী, এম্. এ, বি টি	২৪, ১০১, ২৫০
পল্‌টুর পরামর্শ	(গল্প)	" রবিদাস সাহা রায়	৪৩১
পলটুর পলায়ন	(ঐ)	" খগেন্দ্রনাথ মিত্র	১৯৩
পাহাড়ী	(গল্প)	" সুকুমার দে সরকার	২২০
পাঁচমিশেলী		" ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	৫৮, ১১৫, ২৬৯, ৩৩২, ৪৮৯, ৫৭৫, ৬৩৭
পিস্তল	(গল্প)	শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্. এ	৩২৬
পুতুলের বিয়ে	(গল্প)	" সাধনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত, এম্. এ	৫৯৯
পুরস্কার-প্রতিযোগিতা		...	৬৩জ, ১২২ক, ১৭৭খ, ৩৩৭ঘ
পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল		...	৩৩৫, ৫২৬
পূজার পদ্য	(কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	২৭৯
পুজোর চিঠি	(ঐ)	" প্রভাকর মাঝি	৩২৪
প্রজাপতি	(ঐ)	ডক্টর বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্. এ পি. আর. এস্ ডি. লিট্	৩৯১
প্রতিশোধ	(ঐ)	শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস	৪২৮
প্রফেসর হোঁদারামের ডায়েরী	(গল্প)	শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু	৬, ৯৬
প্রবাদের ছবি	(সচিত্র)	...	৫৬১, ৫৬৬
প্রেসিডেন্ট ডাঃ হো. চি. মিন্‌হ	(জীবনকথা)	শ্রীঅজিতকুমার তারণ	৬০৯
বইয়ের যত্ন	(প্রবন্ধ)	" বিনায়ক সেন	৫৫৯
বনবেড়ালী	(সচিত্র কবিতা)	" রেবতীভূষণ ঘোষ	৩২৩
বাবরের গল্প	(ইতিহাস)	" জয়দেব রায়, এম. এ	১৩৭
বাংলার মন্দির	(সচিত্র)	...	৩৫০
বিজ্ঞানের টুকিটাকি	(বিজ্ঞান)	শ্রীকৌটিল্য	৩০০
ব্যাংএর ছড়া	(ছড়া)	" উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	২৫৯
ভট্ট রঘুনাথ	(জীবনকথা)	" পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৯২
ভয়ে কি না হয় !	(গল্প)	" শামুক	২৩০
ভাগ্যিস	(সত্য ঘটনা)	" জয়দেব রায়, এম্. এ	৩৫১
ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক			৫৩, ১১১, ১৭৬ ২২২, ২৭৩, ৩৩৬, ৩৮৫, ৪৩৫, ৪৭৫, ৫২৭, ৫৮০, ৬৩৩
ভৈরব-শঙ্করী	(গল্প)	৵ সতীশচন্দ্র ঘটক	৪৮
মগজের গল্প	(বিজ্ঞান)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	৬২৪
মজার ম্যাজিক	(ম্যাজিক)	যাদুশ্রী শঙ্কর দাস	৩১৮, ৫০৮, ৬১৬
মনোরঞ্জন-স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা		...	৬২৯

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
মনোরঞ্জন-স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল		...	২২০
মন্দিরে মন্দিরে	(ভ্রমণ)	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	৩৩, ৭২, ১৪০
মহাকালের অভিশাপ	(উপন্যাস)	" অপূর্ব্বমণি দত্ত	৩৬৫, ৩৯২, ৪৪২, ৫০৪, ৫৩৫, ৫৯৭
মৎস্য-পুরাণ	(গল্প)	" বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৭
মানুষের গল্প	(ঐ)	" আশাপূর্ণা দেবী	৩০৫
মুকুন্দ ভট্টর পুঁথি	(উপন্যাস)	" অপূর্ব্বমণি দত্ত	৩, ৭৮
মুক্তি	(গল্প)	" উৎপল সেনগুপ্ত	৫৬৭
মুর্শিদাবাদে	(ভ্রমণ)	শ্রীকৃষ্ণা সুর	৬২০
মৌসুমী	(কবিতা)	" দীপালি সেনগুপ্তা, এম্. এ	১৭৯
ম্যাজিক শেখ	(ম্যাজিক)	যাদুকর এ. সি সরকার	৪৭, ১৫৫
ম্যাজিক শেখ	(ঐ)	যাদুরাজ এস. ডি. মুখার্জ্জী	১৯০, ৪৩০
ম্যাজিকের খেলা	(ঐ)	যাদুশ্রী শঙ্কর দাস	২০৬
যুদ্ধ ও শান্তি	(ইতিহাস)	শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	৪৫৫
যে না জানে টিপের ঘা	(রূপকথা)	" ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি. এ	৪৬৯
রকেটে আকাশ জয়	(বিজ্ঞান)	" রজত চন্দ	৫৪৭
রবিনসন ক্রুশো রচয়িতা ডিফো	(জীবনী)	" অমলশঙ্কর রায়	৩৫৬
রবিন্সন ক্রুশোর ছায়ায়	(প্রবন্ধ)	" ঐ	৫১৪
রসময় ভাদুড়ী	(গল্প)	" শামুক	৬১৮
রামকৃষ্ণ-স্তুতি	(গান)	" শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৫৭৪
রামধনুর দাদু	(জীবনকথা)	" মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য	৯০
রায় বরুয়ার শিকার-কাহিনী	(গল্প)	ডক্টর হিরণ্ময় ঘোষাল	১৫, ৮২, ১২৫, ১৮১, ২৩৩, ২৮৫
রূপ ও সনাতন	(জীবনকথা)	শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৮, ৬৬
রূপকথার দক্ষিণারঞ্জন	(কবিতা)	" নগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার	৩৬
রূপকথার যাদুকর দক্ষিণারঞ্জন	(জীবনকথা)	" ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	৪৯
রুশ বিজ্ঞানী মেনডেলীফ	(বিজ্ঞান)	অধ্যাপক সুবর্ণকমল রায়, এম এস্-সি	৫২২
রেড ইণ্ডিয়ানদের দেশে	(ভ্রমণ)	শ্রীমঞ্জুশ্রী বসু (মিত্র)	১৯৮
লাল গাঁ : আষাঢ়ী রূপকথা	(কবিতা)	" অরুণিমা সেনগুপ্তা	১২৩
লাল শঙ্খ	(উপন্যাস)	" মণিলাল অধিকারী	৩৭, ১০৬, ১৬৩, ২০৮, ২৬০, ৩৭৭, ৪১০, ৪৪৬, ৪৮৬
শরৎ এলো	(কবিতা)	" পূর্ণেন্দু মল্লিক	২৮৪

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
শান্তির প্রস্তাব	(গল্প)	শ্রীঅজিতকুমার তারণ	৫৫৯
শিবাজীর অভিনয়	(নাটিকা)	" যামিনীকান্ত সোম	৪৯৯
শিশুসাহিত্যিক-পরিচিতি	...		৫৬, ১১৪, ১৭৪, ২১৯, ৩৮৩, ৪৩৭
শুভলগন	(কবিতা)	স্বপনবুড়ো	৩১১
শেষ বর্ষণ	(ঐ)	শ্রীদীপালি সেনগুপ্তা, এম্. এ	২২৯
শ্রীজীব গোস্বামী	(জীবনকথা)	" পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৫৭
সন্ধ্যা ঘনায় কোথায় কেমন	(কবিতা)	" নবগোপাল সিংহ	২০৫
সবুজ চিঠি	(ঐ)	" দীপালি সেনগুপ্তা, এম্. এ	৩৩৯
সিংহের গল্প শোন	(সচিত্র প্রবন্ধ)	" ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	৩৬৯
সুখময় বাবুর সুখ্যাতি	(গল্প)	" রবিদাস সাহা রায়	৮৬
সুরযাত্রুকর বিঠোফেন	(জীবনী)	" নীলিমা চক্রবর্ত্তী, বি. এ	৫২৪
সেই বনের গল্প	(গল্প)	" সুকুমার দে সরকার	২৫৫
সোনামণি যাদুমণি	(কবিতা)	" প্রভাকর মাঝি	৬৫
স্মৃতির পটে	(স্মৃতিকথা)	" বিজয়কান্ত রায় চৌধুরী, এম. এ	৪০৭, ৫১৬
হাটতলা	(কবিতা)	" পূর্ণেন্দু মল্লিক	৮১
হাতের কাজ	(গল্প)	" অরবিন্দ গুহ	৪৬৩
হারজিত	(ঐ)	৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	৬০৬
হাসিপাতালে	(ঐ)	শ্রীশামুক	৩৮০

রামধনু-সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের

লেখা বই

— বিজ্ঞানের গল্প —

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা
আবিষ্কারের গল্প
*আকাশের গল্প
*বিজ্ঞান বুড়ো

— উপন্যাস —

ধূমকেতু
রাত যখন সাতটা
*রাধামাধবের রত্নহার

— বিদেশী বই অবলম্বনে —

দি ব্ল্যাক্ টিউলিপ্
দি ইলিয়াড্
দি অডিসি

— ছোট গল্প —

*জন্মদিনের উপহার
৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের সহযোগে
*গল্পসল্প
*ছুটীর গল্প
*আজব গল্প
*অনেক গল্প

— নাটিকা —

অয়েল পেন্টিং

— যন্ত্রস্থ —

ছোটদের বিশ্বকোষ (আনুমানিক ১২ খণ্ডে)

*চিহ্নিত বইগুলি বর্তমানে ছাপা নেই

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের

লেখা বই

— উপন্যাস —

পদ্মরাগ • ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি
* সোনার হরিণ

— বিদেশী বই অবলম্বনে —

দি চ্যানিংস

— নাটিকা —

দমাদম্ দামোদর

— ছোট গল্প —

চায়ের ধোঁয়া, এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ গল্প
* হাস্য ও রহস্য * নূতন পুরাণ
* হুকাকাশির গল্প

* চিহ্নিত বইগুলি বর্তমানে ছাপা নেই।

সবার বন্ধু স্বপনবুড়োর বই

স্বপনবুড়োর শৈশব (জীবনী)
স্বপনবুড়োর ঝুলি ···
স্বপনবুড়োর মজার গল্প···
স্বপনবুড়োর রকমারী গল্প ··
তাল-বেতাল (নাটক)
পালা-পার্ব্বণ-ছড়া-ছন্দ ···
কমলা (নৃত্যনাটিকা) ··
স্বপনবুড়োর স্বনির্ব্বাচিত গল্প
উড়ন্ত চাকী (উপন্যাস)
প্রেতপুরী (রোমাঞ্চ উপন্যাস)
নরহরি পণ্ডিতের কাহিনী (উপন্যাস)

স্বপনবুড়োর অন্যান্য বই—

শশী শ্যামলের সাঁকো	স্বপনবুড়োর ছড়া	স্বপনবুড়োর গল্প-সঞ্চয়ন
স্বপনবুড়োর হুল্লোড়	ধন্যি ছেলে (হাসির বই)	সাতসমুদ্দুর তের নদীর পারে
বেপরোয়া	স্বপনবুড়োর হাসির গল্প	দেশে দেশে মোর ঘর আছে
বনপলাশীর ক্ষুদে ডাকাত	ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প	স্বপনবুড়োর শিশুনাট্য (দুই ভাগ)
বাস্তুহারা	আত্মহত্যা	

নামকরা বইয়ের দোকানেই মিলবে।

Regd. No. C—1641

স্থাপিত – ১৩৩৭ ফোন–৩৫–২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পতাকা মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

/২॥০, /৫, ।৮ সেরা ডাইস্ টীনে,
মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ– শ্রীঅমৃত লাল কুমার।
মিল ও অফিস – ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা–৬

রামধনুর নিয়মাবলী

১ রামধনুর বার্ষিক মূল্য ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২ টাকা ২৫ ন. প., প্রতি সংখ্যা ৩৭ ন প.। ভি পি তে আরও ৭১ ন. প. বেশী লাগে। নমুনার জন্য ৩৯ ন প.র ডাকটিকেট পাঠাতে হয়।

২। বৈশাখে বছর সুরু, যে কোনও মাসে চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যায় কিন্তু পত্রিকা নিতে হবে বৈশাখ কিংবা কার্ত্তিক থেকে।

৩। কোন মাসে পত্রিকা না পেলে ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে তাঁদের উত্তরসহ সেই মাসের মধ্যে আমাদের জানাতে হবে।

৪। গ্রাহকদের সব চিঠিতেই গ্রাহক নং দিতে হবে। চিঠির জবাবের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাকটিকেট দিতে হবে।

৫। লেখা, কপি রেখে, সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা—ম্যানেজার রামধনু। ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫ (টেলিফোন : ৪৮-৩১৮১)

বিজ্ঞাপনের হার (সংশোধিত)

প্রতি বারের জন্য :—

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ৫০ টা, অর্দ্ধপৃষ্ঠা ২৮ টা., সিকি পৃষ্ঠা ১৬ টা.। প্রতি কলম ইঞ্চি ৬ টা.

মলাট : ৪র্থ পৃষ্ঠা ১০০ টা.

মলাট : ২য় বা ৩য় পৃষ্ঠা — ৮০ টা. অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৪ টা., সিকি পৃষ্ঠা ২৪ টা.

ছবি বা লেখার সামনের পৃষ্ঠা ৬০ টা, অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৩৬ টা., সিকি পৃষ্ঠা ২০ টা.

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

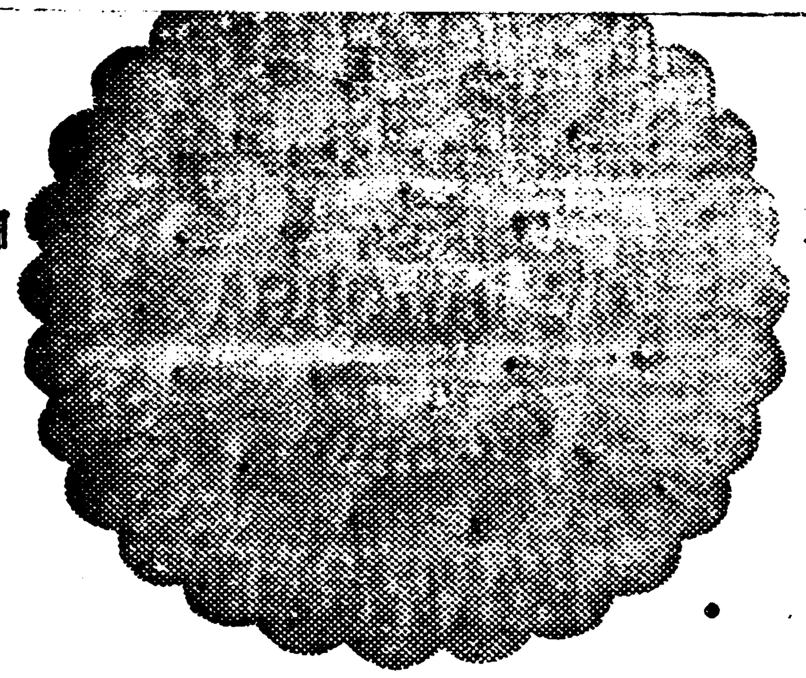

বিজ্ঞাপনের মতামতে
কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে ?
স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,
'থিনের' মধ্যে; গুণে, স্বাদে সবার সেরা "কোলে"
অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,
সবরকমের "কোলে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ

TIGHT BINDING

শ্রীচরণেষু

ফোন : ৫৫-৪০৪৬

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা—গোরাচাঁদ দাশগুপ্ত

* নতুন আদর্শ এবং পরিকল্পনা নিয়ে প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই প্রকাশিত হয়।
* নীচু আয় দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যয়িত হয়।
* 'বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর লেখা' এবং 'বিদ্যালয়ের খবর' বিভাগ দু'টি আমাদের সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পিত।
* প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকদের রচনায় প্রতিটি সংখ্যা সুসমৃদ্ধ।

বার্ষিক (সডাক) ৩৲, ষাণ্মাসিক (সডাক) ১৷০, প্রতি সংখ্যা ।০

অন্যান্য বিষয়ের জন্য কর্মসচিবের সহিত পত্রালাপ করুন।

"সম্পাদক"
শ্রীননীগোপাল দত্ত

'শ্রীচরণেষু' কার্য্যালয়,
৪বি, রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৫

লে—খা—চা—ই

অভিনব কিশোর-মাসিক। ২য় বর্ষ (১৩৬৫—বৈশাখ হইতে)। বার্ষিক সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৵০, প্রতি সংখ্যা।১০, নমুনা বিনা মূল্যে।

শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল, সম্পাদক ; দেবালয়—২৪ পরগণা

রামধনুর প্রতিষ্ঠাতা

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের

লেখা ছোটদের বই

মহাভারতের গল্পগুচ্ছ (১ম খণ্ড) ৸০
মহাভারতের গল্পগুচ্ছ (২য় খণ্ড) ৸০
দিগ্বিজয়ী বীর (মহাবীর আলেকজাণ্ডারের প্রামাণ্য জীবনকথা) ৸০

রামধনু কার্য্যালয় : কলিকাতা-২৫

সুলেখক

শ্রীঅমরনাথ রায়

প্রণীত

জলের কথা (পঃ বঃ শিক্ষা অধিকার)
আলো আর বাতাস ৷০
আমাদের বনৌষধি ১৲
আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য ১।০
ফেলবার নয় (রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত) ৸০

ভারতী বুক ষ্টল : ওরিয়েন্ট বুক কোং
কলিকাতা

লাজুক ছেলে

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩১শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫ { ২য় সংখ্যা

চীনে কবিতা

[খৃঃ পূঃ ১০৬৬-৪০৩ চাউ রাজবংশের রাজত্ব-কালে অনামা এক চৈনিক কবির রচনা]

অনুবাদক ঃ শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

ন্যাড়া পাহাড়টার ওপরে উঠে
ভাবি আমার বাড়ীর কথা—
বাড়ীর লোকদের কথা।

আমার বাবার কথা মনে হয়—
কত ভাবছেন তিনি আমার জন্যে।
যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে
তাকেই বলছেন,
"ছেলে আমার যুদ্ধে গেছে,
দিনে-রাতে এক মুহূর্তও
বিশ্রাম নেই তার ;

আশা করি সে
শরীরের প্রতি যত্ন নেবে
আর
ফিরে আসবে তাড়াতাড়ি
আমাদের কাছে।"

আমার মা?
মা কি বলছেন?
মা বলছেন, "বাছা আমার সৈনিক হয়েছে—
দিনে-রাতে ঘুম নেই তার।
আহা, সে বেঁচে থাক,
শরীর তাজা থাক তার,
বিপদ্ আপদ্ যেন তার
ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষতে না পারে।"

পাহাড়টার আরও একটু ওপরে উঠি,
আর ভাবি আমার ছোট ভাইয়ের কথা—
ছোট্ট ভাইটির কথা।
যাকে দেখছে তাকেই
বলছে সে,—
"আমার দাদা যুদ্ধু করতে গেছে—
খু–উ–ব যুদ্ধু করছে দাদা
চৌপর দিন-রাত।
দাদা—আমার দাদা নিশ্চয়ই জিতবে,
ফিরে আসবে নিশ্চয়ই
আবার আমাদের কাছে।"

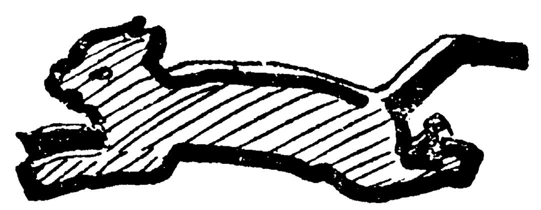

গড়গড়া গাঙ্গুলীর গল্প

—ঝড়—

শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়

ছাব্বিশ সনের ঝড়ের কথা মনে করলেও বুক কাঁপে রে!—বলে গাঙ্গুলী মশায় যেন সভয়ে ভুড়ুক তুড়ুক করে গড়গড়ায় ক্রমাগত টান দিতে লাগলেন। গুণে দেখলাম, পাকা বাইশটি টানের পর তিনি পুনরায় শুরু করলেন।

—তোদের জানবার কথা নয়। তেরশ' ছাব্বিশ সনে তোদের বাবা-জ্যাঠারাই হয়ত জন্মায় নি! সেই প্রলয়ংকর ঝড়ে, সারা পূর্ববঙ্গে ধ্বংসের যে নারকীয় লীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে কথা ইতিহাসে অগ্নির অক্ষরে লেখা আছে।

বিশেষ করে আমাদের বিক্রমপুর পরগণার যে বীভৎস ক্ষতি হয়েছিল তার তুলনা বিরল। হাজার হাজার মেয়েপুরুষ, হাজার হাজার পশু-পাখী মারা পড়েছিল। হাজার হাজার বাড়ীঘর ছাতু হয়ে গিয়েছিল। রাস্তা-ঘাট, বন-জঙ্গল, বাড়ী-ঘর তচনচ হয়ে এমন অবস্থা হয়েছিল যে চেনবার জো ছিল না।

আশ্বিন মাস, পূজোর ক' দিন আগের ঘটনা। যারা বিদেশে থাকে তারা সব বাড়ী এসেছে। আহা, তাদের বড় একটা কেউ ফিরতে পারে নি! নদী দিয়ে কত শত নরনারীর মৃতদেহ ভেসে গিয়েছিল তার লেখাজোখা নেই। শেয়াল, কুকুর, শকুনিতে সে সব মরা খেয়ে শেষ করতে পারে নি। আর শেয়াল-কুকুরই বা ছিল কই? সবাই তো সাফ্! সর্বনাশ হ'ল সার্বজনীন। হলে হবে কি, ওরই মধ্যে ওরই সুযোগে কতগুলো লোক লাল হয়ে গেল। নদী-নালায় ভেসে-যাওয়া মেয়েদের গা থেকে তারা সোনা-গয়না খুলে নিয়ে লাখপতি হয়ে গেল।

ছাব্বিশ সনের সে ঝড়—সে তুফান প্রত্যক্ষদর্শী শুধু এক জীবনে নয়, পরবর্তী কয়েকটি জীবনেই হয়ত ভুলতে পারবে না।

ব্যাপারটা মনে হয়েছিল অলৌকিক। যে ঝড়, যে তুফান এতাবৎ আমরা প্রত্যক্ষ করে এসোছ সেটা তা ছিল না। সে যেন একটা বিরাটকায় দৈত্য ত্ব'হাতে করে সারা প্রকৃতিকে তুলে ধরে, আছাড় মেরে, তূলোধোনা করে গেল! বিরাট বিরাট বাড়ী—চাল ও দেয়াল আধ মাইল দূরে নিয়ে ফেললো। বিশাল বিশাল সব গাছগুলোকে শিকড়সমেত উপড়ে শূন্য দিয়ে উড়িয়ে মাইলের পর মাইল দূরে নিয়ে গেল। কত মানুষ, গরু, ভেড়াকে শূন্য দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে উদ্ভট দূরত্বে ফেললে তার হিসেব জানা নেই।

সেই সময় আমার বরাতে জুটলো প্রথম আকাশযাত্রা। আজকের মত তখন এত এরোপ্লেন হয় নি। সারা পৃথিবীতে যে ক'টি ছিল হাতে গোণা যেত - তাও বেশীর ভাগ মিলিটারীদের হাতে। বেলুনের যুগ চলছে ; জেপেলীনের যুগ সেটা – তাও সুদূর জার্মাণী ও ইয়োরোপের দু' চারটা দেশে। সেই বিমানহীন যুগে আমার হ'ল প্রথম আকাশভ্রমণ।

হ্যাঁ, আকাশভ্রমণ। শুনে অমন হাঁ হয়ে গেলি কেন? শুধু আকাশভ্রমণ নয়— — রেস্ বলতে পারিস—স্রেফ প্রতিযোগিতা। সেই কথাই বলি :

তোরা হয়তো জানিস্ না, আমার আবার চিরকালই একটু কবি কবি স্বভাব। লেখাটেখা আদৌ আসে না বটে তবে ভাবটি পুরোপুরি কাব্যিক। মেঘ দেখলেই আমার মন ময়ূরের মত নাচতে থাকে। ঝড়বৃষ্টি, বিপদ-আপদ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। কালো মেঘে আকাশ ঢাকলেই আমি ছাদে যাবোই, আর মুগ্ধ নয়নে প্রকৃতির সেই করাল রূপের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবো। বৃষ্টি আসুক পরোয়া নেই, ভিজবো। স্বাস্থ্য অটুট। হাঁচি, সর্দি, ফ্যাচ-ফ্যাচানির বালাই নেই।

আমাদের গাঁয়ে ছিল দুই জমিদার বংশ। এক আমরা, গাঙ্গুলীরা, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী বংশ। আর আমাদের পরেই ছিল চৌধুরীরা। অবশ্য ওদের সঙ্গে আমাদের তুলনা করতে যাওয়াই বাতুলতা। কিসে আর কিসে! এই দু' জমিদার ফ্যামিলীরই পাকা বাড়ী। আমাদেরটা পাঁচতলা আর ওদেরটা চারতলা। আগে অবশ্য দু' পক্ষেরই একতলা ছিল। ক্রমে রেষারেষিতে ওরা দোতলা করলো, আমরাও দোতলা করলাম, ওরা তিনতলা, আমারাও তিনতলা, ওরা চারতলা হাঁকড়ালো, আমরাও কমতি কিসে? করলাম চারতলা। তারপর আমাদের প্রেষ্টিজে লাগলো। ওদের সঙ্গে সমান সমান কখনোই থাকবো না। ধাঁ করে পাঁচতলা তুলে দিলাম। এবার আর ও-বাছাধনেরা পারলো না, কারণ ওদের ভিৎএর সে জোর নেই। পাঁচতলা তুলতে গেলেই ওদের বাড়ী ধ্বসে পড়বে। অপর পক্ষে আমাদের ভিৎ এত পোক্ত যে ওর ওপর কুড়িতলা তোলা যায়।

রেষারেষি শুধু এক ব্যাপারেই নয়, আরও হাজারো ব্যাপারে ছিল। প্রত্যেকটাতে আমরাই চিরকাল লীড নিয়েছি, আর ওরা হতাশায় জ্বলে-পুড়ে মরেছে। আমাদের গাঙ্গুলী-রক্তেই ছিল—কোন বিষয়েই ওদের কাছে হারবো না। জান যায়, সো ভি আচ্ছা! জান মান কবুল।

ঝড়ের বারে ওরা চার ভাই বেঁচে। রমাপদ, শ্যামাপদ, কালীপদ ও হরিপদ। ঐ হরিপদটাই ছিল ভয়ানক বেয়াড়া। বেটা সিদ্ধিখোর (অবশ্য ঐ সিদ্ধির নেশাতেই

কি করে ওদের বংশ লোপাট হয়ে গেল সে আরেক কাহিনী)। আমার ওপর ওর ছিল প্রবল রাগ।

অধৈর্য হয়ে আমি বললাম,—আসল কাহিনী বলুন গাঙ্গুলী দাদু! জমিদার ডাইনেষ্টির ইতিহাস শুনতে শুনতে বিরক্তি ধরে যাচ্ছে।

আহাম্মক!—গাঙ্গুলী মশায় খিঁচিয়ে উঠলেন। গল্প বলতে হলে সমস্ত রকম পারিপার্শ্বিক অবস্থা না বলে নিলে লিঙ্ক্ পাবি কি করে? হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম?

ঝড়! সারাদিন—সকাল দুপুর বিকেল ছিল বেশ ঝকঝকে তকতকে দিন ; কিন্তু সন্ধ্যের পর আরম্ভ হল পীচ্ঢালা মেঘের সমারোহ। কিছুক্ষণ স্তব্ধ প্রকৃতি—নট নড়নচড়ন ভাব।

তরুণ বললে,—সে কি দাদু, ঠাক্‌মার মুখে আমি যে শুনেছি সেদিন সারা সময় টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল!

বাজে বকিস না।—গাঙ্গুলী মশায় বাধা পেয়ে ভয়ানক বিরক্ত হলেন। আমি বলছি আমাদের গাঁয়ের কথা। সব যায়গায় কি একই রকম অবস্থা ছিল, না হয়? দেখিস না কলকাতায়?—এপাড়ায় তুমুল বৃষ্টি, ওপাড়ায় শুকনো খটখটে। তেমনি আমাদের গাঁয়ের কথাই আমি বলছি, বাজে ফ্যাচ্ফ্যাচ করিস না।

হ্যাঁ, প্রস্তুতির প্রথমটা নট নড়নচড়ন অবস্থা। তারপর সন্ধ্যের দিকে এল হাওয়া—দৈত্যরূপী বাতাস। সে কি আওয়াজ! হাওয়ার গতি বোধ করি ঘণ্টায় সাত- আট শ' মাইল হ'ল। কানে তালা লেগে গেল বজ্রনির্ঘোষে। বাড়ীঘর, টিনের চালা, গাছ—বনজঙ্গল সব উড়ে গেল আকাশে। আহতদের আর্ত চিৎকার ডুবে গেল বজ্রের ধ্বনি ও বিদ্যুতের ঝলসানিতে। হাজারো সমুদ্রের গর্জন ক্ষ্যাপা বাতাসে। প্রলয় শুরু হয়ে গেল।

আপামর জনসাধারণ ভয় পেল। যে কোন জীবিত প্রাণীরই ভয় পাবার কথা। কিন্তু বলেছি তো, এ শর্ম্মাকে ভয়ডর দেখানো ঝড়বৃষ্টির কর্ম নয়। মনের ময়ূর নাচতে শুরু করেছে তাথিয়া তাথিয়া। গিন্নীর হাজারো কাকুতিমিনতি উপেক্ষা করে সোজা ছাদে চলে গেলাম।

প্রকৃতির সে নটরাজ রূপ আমায় দেখতেই হবে। তখন তো বুঝি নি এটা একটা বিভীষিকাময় ঝড়—বাতাসের গতি শব্দের গতিকেও ছাড়িয়ে গেছে!

চিলকোঠা থেকেই দেখতে পেলাম, আকাশময় চলমান জঙ্গল। মাঝে মাঝে টিনের বাড়ী। ব্যাপার কী! পরে বুঝলাম সব উড়ছে। ঝড়ে উপড়ে তাদের দুরন্ত গতিতে নিয়ে চলেছে।

এক সেকেণ্ড ভাবলাম, কিং কর্তব্য? পরক্ষণেই মনের নাচিয়ে ময়ূর আমায়

টেনে খোলা ছাদে নিয়ে ফেললে। যেতে দেরী আছে কিন্তু উড়তে দেরী নেই— বাতাসের ঝাপটায় চোখের পলকে শূন্যমার্গে উড়ে গেলাম। সর্বনাশ! তীরবেগে উড়ে চলেছি! কি অসহায় অবস্থা! কিছুই করবার নেই। বাড়ীঘর, জমিদারী, তালুকদারী, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, মাসী, পিসি, মামা, ভাগ্নে সবাইকে পেছনে ফেলে চলেছি কোন্ এক অজানার উদ্দেশে।

কিছুক্ষণ এই রকম অনাথ অবস্থার পর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'ল। সহসা দেখলাম পাশ দিয়ে এক —বিশাল শাল্মলীতরু নয়,—বটবৃক্ষ,—ডালপালা, শেকড়বাকড়, এমন কি পাখীর বাসা সমেত উড়ে চলেছে। টপ্ করে ধরে ফেললাম তার একটা ডাল।

আর পায় কে? ভাল একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেই উড়ন্ত গাছের মধ্যে জেঁকে বসলাম। আশে গাছ, পাশে গাছ, উপরে গাছ, নীচে গাছ! বিভিন্ন আকারের! বিচিত্র প্রকারের! মধ্যে মধ্যে টিনের একচালা, দোচালা, চারচালা, আটচালা একই স্পীডে উড়ে চলেছে—জানি না কোন্ দিকে! জানা সম্ভবও ছিল না। কেন না, না ছিল সূর্য, না শুকতারা, না দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। চলো বাবা, যে দিকে খুসী। বসবার স্থান তো পেয়ে গেছি। আপাততঃ আর ভাবনার কারণ কি? গ্রামের পর গ্রাম পায়ের নীচে পেরিয়ে যাচ্ছে।

আমার আবার গতির মধ্যে ঘুম পায়। ট্রেনে, ষ্টিমারে আমি একটু না ঘুমিয়ে পারি না। আজকালও এ বদ্ অভ্যেস আছে। ট্রামে-বাসে পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ে কতবার গন্তব্য স্থান পার হয়ে গেছি!

সেবারেও ঐ দুরন্ত গতিবেগ, বৃষ্টির টুপটাপ আর হু-হু করা হাওয়ায় চোখটা সবে জড়িয়ে এসেছে—এমন সময় একটা উল্লসিত বিকট অট্টহাসিতে আমার কাঁচা তন্দ্রা ছুটে গেল। চেয়ে তো চক্ষুস্থির! চৌধুরীদের হরিপদও উড়ে চলেছে পাশ দিয়ে, একটা ছোট হিজল গাছে চড়ে। বুঝলাম আমার মতই অবস্থা ওর। পরক্ষণেই আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হ'ল হাসলো কেন ব্যাটা? ও,—এই ব্যাপার? ওর গাছটা হাল্‌কা হওয়ায় আমাকে পাস্ করে বেরিয়ে যাচ্ছে—এগিয়ে গেছে খানিকটা; —তাই এ উল্লাস! সেরেছে। এখানে তো জিতলো বুঝি চৌধুরীরা! তা তো হতে পারে না। গাঙ্গুলী-রক্ত শরীরে একবিন্দু অবশিষ্ট থাকতে আমি তো তা হতে দেব না। কি করা যায় কি করা যায়? ভেবে ভেবে বুঝলাম আমার বটবৃক্ষটির ওজন বেশী বলেই সেটা পেছিয়ে পড়ছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার গাছের ডালগুলোকে মটামট ভেঙ্গে ফেলতে লাগলাম। তাতেই কাজ হ'ল। আমার গাছের গতিবেগ বাড়লো। দু' কদম চৌধুরী এগিয়ে গিয়েছিল—কিন্তু নিমেষ মধ্যে আমার গাছ এগিয়ে এসে সমান হ'ল। ওর গাছের পাশে পাশে চলতে লাগলো আমার গাছ। চৌধুরীও ডাল ভাঙছে। কিন্তু বেশী ভাঙবার উপায়

ছিল না—ডালই নেই ওর! শেষকালে ভাঙতে ভাঙতে তো নীচেই পড়ে যাবে! আমি ছোটখাট সব ডালই উপড়ে দিলাম, কিন্তু ইয়া মোটা বড় ডালগুলোকে খালি হাতে কিছু করবার উপায় ছিল না।

সুতরাং একই স্পীডে পাশাপাশি চলতে লাগলাম আমরা। চৌধুরীর অট্টহাসি থেমে গেছে। তবুও আমাকে যেন বৃশ্চিক দংশন করছিল। ওদের সঙ্গে সমান যাওয়াটাও যে আমাদের বংশের প্রেষ্টিজে বাধে!

গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছি। শূন্যমার্গে ভেসে চলেছি দু'জনে গাছে চড়ে, —অদ্ভুত পরিস্থিতি, হাস্যকর অবস্থা। আমার মনে এক চিন্তা। খুব ভাবতে লাগলাম —কি করে গতি বাড়ানো যায়—ওকে ছাড়িয়ে যাওয়া যায়? বিপদের সময়ে, চিরকাল দেখেছি, আমার বুদ্ধি ধাঁ করে খুলে যায়।

ব্যস্—উপায় ঠিক করে, তাই এ্যাপ্লাই করলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার গাছ যেন জেট-বিমানের স্পীড পেল। মুহূর্তে ওর গাছ ছাড়িয়ে মাইল খানেক এগিয়ে চলে গেলাম। আমি বিজয়-উল্লাসে গগনভেদী অট্টহাসি হেসে উঠলাম।

তারপর থেকে চৌধুরীরা আর কোন ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে লাগতে আসে নি।

আমরা তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, গাঙ্গুলী দাদু, তাহলে কি কোন মারণ-উচাটন মন্ত্রের জোরে গাছের স্পীড বেড়েছিল?

ও, উপায়টাই বলি নি বুঝি? গাঙ্গুলী মশায় স্মিতহাস্যে বললেন।—শুনে লজ্জা পাস না। প্রক্রিয়াটা এ্যাপ্লাই করতে আমিও প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত ইতস্ততঃ করেছিলাম। কিন্তু তারপর ভাবলাম, মান লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়।

কে আর দেখছে এখানে? মান-ইজ্জতের প্রশ্নে লজ্জা স্থান পায় না। চট করে পরনের কাপড়টি শার্টটি কোমরে জড়িয়ে খুলে নিয়ে পাল টাঙ্গিয়ে দিলাম। কল্পনা করতে পারবি না—ধাঁ করে আমার গাছের স্পীড বেড়ে গেল একশ' মাইল! নিমেষে পদ্মা পেরিয়ে দক্ষিণ পাড়ে অর্থাৎ ঢাকা থেকে ফরিদপুরে চলে গেলাম। নৌকোয় পাল তোলা দেখেছিস্, শূন্যপথে গাছে পাল তোলা এবার শুনলি তো?

আমি বললাম, কিন্তু ঐ একই প্রক্রিয়া তো হরিপদ চৌধুরীও এ্যাপ্লাই করতে পারতো?

– তা কি করে পারবে? ওরা যে ফুটুনি শিখেছিল ম্লেচ্ছদের মত। সাহেব সেজেছিলেন বাবু! সর্বদাই কোট-পেন্টুল পরে থাকতো। প্যান্ট দিয়ে তো আর পাল তোলা চলে না! ধুতির ঐটিই হ'ল মস্ত সুবিধে।

ব'লে, নিভন্ত গড়গড়ায় নিষ্ফল টান দিয়ে চললেন গাঙ্গুলী মশায়।

১১

চা পর্ব্ব শেষ হলে ডক্টর রামশাস্ত্রী বললেন, দেখ অজয় বাবু, আজ তোমার সঙ্গে খোলাখুলি ভাবেই সব আলোচনা করবো।

আমি বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও ঠিক ওই কথাই আপনাকে বলবো মনে করে এসেছিলাম।

তিনি বলতে লাগলেন ঃ তোমাদের পঞ্চানন্দ দেবকে আমি আমার নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নিয়ে এসেছিলাম এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। সুতরাং সরল ভাষায় বলতে গেলে আমি চোর। তার পর তোমাদের গৃহদেবতা স্বস্থানে ফিরে গিয়েছেন। কিন্তু কেউ যদি চুরি করে তার পর সে জিনিষ ফিরিয়ে দেয় তাহলেও চোর অপবাদটা তার যায় না। সুতরাং স্বীকার করছি আমি চোর।

পঞ্চানন্দ দেবের অন্তর্দ্ধান ঘটেছিল—দাঁড়াও, তারিখটা টোকা আছে আমার নোট বইয়ে। নোট বই বার করে তিনি বললেন, ৬ই মে। তিনি আবার স্বস্থানে ফিরে গেলেন। —এটা হোল ২২শে জানুয়ারী। এই যে সাড়ে আট মাস– দীর্ঘ সময় তাতে সন্দেহ নেই,—এই সময়ের মধ্যে এ সম্বন্ধে কতটুকু কাজ আমার এগিয়েছে? কয়েকখানা ফটো তোলা—সে তো এক ঘণ্টার ব্যাপার। তার পর ?—তবে শোন।

তুমি সেদিন যে অনুমান করেছিলে—সেই বহুদিনের অনন্তবর্ম্মা, যিনি মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সময়ের কিছু পরেই বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আমি যে তাঁরই বংশধর—সে কথাটা সত্য। পুরাতত্ত্ব এবং দেশের পুরোনো ইতিহাস সম্বন্ধে আমি অনেক পড়াশুনো

এবং অনেক গবেষণা করেছি এ কথাও সত্য। আমারই পূর্ব্বপুরুষের একখানা পুঁথিতে গোপালমূর্ত্তির বিবরণ পড়ে আমার মনে সেই মূর্ত্তির বর্ত্তমান অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে এ কথাও তোমাকে বলেছি। সেই দিন থেকেই এ নিয়ে বহু দেশে, এমন কি বিদেশেও খুঁজে বেড়িয়েছি সেই হারানো গোপালমূর্ত্তি। পা ভাঙ্গা যত মূর্ত্তি দেখেছি,—অবশ্য বিষ্ণুমূর্ত্তি বা কৃষ্ণমূর্ত্তি,—তখনই তার ফটো নিতে চেষ্টা করেছি, তার পর খুঁজেছি তাতে কোনও লিপি আছে কিনা। কিন্তু পাই নি। তোমাকে দেখাবো সে সব ফটোগ্রাফ।

তার পর আমার মনে হোল, পরিচয়-লিপি যদি কোথাও খোদিত হয়ে থাকে তবে সে লিপি থাকবে মূর্ত্তির নীচে, উপরে নয়। অবশ্য উপরেও যে থাকে না সে কথা বলছি না। কিন্তু আমি যত মূর্ত্তির ফটো নিয়েছি, তার কোনটাতেই নেই কোন লিপি।

তার পর সুরু করেছি আমার অনুসন্ধান পর্ব্ব। কত জায়গায়, কত গ্রামে ঘুরে, কি সূত্র ধরে অবশেষে এসে পৌঁছলাম তোমাদের গ্রামে সে কথার আলোচনা করে আজ আর কোনও লাভ নেই। তবে আমার অধ্যবসায়ের পুরস্কার পেয়েছি এই ভেবেই নিজের মনে আনন্দ পাচ্ছি।

এ কথাও এখন আমার মনে জাগছে যে যখন মূর্ত্তির নীচের অংশ, মায় তার লিপি—এটা খুঁজে বের করতে পেরেছি—যেটা ন' শো বছর আগে গোবিন্দদেবও পারেন নি, তখন উপরের অংশও খুঁজে পাবো এবং দু'টি ভাঙ্গা অংশকে জোড়া দিয়ে আবার প্রতিষ্ঠিত করবো গোপালমূর্ত্তিকে – যেমন করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অনন্তবর্ম্মা তেরো শো বছর আগে।

রামশাস্ত্রীর চোখ দুটো উত্তেজনায় যেন সাপের চোখের মত জ্বল জ্বল করতে লাগলো। আমি বললাম, তাই যদি আপনার উদ্দেশ্য তবে আবার ফিরিয়ে দিলেন কেন মূর্ত্তির নীচের অংশ ?

রামশাস্ত্রী আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। বললেন, অজয় বাবু, মানুষের নেশা, খেয়াল—এ সবগুলোর কোনও মানে নেই। মূর্ত্তিটাকে খুঁজে বের করা আমার প্রথমে ছিল খেয়াল, এখন হয়েছে সেটা নেশার মত। কিন্তু আমি তো যাযাবর। ঘর নেই, বাড়ী নেই, সংসারের কোন বন্ধন নেই। কাজেই আমি যদি কোনও দিন ভাঙ্গা মূর্ত্তিকে সম্পূর্ণ করতে পারি তাহলে তাকে প্রতিষ্ঠা করবো কোথায় জানো ?

কোথায় ?—বললাম আমি।

তোমাদেরই ওখানে। যেখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন তোমাদের পঞ্চানন্দ দেব। মূর্ত্তি সম্পূর্ণ হলে তখন, তোমরা এবং তোমাদের গ্রামের লোকেরা যদি ইচ্ছা কর, তবে

নামটা বদলে দিতে পারো। আর, তা যদি নাও করো, তাতেও কোনও ক্ষতি নেই। আমার কাজ মূর্ত্তির উদ্ধার করা। তার পর তার নাম গোপালই হোক কিংবা পঞ্চানন্দই হোক, তাতে কিছু যায় আসে না।

কৌতূহল বোধ করছিলাম তাঁর সব কথাগুলো শুনে। বললাম, মূর্ত্তির উপরের অংশের কোনও সন্ধান পেয়েছেন কি? যেমন পেয়েছিলেন নীচের অংশের?

তিনি বললেন, সেই জন্যই তো তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। একটা জিনিষকে সম্পূর্ণ করতে গেলে অনেক রকম এক্সপেরিমেণ্ট করতে হয়। আমার এ ক্ষেত্রেও তাই। স্থির বিশ্বাসে যে পথে এগিয়ে যাবো, গিয়ে দেখবো হয়তো ভুল পথে এসেছি। তখন আবার অন্য পথে পা দিতে হবে।

কিন্তু আমাকে নানা ব্যাপারে নানা জায়গায় যেতে হয় এবং বাইরে—এমন কি ভারতবর্ষের বাইরেও থাকতে হয় অনেক সময়। কাজেই এই অসমাপ্ত কাজকে সম্পূর্ণ করতে গেলে আমার একার পক্ষে অসম্ভব না হলেও কঠিন হবে। তেরো শো বছর আগেকার গোপালমূর্ত্তির উদ্ধার করে তাকে তোমারই গৃহদেবতা করে প্রতিষ্ঠা করবো এ কথা তোমাকে এই মাত্র বললাম। কাজেই এ ব্যাপারে যদি তোমার সাহায্য চাই তা হলে তুমি কি করবে না আমাকে সাহায্য?

আবার আমার দিকে চাইলেন ডক্টর রামশাস্ত্রী। উজ্জ্বল দুটি চোখের তীব্র দৃষ্টি! তার মধ্যে কি সম্মোহনশক্তি আছে জানি না, বিনা দ্বিধায় আমার মুখ দিয়ে বেরুলো, নিশ্চয় করবো সাহায্য।

তিনি বললেন, শুনে খুব সুখী হলাম। এই উত্তরই আমি চেয়েছিলাম। তোমার আফিসের কাজের কোনও ক্ষতি করতে আমি বলি না। মাস দুইয়ের ছুটি নাও আফিস থেকে। মাইনে যদি না দেয়, কিংবা কম করে দেয়, তাতে কিছু আসে যায় না। তার পর চলো, আমরা দু'জনে বেরুবো এই অভিযানে। কেমন, রাজী তো— ?

যাদুমন্ত্র কিনা জানি না, কিন্তু আমারও যেন মনে হোল, যেটা ছিল খেয়াল সেটা যেন পরিণত হয়ে গেল নেশায়। আমাদের গৃহদেবতা পঞ্চানন্দ দেব—কি সূত্রে আমাদের কোন পূর্বপুরুষ তাঁকে পেয়েছিলেন জানি না। সাগরদীঘির জলে দূর অতীতে যাঁর সমাধি ঘটেছিল, কি উপায়ে তিনি আবিষ্কৃত হয়ে আমাদের সংসারে এসে পূজিত হয়েছিলেন সে ইতিহাসের কোনও সূত্র রামশাস্ত্রীর জানা আছে কিনা বলতে পারি না, কিন্তু আজ মনের মধ্যে যেন উদ্দীপনা এসে পড়লো। কেবলই মনে হচ্ছে, তেরো শো বছরের পুরোনো মূর্ত্তি—অনন্তবর্ম্মার গোপালমূর্ত্তি আবার সম্পূর্ণ করে প্রতিষ্ঠিত করবো আমাদের গৃহবেদীতে। জয় গোপাল!

দিন পনেরো পরে একদিন রেল-ষ্টেশন থেকে নেমে সাড়ে আট মাইল কাঁচা রাস্তা পদব্রজে অতিক্রম করে রামশাস্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে পৌছুলাম যে জায়গায়টায় সেটা পুরানো যুগে নাকি একটা নীলকুঠী ছিল। সেই নীলকুঠীকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল একটা ছোট গ্রাম,—তার নাম রবাটপুর। রবার্টস্ নামা কোনও নীলকর সাহেব অতীত যুগে এই কুঠী এবং লোকবসতির সুরু করেছিলেন। রবার্টস্ নামটা লোকের মুখে মুখে সংক্ষিপ্ত হয়ে আজ রবাটপুরে পরিণত হয়েছে।

সেই ছোট গ্রামখানিতে যারা অধিবাসী তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয় এবং ওদেশের চলিত কথায় তাদের বলা হয় 'বুনো'। আসলে এরা সাঁওতাল। নীলকর সাহেবরা বুঝেছিলেন যে বাংলা দেশের মজুরের চেয়ে সাঁওতাল মজুর অনেক বেশী পরিশ্রমী, সুতরাং কাজ চালাতে হলে তাদের নিযুক্ত করাই সুবিধা। তাঁরা তখন দলে দলে সাঁওতালদের নিয়ে এসে নীলকুঠীর আশেপাশে জায়গা-জমি দিয়ে তাদের বসতি করালেন। বিশালদেহী সাঁওতালরা নীলকুঠীর কাজও করতো অক্লান্ত পরিশ্রমে, নীলকর সাহেবদের দেহরক্ষী এবং বরকন্দাজের কাজেও তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে এ-দেশী জনমজুরেরা পারতো না।

ক্রমে নীলকুঠী গেল উঠে, কিন্তু সেই সাঁওতালদের বংশধরেরা এ দেশের বাসিন্দা হয়ে থেকে গেল। তাদের জাতীয় ভাষা এ দেশের গেঁয়ো বাংলার সঙ্গে মিশে গিয়ে একটা বিচিত্র আকার ধারণ করলে। আজ তাদের পরিচয়ের সংজ্ঞা 'বুনো'। কেবল রবাটপুরে নয়, সর্বত্রই দেখেছি নীলকুঠীর সান্নিধ্যে বুনোপাড়া আছেই।

নীলকুঠীর পূর্ব গৌরব আর কিছুই নেই এখন। তবু যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাই দেখেই অবাক্ হয়ে গেলাম। খুব উঁচুতে একটা বিরাট চৌবাচ্চার মত গাঁথা, শুনলাম সেটায় জল রাখা হোত। তারই নিচে ছোট আকারের তিনটে চৌবাচ্চা, তাতে নীলের চারা বোঝাই করে ওপর থেকে জল ছেড়ে দেওয়া হোত। আরও নিচের স্তরে তেমনি আরও তিনটে চৌবাচ্চা, কয়েকদিন জলে পচবার পর নীলগাছের কষানি পীতাভ সবুজ একটা তরল পদার্থ গিয়ে পড়তো সেই নিচের চৌবাচ্চাগুলিতে। তার পর বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সেই তরল পদার্থ বড় বড় কড়ায় জ্বাল দিয়ে কাদার মত একটা পদার্থ তৈরী হোত, সেইটাই নীল। সেটা শুকিয়ে, সাইজ করে কেটে, নম্বর বা মার্কা বসিয়ে বাজারে পাঠানো হোত।

আজ নীলকুঠী নেই, নীলের ব্যবসা অতীত ইতিহাসের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। নীলকুঠীগুলি অতীতের সাক্ষী হয়ে ভাঙ্গা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। সাহেবের কোয়ার্টার্স্ আজ মাটিতে মিশিয়ে ইটকাঠের স্তূপ হয়ে রয়েছে। তারই মধ্যে ২।১ খানা ঘর যদি

কোথাও থাকে, সেখানে আশ্রয় নিয়েছে আজকের দিনের মানুষ, অন্য কোথাও যারা আশ্রয় পায় নি। এদের বেশীর ভাগই যাযাবর, বাউল ভিখারী বা বৈষ্ণব।

এখানে কেন আমাদের আসা হোল তা আমি জানি না। রামশাস্ত্রী বলেছেন তাঁর নির্দ্দেশ মত আমাকে চলতে হবে, সুতরাং তাঁর নির্দ্দেশের কৈফিয়ৎ চাওয়া অসম্ভব।

(ক্রমশঃ)

রেডি ?—ওয়ান—টূ-উ-উ

পুরানো পাতা

তুর্কি

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

তৈমুর—তুর্কি সর্দার	প্রথম গ্রামবাসী
তুর্কি সেনাপতি	দ্বিতীয় গ্রামবাসী
বুড়ী ঠাকু'মা	তৃতীয় গ্রামবাসী
জয়মল	একদল তুর্কি সেনা

[দিল্লীর কয়েক ক্রোশ দূরে ছোট একখানি গ্রাম। গ্রামের শেষ সীমায় একটি কুঁড়েঘর। ঘরের ভেতর তখন আর কেউ ছিল না, কেবল এক বুড়ী উনুনের ধারে বসে আগুন পোয়াচ্ছিল। উনুনের উপর একটা হাঁড়ি চড়ানো, তাতে ডাল সিদ্ধ হচ্ছিল। পাশে একখানা বড় থালাতে মোটা মোটা অনেকগুলো রুটি, আর তার পাশেই এক ঘড়া ঠাণ্ডা জল।]

বুড়ী। ও জয়মল, কোথায় গেলি!—তা যাক্ গে, যেখানে খুসি! আমি যখন ছোট ছিলুম, একটু কোথাও গেলেই মা অমনি বলে উঠতেন, 'যাস্ নে বাছা, যাস্ নে,— তুর্কি ধরে নেবে।' সে আজ কত কালের কথা! ছোট ছেলেরা দুরন্তপনা করলে, অমনি তুর্কির নাম করলেই একেবারে ভয়ে কাঁচুমাচু।—অ্যাঁ, অত গোলমাল কিসের!

[বাইরে দুম্‌দাম্ পায়ের শব্দ। তিন-চার জন গ্রামের লোক ছুটে এসে ঘরের ভেতর ঢুকলো।]

১ম গ্রামবাসী। ও বুড়ী!—ও আয়ী! সর্বনাশ হয়েছে—তুর্কি এসেছে। পালা, পালা, শীগ্‌গির বলছি। মেয়েদের সব একসঙ্গে জড়ো ক'রে এক্ষুনি পালা। নইলে গেলি এবার!

বুড়ী। (একটুও ব্যস্ত না হয়ে) তুর্কি? তুর্কি মরে এদ্দিনে কবরের ভেতর ঢুকেছে। সে কি আজকের কথা রে? সে আমার ঠাকু'মার আমলে একবার এসেছিল। কি হয়েছিল শুনবি—?

২য় গ্রামবাসী। দোহাই তোমার আয়ী! এখন তোমার ঠাকু'মার কাহিনী শুনতে গেলে, তুর্কি এক্ষুনি এসে ঘাড় মট্‌কাবে। যা বলছি শোন। মেয়েদের সঙ্গে

নিয়ে জঙ্গলের ভেতর পালাও, আর দেরী না।—এই তারা এসে পড়লো বলে! আমি নিজের চোখে দেখে এলুম। তুর্কিরা পঙ্গপালের মত যা পচ্ছে তাই পেটে পুরে ফেলছে। পালাও আয়ী, শীগ্‌গির। (বিড়বিড় করতে করতে আয়ী বুড়ী কুলুঙ্গি হাতড়াতে লাগলো) হাঁ হাঁ, যা পারো, সোনা-চাঁদি যা পারো নিয়ে পালাও—শীগ্‌গির পালাও।

(আয়ী বুড়ীর পলায়ন)

৩য় গ্রামবাসী। (কাঁদ-কাঁদ ভাবে) জয়মল যে এখনো এলো না!

১ম গ্রামবাসী। আর জয়মল! এখন যে যার নিজের প্রাণ নিয়েই পালাতে পারলে হয়! কে তোমার জয়মলের জন্য বসে থাকবে? নিজের উপায় সে নিজেই করবে এখন।

২য় গ্রামবাসী। জিনিষপত্র কি নেবে, নাও না হে, চট্‌ করে, হল্লা শুনছো না? এসে পড়লো যে!

(সকলের দ্রুত পলায়ন)

[তার পর সঙ্গে সঙ্গেই একদল তুর্কি এসে ঘরে ঢুকলো, আর জিনিসপত্র হাতড়াতে লাগলো।

সেনাপতি। কি! লোকজন কেউ নেই। বড্ড পালিয়েছে যা হোক্। বাহবা, ক্যা তোফা, খানা যে তৈরী! (এক গোছা রুটি হাতে তুলে নিয়ে হাঁউ হাঁউ ক'রে খেতে সুরু করে দিল) আরে, তোরা ওদিকে কি হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছিস্?—দ্যাখ্‌ এদিকে।

[সকলে একসঙ্গে হুড়মুড় করে এসে পড়লো আর রুটি নিয়ে কাড়াকাড়ি আরম্ভ করে দিল। এমন সময় আর একজন লোক, এদেরই মতন দেখতে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে ঘরের ভেতর ঢুকলো। একে দেখেই কিন্তু সকলে ভড়কে গিয়ে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালো। এ আর কেউ নয়—তৈমুর নিজে।]

তৈমুর। তোমাদের না হুকুম দিয়েছিলুম, বরাবর অমরকোট পর্যন্ত ধাওয়া করতে? তবে যে বড় এখানে মজা করছ? আচ্ছা, মনে থাকবে আমার এ সব!—সেনাপতি মশাইয়ের নামটি কি ভুলে যাচ্ছি যে!

সেনাপতি। হুজুর খোদাবন্দ্‌! অধীনের নাম নসীব বেগ্‌।

তৈমুর। তোমার যা নসীব, তাতে সত্যিই তোমায় অনেক বেগ পেতে হবে। এখন বেরোও সব এখান থেকে।

[সেনাপতি ও সৈন্যদলের প্রস্থান। তৈমুর লোলুপ দৃষ্টিতে রুটির খালি পাত্র আর জলের খালি ঘড়ার দিকে চেয়ে রইলো।]

তৈমুর। রুটির একটা টুকরোও রাখে নি—জলও এক ফোঁটাও নেই। ওদের

আর কি দোষ? আমি হলেও ঠিক এই রকমই করতুম, অর্থাৎ নিজে যখন খিদেয় মরছি তখন অপরে বাঁচলো কি মলো, সে কথা একবারও মনে আনতুম না।

(উনুনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো)

যাক্, আমার কাজ এক রকম শেষ হয়েছে। তুর্কি হিন্দুস্থানে এসে আর একবার বেশ ক'রে দেখিয়ে গেল। হতভাগা কাফেরগুলো তুর্কির কথা আরো অন্ততঃ একশ' বছর ভুলবে না।

[দরজা খুলে গেল, আর একটি দশ বছরের ছেলে এক ঘটি দুধ হাতে করে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো। ছেলেটির নাম জয়মল।]

জয়মল। ঠাকু'মা, এই নাও দুধ—(অমনি তৈমুরকে দেখে আঁৎকে উঠে ছুটে পালাবার উপক্রম।)

তৈমুর। কি বল্‌লি ছোঁড়া?—দুধ?—আচ্ছা, নিয়ে আয় এদিকে।

জয়মল। (ইতস্ততঃ ভাবে) এ আমার নয় কিন্তু!

তৈমুর। (কাষ্ঠহাসি হেসে) তোর নয়? তবে তো ভালই! দে, আমায় দে।

(খাপের ভেতর থেকে সড়াৎ করে তলোয়ারটা বার করেই মাথার উপর উঁচালো। আবার কি ভেবে সেখানা একটা তাকের উপর রেখে দিল। তারপর এক লাফে জয়মলের উপর পড়ে তার হাত থেকে দুধের ঘটি কেড়ে নিয়ে, মারলে তাকে এক ধাক্কা। ধাক্কা খেয়ে জয়মল গড়াতে গড়াতে দেওয়ালে গিয়ে ঠেকলো। এদিকে চক্ষের নিমেষে একঘটি দুধ ঢক্ ঢক্ করে তৈমুরের পেটের ভেতর চালান গেল। জয়মল ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। এবার সে পালাবার চেষ্টা তো করলই না, বরং চোখমুখ লাল করে রুখে দাঁড়ালো।)

তৈমুর। তোর বড্ড জোর বরাত রে ছোঁড়া, বেঁচে গেলি। তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, তাই দুধের ঘটি নিতেই সময় গেল, তা তোকে মারবো কি? এখন তোর দুধ খেয়েছি, আর হাত উঠ্‌ছে না মারতে। তা যাক্, তোর সাহস আছে। আমার লোকজন যে সব চলে গেল, নইলে তোকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতুম, আর তোফা এক মুসলমান বানিয়ে নিতুম। তা তোর বরাতে কালিয়া-পোলাও খাওয়া নেই, আমি তার কি করবো বল্? যেমন কাফের আছিস্ তেমনি কাফের থেকেই এই জাহান্নমে পড়ে থাক্। কিন্তু মনে রাখিস্ ভাল করে, যে, তুই তুর্কি সর্দার তৈমুরকে দেখেছিলি, অথচ সে তোকে প্রাণে মারে নি। তৈমুরের হাতে পড়েও নিস্তার পেয়েছে, এ কথা তুই ছাড়া কেউ বলতে পারবে না কোনদিন।

(তলোয়ারখানা খাপের ভেতর পুরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।)

[বুড়ী আবার ফিরে এলো, আর বিড়বিড় করতে করতে গিয়ে উনুনের ধারে বসে আগুন উস্কাতে লাগলো।]

বুড়ী। ওদের সঙ্গে যেতে পারলুম না। ওরা চট্‌পট্ সব পালিয়ে গেছে। আমি বুড়ো মানুষ, আর ওরা সব জোয়ান।—কিন্তু তুর্কি আমায় ধরতে পারবে না। তা কি পারে? আমি যে বড্ড বুড়ী!

জয়মল। ঠাকু'মা, আমি তাকে দেখেছি।

বুড়ী। (চম্‌কে উঠে) কাকে রে?

জয়মল। তুর্কি সর্দার তৈমুরকে।

হুঁ-হুঁ,—যে আজ্ঞে...

এ কেমন বাতি?

শ্রীঅমরনাথ রায়

বিয়েবাড়ীতে খুব ধুমধাম। সামনের দরজায় মহবৎ বাজছে। ছাঁদনাতলায় আলোর বন্যা ব'য়ে যাচ্ছে। লোকজনের আনাগোনার শেষ নেই। মামার সঙ্গে মণ্টুও এসেছে বিয়েবাড়ীতে ভোজ খেতে এই দূর পাড়াগাঁয়ে।

বিয়েবাড়ীর আলো দেখে কিন্তু মণ্টু অবাক্ হ'য়ে যায়। এ আবার কি রকম আলো! লণ্ঠনের মত নয়, নয় ইলেক্‌ট্রিক আলোর মত। একটা লোহার চোঙের মত পাত্র। তা থেকে বেরিয়েছে মোটা লোহার নল। সেই লোহার মোটা নলের মাথায় আধখানা চাঁদের মত বাঁকানো আর একটা সরু লোহার নল। আবার তারও গায়ে চার-পাঁচটা সরু সরু নল। সব ক'টা নলের মুখে আগুন জ্বলছে—যেমন জ্বলে প্রদীপের শিখা। তবে প্রদীপের শিখার চেয়ে এ আলোক-শিখার জোর অনেক—অনেক বেশী। বেশ জমকালোই বলা যায়। আলোটা সাদা—অনেকটা ইলেক্‌ট্রিক আলোর মতই। পাড়াগাঁয়ে এ জিনিষ দেখবে আশা করে নি মণ্টু।

মণ্টু মামাকে জিজ্ঞাসা করে: এ কেমন বাতি, মামা? মামা বলেন: এ বাতির নমে "অ্যাসিটিলিন বাতি"। অনেকে আবার একে "কার্বাইড বাতি"ও বলে থাকেন। এটা তো আর শহর নয় যে ইলেক্‌ট্রিক বাতি জ্বালানো যাবে। তাই বড় বড় উৎসবের সময় এই বাতিই জ্বালানো হয়।

ছোট্ট ছেলে মণ্টু কতটুকুই বা তার অভিজ্ঞতা! তবুও এর মধ্যেই কলকাতায় বেড়াতে গিয়ে সে অনেক রকম বাতিই দেখেছে। দেখেছে রঙ-বেরঙের ইলেক্‌ট্রিক বাতি, দেখেছে মৃদু, স্নিগ্ধ, রঙ্গিন নিয়ন-আলো। বড় ভাল লেগেছে তার সে সব বাতি। কিন্তু এই অ্যাসিটিলিন তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। মণ্টু ভাবে ইলেক্‌ট্রিক বাতি তো ইলেক্‌ট্রিক বা বিদ্যুতে জ্বলে, লণ্ঠন জ্বলে কেরোসিন তেলে, প্রদীপ জ্বলে সরষের তেল অথবা রেড়ির তেলে, মোম পুড়ে জ্বলে মোমবাতি, কিন্তু এই অদ্ভুত বাতি যার নামই সে কোন দিন শোনে নি, দেখা তো দূরের কথা,—জ্বলে কি ভাবে? ভেবে কূলকিনারা পায় না মণ্টু। তাই বাধ্য হ'য়ে সে মামাকেই ফের জিজ্ঞাসা করে তার প্রশ্ন।

মামা বলেন: অ্যাসিটিলিন হলো একটা গ্যাসের নাম। অ্যাসিটিলিন বাতির তলায় চোঙের মতন যে পাত্রটা থাকে, তাতে রাখা হয় ক্যালসিয়াম কার্বাইড—একটা রাসায়নিক দ্রব্য। তারপর ঐ পাত্রে জল ঢালা হয়। কার্বাইডে জল দিলে আপনা

আপনিই অ্যাসিটিলিন গ্যাস জন্মায় ও বাতির মুখ দিয়ে সেই গ্যাস বেরুতে থাকে। তখন বাতির মুখের সরু ফুটোর ওপর জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ধরলে অ্যাসিটিলিন গ্যাস প্রচুর আলো ছড়িয়ে জ্বলতে থাকে। এই হলো মোটামুটি অ্যাসিটিলিন বাতির রহস্য।

মণ্টু বলে : আচ্ছা মামা, এ গ্যাস দিয়ে বেলুন ওড়ানো বা ঐ রকম কোন কাজ হয় না ?

মামা বলেন : বেলুন ওড়ানো না হ'লেও এ গ্যাস নানান্ কাজে লাগে। বাতি জ্বালানোর কথা বাদ দিলেও 'ওয়েল্ডিং' এর কাজে এ গ্যাসটা খুব বেশী লাগে। কলকাতায় বেড়াতে গিয়ে পথের ধারে 'ওয়েল্ডিং'এর দোকানগুলো দেখেছিলি কি ? সেই যে একটা মোটা পাইপ – যার নাম ব্লো-পাইপ—মুখ দিয়ে তার খুব জোরে আগুন ছিটকে বেরুচ্ছে, আর সেই আগুনে ঝালাইএর কাজ চলছে ? হ্যাঁ, ওকেই বলে 'ওয়েল্ডিং'। এ ঝালাই মানে, ভাঙ্গা লোহার টুকরো বা লোহার তু'টি অংশ আগুনের তাপে গালিয়ে নিখুঁত ভাবে যুড়ে দেওয়া। ব্লো-পাইপের মুখে শুধু অ্যাসিটিলিন গ্যাসই জ্বলে না, জ্বলে আরও একটা গ্যাস – অক্সিজেন, যে গ্যাস আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাতাস থেকে টেনে নেই। তাই ওই ব্লো-পাইপের নাম "অক্সি-অ্যাসিটিলিন ব্লো-পাইপ"। ওই ব্লো-পাইপের মুখে ঐ তুই গ্যাস মিশে জ্বলতে থাকে। এতে এত বেশী তাপ পাওয়া যায় যে তা দিয়ে সহজেই লোহা গালিয়ে ফেলা যায়। তাই ওতে ওয়েল্ডিংএর কাজও ভাল হয়। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবি, 'ওয়েল্ডিং শপে' ইস্পাতের নানা রকম জিনিষ, মোটর গাড়ীর অংশ, নানা রকম কলকব্জা ওয়েল্ডিং করা হ'চ্ছে। ওয়েল্ডিং ছাড়াও 'অ্যাসেটিক অ্যাসিড', 'অ্যাসিটোন' ক্লোরোপ্রিন ও এমনি আরও অনেক রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করতেও লাগে এই অ্যাসিটিলিন গ্যাস।

মণ্টু ভাবে, সামান্য একটা বাতি, অথচ তার বিষয়েও কত যে জানবার রয়েছে তার ঠিক নেই !

ছড়া

শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

ঘাসের ফুল, ঘাসের ফুল
হাওয়ায় দোতুল তুল ;
ঘাস নয় তো, ঘাস নয় তো—
কোন্ সে খুকীর চুল !

ঘাসের ফুল তুলছিল,
খোকনমণি তুলছিল,
ফুল নয় তো, ফুল নয় তো—
কোন্ সে পরীর তুল !

তুষারতীর্থ শ্রীকৈলাস

তীর্থঙ্কর

—তাক্‌লাকোট থেকে মানস সরোবর—

তুষারতীর্থ কৈলাসের উদ্দেশে রওনা হয়ে তিব্বতের তাক্‌লাকোটে এসে পৌছলাম। তাঁবু ফেললাম কর্ণালি নদীর তীরে। নদীর ওপারে শিবলিঙ গুম্ফা। এ দেশটার নাম আমাদের পুরাণে কিংপুরুষবর্ষ। এখানকার অধিবাসীদের পরিচয় কিংপুরুষ বা কিন্নর বলে। এই নামের মানে কুৎসিৎ পুরুষ। পরবর্ত্তীকালে আবার জানা যায় যে এখানকার অধিবাসীদের নাম বোট বা বোদ ; তাই থেকে ভোট শব্দ দাঁড়ায়। এ ছাড়া প্রাচীন ভারতীয়দের কাছে এখানকার লোকদের সাধারণ নাম ছিল যক্ষ, আর দেশের পরিচয় ছিল যক্ষদেশ। এই যক্ষের দেশের উপর কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদ বরাবরই আছে। এ দেশে প্রথম এসে দেখলাম ধ্যানী বুদ্ধ আর শঙ্কর মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছেন। রাস্তার ধারে—পাহাড়ের গায়ে প্রায়ই দেখা যায় লেখা রয়েছে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ"। আসলে বৌদ্ধরা শিবের বীজমন্ত্র হুঁ-কে মিলিয়ে দিয়েছে মণিপদ্মের সঙ্গে। মণিপদ্ম কথাটার অর্থ নাকি মণিপুরের পদ্ম—ষটচক্র বা ষট্ পদ্মের মধ্যে এটা একটা মন্ত্র। যেমন শৈব ধর্ম্ম এসে শেষ হয়েছে বৌদ্ধ ধর্ম্মে, তেমনি প্রাকৃতিক ব্যাপারে এবং আচার-বিচারেও দেখা যায়—শৈব ধর্ম্ম এসে মিলে গেছে বৌদ্ধ ধর্ম্মে। হিমালয়ের এলাকা পার হয়ে এখন আমরা যে এলাকায় এসে পৌছেছি সেটা হচ্ছে হিন্দুকুশ, কিয়ুন-লুন ও হিংয়েন সাং পর্ব্বতের অন্তর্ভুক্ত। হিমালয়ে দেখেছিলাম যোগীশ্বর শিবের প্রাধান্য, আর এখানে এসে দেখছি যোগীশ্বর বুদ্ধের প্রভুত্ব। তুই ধর্ম্মের এই আলিঙ্গন, এই সহজ মেলামেশা বড় সুন্দর লাগলো।

এর পর আমাদের যাত্রা শুরু হ'ল তিব্বতের বিখ্যাত মালভূমির উপর দিয়ে। এখন চড়াই উৎরাই আর বিশেষ ভাঙ্গতে হচ্ছে না। বরং বলা চলে, পথের বন্ধুরতা অনেকখানি কমে গিয়ে সমান ভাব এসে গেছে। ভূমি অনেকখানি কূর্ম্মপৃষ্ঠের মত। এখানকার পাহাড়ে মাটির রং গৈরিক। তারই বুকে একটানা কাঁটাগাছ বা কাঁটা-ঝোপের সারি ছড়িয়ে আছে। এ দেশের রুক্ষ, অনুর্ব্বর প্রকৃতি সহজেই কোন বিদেশী যাত্রীকে মনে করিয়ে দেয় এ এক নিষিদ্ধ দেশ। চলতে গেলে পদে পদে বাধা, পদে পদে বিধিনিষেধ।

পিঠে করে নিয়ে নদী পার করে দেয়।

এখান থেকে তিনটী পথ বেরিয়েছে। একটী পথ চলে গেছে খোচরনাথের দিকে। মোট দূরত্ব ১২ মাইল হবে। শুনেছি এই পথ দিয়ে গিয়ে খোচরনাথ দেখে একদিনেই ঘুরে আসা যায়।

খোচরনাথ মন্দিরে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের মূর্ত্তি আছে। কারো কারো মতে ওই তিনটী মূর্ত্তি হচ্ছে মহাভারতের বনপর্ব্বে যে কিরাত ও অর্জ্জুনের গল্প পাওয়া যায়—সেই গল্পের মূর্ত্তি।—অর্জ্জুন, কিরাতরূপী মহাদেব আর কিরাতপত্নীরূপিনী পার্ব্বতী দেবী। আর একটী পথ গিয়েছে তীর্থপুরীর দিকে প্রেতপুরী হয়ে। আমাদের যাত্রাপথ তৃতীয়টী এগিয়ে গেছে মানস-কৈলাসের দিকে।

এ দেশের অদ্ভুত বাহন জব্বু একটী উল্লেখযোগ্য পশু। দেখতে অনেকটা চমরী গাইএর মত। এর লেজটীকে চামর বলা যায়। শিং দুটী বড় বড় মহিষের মত। গায়ে খুব বেশী লোম, মুখখানিও মহিষের মতই। এরা এক অদ্ভূত কষ্টসহিষ্ণু ভারবাহী পাহাড়ী জীব। স্বভাব ভীরু, কিন্তু মাল বহন করতে সুপটু। যারা এদের চালনা করে—তারা একটী দলকেই চালনা করে। মুখ দিয়ে এক রকম শব্দ বার করে, আর মাঝে মাঝে পাথর ছুঁড়ে পথ নির্দ্দেশ করে।

এ দেশে ছোট ছোট নদী, তাতে খুব জোরালো স্রোত, কিন্তু অগভীর। তিব্বতীরা বিদেশী যাত্রীদের পিঠে করে নিয়ে নদী পার করে দেয়।

বেলা ৪টা নাগাদ আমরা সদলবলে "রিজগাম" গ্রামে এসে পৌছলাম।

এটী একটী ছোট তিব্বতী গ্রাম। কয়েকটী ঝুপড়ী দেখা যায় বটে কিন্তু গ্রামে একটাও লোক নেই। আমাদের তাঁবু পড়লো একটী সমতল জায়গায়। দুই দলের মোট ৪টী তাঁবু। কাছেই বইছিল একটী জলস্রোত। আমরা সেইখানেই মুখ-হাত-পা ধুয়ে নিয়ে চা ও জলখাবার খেয়ে নিলাম। সন্ধ্যাবেলায় এখানে এসে পৌছালেন গাইড্ কিচ্‌খাম্পা। হঠাৎ তাঁকে আসতে দেখে আমরা সবাই আনন্দে হৈ-চৈ করে উঠলাম। এতক্ষণ তাঁর জামাই তসর সিং ও ভাইপো সিরিংখাম্পা আমাদের পথ দেখিয়ে এনেছেন; এখন এই বহুআকাঙ্ক্ষিত পথপ্রদর্শকের দেখা পেয়ে আমরা মনে-প্রাণে নিশ্চিন্ত হ'লাম। আবার চা, কফি প্রস্তুত হ'ল। কিচ্‌খাম্পা খেলেন, তাঁর সঙ্গে আমরাও খেলাম। অবাক্ হয়ে ভাবলাম, আমাদের কথা মনে করে এতটা পথ কিচ্‌খাম্পা একদিনেই অতিক্রম করে এসেছেন। এ জন্য পরিশ্রম তো বড় কম হয় নি তাঁর।

মানস সরোবরে সূর্য্যাস্ত

পরদিন সকালে তসর সিং আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তিনি তাক্‌লা-কোটে ফিরে গেলেন, আর আমরা কিচ্‌খাম্পা ও সিরিংখাম্পার সঙ্গে এগিয়ে চল্‌লাম সেকাং এর দিকে।

সকালে জলখাবার খেয়ে জব্বুর পিঠে জিনিষপত্র চাপিয়ে আমাদের বেরুতে বেলা ৯টা বেজে গিয়েছিল, তাই আমরা বেলা দুপুর নাগাদ সেকাংএ এসে সবাই বিশ্রাম নিতে লাগ্‌লাম। এখানে আবার তাঁবু ফেলা হ'ল।

যথা সময়ে চা-জলখাবার খাওয়া হ'ল, রাতটাও আমরা এখানেই কাটিয়ে দিলাম। পরদিন রওয়ানা হ'লাম রিংগুমের দিকে। দুপুরে যেমন রৌদ্র—রাত্রে তেমনি প্রচণ্ড শীত এখানে। পথ কিছু উঁচুনীচু বটে, তবে তাকে চড়াই-উৎরাই বলা চলে না। পাথরে কাঁকরে ভরা মালভূমির উপর দিয়ে যথা সম্ভব কাঁটাঝোপ এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছি আমরা ক্রমাগত। রিংগুম এসে পৌছাতে বিকেল হয়ে গেল। এখান থেকে দেখা গেল দূরে মান্ধাতা পর্ব্বতশ্রেণী। মান্ধাতার তিব্বতী নাম "মীমনাম নিম্‌রী"। শ্রেণীবদ্ধ ভাবে মান্ধাতা পর্ব্বতমালা এগিয়ে গেছে উত্তর-পূর্ব্ব কোণের দিকে মানস সরোবরের কূল পর্য্যন্ত।

পরদিন বলদাগে এসে পৌছাতে মান্ধাতা পর্ব্বতের দৃশ্যটী আমাদের চোখে আরও

ভাল ভাবে পড়লো। গল্প আছে, এখানে রাজর্ষি মান্ধাতা পুরাকালে তপস্যা করেছিলেন। ইনি ছিলেন দৈত্যরাজ বানের মতই আদর্শ শিবভক্ত। বৃক্ষহীন, তৃণলতাবিহীন এই পর্ব্বতশ্রেণীর চূড়াগুলি ধবল তুষারমণ্ডিত। তার উপর নীল রঙের আকাশ বিস্তৃত। জলে-স্থলে এই নীল দৃশ্যটী বড় সুন্দর।

গাইডের মুখে শুনলাম—গুরলা-ফু ও গুরলা-ফু-পাসের পথে চড়াই বেশী। তাই সে পথ ছেড়ে আমরা পাহাড়ের তলা অর্থাৎ নীচ দিয়ে এগুতে লাগলাম। পথে রিজাং এ খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে কিছুটা এগিয়ে যেতেই আমাদের চোখের সীমানা-মুক্ত হ'ল এক মহিমামণ্ডিত দৃশ্য—'রাবণ হ্রদ'। বিস্তৃত জলরাশির নীলবর্ণ আর তার জলে প্রতি-ফলিত নীল আকাশ যেন সহসা তীর্থযাত্রীর চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। হ্রদটী ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা। সমস্ত দৃশ্যটী নির্জ্জন, নিস্তব্ধ। মনে হ'ল এই মান্ধাতা পাহাড়ের শ্রেণী আর এই রাবণ হ্রদ,—আমরা যে মহানের সাক্ষাৎ লাভ করতে চলেছি—এ যেন তারই পূর্ব্বাভাস।

বিকেলের দিকে দেখা গেল মান্ধাতা পাহাড়ের চূড়া মেঘে মেঘে ঢাকা। বক্ষে তার অগাধ-অপার প্রশান্তি। রাত্রে আবার বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেলা হ'ল। শীতের প্রকোপের জন্য সকলেরই গায়ে মোটা গরম ওভার-কোট। ঝোড়ো হাওয়ায় সেই শীত প্রবলতর হচ্ছিল। রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে কিচ্‌খাম্পার সঙ্গে গল্প-সল্প হ'ল।

পরদিন সকালে উঠে চা ও জলখাবার খেয়ে আবার চল্‌তে শুরু করলাম। প্রায় দুপুর নাগাদ একটি তিব্বতী ধর্ম্মমন্দির—গস্মুল গুম্ফার কাছে এসে পৌছালাম। একটু চড়াই ভেঙ্গে সবাই আমরা গস্মুল-গুম্ফার মঠে গেলাম দেখতে কি আছে। মঠের ভিতরে ৩টী বুদ্ধের মূর্ত্তি,—বড় বড়। আশেপাশে নানা সহচর দেবদেবীর ছোট ছোট মূর্ত্তি। আমরা প্রত্যেকে এক একটি ঘিয়ের প্রদীপ কিনে জ্বেলে দিলাম সেখানে।

একটু পরেই দেখা গেল এক অপরূপ দৃশ্য। পথের এক পাশে রাবণ হ্রদ, আর এক পাশে মানস সরোবর।

ফেনকমল ও ব্রহ্মকমল এখানে ফোটে না বটে, রাজহংসও মানসের জলে দেখা যায় না—তবুও সমস্ত কিছু মিলিয়ে এর দৃশ্যটী অপূর্ব্ব সুন্দর। দু' জাতের হাঁস এর আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে—একটী বালুহাঁস, আর একটী অপেক্ষাকৃত বড়,—সোনালি রঙ্‌এর হাঁস—ঠোঁটগুলি লাল। এক জাতের কাকও এখানে দেখলাম—আকারে আমাদের দেশের শকুনের মত। এদের ঠোঁটও লাল। মানস সরোবরের বিস্তৃতি বড় কম নয়। নীল রঙের জলরাশি। অনেকখানি জলের তল দেখা যায়। পাশ দিয়ে নুড়ির রাস্তা। এই রাস্তা ধরে এগিয়ে আস্‌তেই গাইড এক জায়গায় আমাদের

থামতে বল্‌লেন। জায়গাটীর নাম তিব্বতী ভাষায় 'মালাঠক'। কৈলাসের কাছাকাছি জায়গাটী। "জয় শ্রীশ্রীকৈলাসপতি-কী জয়" বলে জয়ধ্বনি দিয়ে আমরা এখানেই সেদিনের মত তাঁবু ফেল্‌লাম।

তাঁবুতে বসে বসেই মানস সরোবরের উপকূলস্থ পাহাড়ের চূড়ার ওপারে সূর্য্যাস্তের দৃশ্য দেখ্‌লাম। কী অপূর্ব্ব রংএর ছড়াছড়ি! দেখলে কখনও ভোলা যায় না। নীচে বরফের বিস্তৃত মাঠ, আশেপাশে হ্রদের জলের নীল মহিমা, পাহাড়ের চূড়ায় মেঘের রাজছত্র, তার উপরে অস্তগামী সূর্য্যের গোলাপী আভা! এমন আর কোথাও কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না।

পশ্চিম দিগন্তে

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

আমেদাবাদের কথা বলছিলাম।

আমেদাবাদের দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে কাঁকেরিয়া তালাও। কিন্তু তালা অর্থাৎ পুষ্করিণী না বলে একে হ্রদ বললেই ভালো হয়। আড়াই মাইল ব্যেপে আছে এই হ্রদটি। ১৪৫১ সালে গুজরাতের সুলতান কুতুবউদ্দীন এটি খনন করান, তাই এর পুরোনো নাম হৌজ-ই-কুতুব। এর মাঝে একটি দ্বীপ আছে, সেখানে সুলতানের প্রমোদভবন। তীর থেকে একটি সরু সুন্দর পথ গেছে এই জলভবনে যাবার জন্য। সেটি সেতু নয়। এই জলভবনটির নাম 'নগিনা' বাড়ী। 'নগিনা' অর্থাৎ আংটির মধ্যবর্তী রত্ন। এক সময় এই হ্রদে অনেক কুমীর ছিল। সুলতানেরা এই প্রমোদ-ভবনটিকে দুর্গম করে তোলার জন্য ঐ সব কুমীর এনে এইখানে ছেড়েছিলেন। অনেক সময় অনেককে তাঁরা এই জলে ফেলে দিতেন। এই প্রমোদভবনে যদি কেউ কোন কারণে তাঁদের বিরক্তি উৎপাদন করতো, তাহলে তাকে শাস্তিদানের ঐ ছিল সহজ ও সরল ব্যবস্থা। ইংরাজরা কিছুদিন আগে এখানকার সব জল ছেঁচে বের করে দিয়ে সেই সব কুমীর বিনাশ করেন। এখন এটি সাধারণের নৌকাবিহারের প্রশস্ত স্থান। নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়। চারিপাশে ঢেউ খেলানো পাহাড়ী জমি, ফুলের বাগান, প্রশস্ত পথ ভ্রমণকারীর কাছে স্থানটিকে মনোরম করে তুলেছে।

কাঁকেরিয়ার পাশেই চিড়িয়াখানা।

চিড়িয়াখানার এক প্রান্তে ছোটদের প্রমোদকানন 'বালবাটিকা'। একটি ছোট টিলার উপর অপূর্ব এক খেলাঘর। ছোটদের এই খেলাঘরে বয়স্কদের ঢুকতে হলে ছ'খানা করে টিকিট নিতে হয়, সেটা বোধ হয় বয়স বেশী হওয়ার জরিমানা।

বালবাটিকা পুরোপুরি রূপকথার রাজ্য। রংচঙে বিচিত্র ফটক। ভিতরে রঙীন ফুলের রামধনুর মেলা। বাঁদিকে কয়েকটি সিঁড়ি উঠলেই একটি ছোট পুকুর। পুকুরের

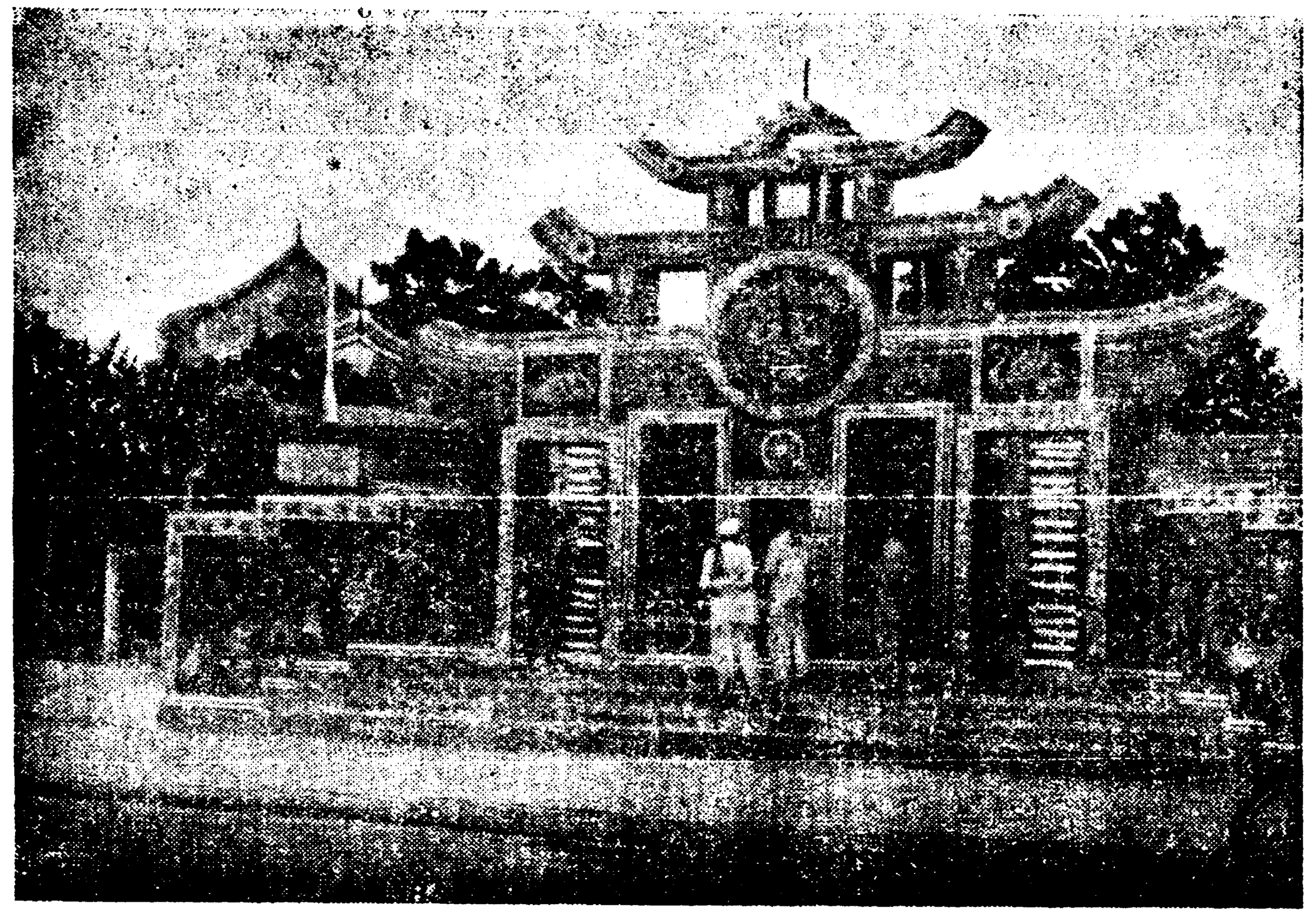

বালবাটিকা
ফটো— শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘাটে একখানি ময়ূরপংখী নাও বাঁধা। নৌকার উপর যেতে কোন বাধা নেই। নৌকার উপর কয়েকখানি ঘর, খেলনা দিয়ে সাজানো। একখানি ঘরে রেকর্ডে গান বাজছে। বাগানের মাঝে সারি সারি পাখীর খাঁচা। তাতে রকমারী পাখী। একপাশে একখানি ঘর, সেই ঘরে নানা জীবজন্তুর ছোট ছোট মডেল। একপাশে একটি গাছতলায় কয়েকটি গাছের গুঁড়ি কেটে ছোটদের বসার মত ছোট ছোট চেয়ার করা আছে। আর একপাশে খানিকটা জায়গা জুড়ে ছোটদের ট্রাইসাইকেল চালানোর পথ। পথের চারিপাশে 'বাঁ দিক্ ধরে চলো'র নানা রকম নিশানা। হাতের কাছে কয়েকখানি ট্রাই-সাইকেলও রয়েছে। উদ্যানের মাঝে একটি বাঁধানো চাতাল। সেখানে উদ্যানের এক

তত্ত্বাবধায়ক আমাদের রেডিও-খেলনার খেলা দেখালেন। খেলাঘরের ট্রাম ও বাস্ মেঝের উপর ছেড়ে দিয়ে রেডিও-কন্ট্রোল-ছড়ি হাতে নিয়ে তিনি একপাশে দাঁড়ালেন। তারপর ছড়ির বোতাম টেপেন আর চাতালের উপর বাস্-ট্রাম ছোটে। কখনো সোজা আসে, কখনো ডাইনে বেঁকে, কখনো বাঁয়ে বেঁকে, কখনো-বা ফিরে যায়। ছোটদের আনন্দ দেবার এমন মনোরম প্রচেষ্টা এর আগে আর কোথাও চোখে পড়ে নি। আমেদাবাদীরা কাপড় বেচে সারা ভারত থেকে পয়সা টেনে আনছে সত্যি, কিন্তু সেই টাকা সার্থক ভাবে ব্যয় করতেও তারা জানে।

ঝুল্‌তি মিনার
ফটো — শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সামনেই চিড়িয়াখানা। অসমতল উচ্চভূমির ঢেউ খেলানো রেখায় ইতস্ততঃ ছড়ানো পাথরের ঢিবিগুলি ও পুষ্পকুঞ্জ চিড়িয়াখানাটিকে উপভোগ্য উপবনে পরিণত করেছে। চিড়িয়াখানাটি আগাগোড়াই দেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময় ছিল না। বাস্‌ওয়ালা বার বার তাগিদ দিয়ে হর্ণ বাজাচ্ছিল। আমরা শুধু চিড়িয়াখানার একটি প্রধান পথ ধরে দু'পাশের দৃশ্য কুড়িয়ে নিতে নিতে দ্রুত এগিয়ে চললাম। তারই মধ্যে দেখা হলো নেকড়ে, চিতা, হায়না, শৃগাল,, সিংহ, উটপাখী, শাদা ময়ূর' ইত্যাদি। বানরের খাঁচার পাশ কাটিয়ে, একটি পুষ্পখচিত টিলার ধার দিয়ে আমরা আবার নেমে এলাম কাঁকেরিয়া তালাওয়ের সামনে প্রশস্ত রাজপথের চৌমাথায়। আমাদের তত্ত্বাবধায়ক বললেন—এখানে আপনারা বড় বেশী দেরী করে ফেললেন, শেষে সময়ের অভাবে হয়তো দ্রষ্টব্য কিছু কিছু বাদ দিতে হবে।

এবার বরাবর এসে নামলাম গোমতীপুরের প্রাচীন মসজিদের সামনে। পাঁচশো

বছরের পুরোনো পাথরের মসজিদ। ভিতরটা দোতলা। পাথরের গায়ে নানা কারুকার্য্য। সামনের দিকে দু' পাশে দু'টি মিনার। এই মিনার দু'টিই এই মসজিদের বৈশিষ্ট্য। মিনার দু'টির উপরে ওঠা যায়। তিনটি তলা, প্রতি তলে ঘেরা বারান্দা আছে। ৭৮টি সিঁড়ি বেয়ে চূড়ায় গিয়ে ওঠা যায়। উপরে উঠে একটু নাড়ালেই মিনারটি দুলে ওঠে, মনে হয় এখনি বুঝি আমাকে নিয়ে একেবারে ভেঙে পড়বে। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! একটি পাথরের মিনার যে মানুষের পদভারে এমন ভাবে দুলতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

এই মিনার দু'টির নাম 'ঝুল্‌তি মিনার'। ইংরাজীতে বলে শেকিং টাওয়ার (Shaking Tower)। তবে দু'টি আর এখন পূর্ণাঙ্গ নেই, আছে দেড়খানা। ডান দিকের মিনারটির উপরের দু'টি তলা ভাঙা। ভেঙেছেন ইংরাজ স্থপতিরা। একটি পাথরের মিনার পাঁচশো বছর ধরে কি জন্য এমন ভাবে কাঁপছে অথচ ভেঙে পড়ছে না তাঁরা সেই রহস্য ভেদ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একটি মিনারের প্রায় অর্ধেকটা ভেঙে ফেলেও তাঁরা এই দোলন-রহস্যের কোন কিনারা করতে পারেন নি। পাঁচশো বছর আগের সেকেলে ভারতীয় স্থপতির কাছে আধুনিক ইংরাজ স্থপতিকে এখানে হার মানতে হয়েছে। অর্ধ-ভগ্ন মিনারটি ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্যার গৌরব বহন করে দাঁড়িয়ে আছে।

এবার আমাদের বাস্ এসে থামলো নগরীর এক পুরোনো পল্লীর মাঝে। পথের পাশেই একটি মসজিদ, তার পাশ দিয়ে নেমে গেছে প্রশস্ত এক সুড়ঙ্গপথ। নীচে একখানি সুদৃশ্য বাড়ী আছে। আমাদের মধ্যে কয়েকজন অত্যুৎসাহী দর্শক তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে সুরু করলেন। আশপাশ থেকে কয়েকজন দোকানী ছুটে এলো, বললো—নীচে কেউ নামবেন না, কাল এখানে দু'টি বড় সাপ দেখা গেছে।

সিঁড়ি থেকে একটু তফাতে দু'টি কূয়া আছে। সেই কূয়া থেকে নীচের কিছুটা দেখা যায়। সাধারণভাবে দেখলে জলই চোখে পড়ে। একটু খেয়াল করে লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, জল যেখানে রয়েছে তার উপর দিকে কূয়াটিকে ঘিরে একখানি বাড়ীর দু'টি তলা দেখা যাচ্ছে। নীচের পাথর কেটে বাড়ীখানি তৈরী।

এই বাড়ীটির নাম দাদা হরিণী ভাও ও মাতর্ ভবানী ভাও। ভাও শব্দটা সম্ভবতঃ ভবন থেকে এসেছে,—মানে গৃহ। এই ভাও তৈরী করেছিলেন আশা ডাকাত। সাত-তলা ভবন। দলবল নিয়ে আশা ডাকাত এক সময়ে এই ভবনে থাকতো। এক ডাকাতে কালীর প্রতিমাও প্রতিষ্ঠা করেছিল এখানে। এক সময় কালীর কাছে নরবলিও হতো বলে জনশ্রুতি আছে। আশা ডাকাত সমস্ত লুঠের সম্পদ্ জমা করতো এখানে। কিন্তু বহু বঞ্চিতের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে সে সম্পদ্ তার ভোগে এলো না।

একদিন সহসা মাটির নীচে থেকে জল উঠতে সুরু করলো, দেখতে দেখতে বাড়ীর তিনটি তলা ডুবে গেল। তারই সঙ্গে ডুবে গেল আশা ডাকাতের ধনাগার। জলের উপর এখন আছে বাড়ীর উপরের অংশটুকু। পাথুরে জমি, তাই একধারে ধ্বসে পড়ে নি। সব কিছু ডুবে যাবার পর আশা ডাকাতের শেষ পরিণতি কি হয়েছিল তার খবর কেউ জানে না। তবে তার এই পরিত্যক্ত গৃহ এখন দর্শকের কাছে ভয় ও বিস্ময়ের উপকরণ হয়ে আছে। উপর থেকে যেটুকু দেখা যায় তাতে আশা ডাকাতের রুচি ছিল এ কথা মানতেই হবে। পাথরের উপর যথা সম্ভব কারুকার্য্য করতে সে বাকী রাখে নি।

এবার আমরা ফিরলাম।

পথে পড়লো আমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালের বিরাট প্রাসাদ। এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। দু' হাজার 'বেড' থাকবে এই হাসপাতালে। এবং এইটিই হবে এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম হাসপাতাল।

ক্যালিকো মিল, স্বামী বিদ্যানন্দের গীতামন্দির ও ভিক্‌টোরিয়া পার্ককে পাশ কাটিয়ে আমরা এসে পড়লাম বল্লভভাই প্যাটেলের বাসভবনে। তারপর আমেদাবাদ শ্রমিক সংগঠনের বিরাট বাড়ী। শ্রমিক সংঘের এত বড় নিজস্ব বাড়ী এ দেশে আর কোথাও নেই। আট হাজার শ্রমিক এই প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত সদস্য, তাদের চাঁদা থেকে এই গৃহ। সে জন্য গৌরবের সামগ্রী।

আমরা এসে নামলাম বেংগলী ক্লাবে। আমেদাবাদ-প্রবাসী বাঙালীদের একমাত্র সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ক্লাবটির অবস্থা খুব ভালো বলে মনে হলো না। অপরিচ্ছন্ন একটি প্রাঙ্গণের মধ্যে পুরানো একখানি একতলা বাড়ী। ভাড়া-বাড়ী। একটি গ্রন্থাগার আছে, কিন্তু পুস্তকের সংখ্যা নগণ্য। শুনলাম সদস্য-সংখ্যাও মাত্র একশো। আমেদাবাদে বাঙালী পরিবার আছে প্রায় সাতশো, সারা সহরের সর্বত্র তাঁরা ছড়িয়ে আছেন, এ কথা সত্য। সহরটিও ছোট নয়, তা-ও মানি। তবে একটি সংঘকে জাতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে বৃহত্তর করে গড়ে তোলার আগ্রহও যে তাঁদের কম, এই ক্লাবটির অবস্থাই তার সাক্ষ্য। কর্মকর্তারা কিন্তু আশাবাদী, বললেন—প্রতিষ্ঠানটিকে একদিন বড় করে তুলতে পারবো বলে আমরা আশা রাখি।

অবশ্য আমেদাবাদে বড় বাংলা গ্রন্থাগার গড়ে তোলার প্রধান অন্তরায় সেখানে বাংলা ভাষা চর্চার কোন ব্যবস্থা নেই। বাঙালী ছেলেরা বাংলা লিখতে পড়তে জানে না। বাংলা কথা তারা বলে, তবে তাতে গুজরাতী টান থাকে। গুজরাতীর মাধ্যমেই ইস্কুলে পড়ানো হয়। বাড়ীতে দু'-চারটে যা বাংলা কথা বলে সেইটুকুই তাদের সব।

সাত শো ঘর বাঙালী অর্থোপার্জ্জন সম্পর্কে এতই ব্যস্ত যে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ কোন খোঁজ-খবর রাখা অধিকাংশের কাছেই বাহুল্য হিসাবে বর্জ্জিত। সেখানে গ্রন্থাগারের পাঠক-সংখ্যা বাড়বে কেমন করে ?

পঞ্চানন্দ

(ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তাঁহার ব্যঙ্গ, শ্লেষ, বিদ্রূপ তীব্র অতি—
দূর করিয়াছে কত দুর্নীতি কি দুর্গতি।
বাঙালী বাঙলা ধনী হইয়াছে তাঁহাকে পেয়ে—
প্রখর প্রতিভা— আনন্দের সে উৎস যে হে !
সব্যসাচীর মত তাঁর শর গমনপথে—
দমন করেছে কতই দর্পী চিত্ররথে।
হাসিতে তাঁহার ব্যথার অশ্রু পড়িত ঝরি,
সে আঘাত করা আপন-করার নামান্তরই।
মর্ম্মভেদী সে ব্যঙ্গ হাসির আতঙ্কেতে
কত দুর্জ্জয় দুষ্কৃতী এলো ন্যায়ের পথে।
সে বাক্‌বিভূতি যেমন সত্য তেমনি প্রিয়,
ইন্দ্রধনুর সপ্ত রঙেতে ভরিত গৃহ।
দেশ ও জাতিকে ভালবেসেছেন প্রাণে ও মনে,
প্রণতি জানাই কল্যাণকৃৎ সে ব্রাহ্মণে।

সামান্য একটু দোলা

শ্রীরেণুকা দেবী

ঘরে ঢুকেই রাখুকে দেখে, প্রথমটা খুব অবাক্ হলেও, পর মুহূর্ত্তেই খুসী হয়ে উঠলো রমু। বেশ আবেগের সঙ্গেই বলল—কি রে, তুই। কোথা থেকে ? ঠিকানা পেলি কোথায় ?

একটারও জবাব না দিয়ে রাখু বলে ওঠে—বেড়ে আছিস তুই ! উঃ, কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা বল্ তো ?

রমুও জবাব না দিয়ে বলে, তারপর কি খবর বল্। কেমন আছিস সব ? মামীমা, মামাবাবু সব ভালো ?

না, ভালো আর কোথায় ? আমাকে দেখে বুঝতে পারছিস নে ? ম্লান হেসে বলে রাখু, অর্থাৎ রাখহরি।

এবার রাখুর দিকে ভালো করে দেখে রমু। আধময়লা জামা-কাপড়, উজ্জ্বল রংএর উপর একটা মলিনতার ছাপ। কে বলবে এই সেই রাখু ? বারে বারে চোখ বুলিয়ে রমু বলে—সত্যি, তোর চেহারা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে।

ভালো করে খেতেই পাই না, চেহারা আর কি করে থাকবে বল্ ? যাক্ গে, বিশেষ দায়ে পড়ে তোর কাছে এসেছি, একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

শুনবো, শুনবো।—বলে রমু হঠাৎ বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে একটু পরেই কয়েকটা সন্দেশ আর চম্‌চম্ নিয়ে। আগে খা, তারপর শুনবো।

রাখু প্রথমটা থতমত খেলেও, শেষে বেশ খুসী হয়েই খেতে আরম্ভ করলো। পাঁচ বছরের ছেলের মত খেতে থাকে রাখু, আর মায়ের মত তৃপ্তি-ভরা চোখে দেখতে থাকে রমু।

রাখহরি আর রমেন,—রাখু আর রমু, মামাতো পিসতুত ভাই। সতের দিনের ছোট বড় দু'জনে। রাখুই ঐ ক'দিনের বড়। ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ হয়েছে। যদিও উচিত মত মানুষ হওয়ার কথা আলাদা জায়গায়, কিন্তু দুর্ভাগ্য রমুর, তিন বছর বয়সেই সে পিতৃহারা।

তিন বছরের রমু, ছ' বছরের দীপু আর আট বছরের মায়া—তিনটী ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী এসে আশ্রয় নেন রমুর মা। বড় ভাই, রাখুর বাবা গোবিন্দবাবু, একটু কৃপণ হলেও লোক খুব খারাপ ছিলেন না। স্থানীয় জমিদারের ম্যানেজার তিনি, প্রায়ই দেখাশোনার কাজে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়। বাড়ীর খবর বিশেষ রাখেন না। তবে বসতবাড়ী, বাগান, পুকুর ইত্যাদি ও ম্যানেজারীর আয়েতে অবস্থা সাধারণের চাইতে সচ্ছলই ছিল।

রমুর মাকে বাপের বাড়ী আসতে দেখে সবচেয়ে খুসী হয়েছিলেন রাখুর মা—রমুর মামীমা। কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত অলস প্রকৃতির লোক আর লোভী; নানা রকম রান্না, খাবার খাওয়ার লোভ ছিল কিন্তু করে খাওয়ার ক্ষমতা ছিল না। তাই রমুর মার হাতে রান্নাঘরের সব দায়িত্ব, সংসারের সব কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। অবশ্য ভাঁড়ার ঘরের ভারটা রাখলেন নিজের হাতে।

একে সব কাজ একলা হাতে করা, তাতে সংসারটীও ছোট নয় নিজের তিনটী আর রাখুরা চার বোন আর রাখু। তবু, ছেলেমেয়ে মানুষ হবে ভেবে, মুখ বুজে সবই সইতে লাগলেন রমুর মা। রাখু ছিল, মায়ের তো বটেই, বাড়ীর সকলের আদরের। পের পর তিনটী মেয়ে হওয়ায় স্থানীয় জাগ্রত দেবতা রাখহরির দোরে মানত করে এই ছেলে। তাই তার নাম রাখহরি। সব তাতেই তার আবদার সবই তার আগে পাওয়া চাই। দীপু ছোট হলেও বোঝে নিজেদের অবস্থা, কিন্তু বোঝে না রমু। ভাঁড়ার ঘর মামীমার হাতে; রাখু দু'টো মোয়া পেলে রমুও তাই চাইবে। নারকোল নাড়ু রাখু কেন চারটে পাবে, ওরা যখন দুটো পেলো? খেতে বসেও প্রায় এক ব্যাপার। রাখুর বড় মাছ ভাজা, যা ভালোবাসে তাই খাওয়াবেন রাখুর মা বসে। এর মধ্যে মাছের ডিম খেতে দু'জনেই ভালোবাসে। কিন্তু রাখুর মা চান রাখুকেই সবটা খাওয়াতে, আর রমুর মা চান শান্তি। ফলে চলে শাসন। রমু বোঝে না, রাগে ফোলে।

রাখু কিন্তু রমুকে ভালোবাসে। ছোটবেলায়, মার চোখ এড়িয়ে, বাইরে এসে রমুকে 'এই নে' বলে দিয়েছে লুকিয়ে-রাখা নাড়ু, মোয়া, সন্দেশ, আতা, পেয়ারা ইত্যাদি। কখনও রমু নিয়েছে, আবার কখনও অভিমানে বলেছে, না, চাই নে আমি। পড়ায় ভালো রমু, খেলায় ভালো রাখু। কিন্তু লোকে রমুরই প্রশংসা করে বেশী। এটা ভালো লাগে না রাখুর মার। রমুর উপরই তাঁর রাগ হয় বেশী।

কিশোরকাল উব্বরা ভূমি। যেমন বীজ বুনবে তেমনি ফসল ফলবে। মায়ের কাছ থেকেই প্রথম জ্ঞানলাভ করে রাখু। তার সরল মনে একটু একটু করে জমা হয় গরল। মা বলেন, কেন ওকে চড়তে দিস তোর সাইকেলে? লেখাপড়া শিখে

জজ সাহেব হবে, তখন কিনে চড়বে। খেতে বসে, ইলিশ মাছের ডিম রমুর অতি প্রিয়, তা তাকে একটুও না দিয়ে জোড়া ডিমই দেবেন রাখুকে। আড়ালে রাখুকে বলেন, তোকে হিংসে করে, তাই চায়।

যথা সময়ে রমু ভাল ভাবে ম্যাট্রিক পাশ করে গেল, কিন্তু রাখু টেষ্টেই গেল আটকে। জমিদারের ম্যানেজার, খাতিরে এত দিন ক্লাসে উঠেছে; কিন্তু এবার তো আর তা হয় না! রাগে ফেটে পড়েন রাখুর মা। রাখুও।

রোগা রোগা চেহারার রমু যখন ঝুঁকে পড়ে বইএর উপর, রাখু তখন ভোরের রোদ আর প্রভাতী হাওয়া গায়ে লাগিয়ে ব্যায়াম করে। মাছের মুড়ো, দুধের বাটী, সর-বাটা ঘি খেয়ে বলিষ্ঠ তার দেহ। চৌদ্দ-পনের বছরের রাখুকে দেখায় আঠারোর মত। রমুর চেয়ে যেন অনেক বড়—অনেক শক্তিশালী! তবু কেন প্রভেদ? প্রভেদ সব দিকেই। লেখাপড়া, আকার-আকৃতি, বেশ-বাস—সব কিছুতেই। রাখুর নিত্য নূতন বায়না। সুন্দর জামা-কাপড়। তারই পুরোনো জামা প'রে রমু মানুষ। তবু সুনাম রমুর! কেন?—কেন?

ইতিমধ্যে মায়ার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। অতিরিক্ত পরিশ্রমে আর অত্যাচারে রমুর মা হঠাৎ মারা গেলেন। দীপু তখন ম্যাট্রিক পাশ করে সবে একটী ছোট চাকরীতে ঢুকেছিল। কত আশা—দুই ভাই মার দুঃখ ঘুচাবে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো রমু, কিন্তু কাঁদলো না দীপু। মার শেষ কাজ সারা করে কেবল বল্ল, এ বাড়ীতে আর থাকা নয়; এদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আর রাখা নয়। চল্।

তার পর কত ঝড়ঝাপ্টার ভিতর দিয়ে মানুষ হয়েছে রমু। টিউশানী করে কলেজের পড়া শেষ করেছে। ওরই এক ছাত্রের বাবা ওকে এই বিলিতি কোম্পানীতে চাকরী করে দেন। মোটা মাইনে। ভবিষ্যৎও ভাল।

ওদিকেও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। বুড়ো জমিদার মারা যাওয়ার পর তাঁর ছেলেরা জমিদারী ভাগ বাঁটোয়ারা করে রাখুর বাবাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। অত্যন্ত কষ্টে আছেন তিনি। মাঝে মাঝে দু'-একজন চেনা-জানা লোকের কাছে মামার বাড়ীর এই দুর্দশার কথা রমুও শুনেছে। যতই হোক, ছোটবেলায় একসঙ্গে মানুষ হয়েছে তো! আজ নিজের সুদিনে আদুরে রাখুর মলিন চেহারা আর খেতে না পাওয়া শুনে সত্যিই মায়া হয় রমুর।

মিষ্টি শেষ করে রাখু বলে, তোদের কোম্পানীতে লোক নিচ্ছে। আমি কিছু ইলেকট্রিকের কাজ জানি। শুনলাম বড় সাহেব মিঃ চৌধুরী তোকে খুব ভালবাসেন, দে না ভাই, বলে-কয়ে এটা করিয়ে। রমুর হাত জড়িয়ে ধরে রাখু।

রমু রাজী হ'ল। সেদিনই দেখা করলো চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে। একটু আশাও পেলো।

রাখু ক'দিন আছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে। রাখুর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছে রমু। এখন রমুর সুখের দিন। আজ আর কিছু মনে নেই। আজ রাখুর জন্য মমতা, সমবেদনা ছাড়া আর কিছু নেই তার মনে। তার চাকরীর জন্যও যথাসাধ্য করছে সে। কাল পাকা কথা পাবে।

খেতে বসেছে দু'জনে। বাটী করে মাছের ঝোল দিয়েছে - ইলিশ মাছের ঝোল। —বাটী ভরা মাছ-ডিম দেখে রাখু খুব খুসী। বলে,—গঙ্গার ইলিশ নাকি? ডিমের টুকরো ভেঙ্গে খেতে গিয়ে হঠাৎ রাখু বলে ওঠে, — মনে আছে রমু, এই ডিম খাওয়া নিয়ে তুই কি রকম হ্যাংলামো করতিস? তুই বাপু, ছোট বেলায় ভারী হিংসুটে ছিলি! আপন মনে বলে চলে,—কি রকম খাওয়া-দাওয়া ছিল তখন! কি মাছ! কেমন দুধ! একটানা সুখের দিনের কথা যতটা মনে পড়ে বলে যায় রাখু। চুপ হয়ে যায় রমু।

কিন্তু কি হ'ল রমুর? হঠাৎ? যেন সমস্ত দুঃখের যে জমাটটা সুখের তলায় থিতিয়ে ছিল, ভেসে উঠলো সামান্য নাড়া পেয়ে। অফিসে বসে সারাদিন ভাবলো। সমস্ত না-পাওয়াগুলো মনে পড়লো। সেই সামান্য মাছের ডিমের জন্য বায়না; নিজে না খেয়ে উঠে গিয়ে, মাকেও সারাদিন অনাহারে রাখা, সামান্য একটা কলার দেওয়া গেঞ্জির জন্য কান্না, মাকে কাঁদানো। কত—কত কথা! দাদার কথাটা মনে পড়লো। মাকে দাহ করে এসে বলেছিল এদের এখানে আর নয়! সেই একটী কথায় চিরদিনের অবুঝ রমু যেন বুঝতে পেরেছিল এদের অত্যাচারেই মার অকালমৃত্যু হয়েছে। একে একে মনে পড়ে সমস্ত খুঁটিনাটি। মনের কোন্ অবচেতন কোণে লুকিয়ে ছিল একটা হিংস্র সাপ, হঠাৎ সামান্য দোলা খেয়ে ফুঁসিয়ে উঠল যেন! এত মায়া, সমবেদনা— কোথায় যেন মিলিয়ে গেল হঠাৎ!

চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে আর দেখা করলো না রমু। বাড়ী ফিরে রাখুকে বল্ল, —হ'ল না রে! এই সামান্য কাজের জন্যও ম্যাট্রিকুলেট আসছে অনেক।

রাখুর ছলো-ছলো চোখ—হতাশ মূর্ত্তির দিকে নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রমু।

মেঘনাদ

(ছোটদের উপন্যাস)

১

টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়েছে সারারাত।

সকাল হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু সূর্য ওঠে নি। হয় তো উঠবেও না। মেঘলা আকাশ এখনও থম্‌থমে হয়ে আছে, যেন ছোট্ট মেয়ে মা'র ওপর অভিমান ক'রে মুখভার ক'রে বসে আছে।

চোখে ঘুম যেন জড়িয়ে আসে। ইন্দ্রনীল পাশ-বালিশটা ভালো ক'রে আঁকড়ে ধরে আবার পাশ ফিরে শুলো। এক ঝলক বিদ্যুৎ জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে যেন মুচ্‌কি হেসে চলে গেল।

মুখে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে ঘরে ঢুকল পৃথা। বেশ চেঁচিয়েই ডাকল, 'দাদা!— দাদা!—দা —দা!'

ইন্দ্রনীলের কানে সে ডাক ঢুকছে এমন কোন পরিচয় পাওয়া গেল না।

এমন ঘুমকাতুরে লোককে নিয়ে পারা যায়? ওদিকে বেলা আটটা বেজে গেছে —ঘড়ি তো আর মেঘের সঙ্গে মিতালী করে থেমে থাকবে না! রাজ্যের কাজ পড়ে আছে পৃথার। তার ওপরে কলেজের পড়া। মিসেস্ গুপ্ত বলে রেখেছেন যে কোন দিন একটা আচম্‌কা-পরীক্ষা নিতে পারেন। গোটা ফস্‌ফরাসের চ্যাপ্‌টারটাই পড়া বাকী। সাধ ক'রে সায়ান্স পড়তে গিয়ে এই এক জ্বালা বিপদ্ হয়েছে তার! কিন্তু দাদারও তো ছুটি নেই! সময় মত তুলে না দিলে শেষে ষাঁড়ের মত চেঁচাবে,—ঝাল ঝাড়বে তারই ওপর। যেন তারই যত দোষ!

পৃথা এগিয়ে গিয়ে দাদার মাথাটা বেশ করে নেড়ে দিল—'বলি শুন্‌ছ? আজ আর উঠতে হবে না? দাদা—দাদা, এই দাদা—!"

কিন্তু ইন্দ্রনীল নির্বিকার। নড়াচড়ার কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না তার।

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ন ভট্টাচার্য্য

হঠাৎ পৃথার মনে পড়ে যায় মুষ্টিযোগের কথা। চকিতে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

মিনিট পাঁচেক পরেই আবার ঘরে ঢোকে পৃথা। এবার তার হাতে এক পেয়ালা ধূমায়িত চা। এবার আর চেঁচানো নয়, আস্তে ইন্দ্রনীলের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'এই তোমার চা এনেছি—বেড্ টি। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে কিন্তু!'

মুহূর্তে অঘটন ঘটে গেল। চকিতে উঠে বসল ইন্দ্রনীল। হাত দু'টো ওপরের দিকে টান করে জড়তা ভাঙবার চেষ্টা করল একবার, তার পর কণ্ঠস্বরে সেই জড়তা নিয়েই বল্‌ল, 'এনেছিস? চিনচিক্ষী চিমেচিয়ে! আশীর্বাদ করি তোদের মিসেস্ গুপ্ত যেন সাত দিন কলেজ চিকাচিমাচিই করেন।'

'চি-ঢং!' ব'লে হাসি-বিরক্তি-মাখা মুখে পৃথা গিয়ে ঘরের জানলাটা খুলে দিল ভালো করে। প্রত্যেক অক্ষরের আগে 'চি' দিয়ে সাঙ্কেতিক কায়দায় কথা বলার মেয়েলী অভ্যাস পৃথার আজও যায় নি—বি. এস্-সি ক্লাসের ছাত্রী হয়েও। ইন্দ্রনীলও সুযোগ পেলেই তার ওপর নিয়মটি প্রয়োগ করে, তবে সবটুকুই ঐ ভাবে বলার ধৈর্য নেই তার।

পাশের বাড়ীর একটি ছোট মেয়ে হারমোনিয়াম্ খুলে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। এতক্ষণ সা-রে-গা-মা সাধছিল, হঠাৎ বোধ হয় তার খেয়াল হয়েছে এমন দিনে একটা বাদলের গান যুৎসই গলায় গাইতে পারলে মানাবে ভালো। তাই সে সুরু করল—

'হ্রী—ঈ-ঈ-দয় আ-আমার নাচ্চেরে আজিকে ময়ূ উ—উ-উ-উ……'

পৃথা আবার তাড়াতাড়ি জানলাটা বন্ধ করে দিল। মুখ ফিরিয়ে বল্‌ল, 'মেয়েটার ওপর ওরা কি অত্যাচারটাই না করছে!—সেই সঙ্গে কবিগুরুর ওপরেও!'

ইন্দ্রনীলের চা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তড়াক্ করে খাট থেকে লাফিয়ে পড়ল সে। তার পর ঘড়ির দিকে তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠল 'আরে ব্বাস্! সা-ড়ে আঠ বজ গয়া!' উত্তেজনার সময় রাষ্ট্রভাষায় কথা বলতেই সে ভালবাসে।

মুখ-হাত ধোয়া, দাড়ি কামানো ইত্যাদি সেরে খেয়াল হ'ল—তাই তো, বর্ষায় জামাকাপড়গুলোও স্যাঁৎসেঁতে হয়ে কুঁচকে আছে, একটু ইস্তিরী না করে নিলেই নয়। তার মানে আজ আর খবর-কাগজটা পড়া হ'ল না। যাক্ কে, বগলে নিয়ে বেরোলেই হবে। আপিসে কাজের ফাঁকে দেখে নিলেই চলবে। এখন বৃষ্টিটা একটু ধরে, তবেই না! রাস্তার অবস্থা না জানি কেমন হয়েছে! হয়তো জলে কাদায় একেবারে যাচ্ছে তাই! বিশেষ ক'রে এই টালিগঞ্জের রাস্তাগুলো।

পৃথা এর মধ্যেই স্নান-ট্নান সেরে পরিপাটী করে সেজে নিয়েছে। মুখে পাউডার বোলাতেও একরত্তি ভুল হয় নি! বেশ আছে এই মেয়েগুলো! পৃথিবী রসাতলে যাক্, কিন্তু সাজপোষাকের একটু এদিক্ ওদিক্ হবার যো নেই। গলায় টাই বাঁধতে

বাঁধতে আর গুণ্ গুণ্ করে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে ভাবতে লাগল ইন্দ্রনীল।

মোড়ের মাথায় বাস্ দাঁড়িয়ে। বাদুড়-ঝোলা হয়ে লোক চলেছে। আপিস্-টাইম, প্রত্যেকটা মিনিটের দাম এখন একশ' ডলার; টাকা দিয়েও ও জিনিষ পাওয়া কষ্ট-কর। শিখ ড্রাইভার অবশ্য তখনও প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে—'চ্যামবাজার—চ্যামবাজার—খালি গাড়ী—খালি গাড়ী।'

পর পর তিনখানা বাসে উঠবার বিফল চেষ্টা করে, জুতোয় প্রচুর কাদা আর প্যাণ্টের পায়ায় প্রচুর কাদা-জল মেখে ইন্দ্রনীল চতুর্থ বাসের পাদানীতে কোন রকমে উঠে পড়ল। বাস্ বিদ্যুৎ-গতিতে এঁকেবেঁকে ছুটে চল্‌ল সহরের কেন্দ্রের দিকে—যেখানে "প্রাণ ধারণের গ্লানি"র পাত্র কানার কানায় পূর্ণ হয়ে আছে বিভিন্ন আপিসের কোটরে কোটরে।

হঠাৎ ইন্দ্রনীলের খেয়াল হ'ল পাশের লোকটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। লোকটি তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কোথাও তাকে কোনদিন দেখেছে বলেও কিছুতেই মনে করতে পারল না। অথচ লোকটি এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যেন, ওর মধ্যে গভীর সন্দেহজনক কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে সে।

কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল ইন্দ্রনীলের। অথচ মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারে না। অগত্যা জোর করে মুখের মধ্যে একটু হাসি টেনে এনে বাইরের জনসমুদ্র দেখবার ভান করা ছাড়া আর কী-ই বা করা যেতে পারে?

কিন্তু শুধু একা ঐ লোকটিই নয় তো! বাসের আরও দু'-চার জন লোক, মনে হ'ল, যেন তাকে খুঁটিয়ে দেখছে—গভীর আগ্রহ সহকারে। এমন কি দু'-একজন চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বল্‌লও। ইন্দ্রনীল শুনতে পেল না বটে কিন্তু বেশ বুঝতে পারল, তার সম্বন্ধেই কোন কথা হচ্ছে। বোকার মত সে একবার নিজের পোষাকের দিকে তাকাল। নাঃ, তেমন কোন গলদ দেখা যাচ্ছে না তো! তবে?

এদিকে ওদের ইসারা-ইঙ্গিত যেন ক্রমেই বাড়ছে! কি ব্যাপার! নেমে পড়বে নাকি ইন্দ্রনীল বাস্ থেকে?

গাড়ী এস্প্ল্যানেডের কাছে এসে বাঁক ঘুরল। শিখ কণ্ডাক্টার তখনও সমানে চেঁচাচ্ছে '—চ্যামবাজার—চ্যামবাজার—খালি গাড়ী—খালি গাড়ী!'

(ক্রমশঃ)

জ্যৈষ্ঠ মাসে

শ্রীউৎপল সেনগুপ্ত

জ্যৈষ্ঠ মাসে—জ্যৈষ্ঠ মাসে
সুর্য্যিমামা অট্ট হাসে।
শোঁ শন-শন্ গরম হাওয়া—
যায় না মোটে বাইরে চাওয়া।
সবুজ মাঠ করছে ধূ-ধূ,
ধূলোই ধূলো উড়ছে শুধু।
সৃষ্টি যেন কাঁপছে ত্রাসে
জ্যৈষ্ঠ মাসে—জ্যৈষ্ঠ মাসে ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসে—জ্যৈষ্ঠ মাসে
মিনি ঘুমোয় কুঁজোর পাশে।
"আইস্‌ক্রীম—সস্তা দাম,"
সারা দেহে ঝরছে ঘাম।

ছুটির দুপুর—কেবল ঘুম,
পড়াশোনার নেইকো ধূম।
ঘেমে-নেয়ে পিওন আসে
জ্যৈষ্ঠ মাসে—জ্যৈষ্ঠ মাসে ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসে—জ্যৈষ্ঠ মাসে
দুষ্টু ছেলে কি উল্লাসে
আমবাগানে ছুঁড়ছে ঢিল,
দূরে কোথা' ডাক্‌ছে চিল।
দাদুর টাকে জ্বলছে কি!
হীরা মুক্তা পান্না কী?
তেঁতুল খেয়ে খুকু কাসে,
জ্যৈষ্ঠ মাসে—জ্যৈষ্ঠ মাসে ॥

এখানে

শ্রীশৈলেন দত্ত

আজো গোধূলির অশথের ছায়াতলে
চোখ গেল পাখী বলে, চোখ গেল হায়—
মেঠোপথে যেতে কাজল দীঘির জলে
বধূ বলে, সখি! বেলা পড়ে এল, আয়।

ঝিল্লী ঝিমায় ঘুম্ ঘুম্ পাখ্‌নাতে,
জোনাকিরা গাঁথে আজও সাতনরী হার,
ঘুম্‌তী নদীটি আজিও নিশুত্ রাতে
রুম্ ঝুম্ গানে তোলে কত ঝঙ্কার।

সকালে সূর্য্য রাঙা মেঘে আঁকে কুম্ কুম্,
ঘুম-ভাঙা পাখী শটিবনে করে চুল্‌বুল্,
রাঙা-প্রজাপতি উড়ে আসে ফুলে ঘুম্ ঘুম্
কৃষ্ণ-কাজল ভ্রমরের গানে মশ্‌গুল্।

রামপ্রসাদের কণ্ঠ এখানে ছড়ানো,
শঙ্খমালার সুরে সুরে দিন ভরানো।

ম্যাজিক শেখ

যাদুরাজ এস, ডি, মুখার্জ্জী

ভারতীয় একটী অতি পুরাতন অথচ চিরনূতন খেলা আজ তোমাদের শেখাতে বসেছি। এই খেলাটির গুপ্ত কৌশল তোমাদের কাছে ফাঁস করে দিচ্ছি বলে আমার যাদুকর বন্ধুরা অনেকেই হয়তো আমার উপর চটে যাবেন। কারণ তাঁরা নানা উপায়ে এই খেলাটি দেখিয়ে থাকেন।

খেলাটি হ'চ্ছে প্রায় দু' গজ সূতো খেয়ে ফেলে পেটের চামড়া কেটে তার ভেতর থেকে তা টেনে বার করা। শুনে হয়তো তোমরা আঁৎকে উঠছ। ৩১ বছর আগে আমিও যখন প্রথম এই খেলা দেখি তখন চম্‌কে উঠেছিলাম। বাড়ীতে ফিরে সেদিন খেতে পারি নি পর্য্যন্ত! এখন ভাবলে হাসি পায়।

যাদুকর একটি লোককে নিয়ে ষ্টেজে প্রবেশ করলেন লোকটির গায়ে জামা-কাপড় নেই, গেরুয়া কাপড় পরা, মাথায় গেরুয়া টুপি। যাদুকর এঁকে একজন যোগী বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এর পরে পর পর যা ঘটল বলছি:

(১) যাদুকর প্রায় দু' গজ লম্বা একটি সূতো যোগীর হাতে দেওয়া মাত্র তিনি তার একটা মুখ নিজের মুখে লাগিয়ে সোঁ করে মুখের ভেতর সমস্ত সূতোটুকু টেনে নিলেন, তার পর (২) মুখ হাঁ করে দেখালেন সে মুখের ভেতর সূতো নেই। (৩) এক গ্লাস জল তাঁর হাতে দেওয়া মাত্র তিনি কিছুটা পান করলেন ও গ্লাসটা যাদুকরের হাতে ফেরৎ দিলেন। (৪) যাদুকর গ্লাসটী অপর এক সহকারীর হাতে দিতেই সে সেটা নিয়ে ষ্টেজের বাইরে চলে গেল। (৫) যোগী ধ্যানস্থ হলেন এবং ধ্যানস্থ হওয়া মাত্র (৬) যাদুকর একটী ধারাল ছুরী নিয়ে যোগীর পেটের একস্থানে সামান্য একটু চিরে দিলেন ও (৭) তার ভেতর থেকে রক্ত মাখা খানিকটা সূতো বার করে এনে দেখালেন যে পেটের চামড়ার ভেতর থেকেই ঐ সূতো বার হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে টেনে টেনে সমস্ত সূতোটুকুই বার করে নিলেন। (৮) এর পরই যোগীর যোগ-

নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল এবং ধীরে ধীরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন—পেটের কাটা অংশের উপর ২।৩ বার হাত বুলোলেন, এবং শেষে (৯) আবার সামান্য জল খেয়ে চলে এলেন একেবারে দর্শকদের মাঝখানে। (১০) দর্শকেরা পেটে কাটার কোন দাগই দেখতে পেলেন না।

তোমাদের বুঝবার সুবিধা যাতে হয় সেই জন্যই ১, ২, ৩ ক'রে কার পর কি করা হ'ল তা লিখে গেছি। এখন খেলাটার কৌশল বলে দিচ্ছি।

যিনি যোগী সেজেছেন তিনি আসলে হচ্ছেন যাদুকরেরই সহকারী এবং অভিনয়ে বেশ পাকাপোক্ত। তাঁর পেটে, কাপড়ের কষির ঠিক উপরেই, আর একটা দু' গজী সুতো (যার স্থানে স্থানে লাল রং মাখা থাকবে) পূর্ব্ব থেকেই গুটিয়ে প্লাস্‌টারএর তলায় রেখে গায়ে আটকানো ছিল। প্লাষ্টারের উপর তূলি দিয়ে গায়ের রংএর মত রং করা ছিল ব'লে সামান্য দুর থেকেও কেউ ওটাকে প্লাষ্টার বলে বুঝতে পারছিল না। বাকি অংশটা সহজ। সুতো মুখে টেনে নিয়ে চিবোবার ভান করে গালের পাশে লুকিয়ে রেখে হাঁ করে মুখ খালি দেখান হ'ল। এবার গ্লাসে জল খাবার সময় গ্লাসের জলে মুখ থেকে সুতো বের করে পাচার করা হ'ল। গ্লাসটা তো অন্য সহকারী সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে চলে যাবেন। সুতো টেনে বার করবার সময় ছুরী দিয়ে প্লাষ্টার সামান্য তুলে ফেললেই সুতোর মুখ পাওয়া যাবে। ইচ্ছা করলে হাতে আগে থেকেই সামান্য আল্‌তা রাখা যেতে পারে। সুতোটা তার উপরে রেখে আস্তে আস্তে টানলেই হ'ল। এর পর যোগী কি করে প্লাষ্টার সরিয়ে ফেলে দর্শকের কাছে গেলেন তা নিশ্চয়ই তোমাদের বলে দিতে হবে না ?

মনোরঞ্জন-স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

(চৈত্র, ১৩৬৪

"তোমার "হবি' বা শখ কি ?"—এ বিষয়ে সবচেয়ে ভাল লেখার জন্য পুরস্কার পেলেন শ্রীশুভেন্দুশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (হাওড়া)।

আর যাঁদের লেখা ভাল হয়েছে—শ্রীসুবীরকুমার সরকার (গড়বেতা), শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ঘোষ (শান্তিপুর), শ্রীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (রাঁচী), শ্রীমুকুলরাণী রায়চৌধুরী (কলিকাতা-১২), শ্রীসন্ধ্যামালতী দাশগুপ্তা (নিউ দিল্লী)।

কি ও কেন ?

মদ খেলে মাতাল হয় কেন ?

বিজ্ঞানের ভাষায় মদ হচ্ছে 'অ্যাল্‌কহল্‌'। এই অ্যাল্‌কহলের একটা গুণ (গুণ বা দোষ যাই হোক) হচ্ছে খুব সহজেই এটি শরীরের রক্তের সঙ্গে মিশতে পারে এবং তার ভিতর দিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে খাস মগজে গিয়ে পৌঁছায়। সাধারণতঃ দেখা যায় মগজের যে সব স্নায়ুকোষ বেশী উন্নত ধরণের—যেগুলি বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে সেগুলিই আগে এই অ্যাল্‌কহলে আক্রান্ত হয়, এবং সাময়িক ভাবে বিকল হয়ে পড়ে। যেমন ধর, শরীরের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে যে স্নায়ুকোষ সেটা বিকল হলে ঠিক মত দাঁড়ানো যায় না—পা টলতে থাকে,—মাতালদের যা সর্বদাই হয়।

মাতলামির প্রথম অবস্থায় বেশ একটা স্ফূর্তি স্ফূর্তি ভাব লক্ষ্য করা যায়। সময় সময় মাতালরা একটু বেশী কথা বলে এবং কথায় কথায় হাসে। যারা বলে মদ খেলে প্রথমে শীররটা চাঙ্গা চাঙ্গা লাগে সেটা এই অবস্থা ছাড়া কিছু না। আসলে মগজের যে সব স্নায়ুকোষ কথা বলা, হাসা ইত্যাদি কাজগুলি নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলি ধীরে ধীরে তাদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার দরুণই ঐ রকম হয়—ওগুলিকে বশে রাখবার কেউ থাকে না কিনা! কিন্তু, এর পরবর্তী অবস্থাতেই, যখন মগজ আরও গভীর ভাবে আক্রান্ত হয়, তখন আর মাতালে পাগলে বিশেষ প্রভেদ থাকে না—কিংবা একেবারে বেহুঁশ অবস্থা এসে পড়ে—যার নাম "টুপ্‌ ভুজঙ্গ" অবস্থা।

কান্না কি দোষের ?

ছিচ্‌কাঁদুনের নাকে কান্না নিশ্চয়ই দোষের। ছিচ্‌কাঁদুনেকে কে পছন্দ করে? কেউ না। তবে সময় বিশেষে কান্না দরকার বৈকি! মনে কর, খুব দুঃখ বা শোকের সময়। তখনি আমাদের মগজ এমন ভাবে উত্তেজিত হয় যে তার পক্ষে স্বাভাবিক কাজ করা

অসাধ্য হয়ে পড়ে। বেশীক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকলে মগজের ক্ষতি হতে পারে। ঐ অবস্থায় যদি খানিকটা কাঁদতে পারা যায়—বেশ চেঁচিয়ে, তা হলে অনেক সময় দেখা যায় মনটা কিছু হাল্কা হয়ে ঘুম এসে পড়ে এবং মগজও প্রয়োজনীয় বিশ্রাম পেয়ে ক্ষতিটা সামলে নিতে পারে। এজন্য মনস্তাত্বিকরাও বলেন—গভীর দুঃখে কাঁদতে না পারলে সেটা বেশ ভয়ের কথা। কবি টেনিসনের সেই বিখ্যাত কবিতাটা হয়তো অনেকে পড়েছ—'হোম্ দে ব্রট্ হার ওয়ারিয়র্ ডেড্।" যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন সেনাপতি, তাঁকে বাড়ী নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁর স্ত্রীর অবস্থা কল্পনা করা যায় না। মুখে থম্থমে ভাব। তখন সবাই বল্ল "শী মাষ্ট্ উইপ্ অর শী উইল্ ডাই ।"—ওঁকে কাঁদতে দাও, নইলে উনি মারা যাবেন।

তবে সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে কান্নাটা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকরই। কান্নার সময় নিঃশ্বাস ঠিক মত নেওয়া যায় না এ তো সবাই জানে, আর সেটা সামলাবার জন্য মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়। শুধু তাই নয়, কান্না পেলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও স্বাভাবিক থাকে না - স্বাস্থ্যের পক্ষে সেটাও নিশ্চয়ই ভাল নয়। এমনও দেখা গেছে বেশীক্ষণ কান্নার পর ক্ষিধে-বোধ থাকে না, অনেকে ঘুমুতেও পারে না। এর কোনটাই স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়।

তবে ছোট ছেলেমেয়েদের বেলা একথা খাটে না—শিশুর পক্ষে ঘুম পরম প্রয়োজন। শরীরের বাড়ের জন্যও শিশুর পর্যাপ্ত ঘুম দরকার। বিজ্ঞানীরা বলেন, যে শিশু যত বেশী ঘুমোয় তার শরীর তত বেশী পুষ্ট হয়।

ঘুমোলে নাক ডাকে কেন ?

চলিত কথায় 'নাক ডাকা' বললেও আসলে ঐ শব্দটা হয় গলার কাছে ; নাক দিয়ে শব্দটা বাইরে প্রকাশ পায় বলেই বলা হয় নাক ডাকছে।

হাঁ করলে মুখের ভিতর দিয়ে দেখা যায় গলার গর্তের কাছে ছোট্ট একটা জিনিষ ঝুলছে। দেখতে অনেকটা জিভের মত, সেই জন্যই বোধ হয় ওটাকে বলা হয় আলজিভ'। গলা থেকে দু'টো নল ভিতরে নীচের দিকে চলে গেছে,—একটা খাদ্যনালী, আর একটা শ্বাসনালী। এখন, কোন কোন লোকের ঘুমুবার সময় একটা বিশেষ ভঙ্গীতে শুলে এই আলজিভটা পড়ে যায়। ফলে নিঃশ্বাস টানবার সময় ঐখানে বাতাস বাধা পায় আর কেমন একটা ঘোৎ ঘোঁৎ শব্দ হয়। এরই নাম নাক ডাকা। জেগে থাকলে আলজিভ তার স্বস্থানেই থাকে, তাই ও রকম শব্দ হতে পারে না। অনেক সময় দেখা গেছে, কেউ হয়তো খুব নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল, ঘুমের ঘোরেই হঠাৎ সে

পাশ ফিরে শুলো, অমনি নাক ডাকা বন্ধ হয়ে গেল। এরও কারণ বার করা কঠিন নয়। শোওয়ার ভঙ্গী বদলানোয় আলজিভটা আবার ঠিক জায়গায় এসে পড়ল। কাজেই নিঃশ্বাসও আর বাধা না পেয়ে অনেকটা নিঃশব্দে যাওয়া-আসা করতে লাগল। নাক ডাকাও তাই বন্ধ হ'ল।

তুমিও পারো

আমাদের নিত্যব্যবহার্য বহু জিনিষ আছে যা আমরা খুব অল্প খরচে এবং অল্প পরিশ্রমে করতে পারি। এতে শুধু যে পয়সা বাঁচানো যায় তাই নয়—এই সব কাজ হাতে করে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার তুলনা নেই। একটার কথা বলি।

ছবি আঁকবার জন্য ক্রেয়ন পেন্সিল বা ছোট ছোট মোম-রং তোমরা হামেশাই ব্যবহার কর। এগুলো নিজেরা বানানো কিছু কঠিন নয়। এর জন্য দরকার কয়েক রকম গুঁড়ো রং, কিছু ভুষো কালি, খানিকটা সাদা মোম, গঁদ আর চর্বি। যে রংএর পেন্সিল তৈরী করতে চাও সেই রংএর গুঁড়ো ব্যবহার করতে হবে। যেমন নীল রংএর জন্য প্রাশিয়ান্ ব্লু, হলদে রংএর জন্য ক্রোম ইয়োলো, কালো রংএর জন্য ভুষো কালি, ইত্যাদি। রং গাঢ় বা হাল্কা করতে হলে রংএর গুঁড়ো তদনুযায়ী বেশী বা কম ব্যবহার করলেই হ'ল।

কি করে করবে ? প্রথমে একটা এনামেলের বাটি যোগাড় কর। এবারে কুড়ি থেকে চল্লিশ ভাগ মোম, দশ ভাগ চর্বি, পাঁচ ভাগ গঁদ আর প্রয়োজন মত দশ থেকে পনেরো, কুড়ি, এমন কি তিরিশ ভাগ পর্যন্ত রং নিয়ে ঐ বাটীতে রাখ। কোন্ জিনিষ ঠিক কত ভাগ লাগবে তা বার কয়েক করলেই বুঝতে পারবে। এবার ঐ মশলাগুলি সমেত বাটীটা গরম করলেই চর্বি, মোম ইত্যাদি গলে যাবে। ঠিক মত গরম হলে বাটীটা নামিয়ে সমস্ত মশলাগুলি খুব ভাল করে ঘুঁটতে থাক। ঘুঁটতে ঘুঁটতে সবগুলো যেন খুব ভাল ভাবে মিশে যায়। এইবারে দেখবে জিনিষটা ঠাণ্ডা হয়ে ক্রমে জমে আসছে।

ইতিমধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট পেন্সিলের ছাঁচ হাতের কাছে তৈরী রাখবে। কাঠের বা মাটীর ছাঁচ হলেও ক্ষতি নেই। মশলার মিশ্রণ জমে এলেই তাড়াতাড়ি সেগুলি ঐ ছাঁচে ঢেলে দেবে। তার পর খানিকক্ষণ ফেলে রাখলেই ওগুলো জমাট বেঁধে ছাঁচের আকার অনুযায়ী পেন্সিলের রূপ নেবে। তখন বের করে নিলেই হ'ল। দেখবে কেমন চমৎকার ক্রেয়ন্ পেন্সিল হয়ে গেছে !

সেকালের সামরিক পত্র

বাংলা দেশে সাময়িক পত্রের ছড়াছড়ি অনেক দিন থেকে। রামধনুর এই তিরিশ বছরে ছোটদের পত্রিকাই তো কম করে খান পঞ্চাশেক দেখলাম,—বেরোতে সুরু করল আর কিছুদিন পরেই বন্ধ হয়ে গেল। কোনটার আয়ু ২।৩ মাস, কোনটার ৫।৬ মাস, কদাচিৎ কোনটা বছর ঘোরে। অবশ্য এর চেয়ে বেশী দিন চলেছে এবং একবার বন্ধ হয়ে আবার নতুন করে চলতে সুরু করেছে এমন কাগজও অনেক দেখেছি, এবং তার মধ্যে বেশ ভাল কাগজও ছিল। তবে বেশীর ভাগ পত্রিকাই স্বল্পায়ু। এর কারণ বোধ হয়—যে ধৈর্য, অর্থবল, পরিশ্রম, অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি নিয়ে পত্রিকা বার করা উচিত অনেক ক্ষেত্রেই তার অভাব ছিল। "একখানা কাগজ বার করলে কেমন হয়?" "ভালই হয়।"—বন্ধুবান্ধবেরা উৎসাহ দেন। কিন্তু তার পেছনে যে বিরাট দায়িত্ব সেটার কথাও ভাবা দরকার। অনেকেই কিন্তু ভাবেন না। সুতরাং ফল হয় দুঃখদায়ক।

ছোটদের পত্রিকার চেয়ে বড়দের পত্রিকার সংখ্যা আরও বেশী এবং অকালমৃত্যুর সংখ্যাও ততোধিক। কিন্তু এ নিয়ে দুঃখ করে কি হবে?

পুরোনো আমলের এই সব কাগজ ঘাঁটতে কিন্তু আমার খুব ভাল লাগে। ওর মধ্যে সমসাময়িক যুগের নানা ঘটনা, তর্ক-বিতর্ক, মজার মজার মন্তব্য—এক কথায় সে যুগের একটা নিখুঁত ছবি পাওয়া যায় কিনা! মনে পড়ে, একবার এক মফঃস্বল সহরে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার লাইব্রেরীতে খুব পুরোনো একখানা 'বান্ধব' পত্রিকা পেয়েছিলাম। ওটা যে সময়কার সেই সময় ল্যান্সডাউন সাহেবের নেতৃত্বে ইংরেজদের সঙ্গে স্বাধীন মণিপুরের যুদ্ধ হচ্ছিল। সে সময়কার দৈনন্দিন ঘটনা —রেসিডেন্ট সাহেবের অত্যাচার, টিকেন্দ্রজিতের বন্দী হওয়া—এই সব ব্যাপার প্রতি সংখ্যায় এমন বিস্তারিত ভাবে থাকত যে তার ঐতিহাসিক মূল্য এখন অনেক। ঐ সব পড়ে, তার পর কিছু দিনের জন্য পুরোনো সাময়িক পত্রিকা সংগ্রহ আমার একটা বাতিক হয়ে দাঁড়াল।

সেকালকার পত্রিকার নাম কেমন হ'ত? প্রায়ই বেশ গাল-ভরা নাম, এখন যা শুনলে কানে খটোমটো মনে হবে। 'পশ্বাবলী' পত্রিকার কথা চৈত্র সংখ্যায় বলেছিলাম। সেকালকার নামকরা পত্রিকার মধ্যে সমাচার দর্পণ, বিবিধার্থ সংগ্রহ, সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অবলাবান্ধব, তত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতি কত রকম কাগজ ছিল! একখানা খুব ভাল কাগজের নাম ছিল সোমপ্রকাশ। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন এর সম্পাদক। কবি দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সুরধুনী কাব্যে এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন — "সোমবারে সুধা ক্ষরে যাঁর লেখনীর।" প্রতি সোমবার এই পত্রিকা বেরোত—তাই

নাম ছিল সোমপ্রকাশ। আধুনিক যুগেও "শনিবারের চিঠি" প্রথমে সাপ্তাহিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতি শনিবারে বেরোত বলে ঐ নাম দেওয়া হয়। এখন অবশ্য পত্রিকাটি মাসিক পত্র হয়ে যাওয়ায় ও-নামের সার্থকতা কমে গেছে। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় এই রকম 'রবিবার' নাম দিয়ে একটি ছোটদের সাপ্তাহিক এক সময়ে প্রতি রবিবারে বার করতেন। সেটা অবশ্য অনেক দিন বন্ধ হয়ে গেছে, তবে শ্রীদিলীপ দে চৌধুরীর ও শ্রীশৈলেন ঘোষের সম্পাদনায় ঐ নামে আর একখানি সাপ্তাহিক হালে বেরোচ্ছে। ক্ষিতীশ বাবু শ্রীঅখিল নিয়োগীর সহযোগিতায় 'মাস পয়লা' নামে একখানা কাগজও বার করেছেন অনেকদিন। মাসের প্রথম তারিখে বেরোবে বলে ঐ নাম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঘটনা বিপর্যয়ে মাস পয়লা মাস কাবারে দাঁড়াচ্ছে দেখেই হয়তো ওঁরা তখনকার মত ওটি বন্ধ রাখেন। বড়দের 'প্রবাসী' পত্রিকাও প্রথমে বেরোত এলাহাবাদ থেকে। সেই জন্য ওর নামকরণ হয় প্রবাসী। পরে প্রবাসী প্রবাস ছেড়ে কলকাতায় উঠে আসায় ও-নামেরও এখন সার্থকতা নেই। প্রবাসীর প্রথম সংখ্যার প্রথম পাতায় রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত "প্রবাসী" নামক কবিতাটি বেরিয়েছিল—"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।" 'ভারতবর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রথম পাতায় বেরিয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ" গানটি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদিত পত্রিকার নাম ছিল বঙ্গদর্শন। সে আমলে অত ভাল পত্রিকার কথা লোকে ভাবতেই পারত না। বহু দিন পরে, বছর কয়েক আগে, আরও দু'-একবার 'বঙ্গদর্শন' নাম দিয়ে একাধিক কাগজ বার করার চেষ্টা হয়। একটির সম্পাদক (তাঁর নামও বঙ্কিমচন্দ্র—তবে চাটুয্যে নয়) আমায় বলেছিলেন—"আমরা একেবারে হুবহু বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বার করব। এমন কি ওর মলাটটিও হবে হুবহু সেই রকম।" কিন্তু মলাট আর নাম (এমন কি সম্পাদকের নামেরও খানিকটা) এক হলেই তো আর ভেতরটা এক হয় না! তাই বোধ হয় ও কাগজ চলে নি, যেমন চলে নি পরবর্তী যুগের (২য় পর্যায়ের) 'সন্দেশ'—অন্যতম কর্ণধার হিসাবে রায় চৌধুরী পরিবারের সুবিনয় বাবুকে পেয়েও।

পত্রিকার নামকরণে সেকালকার সম্পাদকদের বাহাদুরীর কথা তুললে কবি ঈশ্বর গুপ্তের একখানি পত্রিকার নাম আগে মনে পড়ে। পত্রিকাখানির নাম ছিল "পাষণ্ড-পীড়ন"। অর্থাৎ, উদ্দেশ্য,—ঐ পত্রিকা মারফৎ পাষণ্ডদের পীড়ন করা হবে। অবশ্য এই পত্রিকার মূল লক্ষ্য ছিল গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ সম্পাদিত 'রসরাজ'! এই দুই পত্রিকারই প্রধান কাজ ছিল পরস্পরের সঙ্গে কবিতা-যুদ্ধ ও পরস্পরকে প্রাণ খুলে গালাগালি। কিন্তু শুধু এই গুণ সম্বল করে কোন কাগজই যে টিকে থাকতে পারে না—এ যুগেও তো তা আমরা হামেশাই দেখেছি!

শিশুসাহিত্যিক-পরিচিতি

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

জন্ম—১৪ই আশ্বিন, ১৩১৯। জন্মস্থান—ঢাকুরিয়া।

ছাত্রজীবন শুরু হয় ঢাকুরিয়া এম্. ই. স্কুলে। তার পর বালীগঞ্জ জগবন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউশন্ ও ভবানীপুর আশুতোষ কলেজ।

কর্মজীবন সুরু হয় পুস্তক ব্যবসায়ের মধ্যে দিয়ে। এই উপলক্ষ্যে ইনি বাংলা ও বাংলার বাইরে বহু জায়গায় ঘুরেছেন এবং সেই সুযোগে বাংলা সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের জন্যও চেষ্টা করেছেন আপ্রাণ। বর্ত্তমানে ইনি কলকাতার একটি বিশিষ্ট প্রকাশনা-ভবনের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

সাহিত্যজীবন সুরু হয় ১৯৩৬ সাল থেকে। বয়স্কদের জন্য যেমন, তেমনি ছোটদের জন্যও প্রচুর লিখেছেন, এবং দু'দিক দিয়েই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। অনুবাদও করেছেন অনেক। এঁর বিভিন্ন বইএর মধ্যে কয়েকখানির নাম—পঞ্চতন্ত্রের গল্প, ছোটদের বিশ্বসাহিত্য, বিজ্ঞানের শেষ বিস্ময়, মোহন সিংহের ফাঁসী, মঙ্গল গ্রহে বৈজ্ঞানিক, বাংলা ভাষা গড়লো যারা, সুইস্ ফ্যামিলি রবিনসন, থ্রী মাস্কেটিয়াস', ওডিসির গল্প, কিড্‌ন্যাপ্‌ড, ট্রেজার আইল্যাণ্ড, বাংলার টার্জান, কেনিলওয়ার্থ, আইভ্যান হো প্রভৃতি।

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত ঃ

জন্ম—২১শে চৈত্র, ১৩১৯। জন্মস্থান—খাসকান্দি, ফরিদপুর।

ছাত্রজীবন সুরু হয় গ্রামের পাঠশালায়। তার পর গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) রাজেন্দ্রকিশোর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন! এর পর ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই. এ, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে বি এ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ। এম্. এ পরীক্ষায় দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবনে প্রথমে সাংবাদিক-বৃত্তি গ্রহণ করেন। কেশরী, বন্দে মাতরম্, দৈনিক আজাদ ও দৈনিক যুগান্তরের সহকারী নৈশ-সম্পাদক রূপে কাজ করার পর ১৯৩৮ থেকে অধ্যাপনায় ব্রতী হন, এবং হবিগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি কলেজে অধ্যাপনার পর বর্তমানে উত্তরপাড়া (হুগলী) ও কলকাতার উইমেন্‌স্ কলেজে অধ্যাপকপদে নিযুক্ত আছেন।

ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্যচর্চা সুরু। প্রথম বই প্রকাশিত হয় অধুনালুপ্ত 'খেয়ালী' সাপ্তাহিকে। তার পর 'দেশ'এ প্রথম উপন্যাস বেরোয়। শিশুসাহিত্যে প্রথম প্রবেশ অধুনালুপ্ত কৈশোরিকা পত্রিকা মারফৎ। পরে অন্যান্য শিশুসাময়িকপত্রেও লিখতে সুরু করেন।

এঁর লেখা বই—কিশোর সংঘ, ভূতের গল্প নয়, পথিক মানুষ, ঘরছাড়া দিক্‌হারা, দুর্লভ শা'র বাড়ী, অমর মরণ, নতুন যুগের রূপকথা, শেষ রাতের অতিথি, তোমাদের গল্প, লুপ্ত গৌরব প্রভৃতি।

যে গল্প জানা নেই

(গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা বারোয়ারী উপন্যাস)

শ্রীমুকুলরাণী রায় চৌধুরী

—উনিশ—

উমা হঠাৎ একখানা চিঠি পেল। অপরিচিত হাতের লেখা, কিন্তু ভারী চমৎকার হাতের লেখাটা। খামখানাও বেশ দামী ; ভিতরে কেমন একটা ভুরভুরে গন্ধ!

গোপালের হাতের লেখা উমার জানা। শুধু জানা নয়, তার লেখার প্রতিটি টান ওর মুখস্থ। এ চিঠি যে গোপালের নয় তা খাম না খুলেই সে বুঝল। তবে? কে তাকে এমন খামে হঠাৎ চিঠি লিখবে?

"ভাই উমা," মেয়েলি ধাঁচে আরম্ভ হয়েছে চিঠিখানা।—"তুমি আমায় চিনবে না, কখনও দেখা হয় নি তো! কিন্তু একদিক্ দিয়ে তুমি আমি এক যোগসূত্রে বাঁধা। তুমিও যেমন গোপালের দিদি, আমিও তেমনি ওর দিদি। তফাৎ শুধু এই, তুমি আশৈশব ওর দিদি হয়ে আছ, আমি এই ভাইটিকে পেয়েছি অল্প দিন হ'ল। তাই তোমার ওপর ভারী হিংসে হচ্ছে,—এমন চমৎকার মিষ্টি ভাইটিকে তুমি এতদিন একা দখল করে রেখেছিলে ভেবে।

"এখন বোধ হয় বুঝতে পারছ আমি কে। আমি গোপালের বন্ধু সুমিতের দিদি। কিন্তু সুমিতের চাইতে ওরই দিদি হয়ে পড়েছি বেশী। বোধ হয় শুনেছ, গোপাল যেদিন এখানে আসে সেদিন মোটর এক্‌সিডেন্টে সুমিত অচেতন হয়ে যায়। গোপালের জন্যই সুমিতকে আমরা ফিরে পেয়েছি আর সেই সঙ্গে ওকেও পেয়েছি সত্যি করে। এতটুকু ছেলের মধ্যে এত বড় প্রাণ কি করে এল তাই ভাবি।

"যাক্, গোপাল এখন পুরোপুরি আমাদের বাড়ীর লোক হয়ে গেছে। ইস্‌কুলেও ভর্তি হয়েছে। সুমিতের সঙ্গে একত্রই যায়। বেশ স্ফূর্তিতে আছে। খুব কবিতাও লিখছে। ওর জন্য মাসীমাকে ভাবনা করতে বারণ ক'র। তুমিও ক'র না।

"গোপালের কাছে তোমার কথা এত শুনেছি যে তোমাকে আর এখন অপরিচিতা মনে হয় না। তাই নিঃসঙ্কোচে এই চিঠি লিখলাম। জান উমা, আমি কোন দিন পাড়াগাঁ দেখি নি।

আমাদের আধুনিক পরিবার—ছুটি পেলেই আমরা দার্জিলীং. সিমলা, দিল্লী, ওয়ালটেয়ারের দিকে ছুটি. সত্যিকার বাংলা দেশ বলতে কি বোঝায় কোন ধারণাই নেই প্রায়। আমাদের আত্মীয়স্বজনেরাও ঐ রকম। তাঁরা লণ্ডন আর প্যারিস সম্বন্ধে যতটুকু খবর রাখেন বাংলার কোন মফঃস্বল সম্বন্ধে তার সিকির সিকিও রাখেন না। এই মেকী-সভ্যতা আমার একটুও ভাল লাগে না। গোপালের কাছে আমি তোমাদের গাঁয়ের কথা শুনেছি। কত গল্প হয় ওর সঙ্গে! ওর মুখে শুনে শুনে তোমাদের গ্রাম আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।

"তবু ইচ্ছে করে একবার ওখানে ছুটে যেতে। ইট-কাঠপোরা এই পাথুরে সভ্যতা ছেড়ে একবার দেখে আসতে সত্যিকার পল্লী বাংলাকে। গোপালই এদিক্ দিয়ে আমার চোখ খুলে দিয়েছে।

"তোমার সঙ্গেও বসে আলাপ করতে খুব ইচ্ছে করে। গোপালের দিদি তুমি নিশ্চয়ই গোপালের মতই বুদ্ধিমান্। কিন্তু তুমিও কি ঐ রকম মুখচোরা? যাক, আপাততঃ চিঠিতে তো তোমার সঙ্গে সই পাতান যাক—আমরা যাকে বিলিতী কায়দায় বলি 'পেন্ ফ্রেণ্ড'।

"কিন্তু প্রথম দিন আর বেশী বকাব না। ভাববে, মেয়েটা কি নির্লজ্জ! আমার ভালবাসা জেন। মাসীমা আর মেসো মশাইকে আমার প্রণাম জানিও। —ইতি তোমার অপরিচিতা বন্ধু দীপা।"

চিঠিখানা পেয়ে উমা তো অবাক্। গোপালের কাছে দীপার কথা সে অনেক শুনেছে কিন্তু এই ছোট্ট চিঠির মধ্যে ওর সমস্ত রূপটা—সমস্ত মনটা যেন সম্পূর্ণ ভাবে ধরা দিল তার কাছে। "গোপাল তা হলে সুখেই আছে ওখানে। আমার জন্য মন খারাপ করবার কিছু নেই তা হ'লে ওর!"

আনন্দের মধ্যেও কোথায় যেন একটা ছোট্ট কাঁটা থেকে থেকে উমার মনের ভেতর বিঁধতে থাকে।

(ক্রমশঃ)

জেনে রাখ

শ্রীসমীর মজুমদার

পৃথিবীর ব্যাস কত? আমরা বলতে বলি ৮০০০ মাইল। আসলে ওটা হচ্ছে পূর্ব-পশ্চিমে ৭৯২৬ মাইল ১০৪১ গজ, আর উত্তর-দক্ষিণে ৭৮৯৯ মাইল ১০২৩ গজ। এই রকম পৃথিবীর পরিধিও পূবে-পশ্চিমে মাপলে হবে ২৪৯০২ মাইল, উত্তর-দক্ষিণে মাপলে হবে ২৪৮৬০ মাইল।

পৃথিবীর মোট আয়তন কত? ১৯,৯৪,৪০,০০০ বর্গ মাইল। এর মধ্যে ৬,৩৫,৫৬,০০০ বর্গ মাইল হচ্ছে জল, বাকীটা স্থল।

পৃথিবীর ভিতরটা এখনও গরম আছে। যত নীচে যাওয়া যাবে তত গরম বাড়বে। প্রতি ৬০ ফুট নীচে নামলে ১ ডিগ্রী করে উত্তাপ বেড়ে যাবে। এর থেকেই আন্দাজ করা যায় পৃথিবীর কেন্দ্রে অর্থাৎ ৪০০০ মাইল আন্দাজ নামতে পারলে কত গরম লাগত। কিন্তু দুঃখের বিষয় মানুষ এ পর্যন্ত দেড় মাইলও নামতে পারে নি।

আজগুবি ছড়া

আবু কায়ছার

ব্যাং বাবাজীর ঠ্যাং ভেঙেছে খেলতে গিয়ে বল.
তাই না দেখে শঙ্খচূড়ের চক্ষে ঝরে জল।
বাঘের গুহায় ছাগ-শিশুরা যাচ্ছে বারে বারে,
পরীর দেশের আজব আজব গল্প শুনিবারে।

ব্যাধের সাথে হরিণ দলের গলায় গলায় ভাব,
তীর ধনু তার নেইকো হাতে, কীই বা তাতে লাভ?
পুঁচ্‌কে হাঁদা খরগোসটা বনের রাজা তাই,
সিংহ মশাই চুপ্‌টি ব'সে, মনেতে সুখ নাই।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

উঃ, কি গরমটাই না পড়েছে! ছেলেবেলায় হিন্দুস্থানী উপকথায় উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা একখানা ছবির কথা মনে পড়ছে—"পুড়ে মরলাম—পুড়ে মরলাম!" আমাদেরও প্রায় সেই দশা। কলকাতায় নাকি গত ৩৪ বছরের মধ্যে এমন গরম আর পড়ে নি! যারা পশ্চিমের লু-এর মধ্যে কাটাতে অভ্যস্ত তাদের কথা স্বতন্ত্র। তা ছাড়া তাদের রাতটা তো এমন নয়! দিনের বেলাও ঘরে দোর দিতে পারলেই রেহাই। (আমিও ছেলেবেলায় পশ্চিমে কাটিয়েছি কিছু দিন।) কিন্তু আমাদের এই পোড়া কলকাতায় যে দিনে-রাতে সমান! প্যাচ্‌পেচে ঘাম, অহোরাত্র ঝরছেই—ঝরছেই! তার পর ঘাম থেকে ঘামাচি। দুঃখের কথা আর বল কেন!

এ-হেন অবস্থায় মন খুলে চিঠি লেখা যায়? আঃ, কবে বর্ষা আসবে! আমার প্রিয় ঋতু বর্ষা! "নীলনবঘনে আষাঢ় গগন" ছেয়ে যাবে। আপনা আপনিই ছুটবে তখন কলম।

বৈশাখের রামধনু তা হলে তোমাদের ভালই লেগেছে? বিলম্বে প্রকাশও ক্ষমার্হ বলে বিবেচিত হয়েছে? এ সব কথা যারা লিখেছ তাদের কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব ভেবে পাচ্ছি না। ভালবাসা মানুষকে সত্যি মহৎ করে।

শ্রীজম্বা রায় (আইজটনগর)—রামধনুর এবারকার মলাট এঁকেছেন শিল্পী শ্রীত্রিভঙ্গ রায়; অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য তিনি। শুধু ছবির হাত নয়, গল্প-কবিতার হাতও এঁর সুন্দর। শ্রীলীলা

মজুমদারের বকধার্মিক, যত দূর জানি, এখনও বই হয়ে বেরোয় নি। তবে বেরোবার কথা হচ্ছে। কেম্ব্রিজের গল্প ও ছাত্রজীবন সম্বন্ধে তোমার বাবা ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ রায়ের লেখাগুলো বেরিয়েছিল, ১৩৪৪-১৩৪৫ সালের (১০ম-১১শ বর্ষ) রামধনুতে-পৌষ ও মাঘ সংখ্যায়! কিন্তু অত পুরোনো রামধনু তো আর আমাদের কাছে নেই। সব নিঃশেষ হয়ে গেছে,—এক অফিস কপি ছাড়া। শ্রীগোপালচন্দ্র মল্লিক ঠাকুর—(বিক্রমপুর)—মানুষের ব্যক্তিগত রুচি তো বিভিন্ন হবেই—নইলে পৃথিবীতে এত বৈচিত্র্য কি করে আসত? কিন্তু কল্পনাকে বাদ দিলেই কি কবিতা হয়? যা কিছু বাস্তব তাই কি কবিতা? তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। তুমি যে পত্রিকার কথা লিখেছ সেটা আমি এখনও দেখি নি—এমন কি ওর নামও অপরিচিত মনে হচ্ছে। কোথা থেকে, কবে থেকে বেরোচ্ছে ওটা? শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত (ভাগলপুর)—তোমার পরীক্ষায় সাফল্যলাভের কথা জেনে খুব খুসী হলাম। পরের বারে আরও এক 'প্লেস' ওঠা চাই। নেতাজী সম্বন্ধে বইএর সম্ভব মত তালিকা ও প্রকাশকের নাম পৃথক্ ভাবে তোমাকে পাঠাবার চেষ্টা করব। শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ (বোম্বাই)—তোমার নতুন ক্যামেরায় তোলা ছবি সুবিধামত দেখিও। তুমি তো বেশ গুণী লোক দেখছি! বাংলা, হিন্দী দুই ভাষাতেই বেশ গল্প লেখ, ফটো-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পাও! বাহাদুর বলতে হবে। তোমার "এলিক্যান্টার" আত্মপ্রকাশে কেন দেরী হচ্ছে তা পৃথক্ পত্রে জানিয়েছি। পেয়েছ নিশ্চয়ই। ৺দিনেন্দ্রনাথ (কুমার?) রায়ের "জাল ডিটেকটিভ" গল্পটি আমি এখনও যোগাড় করতে পারি নি। সেটা দেখে এবং বর্তমান লেখকের সঙ্গে আলাপ করে এ বিষয়ে তোমাকে জানাব। শ্রীঅমল ও শ্রীঅরুণ সেনগুপ্ত (কলিকাতা-১০)—মহাকালের পূজারী রামধনুর জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯ থেকে সুরু হয়ে আষাঢ় ১৩৬২তে শেষ হয়েছিল। যতদূর জানি, এখনও বই হয়ে বেরোয় নি। শ্রীহারাণচন্দ্র সরদার (বৈঁচবেড়িয়া)—কবি জয়দেব বাঙ্গালী কিনা সে সম্পর্কে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন এ কথা ঠিকই। কেউ কেউ তাঁকে উৎকলী বলে দাবী করেছেন; কিন্তু তাঁদের অনুমান যুক্তিসহ বলে মনে হয় না। আমার এক উৎকলী বন্ধু তো, শুধু জয়দেব কেন, কালিদাস, বাল্মীকি,—সকলকেই উৎকলী বলে দাবী করেন। তাঁর যুক্তিটা অনেকটা এই রকম: উৎকলী ভাষা খুব শ্রুতিমধুর, এঁদের লেখাও তাই। সুতরাং—! জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব বা কেন্দুলি গ্রাম বীরভূম জেলায়—শান্তিনিকেতন থেকে খুব বেশী দূর হবে না। এখনও সেখানে জয়দেবের স্মৃতি উপলক্ষে প্রতি বছর মেলা হয়। ঐতিহাসিকরাও প্রায় সকলেই জয়দেবের বাঙ্গালীত্ব সম্বন্ধে স্থিরমত। শ্রীসৃষ্টিধর মুখোপাধ্যায় (চাঁদবাটী)—তোমার প্রাণখোলা চিঠি পেয়ে ভারী ভাল লাগল। 'যে গল্প জানা নেই' অনেক দিন থেকে বেরোচ্ছে কিনা, তাই ওর পূর্বকথা লিখতে গেলে অনেক কিছুই লিখতে হয়। তাই আর ওটা দেওয়া যায় নি। শ্রীগুণধর বর্ধন (ঝাড়বনী, পোঃ আমলাগোড়া, জেলা মেদিনীপুর)—তোমার হাতে-লেখা পত্রিকা 'সাধনা'র জন্য রামধনুর পাঠকপাঠিকাদের কাছে লেখা ও ছবি চেয়েছ—সে কথা তোমার হয়ে তাঁদের জানাচ্ছি।

আজ আর নয়। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি শেষ করি। —ইতি রাঃ সঃ

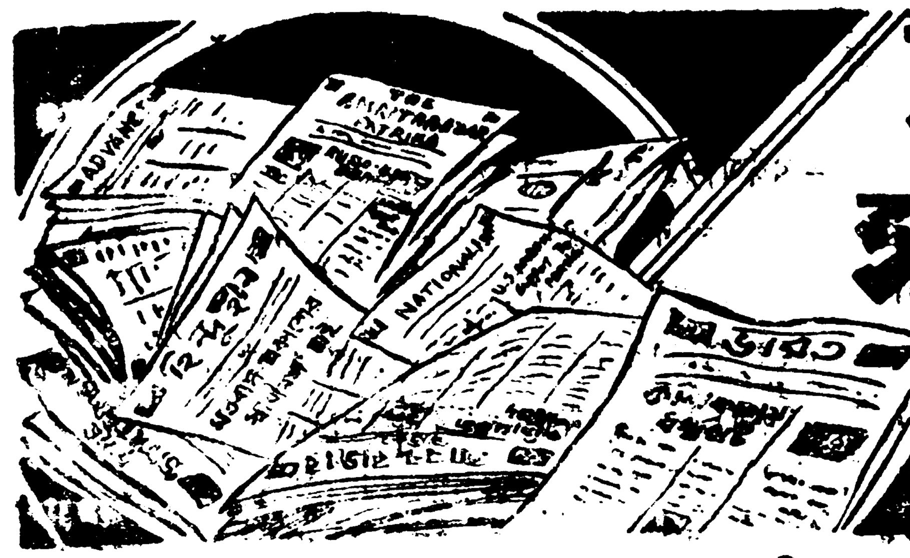

আমাদের সংবাদ পত্র বিভাগ

বিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক অনুরূপা দেবীর মৃত্যুতে বাংলা কথাসাহিত্যের একটি উজ্জ্বল তারা নিভে গেল। অনুরূপা দেবী ছিলেন এমন এক যুগের লেখিকা যখন বাংলা ভাষায় মহিলা সাহিত্যিকের সংখ্যা ছিল অতি সামান্য। অনুরূপা দেবীই ছিলেন তাঁদের শীর্ষস্থানীয়া, তাই তাঁকে বলা হ'ত 'সাহিত্যসম্রাজ্ঞী'। পরিণত বয়সে কলম প্রায় বন্ধ করলেও তাঁর মা, পোষ্যপুত্র, মন্ত্রশক্তি, মহানিশা প্রভৃতি বইগুলি বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে।

*

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকারের তিরোভাব, পরিণত বয়সে হলেও, বাংলার পক্ষে আর একটি দুঃসংবাদ। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী হিসাবে তিনি যেমন অগণিত ছাত্রের শ্রদ্ধা অর্জন করে গেছেন তেমনি ভারতীয় ইতিহাসে মৌলিক গবেষণা করেও ভাবীকালের জন্য রেখে গেছেন অক্ষয় কীর্তি।

*

রামধনুর বন্ধুদের জন্য আমরা আর একটি দুঃসংবাদ বহন করে আনছি। সুলেখিকা কল্যাণী দেবীর অকালপ্রয়াণের সংবাদ। কল্যাণী দেবী খুব বেশী লিখতেন না, কিন্তু রামধনুর পাঠকপাঠিকাদের কাছে তিনি ছিলেন খুবই পরিচিত। তাঁর লেখা মজাদার গল্পগুলি ছিল তাদের কাছে পরম উপভোগ্য। এই সেদিনও তিনি 'চন্দ্রবাবুর ব্রিজ' নামে একটি অতি সুন্দর গল্প তাদের উপহার দিয়ে গেছেন।

কল্যাণী দেবী ছিলেন প্রখ্যাত এঞ্জিনীয়ার শ্রীকরুণাকুমার দত্তগুপ্তের কনিষ্ঠা কন্যা এবং ভাগলপুরের এডভোকেট শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ রায়ের পত্নী। তাঁর কন্যা শ্রীমতী রত্নাবলী দেবী রামধনুর বহুদিনের পুরোনো গ্রাহিকা।

কল্যাণী দেবী কলকাতার ডায়োসেশন কলেজ থেকে বি. এ পাশ করেন ১৯৩২ সালে। অল্প বয়স থেকেই ইংরেজী, বাংলা নানা কাগজে তাঁর লেখা বেরোত। বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত—তিনটে ভাষাই তিনি খুব ভাল জানতেন। সাহিত্যচর্চায় যেমন ছিল তাঁর শখ তেমনি সুগৃহিণী হিসেবেও ছিল তাঁর খ্যাতি। নিজেই তিনি ছেলেমেয়েদের পড়াতেন; রান্নাবান্না করতেও খুব ভালবাসতেন। তাঁর মিষ্টি স্বভাবের জন্য সকলেই তাঁকে ভালবাসত। মাত্র ৪৮ বছর বয়সে তাঁর পরলোকগমন পরম দুঃখের সন্দেহ নেই।

*

টোকিওতে তৃতীয় এশিয়ান্ ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার খবর: যোগদানকারী ২০টি দেশের মধ্যে জাপানের সঙ্গে কেউ পারে নি, ফিলিপাইন্‌স্ ২য় হয়েছে, আর ভারতের কাছ থেকে গত ৩০ বছরের বিশ্ব-হকি-চ্যাম্পিয়নশিপ ছিনিয়ে নিয়েছে পাকিস্তান।

বারান্তরে এ বিষয়ে ভাল করে লেখা হবে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১—গয়া, ২—রাণীগঞ্জ, ৩—পাটনা, ৪—বর্দ্ধমান, ৫—ঢাকা, ৬—পুনা, ৭—চন্দ্রভাগা ৮—কটক, ৯ —চাইবাসা, ১০—রামগড়, ১১—পুরী, ১২—দানাপুর, ১৩—বেনারস, ১৪—বিহার ১৫—বিপাশা, ১৬—জয়পুর, ১৭—আরা, ১৮—গাইবাঁধা, ১৯—কলতা।

উত্তরদাতাদের নাম : নির্ভুল উত্তর কেউই দিতে পারেন নি। যাঁদের বেশীর ভাগ উত্তর ঠিক হয়েছে তাঁদের নাম দেওয়া হ'ল :—নন্দিতা সেন (নয়া দিল্লী) ; কমলা বন্দ্যোপাধ্যায় (নাগপুর), মহেন্দ্র বিশ্বাস (কলিকাতা-৬) ; রাবেয়া ও লুৎফউন্নীসা (ঢাকা) ; কমলকুমার ঘোষ (দমদম্) ; কুশলকুমার দাশগুপ্ত (কলিকাতা-২৯) ; সেবা, রেবা, দ্বিজেন ও নৃপেন রায় (বিশগঞ্জ) ; নূপুর ও ও ঝরণা (এলাহাবাদ) ; সাত্যকী বসু (পাটনা) ; ফজলুল হক্ ও নুরুল হক্ (বহরমপুর) ; কল্পনা দেবী (কলিকাতা-২৬) ; অধিরাজ ও শ্রাবণী সেনগুপ্ত (কলিকাতা-১৯) ফুলু, টুলু, মান্তা, সুধীন, উমা, গৌরী (দিল্লী) ; অমিতাভ ও অশোক চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর)।

নূতন ধাঁধা

নীচের প্রত্যেকটি লাইনে ২টি ক'রে সংখ্যা দেওয়া আছে। প্রত্যেকটি সংখ্যার বদলে একটি করে উপযুক্ত শব্দ বা শব্দাংশ বসালে লাইনগুলির অর্থ বোধগম্য হবে। কিন্তু সেগুলি এমন ভাবে নির্বাচন করতে হবে যে প্রতিটি লাইনেই প্রথমটির আদ্যক্ষর যা হবে ২য়টির আদ্যক্ষর হবে বর্ণমালা ক্রম অনুসারে তার পরের অক্ষর, কিন্তু বাকিটুকু হবে একই। যেমন প্রথমটি যদি হয় 'কাল' তবে ২য়টি হবে 'খাল'। এই ভাবে চেষ্টা কর :—

১। পায়ে ১ বাড়লে ২ খাওয়া উচিত নয়।
২। মেঘের ৩ না পেলে ক্ষেতের ৪ প্রাণ পায় না।
৩। ৫ বহর নিয়ে ৬তলায় গিয়ে বসলাম।
৪। ৭ কেউ ৮বতের নাম শোনে নি, হায় রে'!
৫। পাতে একটু ঝোল দাও, কেবল ৯ ১০ কেন ?
৬। বান এসে ধানের ১১ ১২ জলে ভাসিয়ে দিল।
৭। এক ১৩ মাকিন এনে আমায় ১৪ কর দেখি!
৮। ১৫র মধ্যে সাপ ঢুকেছে, শীগ্‌গির ১৬।
৯। ১৭ বল, এ কোথায় এসে পড়১৮ ?
১০। ১৯তটা ভাল করে ২০ দরকার।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ॥০ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১॥০ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কার্য্যালয় — সম্পাদক
১৩১বি, রসা রোড — শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য,
কলিকাতা-২৬ — বিএ

সুরিনা স্পেশাল
কালি
আপনার কলমের আয়ু অক্ষুন্ন রাখে!
সুপ্রীম কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ • কলিকাতা

বিশুদ্ধতায়, স্বাদে ও গন্ধে
অতুলনীয়

লক্ষ্মী ঘি

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর সর্ব্বত্র
সমাদৃত

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষায় অদ্বিতীয়

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন-২২·৭২৪৩

বাহির হইল বাহির হইল

প্রত্যেক কপি—।৵০

শুকতারা বার্ষিক ৪৲

ফাল্গুনে ১০ম বর্ষে পড়িল

DICTIONARIES
by
A. T. DEV

English to Bengali

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৬৲
Students' Dictionary	৮৲
National Dictionary	৬৲
Jewel Dictionary	৫৲
ঐ পাতলা কাগজে	৪৲
Pocket Dictionary	৪৲

Bengali to English

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৫৲
Students' Dictionary	৬৲
Pocket Dictionary	২৷০

Bengali to Bengali

নূতন বাংলা অভিধান	২০
শব্দবোধ অভিধান	৮৲
ছাত্রবোধ অভিধান	৬৷০
সরল অভিধান	৩৲
পকেট প্রকৃতিবোধ অভিধান	২৲

পূজাবার্ষিকী

কয়েকখানি নাম দিলাম

১।	নব পত্রিকা	৪৲
২।	জয়যাত্রা	৪৲
৩।	দেবালয়	৪৲
৪।	ইন্দ্রধনু	৪৲
৫।	বসুধারা	৪৲
৬।	পরশমণি	৪৲

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর বই

=প্রহেলিকা সিরিজ=
[৪৯ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কুমারিকা সিরিজ=
[১২ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ৸০

=বিশ্বচক্র সিরিজ=
[৫৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ॥০

=বিচিত্রা সিরিজ=
[৩ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ২৲

=জীবন-চরিতাবলী=
[প্রায় ১০০ খানি বই]

=বিশ্ববিজ্ঞান সিরিজ=
[১০ খানি বই]

=ছেলেদের নাটক=
[২২ খানি বই]

=কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ=
[২৪ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কৃষ্ণা সিরিজ=
[৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৷০

=অনুপমা সিরিজ=
[৫ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৷০

=পিরামিড সিরিজ=
[২৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৷০

=জনশিক্ষা গ্রন্থমালা=
[১৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ॥৵০

=পৌরাণিক গল্প=
[প্রায় ৪০ খানি বই]

=মেয়েদের নাটক=
[৪ খানিবই]

এবার পুজায় বাহির হইল

১। যত হাসি ততই মজা—শিবরাম চক্রবর্ত্তী— ২৲
২। পূজার দিনের উপহার—সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲

এ ছাড়া

উপন্যাস, ভ্রমণ ও অ্যাড্ভেঞ্চার, শিকার-কাহিনী, রূপকথা ধর্ম্মগ্রন্থ, উপনিষদ্ গ্রন্থ, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দামোদর ও সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থমালা বাহির হইয়াছে।

'সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯

রামধনু-সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের

লেখা বই

—বিজ্ঞানের গল্প—
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা
আবিষ্কারের গল্প
*আকাশের গল্প
*বিজ্ঞান বুড়ো

—উপন্যাস—
ধূমকেতু
রাত যখন সাতটা
*রাধামাধবের রত্নহার

—বিদেশী বই অবলম্বনে—
দি ব্ল্যাক্ টিউলিপ্
দি ইলিয়াড্
দি অডিসি

—ছোট গল্প—
*জন্মদিনের উপহার
৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের সহযোগে
*গল্পসল্প
*ছুটীর গল্প
*আজব গল্প
*অনেক গল্প

—নাটিকা—
অয়েল পেন্টিং

—যন্ত্রস্থ—
ছোটদের বিশ্বকোষ
(আনুমানিক ১২ খণ্ডে

* চিহ্নিত বইগুলি বর্তমানে ছাপা নেই

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের

লেখা বই

—উপন্যাস—
পদ্মরাগ ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি
* সোনার হরিণ

—বিদেশী বই অবলম্বনে—
দি চ্যানিংস

—নাটিকা—
দমাদম্ দামোদর

—ছোট গল্প—
চায়ের ধোঁয়া, এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ গল্প
* হাস্য ও রহস্য * নূতন পুরাণ
* হুকাকাশির গল্প

* চিহ্নিত বইগুলি বর্তমানে ছাপা নেই।

ছোটদের বই

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

রায় পাহাড়ীর নিশাচর
(রহস্য-উপন্যাস) ৸০

অনুসন্ধানী
(সাধারণ জ্ঞান) ১৷০

কুপারের

দি লাষ্ট অফ্ দি মোহিকান্স্
(শ্রীঅমলেন্দু সেন অনূদিত) ॥৵০

ডিকেন্সের

অলিভার টুইষ্ট
(শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত) ॥৵০

একখানি দরকারী বই

অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

ঘরে বসে হরেক রকম রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করার সহজ প্রণালী।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ—দাম ১৷০

রামধনু কার্য্যালয়ঃ ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫

Regd. No. C– 1641

স্থাপিত – ১৩৩৭ ফোন–৩৫–২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পতাকা মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

/২৷৷০, /৫, ৷৮ সেরা ডাইস্ টীনে,
মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ– শ্রীঅমৃত লাল কুমার।
মিল ও অফিস – ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২ টাকা ২৫ ন. প., প্রতি সংখ্যা ৩৭ ন প. ভি. পি তে আরও ৭১ ন. প. বেশী লাগে। নমুনার জন্য ৩৯ ন প.র ডাকটিকেট পাঠাতে হয়।

২। বৈশাখে বছর সুরু, যে কোনও মাসে চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যায় কিন্তু পত্রিকা নিতে হবে বৈশাখ কিংবা কার্ত্তিক থেকে।

৩। কোন মাসে পত্রিকা না পেলে ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে তাঁদের উত্তরসহ সেই মাসের মধ্যে আমাদের জানাতে হবে।

৪। গ্রাহকদের সব চিঠিতেই গ্রাহক নং দিতে হবে। চিঠির জবাবের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাকটিকেট দিতে হবে।

৫। লেখা, কপি রেখে, সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা—ম্যানেজার রামধনু। ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫ (টেলিফোন : ৪৮-৩১৮১)

বিজ্ঞাপনের হার (সংশোধিত)

প্রতি বারের জন্য :—

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ৫০ টা, অর্দ্ধপৃষ্ঠা ২৮ টা., সিকি পৃষ্ঠা ১৬ টা.। প্রতি কলম ইঞ্চি ৬ টা

মলাট : ৪র্থ পৃষ্ঠা ১০০ টা.

মলাট : ২য় বা ৩য় পৃষ্ঠা — ৮০ টা. অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৪ টা., সিকি পৃষ্ঠা ২৪ টা.

ছবি বা লেখার সামনের পৃষ্ঠা ৬০ টা, অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৩৬ টা., সিকি পৃষ্ঠা ২০ টা.

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

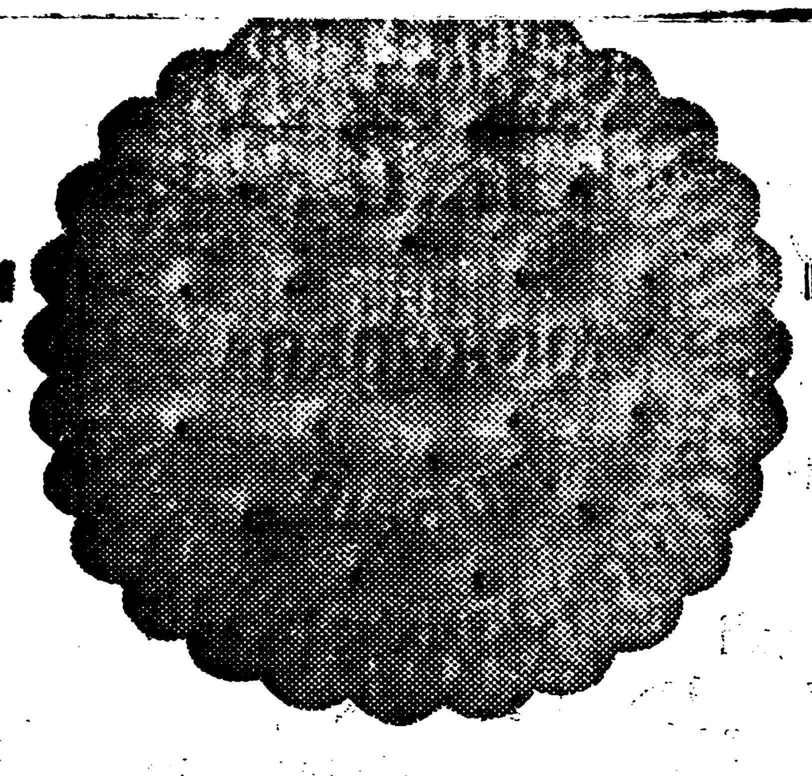

বিজ্ঞাপনের মতামতে
কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে ?
স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,
'থিনের' মধ্যে; গুনে, স্বাদে সবার সেরা "কোলে"

অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,
সবরকমের "কোলে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

ভিটামিন সমৃদ্ধ

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ

বাহির হইল   বাহির হইল

প্রত্যেক কপি—৷৵৹

শুকতারা বার্ষিক ৪৲

ফাল্গুনে ১০ম বর্ষে পড়িল

DICTIONARIES
by
A. T. DEV

English to Bengali

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৬৲
Students' Dictionary	৮৲
National Dictionary	৬৲
Jewel Dictionary	৫৲
ঐ পাতলা কাগজে	৪৲
Pocket Dictionary	৪৲

Bengali to English

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৫৲
Students' Dictionary	৬৲
Pocket Dictionary	২৷৹

Bengali to Bengali

নূতন বাংলা অভিধান	২০
শব্দবোধ অভিধান	৮৲
ছাত্রবোধ অভিধান	৬৷৹
সরল অভিধান	৩৲
পকেট প্রকৃতিবোধ অভিধান	২৲

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর বই

= প্রহেলিকা সিরিজ =
[৪১ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

= কুমারিকা সিরিজ =
[১২ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ৸৹

= বিশ্বচক্র সিরিজ =
[৫৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ৷৹

= বিচিত্রা সিরিজ =
[৩ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ২৲

= জীবন-চরিতাবলী =
[প্রায় ১০০ খানি বই]

= বিশ্ববিজ্ঞান সিরিজ =
[১০ খানি বই]

= ছেলেদের নাটক =
[২২ খানি বই]

= কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ =
[২৪ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

= কৃষ্ণা সিরিজ =
[৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৷৹

= অনুপমা সিরিজ =
[৫ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৷৹

= পিরামিড সিরিজ =
[২৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৷৹

= জনশিক্ষা গ্রন্থমালা =
[১৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ৷৵৹

= পৌরাণিক গল্প =
[প্রায় ৪০ খানি বই]

= মেয়েদের নাটক =
[৪ খানিবই]

পূজাবার্ষিকী

কয়েকখানি নাম দিলাম

১।	নব পত্রিকা	— ৪৲
২।	জয়যাত্রা	— ৪৲
৩।	দেবালয়	— ৪৲
৪।	ইন্দ্রধনু	— ৪৲
৫।	বসুধারা	— ৪৲
৬।	পরশমণি	— ৪৲

এবার পুজায় বাহির হইল

১। যত হাসি ততই মজা—শিবরাম চক্রবর্ত্তী— ২৲
২। পূজার দিনের উপহার—সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲

এ ছাড়া

উপন্যাস, ভ্রমণ ও অ্যাড্‌ভেঞ্চার, শিকার-কাহিনী, রূপকথা ধর্ম্মগ্রন্থ, উপনিষদ্ গ্রন্থ, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দামোদর ও সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থমালা বাহির হইয়াছে।

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯

রামধনু—

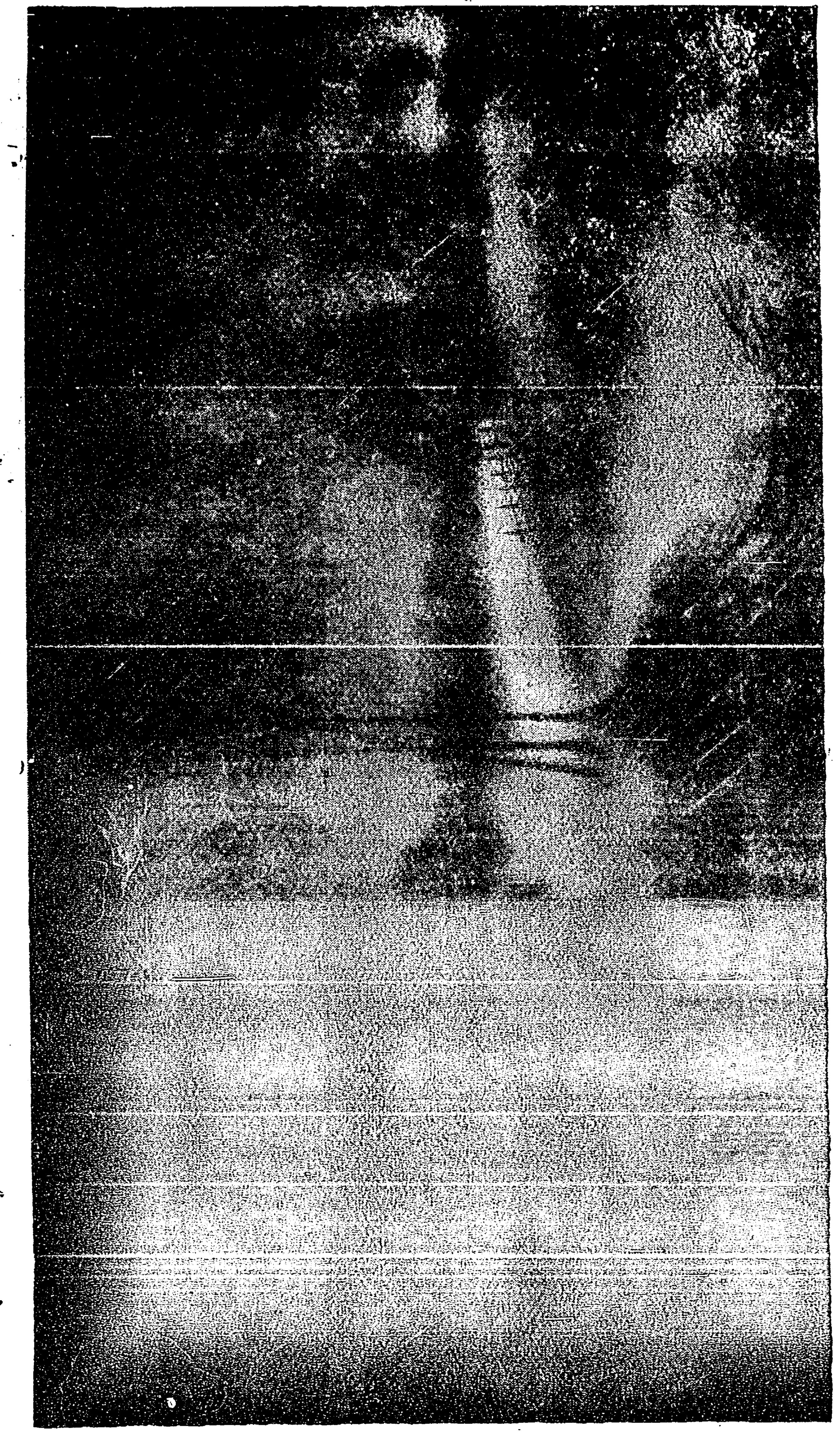

ঝড় এলো

শিল্পী : শ্রীনবীন ভট্টাচার্য

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩১শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৬৫ { ৩য় সংখ্যা

হাওয়া

শ্রীবিমল দত্ত

হাওয়ার সাগর এ কি—হাওয়ার পাথার!
হাওয়া মাতে দিনেরাতে হাজার হাজার—
হাওয়াদের মাতামাতি,
হাওয়াদের হাতাহাতি,
মেঘের হাওদা চড়ে' চলে কী বাহার!
কভু বা জোরসে ছোটে ঘোড়ার সওয়ার।

গাছ দোলে, পাতা দোলে, দোলে ফুল-ফল,
পুকুরের জল দোলে টল—মল—টল্।
চলে যায় ইলিবিলি—
কলাপাতে ঝিলিমিলি,

ঝালর উড়ায়ে, আহা, আহা কি বাহার।
হাওয়া মাতে দিনেরাতে হাজার হাজার।

ঝিরি-ঝিরি ঝরো-ঝরো শন্ শন্ শাঁই
হুল্লোড় করে' ওরা ছোটে বাঁই-বাঁই ;
ইস্কুল-পালানিয়া
এল হাড়-জ্বালানিয়া,
আমবন, জামবন ছুটে হয় পার
আরো আসে—ঐ ঐ দেদার—দেদার।

হাহাহাহা, হোহোহোহো, আহা কি মাতন !
নারকেল-তালপাতে বাজায় বাজন।
দূর মাঠে ছুটে যায়,
ডিগ্‌বাজী পাক খায়,
পাখীদের ওড়া-উড়ি মান্‌ল কি হার ?
কই, তারা ওড়ে না ত', এ কী ব্যবহার !

দখিনে সাগরবুকে জল-ঘেরা দ্বীপ,
নীল সাগরের ভালে সব্‌জে সে টিপ।
সেথা থেকে আসে এরা,
নাই ঘর, নাই ডেরা,
দুনিয়া টহলদারি হাওয়াদের কাজ—
আমার দেশেতে বুঝি পৌঁছল আজ।

মাথা থেকে ছাতা ওড়ে, চাল থেকে খড়,
পাতাগুলো ওড়ে যেন শুকনো পাঁপড়।

নৌকোর পালে লাগে
মাঝিদের খুসী জাগে—
নিরাকার হাওয়াদের ভূতুড়ে রগড়—
হাওয়া নয়, ঠিক যেন ছোটখাট ঝড়।

শীতের চাদর ওড়ে হিমগুণ্ঠন—
দিনেরাতে চলে যেন লুঠ-লণ্ঠন।
ভাত নিয়ে পাতা ওড়ে,
জান্‌লা, দরজা নড়ে—
কোঁচড়ের মুড়ি ওড়ে, ঝরে যেন যুঁই—
উড়ায়ে ধরার ধূলি সাফ করে ভুঁই।

হাওয়া, ওরে হাওয়া, আয়—আয় বুক ভরে,
কোলে পিঠে কাঁখালেতে কোথা রাখি তোরে।
চপল শিশুর মত
আয় ওরে শত শত,
হুল্লোড়ে ভেঙ্গে পড় সাগরের মত,
দুনিয়া টহলদার হাওয়া আছে যত।

ওরে তোরা হাওয়া, নাকি স্ফূর্ত্তির ঢেউ ?
গম্ভীর দুনিয়ায় মিচ্‌কেমি ফেউ ?
দুখ-ভরা এ ধরায়
আঁখিজল ঝরে হায় !
এত খুশি পাস্ কোথা ওরে চঞ্চল ?
দুনিয়া টহলদার রে হাওয়ার দল !

শিশুসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

আমাদের দেশের শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসলে দেখা যায় বাংলা ভাষায় শিশুসাহিত্য বলে কিছুই ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ' অথবা 'কথামালা', 'বোধোদয়' উদয় হবার আগে এদেশে পাঠশালার পাঠ্য হিসেবে সেই চাণক্য পণ্ডিতের চিত্রশোভিত বটতলার ছাপা শিশুবোধকই ছিল একমাত্র অবলম্বন। আমরা শৈশবে এই বই পড়েই বিদ্যারম্ভ করেছিলুম। এতে সব রকমই ছিল। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, পত্র লেখা, ধারাপাত, জীবনী কিছুই বাদ ছিল না। এই একখানি বই পড়েই সেকালের ছেলেরা প্রাথমিক সর্বপ্রকার বিদ্যায় বেশ কিছুটা অগ্রসর হতে পারতো। মনে আছে এই বইয়ের প্রথমেই ছিল 'গঙ্গাস্তোত্র'—'বন্দি মাতা সুরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি, শৈলসুতা জননী জাহ্নবী' ইত্যাদি। এই শিশুবোধকেই প্রথম পড়ি শুক্রাচার্যের পুত্র ষণ্ড-অমর্কের গল্প। এঁরা প্রহ্লাদের গুরু ছিলেন। কিন্তু, তবুও এ ছিল পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্গত। একে শিশুসাহিত্য বলে নির্দেশ করা চলে না। আমার নিজের ধারণা, সত্যিকার শিশুরঞ্জন শিশুসাহিত্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথই বাংলা দেশে প্রথম। আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য 'ছেলে ভুলোনো ছড়া' সংকলন করে প্রকাশ করেছিলেন।

সেদিন সব ছেলেমেয়েরই মুখে সজলঘন বাদল দিনে শোনা যেতো—

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে—তিন কন্যে দান।'

আকাশ ঘনঘটায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে এলেই তারা সেই মেঘমেদুর আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে বলতো—

'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে,
ধান দেব মেপে !'

কিন্তু, আজ সে বর্ষার আনন্দ ছেলেদের কণ্ঠে কি সেই সেকালের ছড়া গানে ছন্দিত হয়ে ওঠে ?

আজ হয়ত তাদের একটু প্রমোশন হয়েছে, তারা গায় এখন—

'বাদল মেঘে মাদল বাজে—
গুরু গুরু গুরু গগন মাঝে !'

এই যে বর্ষার অভিনন্দন এও সেই রবীন্দ্রনাথেরই।

পাঠশালার ছুটির দিন তারা আজ আনন্দে নৃত্য করতে করতে গায়—

"আজ আমাদের ছুটি রে ভাই,
আজ আমাদের ছুটি,
মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি।"

আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর আগে রবীন্দ্রনাথ 'শিশু' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। এর আগে শিশুদের নিয়ে এই ধরণের কাব্য রচনা এদেশের আর কোনও কবি করেন নি। ছেলেদের মনের কথা এমন দরদের সঙ্গে আর কেউ প্রকাশ করেন নি। খোকা প্রশ্ন করছে মাকে ডেকে,—'এলেম আমি কোথা থেকে, কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?'

মা বলছেন—'ইচ্ছে হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে!' 'ছিলি আমার পুতুল খেলায়', 'আমার চিরকালের আশায়– আমার সকল ভালবাসায়!' 'আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে— জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে!'

তারপর শেষ কথা মা বলছেন শিশুকে বুকে নিয়ে—

'সব দেবতার আদরের ধন
নিত্য কালের তুই পুরাতন—
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী;
তুই জগতের স্বপ্ন হ'তে
এসেছিস আনন্দস্রোতে
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি!'

মায়ের হৃদয়ের এই গভীর ভালবাসাই ছিল কবির মনে শিশুদের জন্য একান্ত ভাবে। তাই মায়ের মতই শিশুমনস্তত্বে কবির ছিল সুগভীর অধিকার। তাদের মনের কথা কবির কাছে তাই অজানা ছিল না কিছু। 'বীরপুরুষ' কবিতাটিতে শিশু-মনের কল্পনা তাই অপরূপ রূপে রসে মূর্ত হয়ে উঠেছে—

'তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ায় চড়ে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।'

তারপর সন্ধ্যে হল, সূর্য পাটে নামলো, জোড়াদীঘির মাঠ পার হয়ে চলেছে পালকি।

মা শুধান—'এ এলেম কোথা?' খোকা অভয় দিয়ে বলছে, 'ভয় কোরো না মাগো!' অন্ধকার নেমেছে চারিদিকে। আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। নির্জন মাঠের ওপর দিয়ে পালকি চলেছে। চারিদিক্ নিঝুম। কোথায় চলেছে কে জানে? মা খোকাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'দীঘির ধারে ও কিসের আলো দেখা যাচ্ছে?' খোকা উত্তর দেবার আগেই 'হারে রে রে রে রে!' শব্দে এসে পড়লো ডাকাতের দল।

তখন?

তখন— 'বেহারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরো থরো!'

আর খোকা মাকে ডেকে বলছে—

'আমি আছি, ভয় কেন মা করো?'

তার পর? তার পর, খোকার সে কি বীরত্ব!

'হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।'

এমন যে ভীষণদর্শন সব ডাকাত, খোকা তাদের ডেকে বলছে—

'—দাঁড়া, খবরদার!
এক-পা কাছে আসিস যদি আর
এই চেয়ে দেখ আমার তলোয়ার
টুকরো করে দেব তোদের সেরে!'

মা ভয় পেয়েছেন, বলছেন, যাস্ নে খোকা ওরে!'

খোকা বীরপুরুষ, বললে,—'দেখ না চুপ করে!'

তার পর? তারপর খোকা বলছে—

'ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝনঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে,
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা;
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়লো কাটা!
এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে – ভাবছো খোকা গেলোই বুঝি মরে!
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে, বলছি এসে,—লড়াই গেছে থেমে।

তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে, চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে,
বলছো, ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল, কী দুর্দশাই হ'ত তা' না হলে।'

চিরন্তন শিশুহৃদয়ের এই স্বপ্নকল্পনাকে কবি যে এমন জীবন্ত করে আঁকতে পেরেছিলেন তার কারণ কবির মধ্যেও এক চিরশিশু চিরদিন লুকিয়েছিল।

আগেই বলেছি বাংলা দেশে শিশুসাহিত্যের দুর্ভিক্ষ ছিল। সেই দুর্ভিক্ষের দিনে দু' হাতের মুঠো ভরে রবীন্দ্রনাথ এনে দিয়েছিলেন তাদের শিশুসাহিত্যের নবান্ন,—যা শিশুমনের কল্পনার রংকে বিচিত্র বর্ণে গাঢ় করে তুলেছিল, যা তাদের মনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দরসকে উচ্ছ্বলিত করে তুলেছিল।

শিশুদের অন্তরলোকে একটি বিশেষ জগৎ আছে। এ জগৎ প্রবীণ নয়, এ জগৎ চিরনবীন। এর আকাশ স্বতন্ত্র, এর বাতাস স্বতন্ত্র। এখানে চন্দ্র-সূর্য কোনও নিয়মের চাকায় বাঁধা নয়। এ জগতের জীবজন্তু, মানুষ, পাখী, গাছপালা সব কিছুই আলাদা। এদের কাছে সোনার কাঠি রূপোর কাঠি আছে—যার ছোঁয়া লেগে দৈত্যপুরীর বন্দিনী রাজকন্যা জেগে ওঠে, আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এখানে সব কিছুই ঘটা সম্ভব; অসম্ভব বলে কিছু নেই।

সবাই এর মূল্য বোঝে না। রবীন্দ্রনাথের কাছে এ রহস্যের রত্নভাণ্ডারের দুর্লভ চাবিকাঠিটি ছিল। শিশুর জগৎ কবির কাছে অর্থহীন বলে মনে হয় নি কোনও দিন। তিনি এর মূল্য বুঝেছিলেন, তাই অকৃপণ হস্তে দিয়ে গেছেন একে তার প্রাপ্য মর্যাদা, স্বীকার করে গেছেন এর অনির্বচনীয়তাকে। নয়নে মেখে নিয়েছিলেন এর কল্পনার সুন্দর স্বপ্নাঞ্জন।

এদের জগতে পক্ষিরাজ ঘোড়া আজও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। এখানে তরুলতা কথা বলে, বর্ষার পায়ে নূপুর বাজে, পাখীরা সব ভূতভবিষ্যৎ জানা শুকসারির দল। সমুদ্রের মাছ ডাঙায় উঠে আসতে ভয় পায় না, কাগজের নৌকোও নদীর জলে ভেসে চলে দূর দূরান্তে শ্রীমন্ত সওদাগরের বাণিজ্যের পসরা নিয়ে। এখানকার ধনভাণ্ডারে মণি-মাণিক্যের অভাব নেই, সাত রাজার ধন এদের মুঠোয় থাকে। কুঁচবরণ কন্যার মেঘবরণ চুল এদের দেশে দুর্লভ নয়। শেয়াল এদের অনুগত, বেড়াল এদের মাসি, সিংঙ্গী মামার ভাগ্নে এরা। বাঘ-ভাল্লুকের বন্ধু।

এই শিশুদেরই মনের অদ্ভুত সব প্রশ্ন, অভাবনীয় যত অভিলাষ, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অসংখ্য ঢেউ রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে যেন! এই শিশুদের প্রতি কবির শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। 'শিশু' প্রকাশের প্রায় বিশ বছর পরে

'শিশু ভোলানাথ' প্রকাশ করেছিলেন কবি ১৩২৯ সালে। এই শিশু ভোলানাথের মধ্যে শিশুদের উদ্দেশ করে শিশুভক্ত রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

'তোর কাছে কিছুরি তো কোনো মূল্য নাই,
রচিস যা তোর ইচ্ছা তাই
যাহা খুশি তাই দিয়ে,
তারপর ভুলে যাস যাহা ইচ্ছা তাই নিয়ে।

* * *

লজ্জাহীন সজ্জাহীন আপনা বিস্মৃত
অন্তরে ঐশ্বর্য তোর, অন্তরে অমৃত।
দারিদ্র্য করে না দীন, ধূলি তোরে করে না অশুচি,
নৃত্যের আনন্দে তোর সর্বগ্লানি নিত্য যায় ঘুচি।
ওরে শিশু ভোলানাথ,
মোরে ভক্ত ব'লে
নে রে তোর তাণ্ডবের দলে।
দে রে চিত্তে মোর
সকল ভোলার ওই ঘোর,
খেলনা ভাঙার খেলা দে আমারে ব'লে।'

শিশুদের সঙ্গে শিশু হয়ে মিশে যাবার এই যে ব্যাকুল বাসনা নিরন্তর কবিচিত্তে উতল হয়েছিল এই ব্যাকুলতাই তাঁকে শিশুমনস্তত্ত্বের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় সাধনের সুযোগ দিয়েছিল।

এ বিষয়ে সব কথা আজ বলা হ'ল না, বারান্তরে এ নিয়ে আরও অলোচনা করবার ইচ্ছে রইল।

১২

ডক্টর রামশাস্ত্রী তাঁর বেশভূষা বদলে আবার সেই পুরানো দিনের পরশুরাম শাস্ত্রবাচস্পতি হয়েছেন। হাতকাটা সেই ছিটের শার্টটা এতদিন কোথায় ছিল জানি না, আজ আবার সেটা তাঁর অঙ্গে উঠেছে। বর্ম্মা ঝোলাটাও কাঁধে। আমারও বেশ প্রায় সেই রকম। ফরসা জামা পরতে তিনি নিষেধ করেছেন, সাতদিন দাড়ি কামানো বন্ধ রাখার ফলে হঠাৎ মনে হয় আমার মুখে কে যেন এক পোঁচ আলকাতরা মাখিয়ে দিয়েছে।

এই নীলকুঠীরই এক প্রান্তে যে ভাঙ্গা বাড়ীর ধ্বংসস্তূপ দেখা যাচ্ছিল, বোঝা গেল সেইটাই ছিল রবার্টস সাহেবের বাসভবন। একদিকে একখানা ঘর তখনও ভূমিসাৎ হয় নি, তারই মধ্যে যিনি বাস করছেন, শুনলাম তাঁর নাম কানাইদাস বৈরাগী। সামনেই একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়ার গাছ, তাতে অজস্র লাল ফুল ফুটে রয়েছে। তার পাশে গোটা চারেক ঝাউগাছ। নীলকর সাহেবদের স্মৃতি বহন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারই মাঝখানে একটা ভাঙ্গা কবর। হয়তো রবার্টস সাহেবের কোনও পরিজনের চিরনিদ্রার স্থান।

কানাইদাসের সঙ্গে রামশাস্ত্রীর পরিচয় আগে থেকেই ছিল, সেটা বুঝলাম। আমাকে দেখিয়ে রামশাস্ত্রী জানালেন যে আমি তাঁরই শিষ্য, সম্প্রতি স্বপ্নে প্রভুর আদেশ পেয়েছি তাঁকে খুঁজে বার করার জন্য। এবং তিনিই স্বপ্নে আমাকে জানিয়েছেন যে কানাইদাসই আমাকে এই অভিযানে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

এই নির্জ্জলা মিথ্যা কথা এবং গাঁজাখুরি ব্যাপারে আমার কোনও সমর্থন ছিল

না। কিন্তু আমি নিরুপায়। রামশাস্ত্রীর নির্দ্দেশ আমাকে মেনে চলতেই হবে এবং এই ব্যাপারে কি করতে হবে তার খানিকটা রিহার্সাল কলকাতার বাড়ীতে বসেই আমাকে দেওয়া হয়েছিল।

স্তুতিবাদ শুনে সবাই খুসী হয়। কানাই বৈরাগীও এই কথা শুনে হাসলেন। তাঁর কুচকুচে কালো রংয়ের মুখখানার মাঝখানে সাদা দাঁতগুলো চক্ চক্ করে উঠলো, লম্বা কাঁচা-পাকা দাড়ি আন্দোলিত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, যত দূরে যেতে চাইছি, ততই তিনি যেন টেনে এনে রাখছেন! কি অন্যায় দেখ দিখিনি! স্বপ্নে বললেন বুঝি আমার কাছে এলেই সব হবে? তুনিয়াশুদ্ধ লোক যদি আমারই কাছে আসে তবে আমি কার কাছে যাবো?

বৈরাগী বাবাজীর মনের মধ্যে বেশ খানিকটা অহমিকা আছে সেটা বুঝলাম। কিন্তু এঁর দ্বারা আমাদের আসল কাজের কি সুবিধা হবে সেটা বুঝলাম না।

রামশাস্ত্রী বললেন, কর্ত্তব্য যতদিন আছে তত দিন তো প্রভু আপনাকে ছেড়ে দেবেন না। কর্ম্ম শেষ হয়ে গেলেই তিনি নিজের কাছেই আপনাকে ডেকে নেবেন।

কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় খানকতক ইট বিছিয়ে একটা বেদীর মত তৈরী করে কানাইদাস সেখানে এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। নীলকুঠীর পরিত্যক্ত একখানা টালির উপর সিঁদূর এবং চন্দন মাখিয়ে সেই বিগ্রহের নাম দিয়েছেন দামোদর। বুনোপাড়ার অনেক স্ত্রী-পুরুষ এসে দামোদরের বেদীতে প্রণাম করে চলে যায়। পূজার নৈবেদ্য হিসাবে কেউ বা নিয়ে আসে কিছু মুড়কি, কেউ বা তু'-চারখানা বাতাসা, কেউ খানিকটা গুড়।

আমরা প্রসাদ পেলাম। চিঁড়ে, দই এবং মুড়কি। রামশাস্ত্রী পরম আগ্রহে সেগুলি শেষ করলেন, কিন্তু আমার অনভ্যস্ত জিহ্বায় সেগুলি অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো। কিন্তু কি করা যায়? উপায় নেই।

একটু নিরিবিলিতে গিয়ে রামশাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ ভাবে এখানে কতদিন থাকতে হবে? চিঁড়ে, দই এবং মুড়কি—এই মহাপ্রসাদের সদ্ব্যবহার কতদিন চলবে?

রামশাস্ত্রী বললেন, সাধনা না হলে কি সিদ্ধি হয়? সুতরাং সিদ্ধিলাভ কবে হবে কিংবা আদৌ হবে কি না সেটা জানা না থাকলেও সাধনা করে যেতে হবে। চিঁড়ে-মুড়কি তো তার প্রথম পর্য্যায়!

কানাইদাসের আসল পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করলাম। গার্হস্থ্য আশ্রমে তিনি কি ছিলেন সে কথা জানবার প্রয়োজন নেই, তবে বৈরাগী হওয়ার পরে তিনি নাকি বাংলা দেশের যেখানে যত দেবস্থান আছে সবই পরিক্রমা করেছেন। সুতরাং কোথায় কোন্ দেবমূর্ত্তির কি বৈশিষ্ট্য সে সংবাদ কানাইদাসের চেয়ে বেশী আর কেউ জানে না।

আরও আশ্চর্য্য হলাম শুনে যে এই কানাইদাস বাবাজীর সন্ধান ডক্টর রামশাস্ত্রী পেয়েছেন একজন জার্ম্মান পণ্ডিতের কাছে। তিনি বছর পাঁচেক আগে এসেছিলেন এই দেশে মূর্ত্তি এবং বিগ্রহ সম্বন্ধে কতকগুলো তথ্য সংগ্রহ করতে। কয়েকটা মূর্ত্তি নিয়ে যখন সমস্যার গোলোকধাঁধায় পড়েছিলেন তখন এই কানাইদাসের কাছেই পেয়েছিলেন তার সমাধানের পথ। বিলাতী সার্টিফিকেটের মূল্য এখনও বেশী, সুতরাং জার্ম্মান্ অধ্যাপক যাঁকে অভিনন্দিত করেছেন তাঁকে হালকা ভাবে দেখা যায় না।

চিঁড়ে-মুড়কির মহাপ্রসাদ খেয়ে আমাদের ৩।৪ দিন কেটে গেল। সন্ধ্যার সময় অনেক লোকের সমাগম হোত বাবাজীর আখড়ায় অর্থাৎ নীলকুঠীর সেই ভগ্নপ্রস্থ ঘরের রোয়াকে। বেশীর ভাগই 'বুনো' অর্থাৎ সাঁওতাল নরনারী। চাষভূষো শ্রেণীরও কেউ কেউ আসতো। কেউ বা নিয়ে যেত জলপড়া, কেউ বা মন্ত্রপূত ছাই। একজনের পেটে অসহ্য বেদনা—সেই অবস্থায় সে এসে শুয়ে পড়লো বাবাজীর পায়ের তলায়। তিনি ঝাড়ফুঁক দিয়ে তার পেটে তিনটে টোকা দিয়ে বললেন চলে যা। সে তখনও যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। জানি না, বাবাজীর ঝাড়ফুঁকে তার ব্যথা সেরে গিয়েছিল কিনা।

একদিন আসল কথাটা উত্থাপন করলেন রামশাস্ত্রী। কানাইদাস বাবাজী চোখ বুঁজে খানিকটা স্থির ভাবে বসে রইলেন। বর্ণপরিচয়ে ঋ অক্ষরের সঙ্গে যে ঋষির ছবি ছাপা থাকে এঁকে দেখে সেইটার কথা মনে পড়লো।

তার পর বললেন, জানি। সবই জানি। পা ভেঙ্গে গিয়েছিল মূর্ত্তির। নীচের আধখানা নেই। মাটি দিয়ে সেই ভাঙ্গা পা পূর্ণ করা হয়েছিল। জানি নে আবার? কিন্তু চোখ দুটো? তাতেই তো সর্ব্বনাশ ঘটালো!

অত বড় বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত রামশাস্ত্রীরও চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, ঠিক বলেছেন বাবাজী। তার পর?

বাবাজী তখনও সেই অবস্থায়। রামকৃষ্ণ কথামৃতে পড়েছি—কথা বলতে বলতে পরমহংস দেবের ভাবসমাধি হোত। কানাইদাসের এই অবস্থা দেখে আমার মনে হোল এরই নাম কি ভাবসমাধি?

বাবাজী বলতে লাগলেন,—চোখ দুটোই সর্ব্বনাশ করলে। ঝিনুক দেখেছো? যাতে মুক্তো হয়? নদীর ধারে পাওয়া যায়। এক একটা ঝিনুক—তাতে মুক্তো না থাকলেও এমন ঝিকমিক করে ওঠে যে রাত্রের অন্ধকারে যেন জ্বলছে বলে মনে হয়।

এক ভক্ত সেই বিগ্রহের চোখ দুটো তৈরী করিয়েছিলেন তেমনি জ্বলজ্বলে ঝিনুকে। চোখের তারা দুটো কিসের করিয়েছিলেন জানো?

রামশাস্ত্রী ঘাড় নেড়ে বললেন, না তো!

কানাইদাস বললেন, নীলা। আসল নীলা। নীল হীরে। অত বড় নীলা আজকের দিনে পাওয়া যায় না। এক একটা ঠিক সুপুরির মতন।

তার পর?—আমরা দুজনেই প্রায় একসঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলাম।

আমি দেখেছিলাম সে মূর্ত্তি। সে কি আজকের কথা? বামুনগাছির শিব দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম রাজাদের ভাঙ্গা মন্দির আছে নদীর ধারে; সেখানে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন, রাত্রে তাঁর চোখ জ্বলে। কিন্তু পূজারী ঠাকুর কা'কেও দেখান না সে মূর্ত্তি। নেহাৎ ভাগ্যবান্ না হলে দেখতে পায় না।

কানাইদাস বলতে লাগলেন,—ভাগ্যটাগ্য আমি মানি না বটে, কিন্তু এই কথাটা শুনে কেমন সন্দেহ হোল। পুরুত ঠাকুরের পায়ে গিয়ে পড়লাম। বললাম, ঠাকুর দর্শন করবো। অনেক আপত্তির পর তিনি রাজী হলেন। কিন্তু সর্ত্ত হোল একটিবার মাত্র দর্শন করেই এখান থেকে পালাতে হবে।

দর্শন করেই বুঝলাম কেন পুরুত ঠাকুর অত সাবধানী হয়েছেন। অন্ধকারের মধ্যে জ্বলে উঠেছে চোখের জ্যোতিঃ, তার ভিতর দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে নীলার আভা।

পুরুত ঠাকুরকে বললাম, ঠাকুর মশাই, এ কি কাণ্ড! কোথায় পেলেন এ মূর্ত্তি?

মূর্ত্তির কোনও পুরানো ইতিহাস তিনি জানেন না। বললেন, রাজারা স্থাপনা করেছেন এই মূর্ত্তি, তাঁরা পুরুষানুক্রমে করে আসছেন এর পৌরোহিত্য।

আমি বললাম, ঠাকুর মশাই, এই ভাঙ্গা মন্দিরে রেখেছেন এই সর্ব্বনেশে জিনিষ!

তিনি একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, কেন বলুন তো?

বললাম, ওই চোখ দুটোর জন্যই হয়তো কোন দিন চুরি কিংবা লুঠ হয়ে যাবে ঐ মূর্ত্তি। কত জায়গায় ঠাকুরের গায়ের গয়না চুরি হয়ে গিয়েছে শোনেন নি? সে সব তো কেবল সোনা-রূপোর ব্যাপার। কিন্তু এ যে একেবারে জ্যান্ত আগুন ঠিকরে আসছে!

পুরুত ঠাকুর বললেন, তা জানি। সেই জন্যই চোখ দুটো মাটি দিয়ে ঢেকে রাখি, কাউকে দেখাই না। আপনাকে দেখে সত্যিই সাধু বলে মনে হোল, সেই জন্যই দেখালাম।

বললাম, কিন্তু তবু তো রটে গিয়েছে রাত্রে ঠাকুরের চোখ জ্বলে!

তিনি বললেন, তা রটুক। কিন্তু সে চোখ দেখতে পায় না কেউ। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলি যে নিজের মনে আগে ভক্তির আগুন জ্বালাও, তার পর ঠাকুরের চোখের আগুন দেখতে পাবে।

কানাই বৈরাগী থামলেন। রামশাস্ত্রী বললেম, তার পর ?

তিনি বললেন, আমি তো চলে এলাম। তার পর যা ভেবেছিলাম তাই। সেখান থেকে রওনা হয়ে এক আখড়ায় এসে দশ-বারো দিন থাকি। সেখানেই শুনলাম রাত্রে মন্দিরের বাইরে এক জঙ্গলে পুরুত ঠাকুরের মাথায় লাঠি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে মূর্ত্তি নিয়ে কারা পালিয়েছে। পুলিশ তদন্ত হোল। তার পর আর কিছু জানি না। চোরও বোধ হয় ধরা পড়ে নি, মূর্ত্তিও বোধ হয় উদ্ধার হয় নি।

একটু থেমে তিনি আবার রামশাস্ত্রীকে বললেন, যে মূর্ত্তির খোঁজ করে বেড়াচ্ছ, জানি না এইটাই সে মূর্ত্তি কিনা। তবে সন্ধান করতে দোষ কি ? স্বপ্ন দিয়েছেন তিনি ? আমার কাছে আসতে ? কিন্তু আমি কি করতে পারি ? দেবতার চোখ যদি মানুষে উপড়ে নিয়ে যায়, তবে প্রতিকার আমি কি করতে পারি ?—যাক্, আমার যেটুকু জানা ছিল তা বললাম। তার পর তোমাদের চেষ্টার ফল কি হয় দেখ।

বামুনগাছি যাওয়ার পথের বিবরণ বললেন কানাইদাস। পাছে ভুলে যাই, সেজন্য আমার নোট-বইয়ে পেন্সিল দিয়ে সমস্ত লিখে নিলাম। পথেরও একটা মোটামুটি নক্সা এঁকে নেওয়া হোল।

কিন্তু সে মন্দির থেকে তো মূর্ত্তি অপহৃত হয়ে গিয়েছে, তবে সেখানে গিয়ে কি দেখতে পাবো ?

কানাইদাস বাবাজীর কাছে যে সূত্রটুকু পাওয়া গেল, তারই উপর নির্ভর করে, আমাদের অনুসন্ধান পর্বের নূতম অধ্যায় সুরু করতে হবে।

(ক্রমশঃ)

তুষারতীর্থ শ্রীকৈলাস

তীর্থঙ্কর

মানস সরোবরের তীরে এসে তাঁবু ফেললাম।

ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে গেল, কিন্তু শীতের চাপে বাইরে বেরুনো প্রায় অসম্ভব। মুড়িসুড়ি দিয়ে তাঁবুতে বসে বসেই সূর্য্যোদয়ের শ্রী দেখ্‌তে লাগলাম। এই দারুণ শীতের মধ্যে ঐ আলো আর উত্তাপটুকু বড়ই আরামপ্রদ লাগছিল। বরফের ঠিকরে-আসা রৌদ্রের চিক্কণ দ্যুতি চোখ ঝলসে দেবার মত।

মানস সরোবরে এলে স্নান করতে হয়—এ একটা বহুদিনের সংস্কার। আমরা সকলেই তাই তেল মেখে, গরম জামাকাপড় সঙ্গে নিয়ে সরোবরে গেলাম স্নান করতে। জল স্পর্শ করে দেখ্‌লাম— বরফগলা জল বরফের মতই ঠাণ্ডা। তবু "জয় কৈলাস-পতিকি জয়" ব'লে আর দ্বিধা না করে নেমে পড়লাম সরোবরের জলে। চটপট স্নান সেরে নিয়ে গায়ে চাপা দিলাম গরম কাপড়চোপড়। সংস্কারের পূর্ণতার সঙ্গে হিন্দু সন্তানের জন্ম সার্থক হ'ল। গরম জামা-কাপড় পরলেও ভিতর ভিতর কাঁপুনি চললো অনেকক্ষণ।

এখান থেকে কিছু খাওয়াদাওয়া করে আবার আমরা এগিয়ে চললাম কৈলাসের দিকে। দূরে কৈলাসের চূড়াটী দেখা যাচ্ছিল। আমরা উত্তেজিত হয়ে বার বার 'কৈলাসপতিকি জয়' ধ্বনি দিচ্ছিলাম। পথে পড়লো "বরখার মাঠ"। শুন্‌লাম, এই বরখার মাঠে যাত্রীরা প্রায়ই বিপদে পড়েন। কৈলাসপতির করুণা না পেলে বরফের ঝড়ে অনেকে চাপা প'ড়ে এইখানেই মৃত্যু বরণ করেন।

বরফের রাজ্যে দিগন্তবিস্তৃত এই মাঠখানা দেখে সকলেরই বুক ভয়ে

শুকিয়ে ওঠে। বাতাসে ভেসে আসছে শীকরকণা,—সেও বরফের। মধ্যে কোথাও কোন গাছপালা নেই, শুধু মাথার উপর বিস্তৃত নীল আকাশ। প্রতি পদে এই বাধা কাটিয়ে যাত্রীকে এগুতে হয়। গাইডই শুধু একমাত্র সহায়, আর ভক্তদের সম্বল বাবা কৈলাসপতির নাম। মাঝে পড়লো একটা স্বচ্ছ পার্বত্য নদী। খুব জোরালো তার স্রোত। চওড়াও কিছু কম নয়। গাইড আমাদের পিঠে করে নিয়ে এই নদীটি পার করে দিল। নদীর ওপারে বুংহু। স্থির হ'ল যে বুংহুতে রাত্রিকালীন আশ্রয় নেওয়া হবে। সেই মত তাঁবু ফেলা হ'ল।

পর দিন বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ খাওয়াদাওয়া সেরে তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে আমরা বুংহু ছেড়ে চল্‌লাম। পথে কয়েকজন লামার সঙ্গে দেখা হ'ল। শুন্‌লাম তাঁরা কৈলাস পরিক্রমা করে ফিরছেন। আমাদের গাইড তাঁদের কাছ থেকে জেনে নিলেন, যদিও কৈলাসের পথ বরফে ঢাকা—তবুও যাওয়া যাবে কিনা। আমরা তাঁদের কাছ থেকে আশীর্ব্বাদ চেয়ে নিলাম ও তাঁদের ধর্ম্মমন্দিরে পূজা দেওয়ার জন্য টাকা দিলাম।

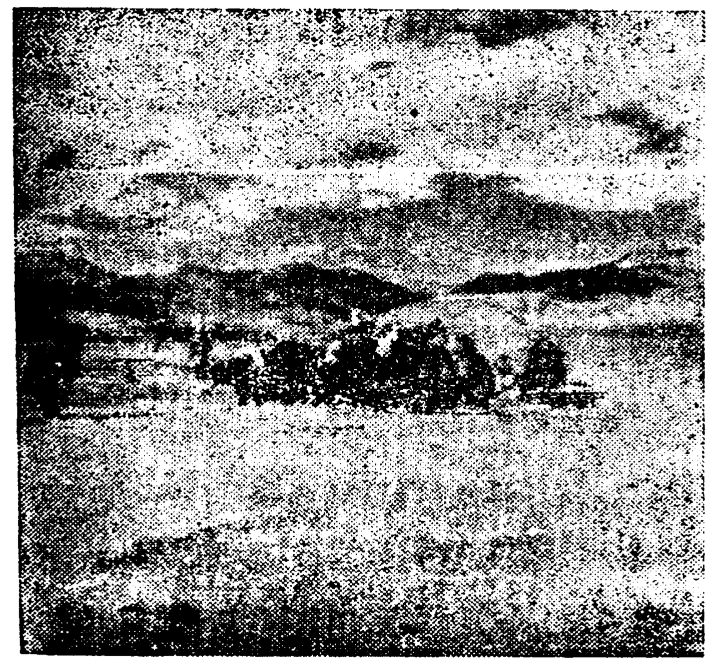

আমাদের মালবাহী জব্বু

পথে পড়ল 'দারচেন'। এখানে লামাদের একটী গুম্ফা আছে। আর আছে চীন সরকারের চেক পোষ্ট। দারচেন হচ্ছে কৈলাস পরিক্রমার প্রথম সোপান। এখান থেকে কৈলাসের চূড়াটী বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। অল্প অল্প মেঘে ঢাকা পটভূমিকায় এই সমুন্নত চূড়াটী সেদিন দেখেছিলাম অপূর্ব্ব—অপরূপ!

দারচেন ছেড়ে কৈলাসের দিকে যাওয়ার পথে শিকারী যেমন শিকারের দিকে নজর রাখে তেমনি করেই আমরা দৃষ্টিপথে ধরে রেখেছিলাম কৈলাসের দৃশ্যপটটিকে। এখন সেই দৃশ্যপটটি কেমন করে একটু একটু বদলাতে বদলাতে নাটকীয় দৃশ্যের মত সম্পূর্ণরূপে বদলে গেল সেই কথা বলি।

অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে দেখলাম কৈলাসের চূড়ায় একখণ্ড মেঘ এসে লাগলো। পতাকার মত মেঘখণ্ডটি চূড়ার গায়ে লগ্ন হয়ে রইলো। তার পর মেঘের সারি এসে ঘিরে ফেললো চূড়াটীকে সব দিক্ থেকে। মেঘে মেঘে একাকার হয়ে

গেল দিগন্ত। কৈলাসের চূড়াটী যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! আমরা আমাদের লক্ষ্য হারালাম।

প্রায় এমনি ভাবে দুপুরটা কেটে গেল। বিকাল নাগাদ এলাম সরসুং-সরসিংএ, এখানেই আমাদের রাত্রিবাসের জন্য তাঁবু ফেলা হ'ল। শুনলাম এখান থেকে একটী পথ গিয়েছে তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্য্যন্ত। অনেকে এই হাঁটা পথে লাসা যায়।

পরদিন সকালে ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার দিগন্তে কৈলাসের ছবি আবার স্পষ্ট হয়ে উঠলো। রাত্রে তুষারপাত হয়ে গিয়েছিল, তাই তখনও পর্য্যন্ত চারিদিকে তুষারের ছড়াছড়ি। স্থির হ'ল এখান থেকে খেয়েদেয়ে বেরোনো হবে। বেলা ২টা নাগাদ আমরা রওয়ানা হ'লাম ডিরাফুকের উদ্দেশে। আঁকাবাঁকা উঁচুনীচু পথ, নুড়িতে ভরা—এগিয়ে গেছে দূর থেকে দূরে। এই পথ ধরে আমরা যখন ডিরাফুকে এসে পৌঁছালাম তখন বিকেল হয়ে গেছে। শুনলাম এখানে গুম্ফার মধ্যে বুদ্ধদেব ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি আছে। গুম্ফাটী তিনতলা। আমরা মূর্তি দর্শনের ও পূজা দেবার উদ্দেশ্যে তিনতলার উপরে এক খোলা ছাদে এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে শ্রীকৈলাসের কি অপূর্ব্ব দৃশ্যই না চোখে পড়ল!

শ্রীকৈলাসের অপরূপ রূপ

শিবলিঙ্গের গায়ে সাপ জড়িয়ে থাকলে যেমনটী দেখায় তেমনি কালো পর্ব্বতের চূড়াটীকে বেষ্টন করে বরফের সাদা পৈতে লেগে রয়েছে। বুঝলাম, আমরা যে শিবলিঙ্গের পূজা করি তা আসলে এই শ্রীকৈলাসেরই প্রতীক। আর নাগোপবীত ও গৌরীপট্ট সমেত যে শিবলিঙ্গের পূজা করি তাও ঐ বরফমণ্ডিত গৌরীকুণ্ড সমেত শ্রীকৈলাসেরই স্মারক। নেমে এসে যে ঘরে বুদ্ধদেব ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি ছিল তাদের কাছে আমরা প্রত্যেকেই ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলাম। মনে মনে মন্ত্র বললাম—'শিব ও বুদ্ধের জয় হোক্।' নীচে নেমে এসে আমাদের দলের কেউ কেউ ফোটো তুল্‌লেন। এর পরে কয়েকজন তিব্বতী এসে আমাদের কাছে কৈলাসের ধূপ ও ভস্ম বিক্রী করলেন। গাইডের মুখে শুনলাম ওই ধূপ হচ্ছে সুগন্ধযুক্ত এক রকম ছোট 'মস্'

জাতীয় গাছ। কেবল শ্রীকৈলাসেই এগুলি দেখা যায়। লামারা তাঁদের পূজার সময় ধুনুচিতে ওই মস্ গুঁড়িয়ে ধুনার মত দিয়ে দেন। ফলে অনেকটা ধূপের মতই সুগন্ধ ছড়ায়। আর, শ্রীকৈলাসের গায়ে এক রকম সাদা মাটী পাওয়া যায়, কিছুটা ওপরে,— যা দেখতে অবিকল ভস্মের মতই। হিন্দুরা যে বিশ্বাস করেন, তার উৎপত্তি বোধ হয় এই থেকেই।

তাই যতটা পারলাম ওই ভস্ম আর সুগন্ধ কিনে নিলাম। দেখলাম এখানে কয়েক ঘর তিব্বতীদের অস্থায়ী বাস রয়েছে। তাদের পোষা লোমশ কুকুরগুলো অচেনা লোক দেখলেই বড় বেশী চেঁচায় ও কামড়াতে আসে। আমাদের গাইড আমাদের সাবধান করেই নিয়ে গেলেন।

পরের দিন সকালে উঠে আবার আমাদের যাত্রা সুরু হ'ল। গাইড বললেন, বাকী পথটুকু বড় দুর্গম, চড়াই উৎরাইয়ে ভরা আর বরফে ঢাকা—অনেকটা লিপুলেক পাসের মতনই। সুতরাং সকাল সকাল বেরিয়ে পড়া দরকার। ভোরবেলা আমাদের তাঁবু উঠিয়ে নিয়ে গাইডের নির্দ্দেশ মত চলা সুরু করতে হ'ল। যেমন চড়াই আর তেমনি উৎরাই। ভেঙ্গে ভেঙ্গে যেতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। পা যেন কিছুতেই উঠতে চাইছিল না। চালকদের কাছ থেকে জব্বুগুলো প্রায়ই তাড়া খাচ্ছিল। তবুও তারা প্রায়ই বিপথে চলে যাচ্ছিল। আমাদের লক্ষ্য ছিল দোলমালা।

এখন শ্রীকৈলাস বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। যতবার দেখছিলাম ততবারই মনে এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশ হচ্ছিল। তাই আপন মনে গেয়ে চলেছিলাম—

"হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে
স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতভয়সূদন মামনাথং
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥

হে পার্ব্বতী-হৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে
ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ।
হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥"

গিরগাঁও

(গল্প)

শ্রীশামুক

বোম্বাই-এর গিরগাঁও দেখেছ? যদি দেখে থাকো ভুলে যাও তাড়াতাড়ি। আর যদি না দেখে থাকো, যদি কোন কিছুর টানে গিয়ে পড় ঐদিকে আচমকা, তো পিছন ফিরে কুইক-মার্চ—নাকের সোজা। ফিরো না—ফিরো না কিছুতেই। পৃথিবীতে অমন জায়গাও আছে?

বেকার আমি। চাকরির চেষ্টায় বোম্বাই এসেছি। মিষ্টি কেকের মত থাকে থাকে উঁচু উঁচু সাজানো বাড়িগুলোর দিকে হাঁ করে চেয়ে চেয়ে থাকি আর খিদে পেলে, ইচ্ছে হয়, কামড়ে কামড়ে খাই। আর কী সুন্দর পথ—কত দূর পর্যন্ত! মেরিন ড্রাইভ সমুদ্রের গলায় ঠিক মালার মত জড়িয়ে। জলের ধারে বাঁধানো ঢিপিতে বসে থাকলে রোদ্দুরের জ্বালা কম লাগে, খিদে-তেষ্টা অনেক সময় মনে পড়ে না—আর সময় কেটে যায় হুস্ করে।

পাশে দাঁড়িয়ে সবুজ চশমা-পরা লোকটা এক মনে দেখছে কি? চোখ দিয়ে জল মাপছে? হবে বা! সেই পানি-ওয়ালা মহারাজের গল্প শুনেছি তো—শুকনো খট্‌খটে জমির ওপর কট্‌মট্ করে তাকিয়ে নাকি বলে দিত নীচে জল কোথায়! সাবাস্! এও হয়তো কোন সমুদ্র—গুপ্ত সাগরের তলাটা ওর চোখের ওপর ভাসছে!

পরে বুঝেছি ঐ তলাটলা নয় কিছু—স্রেফ বুজরুকি। আড়চোখে আমায় দেখছিল, আমার ভেতরটা বুঝে নিচ্ছিল, কি ধরণের বোকসোকা মানুষ আমি!

বোকা না হলে, যেই মিষ্টি করে, ভাই বলে, বললে একটা চিঠি গিরগাঁওতে 'চন্দ্রগিরি সদন' বলে বাড়ির ওপরের তলায় পৌঁছে দিতে,—রাজী হলাম কেন? চিঠির সঙ্গে একটা পাঁচ টাকার নোটও হাতে গুঁজে দিচ্ছিল—কিন্তু নিতে পারলাম কই? বোকা নয়?

জিজ্ঞেস করতে করতে গিরগাঁও পৌঁছে গেলাম। হঠাৎ যেন জনসমুদ্রে হারিয়ে গেলাম। কত লোক—কত লোক সংকীর্ণ পথের ভেতর ঠাসাঠাসি করছে—হাবুডুবু খাচ্ছে! দু'পাশে পুরানো শ্রীহীন বাড়ির শ্রেণী যতটা পেরেছে ওপরে উঠে গেছে পাহাড়ের মত। এক ফালি আকাশের দিকে নাক উঁচু করে খুঁজতে থাকি ওদের মধ্যে আমার চন্দ্রগিরি কোন্‌টি।

হঠাৎ আমাকে একসঙ্গে এতো লোক ভালবেসে ফেললো কেন? আমি

মধুর চাক নাকি ?—মৌমাছির মত দশ-বারোজন আমায় ঠেসে ঘিরে থাকে। এ কি! বাঁ হাতখানা পিছন থেকে এমন মুচড়ে ধরলে যে যন্ত্রণায় বাক্‌শক্তিরহিত! দু'জন আবার দু'দিক্ থেকে গলা জড়িয়ে ধরে—যেন কত কালের চেনা ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার! উদ্দেশ্য ভাল নয় বুঝতে পারি। চীৎকার করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু পাশের একজন তার পকেটে ঢোকানো হাতসুদ্ধ যে জিনিষটি আমার গায়ে চেপে ধরলে—সেটি কি আন্দাজ করে আঁতকে উঠলাম। চুপ করে মরে গেলে কষ্ট কম লাগবে—তখন তাই মনে হ'ল।

ঐ অবস্থাতেই অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে ওপরের ঘরে পৌঁছালাম। সমস্ত পকেটগুলো হাতড়ে, ঠেলা দিয়ে খাটের ওপর বসিয়ে যখন ওরা চলে গেল তখন আবার পুরোপুরি জ্ঞান এল ফিরে।

প্রথম দেখলাম দরজা তালাবন্ধ বাইরে থেকে। ছোট ঘর, আরো ছোট বাথরুম। জানালায় লোহার পাতের জালি—হাতের আঙুল পর্যন্ত ঢোকানো যায়—তার বেশী নয়। মনে পড়ে—চিঠি? পকেটে হাত ঢোকাতে উরুতে গিয়ে ঠেকে। শুধু চিঠি নেয় নি, পুরানো পাতলুনটাও ছিঁড়ে দিয়ে গেছে, কি আগেই ফুটো হয়েছিল কে জানে! জুতোর ভেতর ফুটছে কি? আরে, এই যে সেই চিঠি! ওরা পায় নি তা হ'লে! টানা-হেঁচড়াতে ফুটো দিয়ে জুতোর মধ্যে তাগ করে ঠিক পড়েছে।

খাম ছিঁড়ে চিঠি পড়ি। এমন অসহায় অবস্থায় পরের চিঠি পড়তে দোষ নেই—আর, যখন ঐ চিঠিই হচ্ছে যত নষ্টের মূল।

সর্বনাশ! এ যে খুনে চিঠি! লেখা,—"আজ রাত এগারোটায় হনুমান জাম্বুবানের সঙ্গে দেখা করবে নরিমান পয়েন্ট-এ। সাবধানে ওৎ পেতে থেকো। ধরে দুটো মাথা ভাল করে পাথরে ঠুকে তারপর লাস দুটো জলে ভাসিয়ে দিও।"

মেরিন ড্রাইভের শেষ প্রান্ত ঐ নরিমান পয়েন্ট-এ কত বার ঘুরে এসেছি। কী সুন্দর বাঁধানো রাস্তা সমুদ্রের ভেতর পর্যন্ত চলে গেছে! ওখানে আলো নেই। রাত্রের অন্ধকারে চারিদিকে জল আর ঐ জমির ডগাটুকুতে দাঁড়িয়ে কত ভাল লেগেছে! এই চিঠি ঠিক হাতে পৌঁছালে আজ রাত এগারোটায় দু'-দুটো জীব সাবাড়। হনুমান জাম্বুবানের দল কোন নিশ্চিত নিশানা পেয়ে আমাকে ঠিকই ধরেছিল; কিন্তু বরাত খারাপ, চিঠিটা পেল না। আবার এরা চিঠি পেলে সবুজ চশমা-পরা দলের দু'-একজন বলি হয়ে যাবে নিশ্চয়ই।

ঘরের তালা খোলার শব্দ হতে চিঠি আবার জুতোর ভেতর লুকিয়ে ফেলি। থালায় খাবার নিয়ে যে লোকটা এল তাকে প্রথম দর্শনে মানুষ বলে মনে হ'ল না। স্বপ্নে দেখলে চমকে উঠতাম। লম্বা-চওড়া, মিশমিশে কালো চেহারা, একটা চোখ গাঢ়

হলদে, অন্যটা জবার মত লাল। সামনের দাঁত ক'টি নেই। নীচের ঠোঁট যেন কেটে জোড়া লাগানো—এক পাশ ওপরে এক পাশ নীচে। খাঁড়ার মত বাঁকানো নাক মুখের উপর উপুড় হয়ে ঝুঁকে। পরনে ময়লা হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি। গেঞ্জি পাট করে বুকের ওপর তোলা, সম্ভব—পেটটিতে হাওয়া লাগাবার জন্যে।

খাবার রেখে আমার পিঠে এক থাপ্পড় দিয়ে সে চলে গেল। ঐ আদরের মালিকের যে কি শক্তি তা হাড়ে হাড়ে বুঝলাম। কারণ থাপ্পড়ের ধাক্কায় হাড়গুলো নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি খেয়ে যেন বেসুরো জলতরংগ বাজিয়ে দিল।

তখনো গোধূলি। সন্ধ্যা হতে দেরি আছে। জানালার ধারে বসলাম। পথে মানুষের জংগল আর চারিদিকে বাড়ির পাহাড়। কত রকমের আওয়াজ ওপরে ভেসে আসে। ঠিক সামনে রুজু রুজু জানালায় বসে লোকটা কি খেলা খেলছে? একটা মুখ-খোলা টিনের কৌটো দড়ি বেঁধে নীচে নামাচ্ছে কেন? বুঝেছি, যেমন দেশলাইয়ের খোল নিয়ে টেলিফোন, এ তেমনি খেলাঘরের লিফ্‌ট্। নীচে দোকান পর্যন্ত নেমে ছিপের বঁড়শির মত ঝাঁকুনি দেয়। দোকানদারের নজরে পড়ল। সে কৌটো উপুড় করে পয়সা ও টুকরো কাগজ পড়ে দু'-তিনটা জিনিস পুরিয়া বেঁধে ওর ভেতর রেখে দড়িতে দিল টান। এবারে কৌটো ওপরে ওঠে।

লোকটি যে ভাবে দু' হাতে নিজের পা ধরে টেনে টেনে নড়ে বসলো তাতে বুঝতে পারি ঐ পা দুটো একেবারে অচল, অকেজো—নীচে নামার শক্তি নেই, তাই এ ভাবে কাজ চালাতে হয়। এবারে লোকটির নজর পড়ে আমার ওপর। ইসারা করে, তুমি ওখানে কেন?

বাড়ি দু'টি এমন কাছাকাছি যে চীৎকার করলে শোনা যেত, কিন্তু আমাকে বারণ করলো—চেঁচিও না। বুঝলাম এ পাড়ার খবর ভাল করেই জানে।

ভাবভঙ্গীতে বোঝালাম আমার অবস্থা। চিঠি দেখিয়ে জানালাম যত নষ্টের গোড়া কে। বললে, সবুর কর, রাত বাড়ুক, ব্যবস্থা হবে। তুমি খানিকটা সুতো জোগাড় কর, চিঠি ঝোলাতে হবে।

কে জানে কেন, বড় বিশ্বাস হ'ল ওর ওপর। কারুর সাহায্য আমার চাই-ই। কি দোষ করেছি যার জন্যে এই দুর্ভোগ এবং ভবিষ্যতে আরো কি আছে কে জানে? কিন্তু সুতো পাই কোথায়? ঘরের আনাচে-কানাচে খুঁজি, বাথরুমেও গিয়ে উঁকি মারি মিল গিয়া—দাড়ি কামাবার একটি পুরানো ব্লেড। বাঁদরের হাতে অস্ত্র পড়লে যা হয়—বিছানার চাদর ফালি ফালি কেটে লম্বা দড়ি তৈরি হয়ে গেল।

পথের দিকে চেয়ে বসে থাকি আর মাঝে মাঝে ঝিমাই। ওদের খাবার খেতে

সাহস হয় না, যদি কিছু মেশানো থাকে। রাত বেড়ে যায়। বসে বেশ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টুপ করে আওয়াজ হতে চমকে উঠি। দেখি দড়িবাঁধা কৌটো আমার জানালার কার্ণিশে এসে পড়েছে। লোকটির পা নেই, কিন্তু হাতের টিপ ভাল।

চিঠি বাঁধা তৈরি ছিল, তাকে গলিয়ে সুতোর প্যাঁচ লাগাবার চেষ্টা করি। হয় কি সহজে ? আমার হাত যে বাইরে যেতে পারে না ! প্যাঁচ লাগতে লোকটি টেনে নিল নিজের জানালায়। বড় ভয় হচ্ছিল, যদি নীচে পড়ে যায় ?

চিঠি পড়ে সে ছিঁড়ে ফেলে দিল। তার পর একটা কাগজে লম্বা কি লিখে ফেলে দিল আবার কৌটো আমার কার্ণিশে। ছ'জনার ঘরই অন্ধকার, কিন্তু রাস্তার আলোয় আবছা সব দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল।

আনকক্ষণ চেষ্টার পর প্যাঁচ খুলে আমার দড়ি টেনে নিলাম। চিঠিতে যা নির্দেশ দেওয়া ছিল অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম সকাল বেলায়। তাই না মুক্তি পেলাম ?

সকালে দৈত্য মশাই চা নিয়ে এল। দরজা ভেজিয়ে চা রেখে যেই আবার কালকের মত আদর করে জলতরংগ বাজাতে গেছে, আমি লাফিয়ে ওর বাঁকা নাকটি টিপে ধরলাম যত জোরে পারি। নাকে কোনো ব্যায়রাম আছে নিশ্চয়ই। ঐ যোয়ান কুঁকড়ে নেতিয়ে বসে পড়ে—দাঁতে দাঁত ঘসড়ানির আওয়াজ পেলাম। মায়া হচ্ছিল, কিন্তু আর নতুন বিপদ নয়। আরেকটু মোচড় দিতেই মাটীতে শুয়ে পড়ে অসহায়ের মত। ব্যস্, ডানদিকের সিঁড়িতে যেতে বারণ ছিল, তাই বাঁ-দিকের সিঁড়ি দিয়ে পালিয়ে এলাম।

এখনো মেরিন ড্রাইভের চারিদিকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি সেই সবুজ চশমা-পরা লোকটিকে। বিশেষ হাংগামা করবো না—খুব সোজা উপায় বাৎলেছি। মাথা নীচু করে জলের দিকে যখন দেখবে বা দেখার ভান করবে, পিছন থেকে ছুটো পা মুঠো করে ধরে তুলে উপুড় করে দেবো।

যাই হোক, তোমরা বাপু কেউ গিরগাঁ যেও না। আরো কত জায়গা আছে বোম্বাইতে, যাও না ! কোলাবা যাও, পারেল যাও, বোরি-বন্দর যাও। ইচ্ছে হলে আন্ধেরী, বান্দ্রা, মাহিম, ধোবিতালাও। এতেও সখ না মিটলে যাও টানসা, চেম্বুর, পায়ধুনি, চিন্‌কপোকলি পর্যন্ত। কিন্তু ঐ একটি দিকে নয়। গিরগাঁওতে গেছ আর গিলে ফেলবে গপ্ করে।

পশ্চিম দিগন্তে

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

এর আগে আমেদাবাদের কথা কিছু কিছু বলেছি, এবারে বাকিটুকু বলি।

আমেদাবাদের শাহ আলম রৌজা,—বালি পাথরের তৈরী এক মসজিদ। মধ্য-যুগের কারুশিল্পের এক সুদৃশ্য নিদর্শন। মোগল যুগে এটি তৈরী, ১৫৪১ সালে। মসজিদের সামনে উঁচু করে বাঁধানো একটি প্রশস্ত পাথরের চত্বর। চত্বরের ছ'পাশে কূয়ার মত ছ'টি ফুকর কাটা। সেই ফুকর দিয়ে দেখা যায় নীচের জলে মাছ ভেসে বেড়াচ্ছে। এই চত্বরটি খিলানের উপর নির্মিত, নীচে নগরে জল সরবরাহের একটি জলাধার আছে।

শাহীবাগের কথা না বললে আমেদাবাদের কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, কারণ এই শাহীবাগই আমেদাবাদকে পরিচিত করেছে বাঙালী পাঠকসমাজের কাছে। এই শাহীবাগ ভবনে তিন বছর ছিলেন আমেদাবাদের জেলা ও দায়রা জজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সে ১৮৭৬ সালের কথা।

১৮৭৭ সালে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন তাঁর এই মেজদাদার কাছে। সত্যেন্দ্রনাথ তখন একা থাকতেন এই বাড়ীতে, সারাদিন তিনি ব্যস্ত থাকতেন কাজে। নির্জন প্রাসাদে রবীন্দ্রনাথের সারাটি দিন কাটাতো একা একা। শুভ্রামতী নদীর তীরে মোগল আমলের প্রাচীন প্রাসাদ। কত কক্ষ, কত অলিন্দ, কত আব্ছা আলোছায়ায় ঘেরা রহস্যময় পথ। তারই মধ্যে উপরতলার ছোট একখানি ঘরে কবি থাকতেন। সামনে খোলা থাকতো বড় বড় ছবিওয়ালা টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ আর হেবের্লিন সংকলিত সংস্কৃত কাব্য-সংগ্রহ। পড়তে পড়তে কখনো কখনো তিনি উন্মনা হয়ে যেতেন, মনের মাঝে ভীড় করে আসতো কত চিন্তা। শুভ্রামতীর দিকে ছিল বিস্তৃত ছাদ। এই ছাদে কিশোর কবি রাত্রে একা একা ঘুরে বেড়াতেন। গুণ্ গুণ্ করে আপন মনে গানের সুর ভাঁজতেন। এক আকাশ জ্যোৎস্না ছড়িয়ে থাকতো চারিপাশে, শুভ্রামতীর সুদূর-বিস্তারী বালুকণাগুলি সোনালী আভায় স্বপ্নময় হয়ে উঠতো। স্তব্ধ প্রাসাদ রাত্রির অন্ধকারে রহস্যময় হয়ে উঠতো। কত সুলতানের বিদেহী আত্মা ভীড় করতো মনের মাঝে, কত বিস্মৃত নর্তকীর নূপুরধ্বনির রেশ জাগতো তাঁর কানে। কিশোর মন হারিয়ে যেত স্তব্ধ অতীতের অন্ধকারে।

শাহীবাগের অলিগলি, খিলান ও চত্বর অতীতের রহস্য নিয়ে মৌন নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখনো সরকারী কোন পদস্থ কর্মচারী এখানে বাস করেন। গৃহটির

অলিন্দে দাঁড়িয়ে সহসা মনে হলো, এই পাষাণময় প্রাসাদের পাথরে কান পাতলে বোধ হয় এখনও শোনা যাবে গজল গানের অস্ফুট সুর, নর্তকীর নূপুরনিক্কণের মৃদু মূর্ছনা। এখনই বুঝি সুস্তা নদীর তীর থেকে ছুটে আসবে 'ক্ষুধিত পাষাণে'র পাগলা মেহের আলী, দেউড়ীতে এখনই বুঝি শোনা যাবে সেই কণ্ঠ সব ঝুটা হ্যায়! সব ঝুটা হ্যায়!

সাত-আট ঘণ্টা ধরে নগর প্রদক্ষিণ করে আমরা ফিরে এলাম।

ভারতের পশ্চিম প্রান্তের এই নগরটির সঙ্গে আমাদের জাতিগত পরিচয় অনেক দিনের। সে ১৯০৫ সালের কথা। কাশীতে সেবার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। প্রস্তাব হলো—বিলাতী কাপড় আমরা বর্জন করবো। আমেদাবাদে তখন বস্ত্রশিল্পের পত্তন হয়েছে। কেশবলাল মেটা বললেন—বাঙালী ছেলেদের হাতে-কলমে তিনি বস্ত্রশিল্প শেখাবেন যাতে তারা বাংলা দেশেও কাপড়ের কল চালু করতে পারে। কোন্নগর থেকে ললিতমোহন ঘোষাল গেলেন আমেদাবাদে। সঙ্গে গেলেন আরো কুড়ি-পঁচিশ জন যুবক। সবাই একত্র একটি বাড়ী ভাড়া করলেন, বাড়ীটির নাম হলো—ইউনাইটেড বেংগল হোম। গুজরাতী তরুণদের সেটি হলো বিপ্লববাদ আলোচনার একটি কেন্দ্র। পূর্ব ও পশ্চিমের চিন্তাধারা একই ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলো—দেশের পরাধীনতার শিকল ছিঁড়তে হবে।

কেশবলালের কাছে হাতে-কলমে শিক্ষা শেষ করে সেই সব বাঙালী শিক্ষার্থীরা দেশে ফিরলেন, এক একটি কটন মিল প্রতিষ্ঠা করলেন—কুষ্টিয়া, ঢাকেশ্বরী, চিত্তরঞ্জন। তারপর আরো কত বাঙালী এখানে এলেন। কেউ ফিরে গেলেন, কেউ আবার এখানেই চাকুরি নিয়ে রয়ে গেলেন। ছোট বড় মিলিয়ে আজ এখানে বাঙালী আছেন প্রায় সাত শো ঘর। তাঁদেরই আতিথেয়তা আজ আমাদের এখানে আমন্ত্রণ করেছে।

সোমনাথ।

ষ্টেশনের নাম ভেরাবল। আমেদাবাদ থেকে ২৮৮ মাইল, ভাড়া দশ টাকা তেরো আনা। সোমনাথ মেল নামে একখানি ট্রেন আছে, বরাবর ভেরাবল অবধি যায়। মিটার গজের মেল ট্রেন, এইটুকু পথ অতিক্রম করতে তার লাগে আঠারো ঘণ্টারও বেশী।

মেল ট্রেন, ভীড় হবেই। তবে আমরা দলে ভারী ছিলাম, ভীড় তাই আমাদের বিশেষ কাবু করতে পারে নি। রাত আটটায় আমেদাবাদে চড়েছিলাম, পরদিন বেলা দু'টোয় নামলাম ভেরাবলে।

ভেরাবলের দুই প্রান্তে দু'টি মহাতীর্থ—সোমনাথ ও দেহোৎসর্গ।

দেহোৎসর্গেই আমরা প্রথমে গেলাম।

ষ্টেশনের কাছেই বড় ধর্মশালা। জিনিষপত্র রেখেই টাংগা ধরে বেরিয়ে পড়লাম।

পুরানো নগরী। পুরাতনীর ছায়া ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। দীর্ঘদিনের ঔজ্জ্বল্যের পর এ যেন বার্ধক্যের রূপ। সমুদ্রের তীরে ভেরাবল বন্দরটি ঘিরে ছোট নগর টিম্ টিম্ করছে।

নগর পার হয়ে সমুদ্রের পাশ দিয়ে বরাবর চলে গেছে পাকা সড়ক। সমুদ্রের তীরে কত ভগ্ন দেবালয়, পাথরের থাম, পাথরের দেয়াল এখনও অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিছু দূর গিয়েই পথের পাশে সুরু হলো একটি প্রাচীন দুর্গের প্রাকার ও পরিখা। দোতলা-সমান পাঁচীলের ফাটলে ফাটলে অসংখ্য আগাছা, পরিখার শুষ্ক গর্ভে বড় বড় মহীরুহ। এইটিই প্রভাস দুর্গ। যদুবংশের অনিরুদ্ধের কীর্তি। কাল-স্রোতে আজ সব গরিমা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। রাজা-মহারাজার মণিময় উষ্ণীষ যেখানে ঝল্‌মল করতো সেখানে সবুজ পাতা শ্যামল লাবণ্যে সাগরের বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে।

দুর্গ ছাড়িয়ে আমরা এসে পড়লাম গোমতীর তীরে। সংকীর্ণ নদীর সু-উচ্চ প্রস্তর-বাঁধানো ঘাট। এই ঘাটের পাশেই যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল।

সে দ্বাপর যুগের কথা।—

প্রভাসের ঘাটে দু'টি নদী এসে মিশেছে। হিরণ্যা ও কপিলা। পাণ্ডারা অবশ্য বলেন—এটি ত্রিবেণী সংগম, সরস্বতী নদীও এখানে এসে মিশেছে অদৃশ্য অন্তঃসলিলা হয়ে। তবে নদী-সংগম ও সাগর-সংগম দুইই ঘটেছে এখানে। ঘাটের বাঁ পাশে নদী-সংগম, ডান পাশে নদীর মোহনা গিয়ে মিশেছে সাগরে। দু'টি নদীর জল যেখানে মিশেছে সেখানে জলের গভীরতা থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু জল এখানে এক হাঁটুর বেশী নেই। লবণাক্ত। তার উপর রীতিমত পাঁক। সাবধানে স্নান না করলে জল পংকিল হয়ে ওঠে।

আমরা স্নান করলাম। জলে শীতকালীন স্নিগ্ধতা, সর্বাঙ্গ স্নিগ্ধ করে দিল। দীর্ঘ ট্রেনের ক্লান্তি মুছে গেল নিমেষে।

প্রভাসের ঘাটটি প্রশস্ত। জীর্ণ দীর্ঘ পাথরের সিঁড়ি, ঘাটের উপর ইতস্ততঃ ছড়ানো বড় বড় পাথরের চত্বরের ভগ্নশেষ, এক সময় যে এই ঘাটের সমৃদ্ধি ছিল তা বুঝিয়ে দেয়। তখন হয়তো নদীর জল ছিল গভীর, দুকূলপ্লাবী।

এখন ঘাটের চারিপাশ জংগলাকীর্ণ, জনবিরল। বহু জীর্ণ ও ভগ্নশেষের মাঝে কয়েকটা মন্দির শুধু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, আর আছে সেই মন্দিরকে অবলম্বন করে দু'-চারজন পাণ্ডা।

ঘাটের অদূরেই বহু প্রাচীন সূর্য্যমন্দির। পাথরের মন্দির। মন্দিরমধ্যে দেয়ালের গায়ে গোলাকার সূর্য্য আঁকা আছে। প্রভাসতীরে এই সূর্য্যমন্দির পৌরাণিক যুগের।—

সে অতি পুরাকালের কাহিনী।

প্রজাপতি দক্ষের সাতাশটি মেয়ে। সাতাশটি মেয়েরই তিনি বিয়ে দিলেন একা চন্দ্রের সঙ্গে। মেয়েদের মধ্যে রোহিণীই ছিল সবার চেয়ে সুন্দরী। রোহিণীর কথাই চন্দ্র বেশী শুনতেন, তাকে অনুগ্রহও দেখাতেন বেশী। সে জন্য আর সব বোনেরা মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। দক্ষের কাছে গিয়ে অভিযোগ করলো—সোমদেব রোহিণীর বশ, আমাদের পানে তাকান না, আমাদের কষ্টের আর অবধি নেই।

দক্ষ চন্দ্রকে ডেকে বললেন—সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করবে, একজনের প্রতি অনুগ্রহ করে আর সবাইকে অবহেলা করা অনুচিত।

চন্দ্র কিছুদিন সকলের সঙ্গে সমভাবেই চললেন। তার পর আবার সেই যথাপূর্বম্।

মেয়েরা আবার গিয়ে বাপের কাছে নালিশ করলো।

দক্ষ এবার ক্রুদ্ধ হলেন, চন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন—তুমি আমার কথা শুনলে না, তোমার ক্ষয়-রোগ হোক্।

চন্দ্রের ক্ষয়-রোগ হলো। তাঁর জ্যোতিঃ গেল ম্লান হয়ে। দেবতারা দুঃখিত হলেন। সবাই গিয়ে ধরে পড়লেন দক্ষকে। দক্ষ বললেন বেশ, চন্দ্র প্রভাসের ত্রিবেণী সংগমে গিয়ে স্নান করুক, মহাদেবের পূজা করুক, তার রোগ সারবে। তবে একেবারে সারবে না। পনেরো দিন ধরে সে ক্ষয় পাবে, আর পনেরো দিন ধরে তার বৃদ্ধি হবে।

চন্দ্র এলেন প্রভাসে। এখানে চার হাজার বছর ধরে চললো নিয়মিত স্নান ও শিবপূজা। শিব প্রসন্ন হলেন। বর দিলেন—তোমার অর্ধাংশ চিরদিন জ্যোতির্ম্ময় থাকবে।

এখানে জ্যোতিঃভাস্বর থাকার বর পেলেন চন্দ্র, সেই থেকে এখানকার নাম হলো প্রভাস।

চন্দ্র এখানে একটি ছোট্ট শিবলিঙ্গ পূজা করতেন, ব্রহ্মা বললেন ওই শিবলিঙ্গটি এখানে প্রতিষ্ঠা কর।

ডিমের মত ছোট আকারের জ্যোতির্ময় লিঙ্গ। তার উপর ব্রহ্মশিলা স্থাপনা করে চন্দ্র শিব প্রতিষ্ঠা করলেন। তাই সেই শিবের নাম হলো সোমনাথ।

সেই সময় সূর্য্যের কাছ থেকে জ্যোতিঃ পাবার জন্য চন্দ্রদেব সমুদ্রস্নান করে সূর্য্য-পূজা করে সূর্য্যকে প্রসন্ন করেছিলেন, সেই জন্যই বোধ হয় এখানে সূর্য্যদেবের মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মন্দিরটি যে বহু প্রাচীন তা নিঃসন্দেহ। হয়তো মন্দিরমধ্যে পূর্বে কোন মূর্তি ছিল, যারা বার বার সোমনাথ আক্রমণ করেছে, তাদের উদ্দামতা থেকে সে বিগ্রহ রক্ষা পায় নি। তারপর আর কেউ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে নি, সূর্য্যকে গোলাকার সূর্য্য করেই এঁকে রেখেছে।

প্রভাস থেকে কয়েক পদ গেলেই 'দেহোৎসর্গ'। ঘাটের উপর একটি গাছকে ভালো করে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। এইখানেই গাছের নীচে শ্রীকৃষ্ণ তীরাহত হয়েছিলেন। এটি অবশ্য সেই হাজার হাজার বছরের পুরোনো গাছ নয়, তারই কোন বংশধর।

সামনেই একটি ছোট মন্দির। মন্দিরমধ্যে দেওয়ালের গায়ে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। বৃদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ তীরাহত হয়ে বসে আছেন।

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা ঢুকলাম আরেকখানি ঘরে। বরাবর সিঁড়ি নেমে গেছে মাটির নীচে। কয়েকটি সিঁড়ি নেমেই ভূগর্ভস্থ এক গুহা। গুহার গায়ে একটি সাপ খোদাই করা আছে। এই স্থানেই নাকি বলদেব যোগাসনে দেহত্যাগ করেছিলেন। তাঁর মুখ থেকে মহানাগ নির্গত হয়ে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করেছিল।

এই মন্দিরটির প্রবেশদ্বারের পাশেই ছোট একখানি ঘর, সেই ঘরে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি আছে। প্রতিদিন সেই মূর্তির পূজা হয়। সামনে শ্রীচৈতন্যদেবের একখানি বড় ছবি আছে। এক সময় চৈতন্যদেব এখানে এসে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ভক্ত ও ভগবানের মিলনতীর্থের স্মারক এই ছবিখানি।

এই স্থানের আরেক নাম ভল্লতীর্থ। সংক্ষেপে এখানকার লোকেরা বলে 'ভালকা'। কাছেই এক কুণ্ড আছে,—ভাল্‌কা-কুণ্ড। শুক্লপক্ষের দ্বাদশীর দিনে এই কুণ্ডে স্নান করলে নাকি মহাপুণ্য হয়।

মহাভারতের যুগে অবশ্য এই অঞ্চলের নাম ছিল কাম্যক বন। অজ্ঞাতবাসের সময় পঞ্চপাণ্ডব কিছুদিন এখানে ছিলেন।—

"... ... পঞ্চ সহোদর।
কাম্যক কাননে চলিলেন অতঃপর॥
প্রভাস তীর্থের তীরে বিচিত্র কানন।
ফল, পুষ্প অপ্রমিত, মৃগ পশুগণ॥" [বনপর্ব্ব]

আমরা হিরণ্যা নদীর তীরে এসে দাঁড়ালাম। কয়েক হাজার বছরের পুরানো স্মৃতি এই নদীর জলস্রোতের মতই কালস্রোতে বহে গেছে। জনসমাগমে যে স্থান একদিন মুখর ছিল, আজ তা জনবিরল, পরিত্যক্ত। এইখানে মহাভারতের অসামান্য মনীষা, সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনীতিক শ্রীকৃষ্ণ তাঁর লীলা সংবরণ করেন। একটি যুগের সমগ্র ভারতভূমির রাজনীতি ও ধর্মনীতি ছিল তাঁর নখদর্পণে। সব কিছুই রয়ে গেল, নশ্বর দেহ কালপ্রভাবে পঞ্চভূতে লীন হয়ে গেল। তারপর কত বিপ্লব, কত দুর্যোগ, কত অনাচার ঘটে গেল ভারতের প্রান্ত থেকে প্রান্তান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে, কিন্তু সে-অসামান্য মনীষা তখন স্তব্ধ, মহাকাল তাঁকে চিরকালের মত অস্তমিত করেছে। ধন, জন, সম্পদ ও শক্তি, গরিমা ও মর্য্যাদা, মনীষা ও দেবত্ব—কালস্রোত মুছে দিয়েছে সব কিছু। আমরা ক'জন এখানে এসেছি সেই স্রোতের সর্ব-ধ্বংসী ঢেউকে প্রত্যক্ষ করতে। আমরাও এই স্রোতেরই যাত্রী। হিরণ্যার এই স্রোত যেমন গিয়ে মিশছে সামনের সমুদ্রে, আমরাও তেমনি ভাবে অলক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি কালসমুদ্রে মিশে যাবার উদ্দেশে।

আবেদন

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত

আকাশ, আমায় একটু দয়া কর্,
দে না আমায় দাদার মতো শিল্পী হবার বর।
দেবো তোকে আমার যত খেলনা পুতুল আছে,
জলখাবারের পয়সা জমা পারুল দিদির কাছে,
জন্মদিনে পাওয়া জামা, ছড়া-ছবির বই,
কুলের আচার, উড়কি ধানের মুড়কি, রাঙা খৈ,
বাগান থেকে গোলাপ, চাঁপা চামেলি, টগর ;
আকাশ, আমায় একটু দয়া কর্।

দেখি দাদা অনেক সময় তাকিয়ে তোরই পানে
আঁকে কত মেঘ, তারা, চাঁদ, পাখী তূলির টানে।
তোর হৃদয়ে কত আলো ছায়াছবির খেলা,
পাহাড়চূড়ায় বনের শিরে তোরই রঙের মেলা।
শেখা আমায় ছবি আঁকা, সহে না আর তর ;
আকাশ, আমায় একটু দয়া কর্।

খুকুর দেশে বাদল

৺ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

খুকুর দেশে বাদল এলো
বকুলবনের মেয়ে,
কাজল মেঘের সজল স্নেহে
ভুবন গেলো ছেয়ে।
খুকুর মনের ভালবাসা
বিষ্টি হয়ে ঝরে,
কদম-কেয়ার মায়াখানি
বনের ব্যথা হরে।

বাদল হয়ে এলো খুকু
মেঘনামতী রাণী,
শ্যামল স্নেহে ভরিয়ে দিলো
সারা ভুবনখানি।
মায়ের কোলে খুকু দোলে
বিষ্টি-ঝরা.বেলা—
সাতটী উজ্জল পরী এলো
খেল্‌তে বাদল খেলা।

সাতটী পরী এলো রে সাত
পেরজাপতির পিঠে,
আঁধার বনে লাগ্‌লো যে তাই
সাতটী রঙের ছিটে।
শালের বনের মাথার 'পরে
মেঘরা ভেসে যায়,
হাতছানিতে ডাক্‌ছে—খুকু,
আয় রে—হেথা আয়।

এখান থেকে ঝর্ণা হয়ে
পড়বি অঝোর ঝ'রে,
দুষ্টু মেয়ে—মিষ্টি হবি
সোনার শরৎ-ভোরে।
খুকুর দেশে বিষ্টি এসে
অঝোর ধারায় ঝরে,
বিষ্টি খুকু—মায়ের খুকু
দু'জনে ভাব করে।

নতুন বই

নতুন বইএর খবর অনেক দিন বলা হয় নি। ইতিমধ্যে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর বই এসে গেছে আমাদের হাতে। তাদের কয়েকটির কথা আজ বলি।

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প সিরিজের নূতনতম বই হচ্ছে "জরাসন্ধের শ্রেষ্ঠ গল্প"। জরাসন্ধ—যিনি 'লৌহকপাট' নামে বড়দের বই লিখে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের আসরে সাড়া জাগিয়েছেন—তিনি কি তা হ'লে ছোটদের জন্যও লেখেন নাকি? পাতা খুলে দেখি এগুলি প্রায় সবই ছোটদের নামকরা গল্প—শিশুসাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তীর লেখা। তা হলে ছদ্মবেশী জরাসন্ধ আর কেউ ন'ন—খ্যাতনামা শিশুসাহিত্যিক শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তীই সম্প্রতি ঐ নামে বড়দের আসরে আত্মপ্রকাশ করেছেন! সযত্নপালিত গোপন তথ্যটি প্রকাশক এ ভাবে ফাঁস করে দেবেন তা কেউ ভাবে নি! তবে আমাদের মনে হয়—একদা যে স্বনামে লেখক এই সুন্দর গল্পগুলি লিখেছিলেন—সংগ্রহাকারে প্রকাশ করবার সময় সেই নাম ব্যবহার করলেই বোধ হয় সেটা বেশী সুষ্ঠু হ'ত।

তা জরাসন্ধ বা চারুচন্দ্র যে নামেই বেরোক না কেন, কৌতুকরসে ভরপুর এই গল্পগুলি নতুন করে পড়বার সুযোগ পেয়ে ছেলেমেয়েরা খুসী হবে নিশ্চয়ই। বড় বড় কথা নেই, লেখকের ভাষায়ই বলি—"আমাদের চারদিকে যারা চলছে ফিরছে, সেই সব রাম-শ্যাম-যদু, শোভা-মায়া-কমলার গল্প। তাদের আহার, নিদ্রা. চলন, কথন; তার মধ্যে কোথায় জড়িয়ে আছে মজার গন্ধ, কোথায় লুকিয়ে আছে হাসির ফোয়ারা"—এই নিয়েই লেখা গল্প। এক সময় এর অনেকগুলো রামধনুর পৃষ্ঠাকেও অলঙ্কৃত করেছিল। মোট ১১২ পৃষ্ঠায় ১৩টি গল্পের সংকলন এটি।

"মামাবাড়ি' আর একখানি কৌতুক-রসের গল্পসংগ্রহ। লেখক শ্রীঅরবিন্দ গুহ। ৯টি ছোট ছোট গল্প—সব ক'টিই হাসির এবং যাকে বলে মজাদার। লেখকের অপূর্ব রচনাভঙ্গীর গুণে সাধারণ বর্ণনাগুলোও পরম সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। কয়েকটি গল্পের প্লটও অতি চমৎকার এবং সমাপ্তিও দস্তুরমত অবাক্-করে-দেওয়া। এর কয়েকটি গল্প রামধনুতে ইতিপূর্বে বেরিয়েছিল, পুরোনো পাঠকেরা নতুন করে সেগুলি পড়বার সুযোগ পাবে। বইএর মলাটটিও বেশ সুরুচিপূর্ণ।

বিখ্যাত ইংরেজ লেখক এইচ. জি. ওয়েলসের "এ শর্ট হিষ্ট্রী অব্ দি ওয়র্ল্ড্" ইংরেজী সাহিত্যের একখানি উল্লেখযোগ্য তথ্যবহুল বই। সম্প্রতি বাংলা ভাষায় "পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" নাম দিয়ে এটি তর্জমা করেছেন শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমনোজ ভট্টাচার্য। এ ধরণের বিষয়বস্তুর একখানি নামে 'সংক্ষিপ্ত' অথচ আসলে ছোট অক্ষরেও সাড়ে তিনশ' পাতার বই যতদূর সম্ভব মূলানুগ রেখে অনুবাদ করা কষ্টসাধ্য নিশ্চয়ই—এবং সেই জন্যই হয়তো পড়তে পড়তে জায়গায় জায়গায় বাধো বাধো লাগে। তবু এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। প্রধানতঃ বড়দের জন্য লেখা হলেও কিশোর পাঠকেরা এ-বই পড়ে অনেক কিছু জানতে পারবে। আর, সাধারণ লোক,

যাঁরা সংক্ষেপে বিশ্ব-ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে চান অথচ বেশী সময় দিতে পারেন না,—তাঁদের কাছেও এ বইএর মূল্য অনেক। ভিতরের ছোট ছোট রেখা-মানচিত্রগুলিও পাঠকের বেশ কাজে লাগবে।

"বোরোবুদুরের ডাক" একটি কিশোর উপন্যাস, লিখেছেন শ্রীইন্দিরা দেবী। পাড়াগাঁয়ের ছেলে সোমা। ইতিহাসের শিক্ষক নির্মল বাবু তাকে ইতিহাস পড়ায় উৎসাহিত করেন। এই ইতিহাসের নেশা পরবর্তী জীবনে তাকে নানা বাধাবিঘ্ন এড়িয়ে কি ভাবে বোরোবুদুর মন্দির থেকে একটি দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করল—প্রধানতঃ তাই নিয়েই এর গল্প। এই পুঁথি হচ্ছে যবদ্বীপের ভাষায় লেখা বৌদ্ধ ত্রিপিটক। প্রাচীন ভারত আর যবদ্বীপের মধ্যে এই যোগসূত্র যেমন ভারতীয় সভ্যতার দিক্ দিয়ে. তেমনি বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতির দিক্ দিয়েও মূল্যবান্। বইখানি পড়লে ছেলেমেয়েরা শুধু প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ওপর শ্রদ্ধাভাবাপন্নই হবে না—ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও কৌতূহলী হবে। বইটির রূপসজ্জা সুন্দর।

"স্বর্ণখনির ডাক"—রহস্য-উপন্যাস। মলাটের ওপর উদ্যত পিস্তল আর সুড়ঙ্গপথে-নেমে-যাওয়া সিঁড়ির ধাপ দেখলেই তা বোঝা যায়। কিশোরদের জন্য লেখা ছোট উপন্যাস—লিখেছেন শ্রীসাধনা প্রসাদ দাশগুপ্ত। চতুর গোয়েন্দা ছত্রপতি সেন সহকর্মী প্রণব, শ্রমিকদরদী করবী দেবী আর বুদ্ধিমতী মালিনী দেবীর সহায়তায় কি করে একদল অর্থলোভী দুর্বৃত্তকে সায়েস্তা করলেন—যারা নাকি সুবর্ণরেখার নীচে সোনার খনির সন্ধান পেয়েও পেল না—অতিলোভের ফলে আসল আবিষ্কারককে ফাঁকি দিতে গিয়ে,—তারই কাহিনী। অল্প পরিসরের মধ্যে অনেক রহস্য ঘনীভূত করেছেন লেখক, আবার তা উদ্‌ঘাটিতও করেছেন অল্প পরিসরের মধ্যেই। এবং শেষটায় "মাটি টাকা, টাকা মাটি. এই কথা জেন খাঁটি"—এই মহদ্বাক্য অনুসরণ করে সোনার লোভ সংবরণও করিয়েছেন গল্পের পাত্রপাত্রীদেরকে।

এই লেখকেরই লেখা আর একখানি বই হচ্ছে "বালক শ্রীকৃষ্ণ"। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ছোটদের মত করে সুন্দর সহজ বাংলায় পরিবেশন করা হয়েছে অল্প কথায়। লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায় এতে। ভিতরের রেখাচিত্রগুলিও বইএর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আঁকা হয়েছে। ছোটদের খুবই ভাল লাগবে এই পৌরাণিক কাহিনী। মলাটটি বাঁধানো হ'লে প্রচ্ছদপটের সুন্দর ছবিটির ওপর আরও সুবিচার করা হ'ত।

এবারে বলি আর একখানি অনুবাদ-গ্রন্থের কথা। ফরাসী লেখক জুলে ভার্ণে বিস্ময়কর গল্প লেখার জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁর কয়েকখানি বই—যেমন 'টুয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগ্‌স্ আণ্ডার দি সী' কিংবা 'রাউণ্ড দি ওয়ার্লড্ ইন্ এইট্টি ডেজ্' প্রভৃতি ঘটনাবৈচিত্র্যে অভিনব। এঁরই একখানি বই "এমংগ্ দি ক্যানিবাল্‌স" অবলম্বন করে সংক্ষিপ্ত ভাবে কিশোরোপযোগী করে লিখেছেন শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়। বইটির নাম "নরখাদকের পাল্লায়"। স্কচ্ অভিযাত্রী ক্যাপ্‌টেন গ্রাণ্ট দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কাছে নিখোঁজ হওয়ায় লর্ড গ্লেনারভ্যানের নেতৃত্বে এক ইংরেজ দল রওনা হ'ন তাঁর খোঁজে এবং ঘটনাচক্রে নিউজিল্যাণ্ড অঞ্চলের মাউরী-অধ্যুষিত এক জংলী দ্বীপে নরখাদক আদিম অধিবাসীদের ভিতর গিয়ে পড়েন। তাই নিয়েই গল্প। নানা রকম বিপদ্-আপদের ভিতর দিয়ে

গ্রাণ্ট সহ তাঁরা কি করে ফিরে এলেন এবং সেই প্রসঙ্গে জংলীদের সমাজের নানা রকম রীতিনীতির বর্ণনা আছে এতে। বলা বাহুল্য তার মধ্যে বীভৎস-রসও যে কিছুটা নেই এমন নয়। অনুবাদ স্বচ্ছ ও সুন্দর।

গল্প-প্রবন্ধ ছেড়ে এবার ছড়ার বইতে আসা যাক। ঢ্যাম্ কুড় কুড়্—লিখেছেন শ্রীঅমিয়ভূষণ চক্রবর্তী ও শ্রীজ্যোতিভূষণ চাকী। রংবেরংএর কালিতে ছাপা, বহু চিত্রশোভিত বইখানি ছোটরা খুসীর সঙ্গেই নেবে। ভেতরের ছড়াগুলিও বেশ মজাদার। পড়ে ছোটরা খুসী হবে নিশ্চয়ই।

নতুন বইয়ের কথা লিখতে লিখতে আর একখানা টাটকা বই হাতে এসে পড়ল। 'সাত রাজ্যি' —লিখেছেন শ্রীসুকুমার দে সরকার। খুব ছোটদের বই —গল্পটিও আজগুবি, কিন্তু ভারী মজার আর ভারী মিষ্টি। যেমন মিষ্টি হযবরল, অ্যালিস ইন্ ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড আর অবনীন্দ্রনাথের কোন কোন লেখা। খুব ছোটদের মন-কেড়ে-নেওয়া যাদু-মাখানো ভাষায় গল্প লিখতে সুকুমার বাবু সুপটু। সাত রাজ্যির পাতায় পাতায় সে যাদুর ছোঁয়াচ পাওয়া যায়। এ বইএর ছাপা, বাঁধাই, ছবি—সবই সুন্দর।

জরাসন্ধের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প—জরাসন্ধ—২'০০; মামাবাড়ী—শ্রীঅরবিন্দ গুহ—১'৫০; পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও মনোজ ভট্টাচার্য অনূদিত—৬'০০; সাত রাজ্যি—সুকুমার দে সরকার—১'৮০; অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। বোরোবুদুরের ডাক—ইন্দিরা দেবী—২'০০; এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, ৯৩ হ্যারিসন্ রোড, কলিকাতা-৭। স্বর্ণধ্বনির ডাক—সাধনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত—১'০০; তুলি কলম - ৫৭এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। বালক শ্রীকৃষ্ণ—সাধনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত—'৭৫; স্কলার্স সিণ্ডিকেট, ১৭০এ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৪। নরখাদকের পাল্লায়—বীরু চট্টোপাধ্যায় অনূদিত—১'২৫; বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ঢ্যাম্ কুড়্ কুড়্—অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী ও জ্যোতিভূষণ চাকী—১'৫০; সুমুদ্রণ, ১৩৬বি. আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫।

পুরানো পাতা

যমজ ভাই

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

অহিজিৎ সিং এবং মহীজিৎ সিং দুই যমজ ভাই, জাতিতে তাহারা পাঞ্জাবী। যমজ ভায়েদের সচরাচর যেমনটা হইয়া থাকে—অর্থাৎ সাধারণ লোকের চোখে একজনকে

অপর জন বলিয়া ভুল হওয়া—ছোটবেলায় তাহাদের হামেশাই হইত। এই ধরণের ভুল হইলে দুই ভায়েরই কখনো লাভ, কখনো বা ক্ষতি হওয়ার কথা, কিন্তু বিধাতা পুরুষ বোধ করি লাভের ভাগটা ষোল আনাই অহিজিতের কপালে, আর লোকসানের ভাগটা ষোল আনাই মহীজিতের অদৃষ্টে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। ফলে কোন দিন ইস্কুলের টিফিনের সময় অহিজিৎ দু' পয়সার 'সোহন্ হালুয়া' বা 'নান্‌খাটাই' বাকী কিনিয়া খাইলে পর দিন মেঠাই-ওয়ালা পয়সার জন্য মহীজিৎকে ধরিয়া বসিত। আবার হকি খেলায় মহীজিৎ যদি বিপক্ষ দলকে একা পাঁচ পাঁচ খানা গোল দিয়া আসিত তো পর দিন ইস্কুলে ছেলেদের মুখে অহিজিতের প্রশংসা যেন আর ধরিত না! এ দুঃখ রাখিবার মহীজিতের যেন আর ঠাঁই ছিল না—বিধাতা পুরুষের এ কি একচোখোমি রে বাপু!

তা, বিধাতা পুরুষের একচোখোমির জন্যই হউক বা অপর যে কারণেই হউক, দু' ভাই বড় হইয়া ওঠার পরেও কপালের লেখা তাহাদের এতটুকু বদ্‌লাইল না—অর্থাৎ অহিজিৎ হইল মহা ধনী আর মহীজিৎ নিতান্ত দরিদ্র। অহিজিতের টাকাকড়ি, বাড়ী এবং গাড়ীজুড়ী ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল, আর মহীজিতের অবস্থা ক্রমে এমন দাঁড়াইল যে দু'বেলা রুটীর জোগাড় করাও যেন তার পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার।

বড় হওয়ায় দু'ভাই থাকিত দু' মুলুকে, অনেক দিন যাবৎ তাই দেখাশুনা নাই। একদিন মহীজিৎ ভাবিল, নিজের অবস্থা তো 'অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ,' যাই একবার অহিজিতের কাছে—যদি সে কিছু টাকা-পয়সার সাহায্য করে তো ব্যবসা করিয়া অবস্থার উন্নতি করিব। এই রকম সাত-পাঁচ ভাবিয়া একদিন সে অহিজিতের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল।

নদীর ঠিক উপরে অহিজিৎ সিংহের চমৎকার বাড়ীখানা। চারিদিকে প্রকাণ্ড বাগান, নানা দেশী ফল-ফুলের গন্ধে বাড়ী মাতোয়ারা করিয়া রাখিয়াছে। ফটকের ভিতর দিয়া মহীজিৎ যখন ঢুকিল সন্ধ্যা তখন গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। বারান্দার উপর উঠিয়া চাকর-বাকর-দরোয়ান কারোই সাক্ষাৎ সে পাইল না, শুধু সামনের ঘরখানা হইতে কাচের জানালা ভেদ করিয়া একটা আলোর রেখা আসিতেছিল। মহীজিৎ ধীরে ধীরে দরজার উপর কয়েকটী ধাক্কা মারিল, কিন্তু ভিতর হইতে কেহই দরজা খুলিয়া দিল না। তখন সে দ্বার-সংলগ্ন পিতলের হাতলটা ঘুরাইতেই দুয়ার আপনা-আপনি খুলিয়া গেল। মহাজীৎ দেখিল একটা সোফার উপর কাৎ হইয়া অহিজিৎ পড়িয়া আছে। সে নিকটে গিয়া দাঁড়াইতেও কিন্তু অহিজিৎ এতটুকু নড়িল না, তাহার পলকহীন চোখ দুইটী ঘরের উপরকার কড়িকাঠের দিকে স্থির হইয়া তাকাইয়া ছিল। মহীজিৎ তাহার নাম ধরিয়া

বার দুই-তিন ডাকিল, কিন্তু অহিজিৎ নিশ্চল, তার মুখে কথাটী নাই। মহীজিতের বুকটা হঠাৎ দুরু দুরু করিয়া উঠিল,—তবে কী—? ভাল করিয়া পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে সে ভায়ের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, এবং পরক্ষণেই তাহার মুখ পাংশু হইয়া গেল, প্রবল ভাবে বুকের ভিতরটা ঢিব্ ঢিব্ করিতে লাগিল, কপাল দিয়া দর্ দর্ করিয়া ঘাম ছুটিল—সে যাহা সন্দেহ করিয়াছিল তাহাই সত্য, অহিজিতের দেহে প্রাণ নাই।

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মহীজিৎ কী যে করিবে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার মুখ দিয়া একট ভয়ার্ত্ত চীৎকার প্রায় বাহির হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময় তাহার মনের মধ্যে শয়তান আসিয়া উঁকি দিল।

উত্তেজিত ভাবে, দ্রুতপদে সমস্ত ঘরময় মহীজিৎ পাইচারী করিতে লাগিল। সে ভাবিল, ভাই তো তাহার মারাই গিয়াছে, শত চীৎকার, হাজার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও আর তো তাহাকে ফিরান যাইবে না। তবে সে চেষ্টা না করিয়া অন্য একটা কাজ সে করে না কেন? অহিজিৎ তাহার যমজ ভাই, চেহারায় দু'জনার মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই। সে যদি এখন অহিজিতের পোষাক-পরিচ্ছদগুলি পরিয়া ঠিক তাহারই মত সোফায় হেলান দিয়া বসিয়া থাকে তো এ দুনিয়ায় এমন কেহই নাই যে তাহাকে চিনিতে পারে। অহিজিতের বিপুল সম্পত্তি তবে তাহার একারই হইবে, আর কাহাকেও এতটুকু ভাগ দিবার প্রয়োজন হইবে না। তাহার উগ্র মস্তিষ্কে তখন শয়তানের তাণ্ডব চলিতেছিল, নিমেষ-মধ্যে সে তার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল।

যাহাতে কেহ এতটুকু সন্দেহ না করিতে পারে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়া মহীজিৎ চট্‌পট্ অহিজিতের কাপড়গুলি পরিয়া ফেলিল; পরে নিজের পরিত্যক্ত ময়লা খেলো কাপড়-চোপড়গুলি অহিজিৎকে পরাইয়া দিল। তারপর ধী—রে, অতি সন্তর্পণে অহিজিৎকে কাঁধে করিয়া রাত্রির অন্ধকারে পা টিপিতে টিপিতে নদীর কিনারায় আসিয়া সেই তরঙ্গ-মুখর নদীর জলে ভাইকে চিরতরে শোয়াইয়া দিল।

ভাইকে নদীতে রাখিয়া আসিয়া মহীজিৎ যখন পুনরায় অহিজিতের বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন বুকের ভিতরটা তার বাস্তবিকই একটু খচ্ খচ্ করিতেছিল—কে যেন ভিতর হইতে বলিতেছিল, কাজটা ভাল হইল না। কিন্তু লোভ বড় সাংঘাতিক বস্তু, তাই অস্বস্তির ভাব কাটাইয়া মহীজিৎ তখনই আবার সুস্থ হইতে চেষ্টা করিল, মনকে সবল করিয়া বলিল, কিছুতেই সে বাহিরে এমন ভাব প্রকাশ পাইতে দিবে না যাহাতে লোকে তাহাকে অহিজিৎ ভিন্ন অপর কেউ বলিয়া সন্দেহ করে। ঈজি-চেয়ারে কাৎ হইয়া সে একখানা মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতে লাগিল।

বাহিরের বারান্দায় লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল। মহীজিৎ বুঝিল এ বাড়ীরই কেউ কর্ত্তার ঘরে আসিতেছে। একটু পরেই দরজায় করাঘাতের আওয়াজ আসিল। মহীজিৎ তখন চেয়ার হইতে উঠিয়া মুখখানাকে যত দূর সম্ভব স্বাভাবিক করিয়া ধীরপদে গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। যাঁহারা আসিয়াছিলেন এ বাড়ীর লোক তাঁরা কেহই ন'ন, বাহিরের আগন্তুক—জনা তিনেক ভদ্রলোক। তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা অহিজিৎ সিং-এর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি; বাড়ী আছেন তিনি?"

মহীজিৎ বলিল, "কি দরকার আপনাদের বলুন, আমিই অহিজিৎ সিং।"

ভদ্রলোকটী বলিলেন, "ওঃ, আপনিই অহিজিৎ সিং? তবে আপনাকে গ্রেপ্তার কর্‌লুম। আমি একজন পুলিশের কর্ম্মচারী। আজ সকালে আপনিই যে কিষেণপুরের আমীরচাঁদকে হত্যা করে এসেছেন তা আমরা টের পেয়েছি।"

মহীজিৎ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল, তাহার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছিল। *

* বিদেশী গল্প অবলম্বনে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

—তোমরাও পারো—

শ্বেতসার বা ষ্টার্চ তোমরা অনেকেই দেখেছ, কেউ কেউ ব্যবহারও করে থাকবে। গৃহস্থালীর নানা কাজে আজকাল এ জিনিষটির কদর বেড়েছে। কাপড়-জামা কেচে ইস্তিরী করার আগে তাতে একটু মাড় দিয়ে নিলে সেটা একেবারে ধোপাবাড়ীর মত নিখুঁত হয়। এই মাড় হচ্ছে ষ্টার্চ্ বা শ্বেতসার,—দোকানে প্যাকেটে কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু না কিনে বাড়ীতেও এ জিনিষ তৈরী করে নেওয়া খুব কঠিন নয়।

কারণ আমাদের নিত্য ব্যবহার্য চাল, আটা, ময়দা এ সবেরই মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার আছে। কি ভাবে তা থেকে এই শ্বেতসার বার করে নিতে হয় বলছি।

যদি চাল থেকে করতে হয় তবে প্রথমে সে চাল নরম করে নিতে হবে। এ জন্য এক ভাগ কষ্টিক সোডায় ২ ভাগ জল এই মাপে কিছু কষ্টিক সোডা গুলে নিয়ে সেই কষ্টিক সোডার জল দিয়ে চালগুলিকে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখবে। এতেই চাল বেশ নরম হবে। তখন সেই চাল তুলে নিয়ে ভাল করে ধুয়ে খুব মিহি করে বেটে নিয়ে একটা সূক্ষ্ম ছাঁকনীর বা চালুনীর ওপর ছড়িয়ে দেবে এবং তার ওপর আস্তে আস্তে জল ঢালতে থাকবে। চালুনীর নীচে একটা পাত্র রাখতে হবে। চালের শ্বেতসার জলের সঙ্গে মিশে চালুনীর ভিতর দিয়ে ঐ পাত্রে জমা হবে। এবারে পাত্রটি ঐ অবস্থায় খানিকক্ষণ ফেলে রাখলে দেখা যাবে শ্বেতসার নীচে থিতিয়ে জমা হচ্ছে। বেশ খানিকটা জমলে ওপরের জলটা সাবধানে ফেলে দিয়ে নীচেকার শ্বেতসার আর একবার আগের মত করে চালুনীর ওপর রেখে ধুয়ে নেবে। এবারে যে জল পাওয়া যাবে তাতে আগের বারের চাইতে অধিকতর খাঁটি শ্বেতসার থাকবে। এর পর ঐ শ্বেতসার নিয়ে বেশ গরম জায়গায় ২।১ দিন রেখে দিয়ে তার পর ছায়ায় শুকিয়ে নিলেই হ'ল। যদি ডেলা ডেলা হয়ে যায়, গুঁড়ো করে নিলেই হবে।

চালের বদলে ময়দা বা আটা থেকে শ্বেতসার বার করতে হলে আর কষ্টিক সোডার দরকার হয় না। ময়দা বা আটা প্রথমে অল্প জলে (১০ ভাগ ময়দায় ৪ ভাগ জল) মেখে ঘণ্টা ২।৩ ফেলে রাখতে হবে। তার পর ঐ মাখা ময়দা ঠিক চালের মত করে সূক্ষ্ম চালুনীর ওপর রেখে আস্তে আস্তে ধুয়ে নিলে তলাকার শ্বেতসার-মেশান জল থেকে ঠিক চালের মত করেই শ্বেতসার পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য এ কাজে আটার চাইতে ময়দাই বেশী সুবিধাজনক। ইচ্ছা করলে যবের ছাতু থেকেও ঠিক এই একই প্রক্রিয়ায় শ্বেতসার পাওয়া যেতে পারে।

—ব্যাকরণ কৌমুদীর ইতিহাস—

স্কুলে ভালো করে সংস্কৃত শিখতে গেলে ব্যাকরণ কৌমুদী না পড়ে উপায় নেই। সংস্কৃত শেখাটাকে সহজ করবার জন্যই এই ব্যাকরণ কৌমুদী। অথচ আমি জানি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এ বইটিকেও বিভীষিকার চোখে দেখ। সংস্কৃতকেও তারা রীতিমত ভয় কর। কিন্তু কষ্ট ক'রে যদি একটু সংস্কৃত শিখে নিয়ে সত্যিকার সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে ঢুকতে পার,—অবাক্ হয়ে ভাববে এত মধু আছে একটা ভাষায়! কাব্য, গল্প, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ, এমন কি চিকিৎসাশাস্ত্র - আয়ুর্বেদ পর্যন্ত ছন্দে লেখা

যায় যে ভাষায় তার কি তুলনা আছে? তবে ঐ ব্যাকরণ? হ্যাঁ, ও নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি আছে সংস্কৃতে। কিন্তু বাদামের খোলা ভাঙতে পারলে তবেই না ভেতরের মিষ্টি শাঁস পাওয়া যায়? তখন আর খোলার কথা মনে থাকে না, শাঁসটাই বড় মনে হয়।

আগেকার দিনে টোলে সংস্কৃত শেখান হ'ত। ব্যাকরণটার ওপর খুবই জোর দেওয়া হ'ত সেখানে। পাণিনির সিদ্ধান্ত কৌমুদী আর বোপদেবের মুগ্ধবোধ আয়ত্ত করতে পারলে তবেই সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবেশের অধিকার পাওয়া যেত। বিদ্যাসাগর মশাইও এই ভাবেই সংস্কৃত শিখেছিলেন।

একবার হ'ল কি, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক) হ'ল সংস্কৃত শেখার দারুণ শখ। অবসর সময় ভালো করে ঐ ভাষাটা রপ্ত করার জন্য তিনি বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হলেন; বিদ্যাসাগরও খুসী মনেই তাঁকে সংস্কৃত শেখাতে লাগলেন। কিন্তু পড়াতে গিয়েই তিনি টের পেলেন, এঁকে পুরোনো পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যাকরণ পড়িয়ে নিয়ে সংস্কৃত শেখান মানে অনর্থক সময় নষ্ট করা — কোনই দরকার নেই তার। চট্‌পট্‌ সহজ উপায়ে ব্যাকরণটা পার করিয়ে দেওয়া দরকার। ভেবে ভেবে একটা সহজ প্রণালী ঠিক করে ফেললেন তিনি, এবং তার সাহায্যে অতি অল্প সময়ে বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইকে সংস্কৃতে পণ্ডিত করে তুললেন। তখন তাঁর মনে হ'ল, স্কুলের ছেলেদের জন্যও এই প্রণালীতে ব্যাকরণ লিখে দিলে তা হয়তো তাদের সংস্কৃত শেখার পথ সহজ করে দেবে। উপরন্তু, সময় এবং ধৈর্য দুই-ই বাঁচানো যাবে তা'তে।

ব্যস্, যেমন ভাবা তেমনি কাজ। অমনি লিখতে সুরু করে দিলেন তিনি তাঁর সুবিখ্যাত ব্যাকরণ কৌমুদী - যার প্রথম অংশের নাম উপক্রমণিকা। ভাগ্যিস লিখেছিলেন! নইলে মূল বই থেকে ব্যাকরণ পড়তে গেলে তোমাদের অনেকেরই কি অবস্থা হ'ত ভেবে ভয় পাচ্ছি।

প।

— কবিতা পড়ার আনন্দ—

কবিতা পড়তে তোমরা ভালবাস কি? মনে হয় অনেকেই বাস না। রামধনুতে এত কবিতা বেরোয় কিন্তু সে সম্বন্ধে মন্তব্য খুব অল্প পাঠক-পাঠিকারাই করেন, অথচ গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে কত রকম মতামত নিয়ে এন্তার চিঠি আসে সম্পাদকের নামে! চোখেও দেখেছি, বই পড়বার সময় বেশীর ভাগ পাঠকই কবিতার পাতাগুলো তাড়াতাড়ি উল্টে যান—কোন রকম আগ্রহই দেখান না ওর ওপর।

আমি কিন্তু কবিতা খুব ভালবাসি। ও যেন কখনও পুরোনো হয় না! যতবার পড়ি ততবার নতুন লাগে। এমন কি কয়েকবার পড়লে আপনা থেকেই মুখস্থ হয়ে যায়। কিন্তু গল্প-প্রবন্ধ কি বার বার পড়া যায়? গলা ছেড়ে, মনের আনন্দে চেঁচিয়ে পড়া যায়? কবিতায় যে মাদকতা পাই তা কি আছে ওর মধ্যে?

তবু, শুনতে প্রিয়ই হোক আর অপ্রিয়ই হোক, এটা সত্যি যে আজকাল কবিতা পড়ার নেশা কমে গেছে। এই জন্যই বোধ হয় অল্প কিছু দিন আগে, একদল তরুণ কবি কলকাতার পথেঘাটে "আরও কবিতা পড়" আন্দোলন সুরু করেছিলেন। রাস্তার মোড়ে, চৌমাথায়, পার্কে, এমন কি এস্প্লানেডে ট্রামের গুমটির পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে স্বরচিত কবিতা পড়তে সুরু করে দিতেন। লোক জমে যেত চার পাশে। জানি না এর ফল কেমন হয়েছিল,—কর্ম্মব্যস্ত সহরবাসীদের মধ্যে কবিতা পড়ার নেশা কতটা জাগানো গিয়েছিল এই পদ্ধতিতে। বোধ হয় আশানুরূপ সাফল্যলাভ ঘটে নি। কেন না তার পরে আর ও-ভাবে কাব্যপ্রচার চোখে পড়ে নি।

কিন্তু পদ্ধতিটাকে অভিনব বলতে পারি না – কারণ এই বাংলা দেশেই, এক সময়ে, এই উপায়ে কবিতা পড়ার রেওয়াজ ছিল,—বেশী দিন নয় – এই শ' খানেক বছর আগেই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তখন বাংলা দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি। এখন যেমন আমরা কবিতা বলতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাই আদর্শ বলে মনে করি, এবং সম্ভব মত অনেকেই তাঁর অনুকরণ করার চেষ্টা করি, তখন তেমনি লোকে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাকেই আদর্শ মনে করত এবং তাঁরই অনুকরণ করত সর্ব্বদা। ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ-প্রভাকর নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। সংবাদ ছাড়াও এতে গদ্য-পদ্য নানা জিনিব থাকত এবং এর প্রধান আকর্ষণ ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা। পত্রিকা বেরোনো মাত্র বিক্রেতার দল তা নিয়ে গিয়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে ঐ সব কবিতা চেঁচিয়ে পড়তে সুরু করে দিত। সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে কাব্যরসপিপাসু এসে জড় হ'ত চার পাশে, আর মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত কাগজ বিক্রী হয়ে যেত। সে সময়কার একজন লেখক এর ভারী সুন্দর বর্ণনা দিয়ে গেছেন। তিনি লিখেছেন—"ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা পড়িবার জন্য বাঙ্গালা দেশ পাগল হইয়া উঠিল।" এ থেকেই বোঝা যায় কবিতা পড়ার মধ্যে যে কত আনন্দ থাকতে পারে সে আমলের বাঙ্গালী তা বুঝত।

সাহিত্যিকদের আঁকা ছবি

ছোটদের জন্য যাঁরা লেখেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছবি আঁকতেও সুপটু,—নিজেদের অনেক লেখা তাঁরা নিজেরাই চিত্রিত করেছেন। ৺দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, ৺সুকুমার রায়—এঁরা সকলেই সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতেন। এঁদের আঁকা বহু ছবি তোমরা দেখেছ। এখানে আরও কয়েক জন শিশুসাহিত্যিকের আঁকা কয়েকখানি ছবি তুলে দিলাম। বলতে পার কোন্‌টা কার আঁকা? না পারলে শেষ পৃষ্ঠা দেখ।

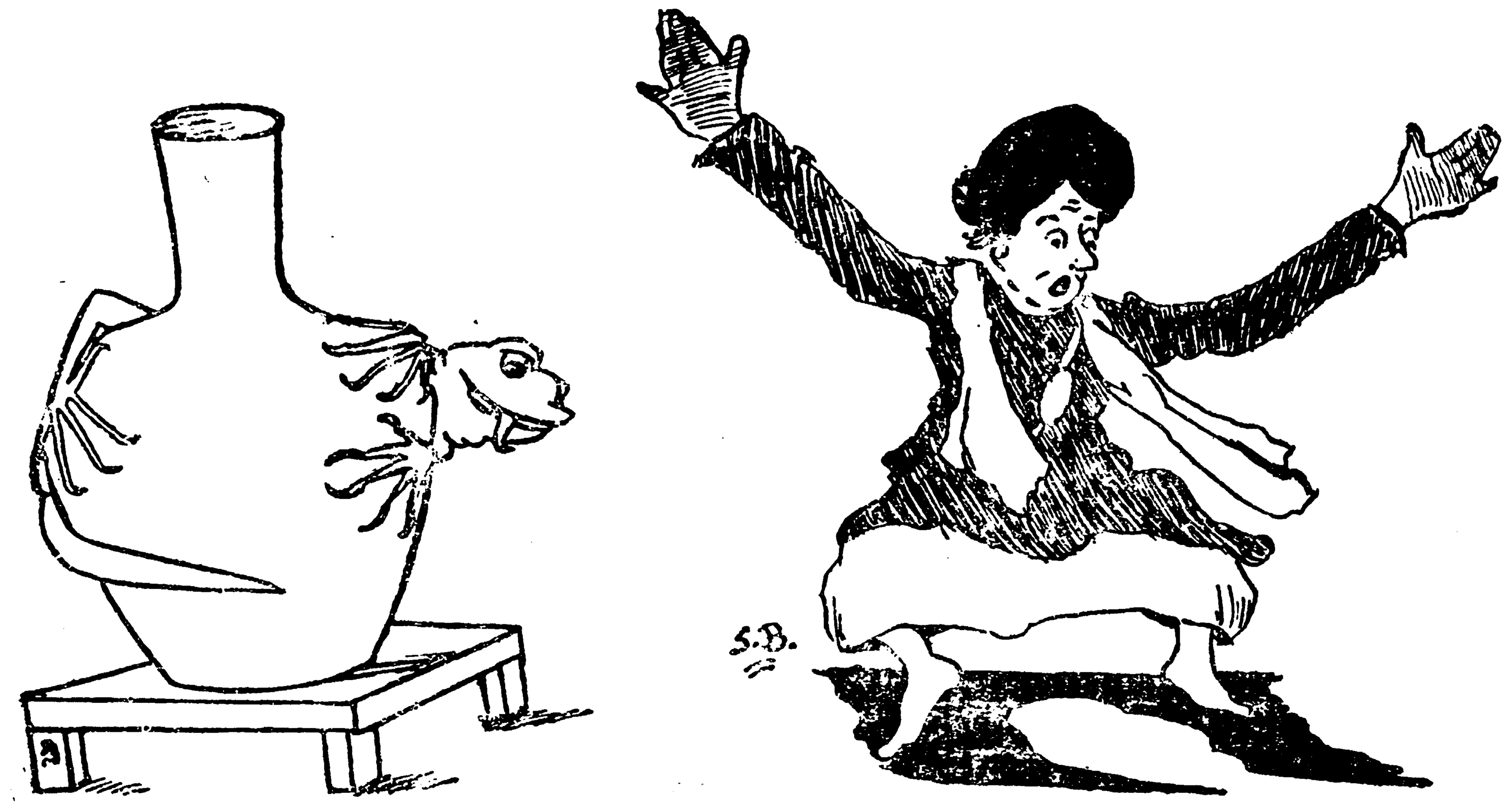

তৃতীয় এশিয়ান্ গেম্

শ্রীঅমিতাভ ভট্টাচার্য

মহা সমারোহে এশিয়ান্ গেম্ শেষ হ'ল জাপানের রাজধানী টোকিও সহরে। বিশ্ব অলিম্পিকের অনুকরণে সারা এশিয়ার দেশগুলি থেকে বাছাই-করা খেলোয়াড়দের নিয়ে যে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা তারই নাম এশিয়ান গেম্। এই প্রথম নয়—এ হ'ল তৃতীয় বার। প্রথম বার, ১৯৫১ সালে, হয়েছিল দিল্লীতে; ২য় বার, ১৯৫৪ সালে,

হয়েছিল ম্যানিলায়; এবার টোকিওয়। প্রথম এশিয়ান্ গেমে যোগ দিয়েছিল এশিয়ার ১১টি রাষ্ট্র, ২য় বারে যোগ দিয়েছিল ১৬টি রাষ্ট্র, এবারে ২০টি। এদের মধ্যে ছিল আফগানিস্থান, ব্রহ্মদেশ, কম্বোডিয়া, সিংহল, ফরমোসার চীন (আসল চীন বা পীপ্‌ল্‌স্ চায়না নয়), হংকং, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, ইসরাইল, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়, নেপাল, উত্তর বোর্ণিও, পাকিস্তান, ফিলিপাইনস্, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড ও ভিয়েৎনাম।

এই ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার জন্য বিপুল আয়োজন করেছিল জাপান। নতুন একটা ষ্টেডিয়াম্ তৈরী করেছিল— যার জন্য খরচ পড়েছিল, আমাদের হিসেবে, প্রায় পৌণে তু' কোটি টাকা। সত্তর হাজার লোক আরামে বসে যাতে খেলা দেখতে পারে তার ব্যবস্থা ছিল এখানে। ৭০ লক্ষ টাকা দিয়ে সাঁতারের পুকুর—সুইমিং পুল তৈরা করেছিল। শুধু তাই নয়, প্রতিযোগীদের জন্য নানান্ রকম সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতেও কার্পণ্য করে নি তারা।

২৪শে মে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়, তার পর ১লা জুন পর্যন্ত ৯ দিন ধরে চলে। প্রতিযোগিতার বিষয় এবারে কয়েকটা বাড়ানো হয়েছিল। খেলাধূলার মধ্যে ছিল ১৫টি বিষয়। ভারত অবশ্য এর অনেকগুলিতে যোগ দেয় নি, দিয়েছিল মাত্র ৫টি বিষয়ে—ফুটবল, ভলিবল, হকি, অ্যাথ্‌লেটিক স্পোর্ট্‌স্ আর বক্সিংএ।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু জাপানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কোন দেশই দাঁড়াতে পারে নি। কোন প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করলে স্বর্ণপদক, ২য় স্থান অধিকার করলে রৌপ্যপদক এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করলে দেওয়া হয় ব্রোঞ্জপদক। জাপান এই পদক এত বেশী পেয়েছে যে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। যুদ্ধজর্জরিত এই ছোট্ট দ্বীপটি যে এখনও অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত খেলাধূলাতেও এশিয়ার শীর্ষস্থানীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কোন্ দেশ কোন্ পদক ক'টা পেয়েছে তার একটা তালিকা নীচে দিচ্ছি:

দেশের নাম	স্বর্ণপদক	রৌপ্যপদক	ব্রোঞ্জপদক
জাপান	৬৭	৪১	৩০
ফিলিপাইনস্	৮	১৯	২১
দক্ষিণ কোরিয়া	৮	৭	১২
ইরাণ	৭	১৪	১১
ফর্মোসার চীন	৬	১১	১৭
পাকিস্তান	৬	১১	৯

ভারত	৫	৪	৩
ভিয়েৎনাম	২	•	৪
ব্রহ্মদেশ	১	২	১
সিঙ্গাপুর	১	১	১ ইত্যাদি

গত ১৯২৮ সাল থেকে ভারত হকিতে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু এবারে তার সেই আসন ছিনিয়ে নিয়েছে পাকিস্তান। অবশ্য পাকিস্তান খেলায় ভারতকে হারাতে পারে নি, কিন্তু সবগুলি খেলা মিলে, গোল বেশী দেওয়ায় ও কম খাওয়ায়, নিয়মানুসারে তাকেই প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান ৪টে ম্যাচে দিয়েছে ১৯ গোল কিন্তু একটাও গোল খায় নি। পয়েণ্ট পেয়েছে ৭। ভারত ৪টে খেলায় দিয়েছে ১৬ গোল, খেয়েছে ১ গোল। পয়েণ্ট তারও ৭।

প্রথম এশিয়ান গেমে ভারত ফুটবলে স্বর্ণপদক পেয়েছিল। এবারে হয়েছে ৪র্থ। অথচ মেলবোর্ণের বিশ্ব অলিম্পিকেও সে ৪র্থ স্থান অধিকার করেছিল যেখানে প্রতিযোগিতা হয়েছিল শুধু এশিয়া নয়,—সারা পৃথিবীর মধ্যে। ফুটবলে এবারেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ২য় এশিয়ান্ গেম বিজেতা ফর্মোসার চীন।

ভলিবলে ভারত এর আগে এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন্ ছিল। এবারে সেখান থেকেও তাকে নেমে আসতে হয়েছে তৃতীয় স্থানে।

২০০ মিটার আর ৪০০ মিটার দৌড়ে ভারতের মিলখা সিং রেকর্ড করে প্রথম হয়েছেন। লোহার বল ছোঁড়ায় রেকর্ড করে প্রথম হয়েছেন ভারতের অ্যাথ্‌লেটিক্‌স্ ক্যাপটেন পরদুমন সিং। ডিস্‌কাস্ ছোঁড়ায়ও রেকর্ড করে প্রথম হয়েছেন ভারতের বলাকার সিং। হপ্‌ষ্টেপ্‌ জাম্পেও প্রথম হয়েছেন ভারতের মহীন্দর সিং। ইনিও, রেকর্ড ভেঙ্গেছেন। নাম শুনেই বুঝছ এই চার জন স্বর্ণপদক-পাওয়া খেলোয়াড়ই পাঞ্জাবের লোক। বক্সিংএ মিডল্ ওয়েটে হরি সিং রৌপ্য পদক ও লাইট ওয়েটে সুন্দর রাও ব্রোঞ্জপদক পেয়েছেন।

ভারতের মহিলা-প্রতিযোগীরা কেউ স্বর্ণপদক না পেলেও ২০০ মিটার দৌড়ে ষ্টিফি ডিসুজা এবং বর্শা ছোঁড়ায় এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট রৌপ্যপদক পেয়েছেন। ৪০০ মিটার রিলে রেসেও ভারতীয় মহিলারা ব্রোঞ্জপদক পেয়েছেন।

বাস্, ভারতের কৃতিত্ব প্রায় এখানেই শেষ। পাকিস্তান কিন্তু ভারতের তুলনায় অনেক ভাল ফল করেছে। হকির সম্মান ছাড়া অ্যাথ্‌লেটিক্‌স্‌এও তাদের আব্দুল খালিক ১০০ মিটারে, মুবারক শাহ ৩০০০ মিটার ষ্টিপল্ চেজে, গোলাম রাজিক ১১০ মিটার হার্ডল রেসে, মহম্মদ নওয়াজ বর্শা নিক্ষেপে. মহম্মদ ইকবাল হাতুড়ী ছোঁড়ায়

স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। অন্যান্য দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে হাই জাম্পে সিংহলের এথির বীরসিংহম্ (৬´৭¾″), লং জাম্পে দক্ষিণ কোরিয়ার সু ইয়ং জু (২৪´১০″), পোল ভল্টে জাপানের নোরিয়াকি যাসুদা (১৩´৯¼″), ১০,০০০ মিটার দৌড়ে জাপানের টাকাশি বাবা এবং ম্যারাথন্ দৌড়ে (২৬ মাইল ৩৮৫ গজ) দক্ষিণ কোরিয়ার লী চ্যাং হুনের নাম করা যেতে পারে।

সাঁতারে জাপানের জয় জয়কার। পুরুষ ও মেয়েদের ২৬টি প্রতিযোগিতায় তারা ২৫টিতেই স্বর্ণপদক লাভ করেছে। রিলে রেস—যেটিতে তারা স্বর্ণপদক পায় নি—সেটিতেও তারাই আসলে প্রথম হয়েছিল, কিন্তু আইনের খুঁটিনাটিতে তাদের দলকে বাতিল করে দেওয়া হয় বলেই ফিলিপাইন্‌স্‌এর বরাতে ওই পদকটা জুটে যায়।

এবারকার এশিয়ান প্রতিযোগিতায় আর দু'টি কথা বলবার আছে। প্রথম হচ্ছে—রেকর্ড ভাঙ্গা। সমস্ত খেলা মিলিয়ে এবার ৭০টি বিষয়ে পুরোনো রেকর্ড ভেঙ্গে নতুন রেকর্ড হয়েছে। অ্যাথ্‌লেটিক্‌স্‌এ ২৬, ওয়েট্ লিফ্‌টিংএ ২২, সাইক্লিংএ ৪, বন্দুক ছোঁড়ায় ১ আর সাঁতারে ১৭টি রেকর্ড ভাঙ্গা—সহজ কথা নয়।

২য় হচ্ছে—বিচারকদের ত্রুটী-বিচ্যুতি। অত্যন্ত কড়া সমালোচনা হয়েছে এই নিয়ে। বিচারকদের যে শুধু ভুলভ্রান্তির কথাই শোনা গেছে তা নয়, পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও এসেছে এবং তা এনেছেন নিরপেক্ষ খ্যাতিমান্ ক্রীড়াবিদ্‌রা। ফুটবল, ভলিবল, হকি—তিনটেতেই এই অভিযোগ উঠেছে। অনেকের মতে বিচারকেরা যদি ন্যায় বিচার করতেন তা হলে হয়তো ভারত বনাম ইন্দোনেশিয়া ফুটবল খেলা, ভারত বনাম ইরাণের ভলিবল্ খেলা আর ভারত বনাম দক্ষিণ কোরিয়া হকি খেলাটির ফল অন্য রকম হ'ত—যার ফলে পদক-প্রাপ্তি ব্যাপারটাও হয়তো উল্টেপাল্টে যেত। কিন্তু যা হয় নি তা হয় নি। ও নিয়ে মন খারাপ না করে ভারতকে খেলাধূলার দিকে সত্যিকার দৃষ্টি দিতে হবে - নিজেদের দোষ-ত্রুটী সংশোধন করতে হবে। তবেই না—'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে!"

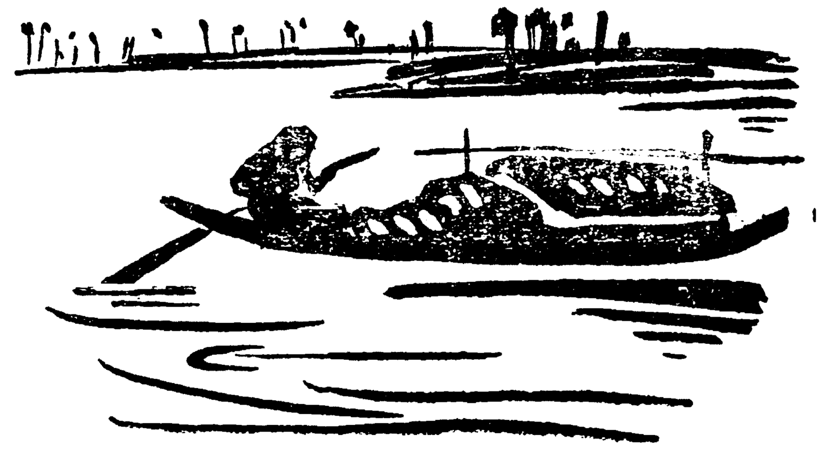

ওদের বাঁচাও

শ্রীঅমরনাথ রায়

কোন মানুষ অথবা কোন জীবজন্তুকে বাঁচাবার কথা বলছি না। বলছি কতকগুলো পুরোনো কাগজপত্রকে বাঁচানোর কথা। যেমন ধর—তোমার কাছে হয়তো আছে কবিগুরুর হাতের লেখা, কবি কৃত্তিবাসের নিজে হাতে লেখা রামায়ণের কয়েকটি পাতা, অথবা শহীদ ক্ষুদিরামের কোন একখানি বই—যা তিনি ছেলেবেলায় পড়তেন। এই কাগজগুলো অতীতের সাক্ষী দেয়—ইতিহাসের সাক্ষী দেয়—এরা তোমার আমার কাছে আজ বিস্ময়ের ও আদরের বস্তু এবং যুগ যুগ ধরে তাই হ'য়েই থাকবে। তাই তো বলছি ওদের বাঁচাতে হবে। শত্রুদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

ওদের আবার শত্রু কে? শত্রু আছে। একটা নয়, অনেকগুলো। তবে কীটপতঙ্গ আর ভিজে বাতাসই ওদের প্রধান শত্রু। উই আর ইঁদুরের কথা না হয় বাদই দিলাম।

বছর কয়েক আগেকার কথা। দিল্লীতে গিয়েছিলাম বেড়াতে। অনেক জিনিষ দেখলাম সেখানে। কুতুব-মিনার, বিখ্যাত লাল কেল্লা, জুম্মা মসজিদ এবং আরও কত কি। কিন্তু আমাকে যদি তোমরা জিজ্ঞেস কর—কোন্ জিনিসটা আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে তবে আমি বলব—"ন্যাশন্যাল আরকেইভস্ অফ্ ইণ্ডিয়া" অর্থাৎ "ভারতের জাতীয় দলিলপত্র সংরক্ষণাগার"। নামটা হয়তো তোমরা অনেকে শোনই নি, তার ওপর নামটা খটমটও বটে—তাই না?

এইখানেই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ পুরোনো দিনের দলিল ও নথিপত্রগুলোকে যত্ন ক'রে রক্ষা করা হয়—বাঁচানো হয় শত্রুদের হাত থেকে। যাদুঘরের মত এখানেও যত্ন ক'রে রাখা হয় এগুলোকে। কারণ এরা হলো জাতীয় সম্পত্তি।

কি ভাবে ওই দামী কাগজপত্রগুলোকে সেখানে সংরক্ষিত করা হয়—সেই গল্পই বলছি এখন।

ধর, কোন দলিল অথবা পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে গেছে। সেটাকে ওঁরা অর্থাৎ ওখানকার কর্মচারীরা স্বচ্ছ ও পাতলা কাগজের সাহায্যে আঠা দিয়ে যোড়া লাগিয়ে দেন—যেমন তোমরা অয়েল পেপার দিয়ে বইয়ের ছেঁড়া পাতা যোড়া লাগাও। এ কাগজ দিয়ে যোড়া লাগালে ছেঁড়া তো যোড়েই, উপরন্তু লেখাগুলো বেশ স্পষ্ট পড়া যায়।

ছেঁড়া তো যোড়া হলো, কিন্তু তারপর? তারপর যোড়া লাগানো ঐ কাগজকে একটা পাটাতনের ওপর রেখে খুব বেশী চাপের বাতাস লাগানো হয় ওর গায়ে। এতে কাগজের গায়ের ধূলো-বালি তো দূর হয়ই, উপরন্তু কোন জ্যান্ত অথবা মরা কীটপতঙ্গ থাকলে তাও ঝরে পড়ে যায়।

এর সত্ত্বেও তো দু'-একটা কীট বা তাদের ডিম ঐ কাগজের সঙ্গে থেকে যেতে পারে! থাকলে—তারা তো কাগজটাকে নষ্ট ক'রে ফেলবে। কাজেই অন্য ভাবে ওদের নষ্ট করা দরকার। ওদের ধ্বংস করার জন্যে কি করা হয় শোন:

ধাতুর তৈরী মস্ত বড় একটা বাক্স আছে সেখানে। বাক্সটাকে ছোটখাট একটা ঘরই বলা চলে। বাক্সটাকে বন্ধ ক'রে দিলে বাইরের বাতাস আপনা আপনি ওর মধ্যে ঢুকতে পারে না। তবে বাতাস কেন, ইচ্ছেমত যে কোন গ্যাসই ওর মধ্যে ঢোকানো যায়। আবার দরকার হ'লে বাক্সের মধ্যেকার সব বাতাস যন্ত্রের সাহায্যে টেনে বের ক'রে নিয়ে বাক্সের ভেতরে শূন্যতারও সৃষ্টি করা যায়।

ধূলো ঝাড়ার পর কাগজকে এই বাক্সের মধ্যে রেখে, পাম্পের সাহায্যে বাক্সের সব বাতাস বাইরে টেনে বের ক'রে দেওয়া হয়। তাতে বাক্সের ভেতরে সৃষ্টি হয় শূন্যতার। আর ঐ শূন্যতা সৃষ্টি হওয়ার দরুণ কীট-পতঙ্গের ডিম (যদি থাকে) আপনা আপনিই ফেটে গিয়ে নষ্ট হয়। ডিম তো নষ্ট করা হলো, তবুও যদি কোন জ্যান্ত কীটপতঙ্গ থেকে যায়? সাবধানের তো মার নেই, তাই তখনই ঐ শূন্য বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় একটা বিষাক্ত গ্যাস। তার নাম 'কার্বন মোনো-অক্সাইড'। ঐ বিষাক্ত গ্যাসে কোন কীটপতঙ্গই বাঁচতে পারে না।

কীট-পতঙ্গের হাত থেকে তো বাঁচানো গেল কাগজটিকে; কিন্তু ভিজে স্যাঁতসেঁতে বাতাস? তার হাত থেকেও তো বাঁচাতে হবে। তাই ওই কাগজের ওপর এবং নীচের পিঠে ওই কাগজেরই সমান মাপের দু'টি স্বচ্ছ ও পাতলা কাগজ লাগানো হয়। তোমরা যে অয়েল পেপার ব্যবহার কর - এ কাগজ অনেকটা সেই জিনিস।

ওপরে ও নীচে এই কাগজ লাগিয়ে আসল কাগজটিকে রাখা হয় একটা 'জলচালিত চাপযন্ত্র' বা 'হাইড্রলিক প্রেস'এর পাটাতনের ওপর। যন্ত্রটিকে চালালেই প্রচণ্ড চাপ পড়ে পাটাতনের ওপরে রাখা ঐ কাগজের ওপর। আর ঐ চাপেই পাতলা ও স্বচ্ছ কাগজ দু'টি দলিলের কাগজের দু' পিঠে সুন্দর ভাবে সেঁটে যায়। এ ব্যবস্থায় কাগজের লেখা বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। তা ছাড়া ধূলোবালি এবং ভিজে স্যাঁতসেঁতে বাতাসের হাত থেকেও আসল কাগজটি বাঁচে। এত ক'রেও কিন্তু ওখানকার কর্মচারীরা সন্তুষ্ট ন'ন। যদি অন্য কোন ভাবে কাগজটি নষ্ট হয়, তাই কাগজের দু' পিঠেরই

খুব ক্ষুদে ক্ষুদে ফটো—মাইক্রোফটোগ্রাফ তুলে রেখে দেন ওঁরা। হঠাৎ দুর্ঘটনায় আসল কাগজটি নষ্ট হ'য়ে গেলেও তার নকল ফটোটি তো থাকবে! তাই বুঝে দেখ—কত দামী আর গুরুত্বপূর্ণ ঐ কাগজগুলো! ওদের বাঁচাবার জন্তে কত পরিশ্রম আর কত অর্থব্যয় যে ওঁরা করছেন তার ঠিক নেই।

যদি কখনও দিল্লী যাও এঁদের এ জায়গাটি দেখে আসতে ভুলো না যেন। আমার মত তোমাদেরও নিশ্চয়ই ভাল লাগবে এ জায়গাটি—এ আশ্বাস দিতে পারি।

মেঘনাদ

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ন ভট্টাচার্য্য

২

আপিসে পৌছতে আজও একটু দেরী হয়ে গেল ইন্দ্রনীলের। বড়বাবু অবশ্য লোক ভাল, তবু রোজই তাঁর কাছে একই রকম জবাবদিহি করতে সংকোচ লাগে। কিন্তু আজ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মনে হ'ল দরোয়ান থেকে সুরু করে বেয়ারাগুলো পর্যন্ত তার দিকে অবাক্ বিস্ময়ে চেয়ে আছে। কোনও দিকে না তাকিয়ে, মাথা নীচু করেই ইন্দ্রনীল তাড়াতাড়ি গিয়ে তার টেবিলে বসে পড়ল।

গত কালের অর্দ্ধসমাপ্ত একটা রিপোর্ট টেবিলের ওপরেই পড়ে আছে। বেলা একটার আগেই ওটা শেষ করতে হবে। বড় সাহেবকে দিয়ে সই করিয়ে আজকের ডাকেই ওটা পাঠানো দরকার। তাই ইন্দ্রনীল বাক্যব্যয় না করে রিপোর্ট্‌টার ওপর ঝুঁকে পড়ল এবং মিনিট পনেরো নিঃশব্দে তন্ময় হয়ে লিখে চল্‌ল খচ্‌ খচ্‌ করে। কিন্তু কতক্ষণ মুখ না তুলে লেখা চলে? দিনটা মেঘ্‌লা—ঘুম ঘুম ভাবটা তাই কিছুতেই যাচ্ছে না চোখ থেকে, হাই উঠছে বারে বারে। কলম রেখে ইন্দ্রনীল একবার পিঠটা টান করে নিল চেয়ারের পেছনে।

আর সঙ্গে সঙ্গেই চোখোচোখি হয়ে গেল দাত্বর সঙ্গে।

দাত্ব, অর্থাৎ বটব্যাল মশাই, আপিসের প্রবীণ কর্মচারী,—বহুদিনের লোক। নামটা উচ্চারণ করতে কষ্ট হয় বলে সবাই তাঁকে বয়স বিবেচনা ক'রে দাত্ব বলেই ডাকে। তিনিও ঐ সম্পর্কের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। সকলের সঙ্গেই তাঁর খাতির। আপিসের সমস্ত সুখ-দুঃখের সঙ্গে আপনাকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে রেখেছেন তিনি।

চোখোচোখি হতেই বটব্যাল মশাই একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ইন্দ্রনীলের দিকে তাকালেন। পরক্ষণেই শান্ত কণ্ঠে বললেন, "ইন্দর্, তোমার হাতের কাজ শেষ হ'লে একবার এদিকে এস।"

"হ্যাঁ, যাচ্ছি দাত্ব!" বলে ইন্দ্রনীল রিপোর্ট্‌টার ওপর কাগজ চাপা দিয়ে তখনই উঠে দাঁড়াল।

এতক্ষণে ঘরের চার দিকে ভাল করে নজর দেবার ফুরসৎ পেল ইন্দ্রনীল। আশ্চর্য, প্রতিটি লোক থেকে থেকে তারই দিকে তাকাচ্ছে কেন? চোখে চোখ পড়তেই আবার নিজের নিজের কাজে অস্বাভাবিক রকম মনোযোগী হয়ে পড়ছে সবাই! এটা যে তাকে এড়াবার কৌশল এ বুঝতে কোন কষ্ট হয় না।

ইন্দ্রনীল উঠে এসে বটব্যাল মশাইএর সামনে দাঁড়াল।

আর একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন বটব্যাল মশাই। ইন্দ্রনীলের আর সহ্য হচ্ছিল না—অধৈর্যের মত বলল, "কি ব্যাপার বলুন তো দাত্ব? কি যেন একটা হয়েছে! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

দাত্বর মুখে যে মিষ্টি হাসিটা সর্বদাই লেগে থাকে আজ যেন তার অভাব বোধ হচ্ছে। তেমনি আবেগহীন কণ্ঠে তিনি বললেন, "কেন, তুমি কি আজকের কাগজ পড় নি?"

"না তো।"

"বল কি? আজকের বিশ্ববার্তা, দৈনিক সমাচার, ডেলি অবজারভার, নয়া খবর—কোনটাই না?"

"না, ঘুম ভাঙ্গতে বড় দেরী হয়ে গিয়েছিল। এখানে বসে পড়ব ভেবে সঙ্গে এনেছিলাম, বাসে ফেলে এসেছি।"

বটব্যাল মশাই বিশ্বাস করলেন কিনা কে জানে। মুখে বললেন, "ও!" পাশের ভদ্রলোককে ডেকে বললেন, "এই, আজকের কাগজটা কোথায় গেল, এদিকে দাও তো।"

।তনি একটু এধার ওধার খুঁজে বললেন,—"কই! ও, সান্যাল নিয়েছে। এই সান্যাল, কি করলে কাগজখানা?"

সান্যাল টেবিলের দিকে চেয়ে বললে, "বাঃ, আমি তো দেখেই দিয়ে দিলাম। ও ঘরে নিয়ে গেছে বোধ হয়। দেখছি।"

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কাগজ পাওয়া গেল না। ঠিক এমনি সময়ে এক টুকরো কাগজ নিয়ে এসে বড় সাহেবের চাপরাশী ইন্দ্রনীলের হাতে দিল। বড় সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন তাকে।

"আচ্ছা, তুমি ঘুরে এস। আমি দেখি, নীচের ঘরে পাওয়া যায় কিনা কাগজ-খানা।"—দাদু বললেন।

বড় সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন! এ ব্যাপারটাও নতুন। ইন্দ্রনীলের সঙ্গে সোজাসুজি কথাবার্তা তিনি এ পর্যন্ত খুব কমই বলেছেন। কথা যা হয় তা বড়বাবুর মারফৎই হয়—এই-ই রেওয়াজ আপিসের। কাজেই হঠাৎ বেছে বেছে তাকেই ডেকে পাঠাবার কারণ কি? বেশ চিন্তিত মুখেই ইন্দ্রনীল বড় সাহেবের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

ভিতরে যেন কারা রয়েছে। বড় সাহেবের গলা শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। একবার শুনল—"না, না, সে রকম তো কোন কিছু রিপোর্ট পাই নি। এই দু' বছরের ওপর দেখছি—সবাই তো পছন্দই করে। কোন দিন কোনও..." আগন্তুকদের কারো একজনের কণ্ঠস্বরে বাকিটা শোনা গেল না।

ইন্দ্রনীল চাপরাশিকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল ভিতরে, পরক্ষণেই ডাক পড়ল তার।

ঢোস্‌কা চেয়ারের ওপর বড় সাহেব তাঁর সুবিপুল দেহ নিয়ে বসে আছেন। ইন্দ্রনীল গিয়ে নমস্কার করতেই একবার ভ্রূকুটি করে তাকালেন তার দিকে —যেন তার ভেতরটা পর্যন্ত যাচাই করে নিতে চান। তার পর বললেন, 'ও,—তুমি—মানে আপনি এসেছেন! এই এঁরা এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে। কি বলতে চান এঁরা শুনুন। বসুন চেয়ারে।"

ইন্দ্রনীল চেয়ারে বসে আগন্তুকদের দিকে নজর দেবার সুযোগ পেল। তিন জন লোক। পোষাক দেখলেই বোঝা যায় সকলেই পুলিশের লোক এবং বেশ পদস্থ কর্মচারী। কোমরে চামড়ার থলিতে আঁটা রিভলভার এঁদের পদের সেই গুরুত্ব ঘোষণা করছে।

"আপনিই মিষ্টার র্‌-র্‌-রয়?" ওঁদের মধ্যে যিনি বয়স্ক এবং, মুখ দেখেই বোঝা যায় বহুদিনের অভিজ্ঞ,—তিনি বললেন। "কি নাম যেন?—ইন্‌দ্রো-ও নীল্‌। তা কি ভাষা ওটা?—ফ্রেঞ্চ, না পোলিশ্‌, না কামস্কট্‌কিয়ান্‌? আপনি তো বুঝি আবার একজন ওয়ার্ল্‌ড্‌ সিটিজেন—বিশ্বনাগরিক?" পাশের সহকর্মীর দিকে ফিরে বললেন, "ঠিক হ'ল তো কথাটা? পুলিশের লোক, আমাদের আবার বাংলা-টাংলা ঠিক

আসে না। তা যাক্‌,, ও বিদ্‌ঘুটে ফরাসী বা কামস্কট্‌কিয়ান্‌ নাম নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, সাদাসিধে মিষ্টার র্‌-র্‌-রয়ই ভাল। তা মিষ্টার র্‌-র্‌-রয়, আপনাকে তো একবার আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হচ্ছে।"

ইন্দ্রনীলের কানে কথাটা ঠিক ঢুকল বলে মনে হ'ল না। সে অভিভূতের মত তাকিয়ে রইল ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে।

বড় সাহেব বললেন, "যাও—মানে যান ওঁদের সঙ্গে। ওঁরা গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট নিয়ে এসেছেন, না গেলে হয়তো যেতে বাধ্য করবেন। হ্যাঁ, এস—মানে আসুন তা হলে।"

"স্‌সসরি টু ডিস্‌টার্ব্‌ ইউ—আপনার মূল্যবান্‌ সময় খানিকটা নষ্ট করে গেলাম, কিছু মনে করবেন না।"—বলে অভিজ্ঞ এবং পদস্থ পুলিশ কর্মচারী উঠে দাঁড়িয়ে ঈষৎ ঝুঁকে পুলিশী কায়দায় নমস্কার জানালেন বড় সাহেবকে। তার পর ইন্দ্রনীলের দিকে তাকিয়ে, কণ্ঠস্বরে একটু গদগদ ভাব এনে বললেন, "চলুন মিষ্টার র্‌-র্‌-রয়, আমাদের কাজটাও শেষ করে আসি।" (ক্রমশঃ)

যে গল্প জানা নেই

—কুড়ি—

শ্রীসবিতা মুখোপাধ্যায়

এর পরেই ঘটল এক মজার কাণ্ড।

পূজোর ছুটী এসে পড়েছে। প্রতি বছরই সুমিতরা এই সময়ে কোথাও না কোথাও বেড়াতে যায়। এবারেও কোথায় যাওয়া হবে তাই নিয়ে শলা-পরামর্শ চলছে। সুমিতের বাবা-মা'ও যোগ দিয়েছেন তাতে। হঠাৎ সুমিতের বাবা গোপালকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি কোথায় যেতে চাও গোপাল?

দেশ ভ্রমণের প্রবল নেশা থাকলেও পূজোর ক'টা দিন বাড়ী যেতে না পারলে গোপালের মন উঠবে না। তাই সে আমতা আমতা করতে লাগল। হঠাৎ দীপা তার মুখের কথা কেড়ে

নিয়ে বল্‌ল,—আমি জানি গোপাল কোথায় যেতে চায়। আর আমিও সেখানে যেতে চাই ওর সঙ্গে। সুমিতটাও যেতে পারে ইচ্ছে করলে।

কোথায় ?—জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রশ্ন করেন বাবা।

আমি জানি।—এবার চেঁচাবার পালা সুমিতের।—তুই নিশ্চয়ই তোর সইএর বাড়ী যেতে চাস্ ?

ইতিমধ্যে উমার সঙ্গে দীপার সই পাতানো হয়ে গেছে পাকাপাকি ভাবে। সুমিত এ খবর ভাল ভাবেই রাখে।

আর তোর বুঝি ইচ্ছে করে না পাড়া-গাঁ দেখতে ?—ধমক দিয়ে বলে দীপা। হ্যাঁ বাবা, আমরা এবার গোপালদের গ্রামেই যাব। পাড়া-গাঁ তো কোন দিন দেখালে না তুমি ! এবার সুযোগ জুটেছে, বাধা দিও না।

সুমিতের বাবা একটু চিন্তায় পড়লেন। গোপালদের সাংসারিক অবস্থার কথা তিনি জানতেন। ধনীর দুলালী দীপা আর ধনীর দুলাল সুমিত ওখানে গিয়ে কি অসুবিধায় পড়বে তা তিনি আঁচ করতে পারছিলেন। কিন্তু গোপালের সামনে বলেনই বা কি করে সে কথা ?

ছেলেমেয়েরা কিন্তু নাছোড়বান্দা। শেষে তাদের প্রবল পীড়াপীড়িতে রাজী হতে হ'ল তাঁকে। ঠিক হ'ল এক সপ্তাহের জন্য ওরা যাবে। সরকার মশাই পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবেন আর বুড়ো দরোয়ান ছমন সিং সঙ্গে থাকবে। এক সপ্তাহ গ্রামে কাটিয়ে ফিরে এসে তখন সবাই মিলে পশ্চিমের কোন একটা সহরে যাওয়া যাবে।

মনের আনন্দে বাক্স-পেঁটরা গোছাতে বসে গেল দীপা। সুমিতও তার ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট, নেট, ক্রিকেট ব্যাট্‌ ইত্যাদি জড় করতে লাগল স্যুট-কেসে।

ঠিক হ'ল আগে কোন খবর দেওয়া হবে না। হুশ্‌ করে একদিন হাজির হয়ে অবাক্ করে দেওয়া হবে উমাদের। পরিকল্পনাটা অবশ্য দীপার। (ক্রমশঃ)

খাউনে চিল

শ্রীনিবেদিতা দত্ত
(বয়স ৬ বছর)

মগডালেতে বসে কে রে ?
চোরের মতন দেখতে যে রে।
মিটির মিটির চাও।
লোকের পাঁপর খাও।

নামটি তোমার খাউনে চিল।
মারব নাকি একটি ঢিল ? *

* একটি চিল রামধনুর এক ছোট্ট পাঠিকার পাঁপর কেড়ে খেয়ে নেওয়ায় উত্তেজনার বশে (বাল্মীকির মত ?) তিনি এই কবিতাটি লিখেছেন।

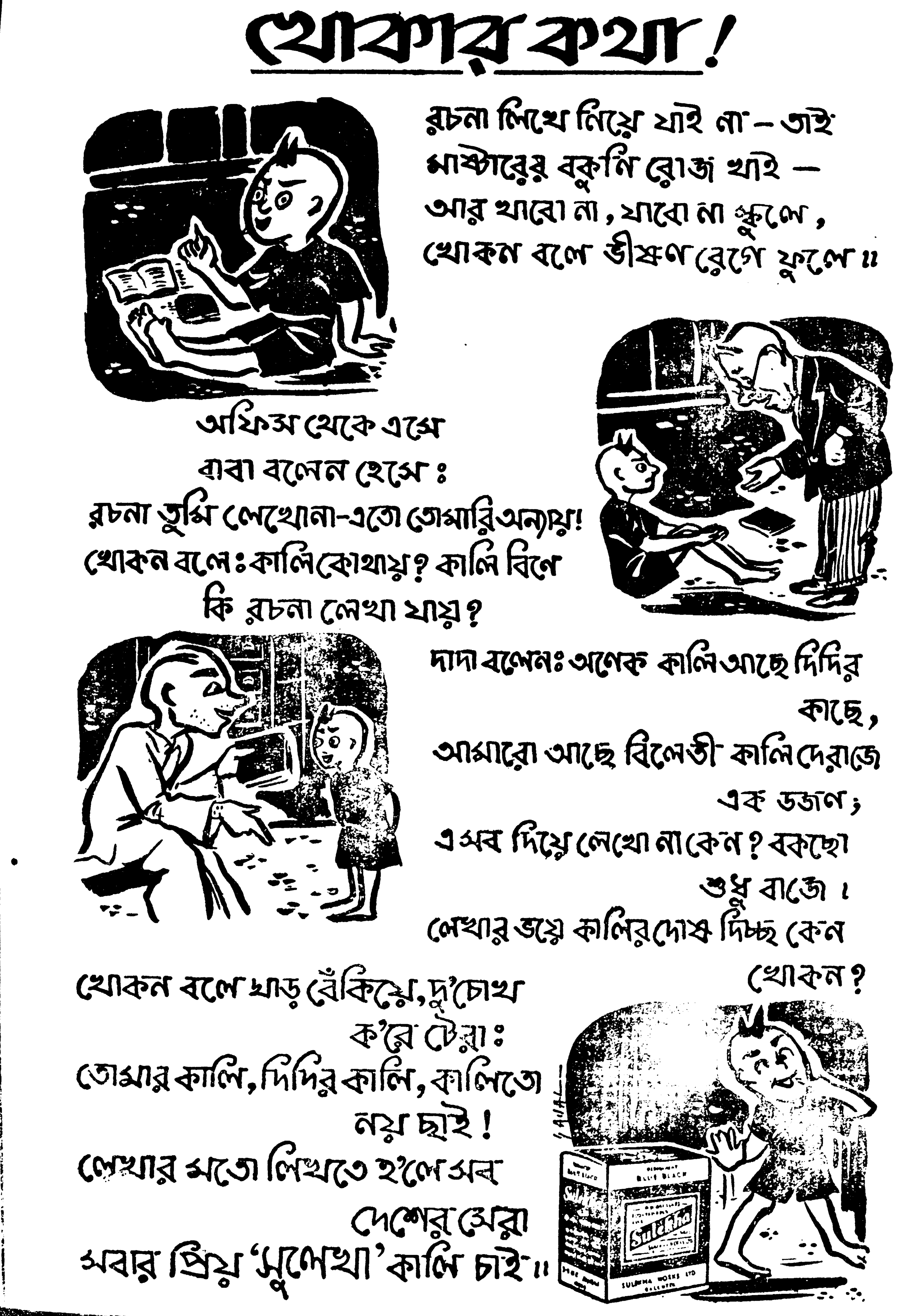

চিঠিপত্র

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

প্রায় দু' সপ্তাহ দেরী করে অবশেষে মৌসুমী বায়ু বাংলা দেশে প্রবেশ করেছে। বিজ্ঞানীদের মতে এই হচ্ছে আসল 'বর্ষাকাল'। কিন্তু পুরো বর্ষা এখনও দেখা দেয় নি। ঝম্ ঝম্ করে সারা রাত বৃষ্টি হবে, গুরু গুরু ক'রে সমানে মেঘ ডাকবে, থেকে থেকে বিজলী হানা দেবে—তবেই না পুরো বর্ষা! অবশ্য তিন-চার দিন ধরে দিনরাত টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি, রাস্তায় কাদা, জামা-কাপড়-জুতো ভিজে ঢোল, ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ শর্দীকাসি—এ রকম বর্ষা নিশ্চয়ই আমরা চাই না। ও তো পুরো বর্ষা নয়—ও হ'ল পচা বর্ষা! যখন সুরু হবে কাঁদিয়ে ছাড়বে। যাই হোক, খবরের কাগজের ভাষায় "গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ" থেকে যে আপাততঃ মুক্তি পাওয়া গেছে এই তো পরম লাভ!

শ্রীঝর্ণা দাস অধিকারী (কলিকাতা-২৪)—তুমি যে শেষ পর্যন্ত লজ্জা ত্যাগ করে চিঠি লিখতে পেরেছ এ জন্য তোমার সাহসকে ধন্যবাদ। সত্যি, বল তো, আমাকে কি বাঘ-ভালুকের মত কিছু একটা ঠাউরেছিলে যে এত সংকোচ? নাকি লজ্জা তোমাদের অন্যতম ভূষণ এই মহবাক্য মেনে নিতে গিয়েই ঐ রকমটা হয়েছিল? তোমার মনের "বাস্তব ও কল্পনা" ফোটাবার জন্যও অত ইতস্ততঃ করার কিছু নেই। স্রেফ লিখবে আর ডাকে ছাড়বে, তার পর অপেক্ষা করবে ওদের কি গতি হয় দেখবার জন্য। শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় (গড়বেতা)—তোমার একাধিক চিঠি এবং তার ভিতরকার অজস্র প্রশ্ন পেলাম। রামধনুর পাতায় অত জায়গা কোথায়? শ্রীসুনীতি চট্টোপাধ্যায় আপাততঃ বালীগঞ্জের অধিবাসী। বিজ্ঞানী দেবেন্দ্রমোহন বসু আচার্য জগদীশচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র, সুতরাং তাঁরও আদিনিবাস নিশ্চয়ই ফরিদপুর ছিল। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের আদিবাড়ী ছিল ময়মনসিংহ কিন্তু ধরতে গেলে রংপুরেই তিনি মানুষ। আপাততঃ বহুদিন যাবৎ বালীগঞ্জ নিবাসী। শিশুসাহিত্যিক-পরিচিতিতে একে একে সকল শিশুসাহিত্যিকের কথাই দেবার চেষ্টা করব আমরা। যাঁদের কথা অন্য ভাবে আগে বেরিয়েছে—বলা বাহুল্য তাঁদেরটা কিছু পরে বেরোবে। শ্রীসৃষ্টিধর মুখোপাধ্যায় (চাঁদবাটী)—আশা "কুহকিনী" হতে পারে, কিন্তু মানুষকে সত্যি করে বেঁচে থাকবার প্রেরণাও যোগায় এই আশা। বেশী চেঁচিয়ে কথা বললে আমাদের শক্তি অর্থাৎ 'এনার্জি' কিছুটা ক্ষয় হয় বৈ কি! লক্ষ্য করে দেখবে, যারা খুব চেঁচিয়ে কথা বলে এবং অনর্গল কথা বলে তাদের খাদ্যের পরিমাণও বেশী লাগে। শরীরের উত্তাপ ঠিক রাখার জন্য আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন। উত্তাপের অপব্যয় করলে বেশী খাদ্য দিয়ে তা পূরণ করতে হয়। আমাদের এক চিকিৎসক বন্ধু খুব আস্তে কথা বলেন। তিনি বলেন, এই ভাবে তিনি আগের চাইতে (যখন খুব চেঁচিয়ে কথা বলতেন) অনেক কম খেয়েও শরীরের শক্তি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। একাধিক লেখক একই উপন্যাসের বিভিন্ন অংশ লিখলে আমরা তাকে বলি "বারোয়ারী উপন্যাস"। এর মজা এই, গল্পাংশ সম্বন্ধে আগে কেউই কিছু জানেন না। একজন খানিকটা লিখে দিলে, পরের জন তাঁর ইচ্ছেমত পরের অংশ লেখেন। এই ভাবে চলতে থাকে। যাঁরা শেষ করেন তাঁদেরকেই ভাবতে হয় বেশী। রামধনুতেও তো "যে গল্প জানা নেই" নামে এই রকম একখানি বারোয়ারী উপন্যাস বেরুচ্ছে আর এতে তোমাদের মত গ্রাহক-গ্রাহিকারাই শুধু লিখছেন। তুমিও চেষ্টা ক'রে দেখ না! আবু কায়ছার (টাংগাইল)—তোমার চিঠিতে বহু প্রসঙ্গের অবতারণা করেছ। আলাদা ভাবে ওর উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

আজ এই পর্যন্ত। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। ইতি—রাঃ সঃ

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১—বাত, ২—তাত, ৩—দান, ৪—ধান, ৫—লট, ৬—বট, ৭—এরা, ৮—ঐরা, ৯—ডাল, ১০—ঢাল, ১১—গোলা, ১২—ঘোলা, ১৩—থান, ১৪—দান, ১৫—নালা, ১৬—পালা ১৭—রাম, ১৮—লাম, ১৯—দোয়া, ২০—ধোয়া।

উত্তরদাতাদের নাম : নির্ভুল :—রত্নাবলী ও গৌরী ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা-২৫); অঞ্জলি ও বীথি দাসগুপ্ত (কলিকাতা-১৯); পার্বতীনাথ সেনগুপ্ত (শালিখা); দিলীপ সমাজদার (কলিকাতা-১২); মণ্টু, দিলু, সণ্টু, ঝণ্টু, অশোক, জামাই বাবু, মা, কাকা (নিউ দিল্লী); অনুরাধা চ্যাটার্জী (বালিগঞ্জ); বসন্ত, উল্লাস, দেবনিলয় ও মলয়কেতু খাঁ (শিলং); জয়া, বিজয়া, ও ছন্দা রায় (আইজটনগর); ফণীন্দ্র, সন্তোষ, বলাই (হুগ্টিয়া); অমিতাভ ও অশোকনাথ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর); শেফালিকা, মীনাক্ষী, মঞ্জুশ্রী ও অলোকেন্দ্র দত্ত (কলিকাতা-২)।

আংশিক :- কৃষ্ণা সুর (কলিকাতা-৪); সুরেখা, সিপ্রা, মমতা, সুজাতা, ভট্টাচার্য্য (সাঁত্রাগাছী); অপরাজিতা ভট্টাচার্য্য (বালিগঞ্জ); প্রবুদ্ধ বসু (সিমলা); যমুনা ও শুক্লা গংগোপাধ্যায় (ধুবড়ী); সুদর্শন ও ওস্তাদ চৌধুরী (বর্দ্ধমান); দীপঙ্কর ঘোষ ও দুলাল বিশ্বাস (বিষ্ণুপুর); ঝর্ণা দাস অধিকারী (কলিকাতা-২৪); সুব্রত রায় (বেলাড়ি); সৃষ্টিধর ও শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় (চাঁদবাটী); চন্দ্রা দেবী (এলাহাবাদ); কণিকা গুপ্তা (বনারস); শ্যামল বসু (নাগপুর); খোকন, বোঁচা ও সুমি (পাটনা); কানন দাশগুপ্ত (কলিকাতা-১২); প্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু) (কলিকাতা-৬)।*

* কাকাবাবু ধাঁধার উত্তর নির্ভুল দিতে না পারলেও জ্যৈষ্ঠের ধাঁধা দেখে তার ওপর একটি সুন্দর কবিতা লিখে পাঠিয়েছেন। আগামী বারে সেটি ছাপা হবে।

নূতন ধাঁধা

নীচের খালি জায়গাগুলো এমন এক-একটি শব্দ দিয়ে ভরাট কর যা বাঁ দিক্ থেকে পড়লেও যা হবে ডান দিক্ থেকে পড়লেও তাই হবে।

১। নতুন — — থেকে এসেছে কিনা তাই ঠাকুরের তার ওপর ভারী —।

২। কি রকম — জমি দেখেছ? —ধান্যে ভরে গেছে আগাগোড়া। দেখে — সার্থক কর। ৩। খালের মুখে — গাছ জমে আছে, — না সরালে নৌকো ঢুকবে না। ৪। এই— দিয়ে এক শিশি — কিনে আন। ৫। — দা — হয়ে সিমলা চললেন।

সাহিত্যিকদের আঁকা ছবি :

প্রথম ছবিটি এঁকেছেন স্বপনবুড়ো (শ্রীঅখিল নিয়োগী), ২য়টি শ্রীলীলা মজুমদার, ৩য়টি ৺সুনির্মল বসু।

* কিশোর কিশোরীদের জন্য *

বিজ্ঞান বিচিত্রা

সম্পাদনা : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীদাস মজুমদার

বারোটি বইয়ে জ্যোতির্বিদ্যা, ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিজ্ঞানের প্রায় সব কয়টি দিক নিয়ে সহজ, সরস ও সচিত্র বর্ণনা।

প্রতিটি বই ১'২৫ ॥

চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর

রংচং ১'০০ * গল্প লেখা হল না ১'৫০

প্রবোধকুমার সান্যালের

দুর্গমের ডাক ১'৫০

শৈল চক্রবর্তীর

অ্যাং ব্যাং ১'০০ ম্যাও ম্যাও ১'০০

ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের

এবংপুরের টিকটিকি ১'০০

বিক্রমাদিত্যের খুনী দরওয়াজা ১'৫০

আশা দেবীর ঘুমতি নদীর ঢেউ ১'০০

রেবতীভূষণের সবুজ টিয়া ০'৭৫

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের

দেশবিদেশের রূপকথা ২'৫০ আমার বাংলা ২'০০

তোমাদের নিতি স্মরি

সুনির্মল বসু রচিত জীবনী-গ্রন্থমালা। এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে ১। রামমোহন, ২। বিদ্যাসাগর, ৩। মধুসূদন, ৪। শ্রীরামকৃষ্ণ, ৫। বঙ্কিমচন্দ্র। প্রতিটি বই ১'০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২

শ্রীচরণেষু

ফোন : ৫৫-৪০৪৬

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা—গোরাচাঁদ দাশগুপ্ত

* নতুন আদর্শ এবং পরিকল্পনা নিয়ে প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই প্রকাশিত হয়।
* নীট্ আয় দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ব্যয়িত হয়।
* 'বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর লেখা' এবং 'বিদ্যালয়ের খবর বিভাগ দু'টি আমাদের সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পিত।
• প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকদের রচনায় প্রতিটি সংখ্যা সুসমৃদ্ধ।

বার্ষিক (সডাক) ৩৲, ষাণ্মাসিক (সডাক) ১॥০, প্রতি সংখ্যা ।০

অন্যান্য বিষয়ের জন্য কর্মসচিবের সহিত পত্রালাপ করুন।

"সম্পাদক"
শ্রীননীগোপাল দত্ত

'শ্রীচরণেষু' কার্য্যালয়,
৪বি, রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৫

লে—খা—চা—ই

অভিনব কিশোর-মাসিক। ২য় বর্ষ (১৩৬৫—বৈশাখ হইতে)। বার্ষিক সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸৵০. প্রতি সংখ্যা।১০, নমুনা বিনা মূল্যে।

শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল, সম্পাদক ; দেবালয়—২৪ পরগণা

জ্যোতির্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ॥০ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১॥০ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বি.এ

Regd. No. C—1641

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

স্থাপিত – ১৩৩৭ ফোন – ৩৫-২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পতাকা মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

/২॥০, /৫, ।৮ সেরা ডাইস্ টীনে,
মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ– শ্রীঅমৃত লাল কুমার।

মিল ও অফিস – ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২ টাকা ২৫ ন. প., প্রতি সংখ্যা ৩৭ ন. প.। ভি.পি.তে আরও ১১ ন. প. বেশী লাগে। নমুনার জন্য ৩৯ ন. প.র ডাকটিকেট পাঠাতে হয়।

২। বৈশাখে বছর সুরু, যে কোনও মাসে চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যায় কিন্তু পত্রিকা নিতে হবে বৈশাখ কিংবা কার্ত্তিক থেকে।

৩। কোন মাসে পত্রিকা না পেলে ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে তাঁদের উত্তরসহ সেই মাসের মধ্যে আমাদের জানাতে হবে।

৪। গ্রাহকদের সব চিঠিতেই গ্রাহক নং দিতে হবে। চিঠির জবাবের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাকটিকেট দিতে হবে।

৫। লেখা, কপি রেখে, সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা—ম্যানেজার রামধনু। ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫ (টেলিফোন : ৪৮-৩১৮১)

বিজ্ঞাপনের হার (সংশোধিত)

প্রতি বারের জন্য :—

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ৫০ টা., অর্দ্ধপৃষ্ঠা ২৮ টা., সিকি পৃষ্ঠা ১৬ টা.। প্রতি কলম ইঞ্চি ৬ টা

মলাট : ৪র্থ পৃষ্ঠা ১০০ টা.

মলাট : ২য় বা ৩য় পৃষ্ঠা — ৮০ টা. অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৪ টা., সিকি পৃষ্ঠা ২৪ টা.

ছবি বা লেখার সামনের পৃষ্ঠা ৬০ টা, অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৩৬ টা., সিকি পৃষ্ঠা ২০ টা.

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনের মতামতে
কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে ?
স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,
'থিনের' মধ্যে; গুনে, স্বাদে সবার সেরা "কোলে"

অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,
সবরকমের "কোলে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ

শ্রীচরণেষু

ফোন ঃ ৫৫-৪০৪৬

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা—গোরাচাঁদ দাশগুপ্ত

* নতুন আদর্শ এবং পরিকল্পনা নিয়ে প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই প্রকাশিত হয়।
* নীট্ আয় দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যয়িত হয়।
* 'বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর লেখা' এবং 'বিদ্যালয়ের খবর' বিভাগ দু'টি আমাদের সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পিত।
* প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকদের রচনায় প্রতিটি সংখ্যা সুসমৃদ্ধ।

বার্ষিক (সডাক) ৩৲, ষাণ্মাসিক (সডাক) ১৷৹, প্রতি সংখ্যা ।৹

অন্যান্য বিষয়ের জন্য কর্মসচিবের সহিত পত্রালাপ করুন।

"সম্পাদক"
শ্রীননীগোপাল দত্ত

'শ্রীচরণেষু' কার্য্যালয়,
৪বি, রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৫

লে—খা—চা—ই

অভিনব কিশোর-মাসিক। ২য় বর্ষ (১৩৬৫—বৈশাখ হইতে)। বার্ষিক সডাক ৩৲

ষাণ্মাসিক ১৸৵৹, প্রতি সংখ্যা ।১০, নমুনা বিনা মূল্যে।

শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল, সম্পাদক; দেবালয়—২৪ পরগণা

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ॥৹ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১॥৹ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বি.এ

সুরিনা স্পেশাল কালি

সুপ্রীম কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ • কলিকাতা

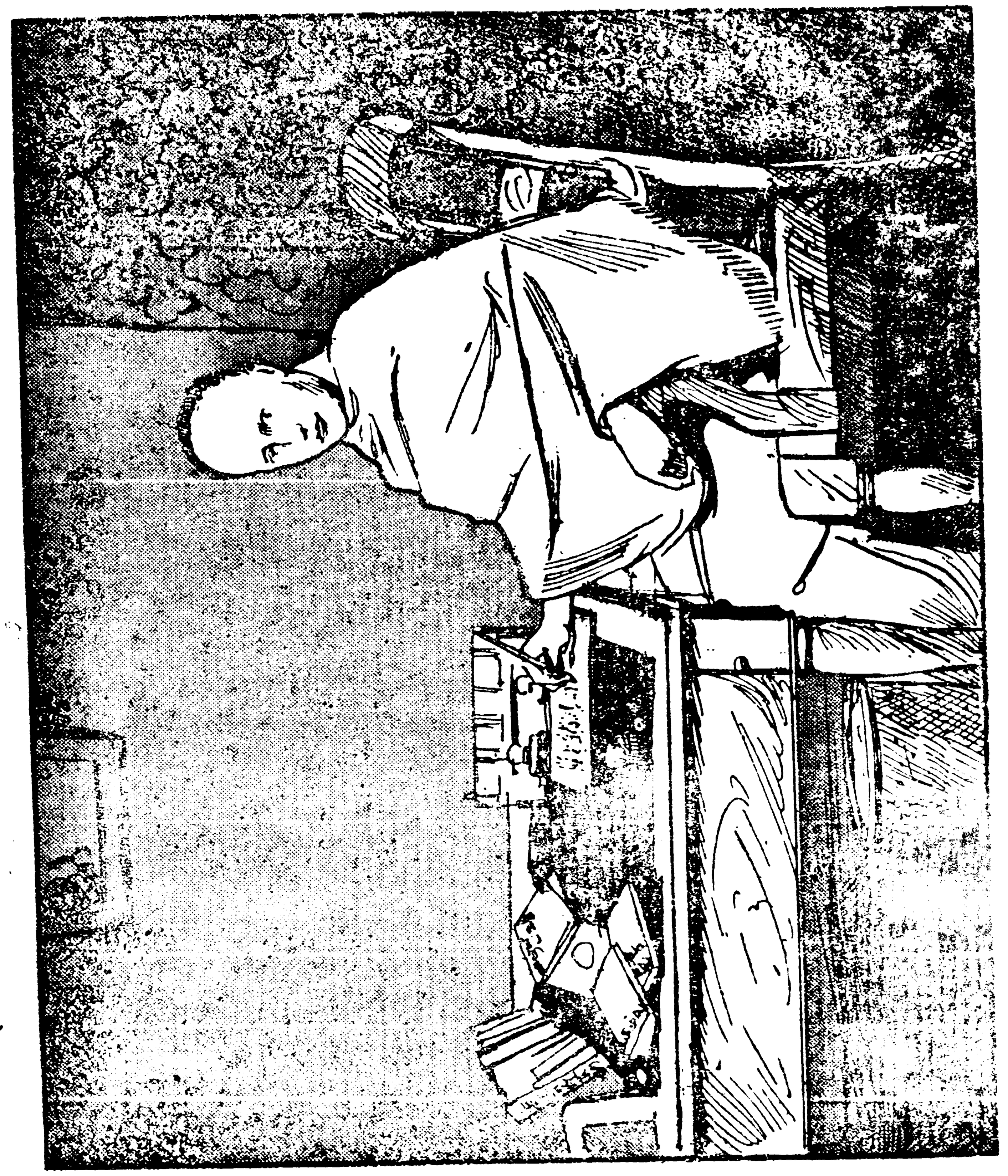

'বিদ্যার সাগর, তুমি বিখ্যাত ভারতে।'

রামময়—

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩১শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৬৫ { ৪র্থ সংখ্যা

খোকার মন

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

মন নাচে মোর আবডালে ওই
গাছের ফাঁকে ফাঁকে—
হাতছানি দে' ভোরের বেলা
নিত্য কে যে ডাকে।

মন ছুটে যায় হাওয়ায় ভেসে
বুলবুলি আর শ্যামার দেশে,
দৌড়ে চলে এক নিমেষে
প্রজাপতির পাখে।

মন ছুটে যায় দুলে দুলে
নীল সাগরের কোলে—

আকাশ ডাকে—বাতাস ডাকে
হাজার রকম বোলে।

হাওয়ায় ভরা পালের 'পরে
মন উড়ে যায় কেমন ক'রে,
হঠাৎ দেখি, দেশান্তরে
নাগরদোলায় দোলে।

মন মাতে মোর পাখীর গানে
সন্ধ্যা সকাল বেলা—
বই ফেলে তাই আনমনে ভাই,
শুনছি সুরের খেলা।

কেমন করে দিন চলে যায়
গানে গানে খেলায় খেলায়,
সবাই ভাবে, লেখাপড়ায়
করছি অবহেলা।

শিশুসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে গত সংখ্যায় কিছু বলেছি। তাতে শিশুদের সঙ্গে শিশু হয়ে মিশে যাবার ব্যাকুল বাসনা কি করে শিশুমনস্তত্বের সঙ্গে কবির অন্তরঙ্গ পরিচয় সাধনের সুযোগ দিয়েছিল তারও উল্লেখ করেছি। তাই রবীন্দ্রনাথের শিশু মাকে ডেকে বলছে —

'খেলা ভোলার দিন মা আমার আসে মাঝে মাঝে,
সেদিন আমার মনের ভিতর কেমনতরো বাজে।
শীতের বেলায় দুই পহরে দূরে কাদের ছাদের 'পরে
ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয় বেগ্‌নি রঙের শাড়ী,
চেয়ে চেয়ে চুপ করে রই তেপান্তরের পার বুঝি ওই ?
মনে ভাবি ওইখানেতেই আছে রাজার বাড়ী।
থাকতো যদি মেঘে ওড়া পক্ষিরাজের বাচ্চা ঘোড়া
তক্ষণি যে যেতেম তারে লাগাম দিয়ে ক'সে,
যেতে যেতে নদীর তীরে ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীরে
পথ শুধিয়ে নিতেম আমি গাছের তলায় ব'সে।'

একটি বালকের শিশুমনের সকল গোপন কথাই এই ক'টি লাইনের মধ্যে সুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে। খেলায় মন বসছে না ছেলেটির। মন বসবে কেমন করে ? —

'ছুটির দিনে কেমন সুরে পূজোর সানাই বাজছে দূরে'

তাই তো তার সমস্ত মনটা উদাস হয়ে পড়েছে—

'খেলনাগুলো সামনে মেলি, কী যে খেলি কী যে খেলি,
সেই কথাটাই সমস্ত ক্ষণ ভাবনু আপন মনে ;
লাগল না ঠিক কোনও খেলাই, কেটে গেল সারা বেলাই—'

সেই খেলা ভোলার দিনে আপন মনে চুপ করে বসে বসে তার মনে হ'তে লাগলো ওই পাশের বাড়ীর ছাদই বুঝি তেপান্তরের মাঠ। রাজার বাড়ীটা বোধ করি ওইখানেই। এ সবই তার কাছে সত্য। তেপান্তরের মাঠ সত্য, রাজবাড়ী সত্য, পক্ষিরাজ ঘোড়া সত্য, ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীও সত্য। তার কাছে এরা প্রত্যক্ষ রূপ নিয়ে দেখা দেয়। শিশু চলে সেই স্বপ্নে ভেসে।

মাঠের মাঝখানে একটা তালগাছ তার চোখে পড়লো। আর কোনও সঙ্গী নেই কাছে। সে একলা। তাকে দেখে খোকার মনে হচ্ছে—

'তালগাছ,— একপায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।'

খোকা তালগাছের মনের কথাটা যেন বুঝতে পারছে,— বলছে,

'মনে সাধ, কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়
একেবারে উড়ে যায়—'

কিন্তু তখনি খোকার মনে হ'ল—'কোথা পাবে পাখা সে?'

তালগাছ তবু হতাশ হয় না। তার মাথার ছাতার মতো গোল গোল পাতাগুলোই তার ইচ্ছাকে মেলে ধরলো—

'মনে মনে ভাবে বুঝি ডানা এই
উড়ে যেতে মানা নেই!'

সত্যিই উড়ছে সে— 'সারাদিন, ঝর্‌ঝর্‌ থথর
কাঁপে পাতা পত্তর
ওড়ে যেন ভাবে ও!
মনে মনে, আকাশেতে বেড়িয়ে,
তারাদের এড়িয়ে
যেন কোথা যাবে ও!'

তার পর, 'হাওয়া যেই নেমে যায়, পাতা কাঁপা থেমে যায়'

তখন আবার এই মাটির বাস্তব জগতে 'ফেরে তার মনটি।'

শিশুদের কল্পনাও যেমনি অদ্ভুত, শিশুদের স্বপ্নও তেমনি অদ্ভুত। তাই শিশুদের জন্য কবি যে 'সহজ পাঠ' বলে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন ১৩৩৭ সালে, তাতে আছে তারা যেন বেছে বেছে স্বপ্ন দেখছে!—ঘুমন্ত খোকাকে ডেকে বিনু বললে, 'দেখ দেখ, চেয়ে দেখ—'

খোকা অমনি ধড়মড়িয়ে উঠে,

'চেয়ে দেখে—ঠোকাঠুকি বরগা কড়িতে,
কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে;
ইটে গড়া গণ্ডার বাড়ীগুলো সোজা—
চলিয়াছে দুদ্দাড়—জানালা দরজা।
রাস্তা চলেছে যত অজগর সাপ।'

খোকার ভারি মজা লাগছে দেখতে—

'ছাদের গায়েতে ছাদ মরে মাথা কুটে,
হাওড়ার ব্রীজ চলে—মস্ত সে বিছে!
* * *
মনুমেণ্টের দোল যেন ক্ষ্যাপা হাতী
শূন্যে দুলায়ে শুঁড় উঠিয়াছে মাতি!
আমাদের ইস্কুল ছোটে হন হন—
অঙ্কের বই ছোটে, ছোটে ব্যাকরণ।
ম্যাপগুলো দেওয়ালেতে করে ছট্‌ফট্‌—
পাখি যেন মারিতেছে পাখার ঝাপট!
ঘণ্টা কেবলই দোলে—ঢং ঢং বাজে,
যত কেন বলো তারে তবু থামে না যে!'

লক্ষ লক্ষ লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে বলছে, থামো! থামো! কিন্তু কলকাতার খেয়াল নেই, সে আপন মনেই চলেছে। খোকা মনে মনে ভাবছে—'চিন্তা তো নাই, কলকাতা যাক্‌ নাকো সোজা বোম্বাই!' খোকা তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। যদিই কলকাতাটা দিল্লী, লাহোর, আগরা চলে যায়—মাথায় পাগড়ি বাঁধবে সে, পায়ে দেবে নাগরা। হেনকালে কিন্তু কিসের শব্দে খোকার ঘুম ভেঙে যেতেই, এমন মজার স্বপ্নটি তার মিলিয়ে গেল। খোকা উঠে চোখ মেলে দেখে, ও মা! 'কলকাতা আছে কলকাতাতেই!'

কবি তাদের জন্যে 'প্রহাসিনী' বলে যে হাসির ছড়া রচনা করে গেছেন তার মধ্যেও শিশুমনস্তত্বের পরিচয় পাই প্রতি ছত্রে ছত্রে।—খুকী বলছে খোকাকে—

'এ ত বড় রঙ্গ জাদু, এ ত বড় রঙ্গ—
চার মিঠে দেখাতে পারো, যাবো তোমার সঙ্গ।'

খোকা বলছে, 'বরফি মিঠে, জিলাবী মিঠে, মিঠে শোনপাপড়ি,
তাহার অধিক মিঠে কন্যা, কোমল হাতের চাপড়ি।'

মেয়েটি বলছে—

'এ ত বড় রঙ্গ জাদু, এ ত বড় রঙ্গ—
চার তিতো দেখাতে পারো, যাবো তোমার সঙ্গ।'

খোকা তখনি বললে—

'উচ্ছে তিতো, পলতা তিতো, তিতো নিমের সুক্ত,
তাহার অধিক তিতো যাহা বিনা ভাষায় উক্ত।'

মেয়েটি তবু হার মানতে চায় না। আবার বললে—

‘এ ত বড় রঙ্গ জাদু, এ ত বড় রঙ্গ—
চার মিথ্যে দেখাতে পারো, যাবো তোমার সঙ্গ।’

খোকাও কম যায় না। বলে—

‘মিথ্যে ভেল্‌কী, ভূতের হাঁচি, মিথ্যে কাঁচের পান্না,
তাহার অধিক মিথ্যে তোমার নাকি সুরের কান্না।’

এর পরই কবি ছেলেদের জন্য দিয়েছেন ‘খাপছাড়া’র ছড়া। ১৩৪৩ সালে ছেলেদের সঙ্গে ‘দামোদর শেঠের’ পরিচয় হ’ল। যার জন্য

‘মুড়্‌কির মোয়া চাই, চাই ভাজা ভেটকি,
চাঁদনীতে পাওয়া যাবে বোয়ালের পেট কি?
না হয় খরচা হবে, মাথা হবে হেঁট কি?
খোঁজ নিও ঝরিয়াতে জিলিপির রেট কি।’

এই খাপছাড়াতেই পাওয়া গেছে গোরা বোষ্টম বাবার দেখা। গোরা বোষ্টম বাবা কি করেন—

‘শুদ্ধ নিয়ম মতো মুরগিরে পালিয়া
গঙ্গাজলের যোগে রাঁধে তার কালিয়া।’

তার পরই খুঁজে পাই এক মজার ডাক্তার বাবুকে এখানে। তার নাম ‘নাড়ী টেপা ডাক্তার’।

‘পাড়াতে এসেছে এক নাড়ী টেপা ডাক্তার,
দূর থেকে দেখা যায় অতি উঁচু নাক তার।
নাম লেখে ওষুধের, এ দেশের পশুদের
সাধ্য কি পড়ে তাহা, এই বড় জাঁক তার।’

তার পর বছর না ফিরতেই রবীন্দ্রনাথ তুলে দিয়েছিলেন ছেলেদের হাতে ‘ছড়ার ছবি’। ছড়ার ছবির যোগীনদা’কে, যার সেই ডেরা এস্মাইল খাঁয়ে জন্ম, ছেলেমেয়েরা কেউ ভুলবে না। এমন রূপকথার রূপকে ভরা কাহিনী ছড়ায় ছন্দে রচনা করে আর কেউ তাদের শোনায় নি। ‘বাসা বাড়ী’র রহস্যময় সন্ধান পায় ছেলেরা বোধ হয় এই ছড়ার ছবির রাজ্যে এসেই প্রথম।

‘আঁধার-মুখোস পরা বাড়ী সামনে আছে খাড়া,
হাঁ করা মুখ দুয়ারগুলো, নাইকো শব্দসাড়া।’

কার্তিক মাসে আমাদের বাড়ী বাড়ী ‘আকাশ-প্রদীপ’ দেওয়া হতো, আজ আর

হয় না। এই ‘আকাশ-প্রদীপ’ দেওয়ার আর যাই অর্থ থাক্, ছেলেমেয়েদের মনে এ কি কল্পনার জাল বোনে কবি তার পরিচয় দিয়েছেন আমাদের—

‘অন্ধকারের সিন্ধুতীরে একলাটি ওই মেয়ে
আলোর নৌকো ভাসিয়ে দিল,—আকাশ পানে চেয়ে।
মা যে তাহার স্বর্গে গেছে, এই কথা সে জানে,—
ওই প্রদীপের খেয়া বেয়ে আসবে ঘরের পানে।’

কি করুণ এই ছবি!

‘মা যে তাদের খুঁজে খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে—
তারায় তারায় পথ হারিয়ে যায় শূন্যের পারে।
মেয়ের হাতের একটি আলো জ্বালিয়ে দিল রেখে,
সেই আলো মা নেবে চিনে অসীম দূরের থেকে।
ঘুমের মধ্যে আসবে ওদের চুমো খাবার তরে
গভীর রাতে মা-হারা সেই বিছানাটির ’পরে।’

ছেলেমেয়েদের প্রতি কবির মমতা মায়ের মতই সত্য ছিল, গভীর ছিল, ছিল মর্মস্পর্শী। তাই কত দিন থেকে কবি কত না ছড়ায় ছবিতে কথায় কাহিনীতে গল্পেসল্পে গাথায় কবিতায় ভরে দিয়ে গেছেন এ দেশের ছেলেমেয়েদের দুটি অঞ্জলি। ‘কথা ও কাহিনী’তে ভারত-ইতিহাসের কত গৌরবময় চিত্র ছেলেদের চিত্তে অবিস্মরণীয় করে মনোহর রঙে এঁকে দিয়ে গেছেন তিনি!

বহুকাল আগে ছেলেমেয়েদের হাতে ‘বালক’ নামে একখানি সুন্দর মাসিক পত্র তিনিই সস্নেহে তুলে দিয়েছিলেন। ছেলেমেয়েদের ‘নাটক’ রচনা করেও তাদের আনন্দ বর্ধন করে গেছেন তিনি। ‘মুকুট’ শিশুদের ললাটে রাজটিকা পরিচয় দিয়ে গেছে।

নৃত্যগীতেও কবি তাদের প্রাণের ছন্দকে নিত্য নন্দিত করে গেছেন।

রূপকথায় কবি যে গান শুনিয়ে গেছেন সেই গানটি তুলে দিয়ে আজকের মত শেষ করছি আমার বক্তব্য—

‘কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা
মনে মনে।
মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা
মনে মনে।
তেপান্তরের পাথার পেরোই রূপকথায়,
পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই চুপ কথায়—

পারুল বনের চম্পারে মোর হয় জানা
মনে মনে।
সূর্য যখন অস্তে পড়ে ঢুলি
মেঘে মেঘে আকাশ কুসুম তুলি,
সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে
যাই ভেসে দূর দিশে —
পরীর দেশের বন্ধ দুয়ার দিই হানা
মনে মনে।

১৩

একটা সন্ধানের ক্ষীণ সূত্র পাওয়া গেল। অনিশ্চিত ব্যাপার। কিন্তু রামশাস্ত্রী বললেন যে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে এর চেয়ে ভাল সূত্র আর পাওয়া যাবে না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা বেরিয়েছি তার সবই অনিশ্চিতের ধোঁয়ার মধ্যে ঝুলছে, সুতরাং সেই ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে নিজের পথ পরিষ্কার করে চলতে হবে।

উপদেশ হিসাবে এ কথাগুলো মন্দ নয়, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিপদে অসুবিধা বোধ করছিলাম। এ রকম কৃচ্ছ্র সাধনে আমি অনভ্যস্ত, অথচ এ ব্যাপারে রামশাস্ত্রীর

সঙ্গে সহযোগিতার মূলে কেবল কৌতূহল ছাড়া আর কিছুই আমার নেই। যাই হোক্, যখন পথে পা বাড়িয়েছি তখন এর শেষ কোথায় কি ভাবে হয় সেটা দেখতেই হবে।

কিন্তু বিকেলবেলা রামশাস্ত্রী যখন বললেন যে ভয়ানক জরুরী কাজে তাঁকে কলকাতায় ফিরতে হবে এবং সেখান থেকে যেতে হবে অন্যত্র, এমন কি ভারতের বাইরে যাওয়াও বিচিত্র নয়, তখন রীতিমত মুষড়ে গেলাম। আমি একা এ ব্যাপারের কি করতে পারি? আর তা ছাড়া যেটুকু খবর জানবার, সে তো আমরা জেনেই নিয়েছি, কানাইদাসের কাছে! তবে আর শুধু শুধু আমার একা এখানে থেকে কি দরকার?

কিন্তু তিনি জানালেন যে যদি বেশী কিছু জানতে পারা যায়, সেই জন্য আরও দিন কয়েক থেকে যাওয়া ভাল। ভারতের বাইরে যদি তাঁকে না যেতে হয় তাহলে দশ-বারো দিনের মধ্যেই তিনি ফিরে আসবেন। ইতিমধ্যে আমি কানাইদাসের কাছ থেকে মন্দির এবং মূর্ত্তির ইতিহাস আরও যতটা পারি যেন জেনে নিই। উৎসাহ এবং সাহস দিয়ে খানিকটা বক্তৃতা শোনালেন।

রবাটপুর থেকে ষ্টেশন প্রায় সাড়ে আট মাইল। চেষ্টা করলে গরুর গাড়ী পাওয়া যেতে পারে, নইলে পদব্রজে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। গরুর গাড়ী একখানা সংগ্রহ করা গেল, কিন্তু সে ষ্টেশন পর্য্যন্ত আমাদের পৌঁছে দিয়ে অন্য জায়গায় যাবে। কাজেই ফেরার সময় আমাকে অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করতে হবে।

রামশাস্ত্রীকে ট্রেনে তুলে দিলাম।

ষ্টেশনের কাছে কয়েকখানা দোকান। সেখানে জলযোগ সেরে বেরুলাম একটা গরুর গাড়ী সংগ্রহের চেষ্টায়। কিন্তু মিললো না। অনেক খোঁজখবরের পরে জানা গেল মাল বোঝাই একখানা গাড়ী যাবে বটে ওই দিকে, কিন্তু রবাটপুর পর্য্যন্ত নয়। মাইল চারেক দূরে একটা জায়গায় রাস্তাটা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একটা গিয়েছে রবাটপুরের দিকে, আর একটা গিয়েছে বেগুনবেড়ের হাটে। এ গাড়ী যাবে সেইখানে। সুতরাং সেই অবধি, অর্থাৎ মাঝপথে সে আমাকে নামিয়ে দিতে পারে।

উপায় ছিল না, কাজেই উঠে বসলাম সেই মাল বোঝাই গাড়ীর একটা সুপুরীর বস্তার উপরে। পল্লীগ্রামের কাঁচা রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলো গাড়ী, ধীর মন্থরগতিতে। অনেক কথাই ভাবতে লাগলাম। রামশাস্ত্রী তো চলে গেলেন। তিনি যদি শীঘ্র ফিরে না আসেন তবে একা আমার পক্ষে কানাইদাস বাবাজীর বর্ণিত সেই রাজার মন্দিরে গিয়ে খোঁজখবর নেওয়া কতটা সম্ভবপর হবে সেটা চিন্তা করে মনের মধ্যে খুব যে উৎসাহ এবং আনন্দ পাচ্ছিলাম তা নয়। তবু আমাদের জীবনের বাঁধা-ধরা প্রাত্যহিক কাজের গণ্ডীর মধ্যে খানিকটা বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত্রি, ফুরফুর করছে হাওয়া, কাজেই চারিদিকের আবেষ্টনী বড়ই ভাল লাগছিল। সুপুরীর বস্তার উপর অস্বচ্ছন্দ ভাবে বসে থেকেও মাঝে মাঝে যেন ঢুলুনী আসছিল।

ঘণ্টা তুইয়ের মধ্যেই এলাম যে জায়গাটায় আমার গরুর গাড়ী চড়ার সমাপ্তি সেইখানে। একটা প্রকাণ্ড বটগাছকে কেন্দ্র করে রাস্তাটা এখানে তুদিকে ভাগ হয়ে গিয়েছে। বটগাছটাকে লোকে বলে গলায় দ'ড়ে গাছ। কবে কে ওই গাছে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল সে কথা কেউ জানে না, কিন্তু গাছের ওই নামটাই একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করে, বিশেষতঃ রাত্রে।

এখান থেকে রবাটপুরের নীলকুঠী বা কানাইদাসের আখড়া আরও তিন মাইল কিংবা একটু বেশী। এতখানি রাস্তা এই রাত্রে সম্পূর্ণ একাকী হেঁটে যেতে হবে মনে করে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম, কিন্তু দেখা গেল একেবারে সঙ্গীহীন নই। আরও এক ব্যক্তি নামলেন গরুর গাড়ী থেকে।

পরিচয়ে জানা গেল ইনি যাবেন আকন্দতলা, রবাটপুরের কুঠী ছাড়িয়ে আরও মাইল খানেক। ব্যবসায়ী লোক, সহরের বাজারে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয়। যাক, একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তু'জনে গল্প করতে করতে একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

আমাদের নামিয়ে মাল বোঝাই গরুর গাড়ী চলে গেল বাঁ দিকের রাস্তায়।

সঙ্গী ভদ্রলোক একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে গল্প করতে করতে চললেন। এ বছর সরষের ফলন কেন ভাল হয় নি, পাট এবং মেস্তা কি উপায়ে আরও ভাল হতে পারে, ছোলা এ বছর যে রকম ফলন হয়েছে তাতে মনে হয় ছোলার ব্যবসায়ীরা তু'টো পয়সার মুখ দেখতে পাবে—এই সব গল্প অনর্গল বকতে বকতে চলেছেন তিনি। এ সব কথায় আমার মন্তব্য করবার কিছুই ছিল না। কারণ সরষে, পাট এবং ছোলা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব সামান্যই, মেস্তা যে কি জিনিষ তা আমার জানাই নেই।

কিন্তু তিনি থামবার পাত্র ন'ন। চিটে গুড়ের বর্ত্তমান দর কি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি সবিনয়ে জানিয়ে দিলাম যে কোন রকম পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধে আমার কোনও জ্ঞানই নেই।

কিন্তু তাতেও তাঁকে থামানো গেল না। জিজ্ঞাসা করলেন, রবাটপুরের নীলকুঠীতে কি জন্য এসেছি। কানাইদাস বাবাজীকে তিনি ভাল রকমই জানেন, কিন্তু কলকাতা থেকে এখানে তাঁর কাছে আসার কি উদ্দেশ্য আমার থাকতে পারে সে কথাটা অত্যন্ত কৌতূহল ভরে জিজ্ঞাসা করলেন।

এবারে মিথ্যা উত্তর দেওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না। বললাম, আমার এক

আত্মীয় অম্লশূলের ব্যায়রামে ভুগছেন প্রায় ৫।৬ বছর, কোনও ওষুধেই কিছু উপকার হয় নি। শেষে একজন বলেছেন যে কানাই বাবাজী যদি একটি মাতুলী দেন তবে নিশ্চয়ই অসুখ সারবে। সেই জন্যই লোকের কাছে খোঁজ নিয়ে অনেক সন্ধান করে এখানে এসে বাবাজীকে ধরেছি। তাঁকে নাম, গোত্র সব দেওয়া হয়েছে, এইবার তিনি হোম করে তার পর মাতুলী দেবেন।

আমার সঙ্গী বললেন, আশ্চর্য্য নয়। কানাইদাসের অনেক গুণ আছে মশাই! সেবার একটা লোককে গোখরো সাপে কামড়ালো, তারা এসে বাবাজীর পায়ে আছাড় খেয়ে পড়লো। তিনি ধুনী থেকে এক মুঠো ছাই নিয়ে বললেন, যে জায়গাটায় কামড়েছে সেখানে এই ছাই বেশ করে রগড়ে ঘষে দি গে। আশ্চর্য্য ব্যাপার, মশাই! তাইতেই বেঁচে উঠলো লোকটা!

গল্প করতে করতে কিছু দূর আসা গেল। আজকাল নাম জিজ্ঞাসা করবার রেওয়াজ নেই, তবু আমি আমার সঙ্গীটির নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁর নাম জগবন্ধু সরকার।

পথের ধারে একটা প্রকাণ্ড পুকুর। চাঁদের আলোয় তার জল চিক চিক করছে। সেখানে বসে একটু জিরিয়ে নেওয়া গেল। তার পর আবার চললাম। তখনও প্রায় তু' মাইল রাস্তা বাকী।

হঠাৎ জগবন্ধু সরকার আমাকে বললেন, ওই গাছটার দিকে চেয়ে দেখুন তো, কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

চাঁদের আলোয় কিছু দূরে একটা গাছ যেন একটা ঝাঁকড়া-মাথা দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে। বললাম, একটা গাছ ছাড়া আর তো কিছুই দেখছি না!

বেশ ভাল করে দেখুন তো!

এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম সেই দিকে। কিন্তু কই, কিছুই তো দেখা যায় না! হঠাৎ আমার তুই চোখে তু' মুঠো ধূলো খুব জোরে কে ছুঁড়ে মারলে। কে মারলে? আর তো কেউ ছিল না! তবে কি জগবন্ধু সরকারেরই এই কাজ?

চোখ তু'টো রগড়াতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু হঠাৎ একজন আমার হাত তু'টো ধরে ফেললে। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে। মনে হোল আর একজন আমার জামার পকেট থেকে মনিব্যাগ, কাগজপত্র সব তুলে নিলে।

মনিব্যাগে বেশী কিছু ছিল না। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানকে ভাড়া দেওয়ার পরে বোধ হয় ৪।৫ টাকা মাত্র ছিল। কিন্তু আমার নোট-বইতে কতকগুলো দরকারী কাগজ-পত্র ছিল। রামশাস্ত্রীর ঠিকানা, আরও কত কি। সবচেয়ে দরকারী জিনিষ যেটা

সেটা হোল কানাইদাস বৈরাগী বামুনগাছি থেকে সেই মন্দিরে যাওয়ার যে বিবরণ বলেছিলেন, এবং পথের যে নক্সাটা আমি লিখে রেখেছিলাম,— সেটাও ছিল সেই নোটবুকে।

চেঁচিয়ে উঠলাম, বললাম, সরকার মশাই, এ কি করলেন আপনি?

কিন্তু বুঝলাম দু'জন লোক রয়েছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব কোথা থেকে এবং কখন ঘটলো জানি না।

হঠাৎ আমাকে তারা এক ধাক্কা দিলে। রাস্তাটা সেখানে একটা উঁচু বাঁধের উপর। কাজেই সেখান থেকে গড়াতে গড়াতে নীচেয় এসে পড়লাম। মাথাটায় দারুণ বেদনা অনুভব করলাম। চোখ দু'টোয় তখনও অসহ্য যন্ত্রণা।

একেই কি বলে চোখে ধূলো দিয়ে কেড়ে নেওয়া?

(ক্রমশঃ)

পথিক মেঘের দল

শ্রীআশা দেবী, এম্. এ., বি. টি.

সব ভাষার ওপর একটা ভাষা আছে,—সেটা নীরব ভাষা। মস্কোয় এসে আমরা তার প্রয়োগ বেশ ভাল ভাবেই করতে শিখলাম।

থাকি এক শূন্য মার্গে—হোটেলের ছ' তালায়, আর খাবার ঘর আর এক প্রান্তে—অর্থাৎ বেশ কয়েক তলা নীচে। কাজেই খেতে যেতে হলে বেশ মুস্কিলে পড়তে হতো।

ভাষা বুঝবার সহায়তা করতো ইনটারপ্রেটার (দোভাষী)। সংখ্যায় তারা চারজন ছিল--নাদিয়া, তানিয়া, ওলগা, মারিয়া। আর একজনও ছিল, সে কয়েকদিন পর চলে গিয়েছিল। এরা সব সময়েই আমাদের ছায়ার মত অনুসরণ করে চলতো। কিন্তু কখনও যদি আমরা

কয়েকটি প্রাণোচ্ছল রুশ মেয়ে আমাদের সংবর্ধনা জানাল।

আলাদা হয়ে পড়তাম তা হলে কথা বলা নিয়ে বেশ বেগ পেতে হতো। তখন আমরা আঙ্গুল দেখিয়ে কথা বলতাম, ওরাও একগাল মিষ্টি হেসে মাথা নাড়তো। ভাবের আদানপ্রদান চলতো নীরব অভিব্যক্তিতে।

এ দেশের লোকেরা আমাদের মত বিদেশী ভাষার মাধ্যমে লেখপড়া শেখে নি। মাতৃভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শেখার জন্যে শিক্ষার গভীরতা যেমন বেড়েছে নিরক্ষরতা দূর হতেও তেমনি সাহায্য করেছে। আমাদের দেশে যেমন এক শ্রেণীর লোকে

লেখাপড়া শিখেছে, তেমনি বিরাট একটা শ্রেণী, যাদের আমাদের ভাষায় আমরা ছোট লোক বলি,—তারা নিরক্ষরই রয়ে গেছে। কারণ ইংরাজী শিক্ষা তাদের দৈনন্দিন কর্মজীবনের সঙ্গে কোন সঙ্গতি আনতে পারবে না। আবার, এরই ছুতোয়, তারা শিক্ষা পেল না বলে তাদেরকে, জমিদার, মহাজন এবং কর্মজীবনে সবার কাছে ঠকতে হলো। এর জন্য দায়ী আমাদের বৈদেশিক শিক্ষাপদ্ধতি।

কিন্তু এদের দেশে সব লোকই নিজের দেশের ভাষা জানে ও লিখতে পারে।

মস্কোর স্কুলের ছেলেরা আমাদের পাঠানো এলবাম্ কৌতূহলের সঙ্গে দেখছে।

জনসাধারণ অন্য দেশের ভাষা বলতে পারে না বলে তাদের আমাদের দেশের মত হেয় করা হয় না। আমরাও এখানে এসে গোটা কতক কথা শিখে নিয়েছিলাম। বলতামও। উচ্চারণ নিশ্চয়ই শুদ্ধ হতো না। ওরা একটু মুচকে হাসতো। কিন্তু আমরা বলতে ছাড়তাম না। যেমন, আমি চায়ে একটু চিনি খেতে ভালবাসি, কিন্তু

ওরা আমাদের লেবু দিয়ে চা দিতো। আমরা অমনি তারস্বরে ঘোষণা করতাম—'মালকুম, সাকর' অর্থাৎ দুধ আর চিনি চাই।

হোটেলটাও বিরাট—কাজেই খাবার ঘরটাও ছিল প্রকাণ্ড। ঘরে ঢুকেই বাঁ হাতের দিকে খানিকটা ফাঁকা। বাঁ-দিকে এই ফাঁকা জায়গাটায় একটা ষ্টেজ আছে। ব্যাণ্ড বাজাবার জায়গা আর নাচবার মত জায়গাও আছে। তার পর চলেছে টেবিলের সারি। টেবিলে খাবার সময় আমরা দু'ভাগ হয়ে খেতাম - নিরামিষ আর আমিষ। আমি ছিলাম নিরামিষের দলে, কাজেই মারাঠী কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গেই আমার বসবার জায়গা নির্দ্দিষ্ট থাকতো।

বক্তৃতারত লেনিন
আজ মুসলিয়ামে চিরবিশ্রাম-শয্যায় শুয়ে

খেতে বসবার সময় পাঁউরুটি রুটির টেবিলেই থাকতো। তারপর একে একে আসতো —সুপ্, মাংস, মাখন, আলুসিদ্ধ, স্যালাড, আইসক্রীম, ফল। শেষে কফি খেয়ে ভোজন শেষ হতো। বুঝতেই পারছো, এ সব খাবার তো খুবই ভাল, কিন্তু আমাদের ভাত, ডাল, চচ্চড়ি খাওয়া মেজাজে যেন কেমন কেমন বোধ হতো। একটা পিঁড়ি পেতে বেশ করে মেখেচুখে হুস্ হাস্ করে না খেতে পারলে আমাদের না ভরে পেট, না হয় তৃপ্তি। তার পর খেয়েদেয়ে গণেশ ঠাকুরের মত একটা নিটোল ভুঁড়ি নিয়ে নাক ডাকিয়ে একটা ঘুম না দিতে পারলে কি সুখ হয়? কাজেই এতো খেয়েও মনটা যেন সেই সজনে-ডাঁটার চচ্চড়ির জন্যে আঁকু-পাঁকু করতো। আর, বলা বাহুল্য, এদের পাল্লায় পড়ে ঘুমের একেবারে বারোটা বেজে গিয়েছিল।

কথা প্রসঙ্গে এক বিলেত-ফেরত ভদ্রলোকের গল্প করছিলেন আমাদের একটি আত্মীয়। 'বিলেতে কেমন ছিলেন?' জিজ্ঞেস করতেই ভদ্রলোক একমুখ বিরক্তি নিয়ে বললেন: 'আরে মশায়, মাছের ঝোল না খেয়ে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল।'

আমাদের অবস্থাও প্রায় তাই। কিন্তু খাবার এরা এতো অপর্যাপ্ত দিতো এবং খাবার সময় এমন আদর-যত্ন করতো যে আমাদের ঘরের মায়েদের কথাই বার বার

মনে পড়তো। এটা খাও—ওটা খাও বলে এমন পীড়াপীড়ি করতে বোধ হয় ইউরোপের আর কোন দেশে দেখা যায় না। এদের আন্তরিকতা আর মেজাজ অনেকটা এসিয়াটিক বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আমরা মস্কোতে পৌঁছবার আগেই ট্রেনে ওঁরা আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমরা কোথায় কোথায় যেতে চাই এবং সেই ভাবেই তাঁরা আমাদের যাবার প্রোগ্রাম তৈরী করেছিলেন। এবার সুরু হলো সেইভাবে বেড়াবার ব্যবস্থা।

খাবার পর আমাদের প্রথম অভিযান হ'ল মুসলিয়ামের দিকে—যেখানে লেনিন ও ষ্ট্যালিনের মৃতদেহ অবিকৃত অবস্থায় শবাধারের মধ্যে রাজকীয় মর্যাদায় রাখা হয়েছে সেই জায়গায়। মস্কো হোটেল থেকে বেরিয়ে বাঁদিকের পথ ধরলাম আমরা। সঙ্গে সঙ্গে চললো বিরাট একটি ফুলের অর্ঘ্য। সেটা বয়ে চললো বিভিন্ন দেশের মাতৃসম্মেলন-ফেরৎ মস্কোতে নিমন্ত্রিত অতিথির দল। বিরাট এক শোভাযাত্রার আগে চলেছে অর্ঘ্য, পরে ছু'জন ছু'জন করে চলেছে আমাদের দলের অতিথিরা। এতে বহু দেশের মেয়েরা আছে। মাতৃসম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রায় ৬৬টি দেশের মায়েরা। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এসেছিলেন নিমন্ত্রিত হ'য়ে এখানে। কাজেই বহু দেশের লোকের মেশালো এই শোভাযাত্রাটি বেশ দর্শনীয় হয়ে উঠেছিল।

মুসলিয়ামের সামনে গিয়ে দেখলাম বিরাট বিরাট চওড়া রাস্তা; তার ওপর দীর্ঘ লাইন পড়েছে মুসলিয়ামে যাবার অনুমতিপত্র নেবার জন্যে। সপ্তাহে এটি পাঁচদিন খোলা থাকে। দেখলাম, এ দেশের জননায়কদের দেখবার জন্যে এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্যে বিরাট জনতা রোদের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে। কারু কারু কোলে ছোট শিশুও আছে।

জুন মাসে এখানে খুব ঠাণ্ডা নয়। ছুপুরে বেশ রোদ উঠলে গরম কাপড়ও প্রায়ই নিতে হয় না। তবে মেঘ বা বৃষ্টি হলে শীত করে। রাতেও শীত করে। আজকের দিনটা বেশ রোদে ঝলমলে ছিল। বিরাট বিরাট রাস্তায় ছেলেরা খেলছে। আমরা এগিয়ে চলেছি সারিবন্দী হয়ে।

মুসলিয়ামের সামনে ডানদিকে ফুলের ছোট বাগান। মন্দিরের ডাইনের বাড়ীটি খয়েরি রংএর। সামনে তার কয়েকটি মহান্ নেতার সমাধি। মুসলিয়ামের দরজায় রাজকীয় মর্যাদায় প্রহরী দাঁড়িয়ে। আমরা এগিয়ে চললাম। প্রবেশের পত্র হয়তো এঁরা আগেই দাখিল করেছেন। সামনের প্রবেশদ্বারটি যেন পাথরের তৈরী; গম্ভীর তার বর্ণ, স্নিগ্ধ, শান্তিপূর্ণ তার আবহাওয়া।

একে একে নামতে লাগলাম সেই পাতালের পথে। ঘোরান ঘোরান সিঁড়ি

না হলেও পথ সোজা নয়। যত নীচে নামতে লাগলাম মনে হতে লাগলো যেন হিমপুরী। এক একটা বাঁকের পথে উৎসুক নেত্রে তাকাই সেই বিশ্ববরেণ্য নেতাদের দেখবার জন্যে। দেশে থাকতে এঁদের সম্বন্ধে কত গল্প শুনেছি—পক্ষে বিপক্ষে কত আলোচনা শুনেছি। আজ তাঁরা ক্লান্ত,—নিশ্চিন্ত বিশ্রামে শায়িত। গুরুশিষ্যের এই বিশ্রাম যেন মনকে কেমন ভারাক্রান্ত করে তুলছিল আমার। সাইবেরিয়ার তুষারপ্রান্তরে অক্লান্ত অভিযাত্রীর আজ ছুটি।

শবাধারের মুখোমুখী দাঁড়ালাম। কাচের বিরাট আধার, আর মধ্যে ছু'জন পৃথক্ পৃথক্ আধারে শায়িত। যেমন দেখা যায় ছবিতে, মার্শালের পোষাকে, ঠিক তেমনি। যেন ঘুমিয়ে আছেন, একটু সাড়া পেলেই জেগে যাবেন। পায়ের জুতো হাতে খুলে নিলাম—শব্দ হলেই বুঝি ঘুম যাবে ভেঙ্গে!

কি প্রশান্তি মুখে! কি নিরবচ্ছিন্ন নিদ্রার ঘোর চোখে! কোথাও সেখানে মৃত্যুর কালিমা স্পর্শ করতে পারে নি। মুখে কোথাও এতটুকু বিকৃতি নেই—প্রাণহীন নিস্পন্দ দেহ বলে কিছুতেই মনে হয় না!

সহসা পাশের মেয়েটির দিকে চোখ পড়লো। কোন্ দেশের জানি না, সে চোখে রুমাল দিয়ে কাঁদছে। চোখে জল এল আমারও। এত নিশ্চিন্ত হয়ে তো বহু বছর ঘুমোন নি এঁরা! প্রায় ত্রিশ বছর আগে থেকে ঘুমুচ্ছেন লেনিন, এখনও যেন তাঁর সারা শরীর ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম।

নামে বিশ্বাস

শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত

প্রায় পাঁচ শ' বছর আগেকার কথা। হুসেন শাহ তখন গৌড়ের অধীশ্বর। গৌড়ে সেদিন বিশেষ দরবার। কাতারে কাতারে লোক ছুটেছে গৌড়ের দরবারে। একজন বৈষ্ণবের বিচার হবে। কেউ ছুটেছে তামাসা দেখতে, কেউ বা চলেছে বিচারের ফলাফল জানতে।

বিচারের আসনে বসে আছেন গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ। চারিধারে পাত্রমিত্র

যার যার আসনে উপবিষ্ট। ফুলিয়ার গোড়াই কাজী সাহেবও এসেছেন। তাঁরই অভিযোগে ধরে আনতে গিয়েছে বৈষ্ণবকে।

হঠাৎ বাইরের জনস্রোতের কণ্ঠ হ'তে আকাশ-পাতাল-কাঁপান ধ্বনি উঠল,—হরিবোল! হরিবোল! দরবার কক্ষের ইট, দেওয়াল পর্য্যন্ত সেই ধ্বনিতে কেঁপে কেঁপে উঠল। গম্ভীর হয়ে উঠলেন হুসেন শাহ।

একটু পরেই দরবার কক্ষের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পেল। কক্ষের বাইরে মৃদু ও মধুর ধ্বনি উঠল,—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে' নাম করতে করতে একজন বৈষ্ণব প্রবেশ করলেন দরবার কক্ষে। তাঁকে ঘিরে রয়েছে নগরের রক্ষীরা।

বৈষ্ণব নির্ভীক্। প্রশান্ত আনন। গলায় তুলসীর মালা। কপালে, হাতে, বুকে, কণ্ঠে শ্বেতচন্দনের তিলক। হাতে ঝোলার মধ্যে মালা। বৈষ্ণব মালা জপ করছেন—আর মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলছেন।

বৈষ্ণবকে নিয়ে নগরপাল দাঁড় করালেন হুসেন শাহের সামনে। হুসেন শাহ অবাক্ বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন সেই সৌম্য-শান্ত, নির্ভীক্ বৈষ্ণবের মুখের পানে।

বৈষ্ণব জিজ্ঞাসা করলেন,—"আমাকে কি ডেকেছেন, হুজুর?"

হুসেন শাহ নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ। তোমার নামে গুরুতর অভিযোগ আছে। তুমি একজন মুসলমান হয়ে হিন্দুর নাম ধারণ করেছ, হিন্দুর আচার পালন করছ!"

"আমি বৈষ্ণব, হুজুর! লোকে আমায় হরিদাস ঠাকুর বলে।"

এবার হুসেন শাহ রাগত স্বরে বলেন,—"তুমি মুসলমান। মুসলমান বংশে তোমার জন্ম।"

শান্ত স্বরে হরিদাস বললেন, "আমি হিন্দুও নই—মুসলমানও নই,—আমি বৈষ্ণব।"

"ও একই কথা। বৈষ্ণব মানে কাফের।"

প্রতিবাদ করলেন হরিদাস বললেন, "না। বৈষ্ণব মানে যিনি সর্বজীবে কৃষ্ণকে দেখেন। সকলেই তার চোখে সমান।"

"তুমি আল্লা মান না। তুমি কাফের।"

"আমি আল্লা মানি হুজুর! কারণ যেই কৃষ্ণ সেই আল্লা। কোন ভেদাভেদ নেই। আমরা ক্ষুদ্র অন্তর দিয়ে দেখি বলে এঁদের আলাদা আলাদা মনে করি।"

"বেশ, তা হলে এবার থেকে কেবল আল্লার নাম কর। ফের মুসলমান হও।"

"কিন্তু কৃষ্ণনাম ত্যাগ করা যে আমার দ্বারা সম্ভব হবে না হুজুর!"

হরিদাসের কথা শুনে ক্ষণিকের জন্য হুসেন শাহ নীরব হলেন। কিন্তু গোড়াই কাজী সাহেব একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, "হুজুর! এ লোকটা বাক্যবীর। এর কথা বিশ্বাস করবেন না। ওর বিচার করুন। ও যদি হিন্দুধর্ম ত্যাগ না করে তা হলে আমাদের ধর্ম রসাতলে যাবে। ওর দেখাদেখি আরও অনেকে হিন্দু কাফের হয়ে যাবে।"

হুসেন শাহ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, বললেন,—"শোন হরিদাস, তুমি এ ধর্ম ত্যাগ কর। ফের মুসলমান হও, সুখে শান্তিতে বাস কর। কিন্তু কাফেরের ধর্ম যদি ত্যাগ না কর, কাজীর বিচারে তোমাকে রেহাই দেবে না।"

হরিদাস ঠাকুর হাসলেন, বললেন, "আমি বৈষ্ণব, নামে বিশ্বাসী। ঈশ্বরের যা অভিপ্রায় তাই হবে।"

হুসেন শাহ গর্জন করে উঠলেন, বললেন, "যদি মৃত্যু হয়?"

হরিদাস ঠাকুর হাসলেন। ভারি মধুর হাসি। শান্ত, নির্ভীক্ কণ্ঠে বললেন,—

"খণ্ড খণ্ড হই যদি, যায় দেহ প্রাণ,
তবুও বদনে না ছাড়ি হরি নাম।"

কথা শুনে সভাসদ্গণ ভয়ে চমকে উঠলেন। হিন্দুরা আনন্দে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠল প্রহরীদের পক্ষে।

হুসেন শাহ রাগে ফেটে পড়লেন। গোড়াই কাজী বললেন "এর আর বিচারের প্রয়োজন নেই। একে বাইশ-বাজারে নিয়ে গিয়ে বেত্রাঘাতে মৃত্যুর হুকুম দিন।"

হুসেন শাহ সেই হুকুমই দিলেন। তার পর বললেন, "যদি বেত্রাঘাতের দরুণ ওর সুমতি হয়, আবার স্বধর্মে ফিরে আসতে চায়, তা হলে ছেড়ে দিও।" বলেই তিনি দরবার-গৃহ ত্যাগ করলেন।

হরিদাস ঠাকুরকে নিয়ে নগরপাল চলে গেল বাইশ-বাজারে। ঠাকুরের চোখে সেই স্নিগ্ধ হাসি। মুখে অনবরত কৃষ্ণ নাম। পশ্চাতে চলেছে অগণিত জনস্রোত। হিন্দুরা সকলে হায় হায় করে উঠলেন।

প্রহরীবেষ্টিত হরিদাস ঠাকুরকে বাইশ-বাজারে আনা হ'ল। গোড়াই কাজীর হুকুমে প্রহরীগণ ঠাকুরকে বেত্রাঘাত শুরু করল। সর্ব অঙ্গ বেত্রাঘাতে জর্জরিত হয়ে রক্ত পড়ছে, তবুও বেত্রাঘাত বন্ধ হ'ল না। গোড়াই কাজীর লোক সমানে হুকুম দিয়ে চলেছেন। হিন্দুরা আকুল হয়ে উঠল। অনেকে অর্থ দিয়ে বৈষ্ণবকে ছাড়িয়ে আনতে চাইল। কিন্তু নবাবের আদেশ, প্রহরীরা অটল, অচল।

কিন্তু আশ্চর্য্য, হরিদাস ঠাকুরের ভ্রূক্ষেপ নেই। মুখে কোন কাতরতা নেই, অনুনয় নেই, কেবল আছে কৃষ্ণ নাম। আর মাঝে মাঝে প্রার্থনা জানাচ্ছেন,—"এদের ক্ষমা কর প্রভু! এরা অজ্ঞ, অধম।" প্রহরীরাও বিস্ময়ে অভিভূত। শেষে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল, জানাল—ঠাকুরের মৃত্যু না হলে তাদেরই বিপদ্।"

ঠাকুর সব শুনলেন, হাসলেন। দেহ ক্ষতবিক্ষত, রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তবু মুখে কৃষ্ণনাম জপ করতে করতে বললেন, "ভয় নেই, এই আমি মৃত্যুকে বরণ করলুম।"

ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। অজ্ঞ প্রহরীরা মনে করল ঠাকুর বোধ হয় মরেই গেছেন। টানতে টানতে তারা তাঁকে হুসেন শা'র কাছে এনে হাজির করল। সেখানে গোড়াই কাজীও উপস্থিত ছিলেন।

হুসেন শাহ বললেন, "ওকে কবর দাও।"

কাজী সাহেব বললেন, "তা হলে তো ওর সদ্‌গতিই হ'ল। ওকে বরঞ্চ নদীতে ফেলে দেওয়া হোক। শকুনে, শৃগালে ছিঁড়ে খাক।"

তখন সকলে মিলে ঠাকুরকে টানাটানি করে তুলতে গেল। কিন্তু সব বৃথা, ঠাকুরকে কেউ এক বিন্দু নাড়াতে পারল না। ভগবান্ কৃষ্ণ যেন এসে ঠাকুরের দেহ আশ্রয় করে রইলেন।

ব্যাপার দেখে সবাই স্তম্ভিত। চারিদিকে কোলাহল—চিৎকার শুরু হ'ল। হিন্দুরা ফের ঘন ঘন হরিধ্বনি সুরু করল।

হঠাৎ ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হ'ল। সম্মুখে হুসেন শাহকে দেখে আনন্দে হাসতে লাগলেন তিনি। আবার চারিদিক্ কাঁপিয়ে হরিধ্বনি উঠল।

মুলুকপতি এবার অনুতপ্ত হলেন। রূঢ় ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইলেন ঠাকুরের কাছে। তার পর ঘোষণা করলেন, "কেউ ঠাকুরের অনিষ্ট করলে সে দণ্ডনীয় হবে। এখন থেকে ঠাকুর তাঁর ইচ্ছামত ধর্ম পালন করতে পারবেন।"

সকলে হরিধ্বনি দিয়ে ঠাকুরকে নিয়ে ফিরে এল ফুলিয়ায়। সকলের মুখেই এক কথা—

"খণ্ড খণ্ড হই যদি, যায় দেহ প্রাণ,
তবুও বদনে না ছাড়ি হরি নাম।"

তুষারতীর্থ শ্রীকৈলাস

তীর্থঙ্কর

তুষারতীর্থ কৈলাসের প্রায় পদপ্রান্তে এসে পড়েছি। আমাদের কৈলাস পরিক্রমাও সুরু হয়েছে। ক্রমশঃই উপরে উঠছি। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জব্বু গুলি মাল নিয়ে যাচ্ছিল অতি কষ্টে। যতই ওপরে ওঠা যাচ্ছিল ততই আমাদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। তাই তারা নারাজ না হলেও তাদের চালকেরা আপত্তি জানাচ্ছিল। আর একটা কারণ, তখনও পর্য্যন্ত যথেষ্ট বরফের দ্বারা পথ আবদ্ধ থাকায় পাছে তাদের পশুগুলির পা তাতে আট্‌কে ভেঙ্গে যায়—এই ছিল ভয়। সৌভাগ্য বশতঃ একজন লামা তখন ঐ পথ দিয়েই তাঁর জব্বু চালিয়ে নিয়ে আসছিলেন। এদেশে তিব্বতীরা লামাদের প্রায় দেবতার মত ভক্তি করে। তিনি আমাদের তীর্থযাত্রী দেখে সহানুভূতি জানাবার জন্য আমাদের জব্বু-চালকদের অভয় দিয়ে বল্‌লেন, "বরফ এমন কিছু নেই। তোমরা আমার জব্বু-চালকদের সঙ্গে সঙ্গে চল।"

এর পর শুন্‌তে পেলাম আমাদের উঠ্‌তে হবে প্রায় ১৯,০০০ ফুট উঁচুতে। এরই মধ্যে আমাদের দোলমালা পাস্ পার হতে হবে। এটা একটা বরফে ঢাকা পাহাড়ের মাঝ দিয়ে সরু পথ। তিব্বতীরা ভূত-প্রেতকে বিশেষ ভয় করে। তাই তাদের উপদ্রব কাটাবার জন্য তারা ছোটবড় নানা রংয়ের নিশান একটা দড়িতে বেঁধে নিয়ে গেছে অনেক দূর পর্য্যন্ত। এই লাল নিশান বুদ্ধের স্মারক। উদ্দেশ্য—বুদ্ধের নাম করে ভূত-প্রেত তাড়ান। এই সব ছোট ছোট নিশানের গায়ে নানা মন্ত্র লেখা। দোলমালা পাস্ অতিক্রম করবার সময় তারা নানা মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে যায়। আমরা যখন হাঁপাতে

হাঁপাতে এখানে এসে পৌঁছলাম তখন ঠাণ্ডার চাপে আমাদের সবারই শরীর শিথিল। তারপর পথের ভয়াবহতা দেখে বুক দমে গেল। শীতে পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। এ ছাড়া জুতো-মোজা শুদ্ধ পা বরফে বসে যাচ্ছিল। তাই অতি কষ্টে আমরা একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছিলাম আর মুখে বলছিলাম :

"হে নীলকণ্ঠ বৃষভধ্বজ পঞ্চবক্ত্র
লোকেশ শেষবলয় প্রথমেশ শর্ব।
হে ধূর্জটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥"

চড়াই শেষ হতে উৎরাই সুরু হ'ল। নাম্‌ছি তো নামছিই ! পা দুটো যেন আর চল্‌তে চায় না। বরফের মধ্যে বেশ খানিকটা বসে যাচ্ছে। চলা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো। ঠাণ্ডায় হাড়ের ভিতর কাঁপুনি লাগছে। মনে হচ্ছে জুতো, মোজা, প্যাণ্টালুন সব ভিজে গেছে। মাঝে মাঝে বরফ-গলা জলের ছোট ছোট স্রোত বয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাস বইছে। মাঝে মাঝে দূর থেকে বরফ পড়ার শব্দ আসছে কামানের আওয়াজের মতই। কিছুটা দূরে প্রকাণ্ড একটা বরফের চাঁই খসে পড়তে দেখলাম—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ঘটোৎকচের মতই। তার বজ্রগম্ভীর আওয়াজে কানে তালা লাগার উপক্রম হ'ল।

- আমাদের পথের সাথী জব্বু

এতক্ষণে শ্রীকৈলাসের পাদদেশে এসে পৌঁছান গেল। এখানে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড কুণ্ড,—নাম গৌরীকুণ্ড। গাইডের সাহায্যে আমাদের দলের একজন অনেকখানি নীচে নেমে গিয়ে গৌরীকুণ্ডের বরফ-গলা জলে স্নান করলেন। বলা বাহুল্য আমরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে গিয়েছিলাম বটে কিন্তু কেউ স্নান করতে সাহস করি নি। ঠিক কুণ্ডের পাশেই শ্রীকৈলাসের কালো পাথরে ঢাকা অনেকখানি উঁচু চূড়া খাড়া হয়ে উঠে গেছে। আমরা সবাই গৌরীকুণ্ডের ধারে বসে বিশ্রাম নিতে লাগলাম। একটু পরেই তুষারবৃষ্টি হতে লাগ্‌লো। নিরাপদ হবার জন্য আমরা সকলেই বর্ষাতি গায়ে

দিয়ে নিলাম। অবশ্য একটু পরেই বরফের বৃষ্টি থেমে গেল। আমরাও উঠে চল্‌তে সুরু করলাম।

উৎরাইয়ের পথে চলতে চলতে বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম যেখানে একেবারেই বরফ নেই। শুধু পাথর আর পাথর। জায়গাটার নাম 'নামচুকর'। স্থির হ'ল এখানেই আমাদের রাত্রিকালীন বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেলা হবে। পরদিন সকালে আবার জুনদালফুকের উদ্দেশে রওনা হওয়া যাবে। এখানে অপেক্ষা করার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। গাইডের মুখে শুনলাম যে লক্ষ্ণৌবাসী হিন্দুস্থানী যাত্রীরা তখনও পর্য্যন্ত এসে পৌঁছতে পারেন নি। তাঁরা অনেক পেছিয়ে আছেন। তাই আমরা যদি এগিয়ে যাই তবে তাঁরা পথিমধ্যে বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন—এমন সম্ভাবনা রয়ে গেছে। সুতরাং, তাঁদের নিরাপত্তার জন্যে, তাঁদের এখানে না আসা পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত বলে মনে করলাম।

রাত্রিতে তাঁবুর ভেতর বেশ শীত করছিল। মনে হচ্ছিল বোধ হয় বাইরে বরফ পড়ছে। পরদিন সকালে উঠে দেখলাম এখানে আসবার সময় দিনের বেলায় যে তরল স্রোতগুলি দেখেছিলাম তা এখন জমাট বরফে পরিণত হয়েছে। নদী এখন নদী বলে মনে হচ্ছে না, যেন একটা বরফের চাদর !

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে নিয়ে আবার আমাদের পথ চলা শুরু হ'ল। বেলা তখন দশটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই জুনদালফুক্ গুম্ফায় এসে পৌঁছান গেল। গাইড আমাদের গুম্ফার ভেতরে নিয়ে গেলেন। দেখলাম গুম্ফার মধ্যে রয়েছে বুদ্ধদেবের একটা বড় মূর্ত্তি ও অন্যান্য সহচর দেবদেবীর ছোটবড় মূর্ত্তি।

এখানকার প্রথা মত আমরা ঘিয়ের প্রদীপ কিনে দেবমূর্ত্তির সামনে রেখে জ্বালিয়ে দিলাম, তারপর প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

গাইডের নির্দ্দেশ মত আবার আমাদের পথ চলা শুরু হ'ল। নুড়ি-ভরা রাস্তা ধরে চল্‌তে চল্‌তে আবার এসে পৌঁছলাম দারচেনে। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল আমাদের কৈলাস পরিক্রমা। এখন সেই পরিক্রমা শেষ হ'ল। এর পর আমরা দারচেনের সীমা ছাড়িয়ে চল্‌লাম বরখার মাঠের উদ্দেশে। বিকেল নাগাদ বাংতুতে পৌঁছে আমাদের রাত্রিকালীন তাঁবু পড়ল। বাংতু আসবার পথে বরফ-গলা জলের নদী পার হওয়া এক কৌতুকপ্রদ ব্যাপার হয়েছিল। গাইড আমাদের এক একজন করে প্রত্যেককে পিঠে করে নিয়ে পার করে দিয়েছিল। তাতে সময় গিয়েছিল অনেকখানি। বাংতু জায়গাটি কিন্তু বড়ই সুন্দর লেগেছিল।

পরদিন সকলে খাওয়াদাওয়ার পাট সেরে বেলা ন'টা নাগাদ জব্বুর পিঠে

আমাদের মালপত্র চাপিয়ে ফের যাত্রা করলাম। এই সময় কৈলাসের কথা খুব বেশী মনে হচ্ছিল। সে স্মৃতি ভুলবার নয়। কৈলাস থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছি এ কথা ভাবতেই চোখে জল এসে পড়ছিল। তাই তখন আপন মনে কৈলাসপতির স্তবগান করতে করতে অগ্রসর হলাম।

মিকির আর চিতা

শ্রীপার্থ দে সরকার

আফ্রিকার সাভানা অঞ্চল পশুরাজ্যের বৈচিত্র্যে ভরপুর। বিস্তৃত, বিরাট প্রান্তর ছোট ছোট ঘাসে ঢাকা। আর এই ঘাসের মধ্যে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যের মত বড় বড় আবোয়াব গাছ। নীল জলরেখা সাভানার বুক দিয়ে কল কল করে বয়ে যাচ্ছে আর দূরে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে রুয়েনজারি আর এলগন পর্ব্বতমালা।

এই সুবিস্তীর্ণ বনে ঘুরে বেড়ায় অসংখ্য পশুপাখী। কেশর ঝামরে রাজার মত ঘুরে যায় সিংহ। চোরের মত শিকারের সন্ধান করে বেড়ায় চিতাবাঘ। হরিণ, জেব্রা আর জিরাফের দল ঘাস খেতে আসে। এই সাভানার এক অংশে কিভু লেক। লেকের একধারে থাকে বদ্‌মেজাজী চিতাবাঘটা। সিংহ ছাড়া কাউকে সে ভয় করে না। একবার ত' একটা গণ্ডারকেই আক্রমণ করে বসেছিল। তারই জন্যে আজও তার একটা পা খোঁড়া। কিন্তু গণ্ডারের উপর তার রাগ নেই। তার যত রাগ সব যেন জিরাফ-দলপতি মিকিরের উপর। নিজে সে খোঁড়া, ছুটে যে ধরবে সে ক্ষমতা নেই। কিন্তু বড় ধূর্ত্ত। চোট-খাওয়া বাঘগুলোই এই রকম ধূর্ত্ত হয়। মিকিরেরও তা অজানা নয়।

মিকির সেদিনও চরছিল তার দল নিয়ে হ্রদটার ধারে। হ্রদের জল জ্বলন্ত সূর্য্যের জ্বালা মেখে জ্বলে উঠে ঝিম্ ঝিম্ বাষ্প হয়ে কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। একদিকে বিস্তীর্ণ সাভানার প্রান্তর সুদূর যাযাবর যাত্রীর মত পায়ে পায়ে হারিয়ে গেছে রুয়েনজারি পাহাড়তলির তলায়। জিরাফদের মাথার উপর মাথা তুলে এদিকে ওদিকে এক একটা আবোয়াব গাছ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মিকির গলা উঁচু করে বলল, "শুন্‌ছ, হতভাগা চিতাটা নাকি এবার জিরাফদের দলের পেছনে ছুটছে না!"

"পারবে কেন জিরাফদের সঙ্গে ছুটে?" বল্‌ল আর একটা জিরাফ।

"উড়ুক্কু হরিণদের পেছনেও নয়!"

"তবে?"—এক সঙ্গে শুধাল জিরাফের দল।

"হতভাগা এবার হানা দিয়েছে মানুষদের দলে।"

"তাই নাকি!—বল কি—?"

কিন্তু কথা শেষ হ'ল না। হঠাৎ মাঠ কাঁপিয়ে শোনা গেল সিংহনাদ। মিকির

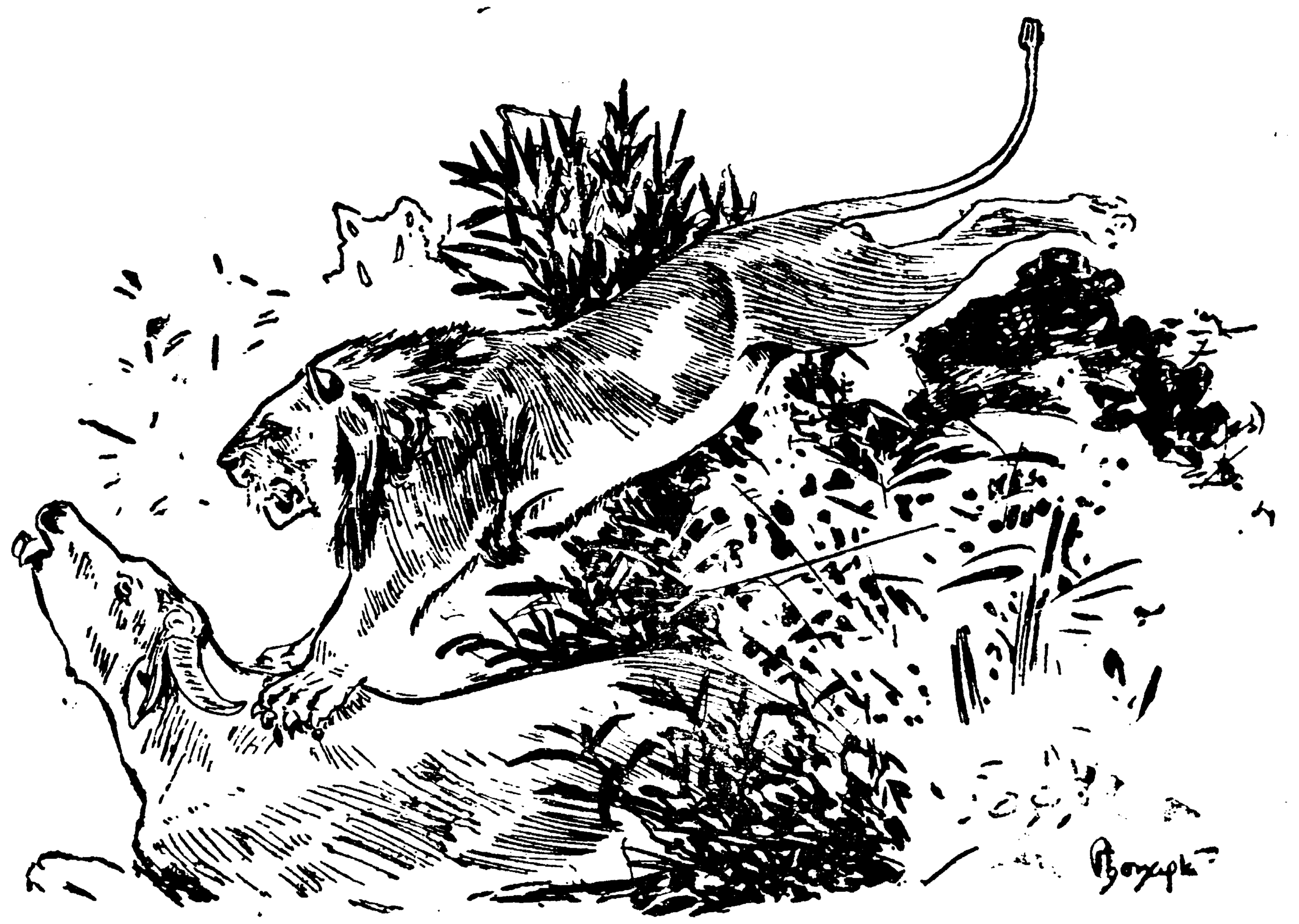

হরিণের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে।

দলের সবাইকে ছুটবার হুকুম দিতে গিয়ে থেমে গেল। সিংহ একটা হরিণের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, হরিণটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সিংহ। আজ তা হলে শিকারীর পেটভর্তি খাবার জুটেছে। আজ আর সিংহটা কিছু করবে না। মনে মনে মিকির ভাবে, সিংহগুলো তবু ভদ্র। কিন্তু ঐ খুনে চিতাটা? যত মারে তত যেন ওর লোভ বাড়ে!

এদিকে চিতাটার সারাদিন কোন শিকার জোটে নি। কিভু হ্রদের নীল জলের উপর একটা আবোয়াব গাছের ছায়ায় একটা কুমীর ঝিমোচ্ছিল। হঠাৎ একটা হরিণকে জল খেতে দেখে নিঃশব্দে ডুবে গেল। কিভুর নীল জল ঝিকমিক করে

উঠল। "না, আর না খেয়ে থাকা যায় না।" মনে মনে বলল চিতাটা, "ঐ ত' দূরে চরছে মিকিরের দল! একটা ছোট হরিণের দলও দেখছি এসেছে। যাক, দেখি একটা হরিণ মারা যায় কিনা।"

নিঃশব্দে উঠে চিতাটা চলতে লাগল। হরিণগুলো আনমনা হয়ে চরছে। আর কিছুটা গেলেই একটাকে ধরতে পারবে। কিন্তু হঠাৎ মিকিরের সাবধানী ডাক শোনা গেল। তবে কি ঐ লম্বা-গলা জিরাফটার চোখ এবারও সে এড়াতে পারে নি! ঐ ত' হরিণ-দলপতিও শুনেছে। দল নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে সে। খোঁড়া পা নিয়ে তো আর হরিণ ধরা চলে না। একটা ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে সারা বনভূমি কাঁপিয়ে দেয় চিতাটা। হুঁ, সে এবার দেখে নেবে ঐ লম্বা-গলা মিকিরটাকে। কী সয়তান! নিজে তো ধরা দেবেই না, হরিণগুলোকে শুদ্ধ বিগড়ে দিচ্ছে!

কিন্তু এমন বরাত তার কে জানত?

দু'-পেয়ে মানুষগুলো এসে জুটেছে এই অঞ্চলে। তাদেরই একটা ধরা পড়ে গেল চিতার থাবার নীচে।

আস্তানায় বসে তারই হাড় চিবোচ্ছে চিতা, আর ভাবছে, "মানুষগুলো নাকি বেজায় বুদ্ধিমান্! আমাদের ধরবার জন্যই নাকি এখানে এসেছে। কিন্তু, হুঁ-হু, চেনে না ত' চিতা জাতটাকে! এই ত' ওদের চোখের সামনে দিয়ে মেরে আনলাম এই দু-পেয়ে মানুষটাকে। হুম্ বাবা, চিতাদের সঙ্গে চালাকি!"

কিভু লেকের উপরে শীতের আমেজ এসেছে। পাখীতে ভরে গেছে লেকের জল। যেন হাট-বাজারি মেলা। মিকিরের দলও চরছে নিশ্চিন্তে। শান্তি নেই শুধু চিতাটার। আবার মিকিরের জন্যই তার মুখের গ্রাস পালিয়েছে। সে আজ দেখে নেবে মিকিরকে।

মিকির চিতার হাত থেকে আজ বাঁচিয়েছে জেব্রার দলটাকেও। একবার বাঁচিয়ে সে তার দল নিয়ে নির্ভাবনায় চরতে চরতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ একেবারে সামনে সাক্ষাৎ যমের মত বেরিয়ে এল চিতাটা। মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজের দলকে ছুটতে বলে মিকির চলে এল সকলের পেছনে। চিতাটা খোঁড়া পায়েই পাগলের মত তাড়া করেছে তাকে। আজ যেন খোঁড়া পায়েই সে হাওয়ার মত ছুটছে। আর কয়েক হাত গেলেই মিকিরের হাড়ে তার থাবা পড়বে। মিকির হঠাৎ সজোরে তার পিছনের পা চালিয়ে দিল। লক্ষ্য ভুল হয় নি। জিরাফের লাথি,—সিংহের থাবার মতই নাকি তার জোর! চিতাটা চোখে অন্ধকার দেখল। লাথিটা লেগেছে ঘাড়ে। চোট সামলে নিতে গিয়ে একটু পিছিয়ে পড়ল সে। কিন্তু না, সহজে ছাড়বে না সে আজ মিকিরকে। আবার সে পিছু নিল বিদ্যুৎ-বেগে।

প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ধনুক-ছাড়া তীরের মত ছুটে চলেছে দু'জনে। কে হারে কে-জেতে। তফাৎ শুধু এই যে চিতা যদি হারে তার শুধু অপমান, কিন্তু মিকির হারলে আর কোন দিন সে দেখবে না এই সাভানার প্রান্তরে জ্বলন্ত সূর্য্যের গলা সোনা আলো, আবোয়াবের মিষ্টি ছায়া আর শিশির-ভেজা নতুন ঘাসের সবুজ-উঁকি মুখ।

মিকিরের দলের আর সবাই তখন অনেক দূরে চলে গেছে। চিতার তাতে ক্ষোভ নেই। মিকির রয়েছে তার চোখের সামনে। এই মিকিরকে সে আজ ধরবেই। কিন্তু ঐ কি! পৃথিবী কি হঠাৎ দুলে উঠল! না হলে ছুটন্ত চিতার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়? এ কি, দেখতে দেখতে মাটীর নীচে—অনেক নীচে পড়ে গেল যে! ঐ ত' দূরে মিকিরের মাথাটা মিলিয়ে যাচ্ছে! তবে কি—তবে কি—?

হ্যাঁ, সত্যিই তাই। মানুষের ফাঁদে ধরা পড়েছে চিতা। দু'-পেয়ের বুদ্ধির কাছে সে এখন বন্দী।

চিতার ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে সারা সাভানা কেঁপে কেঁপে ওঠে। মানুষগুলো আসে বেরিয়ে। বন্দী চিতাটার সেই দিনের কথা মনে পড়ে। এদেরই একজনকে মেরে সে গর্ব্ব করেছিল। মানুষগুলো কিন্তু তাকে না বেঁধে তার ওপর বর্শা চালায়। মট্ মট্ করে দু'টো বর্শা ভেঙ্গে ফেলে সে। তারপর একবার ক্রুদ্ধ গর্জ্জন করেই ঢুলে পড়ে চিরদিনের মত। পশ্চিমে হেলে-পড়া জ্বলন্ত সূর্য্যের রশ্মিতে সমস্ত সাভানা লাল। মানুষের কাটা মাটির খাদটাও তখন লালে লাল হয়ে গেছে!

মিকির এখনও তার দল নিয়ে চরে, আর ভাবে—কোথায় গেল তার প্রধান শত্রু চিতাটা? মানুষগুলো কি খেয়েই ফেলল নাকি ওকে?

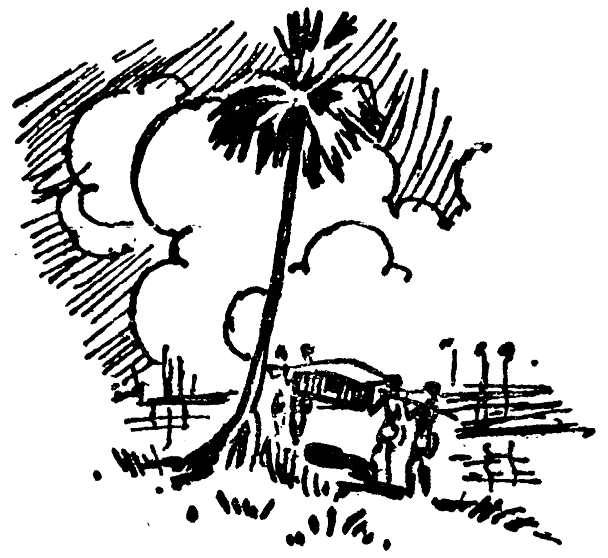

শ্রাবণ

শ্রীসুচেতা ভট্টাচার্য্য

ঘন কালো মেঘে শ্রাবণ-আকাশ
আঁধারে গিয়েছে ছেয়ে,
ধূসর, ধূমল কত রূপ তার
দেখি বাতায়নে চেয়ে।

সারি সারি তাল-তমালের ছবি
মুছে মুছে যায় দূরে,
বাবুই-শিশুরা আকুল নয়নে
ডাকিছে করুণ সুরে।
পথিক চলেছে দ্রুত ঘর পানে,
রাখাল ফেলেছে বাঁশী,
ঘন কালো রূপে রুদ্র আকাশ
হাসিছে রুদ্র হাসি।

ঝর ঝর ঝরে শ্রাবণের ধারা
অবিরল ধরাতলে,
কোন্ শ্যামলের পরশ লেগেছে
প্রকৃতির অঞ্চলে!
শ্রাবণ এসেছে, পাগল শ্রাবণ—
মরি মরি এ কি খেলা!
জলে আর জলে শুধু মাতামাতি
করে আজি সারা বেলা।

মনে ভাবি আজ নিভৃত কুঞ্জে
কোন্ সে স্বভাব-কবি
সাত রাজ্যের কল্পনা লয়ে
আঁকে শ্রাবণের ছবি।
আষাঢ় হয়েছে সমাপন, তবু
বরষা তো যায় নাই,
রেখে গেছে শুধু ভুমিকাটুকুই,
শ্রাবণ এসেছে তাই।

ঝরে বারিধারা তুমুল গরজে,
ডাকে ঘন ঘন দেয়া,
ভরা শ্রাবণের অপরূপ রূপ—
ফুটেছে কদম, কেয়া।
শ্রাবণ এসেছে, পাগল শ্রাবণ
আজি চরাচর ঘিরে,
আকাশে, বাতাসে, স্থলে, জলে
আর ফুলে, ফলে, তরুশিরে।

ম্যাজিক শেখ

যাদুরাজ এস, ডি, মুখার্জ্জী

— বিদেশী খেলা —

উইজার্ড্ ওয়াট্সন সাহেবের নাম তোমরা অনেকেই হয়তো জান না। ইনি জাতিতে অষ্ট্রেলিয়ান এবং একজন কৃতী যাদুকর। অষ্ট্রেলিয়ার ও আমেরিকার অনেক যাদুকর-প্রতিষ্ঠানের ইনি সভ্য ও আমার একজন অকৃত্রিম বন্ধু। আমার অনুরোধে তিনি তোমাদের জন্য কয়েকটি খেলার কথা লিখে পাঠিয়েছেন। তার মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে আজ আমি তোমাদের একটি খেলা শেখাব। তিনি আশা দিয়েছেন যে ভারতীয় ছেলেমেয়েরা যদি চায় তাহ'লে তিনি ভবিষ্যতে আরো নতুন নতুন খেলার কথা লিখে পাঠাবেন। আমিও তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছি তোমাদের তরফ থেকে।

ওয়াট্সনের এই খেলাটী হচ্ছে একটী ভবিষ্যৎবাণীর খেলা। খেলাটি এই রকম: প্রথমে এক খণ্ড কাগজ নিয়ে ১ থেকে ৮ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলো পর পর সমান ফাঁক দিয়ে লিখবে। তার পর দর্শকদের মধ্যে থেকে কাউকে ডেকে ঐ কাগজটি নিতে বলবে। এর পর (১) তাঁকে বলবে সমান ভাগে ঐ কাগজটিকে দুই টুকরো করতে ও এক ভাগের উপর অপর ভাগ উপুড় করে রাখতে। (২) এবার অপর একজনকে ডেকে ঐ কাগজ যোড়াটাকে আবার একবার ছিঁড়তে বলবে। তাহ'লে এখন তোমার সম্পূর্ণ কাগজটী চার ভাগ হয়ে গেল; তাই না? বেশ, এবার (৩) আবার ঠিক পূর্বের মত করে দুটি ছেঁড়া ভাগকে একত্রে রেখে আর একজনকে আর একবার ছিঁড়তে বলবে। তাহ'লে শেষ পর্য্যন্ত ঐ ৩য় দর্শকের এক এক হাতে চারটি করে নম্বর থাকবে। এখন তাঁকে বল, খুসী মত যে কোনও একটা ভাগ রেখে অন্য ভাগটা আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে ফেলতে। তার পর অপর ভাগটা খুলে একটার পর একটা যোগ করতে বল। দেখবে তাঁর যোগফল হবে ১৮।

উদাহরণ—(১) ৫+২+৪+৭—১৮
(২) ৬+১+৩+৮—১৮ ইত্যাদি।

খেলাটা তোমরা করে দেখ, তাহ'লেই বুঝতে পারবে উপরের উদাহরণের মত সংখ্যাগুলোই তাঁর হাতে থাকবে, এবং যোগফল হবে ১৮। ছেঁড়া টুকরোগুলো কিন্তু উপুড় করে রাখবার কথা ভুলো না। খেলাটিকে আরো ভাল করবার জন্য আমি বলি তোমরা একটা কাগজে পূর্ব্ব থেকে ১৮ লিখে খামে সীল করে রাখবে এবং ঐ খামটা খুলে পরে যোগফল মিলিয়ে নিতে বলবে। অথবা, ওয়াট্সন সাহেবের মত, হাতে সাবান গোলা জল দিয়ে তাতে ১৮ লিখে রাখতে হবে। যথা সময়ে পোড়া কাগজের ছাই ঐ হাতে ঘষলেই সে লেখা হাতে ফুটে উঠবে এবং সকলে অবাক্ হয়ে যাবে।

———

পুরানো পাতা

ক্যাল্‌কাটায়

৺সুবিনয় রায়

ভ্‌—অঁ—অঁ—প্‌! একটা প্রকাণ্ড লাল মোটর বাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়াল, আর অম্‌নি ভেতর থেকে একজন মোট্‌কা কোট-প্যাণ্ট পরা ভদ্রলোক মুখ বাড়ালেন। আমাদের চাকর রামা বাড়ীর রকের উপর দাঁড়িয়েছিল; ভদ্রলোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বেয়াড়া! ডেখো! মণিবাবু হ্যায়?"

রামা তো অত বড় মোটর দেখেই ঘাব্‌ড়ে গেছিল। তার উপর যখন ভদ্রলোক তা'কেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, তখন সে একেবারেই থতমত খেয়ে গেল; মুখে তার আর কথাই সর্‌লো না। ভাগ্যে আমি উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম, নইলে ভদ্রলোককে জবাবই দেওয়া হ'তো না। আমি তাড়াতাড়ি, "আজ্ঞে, আছি!" বল্‌তেই ভদ্রলোক উপরের দিকে তাকালেন।

ও হরি! এ যে আমাদের ক্লাস-ফ্রেণ্ড প্রমথেশ! কত কাল পরে যে দেখা হ'লো তার ঠিকই নেই। ছেলেবেলাই সে দিব্যি মোটা ছিল; এখন যেন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আরো হাতীর মত মোটা হয়েছে। ছেলেবেলাই রংটা যথেষ্ট কালো ছিল; এখন যেন তা'র চেয়ে দু'-তিন পোঁছ গাঢ় হয়েছে আর চেহারাখানা যেন আরো চিক্‌নাই হয়েছে। একে তো রংটা কুচ্‌কুচে কালো, তার উপর ধবধবে শাদা কোট-প্যাণ্ট প'রে চেহারাখানা খুলেছে বেশ। টক্‌টকে লাল মোটরের মধ্যে ধব্‌ধবে শাদা পোষাক পরা কুচ্‌কুচে কালো মোটা লোকটি মানাচ্ছিল ভাল। নিজেই মোটর চালাচ্ছে; সঙ্গে একজন চাপ্‌রাশী-গোছের লোক।

আমাকে দেখেই প্রমথেশ তড়াক্‌ ক'রে লাফিয়ে মোটর থেকে নাম্‌ল আর হাত বাড়িয়ে শেক্‌-হ্যাণ্ড ক'রে বল্‌ল, "কটকাল পড়্‌ যে ড্যাখা ভাই! ভাল আছ টো? ভাগ্যিস্‌ আগের বাড়ীটাটেই আছ; নইলে টো খুঁজে বেড় কড়াই ডায় হোটো। উঃ, টোমাডেড় ক্যাল্‌কাটায় গড়মের চোটে টেকাই ডায়! কোঠায় হণ্ডুড়াস, গোয়াটেমালা, ভেনেজুয়েলা—কোঠায় ক্যালকাটা!"

তখন বেলা প্রায় তিনটা। বিকালে মোহনবাগানের ম্যাচ্‌ দেখ্‌তে যাবার ইচ্ছা আছে। প্রমথেশকে জিজ্ঞাসা করলাম, "খেলা-টেলা দেখার সখ আছে তো? চল না ভাই, আজ মোহনবাগানের ম্যাচ্‌টা দেখে আসি। এখানেই চা খেয়ে নাও, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।"

প্রমথেশ বল্‌ল, "না ভাই, গাড়ীখানা ডাডা চেয়েছেন; টাঁকে চাড়টার মধ্যে গাড়ী ফেড়ট্‌ ডিটে হবে। এখন আসি ভাই. পড়ে সব কঠাবার্ট্টা হবে। আমাড় বাড়ীর ঠিকানাটা নাও না কেন? গড়ীবেড় বাড়ীটে পডার্পণ কড়বে টো? ঠিকানাটা হচ্ছে—গোয়াটেমালা ম্যান্সন্স্‌, ১৬নং লিণ্ড্‌লি ষ্ট্রীট।—চল্‌লাম ভাই!"

আমি বাধা দিয়ে বল্‌লাম, "তা' হচ্ছে না ভাই! এতকাল পরে দেখা, একটু থেকে যেতেই হবে। কথাবার্ত্তা তো কিছুই হ'লো না!"

প্রমথেশ বল্‌ল, "টা ভাই, এক কাজ কেন কড় না? টুমিই না হয় চট্‌ ক'ড়ে কাপড়-চোপড় পড়ে এস না! আমার বাড়ীটে চা খেয়ে, বাসে চ'ড়ে খেলা ডেখ্‌টে যাওয়া যাবে। পঠে গপ্প-সপ্পও হবে। আমাড় যে ভাই টাইম নেই একটুও; টাই টোমায় ঢড়ে টান্‌ছি:—এনগেজ্‌মেণ্ট্‌—এনগেজ্‌মেণ্ট্‌—এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্‌!"

অন্য উপায় না দেখে আমি চট্‌ ক'রে জামা-জুতো প'রে প্রমথেশের "লা-সাল্‌" গাড়ীতে চড়ে রওয়ানা হয়ে পড়্‌লাম। পথে গল্প-স্বল্প চলল। কেমন ক'রে প্রমথেশ তার মেজোমামার আপিসে এক ব্রেজিলিয়ান সাহেবের সঙ্গে আলাপ কর্‌ল, কেমন ক'রে সেই সাহেব তা'কে একটা মস্ত বড় রবার ব্যবসায়ীর দালাল নিযুক্ত কর্‌ল, কেমন করে সে তা'দের পয়সায় দক্ষিণ আমেরিকায় গেল; সেখানে কত ঝড়, 'টর্ণেডো', 'টাইফুন', 'হারিকেন', কত জাহাজডুবি, কত পাইরেটের পাল্লায় পড়া, রীতিমত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ, সাঁতার কেটে রক্ষা পাওয়া, বিরাট এনাকোণ্ডা অজগরের সঙ্গে যুদ্ধ, পাটাগোনিয়ার ভীষণ জঙ্গলে প্রাণ হাতে নিয়ে চলা, হণ্ডুরাস, ভেনেজুয়েলায় কত রকমের এ্যাড্‌ভেঞ্চার ইত্যাদি সবই সংক্ষেপে ব'লে নিল। শেষটায় বল্‌ল, "ন্যাষ্টি ক্যাল্‌কাটা! ও সব ডেশে ঠেকে এ ডেশে এলে হাঁপিয়ে মড়্‌টে হয়। এ ডেশের লোকে ষ্টাইল জানে না; কঠা বল্‌টে একশো গণ্ডা উচ্চাড়ন ভুল কড়ে—এক্সকিউজ্‌ মী, ছ' বছর পড়ে বাংলা বলা—বুঝটেই পাড়!"

কথা বল্‌তে বল্‌তে মোটর এক প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড্‌ওয়ালা বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়াল। প্রমথেশ নেমেই আমাকে ডাক দিল, "এসো ভাই, একটু ব'সো; আমি চট্‌ ক'ড়ে বেঙ্গলী ড্রেস্‌ পড়ে আসি;—মোহনবাগানেড় ম্যাচ্‌।"—ব'লেই সে আমাকে প্রকাণ্ড ড্রয়িং রুমে বসিয়ে বাড়ীর ভেতরে চ'লে গেল। আমি চারিদিকের জিনিষপত্র অবাক্‌ হ'য়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। ঘরটি সাজাবার কায়দা আছে বটে!

দশ মিনিট পর সে 'বেঙ্গলী ড্রেস্' প'রে এসে হাজির। পায়ে ফিনফিনে সিল্কের মোজা, একজোড়া সাপের-চামড়ার লপেটা, পরনে শান্তিপুরে ধুতি, সিল্কের শার্টের উপর একটা সিল্কের কোট চড়ান; হাতে সুন্দর একটি সিল্কের ছাতা।

তার পেছন পেছন চাকর চা এনে হাজির কর্‌ল। রূপোর টি-সেট্, রূপোর প্লেটে জলখাবার, চমৎকার এনামেলের ট্রে; সবই চমৎকার।

জলখাবার খেয়ে আমরা রওয়ানা হ'য়ে পড়্‌লাম; প্রমথেশের মোটর আমাদের বাস্ পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে গেল। বাসে উঠেই প্রমথেশ বলল, "এ ড়কম ডার্টি, রিকেটি বাস্ হণ্ডুড়াস্, গোয়াটেমালাড় ড়াষ্টায় চলুক ডেখি—সেখানকাড় নেটিভ্‌ড়া পর্য্যন্ট ক্ষেপে বাসেড় ডফা ড়ফা কড়্‌বে! সেখানেড় ফুটবল গ্রাউণ্ডেড় ভিড়ও কি সাংঘাটিক—এখানেড় ভিড় টো টাড় কাছে ছেলেখেলা!"

আমি বল্‌লাম, "সে সব দিন আর নেই হে আজকাল! একবার চল না বাপু, ঠেলাখানা বুঝ্‌বে। প্রাণটি নিয়ে বাড়ী ফের, তার পর ব'লো।"

প্রমথেশ বল্‌ল, "ড়েখে ড্যাও টোমাড় ভিড়! সাম্‌লে যাড়া পঠ্ চল্‌টে পাড়ে না, টাড়াই ও ড়কম বলে। হণ্ডুড়াস্, গোয়াটেমালা, প্যারাগুয়ে, ব্রেজিল ঘুড়ে এসে শেষটায় কিনা ক্যাল্‌কাটার ভিড়ে জব্‌ড কড়্‌বে?—আড় হাসিও না ডাডা!"

কথা বল্‌তে বল্‌তে বাস্ ড্যালহাউসি স্কোয়ারের কাছে এল; আমরাও নেমে পড়্‌লাম। ততক্ষণে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বেশ জোর বৃষ্টি নেমেছে। আমি আমার ছাতা খুল্‌লাম; প্রমথেশও ছাতার হ্যাণ্ডেলের কাছের একটা বোতাম টিপে দম্ ক'রে ছাতাটা খুলে ফেল্‌ল। একখানা ছাতার মত ছাতা বটে!

বৃষ্টির দরুণ রাস্তার ধারের বারান্দাগুলির নীচে বেজায় ভিড়; আমরাও সেই ভিড়ের সঙ্গে চ'লেছি; সকলেই ময়দানে চ'লেছে। একটি লম্বা অমায়িক-গোছের লোক্ প্রমথেশের পাশে হেঁটে চ'লেছে; তার সঙ্গে ছাতা নেই। বেচারা বার বার এদিক্ ওদিক্ চেয়ে দেখ্‌ছে, কেউ তাঁকে ছাতার নীচে আস্‌তে বলে কিনা। বিশেষ ভাবে সে প্রমথেশের দিকে দেখ্‌ছে।

একটু বাদে প্রমথেশ বল্‌ল, "আসুন না ছাটাড় নীচে!" লোকটিও তখনি মাথা নীচু ক'রে প্রমথেশের ছাতায় ঢুকে গেল। প্রমথেশও হাত উঁচু ক'রে ছাতাটা উঁচু ক'রে ধর্‌ল। লোকটি তখন বল্‌ল, "আপনি এত কষ্ট করে ছাতা ধর্‌বেন কেন, আমিই না হয় ছাতা ধরি"—বলে সে ছাতাখানা নিজের হাতে নিল।

ভিড় ক্রমেই বাড়্‌তে লাগ্‌ল; শেষটায় একেবারে ঠাসাঠাসি হয়ে চল্‌তে লাগ্‌লাম। প্রমথেশ কখন যে পেছনে পড়েছে জানিও না; হঠাৎ তাকিয়ে দেখি সে

আর এক ভদ্রলোকের ছাতার নীচে। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "তোমার ছাতা কই?" প্রমথেশ একবার পাশের ভদ্রলোকের দিকে তাকাল, একবার তাঁর ছাতার দিকে তাকাল, একবার পিছনে তাকাল; তার পর একেবারে বোকার মত বল্‌ল, "ছাতা?!"

আমি ভাব্‌লাম, "এবার পথে এস বাবা! বিপদে পড়ে আর 'ছাটা' বের হলো না মুখ দিয়ে!"

সাম্‌নে, পেছনে, পাশে—কোথাও সেই অমায়িক লম্বা ভদ্রলোককে আর দেখা গেল না; ছাতাটিও দেখা গেল না। কি আর করা যায়? ম্যাচের সময়ও তো হয়ে আস্‌ছে; কাজেই, এগিয়ে চলা ছাড়া আর উপায়ও নেই।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভিড় ঠেলে আমরা খেলার মাঠে পৌছালাম। সেখানে দেখি, লোকে লোকারণ্য; টিকিট-ঘরের কাছে যাওয়াই দায়। প্রমথেশকে বল্‌লাম, "কেমন দেখ্‌ছে হে?" প্রমথেশ বল্‌ল, "ইকুয়েডড়েড় ভিড়ের কাছে লাগে কোঠায়?"

আমি বল্‌লাম, "তবে ভাই, টিকিট দুটো তুমিই কিনে আন না!"

প্রমথেশ কোন উচ্চবাচ্য না ক'রে টিকিট-ঘরের দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

কিন্তু, কাছে যায় কা'র সাধ্য? যেমন ভিড়ের ঠেলা, তেমনি কাদার চপ্‌চপ্যানি—একেবারে যেন আঠার মত জুতো টেনে ধর্‌ছে। প্রমথেশের পায়ে আবার লপেটা জুতো—বহুমূল্য এনাকোণ্ডা অজগরের চামড়ায় তৈরী, জুতোর তলাটা খাঁটি ব্রেজিলিয়ান 'পারা' রবারের তৈরী। সে জুতো একেবারে শিরিষের আঠার টানের মত কাদায় বস্‌তে লাগ্‌ল। এমন সময় হঠাৎ পিছন দিক্ থেকে চার-পাঁচ জন বেজায় মোটা লোক দে ধাক্কা দে ধাক্কা করে এগিয়ে এল; সঙ্গে সঙ্গে প্রমথেশও ঠেলা খেয়ে একেবারে টিকিট-ঘরের কাছে পৌছে গেল—যাক! কিন্তু, এদিকে যে বেচারার এক পাটি জুতো কাদার মধ্যেই রয়ে গেল সে কথা তো আর বলা হয় নি! পিছনের লোকগুলির পায়ের চাপে সে জুতো যে কোথায় অতল কাদায় তলিয়ে গেল তার আর ঠিকানা নেই।

কোন রকমে দু'খানি টিকিট কিনে তো প্রমথেশ বেরিয়ে এল। তার এক পায়ে জুতো আর এক পায়ে শুধু মোজা! কাপড়ে কাদা, কোটের পকেট দুটিই ছিঁড়ে গেছে, চুল উস্কো-খুস্কো।

এক পাটি জুতোর মায়ায় সে একবার চেষ্টা কর্‌ল টিকিট-ঘরের কাছে যেতে—কিন্তু যায় কার সাধ্যি? লাভের মধ্যে এক পায়ের মোজা গেল কাদায় একেবারে নষ্ট হয়ে।

বেচারা তখন আর করে কি? বুদ্ধিমানের মত মোজা-জোড়া খুলে ফেলে দিল; এক পাটি জুতোরও মায়া ত্যাগ করে সেইখানেই ছেড়ে রেখে দিল। এনাকোণ্ডা-অজগরের চামড়া তো আর এদেশে মিল্‌বার জো নেই! জুতোর জোড়া বানাবে কেমন করে?—যাক্ গে সে কথা!

এবার ভিতরে ঢোকার পালা। আমি তো আগে থেকেই মালকোছা মেরে; আস্তিন গুটিয়ে প্রস্তুত। প্রমথেশ বেচারা ঘেমে ঝুল; কোটের বোতাম খুলে, শার্টের গলার বোতাম খুলে, সেও মালকাছা মেরে নিল। বেচারার খালি পা দেখে আমি বল্লাম, "আমার জুতো পরে দেখ না; হয়তো পায়ে হতেও পারে। আমার খালি-পায়ে চলার অভ্যাস আছে ঢের।" প্রমথেশ বল্‌ল, "হাণ্ডুড়াস, গোয়াটেমালায় কট কষ্ট কড়েছি ম্যাচ ড্যাথার জন্য; টাড় কাছে এ টো ছেলেখেলা! খালি পায়ে চলাটে আড় কষ্ট কি?"

এই কথা বলে সে গেটের ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল। আমি পিছন পিছন চল্‌তে লাগ্‌লাম। একটু এগিয়েই প্রমথেশ ছু'-চার ঠেলা দিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল; আমি রোগা মানুষ, একটু পেছিয়েই রইলাম। তারপর খানিকক্ষণ যে কি ঘট্‌ল ঠিক গুছিয়ে বলা শক্ত। মোট কথা, ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি, ধস্তাধস্তি, মারামারি, গালাগালি, গুঁতোগুতি, চাপাচাপি, খোঁচাখুচি, তার সঙ্গে আগে যাবার নানা রকম চেষ্টা, পিছনে হট্‌বার চেষ্টা কত রকমে যে চল্‌তে লাগ্‌ল তা আর বলা যায় না! ডাইনে, বাঁয়ে, আগে, পিছনে,—সর্ব্বত্রই এই চেষ্টা;—এমন কি ছু'-একজন ঠেলার চোটে শূন্যে উঠে মাথার উপরও সে সব চেষ্টা চালাতে লাগ্‌লেন। একজন তো আর কিছু সাম্‌নে না পেয়ে প্রমথেশের কোটের ঘাড় ধরেই ঝুলে রইল! ছু'-একবার শুন্‌লাম প্রমথেশ চেঁচাল, "উঃ! পায়ে মাড়াচ্ছেন কেন?" আরেকবার চেঁচাল, "উঁ হু—হু! কল্‌কেতার লোকগুলো কি অভদ্র! পা জোড়া কি দেখ্‌তেও পায় না?"—এবার আর ক্যালকাটা নয়, একেবারে কল্‌কেতা বেরিয়েছে মুখ দিয়ে!

তার পর হঠাৎ বন্যার মত এক ধাক্কা এল। কেউ গেল ছিট্‌কে গেটের দিকে, কেউ রইল পিছনে পড়ে; কেউ আবার মাটিতে লম্বা;—তাদের মধ্যে প্রমথেশও একজন। আমি ছিলাম 'পিছনে পড়া'র দলে। তার পরমুহূর্ত্তেই গেট বন্ধ হয়ে গেল—আর জায়গা নেই। যাক্! খেলা দেখা তো চুলোয় গেল, এখন প্রমথেশকে তোলা যাক্।

আমি ধর্‌বার আগেই সে উঠে পড়েছে। বেচারার কোট যে কোথায় গেছে তার পাত্তাই নেই। পকেটে এনাকোণ্ডার চামড়ার বহুমূল্য পার্স ছিল, তার মধ্যে গোটা ৫।৭ টাকাও ছিল,—তারও পাত্তা নেই। শার্ট গেছে ছিঁড়ে, কাদা মাখামাখি হয়ে—ধুতির অবস্থাও তাই। চেহারাখানা ঠিক ভূতের মত হয়েছে। পাঁচ মিনিট খোলা হাওয়ায় একটু নিশ্চিন্ত হয়ে জিরিয়ে নিয়ে সে বল্‌ল, "হণ্ডুড়াস্, গোয়াটেমালা, ইকুয়েডড়, প্যাড়াগুয়ে, ব্রেজিলের, লোকডেড় টুলনায় ক্যাল্‌কাটাড় লোকেড়া অভদ্র, ইটড়, চাষা।"*

---

* ৫ম বর্ষের (১৩৩৮) রামধনু থেকে পুনর্মুদ্রিত।

মেঘনাদ

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

৩

পুলিশের সদর অফিস।

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে কতদিন ইন্দ্রনীল গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। ভয়, কৌতূহল এবং কিছুটা সম্ভ্রমও হয়তো ছিল তার মধ্যে। ওর ভিতরকার রহস্য নিয়ে নানা কল্পনাও করেছে মনে মনে। কিন্তু এরই ভেতর যে শেষ পর্যন্ত তাকেও একদিন ধরে আনা হবে তা সে স্বপ্নেও ভাবে নি।

সমস্ত বাড়ীটায় একটা ছিম্‌ছাম্ ভাব। যেন ঘড়ির কাঁটার মতই সব কিছু চলছে নিখুঁত ভাবে। তবে থেকে থেকে ভারী বুটের শব্দ বারান্দা বা সিঁড়ির থম্‌থমে আবহাওয়াটাকে একটু সচকিত করে তুলছে এই যা!

ইন্দ্রনীল শুনল তাকে বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। কিন্তু তিনি আপিসে নেই, কি একটা জরুরী কাজে বাইরে গেছেন। ফিরতে দেরী হবে।

প্রায় পাঁচ ঘণ্টা চুপ্‌চাপ্ একটা বন্ধ ঘরে নজরবন্দী হয়ে থাকার পর অবশেষে তার ডাক পড়ল বড় কর্তার ঘরে।

সুসজ্জিত ঘরে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি লিখছিলেন তিনি, ইন্দ্রনীলকে দেখে ইসারায় বসতে বললেন। ইন্দ্রনীল দেখল—দাড়িগোঁফ কামানো, ছিপ্‌ছিপে চেহারার একটি দীর্ঘকায় লোক। বয়স খুব একটা বেশী নয়—হয়তো সবে চল্লিশ ছাড়িয়েছে। ইতিপূর্বে-দেখা অফিসারদের সঙ্গে কোথায় যেন এঁর একটু অমিলও আছে মনে হ'ল।

বড় কর্তা ফের কি ইঙ্গিত করলেন। যারা সঙ্গে করে এনেছিল তারা স্যালিউট্ ক'রে চলে গেল। ঘরে রইল শুধু ইন্দ্রনীল আর বড় সাহেব।

বড় সাহেবই কথা সুরু করলেন এবং অত্যন্ত সহজ ভাবেই।

"আপনিই মিষ্টার রায় ?—ইন্দ্রনীল রায় ?"

ইন্দ্রনীল ঘাড় নাড়ল। তার হতভম্ব ভাব তখনও যায় নি।

"আপনাকে এখানে কেন ডেকে আনা হয়েছে জানেন বোধ হয় ?"

"আজ্ঞে না। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না !"

বড় সাহেব টেবিলের ওপরকার কাগজের স্তূপ থেকে ৪।৫ খানা খবর-কাগজ টেনে বার করলেন। ইন্দ্রনীলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "দেখুন, চিনতে পারেন ?"

ইন্দ্রনীল কাগজগুলির দিকে একবার তাকিয়েই চমকে উঠল।—"এ কি, এ যে সবই আমার ছবি ! কিন্তু আমি—আমি—"

বড় কর্তা হাসলেন। বললেন, "হ্যাঁ, আপনারই ছবি, কিন্তু আপনার নয়। অন্ততঃ আমার তাই মনে হচ্ছে। ভাল করে দেখুন তো।"

ইন্দ্রনীল তীব্রদৃষ্টিতে একখানি একখানি ক'রে সব ক'খানি ছবি খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। এত খুঁটিয়ে যে ছবির ওপরে-নীচে কি লেখা আছে তা তার কাছে নিতান্ত ঝাপসা মনে হ'ল,—তা পড়বার চেষ্টাও করল না সে। বেশ খানিকক্ষণ দেখে, অবশেষে কাগজগুলি ঠেলে দিয়ে সে বলল, "আমারই ছবি মনে হচ্ছে। কিন্তু এ রকম পোষাক তো আমার নেই ! এমন পোষাক তো আমি দেখিও নি এর আগে ! কি ক'রে হ'ল ? আশ্চর্য !" তার কণ্ঠস্বরে একটা অকপট ভাব ফুটে উঠল।

বড় কর্তা মৃদু মৃদু হাসছিলেন। বললেন, "এ রকম শুনেছি বটে, কিন্তু চোখে দেখার সুযোগ এই প্রথম হ'ল। শুনেছি কোন কোন যমজ ভাইএর মধ্যে এই রকম চেহারার আশ্চর্য মিল থাকে। কিন্তু আপনার তো কোন ভাই-ই নেই। বুঝতেই পারছেন, আপনার সম্বন্ধে যা কিছু কন্‌ফিডেনশিয়াল্ মানে গোপনীয় খবর আমরা সংগ্রহ করছি, নইলে এখানে বসে এ ভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলতাম না। কিন্তু বড় ভয়ানক লোকের সঙ্গে আপনার চেহারার মিল বেরিয়েছে, ইন্দ্রনীল বাবু ! কাগজগুলো ভালো করে একটু পড়ে দেখুন, তা হ'লেই বুঝবেন। কী ভয়ানক কাণ্ড বলুন তো ?"

এতক্ষণ পরে ইন্দ্রনীল মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে কাগজগুলোর দিকে ভালো করে নজর দিল। ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী—নানা কাগজ। সবগুলিতেই সেই ছবি ছাপা হয়েছে। ছবির আশেপাশে যে বিবরণ রয়েছে তাতে জানা গেল ঐ ছবি যার সে হচ্ছে একজন আন্তর্জাতিক দুর্বৃত্ত। অত্যন্ত দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক। কোন্ দেশে তার বাড়ী, কোথায় সে থাকে, কি করে—কেউ তা জানে না। এমন কি তার আসল নামও কারো জানা নেই। তাই ইয়োরোপের পুলিশ তার নাম দিয়েছে 'মিষ্ট্রী-ম্যান্'—রহস্য-মানব। সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ এই মিষ্ট্রী-ম্যানের দাপটে অস্থির হয়ে ছিল। কখন কোথায় যে কি মূর্তি নিয়ে

তার আবির্ভাব হবে, কী ভয়ানক কাণ্ড সে করে বসবে কেউ বলতে পারত না। ধরা তো দূরের কথা ! ও-দেশের অমন শিক্ষিত পুলিশও এই লোকটির পাল্লায় পড়ে হিমসিম খেয়ে গেছে। সম্প্রতি নাকি ইয়োরোপ ছেড়ে এই মহাপ্রভু ভারতে এসেছেন। অন্ততঃ এই রকম সন্দেহ করা হচ্ছে। লোকটিকে ধরতে না পারলেও কোন্ এক অজ্ঞাত মুহূর্তে তার একখানা ফটো ও-দেশের পুলিশের হাতে এসে পড়েছিল। তাই তারা এ-দেশের প্রত্যেক প্রদেশে প্রদেশে পুলিশ বিভাগে তার একটি করে কপি পাঠিয়ে দিয়েছে। এখানকার পুলিশ আবার সেটা পাঠিয়েছে বিভিন্ন খবরের কাগজের আপিসে—জনসাধারণকে সাবধান করার জন্য। শুধু তাই নয়, ঐ লোককে ধরিয়ে দিতে পারলে হাজার পাঁচেক টাকার একটা পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে তাতে। তাই আজকের সব কাগজে ঐ ছবি।

ইন্দ্রনীল কাগজ থেকে মাথা তুলতেই বড় সাহেব বললেন, "কাগজে ছবি বেরোবার পরই নানা জায়গা থেকে রিপোর্ট্ আসতে লাগল। জানি না পুরস্কারটাই ওর আসল টোপ কিনা। যাই হোক্, অমুক আপিসের অমুক বাবুই যে এই মিষ্ট্রী-ম্যান্, কিংবা আমেরিকানদের ভাষায় জনগণের এনিমি নাম্বার ওয়ান্—পয়লা নম্বরের শত্রু,—এ খবর পেতে আমাদের বেশী সময় লাগল না। তার পরের ঘটনা তো দেখতেই পাচ্ছেন। যাই হোক, খোঁজ-খবরের পর আমাদের হাতে এখন যে সব তথ্য এসেছে তাতে আপনার, ঐ লোকটির সঙ্গে চেহারার মিল ছাড়া, অন্য কোন অপরাধ পাই নি। তবে এটাও একটা বড় অপরাধ বই কি।" ব'লে হো-হো করে হেসে উঠলেন বড় সাহেব। তার পরেই বললেন, "যাক্, এবারে আপনার ছুটী। ওহো, অনেকক্ষণ তো আটকে রেখেছি আপনাকে ! একটু—" বলেই কলিং বেলে আঙ্গুল চাপলেন তিনি।

আরদালী এসে সেলাম জানাল, এবং বড় সাহেবের ইঙ্গিতে একটু পরেই প্লেট ভর্তি কেক আর টিপট্ ভর্তি চা এনে রাখল।

"নিন, সুরু করুন।" ব'লে বড় সাহেব আরদালীর দিকে চেয়ে বললেন, "আমার জন্যও এক কাপ্ ঢালো।" তার পর আবার ইন্দ্রনীলের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, "গরম চা—হট্ টী তো আপনার হট্ ফেভারিট্, নয় কি ? আমার-ও।"

(ক্রমশঃ)

পশ্চিম দিগন্তে

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

—সোমনাথ—

ভালকা থেকে সোমনাথ, টাংগায় যেতে আধঘণ্টার বেশী সময় লাগে না।

প্রথমেই অহল্যাবাঈয়ের মন্দির।

এখানে তখন সোমপুরা দুর্গ ছিল। ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাঈ এখানেই সোমনাথের নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেন অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে। এই মন্দিরটি তৈরী করতে লেগেছিল পাঁচ বছর। মন্দিরটি দোতলা। বরাবর মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলে দর্শক উপরের তলেই গিয়ে পড়বে। সেখানে অহল্যেশ্বর শিবলিঙ্গ। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে হবে নীচে। ভূগর্ভের একটি তলে সোমনাথ লিঙ্গ। বার বার বিধর্মীদের হাতে দেববিগ্রহ ধ্বংস হওয়ায় অহল্যাবাঈ এই কৌশলটুকু অবলম্বন করেছিলেন বলে মনে হয়। না হলে, আসল মন্দিরে অহল্যেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে ভূগর্ভের মন্দিরে সোমনাথ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করার কোন অর্থ হয় না।

অহল্যাবাঈ-মন্দির থেকে কিছু দূরেই সাগরতটে সোমনাথের মন্দির।

চন্দ্রদেবের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ সোমনাথ। চন্দ্রের এক নাম তো সোম!

সোমনাথ লিঙ্গের বিবরণ আছে স্কন্দপুরাণে: ডিম্বাকার ছোট্ট স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ। সূর্য্যের মত জ্যোতির্ময়। একটি সাপ এটিকে চক্রাকারে বেষ্টন করে আছে। লিঙ্গটি ভূগর্ভে প্রোথিত।

অবশ্য ইতিহাসের কোথাও এ পরিচয় নেই। মামুদ যে মূর্তি ভগ্ন করে তা যদি ছোট্ট ডিম্বাকার মাত্র হ'তো তাহলে তার মধ্যে লাখ লাখ টাকার হীরা, জহরৎ পাওয়া যেতো না। সে শিবলিঙ্গ নিশ্চয়ই বিপুল—বিশাল ছিল।

সোমনাথের এই মন্দির দু'হাজার বছরের পুরানো।

ভারতের পশ্চিমে যখন ব্যাকৃটি্রয় গ্রীক (বহ্লিক) ক্ষত্রপেরা রাজত্ব করতেন, তখন তাঁদের অনেক রাজা শিবের উপাসনা করতেন। ইতিহাসে সে প্রমাণ আছে। সম্ভবতঃ সোমনাথের পাশুপাত ব্রাহ্মণেরা তাঁদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

তখনকার দিনে শৈব যোগীদের কাছে সোমনাথ ছিল মহাতীর্থ। তারও বহু আগে থেকে এখানকার সাধকেরা নিজেদের পশুপতির উপাসক 'পাশুপাত ব্রাহ্মণ' বলে পরিচয় দিতেন। শিবের পূজা করে সিদ্ধিলাভ করার এক নিজস্ব উপাসনা-পদ্ধতিও

তাঁদের ছিল। সে পূজা-পদ্ধতির বিশেষ ব্যাখা করেন সাধক নকুলীশ। সেই ব্যাখা পাশুপাত দর্শন নামে খ্যাত। পাশুপাত দর্শনে জীবগণ 'পশু' আর জীবের অধিপতি বলেই মহাদেব 'পশুপতি'। মহাদেবের উপাসনা করলেই 'পশুরা' মুক্তি পাবে। এই উপসনা করার পদ্ধতি দুটি—ব্রত ও দ্বার। ব্রত হলো ত্রিসন্ধ্যা গায়ে ছাই মাখা, ছাইয়ের উপর শোওয়া, মহাদেবের গুণ গান করা, মহাদেবের নামে নৃত্য করা, মহাদেবকে প্রণাম করা ও শিব নাম জপ করা। দ্বার হলো সত্যরক্ষা ও সত্যভাষণ। পাশুপাতেরা নানা রকম তন্ত্রসাধনাও করতেন। সে সাধনা 'সোমবিদ্যা' নামে প্রচলিত ছিল। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে সোমবার যদি অমাবস্যা হয়, তাহ'লে সেদিন সরস্বতী নদীতে স্নান করে সোমনাথের পূজা করলে যা কামনা করা যাবে তাই সিদ্ধ হবে।

সোমনাথের মন্দির প্রথম আক্রান্ত হয় সপ্তম শতকে। আরবেরা সিন্ধুদেশ জয় করে ভগুকচ্ছ, গুর্জ্জর দেশ, উজ্জয়িনী মাড়োয়ার ও মালব পর্য্যন্ত এগিয়ে আসে। সেই সময় সোমনাথের মন্দিরটি তারা ধ্বংস করে। পরে আবার নতুন মন্দির তৈরী হয়।

তারই শ' আড়াই বছর পরে গজনীর মামুদ সোমনাথ আক্রমণ করে ১০২৬ খৃষ্টাব্দে। প্রথম যুদ্ধে মামুদ হেরে যায় কিন্তু ফিরে যায় না। তৃতীয় দিন আবার পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ করে। সে আক্রমণ প্রতিরোধ করেন সোমপুরী দুর্গের দুর্গেশ মাণ্ডলিক। পঞ্চাশ হাজার সেনা মন্দির রক্ষার জন্য প্রাণ দেয়। কিন্তু শেষ অবধি মামুদই জয়ী হয়। মামুদের হিন্দু মন্ত্রী জানিয়ে দেয় যে সোমনাথ লিঙ্গের মধ্যে প্রভূত ধনরত্ন আছে। মামুদ শিবলিঙ্গ চূর্ণ করে সেই সব ধনরত্ন লুঠ করে। শেষে মন্দিরটি ভস্মীভূত করে ফিরে যায়।

হিন্দুরা আবার মন্দির তৈরী করে। কিছুদিন পরে মুসলমান পর্য্যটক আলবেরুণী এ দেশে এসে সোমনাথের পূর্ব গরিমা অক্ষুণ্ণ দেখে বিস্মিত হন। কিছুদিন আগে মামুদের যে অত বড় অনাচার ঘটে গেছে, তার লেশ মাত্র নেই। আলবেরুণী লিখে গেছেন—'সোমনাথ বিরাট সহর। আমাদের মক্কা যেমন, তেমনি সাগরতীরে হিন্দুদের এটি একটি মহাতীর্থ।'

নতুন মন্দির তৈরী হয়েছিল বটে, কিন্তু আগের মত সুন্দর হয় নি। সে জন্য পুরোহিতদের মনে একটা ক্ষোভ ছিল। ইতিমধ্যে একদিন সুযোগ এসে গেল। মহারাজ কুমারপাল এলেন সোমনাথের পূজা দিতে। সোমনাথের মুখ্য পুরোহিত মোহান্ত ভব-বৃহস্পতি মহারাজকে বললেন—মহারাজ, এখানে এমন এক মন্দির করে দিন, যা কৈলাসশিখরের মত মাথা উঁচু করে সোমনাথের মহিমা প্রচার করবে। আপনার তো সমৃদ্ধির অভাব নেই, সোমনাথের আশীর্বাদে সে সমৃদ্ধি শত গুণ বৃদ্ধি পাবে।

মহারাজ কুমারপাল সম্মত হলেন। ভব-বৃহস্পতি সু-উচ্চ মন্দির তৈরী

করালেন। মন্দিরের চূড়া সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিলেন। বিরাট এক নাটমণ্ডপ তৈরী করালেন। পানীয় জলের জন্য দীর্ঘিকা খনন করালেন। মন্দিরকে সুরক্ষিত করার জন্য সোমপুরী দুর্গপ্রাকারকে আগের চেয়ে মজবুত করলেন। মন্দিরের নাম দিলেন মেরুপ্রাসাদ। সে ১১৭৪ সালের কথা।

কিন্তু সে মন্দির টিকলো না। দুশো বছর যেতে না যেতেই আলাউদ্দীন খিল্‌জি পিতৃব্যকে হত্যা করে দিল্লীর তখ্‌ৎ দখল করে বসলেন। তারপরেই আক্রমণ করলেন পশ্চিম ভারত। সুরাট লুঠ করে আলাউদ্দীন এলেন প্রভাসে। রাজপুত সেনারা সোমনাথের নামে জীবন পণ করে লড়লো, কিন্তু মন্দির রক্ষা করতে পারলো না। বিধর্মীরা শিবলিঙ্গ চূর্ণ করলো, মন্দিরও বিধ্বস্ত করলো। লিঙ্গ-চূর্ণ টুকরোগুলি নিয়ে গেল দিল্লীতে।

বিগ্রহশূন্য ভগ্নমন্দির হিন্দুর শৌর্যবীর্যকে উপহাস করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুকাল। তারপর জুনাগড়ের রাজা মহীপাল সেই মন্দিরের সংস্কার করলেন। তাঁর পুত্র মন্দির-মধ্যে আবার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন।

তা'ও শ' খানেক বছরের বেশী স্থায়ী হলো না। মাস্‌দ বেগদা মন্দির দখল করে বিগ্রহ সরিয়ে দিলে, মন্দিরকে করে দিল মসজিদ।

কিন্তু মসজিদও স্থায়ী হলো না। সে কথা আর একদিন বলব।

—পাখী কেমন করে ওড়ে—

প্রাণিবিজ্ঞানীরা বলেন, পাখীর উৎপত্তি হয়েছে সরীসৃপ থেকে, যদিও চেহারায় পাখী আর সরীসৃপের মধ্যে আজ সাদৃশ্য অতি সামান্যই। অবশ্য দু' দলেরই বাচ্চা হয় ডিম থেকে আর পাখীদের পায়ে, এখনও, সরীসৃপের চিহ্ন আঁশ দেখা যায়। অবশ্য শরীরের গঠনেও কিছু কিছু মিল আছে।

কিন্তু পাখীদের শরীরে আরও কতকগুলি বিশেষত্ব আছে যার জন্য তার পক্ষে ওড়া কতকটা সহজ হয়েছে। যেমন ধর, তার শরীরের কাঠামো খুব হাল্কা কিন্তু মজবুৎ। মাথার খুলিও পাৎলা এবং মোটেই ভারী নয়। কতকগুলি ছাড়া বেশীর ভাগ হাড়ই প্রায় ফাঁপা। বুকের গড়নও ঠিক জাহাজের খোল বা নৌকোর মত।

উড়বার সময় যাতে নীচে ধাক্কা দিয়ে শরীরটাকে ওপরে ঠেলে তোলা যায় তারও ব্যবস্থা আছে পাখীর শরীরে। এ জন্য ডানা দুটো তার শরীরের তুলনায় বেশ বড় আর ছড়ানো। যে পেশীর সাহায্যে ঐ ডানা নাড়ানো হয় তাও শরীরের অন্যান্য পেশীর তুলনায় খুব বড় আর মজবুৎ। পাখী এই ডানা মেলে একবার ওপরের দিকে তোলে আবার নীচে নামায়। ডানা ওপরে তুলবার সময় তার ওপরকার হাল্‌কা পালকগুলো ঈষৎ ফাঁক হয়ে যায়—যাতে তার ভেতর দিয়ে বাতাস ঢুকে বেরিয়ে যেতে পারে। ডানা নামাবার সময় কিন্তু এই পালকগুলো ঘন হয়ে সেঁটে থাকে, যার ফলে সে ডানা সহজেই বাতাসের ঠেলা রোধ করতে পারে। আর ইচ্ছেমত মোড় বেঁকবার জন্য রয়েছে পাখীর লেজ—ঠিক নৌকোর হালের মত কাজ করে এটি।

পাখীর রক্ত গরম, সরীসৃপদের মত ঠাণ্ডা নয়। এতেও উড়তে সুবিধা হয় তাদের।

—নাম যখন সংক্ষিপ্ত হয়—

অনেক বড় বড় কথা সময় বাঁচাবার জন্য আমরা সংক্ষেপ করে নেই এবং তার প্রত্যেকটি শব্দের কেবল আদ্যক্ষরটি একত্র করে উচ্চারণ করি। ইংরেজীতে এবং ইংরেজী ভাষার জননী ল্যাটিনে এ রকম খুব বেশী দেখা যায়। বহু ল্যাটিন শব্দ এখনও ইংরেজীতে ব্যবহার করা হয় কিনা! অনেক সময় দেখা গেছে ঐ সংক্ষিপ্ত নামটাই আমাদের পরিচিত, আসল শব্দগুলি, যাকে সংক্ষেপ করা হয়েছে,—আমাদের জানাই নেই! এ রকম কয়েকটি সংক্ষিপ্ত নাম আর তার আসল পুরো নাম এখানে দিচ্ছি। দেখ তো তোমরা জান কিনা!—

এফ্. আর. সি. এস্—ফেলো, রয়্যাল কলেজ আব সার্জেন্‌স্। এম্. আর. সি. পি. —মেম্বার, রয়্যাল কলেজ অব্ দি ফিজিসিয়ান্‌স্। এন. বি—নোটা বেনে (অর্থাৎ ভাল করে নোট্ কর)। ই. জি—এগ্‌জেম্‌প্লি গ্রেটিয়া অর্থাৎ উদাহরণ স্বরূপ)। এম্. সি. সি.—মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব। এম্. ডি—মেডিসিনি ডক্টর (অর্থাৎ মেডিসিনের (ওষুধ ডক্টর। এম্.পি. এইচ্—মাইল্‌স্ পার আওয়ার (ঘণ্টায় এত মাইল)। এম্. এস্—ম্যানাস্ক্রিপ্‌ট্ (পাণ্ডুলিপি)। আই. এল্. ও—ইণ্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানিজেশন (আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান)। ন্যাটো (N. A. T. O) নর্থ

আটলান্টিক ট্রিটি (সন্ধি) অর্গানিজেশন। ও. কে—ওল্ ক্রেক্ট্, (অল্ কারেক্ট্, (সব ঠিক) এর বিকৃত রূপ)। পি. এম্. জি.—পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল। পি. এস্—পোষ্ট স্ক্রিপ্টাম্ (অর্থাৎ পুনশ্চ লেখা, বাংলায় লেখা হয় পুঃ)। টি. এন. টি—ট্রাই-নাইট্রো-টোলুইন (এক রকম বিস্ফোরক পদার্থ)। ইউনেস্কো U. N. E. S. C. O.—ইউনাইটেড নেশন্‌স্ এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক্ এণ্ড কালচারাল্ অরগানিজেশন্ (অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান)। ভিজ্ (Viz.)—ভাইডেলি সেট (যেমন ধর।)

— নিজেকে পরীক্ষা কর —

নীচে কয়েকটি সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন দেওয়া হ'ল। এর অন্ততঃ ১০টির সঠিক উত্তর তোমার দিতে পারা উচিত। ১৫টি ঠিক হলে বোঝা যাবে তুমি খোঁজখবর ভালই রাখ। উত্তরটা ২০৬ পৃষ্ঠায় দিয়ে দেওয়া হ'ল।

ক) এগুলো কি ?—১) বার্সিলোনা ২) আরকিপেলেগো ৩) ইলিয়াড্ ৪) নাইলন (খ) এঁরা কোন দেশের লেখক ? এঁদের অন্ততঃ একখানা করে বিখ্যাত বইএর নাম বল : ৫) গোগোল ৬) টমাস্ হার্ডি ৭) ইবসেন ৮) এমিল জোলা ৯) শিলার। (গ) কে আবিষ্কার করেছেন ?—১০) টেলিভিশন ১১) টেলিফোন ১২) ভিটামিন ১৩) ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব (ইভলিউশন্) ১৪) পেনিসিলিন। (ঘ) কোন্‌টা ঠিক ? ১৫ । আমেরিকার জাতীয় খেলা—রাগবী, গল্‌ফ্, হকী, বেস্ বল, বাস্কেট বল। ১৬ । ক্রস্‌ড্ চেক্ মানে যে চেক্ ছিঁড়ে গেছে, যে চেক্ বাতিল হয়ে গেছে, যে চেক্ নিজের ব্যাঙ্কের মারফৎ ছাড়া ভাঙ্গানো যায় না যে চেক্ যে কেউ ভাঙ্গাতে পারে। ১৭) সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে—একদিন, এক ঘণ্টা, আট মিনিট, ১'২৫ সেকেণ্ড। ১৮) কে বলেছিলেন ?—'অসম্ভব' কথাটি কেবল মাত্র মূর্খের অভিধানেই পাওয়া যায়।—সক্রেটিস, নেপোলিয়ন, ফ্রেডরিক, পিটার। ১৯) জেলা সমাহর্তা বলতে বোঝায় জেলার জজ্, পুলিসের বড় সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলার। ২০) চরক বলতে বোঝায় চৈত্র সংক্রান্তির উৎসব, একজন বিখ্যাত বৈদ্য-শাস্ত্রবিদ, পাহাড়ে চড়বার খাড়া রাস্তা, নদীর ভিতর গজানো ডাঙ্গা।

যে গল্প জানা নেই

—একুশ—

শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী

দেখতে দেখতে যাবার দিন এসে পড়ল। বাংলা দেশে শরৎ এসে গেছে। কলকাতাতেও তার একটু ছোঁয়া লেগেছে যেন ! গোপাল জানালার ধারে বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। সত্যি. সত্যি তা হলে সুমিতরা তাদের বাড়ীতে চলেছে ? কি মজাটাই না হবে ! কিন্তু যারা রাজ-প্রাসাদের মত বিরাট বাড়ীতে থাকতে অভ্যস্ত তারা কি তাদের ঐ খড়ের ঘরে থাকতে পারবে ? পরক্ষণেই ভাবে, কেন পারবে না ? তারা ত' আর রাজ-ঐশ্বর্য দেখতে যাচ্ছে না, তারা যাচ্ছে পল্লী-বাংলাকে দেখতে। ঐ তো বাংলার আসল রূপ, আর ওরই মধ্যেই তো বাংলার সত্যিকার প্রাণ !

যথা সময়ে বাড়ীর মোটর-গাড়ী এসে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেল ওদের। এবং একটু পরে ট্রেনেও উঠল ওরা। শেষে ট্রেনও ছাড়ল।

ক্রমে একটি দু'টি করে গোটা কয়েক ষ্টেশন পার হতেই সহরের আবহাওয়া থেকে মুক্ত হ'ল ওরা। গাড়ী এবার ছুটেছে বনজঙ্গলের ধার দিয়ে। দু' পাশের সবুজ ক্ষেত নুয়ে পড়েছে ধানের শীষের ভারে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট খাল, নদী। ওখানে এক ঝাঁক বক ট্রেনের শব্দে সাদা পাখা মেলে উড়ে গেল। একপাল চাষীর ছেলে ট্রেন দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। প্রথম শ্রেণীর নরম গদীর উপর বসে বসে দেখতে লাগল ওরা।

অবশেষে গাড়ী এসে দাঁড়াল একটা ছোট্ট ষ্টেশনে। হুড়মুড় করে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল ওরা। লছমন সিং তাড়াতাড়ি একখানি গরুর গাড়ী যোগাড় করে আনল। গাড়ী মন্থর গতিতে চলল গোপালদের গ্রাম কেশবপুরের অভিমুখে।

ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ করে গরুর গাড়ী এগিয়ে চলেছে উঁচুনীচু রাস্তা দিয়ে। কোথাও গাড়ী বেশ গড় গড় করে এগিয়ে চলে, আবার হঠাৎ হাচাং শব্দ করে গর্তে পড়ে আবার ওঠে। আরোহীরা গড়িয়ে পড়ে এ ওর গায়ে। তার পরেই তুমুল হাসি। সুমিতরা দামী দামী গাড়ীতে চড়েছে অনেক, কিন্তু এমন মজার গাড়ীতে তো চড়ে নি কখনও !

গোপালদের বাড়ীর কাছে এসে গাড়ী দাঁড়াল। গোপাল গাড়ী থেকে নেমে আগে ছুটল খবর দিতে। কিন্তু বাড়ী ঢুকতে গিয়েই দরজায় যার সঙ্গে তার মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল তাকে যে

কখনও এখানে দেখতে পাবে এ সে পৃথিবী ওলটপালট হয়ে গেলেও হয়তো বিশ্বাস করতে পারত না! কিন্তু পৃথিবীতে কত আশ্চর্য ঘটনাই না ঘটে!

"উঃ" বলে যে মেয়েটি কপালে হাত বুলোতে বুলোতে তার দিকে কটমট ক'রে তাকাল সে আর কেউ নয়—বুলু। (ক্রমশঃ)

কি মোর ভালো লাগে

শ্রীবিজলী সরকার

গগনে কেবা যেন
দিয়েছে মসী মাখি',
বিজলী তারি বুকে
হাসিছে থাকি' থাকি'।

দাদুরী দলবলে
হরষে গান ধরে,
হিমেল বায়ু সনে
বরষা-ধারা ঝরে।

মেদিনী মুখরিত
মেঘেরি গরজনে,
লুকালো দিনমণি
তাহারি আবরণে।

এমনি দিনে শোন
কি ভালো লাগে আজ—
খিচুড়ী ভুনি—আর
গরম ভাজা মাছ।

কিন্তু আরো ভালো—
মিছে তো বলবো না,
দরজা এঁটে ঘরে
ভূতের গল্প শোনা।

---

২০৪ পৃষ্ঠার প্রশ্নের উত্তর

ক) ১) স্পেনের বিখ্যাত বন্দর। ২) যে সমুদ্র দ্বীপপুঞ্জে ভর্তি কিংবা সেই দ্বীপপুঞ্জগুলোই,—যেমন মালয়। ৩) হোমারের লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ—গ্রীকদের সঙ্গে ট্রয় (ইলিয়াম্)-বাসীদের যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে লেখা। ৪) এক ধরণের প্লাষ্টিক—সাধারণতঃ ফিনোল বা বেনজিন থেকে নানা জটিল প্রক্রিয়ায় তৈরী হয়। অনেকটা রেশমের মত দেখতে। খ) ৫) রাশিয়া।—ডেড সোল্‌স। ৬) ব্রিটেন।—ফার ফ্রম্ দি ম্যাডিং ক্রাউড। ৭) নরওয়ে।—এ ডল্‌স্ হাউস্। ৮) ফ্রান্স।—নানা। ৯) জার্মেনী—দি মেইড্ অব্ অর্লিন্স। (গ) ১০) বেয়ার্ড ১১) গ্রেহাম্ বেল ১২) হপ্‌কিন্‌স ১৩) চার্লস্ ডারউইন ১৪) আলেক্‌জাণ্ডার ফ্লেমিং (ঘ) ১৫) বেস্ বল ১৬) যে চেক্ নিজের ব্যাঙ্কের মারফৎ ছাড়া ভাঙ্গানো যায় না। ১৭) আট মিনিট। ১৮) নেপোলিয়ন। ১৯) জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ২০) একজন বিখ্যাত বৈদ্যশাস্ত্রবিদ্।

শিশুসাহিত্যিক-পরিচিতি

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

জন্ম—জানুয়ারী, ১৯১২ঃ জন্মস্থান—চোরবাগান, কলকাতা। পৈত্রিক আদিনিবাস—ফরাসী চন্দননগর।

প্যারীচরণ বালিকা বিদ্যালয়ের শিশুপাঠশালায় ছাত্রজীবন আরম্ভ। তার পর আর্য্য মিশন ইনষ্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা ও বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আই.এ ও বি.এ. (১৯৩১)।

জনৈক এম্. এল্.এ-র (দিল্লী) সেক্রেটারী হিসাবে কর্মজীবন সুরু করেন। তার পর ক্রমান্বয়ে খবরের কাগজে সাংবাদিকতা, ই. বি. রেলওয়েতে চাকুরী ও শিক্ষকতা করার পর বর্তমানে কলকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত আছেন। আজ পর্যন্ত বিবাহ করার অবসর পান নি।

অল্প বয়স থেকেই শরীরচর্চা ও সেই সঙ্গে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষ করে শিশুসাহিত্যে এঁর প্রচুর দান। শিশুসাথী, রামধনু, মৌচাক ও অন্যান্য সাময়িক পত্রে নিয়মিত লেখা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে বাংলা শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। শিশু-সাহিত্য-পরিষদের ইনি আজীবন সদস্য এবং পরিষদের প্রথম থেকেই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। একাধিক বার এর সম্পাদক পদেও নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৫৪ সালে বয়স্কশিক্ষা-সাহিত্য রচনার জন্য ভারত সরকার এঁকে পুরস্কৃত করেন এবং ১৯৫৬ সালে বাংলা সরকার এঁকে সাহিত্য-কর্মশালার (শিশুসাহিত্য) সহ-অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।

এঁর অসংখ্য বইয়ের মধ্যে কয়েকখানির নাম:—মৃত্যুর পশ্চাতে, তন্ত্রগুম্ফা, আবিসিনিয়া ফ্রণ্টে, মহাচীনে মহাসমর, যুদ্ধের গল্প, গল্প হলেও সত্যি (২ খণ্ড), এই দেশেরই মেয়ে, আমাদের গান্ধিজী, অসি বাজে ঝন্ ঝন্, নীল নায়ের মাঝি, যত রাজ্যের রূপকথা, ছোটদের কংগ্রেস, প্রিয়দর্শী অশোক, বিদেশী রূপকথা, ছোটদের গালিভার, ডেভিড কপারফিল্ড, ছোটদের প্রথম ভাগ, কিশোর গ্রন্থাবলী (৪ খণ্ড), মন্দিরে মন্দিরে প্রভৃতি।

চিঠিপত্র

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

আজকে মনের মত বর্ষা পেয়েছি। কবির ভাষায়

"আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝর ঝর,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার
খরতর বক্রহাসি শূন্যে বরষিয়া।"

এই পর্যন্ত কবিগুরুর সঙ্গে দিব্যি মিলে যাচ্ছে। কিন্তু এর পরেই 'অন্ধকার রুদ্ধগৃহে' তিনি একলা

বসে মেঘদূত পড়ছিলেন আর আমি বেচারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ছাপাখানার দুর্দান্ত "প্রুফ" সংশোধন করে চলেছি। তবে একটা সুবিধে এই,—রাস্তায় হাঁটু জল জমে গেছে, নেহাৎ প্রাণের দায়ে ছাড়া কেউ এ সময় পথে বেরোয় না। তাই আমার ঘরেও আগন্তুকের ভিড় নেই এখন। নিশ্চিন্ত মনে ঝরণা-কলম আঁচড় কাটছে ছাপা কাগজের ওপর। কেটে কেটে হাত ব্যথা হয়ে গেল।

কিন্তু চিঠির উত্তরও আজই দিতে হবে—নইলে বিলম্বিত কাগজ আরও বিলম্বিত হবে এবং হয়তো মিঠে-কড়া চিঠিও ফের আসতে থাকবে। সবাই তো আর যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। তা ছাড়া আমাদের এক গুজরাটী গ্রাহক তো স্পষ্টই লিখেছেন—"আপ্ কা কাণ্ড্ কার্খানা এ্যায়সা হি চল্তা হ্যায় ?" অতএব বাংলার সুনাম রক্ষার জন্যও অন্ততঃ তাড়াহুড়ো করা দরকার।

শ্রীহারাণচন্দ্র সরদার (বৈঁচবেড়িয়া)—লেখা নানা কারণে ছাপানো যায় না। পছন্দ হ'লেও কিছুদিন ফাইলে বাস করতে হয় তাকে—পূর্বাগতদের জন্য স্থান সংকুলান করতে। কাজেই লেখা পাঠিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছাপা না হ'লেই চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। রামধনুর প্রতিষ্ঠাতার সম্বন্ধে নানা কথা ফাল্গুন ১৩৬৩ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ সংখ্যায় পাবে। শ্রীবিজয়া রায় (আইজটনগর)—চিঠির জবাব দেব না কেন ? নিশ্চয়ই দেব। তা ছাড়া তোমার চিঠির হাত এমন সুন্দর!—বার বার পড়তে ইচ্ছা করে। তোমার ওখানকার বর্ণনা আর নিমন্ত্রণ পেয়ে সত্যিই লোভ হচ্ছে। তোমার বোন কিন্তু বেশ চালাক মেয়ে। গিয়েই ঠিকানা বদলে নিয়েছে! হ্যাঁ 'রামধনু' নামটা, যতদূর মনে পড়ে, সবাই মিলে বসে ঠিক করা হয়েছিল ৩০ বছর আগে। সেই সবাইএর মধ্যে আমিও ছিলাম। প্রতিষ্ঠাতা তো ছিলেনই। শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় (গড়বেতা)—আমারই ভুল হয়েছিল। জগদীশচন্দ্রের বাল্যকাল ফরিদপুরে কাটলেও তাঁর বাড়ী রাঢ়ীখাল (বিক্রমপুর)। তবে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র (সম্পর্কটা ঠিকই) দেবেন্দ্রমোহনদের পৈতৃক বাসস্থান, তাঁর জীবনীতে দেখছি, ময়মনসিংহ জেলার জয়সিদ্ধি গ্রাম। তাঁর বাবার নাম মোহিনীমোহন বসু। রাখালদাস সম্বন্ধে ভাল করে তথ্য সংগ্রহ করে লিখতে হবে। তাঁর পুত্রের কাছে হয়তো এ সম্পর্কে কিছু নতুন কথা জানা যাবে। তিনিও আমার সহপাঠী ছিলেন। শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্তী (কৃষ্ণপুর)—লেখাটির খোঁজ করব। গাছপালা বেশী কেটে ফেললে সেখানকার বৃষ্টিপাত কমে যায় এটি বৈজ্ঞানিক সত্য। সাম্প্রতিক যুগেও এ রকম ঘটনা অনেক ঘটেছে। পুরোনো রামধনুর জন্য ৩৯ নয়া পয়সার ডাক টিকেট পাঠাতে হয়। বুক পোষ্টে ব্যক্তিগত চিঠি দিলে তা বেয়ারিং হয়, কাজেই পোষ্ট কার্ডে, না আঁটলে ১০ নয়া পয়সা দিয়ে ইন্‌ল্যাণ্ড লেটারে (অন্তর্দেশীয় পত্র) পাঠাতে পার। ওতে বুক পোষ্টের চেয়ে মাত্র ২ নয়া পয়সা বেশী লাগে। শ্রীরণেন্দ্র গংগোপাধ্যায় (ঘৈরালী)—বারোয়ারী উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত কেমন দাঁড়ায় দেখে ঠিক হবে সেটা পুস্তকাকারে বের করা যাবে কিনা। শ্রীলোকনাথ আগরওয়ালা (পলাশী)—রামধনু ইদানীং মাসের শেষ দিকেই বেরুচ্ছিল। তবে আস্তে আস্তে আরও গোড়ার দিকে বার করার চেষ্টা হচ্ছে।

প্রীতি ও সম্ভাষণ জেন সবাই। ইতি—রাঃ সঃ

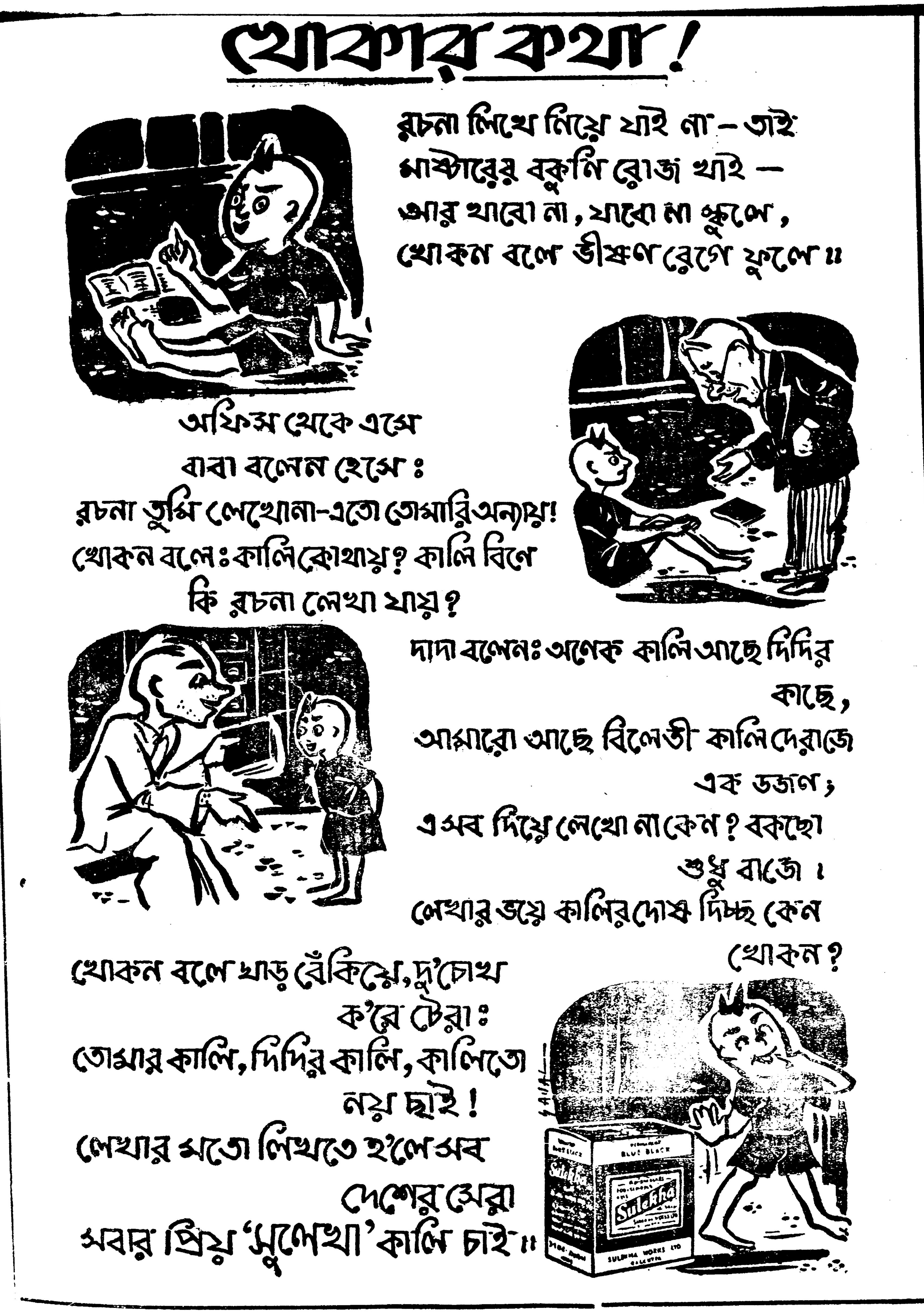

জ্যৈষ্ঠের ধাঁধা দেখে

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু)

কাল ভাই ট্রামে চ'ড়ে ঘামে ভিজে এসে
দেখি দাদা কাদা মেখে দাঁড়িয়েছে হেসে।
ক্ষ্যাপার ব্যাপার দেখে আমি বলি রেগে —
মাথা কি খারাপ হ'ল কাঁথা নিয়ে ভেগে ?
দাদা বলে, চলে সব এ দেশে জানিস্.
কালো জাম ভালো আম চিনেই আনিস্।
না পাস্ কাপাস তুলো এনে একমণ
তিন ক্ষেপ লেপ কর্ মনের মতন।
যুৎসই কথা শুনে ব্যথা কমে যায়,
দাদার আদার কুচি রইলো কোথায় ?

জ্যৈষ্ঠের ধাঁধা দেখে বাঁধা কবিতার
ছন্দটা নিয়ে এলো মন্দ বিচার।

ভেরা চ্যাপলিনার

চিড়িয়াখানার খোকাখুকু—৪৲

(দুই খণ্ড একত্রে)

মস্কো চিড়িয়াখানার জীবজন্তু সম্পর্কে মজার মজার গল্প, ছোটদের উপযোগী করিয়া লিখিয়াছেন লেখিকা। পাতায় পাতায় রেখাছবি, উনিশখানা হাফটোন ছবি, সুন্দর আর্ট পেপারে তিনরঙা প্রচ্ছদ।

অশোক গুহের

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম-২৲

(পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ)

ছোটদের উপযোগী একখানি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস।

শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে

অজিতকুমার তারণের

সচিত্র

॥ ইন্দোচীনের কথা ॥

পপুলার লাইব্রেরী,

১৯৫।১বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। মামীমা (বা মাসীমা বা সহিস) কটক, দরদ। ২। সরস (বা সরেস), কনক (বা নবীন), নয়ন। ৩। জলজ, কতক, ৪। টাকাটা, মলম (বা সালসা)। ৫। নরেন (বা মহিম ইঃ), কালকা।

উত্তরদাতাদের নাম : নিভু'ল :— নীপু, দীপু, মিঠু, বেবী, অঞ্জু (কলিকাতা-১৯); প্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু) (কলিকাতা-৬) ডিহিমণ্ডল ঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ (ডিহিমণ্ডল ঘাট); পার্বতীনাথ ও পশুপতিনাথ সেনগুপ্ত (সালকিয়া); বাণীকান্ত, স্মৃতিকণা, অশ্রুকণা (বরদাবাড়); শেফালিকা, মীনাক্ষি, মঞ্জুশ্রী, অলোকেন্দ্র দত্ত (কলিকাতা-২); রাধারঞ্জন দে (কেশিয়ারি); সন্তোষ, রবীন্দ্র ও রণেন্দ্র গংগোপাধ্যায় (ঘৈরালী চা-বাগান); দিলীপ, অশোক, রমলা, ঝণ্টু, সন্দীপ, প্রদীপ, দাতু, কাকা, জামাইবাবু (নিউদিল্লী); সুব্রত রায় (বেলাড়ি); অমিতাভ ও অশোকনাথ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর); ওস্তাদ, স্বস্তিকা, সুফল চৌধুরী (বর্ধমান)।

আংশিক :—দিলীপ সমাজদার (কলিকাতা-১২); নতুন খুকু, বাণীশ্রী, জয়শ্রী, ছোট ঝণ্টু, গুমু, সণ্টু, মীনু, বুনু, বড় ঝণ্টু, পাণ্ডু ও আরো ষোল জন (খড়গপুর); জীবনকৃষ্ণ, শক্তিধর সলিল, দুল'ভ, তারক, সহদেব, মহাদেব, রথীন্দ্র (অভয়নগর); রাণী চ্যাটার্জী, আলোক চ্যাটার্জী, নেবু চ্যাটার্জী (দানাপুর); শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (রাঁচি); নিমাই, নির্মল, বংশী, দিক্‌পতি, দিলীপ, শান্তি, গৌরী (বিষ্ণুপুর); মানবী চৌধুরী (কুলিয়া); দুলাল, অনন্ত, অজিত (বিষ্ণুপুর)।

নূতন ধাঁধা

নীচের লেখাগুলো পড়ে কিছুই বুঝছ না তো ? আচ্ছা, ওর ভিতরে ভিতরে খুসীমত এক একটা শব্দের প্রতিশব্দ বা ভাবার্থ বসিয়ে দেখ তো, অর্থ বোঝা যায় কিনা !

ভাই ঘনশব্দ, তোসমেত নিয়ে আরাজসভা এপিঙ্গল উপগচ্ছিত বস্ত ভালরু লাঙ্গল। প্রবাহ অথবাহিক তৈরী করনা আপ্রহার এবিস্বাদও পছাঁদ ঘোড়া না। পোষাক এক এক বারয়েক বাস্তবিশেষয় পড়ে পাশ নয়ব। ব্যতীতও দলিলম্, আমিও খুজানকী না মাচারপোয়া অনাত্মীয় মাংস মিলনা নিয়ে কাআকর্ষণ করো ! শেষ ২৪ পরগণার নামকরা জায়গা জলপাত্রবে, ও জগৎটি অচিন্ত হাতছে কোন্ লোকন, ও একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর কবাস করি—এ এই ব্যক্তিয়ে কেশক্তি বহু গিঁটলা, আর নি নাছোড়বান্দা তাবের বনিয়াদর তর্ক ! টেলিগ্রাম তাকিয়ে তুমি পাটের সুতোর কাপড়ছবি গল্বাহাদুরখারাপ আগেই বলে কাটারি না !—সমাপ্তি একোমর পদজুয়াচোর।

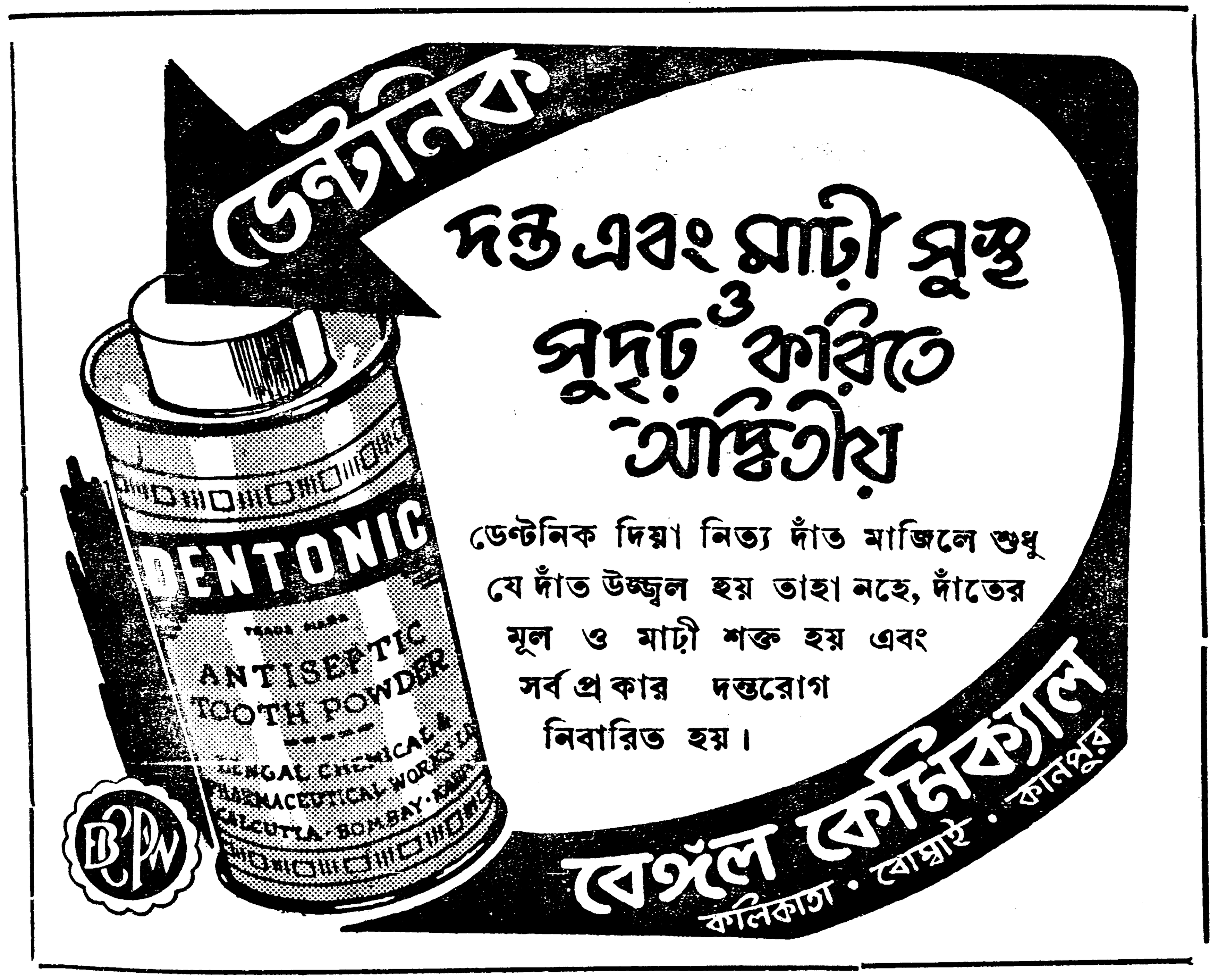

এবার পূজায় নূতন বই

—পূজা বার্ষিকী—

অপরাজিতা

। দাম চার টাকা।

ঠান দিদির থলে

। দাম তিন টাকা।

— আশাপূর্ণা দেবীর —

গল্প ভালো আবার বলো

। দাম দু' টাকা।

— সুনির্মল বসুর —

বরণ ডালা

গল্প ও কবিতা সংকলন

। দাম দু' টাকা।

— হেমেন্দ্রকুমার রায়ের —

সাজাহানের ময়ূর

(ছোটদের রোমাঞ্চকর উপন্যাস)

। দাম দেড় টাকা।

দেব সাহিত্য কুটীর···কলিকাতা—৯

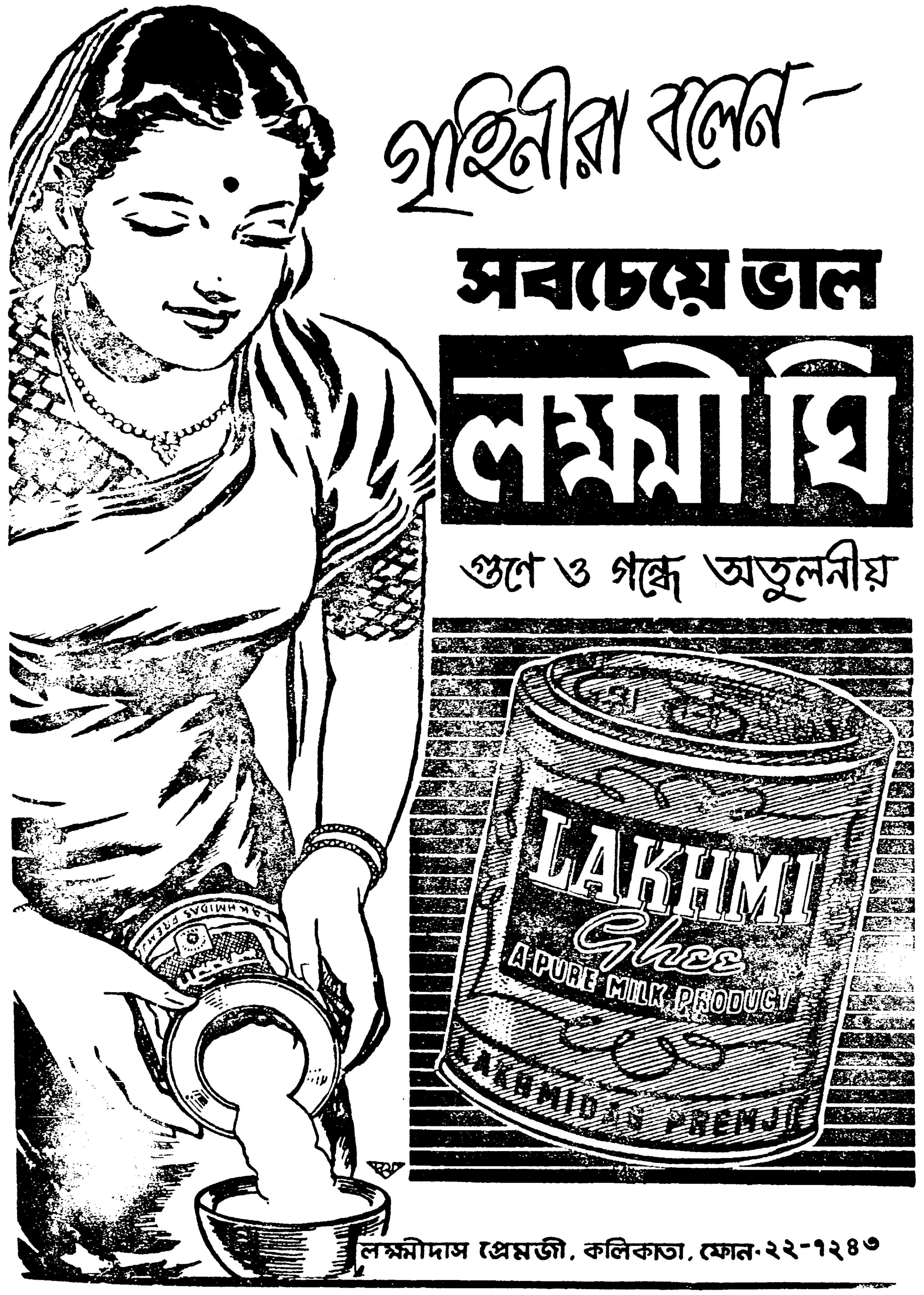

Regd. No. C—1641

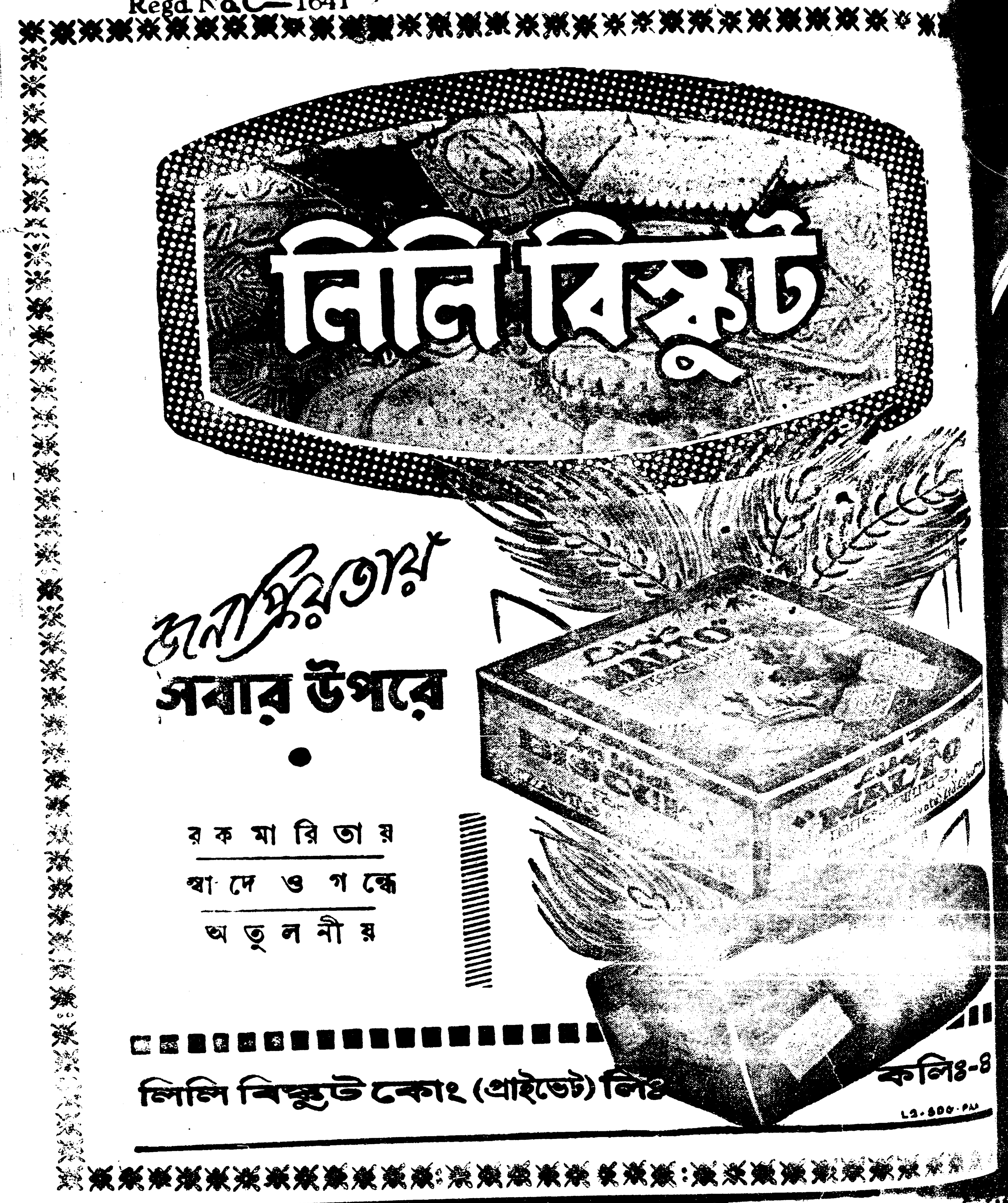

স্থাপিত – ১৩৩৭ ফোন–৩৫–২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পতাকা মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

৴২৷৷০, ৴৫, ৷৮ সেরা ডাইস্ টীনে,
মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ— শ্রীঅমৃত লাল কুমার।

মিল ও অফিস – ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২ টাকা ২৫ ন. প., প্রতি সংখ্যা ৩৭ ন. প. ভি. পি তে আরও ৭১ ন. প. বেশী লাগে। নমুনার জন্য ৩৯ ন প. র ডাকটিকেট পাঠাতে হয়।

২। বৈশাখে বছর সুরু, যে কোনও মাসে চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যায় কিন্তু পত্রিকা নিতে হ বৈশাখ কিংবা কার্ত্তিক থেকে।

৩। কোন মাসে পত্রিকা না পেলে ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে তাঁদের উত্তরসহ সেই মাসের মধ্যে আমা জানাতে হবে।

৪। গ্রাহকদের সব চিঠিতেই গ্রাহক নং দিতে হবে। চিঠির জবাবের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা উপযু ডাকটিকেট দিতে হবে।

৫। লেখা, কপি রেখে, সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা—ম্যানেজা রামধনু। ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫ (টেলিফোন : ৪৮-৩১৮১)

বিজ্ঞাপনের হার (সংশোধিত)

প্রতি বারের জন্য :—

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ৫০ টা., অর্দ্ধপৃষ্ঠা ২৮ টা., সিকি পৃষ্ঠা ১৬ টা.। প্রতি কলম ইঞ্চি

মলাট : ৪র্থ পৃষ্ঠা ১০০ টা.

মলাট : ২য় বা ৩য় পৃষ্ঠা – ৮০ টা অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৪ টা., সিকি পৃষ্ঠা ২৪ টা

ছবি বা লেখার সামনের পৃষ্ঠা ৬০ টা, অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৩৬ টা, সিকি পৃষ্ঠা ২০ টা.

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

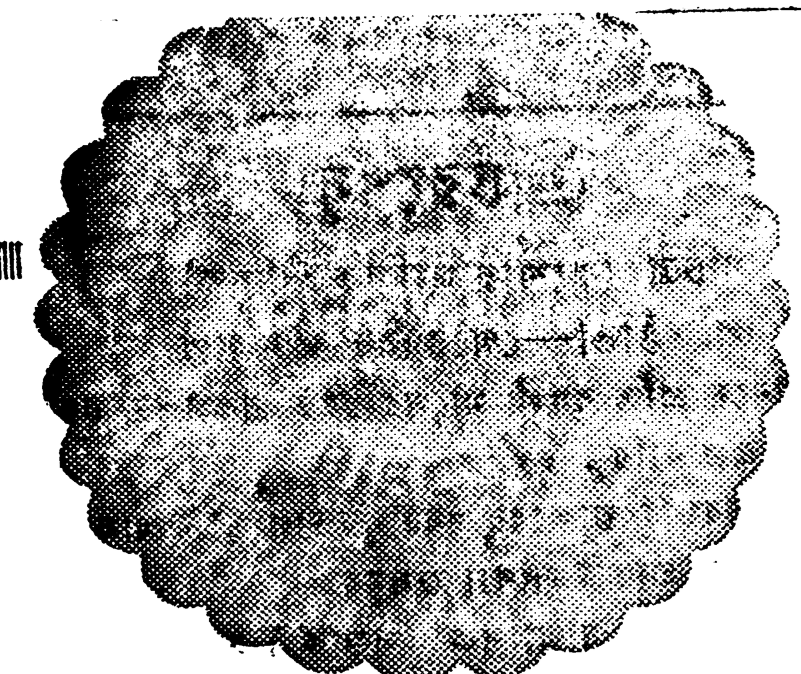

বিজ্ঞাপনের মতামতে

কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে ?

স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,
'থিনের' মধ্যে ; গুণে, স্বাদে সবার সেরা "কোলে"

অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,
সবরকমের "কোলে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ

শ্রীচরণেষু

ফোন : ৫৫-৪০৪৬

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা—গোরাচাঁদ দাশগুপ্ত

* নতুন আদর্শ এবং পরিকল্পনা নিয়ে প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই প্রকাশিত হয়।
* নীট্ আয় দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যয়িত হয়।
* 'বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর লেখা' এবং 'বিদ্যালয়ের খবর' বিভাগ দু'টি আমাদের সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পিত।
* প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকদের রচনায় প্রতিটি সংখ্যা সুসমৃদ্ধ।

বার্ষিক (সডাক) ৩৲, ষাণ্মাসিক (সডাক) ১॥০, প্রতি সংখ্যা।০

অন্যান্য বিষয়ের জন্য কর্মসচিবের সহিত পত্রালাপ করুন।

"সম্পাদক"
শ্রীননীগোপাল দত্ত

'শ্রীচরণেষু' কার্য্যালয়,
৪বি, রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৫

লে—খা—চা—ই

অভিনব কিশোর-মাসিক। ২য় বর্ষ (১৩৬৫—বৈশাখ হইতে)। বার্ষিক সডাক ৩৲,
ষাণ্মাসিক ১৮৵০, প্রতি সংখ্যা।১০, নমুনা বিনা মূল্যে।

শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল, সম্পাদক ; দেবালয়—২৪ পরগণা

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ॥০ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১॥০ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বি.এ

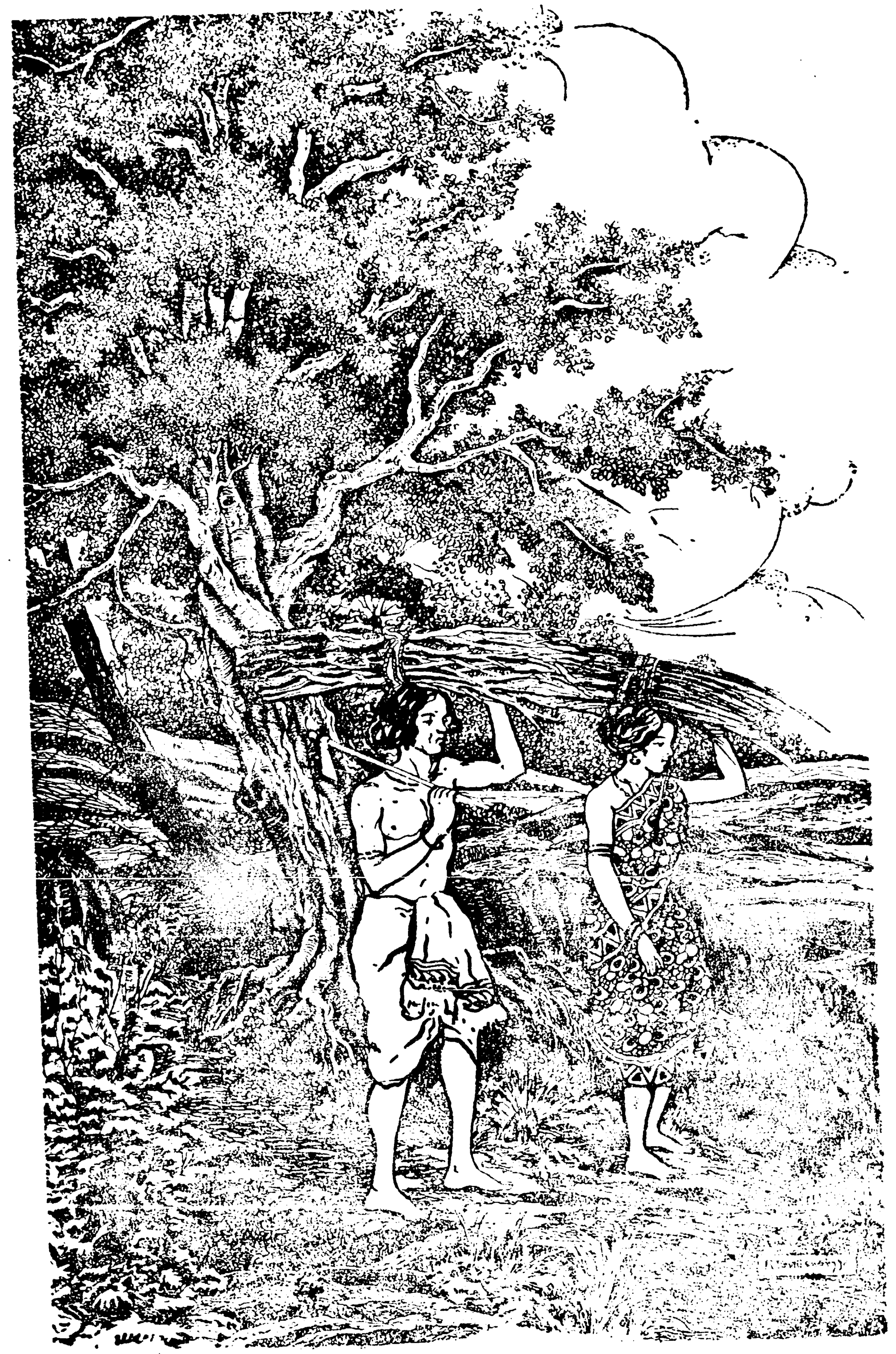

ফেরার পথে

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩১শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৬৫ { ৫ম সংখ্যা

শ্রীল শ্রীযুত···বাবু

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

সবাই আমায় আদর করে নাম দিয়েছে ······ খুড়িঃ,
— নামটা আমার বলবো সবার শেষে ;
আমার মত মানুষ তুমি পাবে ঝুড়ি ঝুড়ি
যাও যদি সেই উল্টো রাজার দেশে।

যতই খাই, উদর আমার ততই রহে খালি,
অনাহারেই হয় তো উদর পূর্তি ;
আহ্লাদেতে গলি আমি কেউ যদি দেয় গালি,
মিষ্ট বাক্যে হই অগ্নিমূর্তি।

শীতকালে মোর গরম লাগে, গা দিয়ে ঘাম ঝরে,
ইচ্ছা করে বরফ-জলে নাই,

গ্রীষ্মকালে ঠক্‌ঠকানি কম্প আমার ধরে,
লেপমুড়ি দে' তবেই প্রাণ বাঁচাই।

রাত্রে আমার হয় নাকো ঘুম, সারা রাতই ব'সে
অন্ধকারে কেবল মশা তাড়াই,
দিনের বেলা উদয়াস্ত ঘুমাই খুব ক'ষে,
ডেকে আমায় পায় না তো কেউ সাড়া-ই।

রসগোল্লা আমার মুখে লাগে বেজায় তেতো,
উচ্ছে, নিম মিষ্টি লাগে ভারি,
সেই কারণে মোর বাগানে কিচ্ছু লাগাই নে তো—
উচ্ছে শুধু লাগাই সারি সারি।

ডান পায়ে মোর লাগাই আমি বাঁ পায়েরই জুতো,
বাঁ পায়েতে ডান পায়েরটা পরি ;
'হরি'র সঙ্গে দেখা হ'লে, ডাকি—'ওরে ভূতো!'
ভূতনাথকে ডাকি আমি—'হরি!'

আমায় যদি লিখতে বল—'হরকালী রায়',
কী লিখবো, তোমরা সবে কহ ;
—পারলে না তো? লিখবো আমি—বলতে হাসি পায়—
লিখবো আমি 'য়রা লীকারহ'।

অসুখ হলে চপ্-কাট্‌লেট্, পান্তা, পোলাও খাই,
ভাল থাকলে, বার্লি এবং সাবু ;
আদর করে সবাই আমার নাম দিয়েছে তাই—
'শ্রীল শ্রীযুত উল্টোচরণ বাবু'।

রূপকথা রচয়িতা গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

জার্মানীর কেসেল সহরের গায়ে গায়ে লাগা এক বন।

বন না বলে পার্ক বললেও চলে। গাছ ও ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেছে আঁকাবাঁকা সুন্দর বাঁধানো রাস্তা। ঐ রাস্তা দিয়ে গাড়ীও চলতে পারে। ছুটীর দিনে দেখতে পাওয়া যায় দলে দলে কিশোর-কিশোরী ঐ রাস্তা দিয়ে চলেছে সাইকেল চড়ে। বন পেরিয়ে তারা যাবে কোনও পাহাড়ে অথবা হ্রদের ধারে ছুটী কাটাতে।

কিশোর-কিশোরীদের চোখ সচকিত। তারা তাকাতে তাকাতে চলেছে,—বুঝি কখন দেখতে পাবে একটা হরিণ ঝোপের আড়াল থেকে মুখ বাড়াচ্ছে, নয় তো বা একটা মেটে খরগোস ঘুরে বেড়াচ্ছে আর মাটি শুঁকছে। কারো কারো ভাগ্যে এই ভাবে জন্তুজানোয়ার দেখা ঘটে ওঠে। তবে লোকজনের ভীড় দেখলে জন্তুরা ভয়ে ঝোপ থেকে বড় একটা বের হয় না।

ছুটীর দিনে···সাইকেলে

এমনি প্রদেশে গ্রীমেরা দুই ভাই বহুদিন কাটিয়েছেন,—উইলহেল্‌ম ও জেকব। ফল, ফুল, লতা, গাছ, পাথর, জীবজন্তু তাঁদের ভারী প্রিয় ছিল। পাখীর গান শুনলে কিংবা হরিণের সুন্দর চোখের সঙ্গে চোখাচোখি হলে তাঁরা বিভোর হয়ে যেতেন। অবসর সময়ে তাঁরা বনের ভিতর ঘুরে বেড়াতেন। খুঁজতেন রকমারী ফুল, রকমারী ফল, লতা, বিভিন্ন রঙের পাতা। ঝরণার আশেপাশে বেড়িয়ে বেড়াতেন। খুঁজতেন নানা রঙের নুড়ি। কোন সুন্দর নুড়ি পেলে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন বাড়ীতে। নুড়ি কুড়িয়ে জমানোর বাতিক ছিল তাঁদের।

উইলহেল্‌মএর স্বাস্থ্য ছিল খারাপ। প্রায়ই তিনি বিছানায় পড়ে থাকতেন।

তখন জেকব একা একাই ঘুরে বেড়াতেন, আর মনে মনে ভারী দুঃখ পেতেন উইলহেল্‌মকে সঙ্গে না পাওয়ার দরুণ।

উইলহেল্‌মএর জন্ম হয় ১৭৮৫ সনে। আর জেকবের জন্ম তার এক বছর পরে। তাঁরা যখন খুব ছোট্ট, তখনই তাঁদের বাবা মারা যান। দুটি ছেলেকে মানুষ করে তোলবার ভার পড়ে মায়ের উপর। মা যেন অথই জলে পড়েন। আয়ের কোন পথই নেই, কিন্তু দুটি ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলতেই হবে। ছেলে দুটি খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁরা মায়ের দুঃখ যতটা সম্ভব লাঘব করতে চেষ্টা করতেন। তাঁদের স্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়ে মা অতি কষ্টে তাঁদের খরচ চালাতে লাগলেন। পড়াশুনায় দু'জনেই ভাল ছিলেন। শুধু স্কুলের নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকই তাঁরা পড়তেন না,—নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্যে বহু রকম বই তাঁরা পড়তেন।

একটি সুন্দর রাস্তা · চলে গেছে।

স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে তাঁরা কলেজে ভর্তি হলেন। কলেজের পরীক্ষাতেও তাঁরা কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করলেন। তারপর কর্মজীবন। দু'জনেই একটা একটা গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের পদ পান। এ কাজ ঠিক তাঁদের রুচি মতন হয়। কারণ পড়াশুনা নিয়েই তাঁরা বেশীর ভাগ সময় কাটাতে চাইতেন; গ্রন্থাগারিকের কাজ পেয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ ও উৎসাহ আরও বেড়ে গেল।

এমনি সময়ে তাঁরা গল্প লিখতে আরম্ভ করেন। কি রকম গল্প? বড়দের জন্য উপন্যাস? মোটেই না। ছোটদের জন্য রূপকথার গল্প। গল্পগুলি কিন্তু মৌলিক নয়,—গ্রামের প্রাচীন ও প্রাচীনাদের কাছ থেকে তাঁরা ঐগুলি শুনেছিলেন। শোনা যায়, বেশীর ভাগ গল্পই তাঁরা শুনেছিলেন গ্রামের এক দরজীর স্ত্রীর মুখে। গ্রীমেরা দুই ভাই সেগুলি শুনে বাড়ীতে এসে নিজেদের ভাষায় লিখে ফেলতেন।

তখনকার দিনে শিশুদের জন্যে যে কেউ ঐ ধরণের গল্প লিখতে পারবেন এ

ধারণা অনেকেরই ছিল না। তাঁরা মনে করতেন রূপকথা শুনতেই ভাল লাগে, ভাষার মাধ্যমে পড়লে ওর মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু গ্রীমদের লেখা রূপকথা পড়ে লোকের ধারণা বদলে গেল। অবশ্য প্রথমেই তাঁরা সমালোচকবৃন্দের কাছ থেকে তেমন ভাবে উৎসাহ পান নি। তবে কিছুদিন পরেই তাঁদের গল্পগুলি পড়ে পাঠক, সমালোচক সকলেই উচ্চপ্রশংসা করতে লাগলেন। ক্রমে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায়ও গল্পগুলির অনুবাদ প্রকাশিত হতে লাগল। ইউরোপের ছেলেমেয়েরা গল্পগুলি পড়ে নতুন কল্পলোকের সন্ধান পেল। স্কুলে ও ছোটদের ক্লাবে কোন কোন গল্প নাট্যাকারে রূপান্তরিত করে করে অভিনয় হতে লাগল। প্রতি ছেলেমেয়ের মুখে মুখে ঘুরতে লাগল 'সিণ্ডেরেলার' গল্প, 'তুষারকন্যার' গল্প, 'ঘুমন্ত সুন্দরীর' গল্প কিংবা 'ভেক রাজকুমারের' গল্প।

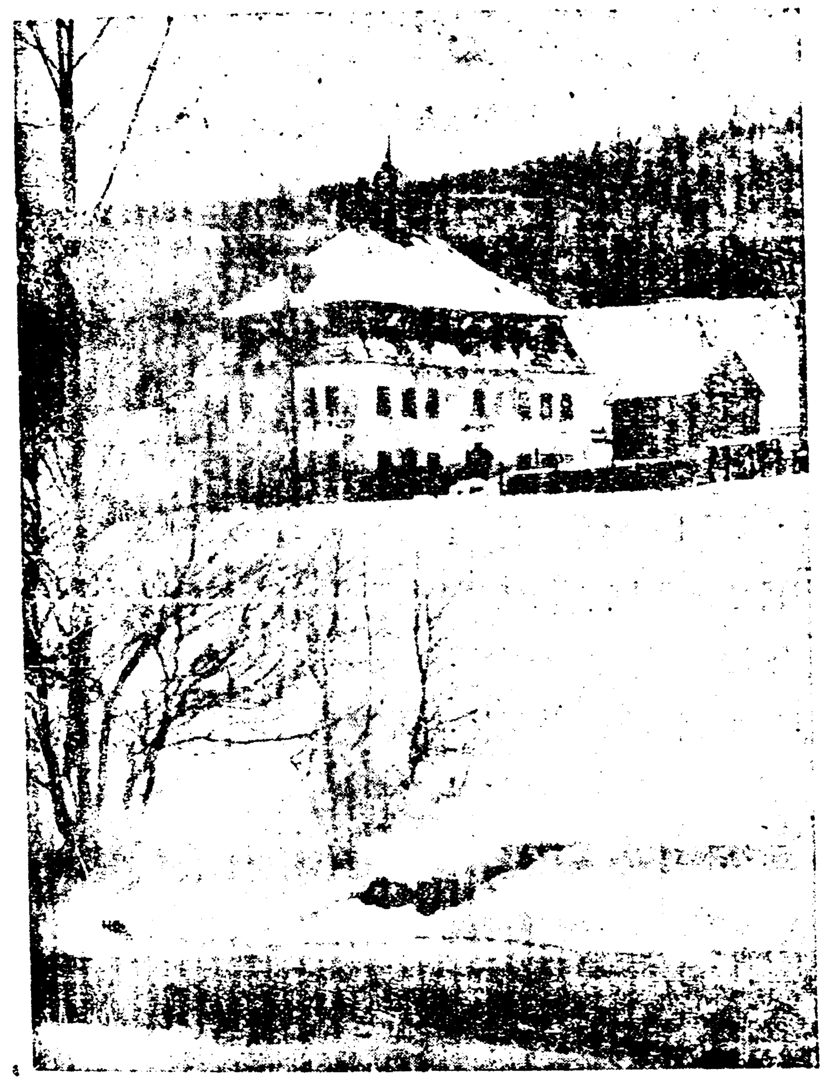

গ্রীম ভ্রাতৃযুগলের দেশ জার্মানীর আর একটি রূপ—শীতের দিনে।

গ্রীমেরা দুই ভাই কিন্তু শুধু রূপকথাই লেখেন নি, একটি মূল্যবান্ অভিধানও সঙ্কলন করেছিলেন।

৭৪ বছর বয়সে উইলহেল্‌ম মারা যান। পরের বছর জেকবেরও মৃত্যু হয়।

গ্রীমদের কোন কোন গল্প তোমাদের ভিতর কেউ কেউ বাংলাতে নিশ্চয়ই পড়েছ। কিন্তু যারা পড় নি তাদের জন্য তাঁর একটি গল্পের সারাংশ মূল জার্মান্ থেকে তুলে দিচ্ছি। গল্পটির নাম সিণ্ডেরেলা।

এক ধনীর স্ত্রী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। এত অসুস্থ যে জীবনের আশাই রইল না। যাবার সময় একমাত্র কন্যাকে নানা সদুপদেশ দিয়ে তিনি বললেন, "আমি তোমাকে ছেড়ে গেলেও উপর থেকে সর্বদা তোমার উপর নজর রাখব।" খানিকক্ষণ পরে তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। মেয়েটি প্রতিদিন মায়ের কবরের পাশে বসে খুব কাঁদতো।

একদিন তার বাবা তার জন্যে নতুন এক মা নিয়ে এলেন। নতুন মা তাকে দেখে মোটেই খুসী হলেন না। তিনি তাকে খুব খাটাতে লাগলেন। নতুন মায়ের সঙ্গে এসেছিল তার দুই দিদি। দিদিরাও তাকে বিষচক্ষে দেখত। দিদিরা তার নাম দিল 'সিণ্ডেরেলা'।

একদিন তাদের বাবা তাদের ডেকে বল্লেন, "আমি যাচ্ছি মেলায়। তোমাদের কার জন্য কি আনব বল?" এক বোন বলল, "আমি চাই সুন্দর পোষাক।" আর এক বোন বলল "আমি চাই মুক্তো ও দামী পাথর।" আর সিণ্ডেরেলা বলল, "আমি চাই একটি গাছের ডাল।" তাদের বাবা যে যা চেয়েছিল তার জন্য সেই জিনিষ নিয়ে এলেন। সিণ্ডেরেলা সযত্নে ডালটি লাগিয়ে দিল তার মায়ের কবরের পাশে।

ডালটি ক্রমে গাছ হয়ে গেল। এই গাছে বসত একটি পাখী। সিণ্ডেরেলার সঙ্গে তার ভারী ভাব হয়ে গেল।

একদিন সেই দেশের রাজকুমার ঘোষণা করে দিলেন দেশের সব চাইতে সুন্দরী মেয়েকে তিনি বিয়ে করবেন। রাজবাড়ীতে উৎসব সুরু হ'ল। উৎসবে যোগ দিতে চলল দেশের সব বিবাহযোগ্যা মেয়েরা। সিণ্ডেরেলার ইচ্ছা সেও যায় ঐ উৎসবে। কিন্তু তার সৎমা কিছুতেই রাজী হলেন না, কারণ তার ভাল পোষাক নেই। সিণ্ডেরেলার দুই দিদি চলল ঐ উৎসবে। সৎমা সিণ্ডেরেলাকে বললেন, "আমি এক গাদা সিম ছাইয়ের ভিতর ফেলে দেব। যদি তুই ঘণ্টার ভিতর প্রতিটি সিম তুলে আনতে পারিস তা' হলে তোকে উৎসবে যেতে দেব।" সিণ্ডেরেলা তখন তার মাকে ডেকে মনের ইচ্ছা জানাল। সঙ্গে সঙ্গে এক যোড়া সাদা পায়রা, এক দল ঘুঘু আর এক ঝাঁক পাখী এসে এক ঘণ্টার ভিতর সিমগুলো ছাইয়ের ভিতর থেকে বের করে দিয়ে গেল। দেখে সৎমা তো অবাক্। তিনি বললেন, "কিন্তু তোর ভাল পোষাক আর জুতো কই?" সিণ্ডেরেলা আবার তার ইচ্ছা প্রকাশ করল তার মায়ের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে একটা পাখী ঝুপ্ ঝুপ্ করে খুব সুন্দর ঝলমলে পোষাক ও একজোড়া জুতো ফেলে দিয়ে গেল। সিণ্ডেরেলা চলল উৎসবে।

রাজবাড়ীতে একটা হলে নাচ-গান, উৎসব চলছে। সিণ্ডেরেলা তাদের ভিতর ভিড়ে গেল।

হঠাৎ রাজকুমারের চোখ পড়ল সিণ্ডেরেলার উপর। সিণ্ডেরেলা অপরূপ সুন্দরী দেখতে। রাজকুমার সিণ্ডেরেলাকে উৎসবের ভিতর টেনে নিলেন। উৎসব-শেষে বললেন, "চল, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।" কিন্তু সিণ্ডেরেলা সাধারণ ঘরের মেয়ে। লজ্জায় সে পালিয়ে গেল। রাজকুমার অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পেলেন না।

পরদিন সিণ্ডেরেলা আবার এল উৎসবে। কিন্তু সেদিনও সে লুকিয়ে বাড়ী পালিয়ে গেল। পরের দিনও ঐ রকম ঘটল। কিন্তু সেদিন সিণ্ডেরেলা তাড়াহুড়োতে একপাটি জুতো ফেলে চলে গিয়েছিল। রাজকুমার ঘোষণা করে দিলেন, তিনি জানতে চান কার ঐ জুতো। সিণ্ডেরেলার বোনেরা দাবী করল তারা ঐ জুতো ফেলে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেল। দেখা গেল ঐ জুতো তাদের পায়ে লাগে না। শেষকালে প্রমাণ হ'ল ঐ জুতো সিণ্ডেরেলার। তখন মহাসমারোহে রাজকুমারের সঙ্গে সিণ্ডেরেলায় বিয়ে হয়ে গেল।

১৪

জ্ঞান হলে দেখলাম একটা বাঁশের মাচার উপর শুয়ে আছি। একজন চোখে ক্রমাগত জলের ঝাপটা দিচ্ছেন। মাথাটা ব্যাণ্ডেজ করে বাঁধা। চোখের যন্ত্রণা তখনও রয়েছে, মাথাটাও ঝিম ঝিম করছে। তবু উঠে বসলাম।

সামনে টাঙ্গানো একটা সাইন বোর্ড, গোটা দুই আলমারি, একটা টেবিল ও চেয়ার। তাতে বুঝলাম এটি একটি ডাক্তারখানা।

ডাক্তার বাবুটি তরুণ। বেশ অমায়িক ভদ্রলোক। নাম শুনলাম বিমল বাবু। তিনি বললেন, ভোরের দিকে তিনি সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখলেন বাঁধের

ধারে আমি পড়ে আছি। তাড়াতাড়ি নেমে আমাকে দেখে বুঝলেন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছি, মাথাটায় রগের কাছে কেটে গিয়েছে, চোখ দিয়ে একটা কাদার মত কলতানি বেরুচ্ছে। ভোরবেলা, তখন চাষীরা মাঠে যেতে সুরু করেছে। ডাক্তার বাবুর ডাকে কয়েকজন এসে ধরাধরি করে আমাকে তাঁর ডিস্পেন্সারীতে নিয়ে এসেছে।

তাঁর প্রশ্নের উত্তরে ব্যাপারটা বললাম। অবশ্য কানাইদাসের আশ্রমে আসার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার সেই কাল্পনিক আত্মীয়ের অন্নশূলের কথাই বলতে হোল।

কিন্তু জগবন্ধু সরকারের কথা শুনে তিনি চিন্তায় পড়লেন। বললেন, আমি তো এ তল্লাটের প্রায় সকলকেই চিনি। আকন্দতলার জগবন্ধু সরকার? কি জানি, মনে তো পড়ে না!

কি একটা লোশন দিয়ে ডাক্তার বাবু আবার আমার চোখ দুটো ধুইয়ে দিলেন। অনেকটা সুস্থ বোধ করলাম।

বিমল বাবু বললেন, থানায় যদি ডায়েরী করাতে চান তাহ'লে থানা-অফিসারকে আমি চিঠি দিতে পারি।

কিন্তু ভেবে দেখলাম যে আমাদের অনুসন্ধানের কাজ যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহ'লে এখন থানা-পুলিশের সান্নিধ্যে না আসাই ভাল। তা ছাড়া টাকাকড়ি যা খোয়া গিয়েছে তার পরিমাণ বেশী নয়। তবে বামুনগাছির যে নক্সাটা হারিয়েছে সেটা দরকারী জিনিষ বটে। কিন্তু বামুনগাছি এবং সেই মন্দিরে যাওয়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বর্ত্তমানে পুলিশকে কিছু না বলাই ভাল। নক্সাটা কানাই বাবাজীর কাছ থেকে আবার এঁকে নেওয়া বিশেষ শক্ত হবে না।

বিমল বাবুকে ধন্যবাদ দিয়ে আবার ফিরে এলাম রবাটপুরের নীলকুঠীতে কানাই-দাস বৈরাগীর আশ্রমে।

সমস্ত শুনে কানাইদাসও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, ব্যাপারটা যদি মামুলী রাহাজানি হয় তাহ'লে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু যাকে বলছো জগবন্ধু সরকার, সে ব্যক্তি তো মনে হচ্ছে ষ্টেশনে থেকেই তোমার পিছু নিয়েছে। আর একজন লোকও হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই আসছিল, তুমি লক্ষ্য কর নি। তা যদি হয় তাহ'লে তো মামুলী রাহাজানি বলে মনে হয় না। তোমাকে যখন বামুনগাছির কথা বলেছিলাম তখন কি আর কেউ ছিল সেখানে? তাও তো মনে হয় না। তাহ'লে এটা অনুমান করতে পারা যাচ্ছে যে তোমার ওই নক্সাখানার জন্যই এই বিপত্তি ঘটেছে। কিন্তু কেন?

খানিকটা চুপ করে থেকে কানাইদাস বলতে লাগলেন, আমার অনুমান যদি সত্য হয় তা হ'লে এ ব্যাপারে অন্য লোকেরও স্বার্থ রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। কাজেই খুব

সাবধানে পা বাড়িও বাবা! তোমার বন্ধুটি চলে গেলেন, তুমি একা, কাজেই আরও সাবধান হওয়া উচিত।

সেটা আমিও বুঝেছিলাম। স্থির করলাম, আপাততঃ কলকাতায় চলে যাই। ডক্টর রামশাস্ত্রী যদি এখনও সেখানে থাকেন তো ভালই, নইলে তাঁকে চিঠি লিখে তাঁর উপদেশ নিয়ে তবে এগুনো ভাল। এই ব্যাপারে অজানা অচেনা জায়গায় একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়ানোর কোনও মানে হয় না।

বামুনগাছি এবং রাজার মন্দিরের বিবরণ নিয়ে আবার একটা নক্সা তৈরী করিয়ে পরের দিনই কলকাতা রওনা হলাম। নীলকুঠীর সান্নিধ্যে বুনোপাড়ার অনেক প্রবীণ লোককে জিজ্ঞাসা করেও আকন্দতলার জগবন্ধু সরকারের কোনও হদিসই পেলাম না।

কলকাতার বাড়ীতে ফিরে এসেই দেখি আমার বাইরের ঘরের ডেক-চেয়ারটায় শুয়ে আছে দিলীপ—দিল্লীর দিলীপ ঘোষ। দিলীপ আমার আত্মীয় এবং ইতিপূর্ব্বে মুকুন্দ ভট্টর পুঁথির ব্যাপারে যখন দিল্লী গিয়েছিলাম, তখন সে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। আজ তাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে কলকাতায় আমার এখানে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তার আগমনের হেতু।

দিলীপ বললে, রেলে একটা চাকরির দরখাস্তের ফলে ইন্টারভিউর আহ্বান এসেছে, কাজেই দিল্লী থেকে সুদূর কলকাতায় তাকে আসতে হয়েছে। ইন্টারভিউ গত কাল শেষ হয়েছে, কর্ম্মকর্ত্তারা বলেছেন এক সপ্তাহের মধ্যে ফলাফল জানাবেন। কাজেই কলকাতায় তাকে অন্ততঃ এক সপ্তাহ থাকতেই হবে।

শুনে আনন্দ বোধ করলাম। আমার এই অনুসন্ধান পর্ব্বে যদি দিলীপকে সঙ্গী পাই তা হলে ভালই হয়।

চা খেতে খেতে তাকে সমস্ত কাহিনীটা বললাম। এ্যাডভেঞ্চারের নামে সে তো লাফিয়ে উঠলো, বললে, তাহলে তো আমার আসা সার্থক দেখতে পাচ্ছি। যে চাকরিটার জন্য দরখাস্ত করেছি তাতে শুনলাম বারোটি পোষ্ট এবং সাড়ে তিন হাজার দরখাস্ত পড়েছে। ইনটারভিউতে ডেকেছে পাঁচশো সতেরো জনকে। সুতরাং এই চাকরির ভরসা করা যেতে পারে না। অন্য চেষ্টা করতে হলে বাঙ্গালীর ছেলের পক্ষে দিল্লীর চেয়ে কলকাতাই ভালো। অতএব যতদিন কিছু না হচ্ছে ততদিন আমাকে পাবেন আপনি।

যাক্, ভালই হোল। খাওয়া-দাওয়া সেরে দিলীপকে সঙ্গে নিয়েই গেলাম বালীগঞ্জে ডক্টর রামশাস্ত্রীর কাছে। ভেনুগোপালনের কাছেই খবর পেলাম তিনি রাত্রের মেলে রওনা হবেন বোম্বাই।

রামশাস্ত্রী তো আমাকে দেখে অবাক্। গত কালও এমন সময় তিনি এবং আমি রবাটগঞ্জের নীলকুঠীতে চিঁড়ের ফলার গালাধঃকরণ করছি। আজ কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করবো এটা তিনিও কল্পনা করতে পারেন নি।

জগবন্ধু সরকার সংক্রান্ত দুর্ভোগের কথা বললাম। আমার চোখের লালিমা তখনও কাটে নি। নক্সাখানা এবং আমার নোটবুক খোওয়া যাওয়ার কথাও জানালাম। কানাই-দাসের সাবধান বাণীও বলতে ভুলি নি।

শুনে তিনি তো শিউরে উঠলেন। বললেন, আমাদের এই অভিযান সম্বন্ধে আর তো কোনও তৃতীয় ব্যক্তির স্বার্থ নেই, এবং আর কেউ এই ব্যাপার জানে বলেও তো মনে হয় না। কেবল একটা সন্দেহ মনের মধ্যে জেগে ওঠে। কানাইদাস বাবাজী যখন সেই ভাঙ্গা মন্দির, তার পুরোহিত আর বিগ্রহের ঝিনুকের মধ্যে নীলা বসানো চোখের কথা বলছিলেন, তখন সে কাহিনী আর কেউ শুনেছিল কিনা! আমার মনে হয় তারাই এর পেছনে লেগেছে সেই মূর্ত্তি আর তার দুই চোখের জন্য। কিন্তু কারা তারা? সেদিন তো ঘরের ভেতর আর কেউ ছিল না! বাইরে থেকে যদি কেউ আড়ি পেতে শুনে থাকে। কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব?

চোখের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠলো ডক্টর রামশাস্ত্রীর। তিনি বললেন, জলে যখন নেমেছি তখন ডুব দিতেই হবে। যাও তুমি বামুনগাছি, তার পর সম্ভব হলে প্রতিদিনের রিপোর্ট আমার কাছে পাঠিও এইখানকার ঠিকানায়। ইতিমধ্যে আমিও ব্যাপারটা বেশ করে ভেবে দেখি। কানাইদাস যে ভাঙ্গা মন্দিরের কথা বলেছেন সেটারও ইতিহাস যতটা সম্ভব আবিষ্কার করতে পারবো বলেই মনে হয়।

দিলীপের কথা বললাম। একজন সঙ্গী থাকলে ভাল হয় সেটা তিনিও স্বীকার করলেন।

আমাদের অনুসন্ধানের নবপর্য্যায় সুরু হোল।

(ক্রমশঃ)

পরিবর্ত্তন

৺কল্যাণী দেবী

·· এ খোখাবাবু···ইয়ে আয়ী লব্‌লবেবা ঝব্‌ঝবেবা···গুণাবো সীতাবো ··ও—ও—ও···

সঙ্গে সঙ্গে একখানা কচি মুখ দোতালার বারান্দায় দেখা গেল। সেদিকে এক নজর চেয়ে ফুটপাথের ওপর বুড়ো ইমাম আলি তার ঝোলাঝুলি নিয়ে বসে পড়ল, হাসিমুখে বলে চল্ল—হাসানিয়া···ইমানিয়া ··ইয়ে হ্যায় হারিয়া-কি মাই···ইয়ে হ্যায় পরিয়া-কি মাই···

ততক্ষণে কচি মুখখানার অধিকারী সাত বছরের খোকন নীচে রোয়াকে এসে দাঁড়িয়েছে।

বুড়ো মস্ত এক সেলাম করল খোকনকে। তার পর তার ঝোলা থেকে দুটি কাঠের পুতুল বার করল। পুতুল দু'টির বিশেষ কোন সৌন্দর্য্য ছিল না; চোখ-মুখ অনেকটা লেপা-পোঁছা হয়ে গিয়েছিল, জামা আর ঘাগ্‌রাগুলোর অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। বুড়ো বেশ জুৎ করে বসল, তার পর জোরে হাঁক দিল আইয়ে, দেখিয়ে বানারসকী নাচ্‌নেওয়ালী নাচ দেখলাতি হ্যায়·· ঝুমুর—ঝুমুর—ঝুম—ঝুম···

পুতুল দুটোর ঘাগ্‌রার ভেতরে দু'হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বুড়ো অপূর্ব্ব কৌশলে তাদের নাচাতে লাগল। একটা পুতুল হাততালি দিয়ে চল্ল, অন্যটা তার তালে তালে হেলে-দুলে, ঘুরে-ফিরে, কোমর বেঁকিয়ে নানা অঙ্গভঙ্গী করে নাচতে লাগল। একটী দুটী করে বুড়োর আশেপাশে ছোট ছেলেদের বেশ একটী ভীড় জমে গেল। বুড়ো তাদের দিকে চেয়ে হাসিমুখে গান ধরল—আরে বাগিচামে ফুল আয়া, দিলমে আয়া রং···গানের সঙ্গে সঙ্গে খোকন মাথা দোলাতে লাগল আর এক একবার সমাগত ছেলেদের দিকে এমন ভাবে চাইতে লাগল যেন বুড়ো যে এই ভাবে পুতুল দু'টো নাচাচ্ছে তার সমস্ত কৃতিত্ব তারই।

গান ছেড়ে ইমাম আলি ছড়া কাটতে লাগল—

আরে শাগ লায়া, পাত্তা লায়া, আউর লায়া ঝাউয়া,
শ্বাশ-পুতোহু কাজিয়া হুয়া, নাক লে গিয়া কৌয়া···

ছড়া শুনে খোকন খিল-খিল করে উঠল, বল্ল—তার পর? আরো বল—

বুড়ো বল্ল—

আরে ডালভাত সাপুর-সুপুর মছ্‌লিমে কাঁটা,
ছুটকিকে তেল-সিন্দূর, বড়কিকে ঝাঁটা···

মিনিট কুড়ি পরে পুতুলদের নাচ শেষ হ'ল। বুড়োকে বসতে বলে খোকন দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। একটা কাগজ মুড়ে দু' টুকরো পাঁউরুটি আর দু'টো নারকেল নাড়ু বুড়োর হাতে এনে দিল, সঙ্গে দিল একটা সিকি। বুড়োর মুখে একটা আনন্দের হাসি খেলে গেল। ছোট ছেলেদের ভীড়টির দিকে চেয়ে বল্ল, – দেখো হামারা খোখাবাবুকো? দুসরা দুসরা ডেরামে দু চারঠো পৈসা দে কর ভাগা দেতা হ্যায়, লেকিন খোখাবাবুকে ইঁহাসে হম্ বেগ্‌র খানাসে কভি নহি যাতে হেঁ···

পরম তৃপ্তির সঙ্গে বুড়ো রুটি চিবুতে লাগলো, রোয়াকের ওপর একটা ঘটিতে জল নিয়ে বসে খোকন তার খাওয়া দেখতে লাগল, খাওয়া হয়ে গেলেই বুড়োর মগে জল ঢেলে দেবে। চাকরদের হাত দিয়ে বুড়োর খাবার কিংবা জল দেওয়া খোকনের একেবারেই পছন্দ নয়।

প্রতি রবিবার বুড়ো ইমাম আলি তার পুতুলদের নিয়ে আসে। বুড়ো মানুষ, রোজ বেরুতে পারে না। রবিবার বেরিয়েই প্রথমে সে খোকনের কাছে আসে। চল্লিশ বছর ধরে সে পুতুল নাচাচ্ছে, কিন্তু খোকনের মত এমন দরদী দর্শক সে তার এই ষাট বছরের জীবনে আর পায় নি। খোকনও যে এই বুড়ো আর তার পুতুল দু'টোর ভেতর কি আকর্ষণ পেয়েছে তা সে-ই জানে। একই পুতুল, একই নাচ, একই গান, একই ছড়া — অথচ খোকনের কাছে তারা পুরোনো হয় না। প্রতিবারই সে এমন ভাবে সমস্ত ব্যাপারটা উপভোগ করে যেন সে এগুলো প্রথম দেখছে।

* * * *

সেদিন খোকনের দিদি বাক্স গুছোচ্ছিল, এক পাশে কয়েকটা ব্লাউজ জড়ো করা ছিল। খোকনকে সেগুলো নাড়া-চাড়া করতে দেখে দিদি বকে উঠ্‌ল,—এই, কি করছিস? —ইস্ত্রি নষ্ট হয়ে যাবে যে! খোকন দু'টো রং-চংএ ব্লাউজ হাতে তুলে নিল, বল্ল— দিদিভাই, তুমি এই জামাগুলো পর? কি রকম বিশ্রী হয়ে গেছে রং উঠে—পরলে কিন্তু তোমাকে ভারী খারাপ দেখাবে!

দিদি হাসল।—তাই না কি? তুই যে মস্ত সমঝদার হয়ে উঠলি!

—না দিদি, সত্যি— তুমি এগুলো আর প'রো না।

— আচ্ছা, আচ্ছা—পরব না, এখন তুই রাখ্ তো।

—পরবে না? ঠিক বলছ? তাহ'লে এগুলি আমি নিলাম।—বলেই খোকন জামা দু'টো হাতে করে দৌড়ে পালিয়ে গেল। খোকনের কাণ্ড দেখে দিদি অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল।

পরদিন ইমাম আলি আসতেই ব্যাপারটা বোঝা গেল। যথারীতি নাচ-গান হয়ে

যাওয়ার পর খোকন বুড়োকে বল্ল—দেখ বুড়ো, তোমার লব্‌লবো ঝব্‌ঝবোর জামা-কাপড়গুলো একদম ছিঁড়ে গেছে, ওদের নতুন জামা পরাও।

— কোথায় পাব?—বুড়ো জানায়।

— আমি দিচ্ছি।

খোকন ভেতরে গিয়ে দিদির সেই জামা দু'টো এনে বুড়োর হাতে ফেলে দিল। —দ্যাখো তো এইগুলো দিয়ে জামা করলে কী সুন্দর ওদের দেখাবে — এইগুলো পরে যখন নাচবে, ওঃ··· ! খোকন সেই ছবিটি কল্পনা করে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

কৃতজ্ঞতায় বুড়োর চোখ ছল্‌ছলিয়ে উঠলো, হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করল—আল্লা খোখাবাবুকো দোয়া দে!

* * * *

রান্না সেরে মা বিকেলের জন্য রুটি গড়ে রাখছিলেন। খোকন এসে পাশে বসল। জিজ্ঞেস করল—মা, আটা বেশী নিয়েছ তো? আজ কিন্তু বুড়ো আসবে।

মা হাসলেন,—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আমার মনে আছে।

মা তাওয়া থেকে রুটি উনুনে ফেলছিলেন। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে খোকন বল্ল, —ও মা, ঠিক যেন ব্যাঙের মত ফুলে উঠ্‌ল! আচ্ছা মা, চারখানা রুটিতে ঘি মাখিয়ে রাখবে?

—তুই খাবি ঘি-মাখানো রুটি? বেশ তো!

— না, আমি না।

—তবে? তোর দিদি তো খায় না ঘি-দেওয়া রুটি। তোর বাবাও না।

— না, মা, ওদের জন্য বলছি না!

মা অবাক্ হলেন,—তবে কার জন্য বলছিস?

খোকন ইতস্তত: করতে লাগলো; তারপর সলজ্জভাবে বল্ল—জান মা, বুড়ো হয়েছে তো, দাঁত সব পড়ে গেছে—শুকনো রুটিগুলো খেতে ওর কষ্ট হয়।

মা বুঝলেন কার কথা খোকন বলছে। ছেলের মনের পরিচয় পেয়ে তাঁর মনটা আনন্দে ভরে উঠলো। বল্লেন—বেশ, রাখছি ঘি মাখিয়ে। তারপর হেসে বল্লেন, — দেখিস্, শেষে নিজেই আবার খেতে চাস নে!

খোকন প্রবল প্রতিবাদ করে উঠলো,—কক্ষনো না, কক্ষনো না,—তুমি দেখে নিও।

এক রবিবার বুড়ো এলে পর খোকন তাকে খাইয়ে পয়সা দিয়ে তার সঙ্গে গল্প ফেঁদে বসল। বল্ল,—আচ্ছা বুড়ো, তুমি বুঝি রামায়ণ পড় নি?

—কাঁহে খোখাবাবু? বুড়ো অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করল।

—মা আমাকে কত রামায়ণের গান শোনান—তুমি তো কোনদিন রামায়ণের গান কর না? জান না বুঝি? সেই যে লবকুশ গান গেয়েছিল রামচন্দ্রের সভায়—কি সুন্দর গান! —তুমি গাইতে পার না?

খোকনের আগ্রহ দেখে বুড়োর ভারা কষ্ট হ'ল। তার মনে হ'ল সত্যিই রামায়ণের গান না জানাটা তার মস্ত অপরাধ হয়ে গেছে। বল্ল,—আচ্ছা, খোখাবাবু, হাম ভি শুনায়েঙ্গে রামায়ণকা গানা।

এরপর দু' রবিবার বুড়ো এল না। খোকন আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল—কী হতে পারে বুড়োর! অনেক দিন আগে বুড়োর ছেলের অসুখ হয়েছিল, তখন কয়েক রবিবার সে আসতে পারে নি।—আবার ছেলের অসুখ হ'ল না তো?

দিদি বল্ল,—ছেলের কেন, ওর নিজেরই হয়তো অসুখ হয়েছে।

- যাঃ! খোকনের গলায় পূরো অবিশ্বাস।

—যাঃ মানে? তোর বুড়ো কি অজর অমর না কি? কে জানে হয়তো বা পটল তুলেও থাকতে পারে!

দিদির কথায় খোকনের মন খারাপ হয়ে গেল। বুড়োর বাড়ীর পথ জানলে বোধ হয় সে তার উদ্দেশেই বেরিয়ে পড়ত।

এর পরের রবিবার। দোতালার বারান্দায় খোকন বসে আছে, হাতে "রাক্ষসপুরীর কথা", কিন্তু মন পড়ে আছে পথের ওপর। কখন পরিচিত কণ্ঠে শুনবে—ইয়ে আয়ী লব্‌লব্বো ঝব্‌ঝব্বো···তারই জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে। হঠাৎ রাস্তার মোড়ে বুড়োকে দেখা গেল। আলখাল্লা ও লুঙ্গি পরনে, কাঁধে মস্ত এক ঝোলা, খুট্‌খুট্‌ করে এগিয়ে আসছে। খোকন ঊর্দ্ধশ্বাসে নেমে এল।

—এতদিন আস নি কেন? ও বুড়ো··

বুড়ো রোয়াকের নীচে এসে দাঁড়াবার আগে খোকন-ই তার কাছে পৌঁছে গেল আস নি কেন, এ্যাঁ? ছেলের অসুখ হয়েছিল বুঝি? এখন ভাল আছে? তুমি ভাল আছ তো? তোমার কোনো অসুখ হয় নি তো, বুড়ো? তুমি হাঁপাচ্ছ কেন? বুঝেছি, তোমারই অসুখ করেছিল। তাহ'লে এলে কেন? তোমার চলতে খুব কষ্ট হচ্ছে, না? আমি কত ভাবছিলাম—

খোকনের এক নিঃশ্বাসে এতগুলি প্রশ্নের উত্তরে বুড়ো শুধু একটু হাসল। একখানা কচি বুক যে তার জন্য এতখানি উদ্বেগ নিয়ে এ রকম অধীর আগ্রহে পথ চেয়েছিল এ কথা মনে করে বোধ হয় তার বুকখানা ভরে উঠলো। বল্ল—খোদা খোখাবাবুকো ভালা করে।

বুড়ো ঝোলা থেকে পুতুল দুটো বার করতেই খোকনের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল—তাদের গায়ে দিদির ব্লাউজ দিয়ে তৈরী জামা আর ঘাগ্‌রা। ওদের চোখমুখও নতুন করে রং করা হয়েছে। বুড়ো একগাল হেসে জিজ্ঞেস করল,—কেয়া খোকাবাবু, লব্‌লব্বো ঝব্‌ঝব্বোকে পছানতে হেঁ?

খোকন বল্ল,—সত্যি, ওদের চেহারা একদম বদলে গেছে—কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

বুড়ো বল্ল,—আজ ইন্ লোগোঁকী গানা ভি বদল গয়ি। শুনায়েঙ্গে পিছে।

খোকন বল্ল,—ওদের সেই ঝগড়াটা আজও শোনাও না বুড়ো।

অন্য দিনের মত আজও একটি ছেলের দল জুটেছিল; তারা সায় দিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুড়ো, সেই ঝগড়া—মারপিট—

বুড়ো শুরু করল—আ জেব্‌উন্নিসা, মেহেরুন্নিসা, ফুলসুমিয়া, দিলখুশিয়া—ইয়ে হামিদা, মামুদা, জুবেদা খোখাবাবুকে সেলাম কর্ লে, দোয়া কর্ লে—সঙ্গে সঙ্গে পুতুলগুলোর ঘাগ্‌রার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল, তারা নীচু হয়ে খোকনকে সেলাম করল।

বুড়ো গান শুরু করল—দুই সতীনের কাহিনী।

—ইয়ে দোনোকো সাঁই গিয়া পরদেশ, ছুট্‌কিকে লিয়ে ভেজা পাটনাকি শাড়ী, আঁখোকো সুর্ম্মা, দাঁতোকো মিশি আউর পচাশঠো রূপেয়া—দেখ্‌কো বড়ী খুসী হো গয়ি—

ছুট্‌কির খুসীর নাচ দেখে খোকন হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

—হাঁ—আ-অ, আউর বড়কিকো লিয়ে কেয়া ভেজা? না, পাঁচঠো রূপেয়া! দেখ্‌কো জর্ গয়ি, জ্বল্ গয়ি—

বড়কি দু'হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে রণচণ্ডীর নাচ দেখাতে লাগল। এমন মজার দৃশ্য খোকন যেন জীবনে দেখে নি! তার সমস্ত চোখমুখ ভীষণ ভাবে এই দৃশ্যটা উপভোগ করতে লাগল।

তারপর বড়কি ছুট্‌কিকে খোসামোদ শুরু করল, কিন্তু ছুট্‌কি চটে লাল, সে কিছ্ছু বুঝতে চায় না—নহি, হম্ কাজিয়া করেঙ্গে, তুম্‌সে লড়েঙ্গে—

—ব্যস্, দোনোমে লগ্ গিয়া ঝোটাম্-ঝোটি—

দু'জনে ঝুটোপুটি চল্ল, শেষ পর্য্যন্ত কোন মতে মিটমাট হ'ল।

এবার বুড়ো তার নতুন গান শোনাবে বল্ল। খোকন অত্যন্ত উৎসুক হয়ে রোয়াকে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ল—কি নতুন গান আজ বুড়ো শোনাবে?

খোকনের দিকে একবার আড়ে চেয়ে বুড়ো গান ধরল—

কাঁহা মেরা রামচন্দর, কাঁহা লছমন ভাই,
রাজ্ ছোড়কে বন্‌মে বুলে হামারা সীতা মাঈ—ওহ্-হোঃ!

খোকনের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল।

লঙ্কাপুরসে দুষমণ আয়া, সীতা হো গয়ি চোরি,
জটায়ু-বীর আউর রাবণসে লড়াই হুয়া বড়্ ভারী!

— বুড়ো, তুমি তো রামায়ণ গাইছ!— উত্তেজনায় খোকন উঠে দাঁড়াল।

—হাঁ, খোখাবাবু, আপকে লিয়ে হাম্ শিখ্‌কে আয়া। আচ্ছা হ্যায় না?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভাল, আরো গাও।

বুড়ো আরো গেয়ে চল্ল। তন্ময় হয়ে খোকন শুনতে লাগল। সেদিন বুড়ো খাওয়া শেষ করে মস্ত একটা ঢেকুর তুলে বল্ল—খোখাবাবু, পেট একদম্ ভর্ গিয়া, চল্‌নে নেহি সকেঙ্গে—

* * *

সেদিন মা তাঁর ছোট কাঁচিখানা কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না। দিদি বল্ল,— খোকনের বাক্স খুঁজে দেখ। খোকনের খেলার বাক্স খুলে মা অবাক্ হয়ে গেলেন। সকালে চপ্ ভেজেছিলেন—দাও না মা, চেখে দেখি—বলে খোকন আগেই দু'খানা চপ্ নিয়ে এসেছিল। মা দেখলেন সে চপ্ দু'খানা বাক্সে রাখা আছে। বুঝলেন কার জন্য। খোকনকে ডেকে বল্লেন—ওরে, বুড়ো তো কাল আসবে, চপ্ যে নষ্ট হয়ে যাবে!

ধরা পড়ে খোকন বিষম লজ্জিত হ'ল, অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মা বল্লেন- বেশ তো, তোর বুড়োকে একদিন খাওয়াব চপ্। মনে মনে বল্লেন— ঠাকুর, আমার খোকনের এই মনটি যেন চিরদিন এম্‌নিটি-ই থাকে—

কিছুদিন পর। বুড়ো এসে যথারীতি হাঁক দিল, কিন্তু কচি মুখখানার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। দিদি বারান্দায় দাঁড়িয়ে বল্ল—বুড়ো, খোকনের যে অসুখ করেছে!

শুনে বুড়ো ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠল। কবে জ্বর হ'ল? খুব জ্বর না কি? বেহুঁশ্ আছে? কথা বলছে না? দিদিকে বল্ল যে একটু জল চাই তার, খোকনকে সে ওষুধ দেবে। তার আগ্রহ দেখে দিদি একটা বাটীতে একটু জল নিয়ে এল। বুড়ো বাটীটা ছুঁলো না, কিন্তু তার চার পাশে ফুঁ দিয়ে দিয়ে আঙ্গুল নেড়ে কি সব বিড়্‌বিড়্ করতে লাগল। তার পর বল্ল যে সে জলে মন্তর পড়ে দিয়েছে, এইবার জলটা খোকনকে খাইয়ে দিলে অসুখ ভাল হয়ে যাবে।

দিদি জলের বাটীটা ভেতরে এনে একপাশে সরিয়ে রাখতেই মা বল্লেন,—আহা, ফেলে দিস্ নে, এত আকাঙ্ক্ষা করে দিয়েছে!

সে কি মা! এই জল তুমি খোকনকে খাওয়াবে? ফুঁ দিয়েছে এতে, কে জানে কত থুতু ছিট্‌কে পড়েছে!

— না খাওয়াস্, মাথায় একটু ছিটিয়ে দে।

তাই দিল দিদি।

* * *

এর পর দশ বছর কেটে গেছে। খোকনের বাবা বদ্‌লি হয়ে চলে গিয়েছেন অন্যত্র।

বুড়ো ইমাম আলির পুতুল নাচানোর উৎসাহ একদম কমে গিয়েছে। কেউ আর তেমন আগ্রহ করে তাকে ডাকে না, তার গান শোনে না। খোকনদের বাড়ীতে যারা এসেছে তাদের ছেলেমেয়েরা বুড়োকে দেখলে হেসে গড়িয়ে পড়ে। ও মা, এ আবার পুতুল-নাচ নাকি! ওগুলো পুতুল না পোড়াকাঠ? এ গলায় আবার বুড়ো গান গাইছে—শোন্, শোন্ কি মজা!

বুড়ো পাড়ার সকলের কাছে খোকনের খোঁজ নেয়, আবার কবে খোকনরা ফিরবে জিজ্ঞেস করে।

অবশেষে খোকনের বাবা আবার সেই সহরে সত্যিই ফিরে এলেন। খবর পেয়েই বুড়ো হাজির হ'ল। অনেক বেশী বুড়ো হয়ে গেছে, চোখে দেখে না, ভাল চলতেও পারে না। পুতুলের ঝোলাটি কিন্তু ঠিক কাঁধে ঝোলানো আছে।

আগেকার মত লব্‌লব্বো-ঝব্‌ঝব্বো বলে হাঁক দিতেই দরজায় মা এসে দাঁড়ালেন, বল্লেন—খোকাবাবু তো আসে নি, কলেজ বন্ধ হ'লে আসবে।

বুড়ো খোকাবাবুর সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন করল। মা হাসলেন, বুড়োর বুঝি ধারণা যে খোকন তেম্নি ছোট্টটিই আছে! বুড়োকে পরিতোষ করে খাইয়ে পয়সা দিয়ে মা বিদেয় দিলেন।

বুড়ো প্রায়ই আসে, খোঁজ নেয় খোকাবাবু এল কিনা। খোকাবাবু এলে তার ঝিমিয়ে-পড়া নাচ-গান আবার জমে উঠবে। লব্‌লব্বো-ঝব্‌ঝব্বোকে নিয়ে সে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কেউ তাকে আমল দেয় না, তার গান কেউ শুনতে চায় না। অথচ ঐ যে একটা অন্ধ ভিখিরী বছর কয়েক হ'ল এ পাড়ায় ভিক্ষে করতে আসে—তাকে ডেকে লোকে তার গান শোনে! অথচ কী-ই বা তার গান, আর কী-ই বা তার গলা! খোকাবাবু নেই, কে এ সব বুঝবে?

একদিন খোঁজ নিতে এসে বুড়ো খোকনের দেখা পেল। আ রে, খোকাবাবুকে চেনাই যায় না, কত লম্বা আর জোয়ান হয়েছে খোকাবাবু! আনন্দে বুড়ো আত্মহারা হয়ে পড়ল। হাজার রকম প্রশ্ন করেও যেন তার আশা মেটে না। বল্ল,—খোখাবাবু, লব্‌লব্বো—ঝব্‌ঝব্বোকো নাচ দেখো—

খোকন হাসল একটু।

বুড়ো ঝোলা থেকে পুতুল দুটো বার করল। তার পর হাঁক দিল—ইয়ে আয়ি লব্‌লব্বো-ঝব্‌ঝব্বো, সীতাবো-গুলাবো··কিন্তু তার গলা দিয়ে পূরো আওয়াজ বার হ'ল না, মাঝপথেই স্বরটা কেঁপে কেঁপে ভেঙ্গে গেল। তবু বুড়ো পুতুলদের নাচিয়ে চল্ল, কিন্তু পাঁচ মিনিট নাচিয়েই থামিয়ে দিল। তারপর রামায়ণের গান ধরল - কাঁহা মেরা রামচন্দর কিন্তু কেবল কথা ক'টি ছাড়া তার গলা দিয়ে কোনো সুর বার হ'ল না। একটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কর্কশ আওয়াজ শুধু শোনা যেতে লাগল—তবু গলার শির ফুলিয়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বুড়ো গাইবার চেষ্টা করতে লাগল। খোকাবাবু খুশী হবে যে!

খোকন ভেতরে চলে এল। চাকরকে ডেকে বল্ল—ওকে গাইতে বারণ কর, ও গান তো আর শোনা যায় না! অত বুড়ো হয়ে পড়েছে, আর কি গাইতে পারে? ওর কষ্ট হচ্ছে। এই টাকাটা ওকে দিয়ে দে।

চাকরের হাত থেকে খোকনের দেওয়া টাকাটা হাত পেতে নিয়ে বুড়ো আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু তার চোখেমুখে আজ আর আনন্দের ঢেউ খেলে গেল না। অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাবে সে পথে নেমে এল খোকনের কথাগুলো সে শুনতে পেয়েছে।

একটা জামরুল গাছের নীচে বসে পড়ল বুড়ো। ঝোলাটা পাশে নামিয়ে রাখল। এত বড় আঘাতের জন্য সে তৈরী ছিল না। এই দশ বছরের প্রতিটি দিন সে খোকনের প্রতীক্ষা করেছে। খোকাবাবু ফিরলেই যে তার পুতুলনাচের ও গানের পূরো কদর হবে এ সে সমস্ত মন দিয়ে বিশ্বাস করত। সকলে যখন অন্ধের গান শুনে বাহাবা দিত, সে অবজ্ঞাভরে হাসত—আচ্ছা, খোকাবাবু ফিরে আসুক, তখন দেখা যাবে। কিন্তু আজ এ কি হ'ল।—এ কি শুনল সে! – তার খোকাবাবুর মুখে এই কথা! নিদারুণ ক্লেশে বুড়োর বুকটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যেতে লাগল। তবে তো সত্যিই তার গান আর শোনবার মত নেই।

অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়ে বুড়ো গাছতলায় বসে রইল। তার পর লাঠি ভর করে উঠে আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করল। দুটি ছোট ছেলে গাছতলায় গুলি খেলছিল, তারা ডেকে বল্ল—ও বুড়ো, তোমার ঝোলা যে পড়ে রইল! বুড়ো সেদিকে ফিরেও চাইল না। পঞ্চাশ বছরের সাথী লব্‌লব্বো-ঝব্‌ঝব্বো আজ খোকনের মুখের একটি কথায় তার কাছে একেবারে নিষ্প্রয়োজন হয়ে গেছে।

পশ্চিম দিগন্তে

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

সোমনাথের কথা বলছিলাম।

মামুদ বেগদা সোমনাথ মন্দির থেকে বিগ্রহ সরিয়ে দিয়ে মন্দিরকে বানিয়ে দিল মসজিদ।

দেখতে দেখতে আরও তিনশো বছর কালস্রোতে হারিয়ে গেল। তার পর এলেন ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাঈ। তিনি আবার সোমনাথকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। কিন্তু প্রাচীন মন্দিরের তখন আর বিশেষ কিছুই ছিল না। সেখানে আবার নতুন মন্দির তৈরী না করে, একটু তফাতে তিনি এক নতুন মন্দির তৈরী করালেন। এই মন্দিরটি ঠিক সাধারণ মন্দিরের মত হলো না। এটি হলো দোতলা। নীচের তলাটি রইল ভূগর্ভে, সেইটিই হোল আসল মন্দির। সেইখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন সোমনাথকে, আর উপরের তলে প্রতিষ্ঠা করলেন অহল্যেশ্বর শিবলিঙ্গ। যদি আক্রান্ত হয়, তাহ'লে নীচের তলের মুখ বন্ধ করে দিলে কেউ আর সোমনাথকে খুঁজে পাবে না। এই মন্দিরটি সম্পূর্ণ হয় ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে।

তারপর ইন্দোরের হোলকার ও বরোদার গাইকওয়াড় রাজাদের আমলে সোমনাথের লুপ্ত গৌরব আবার ফিরে আসে। কিন্তু সে মাত্র সাঁইত্রিশ বছরের জন্য। তারপর কাথিয়াবাড় অঞ্চল এসে পড়লো ইংরাজদের হাতে। দেশীয় রাজাদের মাথার উপর বসলো পলিটিক্যাল এজেন্ট। ইচ্ছামত কাজ করার স্বাধীনতা আর তাঁদের রইল না। একবার মন্দিরের সামান্য সংস্কার করার জন্য এজেন্টের কাছে গাইকওয়াড়কে অনেক তদ্বির করতে হলো।

কিন্তু ইংরাজদের সেই প্রাধান্যও একদিন অস্ত গেল। ভারতভূমিকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়ে চরম ক্ষতি সাধন করে ইংরাজ এ দেশ থেকে বিদায় নিলে। জুনাগড়ের নবাব তখন পাকিস্তানে যোগ দেবার জন্য উৎসুক হয়ে পালিয়ে গেলেন পাকিস্তানে। রাজ্য শাসনের ভার দিয়ে গেলেন দেওয়ান শা-নওয়াজ ভট্টর উপর। পাকিস্তান হয়েছে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে। জুনাগড়ে বেশী মুসলমান নেই, জুনাগড় পাকিস্তানে পড়লো না। দেওয়ান ভট্ট স্বরাষ্ট্রসচিব সর্দার বল্লভভাইকে নিমন্ত্রণ জানালেন। সর্দার প্যাটেল দেওয়ালী উৎসবে জুনাগড়ে এলেন, সঙ্গে এলেন মহারাজা জামসাহেব, কাকাসাহেব গ্যাড্‌গিল ও শ্রীকানাইয়ালাল মুন্সী। সর্দার প্যাটেল সেই দিনই ঘোষণা করলেন— 'আজকের এই শুভদিনে আমরা স্থির করেছি যে সোমনাথের মন্দির আবার তৈরী করতে

হবে। এতে সৌরাষ্ট্রের জনগণের সহযোগিতা আমি প্রার্থনা করি। এই মহান্ কাজে সকলকেই অংশ গ্রহণ করতে হবে।' ১২ই নভেম্বর ১৯৪৭।

আড়াই বছর পরে পুরানো মন্দিরের জায়গায় নতুন মন্দির তৈরী হতে সুরু হলো। নবনগরের মহারাজা জামসাহেব নতুন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনা করলেন। ৮ই মে ১৯৫০। দেখতে দেখতে এক বছরের মধ্যে মন্দিরের একটি তলা সম্পূর্ণ হলো। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ মন্দিরমধ্যে সোমনাথ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করলেন। ১২ই মে ১৯৫১।

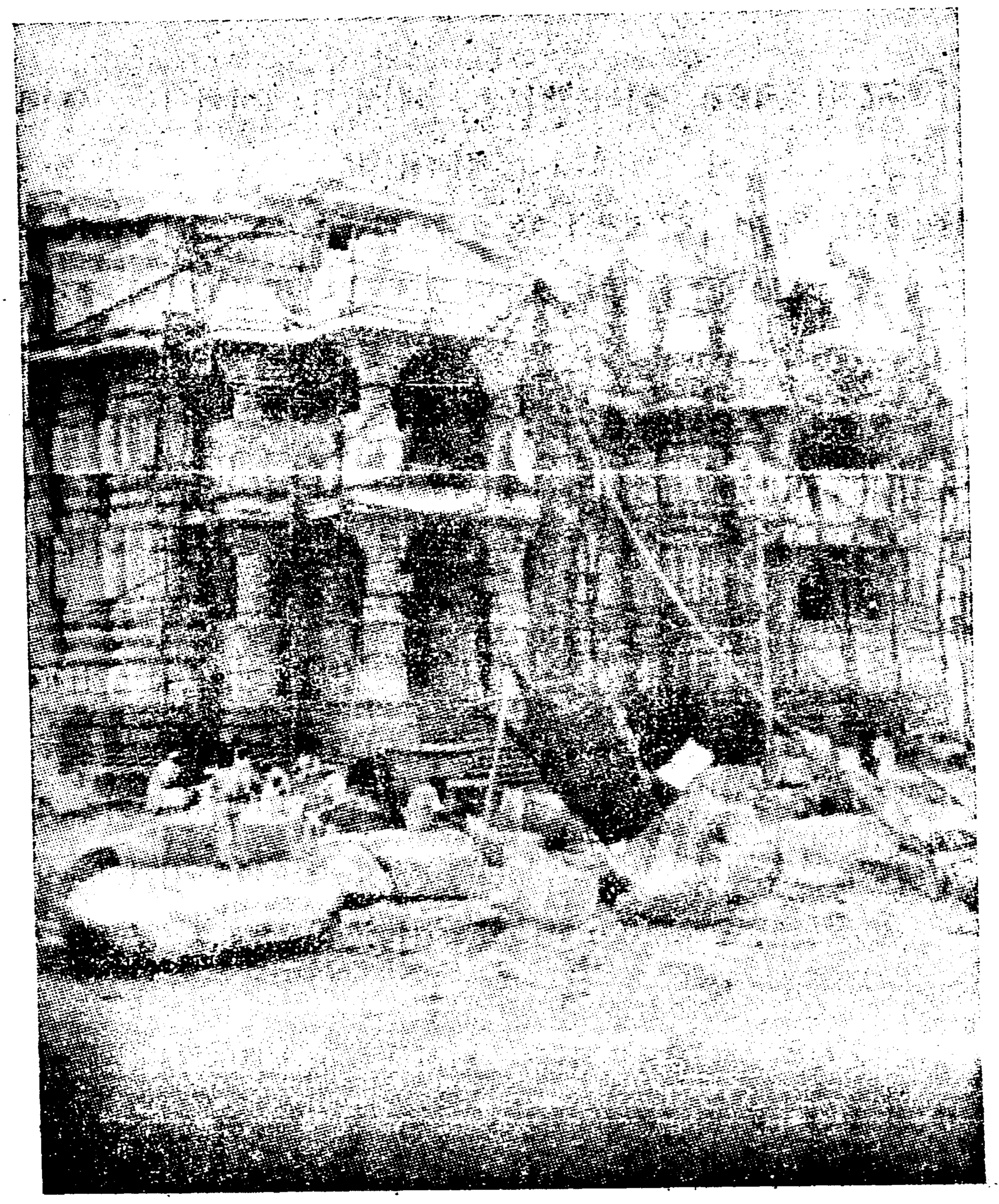
সোমনাথের নির্মায়মান মন্দির

তারপর সাড়ে ছ' বছর কেটে গেছে। হালকা চম্পকবর্ণের পাথর দিয়ে মন্দিরের তিনটি তলা সম্পূর্ণ হয়েছে। চতুর্থ তলা ও মন্দিরচূড়া এখনও বাকী, নাটমণ্ডপও সম্পূর্ণ হয় নি। সামনের মাঠে শত শত প্রস্তরশিল্পী কাজ করে চলেছে, বড় বড় কপিকল দিয়ে ভারী ভারী পাথর তোলা হচ্ছে মন্দিরের মাথায়। নির্মাণকার্য্য চলেছে পূর্ণোদ্যমে। যেটুকু গড়ে উঠেছে তাতে অপূর্ব কারুকার্য খোদাই করে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখা হয়েছে। মণ্ডপের বাঁ দিক্ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। আমরা বরাবর উঠে গেলাম তিনতলার ছাদে।—সেখানে মিস্ত্রীরা বড় বড় পাথর নিয়ে ব্যস্ত। কয়েকটি বড় বড় গবাক্ষ অর্ধেক তৈরী হয়েছে। সেই গবাক্ষের পাশে এসে দাঁড়ালাম। সামনে দিগন্তবিস্তারী সমুদ্র। যত দূর চোখ যায় শুধু নীল জল। অস্তগামী সূর্যরশ্মি নীলাম্বুরাশি

কালো করে তুলছে। প্রশান্ত আকাশে রক্তিমতার ঢেউ। সূর্যদেব নেমে আসছেন সাগরের প্রান্তে। উপরের রক্তরাগ ও নীচের কৃষ্ণনীল দিগ্বলয় থেকে এগিয়ে এসে আছড়ে পড়ছে মন্দিরের পাষাণ-প্রাকারের গায়।

আকাশ লাল করে দিয়ে সূর্য অস্ত যায়। শেষ রশ্মিরেখা সাগরের কালো জলে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় আবিরের দীপ্তি জাগায়। এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি নেমে আসে চারিপাশে।

মন্দিরশীর্ষ থেকে আমরা নেমে আসি। সামনের প্রাঙ্গণসীমান্তে পাথরের বাঁধ দেওয়া হয়েছে। সেই দেয়ালের কোলে আছড়ে এসে পড়ছে সাগরের সফেন শুভ্রতা। প্রশস্ত দেয়ালের একপাশে গিয়ে আমরা ক'জন বসলাম। একপাশে প্রাচীন মন্দিরের কৃষ্ণপ্রস্তরের ভগ্নশেষ ভিত্তিটুকু পড়ে আছে। তারই পাশে এই নতুন মন্দির। এ মন্দির যেন একটি চাঁপা ফুলের কুঁড়ি, আকাশের পানে মুখ তুলে ফুটে উঠতে চাইছে। অতীতে একদিন এই পুষ্পকোরক শতদল বিস্তার করে ভারতের সংস্কৃতির পূর্ণরূপ প্রকাশ করেছিল। বারো শো বছর ধরে বিদেশী ভিন্নধর্মীর অনাচারে সে সংস্কৃতি বৃন্তচ্যুত হয়ে ছিল। পশ্চিম ভারতের গরিমা লুপ্ত হয়ে ছিল। সামনের ওই বিধ্বস্ত মন্দিরের ভগ্নশেষ ভিত্তিটুকু সেই লুপ্ত গরিমার সাক্ষ্য বহন করছে। ভারতভূমি আবার আজ নিজ শৌর্যে দীপ্যমান হয়ে উঠেছে, চম্পককোরক তাই আজ আবার মুকুলিত হয়ে উঠছে পশ্চিমের এই প্রাচীন বেলাভূমিতে। আরব লুণ্ঠনকারী বার বার এসে আঘাত করেছে এই বেলাভূমিতে। আরব সাগরের ঢেউ সেই কাহিনী আজও বুঝি ধ্বনিত করছে এই পাষাণ-প্রাকারের গায়।

সংস্কৃত ভাষার গল্প

শ্রীঅপর্ণা দাশগুপ্ত, এম্. এ

আমাদের অনেকেরই ধারণা,—ভাষা হচ্ছে মানুষের কাছে কেবল ভাব প্রকাশের বাহন মাত্র। কিন্তু, সত্যি কি শুধু তাই? তা নয়। ভাষার ভিতর দিয়েই মানুষ তার ইচ্ছা ও কল্পনাকে রূপায়িত করে। তাই যে ভাষা যত উন্নত, সে ভাষাভাষী জাতিও তত উন্নত এই আমরা দেখতে পাই। ভারত এখন বহুভাষাভাষী দেশ। এখানে পাঞ্জাবী, সিন্ধী, গুজরাটী, মারাঠী, হিন্দী, বাংলা, অসমীয়, ওড়িয়া প্রভৃতি নানা প্রাদেশিক ভাষা

প্রচলিত আছে। সংস্কৃত ভাষাকে এই সব ভাষার জননী বলা হয়। কারণ সংস্কৃত ভাষা থেকেই এই সব ভাষার উদ্ভব হয়েছে। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষাই অনেক বছর ধরে বদ্‌লাতে বদলাতে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালয়ালম্ প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগুলির উৎপত্তি সংস্কৃত ভাষা থেকে হয় নি। সাঁওতালী, মুণ্ডারী, হো প্রভৃতি অনুন্নত ভাষাগুলি কোল ভাষা। সংস্কৃত ভাষা থেকে এগুলিরও উৎপত্তি হয় নি। এই সংস্কৃত ভাষা কোথা থেকে এল এবং কতদিনে ও কেমন ভাবে এই ভাষা বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষার রূপ নিল সে বিষয়ে নিশ্চয়ই তোমাদের জানতে ইচ্ছা করে?

আনুমানিক খৃঃ পূর্ব ১৫০০ অব্দের দিকে আর্য্যেরা বাইরে থেকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পারস্যের মধ্য দিয়ে ভারতে এসে প্রবেশ করে। এদের অন্যান্য দল পারস্য ও ইউরোপের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতে এসে যারা বসবাস করতে থাকে তাদের ভারতীয় আর্য্য বলা হয়। আর্য্যেরা এদেশে এসে একের পর এক উত্তর ভারতের জনপদগুলি অধিকার ক'রতে থাকে এবং এদেশের আদি বাসিন্দাদের উপর আর্য্যভাষার প্রভাব বিস্তার করে।

ভারতে এসে আর্য্যেরা সর্বপ্রথমে পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। বেশীদিন তারা এই অঞ্চলে আবদ্ধ থাকে নি। রাজ্যজয় ও নূতন দেশের সন্ধানে তারা আরও দূরে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। প্রথম অবস্থায় আর্য্যেরা যাযাবর জাতি ছিল এবং প্রধানতঃ চাষবাস আর পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করত। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যও তারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হ'ল।

আর্য্যেরা যখন ভারতে আসে তখন এদেশে সুসভ্য দ্রাবিড় ও অর্দ্ধসভ্য কোল বা অষ্ট্রিক শ্রেণীর লোকেরা বাস করত। এই দু'টি বড় অনার্য্য জাতির নিজের নিজের ভাষা, ধর্ম ও রীতিনীতি—সবই ছিল। আর্য্যেরা এদেশে আসার আগে এখানে কোল ভাষার খুব প্রভাব ছিল। এই ভাষাই বোধ হয় ভারতের সবচেয়ে পুরানো ভাষা। ভারতের আদিম অধিবাসী দ্রাবিড় ও কোলেরা আগন্তুক আর্য্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। বলা বাহুল্য আর্য্য ও অনার্য্যের এই যুদ্ধে পাঞ্জাবে আর্য্যেরা জয়ী হয়। কিন্তু পশ্চিমের সিন্ধুদেশের সুসভ্য অনার্য্যদের কাছে তারা এমন বাধা পায় যে ঐদিকে বহুদিন পর্য্যন্ত অগ্রসর হবার আর চেষ্টা করে নি। এজন্য তারা পূবে গঙ্গা-যমুনার উপকূলের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে ক্রমশঃ তারা কাশী, কোশল, মগধ (দক্ষিণ বিহার), বিদেহ (উত্তর বিহার), অঙ্গ, বঙ্গ, কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের হারিয়ে, নিজেদের

ভাষা নিয়ে সমস্ত উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়েরা প্রবল থাকায় সেদিকে বিশেষ কিছু করতে পারল না

আর্য্যেরা ভারতে আসার সময়ে যে ভাষা ব্যবহার ক'র্‌ত তাকে বলা হ'ত বৈদিক ভাষা। এই ভাষায় তারা প্রকৃতির মহিমায় মুগ্ধ হয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে স্তবস্তুতি রচনা কর্‌ত। ঋগ্বেদের সূক্ত অর্থাৎ স্তোত্রগুলিতে বৈদিক ভাষার সবচেয়ে পুরানো নমুনা পাওয়া গিয়েছে। ঋগ্বেদের সময়েই আর্য্যেরা পূর্বদিকে গঙ্গা, যমুনা নদী ও অযোধ্যার সরযূ নদী পর্য্যন্ত তাদের ভাষা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্ত্তী বৈদিক যুগে একদিকে আফগানিস্থান আর অন্য দিকে সুদূর বিহার পর্য্যন্ত তারা এগিয়ে এল। তবে বঙ্গদেশে অনেক দিন পর্য্যন্ত অনার্য্য জাতির বাস ছিল। বোধ হয় মৌর্য্য আমলেই প্রথম আর্য্যেরা এ অঞ্চলে আসে এবং তখন থেকে এদিক্‌কার আদিম অধিবাসীরা আর্য্যভাষা গ্রহণ করে।

আর্য্যেরা অনার্য্যদের দেশ দখল করে তাদের উপর প্রভুত্ব ক'র্‌তে থাকে এবং পরাজিত অনার্য্যদের দাস বা দস্যু নামে অভিহিত করে। অনার্য্যদের কিছু কিছু আশ-পাশের বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল। কিন্তু অধিকাংশই আর্য্যভাষা ও ধর্ম গ্রহণ করে। আর্য্যেরা বিজেতা এবং আর্য্যভাষা অনার্য্যভাষার চেয়ে সমৃদ্ধ ছিল, কাজেই অনার্য্যরা, আর্য্যদের অনুকরণ ক'রতে গিয়ে, তাদের ভাষাও যে গ্রহণ ক'রবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আর্য্যেরা ছিল সংখ্যায় কম, এবং তাদের চারিদিকেই ছিল অনার্য্যদের বাস। এই জন্য আর্য্যেরাও অনার্য্যদের প্রভাব থেকে মুক্ত থাক্‌তে পার্‌ল না। আর্য্যেরা অনার্য্যদের সম্পর্কে এসে অনেক নতুন মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদের সঙ্গে পরিচিত হয়। যে সকল বস্তু বা প্রাণী তারা ভারতে এসে প্রথম দেখে সেগুলির নাম তারা বাধ্য হয়েই অনার্য্য ভাষা থেকে নেয়। পরে অবশ্য অনেক দিন এদেশে থাকার ফলে তারা তাদের পরিচিত অনেক বস্তুর নামও অজ্ঞাতসারে অনার্য্য ভাষা থেকে গ্রহণ করে।

বৈদিক ভাষা ক্রমে লিখতে ও বলতে দু' রকম ভাবেই ব্যবহার করা হ'ত। প্রথম অবস্থায় যখন আর্য্যেরা অল্পপরিমিত স্থানে আবদ্ধ ছিল, তখন তাদের কথ্য বেদভাষা খাঁটী বা অপরিবর্ত্তিত ছিল। পরে তারা যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের সঙ্গে স্বভাবতঃ অনার্য্যদের সংমিশ্রণ ঘটে তখন তাদের এই ভাষাও বিকৃত হয়ে পড়ে। পরস্পরের মনোভাব বোঝবার জন্য উভয়কেই কিছু কিছু অপর ভাষার শব্দ ব্যবহার করতে হ'ত। এইভাবে ক্রমে দুই ভাষার মিশ্রণ ঘটল। অনার্য্যরা যখন বেশী করে আর্য্যভাষা ব্যবহার কর্‌তে সুরু করল তখন তাদের বিকৃত উচ্চারণের ফলে কথ্য বেদভাষার শব্দগুলি বিভিন্ন

রূপ ধরতে লাগল। অনার্য্যরা আর্য্যদের মত বৈদিক ভাষার শব্দগুলি বিশুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করতে পারত না। তারা যুক্ত শব্দগুলি ভেঙ্গে সোজা করে উচ্চারণ করত। আজকালও একটি শব্দকে দেশ ভেদে বিভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হ'তে দেখা যায়। কেবল যে উচ্চারণের তারতম্যের জন্যই বৈদিক ভাষা বিকৃত হয়ে পড়ল তা নয়, এই ভাষার মধ্যে দ্রাবিড় প্রভৃতি অনার্য্যভাষার শব্দের ও ধ্বনির মিশ্রণের জন্যও ভাষার এই রকম রূপান্তর ঘটল। এই সব কারণে বৈদিক ভাষা প্রাচীন আর্য্যদের মুখে যে রকম ছিল পরে আর সে রকম রইল না।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কথ্য ভাষার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ভাষা সংযত না হ'লে তা দিয়ে সাহিত্য হয় না। সে জন্য ভাষাকে শৃঙ্খলিত করবার চেষ্টা মানুষ সর্বদাই করে থাকে। আর সাহিত্য না থাকলে দূর দেশান্তরস্থিত লোকের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান হয় না। বৈদিক ভাষা যখন বিশুদ্ধতা হারিয়ে ফেলছিল তখন সকলে যাতে এক রচনারীতি মেনে চলে সেই বিষয়ে নিয়ম করতে হ'ল। খৃঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাপণ্ডিত পাণিনি তাঁর ব্যাকরণ লিখলেন। তিনি তার মধ্যে যে সব নিয়ম লিপিবদ্ধ করলেন তার দ্বারা বিকৃত বৈদিক ভাষার ত্রুটীগুলোর সংস্কার সাধন ক'রলেন। তাই তখন থেকে এই ভাষার নাম হ'ল সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত হ'ল বিদ্বান্ সমাজের শুদ্ধ ভাষা। আর এর বিপরীত সাধারণ (প্রাকৃত) লোকেরা যে ভাষা ব্যবহার করত তা'কে বলা হ'ল প্রাকৃত ভাষা। আর্য্য ও অনার্য্যের মিশ্রণে স্বাভাবিক ভাবে এই ভাষার জন্ম হয়েছিল। ঋগ্বেদ প্রভৃতি চার বেদ ও ব্রাহ্মণ উপনিষদের ভাষাকে বৈদিক সংস্কৃত বলা হয় আর পাণিনির দ্বারা সংস্কার সাধনের ফলে যে শুদ্ধ ভাষার জন্ম হ'ল তাকে শুধু সংস্কৃত বা লৌকিক সংস্কৃত বলা হয়।

সংস্কৃত ভাষা সম্পূর্ণ রূপে ব্যাকরণের অধীন হওয়ার পর এই ভাষায় ইচ্ছামত শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা চলত না। সেই জন্য এই ভাষা আর কখনও বিকৃত হয় নি। খৃঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে আজ অবধি লেখা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সবটাই পাণিনির ব্যাকরণ অনুযায়ী। কিন্তু কোন ভাষা যদি কেবল শিক্ষিত লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে কালক্রমে তার চর্চা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এখানেও তাই ঘটেছে। সেই জন্য আজ একে মৃত ভাষা বলা হয়।

জীবিত ভাষা কোন নির্দিষ্ট ব্যাকরণের শাসন মানে না। অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণ পাণিনির ব্যাকরণের নিয়মের ধার ধারে নি। সেই জন্য সংস্কৃত কোন দিন সাধারণের কথ্য ভাষা হয়ে উঠতে পারে নি। সংস্কৃত ভাষা রাজকার্য্যে, পণ্ডিতদের আলোচনায় ও সাহিত্যচর্চায় ব্যবহৃত হ'ত। আর সাধারণ লোকেরা অসংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় কথা ব'লত, গল্প ও ধর্মকাহিনী শুনত। সে জন্য সংস্কৃত নাটক রচয়িতারা তাঁদের

নাটকে রাজা, ব্রাহ্মণ, যক্ষ ও দেবতার মুখে সংস্কৃত ভাষা বসিয়েছেন এবং নারী, অশিক্ষিত পুরুষ ও নীচুস্তরের লোকেদের মুখে প্রাকৃত ভাষা দিয়েছেন।

মৃত ভাষা হলেও সংস্কৃত অত্যন্ত সমৃদ্ধ ভাষা। এর শব্দভাণ্ডার থেকে শব্দ আহরণ করে বাংলা, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, ওড়িয়া, অসমীয় প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। আর ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে যোগসূত্রও রচনা করেছে এই সংস্কৃত শব্দগুলি।

ডাকে আয়, আয়!

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

সবুজের মখমলে ঢাকা চারিদিক্,
আকাশে মেঘেরা ছুটি পেয়েছে খানিক।
শালী নদী তর তর বহে চলে যায়,
ছোট টুনটুনি ডাকে—খোকাখুকু আয়।

লেগেছে দোদুল দোলা মাধবীশাখায়,
জেগেছে সুরের সাড়া ভ্রমর-পাখায়।
আকাশের চাঁদ যেন ধরা দিতে চায়,
মার কোল থেকে খুকু ডাকে—আয়, আয়!

শাপলা, শালুকে দীঘি করে টলমল,
পানিকোর ডুবে উঠে মাপ করে জল।
ফোটা শিউলির বাস ভেসে আসে বায়,
শালিখ, ময়না ডাকে—খোকাখুকু আয়!

সোনালি শরৎ যে রে এসেছে ধরায়,
মেনকা উমাকে ডাকে—আয়, আয়, আয়!

কিশোর

শ্রীবিভা সরকার, বি. এ

ওরে দুর্ব্বার, নবীন যাত্রী,
তুই যে দুঃসাহসী,
বিপুল আশার অমৃত আবেশে
অম্লান অবিনাশী।
পথ দুর্গম, অগম গহন—
তোর মনে ভয় নাই,
তুই যে অভয় মৃত্যুঞ্জয়
কভু তোর ক্ষয় নাই।

তুই চির রাজা জীবন-সভায়,
কল্পনা রাজধানী,
স্বপ্ন মন্ত্রী, মন সেনাপতি
শোনায় আশার বাণী।
সমুখে অপার বিপদ সিন্ধু—
ঘনায় অন্ধকার,
আগ্নেয়গিরি উগ্র সমান—
তবু তুই দুর্ব্বার।

দারুণ আহবে কল্পসমরে
তুই যে বিজয়ী বীর,
চল চঞ্চল উছল উথল
ও হৃদয় নদীনীর।

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু"
ছুটে চলে আসোয়ার,
অসির ঝলকে জীবন ছলকে—
বাধা আসে বার বার।

চলেছে কিশোর আপনা বিভোর
যেন রে মত্ত করী,
"করি ব্যোম পান মদ্য সমান"—
আনন্দ আশাবরী।
শুধু কৌতুক—শুধু রহস্য,—
তুই যেন যাদুকর,
কুহকিনী মায়া নয়নে ঘনায়
জগৎ যে যাদুঘর!

রহস্যময় বিধাতার করে
জ্বলন্ত তলোয়ার,
শক্তিমত্ত চির প্রমত্ত
তোর গতি দুর্ব্বার।
জন্মমৃত্যু রহস্য মাঝে
জয় তোর—চির জয়,
অনন্ত কাল তুই শুধু বল্
হে অভীক্! নাহি ভয়।

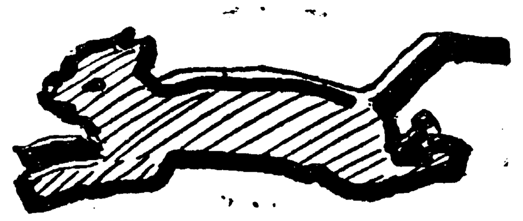

পাকাপাকি

শ্রীসুব্রত সেন গুপ্ত

প্রথমটা খু-উব আনন্দ হ'য়েছিল তপনের। তাদের শ্যামাদাস ইংরেজী হাই স্কুলে গরমের ছুটি দিয়েছে এক মাস দশ দিন। তপন মনে মনে হিসেব ক'রে দেখেছে এক মাস দশ দিনে হয় চল্লিশ দিন; চল্লিশ দিনে—ন'শ'—ও—ষাট—ঘণ্টা!

মার কেল্লা!

বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনাও হ'য়ে গেছে। তিন দিন 'ফিষ্ট'। বোটানিক্যাল গার্ডেন কি কুদ্ঘাটা। দু'টো নাটক।—দুঃশাসনের রক্তপান আর চন্দ্রগুপ্ত। বিদ্যুৎ স্পোর্টিং, বেগুনী সংঘ আর বয়েজ এথ্লেটিকস্এর সাথে ফুটবল ম্যাচ্। আরও কতো কী!

এমনি দিনে তপনের বাবা রাশিয়ান স্পুট্নিকের মত অপ্রত্যাশিত ভাবে তাকে ট্রান্সফার ক'রে দিলেন উল্টোডাঙ্গায়, মামার বাড়ীতে।

বেচারা! তাতেই কি আর রক্ষে আছে? মামা আবার ট্রান্সফার ক'রলেন কৈলাস মাষ্টার মশায়ের বাড়ী। সারা দুপুরের জন্য। তপন অঙ্কে কাঁচা, আর কৈলাস মাষ্টার মশাই অঙ্ক পেলে আর কিছু চান না। কাজেই সেখানেই তাঁর কাছে অঙ্কে পাকা হওয়ার পাকাপাকি ব্যবস্থা করলেন মামা,—বাবার নির্দেশ মত। সকাল সন্ধ্যায়ও বই নিয়ে বস। মামা-বাড়ীর আদর-টাদর—ধ্যাৎ, কে যে এ সব মিছে কথা রটিয়েছে! তপনের মনে হয় এর চেয়ে ছুটি না হওয়াই ছিল ভালো।

এখানকার ছেলেগুলোও যাচ্ছেতাই। ঘর থেকে বেরুলেই নয়া পয়সার মত জুলু জুলু চোখে তাকিয়ে থাকবে তারই দিকে। কলকাতার ছেলে কোনদিন দেখে নি কিনা! এ জন্য তপনের একটু গর্ব অবিশ্যি। বুক ফুলিয়ে ডোণ্ট কেয়ার ক'রে বড় বড় পা ফেলে রাস্তা দিয়ে হাঁটে। কোনও দিকে তাকায় না।

আজও যাচ্ছিল। বগলে যাদব চক্রবর্ত্তীর পাটীগণিত আর ইয়া মোটা একটা খাতা।

যাচ্ছিল আর ভাবছিল তপন। একটা দিনও যদি ছুটি পাওয়া যেত কৈলাস মাষ্টারের কাছ থেকে! ছোট মামা, মেজ মামা, তাপসী দি—সব্বাইকারই যে জ্বর হ'লো, তার কি একবারও হ'তে পারত না? অবশ্য অল্প অল্প। ডাক্তার বাবু যাতে বার্লি খেতে না বলেন। তা কি হ'ল? সব্বাই তার বিপক্ষে। এমন কি ভগবান্ও।

আর, এই যে অমূল্য দা' কেমন একমাস ভুগে উঠলেন! টাইফয়েড না হাতী!

কলেজেও যেতে হয় নি, কোথাও না। দিব্যি শুয়ে শুয়ে আঙ্গুরের রস আর বেদানা খেলেন!

শুয়ে থাকতে তপন অবিশ্যি চায় না। তবু দু'টো তিনটে দিন,—না হয় অন্ততঃ একটা দিনও কি ছুটি পাওয়া যায় না কৈলাস মাষ্টার মশায়ের কাছে?

তপন চলে। চলতে চলতে হঠাৎ আকাশ চুঁইয়ে নামে জল। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি। তারপর জোরে—আরও জোরে। তারপর থেমে যায় বেখাপ্পা।

হঠাৎ বুদ্ধি খেলে যায় তপনের মাথায়। যে বৃষ্টি হ'য়েছে তাতে অনায়াসে ভিজে উঠতে পারে একটা মানুষ। কিন্তু তখন বুদ্ধি আসে নি মাথায়। বোকার মত ঢুকেছিল ঝুনু ময়রার দোকানে। তা হ'ক। আশেপাশে পুকুরের অভাব আছে নাকি? এদিক্ ওদিক্ দেখে বই শুদ্ধ চট্ ক'রে একটা ডুব দিয়ে এল তপন। জামা-কাপড় ভিজে একসা। ব্যস্, এবার রেনি-ডে না দিয়ে কোথায় যাবেন বাছাধন?

তারপর?

তারপর এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ক'রলেন কৈলাস মাষ্টার মশাই। তপনকে পরতে দিলেন নিজের শুকনো কাপড়। গামছা দিলেন গা মুছতে। আর?—তপনকে সামনে রেখে উপদেশ দিলেন ঝাড়া পাঁচ ঘণ্টা। তপনের মাথায় আর পিঠে পুকুরের ক্ষুদে পানা লেগে ছিল। তপনের খেয়াল হয় নি—কিন্তু কৈলাস মাষ্টারের চোখ এড়ায় নি।

এত বড় প্ল্যান্ ভেস্তে যাওয়ার পর দুঃখের আর সীমা থাকে না।

এবার সত্যি বিছানায় আশ্রয় নেয় তপন। খানিক গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদে। তার পর মেজ মামা, তাপসী দি সব্বাই এসে দেখে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে তপনের। দিদিমার অবস্থা হয় শোচনীয়। মাথায় জল ঢালেন, গায়ে মাথায় হাত বোলান, আর বকাবকি করেন, "হবে না? এমন কাঠ-ফাটা রোদে ছেলেটাকে রোজ রোজ পাঠাবে কৈলাস মাষ্টারের বাড়ী! তার উপর জলে ভিজেছে আজ!"

এমন সময় বড় মামা আপিস থেকে এসেই ব'ললেন, "চল্ তপন। আজকে নৃপেনের বাড়ী নেমন্তন্ন। খাওয়াদাওয়ার পর ম্যাজিক দেখান হবে। তোকে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ করে বলে দিয়েছে।" ব'লতে ব'লতে হঠাৎ থেমে গেলেন। তপনের পাশে বসে বুকে, মাথায় হাত বুলিয়ে করুণস্বরে বললেন, "এ কি, জ্বর বাধিয়েছিস্! বেছে বেছে আজকের দিনে? তবে তো তোর আর যাওয়া হ'ল না। আমার যে না গেলে নয়!"

দিদিমা ধমকে উঠলেন,—"আহা, ছেলেটার মুখের ওপর না বললে চলত না?

বড় মামা একটা হোমিওপ্যাথিক বই খুলে পাশে ব'সে পড়লেন। দিদিমা ফের ধমকে বললেন, "ও হোমোপাথীতে কি করবে? সতু ডাক্তারকে ডেকে আন্। কুইনিন মিকশ্চার দিতে হবে মনে হচ্ছে। বাছার মুখখানা শুকিয়ে গেছে। যাই, বার্লি নিয়ে আসি।"

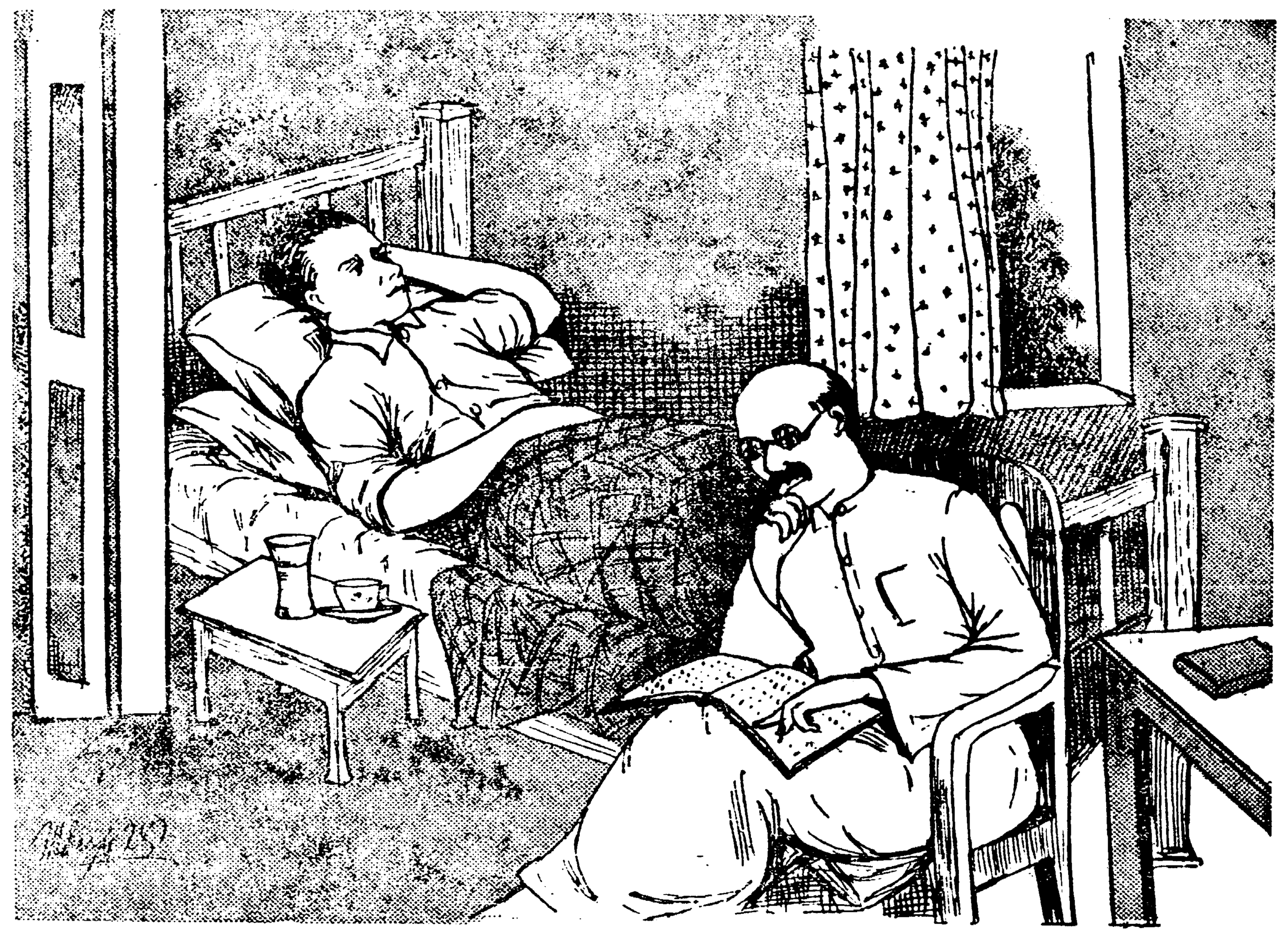

বই খুলে পাশে ব'সে পড়লেন।

এক লাফে উঠে প'ড়ল তপন। জামার তলা থেকে ছিটকে পড়ল দু'টো রসুন! গোঁয়ার্তুমি ক'রে নেমন্তন্নটা মাটি ক'রবে অত বোকা পাও নি তপনকে। তা ছাড়া কুইনিন মিকশ্চার ··

লজ্জার মাথা খেয়েও বড় মামার সঙ্গে তাঁর বন্ধুর বাড়ীতে তপন নেমন্তন্ন রক্ষা ক'রতে গেল। ম্যাজিকও দেখল।

কিন্তু পরের দিন আর গেল না কৈলাস মাষ্টার মশাইয়ের বাড়ী। তার পরের দিনও না। তার পরের দিনও না। কোনও দিনই না।

দিদিমা-ই যেতে দিলেন না। বাবা! যে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ছেলে!

হয় নি, কিন্তু শেষে যদি সত্যি সত্যি হয়?

শ্রীকৌটিল্য

কলকাতার ফুটবল লীগ্, একেবারে শেষ না হলেও এর, ফলাফল ইতিপূর্বেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। প্রথম বিভাগে এবারের চ্যাম্পিয়ন্ হবার গৌরব লাভ করেছে ইষ্টার্ন রেলওয়ে দল। দ্বিতীয় অর্থাৎ রানার্স আপ্ হয়েছে মোহনবাগান।

কলকাতার ফুটবল লীগের ইতিহাসে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত লীগ বিজয়ের সম্মান স্থানীয় ইয়োরোপীয় কিংবা বৃটীশ মিলিটারী দলগুলির একচেটিয়া ছিল। বিলিতী টিমদের হারিয়ে যে কোন ভারতীয় দল লীগে শীর্ষ স্থান অধিকার করতে পারবে এ কেউ ভাবে নি। এর একটা কারণ বোধ হয় ছিল যে সে আমলে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা সকলেই খালি পায়ে খেলতেন; ফলে লীগের প্রথমার্ধে ভাল খেললেও দ্বিতীয়ার্ধে, যখন পুরো বর্ষা সুরু হ'ত, তখন আর তাঁরা বুট-পরা বিলিতী খেলোয়াড়দের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতেন না। তবু মোহনবাগান দল কয়েক বার এই সম্মান পেতে পেতে পায় নি, রানার্স আপ্ পর্যন্ত হয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অবশ্য, এর আগে ১৯১১ সালেই তারা একবার আই. এফ্.এ শীল্ড দখল করে ভারতীয় খেলোয়াড়দের গৌরবের সূচনা করে। ১৯১১ সালের সেই বিজয়কাহিনী এখনও ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে আছে। সে যুগে এ নিয়ে মুখে মুখে অনেক ছড়া-কবিতাও রচিত হয়েছিল, ছেলেবেলা আমরাও তা শুনে শুনে আউড়েছি:

"সাবাস্ সাবাস্ মোহনবাগান, খেলেছ তো ভাই বেশ,
গোল দিয়েছে গোরা দলে—বাঙ্গালীদের জিৎ!
আজকের এই জয়ের কথা ভুলবে নাকো দেশ…"—ইত্যাদি।

তার পর ১৯৩৪ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রথম লীগ্ বিজয়ী ভারতীয় দল হিসাবে এক নতুন ইতিহাস রচনা করল। একবার নয়, এর পর উপর্যুপরি ৫ বার তারা এই সম্মান অর্জন ক'রে এক নতুন রেকর্ড স্থষ্টি করে। তার পর অবশ্য মোহনবাগান এবং ইষ্ট বেঙ্গল দলও অনেকবার লীগ্ বিজয়ী হয় কিন্তু তখন ইংরেজের যুগ প্রায় ফুরিয়েছে। আজ পর্যন্ত মহমেডান্ স্পোর্টিং ৯ বার, মোহনবাগান ৭ বার এবং ইষ্ট বেঙ্গল ৬ বার এই লীগ্ বিজয়ের গৌরব লাভ করেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, এই তিনটি দল ছাড়া আর কোনও ভারতীয় দলই এতদিন পর্যন্ত এ সম্মান লাভ করতে পারে নি। ইষ্টার্ন রেলওয়ে হ'ল ৪র্থ।

এখানে আর একটা কথা উল্লেখযোগ্য। এমন এক সময় ছিল যখন বাংলা দেশই ছিল সমস্ত ভারতের মধ্যে ফুটবল খেলায় সবচেয়ে অগ্রণী, আর এখানকার সমস্ত খেলোয়াড়ই ছিল বাঙ্গালী, ক্বচিৎ ২।১টি বাদে। কিন্তু কালক্রমে ফুটবল-আসরে বাঙ্গালী সে আসন থেকে পিছনে

পড়েছে। তাই দেখতে পাই প্রতি বছরই কলকাতার শ্রেষ্ঠ টিম্গুলি সারা ভারত খুঁজে (এমন কি এখন ভারতের বাইরে পাকিস্তান থেকেও) খেলোয়াড়দের ভাড়া করে নিয়ে আসে এবং এ জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করে। মহমেডান স্পোর্টিং, ইষ্ট বেঙ্গল, মোহনবাগান, রাজস্থান সকলেই যেন এ ব্যাপারে একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। কিন্তু কই, ভারতের অন্যান্য জায়গায় তো বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের ও রকম ডাক পড়ে না! এতেই বোঝা যায় এতদিন বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের খেলার মান কেমন ধীরে ধীরে পড়ে আসছিল। প্রাদেশিকতার কোন কথা নেই এতে। অন্য রাজ্যে ভাল খেলোয়াড় তৈরী হচ্ছে এ তো খুব আনন্দের কথা, কিন্তু বাংলা দেশেও যদি বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলবার চেষ্টা না ক'রে অন্য রাজ্যের ভাড়া-করা খেলোয়াড়দের মুখ চেয়ে থাকতে হয় তবে তা বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা।

কিন্তু বাঙ্গালী খেলোয়াড়রাও যে অপাংক্তেয় নয় এবং কেবল মাত্র তরুণ বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত টিম নিয়েও যে লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্ হওয়া যেতে পারে—এবারকার ইষ্টার্ন রেলওয়ে দলের কৃতিত্বে তাই প্রমাণিত হয়েছে। এবারকার এই চ্যাম্পিয়ন্ দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড় বাঙ্গালী—এবং সকলেই বয়সে নিতান্ত তরুণ। অধিনায়ক পি. বসু (তাঁরও বয়স ২৮ বছর মাত্র) ছাড়া আর সকলেরই বয়স প্রায় ২০ থেকে ২৪এর মধ্যে। কিন্তু তা সত্বেও তাঁরা ভারতের নানা রাজ্য থেকে জড়-করা দুর্ধর্ষ টিমগুলিকে অনায়াসে হারিয়ে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন এতে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হবেন সন্দেহ নেই। আশা করি ইষ্ট বেঙ্গল, মোহনবাগান প্রভৃতি টিমগুলির কর্তৃপক্ষ এ থেকে শিক্ষালাভ করবেন।

যে সব খেলোয়াড়ের সম্মিলিত চেষ্টায় রেল দল এবারে এই অসাধ্য সাধন করল তাঁদের মধ্যে পি. কে. ব্যানার্জি এবং এন. নন্দী অলিম্পিক খেলোয়াড়। এ ছাড়া দলে ছিলেন—পি. বসু, পি. বর্মণ, টি. সোম, এ. সোম, বি. ঘোষ, বি. মিত্র, এস্. রায়, এস্. নন্দী, ডি. দাশ, এ. চৌধুরী, কে. মণ্ডল, এ. চ্যাটার্জি, পি. সিংহ, এ. সেনগুপ্ত প্রভৃতি।

প্রতি বছর লীগ্ খেলার শেষে এ বছরের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় কে তা বাছাই হয়। আগেকার দিনের খ্যাতনামা ফুটবল-ধুরন্ধরদের নিয়ে এর জন্য একটা বিচারকমণ্ডলী গঠিত হয় এবং তাঁদের মতামতকেই প্রামাণ্য বলে ধরা হয়। এবারে তাঁরা এই সম্মান দিয়েছেন মোহনবাগানের তরুণ খেলোয়াড় চুণী গোস্বামীকে। তা হ'লে, দেখা যাচ্ছে, এদিক্ দিয়েও এ বছর একজন বাঙ্গালী খেলোয়াড়ই অন্যান্য রাজ্য থেকে আগন্তুক খেলোয়াড়দের চাইতে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বাংলার ক্রীড়ামোদীদের পক্ষে এটাও একটা আশার কথা সন্দেহ নেই।

* * *

কলকাতার ফুটবল মাঠ থেকে এবার আমাদের দৃষ্টি সুদূর ওয়েল্সের কার্ডিফ সহরে নিয়ে আসা যাক্, যেখানে সম্প্রতি এম্পায়ার ও কমনওয়েল্থ্ প্রতিযোগিতা হয়ে গেল সমারোহের সঙ্গে।

৩৭টি রাষ্ট্রের ১২০০ প্রতিনিধি এবার এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। ভারত থেকেও গিয়েছিলেন ২০ জন। এঁদের মধ্যে মিলখা সিং ৪৪০ গজ দৌড়ে এবং লীলারাম হেভিওয়েট কুস্তীতে প্রথম হয়ে দু'জনে ২টি স্বর্ণপদক পেয়েছেন। আর ওয়েল্টার ওয়েট কুস্তীতে লক্ষ্মীকান্ত পাণ্ডে ২য় হয়ে একটি রৌপ্যপদক পেয়েছেন। এ ছাড়া ভারতের আর কেউ কিছু করতে পারেন নি।

প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে ভাল করেছে ইংল্যাণ্ড। তারা ২৯টী স্বর্ণপদক, ২২টি রৌপ্যপদক এবং ২৯টী ব্রোঞ্জপদক (৩য় স্থানের জন্য) পেয়েছে। এর পর অষ্ট্রেলিয়া ২য়, দক্ষিণ আফ্রিকা ৩য়, নিউজিল্যাণ্ড ৪র্থ, জ্যামাইকা ৫ম ও পাকিস্তান ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। পাকিস্তান পেয়েছে ৩টি স্বর্ণ পদক, ৫টি রৌপ্যপদক এবং ২টি ব্রোঞ্জপদক। ভারতের চাইতে অনেক ভাল করেছে তারা। ভারতের স্থান হয়েছে ৮ম। আর একটা মজার খবর—সিঙ্গাপুর থেকে মাত্র ৩ জন প্রতিযোগী যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের ২জনই স্বর্ণপদক পেয়েছেন! আবার কানাডা থেকে যোগ দিয়েছিলেন ১০০ জন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে মাত্র একজন একটি স্বর্ণপদক পেয়েছেন।

ইংরেজী বাগ্‌ধারার গল্প

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

ইংরেজী ভাষায় ব্যবহৃত অনেক বাগ্‌ধারার (ইডিয়ম্) পিছনে এক একটী মনোরম গল্প আছে। ইহার কয়েকটি এখানে দেওয়া হইল। তোমাদের ভাল লাগিলে এরূপ আরও কিছু দিবার চেষ্টা করিব। আপাততঃ তোমরা এই ইডিয়ম্‌গুলি, ইংরেজী লিখিবার সময়ে, সুযোগ পাইলে ব্যবহার করিতে পার।

অ্যাপ্‌ল অব্ ডিসকর্ড: গ্রীক পুরাণে আছে যে একবার কোন উৎসবে ঝগড়ার দেবী এরিস ভিন্ন সকল দেবদেবী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইহাতে এরিস ক্রুদ্ধ হইয়া অদৃশ্যভাবে একটী সোনার আপেল উৎসব-সভার মধ্যে নিক্ষেপ করেন—তাহাতে লিখিত ছিল "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীর জন্য"। উহা কাহার প্রাপ্য তাহা লইয়া তিন দেবীর মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল, যাহা ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে ট্রয়ের মহাযুদ্ধে পরিণত হইল। তাই আজও লোকে বলে—বিদেশী বাণিজ্যে অধিকার লাভই গত বিশ্বযুদ্ধে অ্যাপ্‌ল অবং ডিস্‌কর্ড ছিল।

এরিয়াডনি'স্ থ্রেড্: রাজকুমার থিসিউস ক্রীটের রাজা মাইনসের পালিত রাক্ষস মিনেটকে বধ করিবার জন্য তাহার বাসস্থান এক গোলকধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করেন। গোলকধাঁধার মধ্যে কেহ একবার প্রবেশ করিলে আর ফিরিয়া আসিতে পারিত না। কিন্তু মাইনসের কন্যা এরিয়াড্‌নি তাঁহাকে একটী সূতার গুলি (থ্রেড) দিয়া সাহায্য করেন। সূতার এক প্রান্ত দ্বারপ্রান্তে বাঁধিয়া উহা খুলিতে খুলিতে তিনি কেন্দ্রস্থলে পৌছেন এবং রাক্ষসকে বধ করিয়া ঐ সূতার সাহায্যেই বাহিরে আসেন। কোন রহস্য অনুসন্ধানের জন্য যদি কোন সূত্র পাওয়া যায় তো তাহাকেই লোকে বলে এরিয়াডনি'স থ্রেড্।

ঔজিয়ান ষ্টেব্‌ল: মহাবলশালী হারকিউলিস তাঁহার প্রভুর নিকট যে সকল কঠিন কাজের ভার পাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে রাজা ঔজিয়াসের আস্তাবল একদিনে পরিষ্কার করা একটী ছিল। এই প্রকাণ্ড আস্তাবলে ৩০০০ গরু-ঘোড়া থাকিত, কিন্তু তাহা ত্রিশ বৎসর পরিষ্কার করা হয় নাই। হারকিউলিস কৌশলে একটী নদীর ধারাকে এই আস্তাবলের মধ্য দিয়া পরিচালিত করেন এবং তাহাতেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। তাই বহুদিনের সঞ্চিত আবর্জ্জনা পরিষ্কার (পঙ্কোদ্ধার) করাকেই বলা হয় ঔজিয়ান্ ষ্টেবল্ সাফ করা।

বেলেরোফন্‌স্ লেটার: এক নিষ্ঠুর রাজা অন্য দেশের রাজকুমার বেলেরোফনকে ছলে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারই হাতে এক মিত্র রাজার নিকট একটী মোহর করা চিঠি পাঠান। নির্দ্দেশ ছিল পত্রবাহককে হত্যা করিতে। যদিও দৈবক্রমে বেলেরোফনের জীবন রক্ষা হয় তথাপি আজও বেলেরোফন্‌স্ লেটার বলিলে ঐরূপ চিঠি বুঝায় যাহা পত্রবাহকের বিরুদ্ধেই লিখিত।

বিট্উইন্ সাইলা এ্যাণ্ড ক্যারিবডিস্: ইউলিসিসের জাহাজ একবার মেসিনার সংকীর্ণ প্রণালী পার হয়। তাহার দুই দিকে সাইলা ও ক্যারিবডিস নামে দুই ভয়ঙ্কর রাক্ষসী বাস করিত। কাজেই উহার মধ্য দিয়া যাওয়া খুবই বিপজ্জনক। এদিকে গেলে ইহার খপ্পরে, ওদিকে গেলে উহার খপ্পরে পড়িবার আশঙ্কা। সেই গল্প হইতেই এই বাক্যটির অর্থ হইয়াছে 'উভয়-সঙ্কট'।

রাইটিংস্ অন দি ওয়াল্: বাইবেলে বর্ণিত আছে যে ব্যাবিলনের শেষ রাজা বেলশেজার একদিন রাত্রিকালে তাঁহার দরবার-গৃহে এক মস্ত ভোজের অনুষ্ঠান করেন। ইহাতে সভাসদ্‌গণ ও রাজ্যের অভিজাতবর্গ নিমন্ত্রিত ছিলেন। বিবিধ উত্তম খাদ্য ও উৎকৃষ্ট মদিরা পরিবেশিত হইতেছিল। হঠাৎ রাজা সভয়ে দেখেন যে কোন অদৃশ্য পুরুষ (যাহার শুধু হাতখানা দেখা যাইতেছিল) দেওয়ালে কয়েকটী শব্দ লিখিতেছে। সে শব্দ কয়টীর অর্থোদ্ধার করা হইল—"হে রাজন্, ঈশ্বর তোমার রাজ্য শত্রুদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন।" অল্প পরেই তাঁহার চিরশত্রু পারস্যরাজ দরায়ুস সসৈন্যে ব্যাবিলনে প্রবেশ করিয়া বেলশেজারকে নিহত করিলেন এবং তাঁহার রাজ্যকে মিডিয়ার রাজার সহিত বণ্টন করিয়া লইলেন। আসন্ন ধ্বংসের সময়েও যদি কেহ তৎপ্রতি উদাসীন থাকিয়া আমোদপ্রমোদ বা সুখের আশায় মগ্ন থাকে তো লোকে বলে "ওর 'রাইটিংস্ অন্ দি ওয়াল্' (দেওয়ালের লেখা) পড়ে দেখা উচিত।"

বাংলা বাগ্‌ধারার পিছনেও অনেক কাহিনী আছে। আর একদিন তাহা বলিতে চেষ্টা করিব।

শিশুসাহিত্যিক-পরিচিতি

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

জন্ম—৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। জন্মস্থান—কলকাতা। আদিনিবাস ঢাকা জেলার তেওতা গ্রাম। সেখানকার বিখ্যাত জমিদার বংশ রায় পরিবারে এঁর জন্ম।

ছাত্রজীবন কলকাতাতেই সুরু হয়। তালতলা হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে ইনি রিপন কলেজে ভর্তি হন এবং আই. এস্-সি পাশ করে উচ্চশিক্ষার্থে ইয়োরোপ গমন করেন। ইংল্যাণ্ডের নটিংহাম্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বস্ত্রবিজ্ঞানে (টেক্সটাইল এঞ্জিনীয়ারিং) শিক্ষা শেষ করে ইনি ইংল্যাণ্ড ও জার্মেনীর নানা অংশে রঞ্জনশিল্পেও শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ ক'রে ঐ সব দেশ সম্বন্ধে নানা বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পরে ইনি বি. এ পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। বর্তমানে ইনি ভারত সরকারের অধীনে একটি ল্যাবরেটরীতে বস্ত্রবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ রূপে নিযুক্ত আছেন।

ছোটদের জন্য নানা সাময়িক পত্রে এঁর বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে রামধনু, শিশুসাথী, ভাইবোন, চয়নিকা, রংমশাল ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। বিশেষ ক'রে ছোটদের উপযোগী ভ্রমণকাহিনী লিখে ইনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছেন। তা ছাড়া খুব ছোটদের উপযোগী করে গল্প, মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতেও ইনি সিদ্ধহস্ত। বর্তমানে ইনি শিশুসাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সম্পাদক।

এঁর লেখা কয়েকখানি বইএর নাম—ইউরোপের আলো যে জার্মানী হেরে গেছে, খরগোসের গল্প ইত্যাদি।

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

জন্ম—১৯১৭; জন্মস্থান—যোড়াসাঁকো, কলকাতা।

ছাত্রজীবন সুরু হয় খিদিরপুর একাডেমিতে। তার পর সেণ্ট জেভিয়াস কলেজে বি. এ পর্যন্ত (১৯৩৯) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে।

কর্মজীবনে ইনি ব্যবসা-ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেছেন। কোয়ালিটি হোসিয়ারীর ইনি স্বত্বাধিকারী। ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্যচর্চা সুরু করেন। প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় অধুনালুপ্ত বিচিত্রা পত্রিকায়। তখন ইনি ১ম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তার পর শিশুসাহিত্যের আসরে নামেন এবং মৌচাক, রামধনু, শিশুসাথী, শুকতারা প্রভৃতি শিশুসাময়িক পত্রে নিয়মিত লিখতে সুরু করেন। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটিকা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ইনি লিখে থাকেন। কিছুদিন কথাসাহিত্য পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক রূপেও কাজ করেছেন।

ইনি শিশুসাহিত্য-পরিষদের আজীবন সদস্য। কিছুদিন পরিষদের সহ-সম্পাদকও ছিলেন। বর্তমানেও ঐ প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহক সমিতির একজন সদস্য আছেন।

এঁর লেখা কয়েকখানি গ্রন্থের নাম:—ছোটদের সোভিয়েট (সম্পাদনা), ঘণ্টামারা (অনুবাদ), বীরত্বের দশটি কাহিনী, লোকমান্য তিলক, মনীষী অক্ষয়কুমার প্রভৃতি।

মেঘনাদ

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

৪

সেদিন কলেজ থেকে একটু তাড়াতাড়িই ফিরে এল পৃথা। দাদার আশীর্বাদ সফল ক'রে দিয়ে মিসেস্ গুপ্ত সত্যিই "চিকাচিমাচিই" করেছেন, বৃষ্টির জন্য মেয়েদেরও অনেকেই কলেজে আসে নি। কারণ কলেজে দু'-একটা পার্সেণ্টেজ গেলে এমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, কিন্তু শাড়ীর আঁচলে কাদা লাগা বা ভাঁজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা তারা কল্পনাও করতে পারে না।

তা পৃথার পক্ষে ভালই হ'ল। একটা দিন আচম্‌কা ছুটী পাওয়া গেল। খানিকক্ষণ কমন রুমে বসে যথারীতি পরচর্চার পর ধীরে ধীরে কলেজ থেকে বেরিয়ে পড়ল সে।

কিন্তু বাড়ী গিয়েই বা কি করা যায়?

ফুটপাথের ধারে মাথার ওপর ত্রিপল চাপিয়ে অস্থায়ী একটা তাঁবুর মত খাটিয়ে একটা লোক গরম পকৌড়ী ভাজছে। পুড় পুড় ক'রে শব্দ হচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় ভেসে আসছে খেলে-মন্দ-হয়না গোছের একটা গন্ধ। আর একটু বয়স কম হলে পৃথার পক্ষে হয়তো এ লোভ সংবরণ করা কঠিন হ'ত, হয়তো ওখানে দাঁড়িয়েই এক-আধ ঠোঙ্গা উড়িয়ে দিতে পারত সে। কিন্তু না, এখন আর ওসব হয় না—প্রেষ্টিজে বাধে। "লোভ বড় বিষম বস্তু। লোভ করিতে নাই। লোভ করিলে···হেন হয় তেন হয়—" মনে মনে নিজের মনকে খুব খানিকটা ধমকে দিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল পৃথা।

কিন্তু মনকে ধমকালেই কি মন মানে? না শুনতে চায়? বাড়ী এসেও থেকে থেকে ক্রমাগত দ্বিজু রায়ের বর্ষাযাপনের সেই কলিটাই মনে আসতে লাগল—

"বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্ টাপ্ ··
এ সময়ে মুড়ি দিয়ে রেকাবি রেকাবি
ফুলুরি খেতে হয় কুপ্ কাপ্।"

ঠিক হয়েছে। দাদাকে খুব একটা হকৃচকিয়ে দেওয়া যাবে। গরম গরম ফুলুরি আর গরম গরম মুড়ি। অবশ্য সেই সঙ্গে গরম গরম আর একটা জিনিষ না হলে দাদার মন উঠবে না। গরম গরম চা। তা তার জন্য তো ষ্টোভে জল ফুটবেই।

বই-খাতা টেবিলে রেখে পৃথা কোমরে কাপড় জড়িয়ে ফুলুরি ভাজার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বিকেলের দিকে বৃষ্টিটা বেশ ধরে এল। মাথার ওপরকার ধেঁায়াটে চাদর ছিঁড়ে ছিঁড়ে এখানে সেখানে উঁকি মারতে লাগল নীল নীল আকাশের টুকরো,—ঠিক যেন বহু-ব্যবহৃত ছেঁড়া সামিয়ানার গায়ে সেলাই করা নীল কাপড়ের তালি। ক্রমে সে তালি আকারে বাড়তে লাগল। ধীরে ধীরে—অতি ধীরে। শেষে আর তালি নয়, মনে হ'ল, কে যেন গোটা সামিয়ানাটাই বদলে নতুন কাপড় লাগিয়ে দিচ্ছে—টকটকে নীল কাপড়—সদ্য রং করা, এই মাত্র পাট খুলে বার করা হয়েছে যেন!

আর সেই নীলের বুকে ছোট্ট খুকুর হাসির মত ছড়িয়ে পড়ছে এক-এক ঝলক ঝক্‌মকে রোদ!

আপিস-কাছারী ছুটী হয়েছে। রাস্তায় লোকের আনাগোনা বাড়ছে. কিন্তু ইন্দ্রনীলের দেখা নেই।

পৃথা বারে বারে ঝুলন্ত বারান্দায় এসে দেখতে লাগল। কিন্তু নাঃ, দাদার টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা লোক যা হোক্!

ক্রমে ফুলুরি ঠাণ্ডা হয়ে গেল, মুড়ি মিইয়ে গেল. চায়ের জল ফুটে ফুটে শেষটায় কেটলির মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেল। কিন্তু তবু ইন্দ্রনীলের ফিরবার নাম নেই।

শেষে পৃথা বিরক্ত হয়ে ষ্টোভ নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ইন্দ্রনীল এখনও ফেরে নি। এ রকম দেরী সে কোন দিন করে না। ভাইবোন রোজ বিকেলে একসঙ্গে খায়, আর সেই সময়টাই হচ্ছে ওদের সারাদিনের জমা যত কথা উজাড় করে দেবার নির্দিষ্ট সময়। এই সময়টা ওদের সম্পূর্ণ নিজস্ব, বাইরের কারো উপস্থিতি ওরা বরদাস্ত করতে পারে না এ সময়ে। সেই ছেলেবেলা থেকে চলে আসছে এই রকম। অল্প বয়সেই মা-বাপকে হারিয়ে এই দুই ভাইবোন ধরতে গেলে কেবল পরস্পরের সাহচর্যেই এত বড়টা হয়ে উঠেছে। অন্য আত্মীয়স্বজন যাঁরা ছিলেন,—কেউ বিপদে-আপদে দেখেছেন, কেউ তাও দেখেন নি। কিন্তু সে সব হ'ল পুরোনো দিনের কথা, তা নিয়ে ওরা আর এখন মাথা ঘামায় না। অপরের সাহায্য ছাড়াই ওরা এখন বেশ চালিয়ে নিতে পারে নিজেদের।

শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল পৃথা। সত্যি, দাদাটার হ'ল কি আজ? আপিসে লেট্ করায় বড় বাবু বোধ হয় এক হাত নিয়েছেন, তাই রেগে-মেগে ওভার টাইম্ খেটে মিটিয়ে নিচ্ছে মনের ঝাল? বড়বাবুর টাকটা হাতের কাছে পেলে, পৃথার ইচ্ছে হচ্ছিল, বেশ করে কিলিয়ে হাতের সুখ ক'রে নেয়। কিন্তু তাই কি? বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মাঠে চলে গেল না তো খেলা দেখতে? কিন্তু পৃথাকে না জানিয়ে তো যায় না কোন দিন এ রকম! সেই কবে একবার শুধু গিয়েছিল—কিন্তু তার জন্য নাকালটাই কি কম হয়েছে? বৃষ্টিতে ভিজে ফাঁাচ্‌ফেঁচে হাঁচি আর শর্দীতে বাবুর অবস্থা যা হয়েছিল! শেষে নাক-কান ম'লে প্রতিজ্ঞা করেছিল—অপরের পাল্লায় পড়ে এমন দুষ্কর্ম আর সে কখনও করবে না। বর্ষার দিনে ভিজে মাঠকে সে "সিংহ-ব্যাঘ্র-অহি-নকুলাদি-শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন অরণ্যানীর" মত "সভয়ে পরিহার" করে চলবে। অনেক পুরোনো বই ঘাঁটাঘাঁটি করে সে নাকি ঐ শব্দগুলো যোগাড় করেছিল। কথাগুলো আজও মনে পড়ে পৃথার। মনে পড়ে আর হাসি পায়।

কিন্তু না হাসি নয়, সত্যি, ভাবনার কথা। রেডিওটা খুলে বিকেলের খবরটা শুনে নিলে হ'ত। সকালেও আজ গোলমালে কাগজ পড়া হয় নি। বিকেলেও না। দাদা বুদ্ধি করে কাগজখানা পকেটে পূরে আপিসে বেরিয়ে গেছে। যেন সে একা পড়লেই চলবে, পৃথা যেন কেউ নয় বাড়ীর!

ঘড়ির কাঁটা টক্ টক্ করে এগিয়ে চলেছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে কখন। রাত বেড়ে চলেছে। কই, ইন্দ্রনীল তো ফিরল না! ভাবনা এবার দাঁড়াল ভয়ে। সত্যি, কোন বিপদ্-আপদ্ ঘটল না তো? সহরের যে হালচাল হয়েছে আজকাল, কিছুই ঘটা বিচিত্র নয়। হামেশাই তো ঘটছে! রাস্তায় বেরুনো মানেই তো প্রাণটি হাতে করে বেরুনো!

এবারে ছটফট করতে লাগল পৃথা। পাশের বাড়ী গিয়ে একটা ফোন্ করে খবর নেবে? আপিসে, না থানায়, না…হাসপাতালে? শেষের কথাটা ভাবতেই কেমন কেঁপে উঠল গা-টা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করা হ'ল না। কি না কি শুনতে হবে! তার চেয়ে দেখি না আর একটু…

বেশ রাত করেই ফিরল ইন্দ্রনীল। মনে হ'ল অত্যন্ত ক্লান্ত। সুস্থ স্বাভাবিক থাকলে সে লক্ষ্য করত পৃথার মুখখানাও শুকিয়ে কেমন এতটুকু হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিকে চেয়ে দেখবার মতও যেন মনের অবস্থা নয় তার। ধীরে ধীরে, কোন কথা

না ব'লে, কাপড়জামাগুলো আলনায় ছুঁড়ে দিয়ে ঈজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিল সে। চুপ্‌চাপ পড়ে রইল খানিকক্ষণ চোখ বুঁজে।

পৃথা কাছে উঠে এল, জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল। ভাবল, ইন্দ্রনীল নিজে থেকেই সব খুলে বলবে। কিন্তু ইন্দ্রনীলের দিক্ থেকে তার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। বাঁ হাত দিয়ে গলার সামনে দিক্‌টা একটু চেপে ধরে চোখ হু'টো কুঞ্চিত ক'রে ইশারায় শুধু জানাল, কথা বলতে ভাল লাগছে না তার—কষ্ট হচ্ছে রাতিমত। তার পরই আবার ক্লান্তিতে পাশ ফিরে চোখ বুঁজল সে।

(ক্রমশঃ)

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

পঞ্জিকার মতে ভাদ্র মাস থেকেই শরৎকাল সুরু, যদিও শরৎ বলতে আশ্বিনের কথাই আমাদের আগে মনে পড়ে। ভাদ্র মাসটা যেন না-বর্ষা না-শরৎ—কোনটারই মাধুর্য নেই ওতে। গুমোট আবহাওয়ায় প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। ঘরের মধ্যে তবু পাখা খুলে বসা যায় কিন্তু একটু বাইরে এলেই ঘামে সর্বাঙ্গ যায় ভিজে। কবি অবশ্য 'মাহ ভাদর' অর্থাৎ ভাদ্র মাসকে 'ভরা বাদর' অর্থাৎ ভরা বর্ষাই বলেছেন, কিন্তু এবারের বর্ষা যেন শ্রাবণেই চুকেবুকে গেছে মনে হচ্ছে। জানি না, মাসের শেষ দিকে একবার খুব খানিকটা ঝরে শেষ বর্ষণ দিয়ে যাবে কিনা। তখন আবার হয়তো দেখা দেবে বন্যা। "সত্য সেলুকাস্, কী বিচিত্র এই দেশ!"

ভাদ্রের রামধনু মাসের গোড়াতেই ছাপা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল ; ভেবেছিলাম ঝট্ করে বার করে দিয়ে সমালোচকদের মুখ একদম বন্ধ করে দেব। কিন্তু বিধাতা যদি

বাদ সাধেন, আমি কি করতে পারি বল? হঠাৎ ছাপাখানায় যে এমন গণ্ডগোল বাধবে তা কি কল্পনা করতে পেরেছিলাম? তার ওপর কাগজের দুর্ভিক্ষ! এ যেন চালের দুর্ভিক্ষকেও হার মানিয়ে দিয়েছে! আবার বলতে ইচ্ছে করছে, "সত্য সেলুকাস্, কী বিচিত্র এই দেশ!" খাসা কথা লিখে গিয়েছিলেন কবি দ্বিজু রায়। লাখ কথার এক কথা।

আশ্বিনের রামধনু পূজো সংখ্যা হিসাবে বেরুচ্ছে। কাজ সুরু হয়ে গেছে। এই সংখ্যাটি, বলা বাহুল্য, অনেক বড় করবার ইচ্ছে আছে ; তাই একেবারে চট্ করে বার করা যাবে না হয়তো, তবে মহালয়ার আগেই তোমাদের হাতে পেঁ।ছে দিতে পারব এ ভরসা রাখি। অবশ্য 'কাগজ-দেবতার' কৃপাদৃষ্টিও চাই সেই সঙ্গে।

অনেক ভাল ভাল লেখক লিখছেন এই সংখ্যায়। তোমাদের ভাল লাগবে বলেই আশা রাখি। অতএব, আমাদের মাষ্টার মশাইএর ভাষায়ই বলি, ধৈর্যধারণ, বিরক্তিবর্জন এবং আশাপোষণ কুরু এবং দুশ্চিন্তা এবং গোলমাল মা কুরু।"

আর একটা কথা বলবার আছে,—তোমাদের লেখা বারোয়ারী উপন্যাসটি সম্বন্ধে। প্রথম দিকে গ্রাহকদের এ বিষয়ে যতটা উৎসাহ লক্ষ্য করেছিলাম—গল্প জমে এলে সেটার অভাব বেশ অনুভব করছি। লেখা যে আসছে না তা নয়, কিন্তু তা ছাপবার মত হচ্ছে কই? এ নিয়ে তোমাদের কাছ থেকেও, প্রায়ই মতামত আসছে—গল্পটা গোড়ার মত জমছে না। ঠিকই তাই। গল্প সুরু করা সহজ, জের টেনে তাকে সরস রাখা, এক-ঘেয়েমি দূর করা এবং সব শেষে সফল সমাপ্তিতে নিয়ে আসা—এইটাই তো কঠিন এবং এইখানেই তো লেখকের কৃতিত্ব! রামধনুর গ্রাহকদের মধ্যে অনেক শক্তিশালী লেখক আছ, তারা এগিয়ে এস এ কাজে, এই আমরা চাই। একটা কথা কেউ কেউ লিখেছ। একটা সংখ্যা বেরোবার পর সেটা পড়ে, নতুন রচনায় হাত দিয়ে, যথা সময়ে সেটা আমাদের কাছে পাঠাতে যে সময়টুকু পাওয়া যায় তা নাকি মোটেই পর্যাপ্ত নয়। বেশ, সময় দিচ্ছি। পূজোর সংখ্যায় তো ধারাবাহিক রচনার দরকার নেই, তোমরা পরবর্তী কিস্তি কার্তিকের জন্য লিখে ফেল, পূজোর পরে পাঠিও, কেমন? ব্যস্, যথেষ্ট সময় দিয়ে দিলাম।

এবারে তোমাদের চিঠির জবাব।

শ্রীমালবিকা দত্ত (করিমগঞ্জ)—দীর্ঘ প্রবাসের পর আসামের প্রাকৃতিক পরিবেশ নিশ্চয়ই ভাল লাগছে? বিশেষ করে যে বর্ষার ঘনঘটার কথা লিখেছ! একটা বন্ধুর তালিকা দেখছি না পাঠালেই নয়! বড্ড কুঁড়ে হয়ে পড়ছি। এবারে একটু খাটতে হবে মনে হচ্ছে তোমাদের পাল্লায় পড়ে। শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায় চৌধুরী (সিউড়ী)—তোমার আগেকার প্রশ্নের জবাব পাও নি বুঝি? আচ্ছা, আবার জানিও, সাধ্যমত জবাব

দেবার চেষ্টা করব। শ্রীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (রাঁচী)—কাকাবাবু তো সেই সাত নম্বর রাজাবাগান ষ্ট্রীটেই আছেন। মনে-প্রাণে এখনও তেমনি সবুজ! দেখছ না, কেমন কোমর বেঁধে তোমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধাঁধার উত্তর বার করেন! পত্রিকা নানা কারণে বন্ধ হতে পারে। বড় ঝামেলার কাজ এটা। যাঁরা বার করেন তাঁরাই জানেন। সেই সখা, সাথী থেকে সুরু করে মুকুল, বালক, শিশু, সন্দেশ, খোকাখুকু, মাস পয়লা, কৈশোরিকা, কৈশোরক, রংমশাল, ভাইবোন—আরও কত ভাল ভাল কাগজই তো উঠে গেল। কবি নবগোপাল সিংহের 'শতদল' বইটি আমাদের এখানেই ছাপা হচ্ছে। শ্রীবিজয়া রায় (কর্ণাল)—১৯ বছরের স্মৃতিবিজড়িত জায়গা হঠাৎ একেবারে ছেড়ে আসতে হলে কষ্ট হয় বৈ কি! তবু মানিয়ে নিতে হবে। কবির সেই লাইনটা মনে আছে তো—"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া"? তোমার চিঠিতে কর্ণালের কথা জানবার জন্য উৎসুক হয়ে রইলাম। শ্রীঅশোক দাশ গুপ্ত (ভাগলপুর) —নেতাজীর রহস্য এখনও রহস্যই রয়ে গেছে। কাজেই ও সম্বন্ধে জোর করে কিছুই বলা যায় না। খবরের কাগজেও পরস্পরবিরোধী অনেক খবর থাকে। ওরও সবগুলোকে তাই সত্যি বলে মেনে নেওয়া যায় না। আশা করি রহস্য একদিন উদ্ঘাটিত হবেই। বিজয় বাবু হতাশ করলে বাধ্য হয়েই অপরের দ্বারস্থ হতে হবে। তাই হব ভাবছি। শ্রীশিকুল চক্রবর্তী (কলকাতা-১৯)—মফঃস্বলের উদার প্রকৃতির মধ্যে মানুষ হয়ে হঠাৎ কলকাতার ভিড়ে এসে পড়লে হাঁপিয়ে পড়া স্বাভাবিক। তাই তোমার চিঠিতে কলকাতাকে যে প্রাণ ভরে গালাগাল দিয়েছ তার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করছি। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে পারলে দেখবে এই সহরই হচ্ছে বর্তমানে বাংলার প্রাণকেন্দ্র। কবি সত্যেন দত্তের ভাষায় বলব—"এই কলিকাতা কোলাহলময়ী এর ভাগ্যের তুলনা কোথা?" ছুটীতে দু' দিন বাইরে গেলে ভাল লাগে নিশ্চয়ই, কিন্তু দু'দিন বাদেই আবার মন ফিরে আসতে চায় কর্মচঞ্চল, প্রাণোচ্ছল এই সহরে। শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় (গড়বেতা)—তোমার প্রশ্নবহুল 'মাসিক' চিঠি ঠিকই এসেছে। রেডিওতে একবার শুনে আবার কি সেটা পড়তে ভাল লাগে? তা ছাড়া ওগুলো যে প্রায়ই বেতার জগতে বেরোয়। একই খাবার ক' জায়গায় পরিবেশন করা যায় বল? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শিবনাথ শাস্ত্রী দু' জনেই আসলে ভট্টাচার্য। হরপ্রসাদের বাড়ী নৈহাটী, শিবনাথ শাস্ত্রীর বাড়ী জয়নগর মজিলপুরের কাছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ হচ্ছেন খড়দহের লোক, আর রামনারায়ণ তর্করত্ন হচ্ছেন হরিনাভির লোক। চারটি জায়গাই ২৪ পরগণার মধ্যে। ২।৩ সংখ্যা পড়েই কোন বই সম্বন্ধে কিছু সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়। দেখই না শেষ পর্যন্ত! শ্রীসুব্রত রায় (বেলাড়ি)—তোমার প্রশ্ন মত তালিকা দিতে গেলে তা অত্যন্ত দীর্ঘ হবে,—এখানে

স্থানাভাব। ভারতে রবীন্দ্রনাথের যুড়ি কোথায়? পাশ্চাত্য দেশে অবশ্য নোবেল-পুরস্কার-পাওয়া কবি আরও কয়েকজন আছেন। যেমন ধর ইয়েট্স্, টি. এস্. এলিয়ট্ প্রভৃতি। সমসাময়িক বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহীর এবং বন্ধুর সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। ইয়েট্স্, রোমাঁ রোলাঁ—এঁরা তো বিশেষ ভক্ত। বার্ণার্ড শ'ও কবিকে খুব খাতির করতেন। শ্রীস্বষ্টিধর মুখোপাধ্যায় (চাঁদবাটী)—তোমার চিঠির ভূমিকাটুকু বেশ ভাল লাগল। তোমাকে বোধ হয় আগেও বলেছি, পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু ঘটে যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না; কিংবা, আরও ঠিক করে বললে বলতে হয়,—মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যতটুকু হয়েছে—ওটি তার নাগালের বাইরে। অবশ্য আজ ওর ব্যাখ্যা না হলেও ভবিষ্যতে মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যখন আরও বাড়বে তখন ওর রহস্যও হয়ত ধরা পড়বে। জলসা কথাটা এসেছে আরবী 'জলস্অ' থেকে। ওর মানে নাচ-গান-বাজনার আসর।

এবারের চিঠি বেশ বড় হয়ে গেল, কাজেই এখন কলম বন্ধ করি। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। ইতি—রাঃ সাঃ

ভাঙ্গা ঘাট

শ্রীসুগত সেনগুপ্ত

সমুখে চলেছে বয়ে গৈরিক গঙ্গা, পিছনে ধূলিতে ঢাকা ধূ-ধূ মাঠ,
এ দুয়ের মাঝখানে পড়ে আছে এক কোণে গুটি কয় গাছে ঢাকা ভাঙ্গা ঘাট।
দুপুরের সূর্য্যের প্রখর কিরণ-জালে যে যার আবাসে লভে বিশ্রাম,
সমুখে তটিনী শুধু কুলুকুলু নিঃস্বনে গান গেয়ে নেচে চলে অবিরাম।
ধারে ভাঙ্গা ঘাট, তার সিঁড়িগুলি ফেটে গিয়ে ফাঁকে ফাঁকে গজিয়েছে ঘাস-বন,
তার দুর্দ্দশা দেখে মধ্যাহ্নের বায়ু ফেলিছে দীরঘ শ্বাস অনুখন।

ঝুলাইয়া জটাভার পুরাতন সাথী তার বুড়ো বটগাছ ওই ওখানে—
হু-হু বাতাসের সাথে দুলায়ে দুলায়ে মাথা বলিতে চাহে কি কথা কে জানে!
শোনা যায় ঘুঘু ডাকে লুকায়ে পাতার ফাঁকে, বাতসেতে ভাসে সে করুণ সুর,
মাথার উপরে ওই সুনীল আকাশে ভেসে চিলগুলি উড়ে যায় বহু দূর।
চারিদিক থম্‌থমে, ক্রমে বেলা আসে কমে, গাছ হ'তে ধীরে পাতা ঝরে যায়,
বিজন মাঠের ধারে ভাঙ্গা ঘাট রয় পড়ে,—গণে দিন কবে নদী নেবে তায়।

শরতের চিঠি

শ্রীগুণধর বর্দ্ধন

শরৎ, তোমার চিঠি পেলাম আজকে ভোরের বেলা,
শিউলি যেথায় ঝরে—যেথায় মৌমাছিদের মেলা।
শিশির-ভেজা সবুজ ঘাসে
শিলাই নদীর আশেপাশে,
দেখতে পেলাম সেই সে তোমার সবুজ চিঠিগুলি,
তাইতে আমার মনের গোপন দ্বারটি গেছে খুলি'।

কাশের চামর উঠছে দুলে নদীর দু'টি তীরে,
সেই তো মায়ের স্নিগ্ধ আঁচল, জানিস তোরা কিরে?
নীল আকাশে বকের সারি—
কেমন, আহা, রূপটি তারি,
কোন্ যাদুকর আড়াল থেকে দিয়েছে হাতছানি!
তাইতে আজি আকুল আমার ছোট্ট পরাণখানি।

জেনে রাখ

শ্রীসুমিত্রা বসু

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে এশিয়াবাসীদের মধ্যে জাপানীদের যুড়ি মেলা ভার। জাপানী প্রথায় ধান চাষ করলে ধানের ফলন অনেক গুণ বাড়ান যায়। জাপানীরা যে সয়াবিন নামে মটরশুঁটি জাতীয় খাদ্য খায় তা নাকি ভিটামিনে টইটম্বুর। কিন্তু এ সব তো গেল চাষের ফসল! কৃত্রিম উপায়ে তৈরী খাবার প্রস্তুতেও ওরা কম যায় না।

সম্প্রতি জাপানী বিজ্ঞানীরা ক্লোরেলা নামে এক রকম খাদ্য, আবিষ্কার করেছেন। নদী থেকে এক জাতের শ্যাওলা তুলে নিয়ে কৌশলে তার চাষ করে এবং তার মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে নানা খাদ্যপ্রাণ ভরে এই ক্লোরেলা তৈরী করা হচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে,—এক আউন্স ক্লোরেলার যা খাদ্যগুণ তার সমান খাদ্যগুণ পেতে হলে অন্ততঃ দেড় পাঁইট টাটকা দুধ, এক আউন্স মাংস এবং একটি আস্ত ডিম খেতে হবে।

শরতের ব্যথা

শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়

শরৎ-রবির অমল কিরণ ঝরেছে সোনালী ধানে,
ছড়ায়ে দিয়েছে মুক্তির হাসি নিখিলের প্রাণে
প্রাণে।
মুখর বাঁশীর গৌড় সারঙ ভরিয়া তুলেছে হাওয়া,
এখন মুক্তিপিয়াসী মনের অসীমের স্রোতে ধাওয়া।

ওদিকে দৃষ্টিসীমানা ছাড়ায়ে দিগন্ত যেথা মেশে—
কৃষকের দল স্কন্ধে লাঙল চলেছে পথের শেষে।
আজিকে আমার দিশাহারা মনে উঠিতেছে রণি
রণি
মরু প্রান্তর তেপান্তরের হারানো বাঁশীর ধ্বনি।

উদাসী সমীর ফেলে নিঃশ্বাস ঝরা শেফালির রাশে,
সাতরঙা পাখী উড়ে গেছে ওই শরতের নীলাকাশে।
এই জীবনের যত শোকতাপ, উষর ব্যথার স্মৃতি
ধুয়ে মুছে সব একাকার করে শরতের লীলাগীতি।

এসেছে শরৎ, জগৎ সেজেছে সোনালী আলোর
সাজে,
মধুলোভী যত ভ্রমরের দল শ্বেত কুবলয়ে রাজে।
তবুও আমার বিরহী পরাণ যাচে না তো এই
আলো,
ঘন বর্ষার মসীমাখা মেঘ—সেই যেন ছিল ভালো!

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

লেখাটি এই রকম হবে :—

ভাই মেঘনাদ, তোমায় নিয়ে আবার একটা উপন্যাস সুরু হল। ধারাবাহিক রচনা আমার একটুও পছন্দ হয় না। বেশ একবারে কয়েক ঘণ্টায় পড়ে ফেলব। বইও খতম্, আমিও খুসী তা না মাসের পর মাস ভাবনা নিয়ে কাটানো! শেষটা কি ঘটবে, ও লোকটি অমন করছে কেন, ওর মনের কথা কি—এই নিয়ে কেবল জটলা, আর নিজেদের ভিতর তর্ক। তার চেয়ে তুমি চটপট গল্পটুকু আগেই বলে দাও না।—ইতি একটি পাঠক।

উত্তরদাতাদের নাম :—

বেবু, অঞ্জু, দাদা, খোকন, মামা ও মা (কলিকাতা-১৯); রত্না, স্বপ্না ও ছন্দা (বাঁকীপুর); অমিতাভ ও অশোকনাথ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর); মঞ্জুশ্রী চৌধুরী (নয়া দিল্লী); কেশবলাল দত্ত (মেদিনীপুর); সীতা ও গীতা (নাগপুর); কল্যাণী রায় (এলাহাবাদ); নিমু, টুলু ও বোকাই (বারাণসী)।

নূতন ধাঁধা

শ্রীঅরুন্ধতী বাগচী

ড্রিল মাষ্টার মশাই বললেন, "ছেলেরা, তোমরা সার বেঁধে দাঁড়াও। পাঁচটা সারিতে।" ছেলেরা তাই দাঁড়াল।

মাষ্টার মশাই বললেন, "ও হ'ল না। প্রত্যেক সারিতে চার জন ক'রে দাঁড়াতে হবে।"

"সে কি ক'রে হবে স্যর? আমরা যে সবশুদ্ধ মোটে দশ জন! প্রত্যেক সারিতে ৪ জন ক'রে ৫ সারিতে দাঁড়াতে গেলে তো ২০ জনের দরকার।"—বললে একটি ছেলে।

"তা কেন, বুদ্ধি থাকলে ঐ দশ জনেই পাঁচ সারিতে দাঁড়ানো যায়—প্রতি সারিতে ৪ জন করে দাঁড়িয়েও।"—হাসতে হাসতে বললেন ড্রিল স্যর।

ছেলেরা তো হতবুদ্ধি। সত্যি কি তা সম্ভব? যদি তাই হয় তবে ওদের নক্সা এঁকে দেখিয়ে দাও।

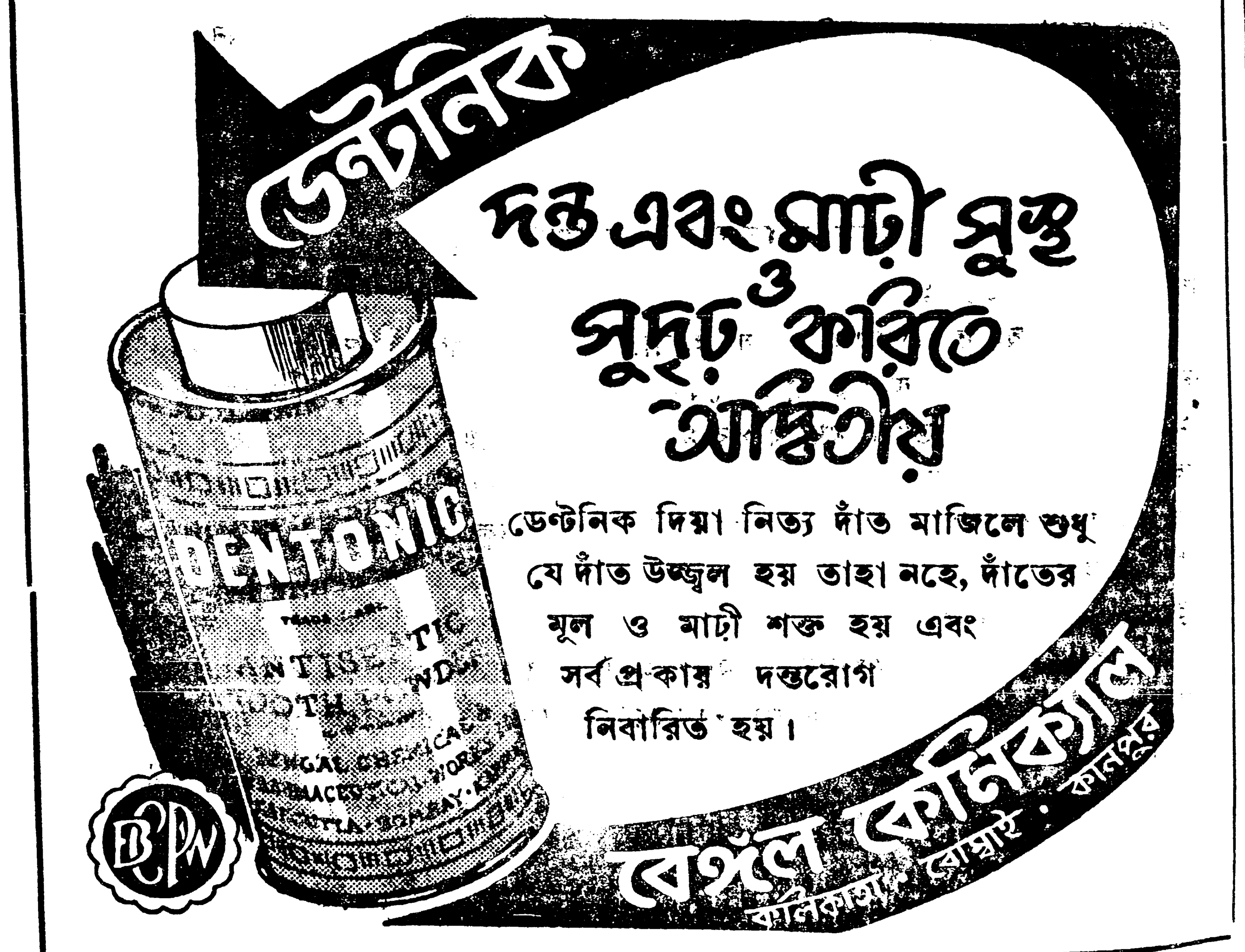

প্রাণী ও প্রকৃতি

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১'৫০

চারুচন্দ্র চক্রবর্তী

গল্প লেখা হল না ১'২৫ **স্বং চং** ১৲

॥ ছোটদের বই ॥

দুর্গমের ডাক ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ১॥০
যে গল্পের শেষ নেই : ১ম ॥ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৷০
যে গল্পের শেষ নেই : ২য় ॥ „ ২৲
ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব (২য় সং) ॥ „ ১৷০
অ্যাং ব্যাং (২য় সং) ॥ শৈল চক্রবর্তী ৸০
ম্যাও ম্যাও (২য় সং) ॥ „ ৸০
পুতুলের দেশ ॥ মৌমাছি ১৷০
কালটু গুলটু : ১ম ॥ „ ৸০
কালটু গুলটু : ২য় ॥ মৌমাছি ১৲
টুনটুনি আর ঝুনঝুনি ॥ „ ১৷৵০
ঘুমতি নদীর ঢেউ (২য় সং) ॥ আশা দেবী ১৲
সবুজ টিয়া ॥ রেবতীভূষণ ঘোষ ৸০
ডাকটিকিট ॥ অমরেন্দ্রকুমার সেন ১৷০
লালু ভুলু ॥ বানভট্ট ৩৲
চিড়িয়াখানার গণৎকার ॥ জগৎমোহন সেন ১৷০
আমার বাংলা (২য় সং) ॥ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২৲
দেশ বিদেশের রূপকথা ॥ „ ২॥০
খুনী দরওয়াজা ॥ বিক্রমাদিত্য ১॥০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা বারো

এবার পূজায় নূতন বই

=পূজা বাষিকী=

অপরাজিতা

॥ দাম চার টাকা ॥

ঠান দিদির থলে

॥ দাম তিন টাকা ॥

= আশাপূর্ণা দেবীর =

গল্প ভালো আবার বলো

॥ দাম দু' টাকা ॥

= সুনির্মল বসুর =

বরণ ডালা

গল্প ও কবিতা সংকলন

॥ দাম দু' টাকা ॥

= হেমেন্দ্রকুমার রায়ের =

সাজাহানের ময়ূর

(ছোটদের রোমাঞ্চকর উপন্যাস)

॥ দাম দেড় টাকা ॥

দেব সাহিত্য কুটীর···কলিকাতা—৯

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী, কলিকাতা, ফোন-২২-১২৪৩

Regd. No. C—1641

স্থাপিত – ১৩৩৭ ফোন–৩৫–২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পতাকা মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

/২॥০, /৫, ।৮ সেরা ডাইস্ টীনে,
মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ– শ্রীঅমৃত লাল কুমার।
মিলও অফিস – ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২ টাকা ২৫ ন. প., প্রতি সংখ্যা ৩৭ ন. প.। ভি.পি তে আরও ৭১ ন. প. বেশী লাগে। নমুনার জন্য ৩৯ ন প.র ডাকটিকেট পাঠাতে হয়।

২। বৈশাখে বছর সুরু, যে কোনও মাসে চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যায় কিন্তু পত্রিকা নিতে হবে বৈশাখ কিংবা কার্ত্তিক থেকে।

৩। কোন মাসে পত্রিকা না পেলে ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে তাঁদের উত্তরসহ সেই মাসের মধ্যে আমাদের জানাতে হবে।

৪। গ্রাহকদের সব চিঠিতেই গ্রাহক নং দিতে হবে। চিঠির জবাবের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাকটিকেট দিতে হবে।

৫। লেখা, কপি রেখে, সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা—ম্যানেজার রামধনু। ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫ (টেলিফোন : ৪৮-৩১৮১)

বিজ্ঞাপনের হার (সংশোধিত)

প্রতি বারের জন্য :—

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ৫০ টা., অর্দ্ধপৃষ্ঠা ২৮ টা., সিকি পৃষ্ঠা ১৬ টা.। প্রতি কলম ইঞ্চি ৬ টা

মলাট : ৪র্থ পৃষ্ঠা ১০০ টা.

মলাট : ২য় বা ৩য় পৃষ্ঠা – ৮০ টা অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৪ টা., সিকি পৃষ্ঠা ২৪ টা.

ছবি বা লেখার সামনের পৃষ্ঠা ৬০ টা, অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৩৬ টা, সিকি পৃষ্ঠা ২০ টা.

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনের মতামতে
কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে ?
স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,
'থিনের' মধ্যে; গুণে, স্বাদে সবার সেরা "কোলে"

অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,
সবরকমের "কোলে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ

এবার পূজায় নূতন বই

— পূজা বার্ষিকী —

অপরাজিতা

॥ দাম চার টাকা ॥

ঠান দিদির থলে

॥ দাম তিন টাকা ॥

— আশাপূর্ণা দেবীর —

গল্প ভালো আবার বলো

॥ দাম দু' টাকা ॥

— সুনির্মল বসুর —

বরণ ডালা

গল্প ও কবিতা-সংকলন

॥ দাম দু' টাকা ॥

— হেমেন্দ্রকুমার রায়ের —

সাজাহানের ময়ূর

(ছোটদের রোমাঞ্চকর উপন্যাস)

॥ দাম দেড় টাকা ॥

দেশ সাহিত্য কুটীর ··· কলিকাতা—৯

বন্দে মাতরম্

শিল্পী : শ্রীসুধীন বন্দ্যোপাধ্যায়

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩১শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৬৫ {৬ষ্ঠ সংখ্যা

শরৎ

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

শরৎ এসেছে, শিউলি ছড়ায় খুসি,
মিঠেল গন্ধে মউ মউ করে মন ;
আকাশের নাকে-কান্না গিয়েছে থেমে—
তুলো-পারা মেঘে ভরলো দিগঙ্গন।

আহা, খোকনের ফুলকো গালের 'পরে
চুমকুড়ি খায় চিকৃচিকে কচি রোদ,
কে দিল বিছিয়ে রাঙা মাটী প্রান্তরে
চিকণ-সবুজ জাজিমের অবরোধ !

শিলায়ের চরে দুধ-সাদা কাশফুলে
দুষ্টু-হাওয়ার অবিরাম লুটোপুটি,
ঝাঁকড়া-মাথা ও হিজল গাছের ডালে
কয়েকটা মেছো বক করে খুনসুটি।

শরৎ এসেছে, শাপলা ফুটেছে কত,
কাজলা দীঘিটি জলে টইটম্বুর :
গুগলি কুড়ায় প্যাক্ প্যাক্ পাতিহাঁস—
ইস্, কি পুলকে অন্তর ভরপুর!

সোনালি শরতে আজকে বিকেল বেলা
ভাবছে টুটুল জান্‌লায় মুখ তুলে,
—ছোড়্‌দির চিঠি পৌঁছে গিয়েছে কাল,
ছুটির ঘণ্টা বাজবে না ইস্কুলে?

যদি একটা বলো

শ্রীইন্দিরা দেবী

তপুর কান ঝালাপালা হয়ে গেল এ কথা মার মুখ থেকে শুনে শুনে—'যদি একটা মিথ্যে কথা বলো তাহ'লে তার জন্য দশটা বলতে হবে—কাজেই মিথ্যা কথা না বলাই ভালো।'

কথাটা প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে তপুর। কিন্তু তবু সে ভাবে : মা যে বলেন—কিন্তু ঐ তো সেদিন ছোটদা রাজস্থান আর অন্ধ্র পুলিশের খেলা দেখতে গেল আর ডাহা বিষ্টিটা মাথায় করে এলো! বললে কিনা বড়দি'র বাড়ী গিয়ে ফিরতে এত ভিজেছে। আর ঐ তো, এক মাসও হয় নি, হরি বাবার খাবার চমৎকার রাইস প্লেটটা দু' আধখানা করে মাকে বললে, এ রকম করে ফাটিয়ে রেখেছিল কে? অথচ সত্যি তো কেউ ফাটায় নি—নির্ঘাত হরি ভেঙ্গে ঐ কথা বললে! তার পর নান্টু ইস্কুল থেকে ফিরবার পথে ঝাল চানা-ওয়ালার কাছে থেকে অত ঝালমুড়ি খেয়ে এসে পেটের কামড়ে ভুগলো—বল্লে কিনা কিচ্ছু খাই নি তো! কই, তাদের কি হলো?—দশটা কথা হলো না তো! একবারেই শেষ। কাকে বকে টের পেলো না কি মিথ্যে তারা বলেছে। কিন্তু তপু তো সব জানে! এক একবার ভাবে, দিই মাকে বলে, আর বলি - দশটা মিথ্যে তো, কই, বলতে হলো না!

কিন্তু নাঃ, থাক গে, মার উপর কথা বলে কি হবে? তবে কথাটা যে সত্য নয় একদিন ও প্রমাণ করে দেবেই।

ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ!

মার কণ্ঠস্বর শোনা গেল— ও হরি, দেখ্ বাবা দেখ্, কোনটা নতুন হলো? আর তোদের নিয়ে পারি না!

ছাদের কোণে বসে হরি কয়লার গুঁড়োর গুল পাকাচ্ছিল – সেখান থেকেই উত্তর দিল : আমি ওপরে আছি, হাতে কাজ আছে।

মার কানে সে কথা পেঁৗছল না হয়তো— কারণ তাঁর বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বর আসলো না : বাবাঃ, আর পারি না! যেমন হয়েছে ছেলেমেয়েরা তেমনি হয়েছে চাকরবাকর—যত সব অলবড্ডে হতচ্ছাড়াগুলো জুটেছে আমার!

হাতের গুলতিটা সন্তর্পণে বইএর আলমারীর মাথায় রেখে দিয়ে গুটি গুটি মায়ের সামনে এসে দাঁড়ালো তপু। তারপর বল্লে : দেখলে মা, তোমার আদরের পুষির কাণ্ড?

সেই কোন দেশ থেকে এনেছিলে যে ফুল রাখার কাঁচের ঝাড়—টেবিলে উঠে লাফাতে
গিয়ে পুষি সেটা ফেলে খান্ খান্ করেছে।

—য়্যাঁ! বলিস কি? গালে হাত দিয়ে চোখ বড় করে মা আঁতকে উঠলেন।

—হ্যাঁ মা, সত্যি আমি দেখলুম—পুষি টেবিলের তলায় চোখ বুঁজে ধ্যানী বুদ্ধের
মত বসেছিল। ও কি কম পাজী? ইঁদুর-টিঁতুর কিছু দেখে থাকবে নিশ্চয়! ওটা পড়ে
গেল আর লেজ উঁচু করে পুষিও ছুটছে—আমি স্বচক্ষে দেখলাম।

—হতচ্ছাড়া বেড়াল, আজই আমি ওকে বিদেয় করে দিচ্ছি! হরি নামুক ওপর
থেকে একবার। আমার অমন সাধের জিনিসটা খণ্ড খণ্ড করলো? আর তোমরাও, বাবা,
হয়েছ তেমনি—পুষিটাকে টেবিলের তলে বসে থাকতে দেখেছ তো উঠিয়ে দাও নি কেন?

—বা-রে, আমাদের কি দোষ? ও তো ওখানেই থাকে। টেবিলে বসে যে খায়
সে ওকে কাঁটা দেয়, দিব্যি মনের সুখে ও চিবোয়।—তপু বল্লে।

ক্ষোভে, দুঃখে মার মন তখন উত্তপ্ত। বল্লেন: উনি এই সব অভ্যাস করিয়েছেন
বিড়ালের, কুকুরের। আজ সব বিদেয় করবো। এই তপু, শীগগীর যাও, পুষিকে ধরে
আনো।

তপু থতমত খেয়ে বল্লে: ওঃ, পুষি? আচ্ছা, দেখি কোন্ দিকে গেল—

মা সমানে হায় হায় করতে লাগলেন, অকারণে তপু, মিণ্টু, ছোটন—সবাই বকুনী
খেতে লাগলো। ছাদ থেকে হরি যখন নামলো সেও রেহাই পেলো না। সবাই চুপ-
চাপ—কারণ, জানে—মা রাগলে তখন চুপ না করে থেকে উপায় নেই—তা না হলে
রসাতলে যাওয়ার সম্ভবনা। আবার মার যখন মেজাজ ঠাণ্ডা থাকবে তখন সব কিছু আদায়
করা যাবে, জুলুমও চলবে।

কিন্তু মা আজ পুষিকে চান, কোনো কথা শুনতে চান না। পুষিকে ধরে আনতেই
হবে, আর যেমন করেই হোক বাগবাজারে খড়ো ঘাটে তাকে ছেড়ে দিয়ে আসতেই হবে।
তপু সেই যে বেরুলো আর দেখা নেই। হরির সব কাজ সারা হয়ে গেল, তবুও দেখা
নেই তপুর! শেষে মা বল্লেন: হরি, দেখ তো তপুবাবু কোথায় গেল—আজ যেমন করে
হোক হতচ্ছাড়া বেড়ালটাকে দূর করতেই হবে।

হরি আস্তে আস্তে বল্লে: আজ কিন্তু মা বৃহস্পতিবার—

—হোক গে, তুমি পণ্ডিতী রাখো, শীগ্গীর দেখ।—গর্জে উঠলেন মা। কাচের
পছন্দ-করা জিনিসের শোক তখন মনের ভিতর তোলপাড় করছে।

একটু পরে তপু এলো: পেলাম না মা, কোথাও। বোধ হয়—মন্তুদের বাড়ী
লুকিয়েছে—

—গেলে না কেন ওখানে?—যেখান থেকে পারো ধরে আনো।

মায়ের রাগ তখনও পড়ে নি; তপু তা ভাবতে পারে নি।—আচ্ছা, আচ্ছা,
যাচ্ছি—দেখি।

আবার কিছুক্ষণ ঘুরে এসে তপু বল্লে: মন্তুরা বল্লে ওদের বাড়ী এসেছিল বটে
বেড়ালটা কিন্তু ওরা চেঁচামেচি শুনে বুঝেছে এখানে কিছু একটা হয়েছে, তাই ওরাও
আবার তাড়িয়ে দিয়েছে।

—কোথায় গেছে কেউ দেখে নি? মা গম্ভীর গলায় বল্লেন।

—হ্যাঁ, ঐ ওদিকে, ওদের বাড়ীর পিছনে যে ঝোপ-ঝাড় আছে সেই দিকে।
আমি ওদিকে গিয়েছিলাম কিন্তু খুঁজে পেলাম না।

—ও সব আমি জানি না, তুমি আবার যাও, খুঁজে বার করো।

অগত্যা তপুকে যেতেই হয়। আস্তে আস্তে আলমারীর উপর থেকে গুলতিটা
নামিয়ে নিয়ে সে চলে গেল।

সারাদিন গেল—বিকেল হয় হয়,—এমন সময় তপু বাড়ী ফিরলো। কাছাকাছি
মাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে, ঘরে ঢুকে গুলতিটা রেখে বাইরে আসতেই দেখলো
মা ছোটনকে নিয়ে ঘরে ঢুকছেন। থতমত খেয়ে তপু বল্লে: অনেক দূর গিয়েছিলুম
মা, ওখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে আবার আরো কতদূর খুঁজতে খুঁজতে গেলাম।
—উঃ, পা দুটো ব্যথা হয়ে গেছে আর ক্ষিদেও পেয়েছে।

মায়ের পিছন থেকে মিণ্টু ঠোঁটের উপর আঙ্গুল চেপে কি যেন ইশারা করে বলতে
বারণ করলো কিন্তু অত দেখবার সময় নেই তখন তপুর। অনেকক্ষণ খেলাধূলা হয়েছে,
এখন প্রচণ্ড ক্ষিদে—কাজেই ওসব ইশারা বোঝা এখন দুঃসাধ্য।

মা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার তপুর দিকে তাকিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেলেন।

মিণ্টু বল্লে: কোথায় গিয়েছিলি সত্যি করে বল তো?

—কোথায় নয় তাই বল? পুষিকে খুঁজতে খুঁজতে একেবারে সেই শ্যামবাজারের
মোড় থেকে হ্যারিসন রোড—

—শ্যামবাজার থেকে হ্যারিসন রোড—সেখানে কি? পুষি কি ট্রাম-রাস্তা ধরে
গেছে, না ট্রামে উঠে কোথাও বেড়াতে গেছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, এই বলছিলাম—তোতলামী করে উঠলো তপু। মিণ্টু বল্লে:
তাহ'লে পুষিকে খুঁজতে সেই উল্টোডাঙ্গা গিয়েছিলি বল?

—উল্টোডাঙ্গা! ওঃ, হ্যাঁ, তাই তো, ঠিক বলেছিস—হ্যারিসন রোড নয়, উল্টো-
ডাঙ্গাই গিয়েছিলাম।

—কিন্তু কি বলছিস ঠিক করে মনে রাখিস। কেন না মা ভীষণ রেগে আছে, সেদিন ছোটদা বলেছিল বড়দির বাড়ী থেকে ফিরতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল—আর আজ বড়দি ফোন্ করেছিল ছোটদাকে একবার পাঠিয়ে দেবার জন্য, অনেক দিন কেন আসে নি সেই কথা জানতে চেয়ে। আবার নান্টুর বন্ধু এসে মাকে জিজ্ঞাসা করলো নান্ট কেমন আছে, — ঝালমুড়ি খেয়ে ওর অসুখ করেছিল—তাই।

তপুর মুখ শুকিয়ে উঠলো, পেটের ক্ষিদে চলে গেল। ঢোঁক গিলে বল্লে: তা মা কি বল্লে?

— কি বলবে? যা বলার তাদের সামনে হবে—যা ভীষণ রেগে গেছে। জানো তো, মিথ্যা কথা বলা মা অপছন্দ করে। তারপর তুমি সেই পুষিকে খুঁজতে গেছ অথচ পুষি দিব্যি টেবিলের নীচে চোখ বুঁজে বসে আছে।

—মা দেখেছে?

—তা জানি না। তবে তোর আসার দেরী দেখে মা হরিকে কোথায় খুঁজতে পাঠিয়েছিল—এই একটু আগে হরি এসে মাকে কি যে রিপোর্ট দিচ্ছিল—কে জানে। তা ছাড়া মাও তো ছোটনকে নিয়ে পাশের বাড়ী গিয়েছিল—তুই নাকি বলেছিস ওদের বাড়ী পুষি গেছে?

তপুর কণ্ঠতালু শুকিয়ে এসেছে। জড়িয়ে জড়িয়ে বল্লে: ওঃ, তাই বুঝি?—আচ্ছা, দেখি—

তপু আর দ্বিতীয় কথা না বলে একেবারে সোজা শোবার ঘরে গিয়ে খাটের ওপর শুয়ে পড়লো। রীতিমত প্যাল্‌পিটেসন সুরু হয়ে গেছে তার।

কতক্ষণ কেটে গেছে তা তপু বুঝতে পারে নি। শুনতে পেলো মা বাবাকে বলছেন: ছেলেরা সবাই এর মধ্যে লুকোতে শিখেছে, আর সেই জন্য মিথ্যে কথা বলতে শিখেছে। চাকরটা পর্যন্ত। টিপু সেদিন খেলা দেখতে গিয়ে ভিজে এসে বল্লে—বড়দির বাড়ী গিয়েছিলাম। আর আজ রেণু ফোন করছিল। তারপর সে দিন নান্টুর পেট কামড়ানোর ব্যাপার—সেও এক মিথ্যে। এক গাদা নাকি ঝালমুড়ি খেয়েছে! এ সব আমাকে লুকোয়। আর সব চেয়ে আজ কীর্তি রেখেছে তপু··ঐটুকু ছেলে, সাজিয়ে সাজিয়ে এত মিথ্যে কথা বলতেও পারলো! মিছি মিছি বেড়ালের নাম করে সারাদিন কোথায় কাটিয়ে এলো! তা ছাড়া ··এতখানি লম্বা মিথ্যে কথার মালা গেঁথে গেল!

বাবা যেন কি উত্তর দিলেন কিন্তু কথাগুলো ঠিক বোঝা গেল না।

কিছুক্ষণ পরে মিণ্টু এসে খবর দিল—তপুকে বাবা ডাকছেন।

তপু হিম হয়ে গেছে। মিথ্যে কথা বলাটা তারও অভ্যাস নেই ঠিক—কিন্তু

আজ যেন কি রকম সব গোলমাল হয়ে গেল···কেন যে হলো! ভাঙ্গা কাচের ঝাড়টা তার হাতের গুলতি লেগে মাটীতে পড়ে যখন খান্ খান্ হয়ে গেল তখন ভয়ে সে কেমন যে দিশেহারা হয়ে গেল!...না, আর ভাবতে পারে না সে।

পায়ে পায়ে কখন মিণ্টুর সঙ্গে বাবার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, বাবা কি বলেছেন, সে কি উত্তর দিয়েছে—কিছুই মনে করতে পারে না, কেমন যেন আচ্ছন্ন ভাব! চিন্তাশক্তি লোপ পেয়ে গেল নাকি? কতটা সময়ও তো চলে গেছে! তারপর যখন প্রকৃতিস্থ হলো তখন বাবার শেষ কথাটা কানে গেল—দোষ করে স্বীকার করলে এত মিথ্যা বলতে হতো না। মিথ্যা কথা ধরা পড়ায় এত লজ্জাও পেতে হতো না—ভাবতেই আমার লজ্জা করছে কিন্তু। আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করো আর কখনও মিথ্যে বলবে না।

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল তপু। মনে মনে বলে উঠলো, আর কোনোদিন মিথ্যে বলবো না। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো মা সব সময় বলেন: যদি একটা মিথ্যে কথা বলো তাহ'লে তা ঢাকবার জন্য দশটা মিথ্যে কথা বলতে হবে। কাজেই মিথ্যা কথা না বলাই ভালো।

শুধু তপু কেন—টিপু, নান্টুও সেই কথাই ভাবছিল।

বন্দী নেপোলিয়ন

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত

১৮১৫ সাল—প্রায় দেড়শো বছর কেটে গিয়েছে আজকের দিন থেকে।

অতলান্তিকের বুকের মাঝখানে ছোট্ট দ্বীপ সেণ্ট হেলেনা। চারিদিকে বিশাল সমুদ্রের সীমাহীন নীল জলকল্লোল। তীরভূমি কোথাও নেই আটশো মাইলের মধ্যে।

অতলান্তিক পাড়ি দিয়ে যে সব জাহাজ এদিকে ওদিকে যায় তারা এখানে এসে জাহাজের এঞ্জিনকে সচল রাখবার জন্য কয়লা বোঝাই করে নেয়। সুয়েজ খাল তৈরি হওয়ার আগে এইটাই ছিল ইয়ুরোপের যাত্রাপথের একটা ঘাঁটি।

জাহাজের আসা-যাওয়াকে অবলম্বন করেই সেই ছোট্ট দ্বীপের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একটা বন্দর এবং তাকে কেন্দ্র করে একটা সহর—জেমস্ টাউন। দৈনন্দিন জীবনে মোটামুটি যা কিছু প্রয়োজনীয় তার সবই পাওয়া যেত বন্দরের এই ছোট্ট সহরটিতে—কয়েকটি দোকানে।

এই ধরণের একটা দোকানের মালিক ছিলেন জেম্স ব্যালকম্বি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে সব জাহাজ সেণ্ট হেলেনার পথে ভারতে যাতায়াত করতো, তারও দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। এ জন্য একটা লম্বা-চওড়া খেতাবও তাঁর ছিল—"এজেণ্ট ফর দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানী।" সেণ্ট হেলেনায় জাহাজ ভিড়িয়ে যে কয়দিন সেখানে থাকার প্রয়োজন হতো, জাহাজের কাপ্তেন সাহেবরা ব্যালকম্বির বাড়ীতেই আশ্রয় নিতেন। সেজন্য দোকানের সংলগ্ন ছোটখাটো একটা হোটেলও তিনি খুলেছিলেন।

এমনি করে বারো বছর কেটে গেল জেম্‌স ব্যালকম্বির। সংসারে ছিল স্ত্রী এবং দুটি মেয়ে। স্ত্রী একদিন পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে সেণ্ট হেলেনার মাটিতেই চিরবিশ্রাম নিলেন। লেখাপড়া শেখাবার জন্য বড় মেয়েটিকে বাপ পাঠিয়ে দিলেন ইংলণ্ডে। তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনে একটি মাত্র সঙ্গী রইলো—ছোট মেয়ে বেট্‌সি। চঞ্চলা, আনন্দময়ী এই মেয়েটি—বছর বারো তার বয়স, ছুটে বেড়াতো চারিদিকে। ব্যালকম্বি হাসতেন আর ভাবতেন অতীত আর ভবিষ্যতের কথা।

এমনি ভাবেই কেটে যাচ্ছিল দিনগুলি।

খবরের কাগজও আসতো ইয়ুরোপ-ফেরত জাহাজ-বাহিত হয়ে। ছোট্ট দ্বীপের অধিবাসীরা উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়তেন ইয়ুরোপের সাম্প্রতিক বিপর্য্যয়ের কাহিনী। ইয়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিকে ওলটপালট করে দিয়ে মহাবীর নেপোলিয়নের অজেয় বাহিনীর বিজয়-অভিযানের চাঞ্চল্যকর সংবাদ। অষ্ট্রিয়া গেল, ইটালী গেল, নেপল্‌স্ গেল—ইয়ুরোপের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে চলেছে। তার পর সেই মহাবীরের প্রথম ভাগ্যবিপর্য্যয় মস্কোতে, তার পর হলেন তিনি বন্দী। পাঠানো হোল তাঁকে এলবায়ে। লোকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। যাক, পৃথিবীতে এবার বুঝি এলো শান্তির বাতাস।

কিন্তু নেপোলিয়ন একদিন অন্তর্হিত হলেন এলবার কারাগার থেকে। আবার উঠলো ঝড়ো হাওয়া ইয়ুরোপের আকাশ বাতাসকে ব্যাপ্ত করে।

আবার পৃথিবীময় ঘোষিত হোল ওয়াটারলুর জয়ভেরী। শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেছেন বিশ্বত্রাস নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। তাঁকে আবার বন্দী করেছেন বৃটিশ সেনাপতি ওয়েলিংটন।

ইয়ুরোপের এই রণতাণ্ডবের কাহিনীগুলো গল্প করে শোনাতেন জেম্‌স ব্যালকম্বি তাঁর মেয়ে বেটসিকে।

বারো বছরের বেটসি বাপকে বলতো,—বাবা, নেপোলিয়ন মানুষ না রাক্ষস? তুমি দেখেছো তাকে?

বাবা হেসে জবাব দিতেন,—রাক্ষসই বটে।

কৌতূহলী মেয়ে জিজ্ঞাসা করতো, কি রকম চেহারা তার বাবা? ঐ পাহাড়ের মতন? হাতগুলো কত বড়ো? আমাদের ঐ গাছটার চেয়েও লম্বা?

বাবা হেসে জবাব দিতেন, না রে পাগলী, এই আমারই মতন চেহারা।

দূর, তা কি কখনও হয়? কত বড় বড় সহর, দেশ সব পুড়িয়ে দিয়েছে বলছো! তুমি কখনও তা পারো? আচ্ছা, দাও দিকি ওই পাহাড়ের ঢিবিটাকে পুড়িয়ে, দেখি তোমার গায়ে কত জোর?

হেসে ওঠেন বাবা। মেয়ের মনে নেপোলিয়ন সম্বন্ধে একটা বিভীষিকার ছবিই থেকে যায়। তা থাকুক।

একদিন হঠাৎ দু'জন ইংরাজ মিলিটারি অফিসার এসে উপস্থিত হলেন জেম্‌স টাউনে। ব্যালকম্বি তখনও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেণ্ট। তখনই তাঁর তলব হোল এঁদের সামনে।

খবর যা শোনা গেলে তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। নেপোলিয়ন বোনাপার্টি—সারা ইয়ুরোপের—সারা পৃথিবীর বিভীষিকা—তাঁকে নির্বাসিত করবার সিদ্ধান্ত হয়েছে এই বহু দূরের ছোট্ট দ্বীপ সেণ্ট হেলেনায়। দ্বীপের এক প্রান্তে একটা পাহাড়ের উপর একটা বাড়ী আছে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের, তার নাম লং উড—সেইখানেই তাঁকে এনে রাখা হবে। তবে বন্দী হলেও তাঁর মর্য্যাদাকে

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া হবে না, সুতরাং সে বাড়ীখানির প্রয়োজনীয় সংস্কার করা দরকার। তাতে কিছু সময় লাগবে। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁকে এনে কোথায় রাখা যায়?

দু'-তিনখানা বাড়ী, যেগুলো সাধারণ পর্য্যায়ের একটু উপরে, তারই নাম করা হোল। শেষে স্থির হোল, আগে এসে পৌঁছান ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ নেপোলিয়ন বোনাপার্টি, তাঁকে দেখানো

হোক বাড়ীগুলো, তারপর যেটা তাঁর পছন্দ হয় সেইখানেই সাময়িক ভাবে তাঁর থাকায় ব্যবস্থা করা যাবে।

ব্যালকম্বি তাঁর দোকানে ফিরে এসে ডাকলেন,—ওরে বেটসি !

ছুটে এলো সে।—কি বাবা ?

তোর সেই রাক্ষস আসছে রে! নেপোলিয়ন বোনাপার্টি। এইখানে,—আমাদের এইখানে রে!

বেটসির মুখ যেন শুকিয়ে গেল।—কি হবে বাবা ?

দূর্ পাগলী! কি হবে কি রে ? এইবার নিজের চোখে দেখবি কি রকম তার চেহারা। হাতগুলো গাছের মতন, মুখটা পাহাড়ের মতন কি না ?

বেটসির মনের ভয় গেল না। সারা ইয়ূরোপ পুড়িয়ে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি—সব কাহিনীই তো শুনেছে সে বাবার কাছে। সে আসছে এইখানে ? কি সর্ব্বনাশ! তাদের বাড়ীটাকেই যদি পুড়িয়ে দেয় একদিন, তখন কি হবে ?

অবশেষে একদিন সেণ্ট হেলেনার মাটিতে পদার্পণ করলেন অর্দ্ধ ইয়ূরোপের ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বর নেপোলিয়ন বোনাপার্টি। জেম্‌স টাউনের সমস্ত নরনারী উৎসুক হয়ে এসে দাঁড়ালেন রাস্তার ধারে তাঁর শোভাযাত্রা দেখার জন্য। জেম্‌স ব্যালকম্বিও এসে দাঁড়ালেন বেটসিকে নিয়ে তাঁর দোকানের সামনে। সেই পথ দিয়ে যাবেন ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্।

একটু পরেই দূরে দেখা গেল একদল সৈনিকের মিছিল। তার পেছনেই ঘোড়ার উপর রয়েছেন অ্যাডমিরাল ককবার্ণ। মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা কালো ঘোড়ায় যিনি আরোহী—বেশ হৃষ্টপুষ্ট, খর্ব্বকায় পুরুষটি, গায়ে সবুজ রংয়ের লম্বা কোট, মাথায় ত্রিকোণ টুপি, বুকের উপর ব্রেষ্টপ্লেট—তার পাশে জ্বল জ্বল করছে—শোনা গেল সেটা হীরা—তিনিই নেপেলিয়ন বোনাপার্টি স্বয়ং। পিছনে আর একজন অশ্বারোহী—মার্শাল বারট্রাণ্ড।

কই বাবা ?—জিজ্ঞাসা করল বেটসি।

ওই যে মাঝখানে কালো ঘোড়ায়। দেখতে পাচ্ছিস না ?

পাচ্ছি বৈ কি। কিন্তু কই, ওর তো রাক্ষসের মত চেহারা নয়, হাত দুটোও গাছের মত নয়, মাথাটাও পাহাড়ের মত নয়—!

বেটসি যেন হতাশ হয়ে পড়েছে। যা দেখতে পাবে মনে করেছিল, তার সঙ্গে কিছুই মিললো না।

হঠাৎ তার কি খেয়াল হোল, বাপকে বললে, আমাদের গাছের ফুলের একটা গোছা নিয়ে এনে দেবো বাবা ওঁর হাতে ?

একটু দ্বিধার ভাব মনে এলো ব্যালকম্বির। সম্রাট্ হলেও তিনি শত্রু ছিলেন, আজ বন্দী। কাজেই ফুল দিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করা কি উচিত হবে একজন বৃটিশ নাগরিকের পক্ষে ? কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তিনি দেখলেন, বন্দীবেশে নেপোলিয়নকে আনা হয় নি, সম্রাটের পরিচ্ছদেই তিনি জাহাজ থেকে নেমেছেন। নিজের দেশে তিনি কালো ঘোড়ায় চড়তেন, এখানেও তাঁর জন্য কালো ঘোড়ারই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমন কি তাঁর বুকে রয়েছে এখনও ব্রেষ্টপ্লেট, তার পাশে হীরা বসানো তাঁর।

মেয়েকে বললেন,—বেশ তো, নিয়ে আয়।

ছুটে গেল বেটসি। দোকানের সামনেই কয়েকটা গাছে ফুটে রয়েছে অজস্র ফুল। তারই কয়েকটা ডাল নিয়ে এলো ভেঙ্গে।

বন্দী সম্রাট্‌কে নিয়ে শোভাযাত্রা এতক্ষণে এসে পড়েছে ওদের সামনে। ব্যাণ্ড বাজিয়ে রক্ষী সৈন্যদল গেল এগিয়ে, তারপর ঘোড়ার পিঠে অ্যাডমিরাল ককবার্ণ। তার পরেই কালো ঘোড়ায় সেই লোকটি—

ফুলের গোছা উপরের দিকে ছুঁড়ে দিল বেটসি। কিন্তু অত উঁচুতে পৌঁছুলো না সে পুষ্পস্তবক। মাটিতে পড়ে গেল সাদা, লাল, গোলাপী ফুলের গোছাগুলি। কিন্তু চেয়ে দেখলেন নেপোলিয়ন। ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন, এবং পরমুহূর্ত্তেই ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন বন্দীবীর।

সঙ্গে সঙ্গেই নেমে পড়লেন অ্যাডমিরাল ককবার্ণ এবং মার্শাল বারট্রাণ্ড। ইঙ্গিত পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল অগ্রবর্ত্তী সৈন্যবাহিনী।

ঘোড়া থেকে নেমে বেটসির দিকে এগিয়ে এলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্টি। শশব্যস্ত হয়ে উঠলো চারিদিকের জনতা। তাড়াতাড়ি একজন একখানা চেয়ার এনে পেতে দিল সামনে।

বেটসির হাত দুটো তুলে ধরে আদর করলেন বোনাপার্টি। গুর গুর করে উঠলো বেটসির বুকের ভেতরটা! কল্পনার সেই রাক্ষস এসে ধরেছে তার হাত!

নাম কি তোমার ?—ফরাসী ভাষাতেই জিজ্ঞাসা করলেন নেপোলিয়ন।

এ ভাষাটার সঙ্গে ইয়োরোপীয় প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। ব্যালকম্বি স্বয়ং এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, ওর নাম এলিজাবেথ—আমরা ডাকি বেটসি বলে। আমারই মেয়ে—

ইতিমধ্যে ককবার্ণ এবং বারট্রাণ্ড এসে সম্রাটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ব্যালকম্বি এবং আরও কয়েকজন স্থানীয় নেতাদের।

কি পড় ?

এবার বেটসিই উত্তর দিলে। ভয়ের ভাবটা কেটে গিয়েছে অনেকটা।—সাহিত্য, ইতিহাস ভূগোল।

ভূগোল পড়েছো ?—বল তো ফ্রান্সের রাজধানী কোথায় ?

প্যারি।

বেশ। আচ্ছা, ইটালীর ?

রোম।

চমৎকার। আচ্ছা রাশিয়ার ?

সেণ্টপিটার্সবার্গ। আগে ছিল মস্কো।—বলেই, একটু থেমে, বেটসি বলে উঠলো, আগুন লেগে মস্কো পুড়ে গিয়েছে।

হেসে উঠলেন নেপোলিয়ন।—বেশ, অনেক খবর রাখো দেখছি। আচ্ছা বল তো, কে মস্কোতে আগুন লাগিয়েছিল ?

এবারে চুপ করে রইলো বেটসি।

নেপোলিয়ন নিজের বুকের ব্রেষ্টপ্লেটের উপর চাপড় মেরে বলে উঠলেন, আমি। আমি। আমি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়েছি মস্কো সহর।

সবাই সচকিত হয়ে উঠলো। গর্জ্জে উঠলো নাকি সিংহ ?

চারিদিকে চেয়ে দেখলেন বন্দী নেপোলিয়ন। ওপাশে অনেকখানি খোলা জায়গা, মাঝে মাঝে গাছপালা, দূরে পাহাড় দেখা যায়। অদূরে সীমাহীন সমুদ্র।

অ্যাডমিরাল ককবার্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আমার জন্য যে বাড়ী ঠিক করা হয়েছে সেটা মেরামত হতে কতদিন সময় লাগবে ?

ককবার্ণ জানালেন, লোকজন লাগানো হয়েছে, বড় জোর এক সপ্তাহের মধ্যেই—

ততদিন কোথায় থাকবো আমি ?

তিনটে বাড়ী পছন্দ করা হয়েছে, তার মধ্যে যেটায় অভিরুচি হয়—

তাঁবুর সংস্থান নেই এখানে ? — জিজ্ঞাসা করলেন নেপোলিয়ন।

নিশ্চয়ই আছে।—এক সঙ্গে বলে উঠলেন ককবার্ণ এবং বারট্রাণ্ড।

তবে ওই খোলা জায়গায় তাঁবু খাটাও। বড় গাছটা যেন তাঁবুর সামনেই থাকে। ওখানে আমি বসবো।

ককবার্ণ এবং বারট্রাণ্ড প্রত্যুত্তরে যা বললেন তাকে আমাদের বাংলা নাটকের ভাষায় রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায়—যথা আজ্ঞা সম্রাট্!

সুরু হ'ল নেপোলিয়নের বন্দীজীবন। কিন্তু সে কথা আর একদিন হবে।

ভাড়াটে

৺কল্যাণী দেবী

সকাল বেলায় বাইরের ঘরে বসে কাগজ পড়ছিল শঙ্কর, একটি ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন। বয়স চল্লিশের ওপর, বেশ ফিট্‌ফাট্, দাঁড়ি-গোঁফ কামানো চেহারা। শঙ্কর মুখ তুলতেই বল্লেন—নমস্কার!

—নমস্কার! কাকে চাই আপনার ?

—বাইরে 'টু-লেট্' দেখে ঢুকেছি ; বাড়ীখানা কি আপনার ?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, বসুন। শঙ্কর চেয়ার দেখিয়ে দিল।

—এই বাড়ীখানাই ভাড়া দেবেন তো ?

— হ্যাঁ, মানে পুরোটা নয়, শুধু নীচের তলাটা।

—ও! তা কি রকম নীচতলাটা ? ঘরটর ক'খানা ?

—ঘর আপনার চারখানা ; তা ছাড়া রান্না, ভাঁড়ার, কল, বাথরুম ইত্যাদি ; ভেতর দিকে চওড়া বারান্দা, একটু উঠোন—সবই আছে।

—চারখানা মানে ? তিনখানা বলুন। একখানা তো আপনিই দখল করে আছেন দেখছি।

—না, না, এখানা বাদ দিয়েই চারখানা।

—তবু ভাল। আজকাল বাড়ীওলাদের কাণ্ডই আলাদা। বাড়ী দেবার সময় বলে তিনখানা চারখানা ঘর, পরে যখন বাড়ীতে ঢোকা যায় তখন দেখি একটা ঘরে বাড়ীওলার জিনিষপত্র ঠাসা। আপত্তি জানালে বলে ওগুলো দু'দিন পরেই সরিয়ে ফেলব, কিন্তু সে দু'দিন আর কোন দিনই আসে না। এ ঘরখানার জন্য অন্ততঃ পনেরো টাকা ভাড়া কম হওয়া উচিত, কিন্তু ব্যাটাচ্ছেলেরা পনেরোটা পয়সা পর্য্যন্ত কমায় না! তা যাক্ গে, ভাড়া কত ?

—দু'শো।

—দু'শো! অবাক্ করলেন মশাই!

—অবাক্ আর কি করলাম ?—এর চেয়ে কমে আজকাল ভাল বাড়ী পাওয়া যায় নাকি ?

—পাওয়া যাবে কি করে ? আপনারা যে এক একটি শাইলক্! তা বাড়ীখানা কি আপনার নিজের তৈরী, না পৈতৃক ?

— পৈতৃক।

—পিতা কি করতেন ?

— পুলিশে কাজ করতেন ?

— পুলিশে ? তা হলে তো স্রেফ্ ঘুষের পয়সায় বাড়ী তৈরী। ঘরের পয়সা একটি খরচ হয় নি, অথচ ভাড়া হাঁকছেন দু'শো—বেশ আছেন মশায়!

শঙ্কর অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক বল্লেন—গ্যারেজ আছে ?

—না।

— নেই ? তার মানে রোজ আপিসে লেট্।

—কেন ?

—কেন মানে ? মোটর রাখবার জন্য টালা কি টালীগঞ্জ কোথায় গ্যারেজ পাওয়া যাবে ঠিক আছে কিছু ? সেখান থেকে গাড়ী আনিয়ে আপিস যেতে যেতেই তো ব্যস্! — চাকরবাকরদের থাকবার ব্যবস্থা আছে তো—নাকি তাও নেই ?

—ও, তাহ'লে মাটিটুকুও কিনতে হবে বলুন ? তা উঠোনে রোদ-টোদ আসে, না স্যাঁৎসেঁতে শ্যাওলা-পড়া ? চলতে গিয়ে পাঁচবার পা হড়্‌কাবে ?

শঙ্কর মনে মনে বল্লে—পা হড়্‌কে তোমার হাড় ভাঙ্গে তবেই ঠিক হয়।

হঠাৎ শঙ্করের পায়ের দিকে নজর পড়তেই ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন—এ কি, আপনার পায়ে খড়ম দেখ্‌ছি !

—হ্যাঁ।

—সে কি, আপনি খড়ম প'রে থাকেন না কি ?

—হ্যাঁ।

—স্যাণ্ডেলের খরচ বাঁচান বুঝি ? তা বাঁচান, কিন্তু তাহ'লে আপনার বাড়ী আমার নেওয়া চলবে না।

শঙ্কর জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইতেই ভদ্রলোক বল্লেন—আপনি মাথার ওপরে চব্বিশ ঘণ্টা খড়ম প'রে খট্‌খট্ করবেন, আর সেই আওয়াজে নীচে আমার কাজ নষ্ট, মেজাজ নষ্ট, ঘুম নষ্ট, স্বাস্থ্য নষ্ট—

শঙ্করের আর সহ্য হ'ল না, বল্ল—আপনি কি বলতে চান মশাই ? আপনাকে বাড়ী দিলে কি আমি খড়ম পরতে পারব না, ক্রেপসোলের জুতো পায়ে প'রে থাকতে হবে আমাকে ?

—তা কেন ? আপনার বাড়ী, আপনার ইচ্ছে হয় খড়ম পায়ে ঘুরুন, ইচ্ছে হয় রণ-পায়ে ঘুরুন, আমার বলবার কি আছে ? কিন্তু আমি বাড়ী নিতে পারব না। মাসে মাসে দু'শো টাকা গুণে দেবো, সঙ্গে স্বাস্থ্যটিও ফাউ দেব না কি ? অদ্ভুত আব্দার তো !

শঙ্কর ভাবল একবার বলে যে আব্দেরে বাড়ীওলার পাল্লায় এখনও পড় নি মনে হচ্ছে। কিন্তু ততক্ষণে ভদ্রলোক চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছেন, দোরের দিকে যেতে যেতে বল্লেন—আমি চল্লাম, নিন মশাই, আপনি অন্য ভাড়াটে দেখুন। টাকা ফেল্লে আবার বাড়ীর অভাব ? হ্যাঁঃ।

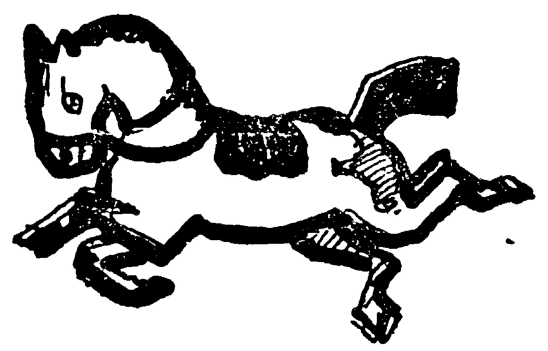

দুই বন্ধু

বন্দে আলী মিয়া

কীর্ত্তিনাশার বান

তিনটি বছর ডুবায়ে দিতেছে খামারের পাকা ধান।
ঘরে যাহা কিছু ছিলো ঘটি বাটি বেচেছে পেটের দায়,
এবারে এমন হইয়াছে দশা দিন আর নাহি যায়।
হাটে চাউলের অতি চড়া দর—ঘরে ঘরে উপবাস,
ফুরাইয়া গেছে পালানের কচু—শেষ হলো চাঁপঘাস।
ছেলে বউ মেয়ে ক্ষুধায় কাতর—চোখে নাহি তবু জল,
হাঁসুলি লইয়া চলিল মহেশ শেষ তার সম্বল।
রূপার হাঁসুলি দিয়েছিলো কিনে আদুরী মেয়েরে তার,
শত অনটনে ছোঁয় নাই ইহা—আজ পারিল না আর।
ইহাই বেচিয়া যে-টাকা পাইবে তাহাই পাথেয় করি
বাড়ীঘর ছেড়ে শহরের পানে চলে যাবে সরাসরি।
ছেলে বউ মেয়ে যাইবে সঙ্গে—খাটিয়া খাইবে তারা,
সবারে এমন হতে হবে নাকো অনাহারে দিশাহারা।

হাঁসুলি বেচিয়া চাল ডাল নিয়ে মহেশ ফিরিল ঘরে,
উদর পূরিয়া খাইল সকলে অনেক দিনের পরে।
পোঁট্‌লা পুঁটুলি বাঁধিল মহেশ—শহরে যাইবে ভোরে,
ঘরের জিনিস গুছাইয়া রাখি তালা লাগাইল দোরে।
রেল যেথা থামে ইষ্টিশান সে—গ্রাম ছেড়ে বহু দূর—
মধুমতী গাঙ বাঁয়ে রাখি পথ চলে গেছে রঘুপুর।
সেই পথ ধরি চলিছে মহেশ - চলিতেছে তাড়াতাড়ি,
পাঁচটি মাইল পার হয়ে গেলে তবেই মিলিবে গাড়ী।
পথে যেতে যেতে মনে পড়ে তার ফেলে-আসা বাড়ী-ঘর
কত দিনে আর ফিরিবে বা হেথা—কত বরষের পর !
শত স্মৃতি, হায়, জড়ায়ে রয়েছে ওই কুঁড়েখানিময়,
পিতা ও মাতার চরণের ধূলি আজিও হেথায় রয়।

সুখ-দুখ নিয়ে ছিল এতকাল—আজ বাহিরিল পথে,
হয় তো বা ইহা বিধির বিধান—চলে এলো গৃহ হতে।

ছেলে আর বউ চলে সাথে তার—মনে জাগে কত কথা,
আকুলি উঠেছে বুকের মাঝারে শত দুখ—শত ব্যথা।
ইষ্টিশানেতে পৌঁছার আগে গাড়ীর শব্দ পায়,
পুঁটুলি মাথায় মহেশ মাইতি সুমুখেতে দৌড়ায়।
ছুটোছুটি শুধু সার হলো তার—ছেড়ে গেল রেলগাড়ী,
টিকিট-ঘরের বাহিরে মহেশ বসিল নিশাস্ ছাড়ি'।
গাড়ী হতে নামি যাত্রীর দল যে যাহার পথে যায়,
বেচারী মহেশ তাদের পানেতে করুণ নয়নে চায়।
বিড়ি ধরাইবে—দেশলাই লাগি ট্যাঁকে দিল তার হাত,
ট্যাঁকে ছিলো টাকা—নাহি তো সেথায় – পড়েছে অকস্মাৎ।
খোয়া গেছে পথে, হায় হায় হায়, এ কিরে বিপদ তার!
শেষ সম্বল কেড়ে নিলো বিধি—কিছুই নাইকো আর।
শিরে করাঘাতে হানে ঘন ঘন—মুখে বলে 'হায়—হায়'—
"হয়েছে কী বলো? কে বটে তোমরা?" সবে জিজ্ঞাসে তায়।

জনতা হইতে একজন গিয়ে বসিল নিকটে তার,
শুধালো তাহারে, "মহেশ কি তুমি? কেন করো হাহাকার?"
ডুকারি কাঁদিয়া কহিল মহেশ চাহিয়া তাহার পানে,
"বন্ধু রকীব, বরাত মন্দ – কাঁদি তাই এইখানে।
তিনটি বছর হয় নি ফসল, চলে নাকো দিন আর,
ছেলেপুলে লয়ে চলিয়াছি তাই শহরেতে খাটিবার,—
রেল ভাড়া আর যাহা ছিলো পুঁজি পথে গেছে হারাইয়া।"
রকীব কহিল, "দুঃখ কোরো না, সাহসেতে বাঁধো হিয়া।
জীবনে যদি গো বেঁচে থাকো তুমি অর্থ অনেক পাবে,
ফসল হয় নি তার তরে কেন গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে?
দেশে ছিলে তুমি বনেদী কৃষাণ—শহরে শ্রমিক হবে,
কলে যদি বউ খাটিবারে যায়, মান তব কোথা রবে?"

কহিল মহেশ, "করি কী উপায়, পেটে যার দানা নাই,
ইজ্জৎ মান গুমর করা কি তাহার সাজে রে ভাই?"

কহিল রকীব, "মনে পড়ে কি গো ছেলেবেলাকার কথা—?
দু'জনার লাগি দু'জনার মনে ছিলো কী সে আকুলতা!!
পাশাপাশি বাড়ী ছিলো আমাদের—ছিলো কি দু'জনে ভাব,
আজ তুমি কোথা, আজ আমি কোথা—এ কি বলো অভিশাপ!
বহু দিন পরে মিলেছি আমরা—আর তোমা ছাড়িব না,
আমার আছে গো সাতকাণি জমি—দেবো তোমা তিন কোণা।
এই জমি তোমা দান করিলাম, চাষ করে খাও ভাই,
তোমার গাঁয়েতে বান আসে বটে, হেথায় ও-সব নাই।"
মহেশ কহিল, "বন্ধু রকীব, দরাজ তোমার মন,
এমন করিয়া প্রাণে আজি মোর দিলে এ কী বন্ধন!
এ ঋণ কেমনে শুধিব তোমার বলো গো রকীব, তাই?"
রকীব কহিল, "আমি অভাজন, তোমার গরীব ভাই।
মোর দুর্দ্দিনে তুমি কি কখনো পারিতে গো ফিরাইতে?
সেই সাহসেতে তুচ্ছ এ দান পারিয়াছি তোমা দিতে।"

দু' হাতে সাপটি মহেশ তাহারে জাড়ায়ে ধরিলো বুকে,
দু'টি ভাই যেন বহুকাল পরে মিলিল পরম সুখে।

নিয়তি

শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়

রাত তখন বারোটা। বর্ধমান শহর।

বিখ্যাত ডাক্তার আর. কে. ঘোষ, ব্রেন অপারেশনে যাঁর জুড়ি মেলা ভার, খাওয়া-দাওয়া করে সবে শুয়েছেন।

ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং! টেলিফোন বেজে উঠলো।

সারাদিনের ক্লান্তিতে চোখ আঠার মত জড়িয়ে এসেছে, তবুও উঠতে হ'ল।

হ্যালো!

আমি কলকাতার হাসপাতাল থেকে বলছি স্যর!—সহকারী ডাঃ তিমিরবরণের কণ্ঠ শোনা গেল।

কি ব্যাপার?

একটা জরুরী কেস্ এসেছে স্যর! মোটর এ্যাকসিডেন্ট। ব্রেনে সাঙ্ঘাতিক আঘাত। অপারেশনের প্রয়োজন।

ঠিক আছে, করে ফেল।

আমরা সাহস পাচ্ছি না স্যর! তা ছাড়া পেশেণ্ট ছেলেটি জ্ঞান হারাবার আগে আপনার কথাই বলেছে। অনুরোধ জানিয়েছে যা কিছু করতে হয় আপনিই যাতে করেন।

কারণ?

জানি না স্যর! তবে ছেলেটি আপনাদের বর্ধমানের লোক··· খুব কাকুতি-মিনতিই করেছে ছেলেটি সেন্সলেস্ হবার আগে।

বেশ। অপারেশনের ব্যবস্থা করো, আমি যাচ্ছি।

শরীর আর ডাঃ ঘোষের বইছে না। সারাদিনের ক্লান্তি, চোখ জড়িয়ে আসছে দুর্দমনীয় ঘুমে! তবু ডাক্তারের মহান্ কর্তব্য—রোগীর জীবনমরণ সমস্যা।

আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে আসুন স্যর!—ডাঃ তিমিরবরণের উৎকণ্ঠিত আওয়াজ শোনা গেল।—কেসটা খুবই সাঙ্ঘাতিক, আজ রাত্রের মধ্যেই অপারেশন করা কর্তব্য।

ঠিক আছে। ডাঃ ঘোষ অভয় দিলেন,—আমি ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই পৌঁছচ্ছি।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে তিনি দ্রুত পোষাক পরিবর্তন করে নিলেন। বারোটা দশ

এখন। বর্ধমান থেকে কলকাতা প্রায় সাতষট্টি মাইল। গভীর রাত্রি। রাস্তা ফাঁকা। ঘণ্টা দেড়েকে কলকাতা পৌঁছতে পারবেন।

গ্যারেজ থেকে ছোট অষ্টিন গাড়ীখানা নিয়ে তিনি তীরবেগে রওনা দিলেন।

শহর প্রায় ঘুমে নিস্তব্ধ। পানের দোকান, খাবারের দোকানগুলোও প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে।

গাড়ী শহর ছেড়ে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ওপর এসে পড়লো।

কিছু দূর এগোবার পরেই কিন্তু ডাঃ ঘোষকে গাড়ীর তিরিশ মাইল গতিকে ব্রেকে পা দিয়ে মুহূর্তে শ্লথ করে আনতে হ'ল। হেড লাইটের আলোয় দেখা গেল একজন ভীমদর্শন লোক হাত তুলে গাড়ীটাকে থামবার ইঙ্গিত করছে। লোকটার ভীষণ মোটা ভুরু, বাঁ গালে একটা শুকনো কাটা চিহ্ন, মাথায় বিরাট এক টাককে ঘিরে চার-পাশে রুক্ষ চুল সামান্য। লোমশ বিশাল দেহ।

গাড়ীর গতি থেমে আসতেই লোকটা এক লাফে পা-দানিতে উঠে পড়লো। তার পরেই রিভলভার তুলে ডাঃ ঘোষের পিঠে চেপে ধরে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলো—গাড়ী থামাও!

বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে ডাঃ ঘোষ গাড়ী রুখ্লেন।

—নেমে এসো। ভীমদর্শন লোকটা মুহূর্তের জন্যেও ডাক্তারের পিঠ থেকে রিভলভার নামাল না।

ডাক্তার নেমে আসতে বাধ্য হলেন। অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, দেখ, আমার কাছে বিশেষ টাকাপয়সা নেই। যা আছে দিয়ে দিচ্ছি। তা ছাড়া আমায় বিশেষ এক জরুরী প্রয়োজনে—

কোন কথা নয়।—ভীষণদর্শন ডাক্তারকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে নিজে গাড়ীতে উঠে বসলো এবং তন্মুহূর্তে গাড়ী ষ্টার্ট দিয়ে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের নিঃসীম অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

এত দ্রুত ঘটনাটা ঘটলো যে ডাক্তারের বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো প্রকৃতিস্থ হতে।

এখন উপায়? মোটর তো গেল। তা যাক, কিন্তু ছেলেটি, সেই পেশেণ্ট—যার এখন-তখন অবস্থা? যার জীবন নির্ভর করছে তাঁর পৌঁছনোর উপর? তার কি হবে?

ফিরে তিনি হাঁটতে লাগলেন। ষ্টেশানে এলেন। কিন্তু এখন কোনও কলকাতাগামী গাড়ী নেই। প্রথম গাড়ী যাবে শেষ রাত্তিরে। উপায়হীন অবস্থা। চিন্তায়,

অনুশোচনায় ছটফট করতে লাগলেন ডাঃ ঘোষ। কি বিড়ম্বনা! সমানে পায়চারি করে গেলেন ষ্টেশানের প্ল্যাটফর্মে—যতক্ষণ না কলকাতাগামী প্রথম ট্রেন এসে পৌছলো।...

কলকাতা পৌছলেন যখন—তখন সকাল হয়ে গেছে। ট্যাক্সি নিয়ে সটান চলে এলেন তাঁর হাসপাতালে।

ভীষণ তুশ্চিন্তা মনে। রাতটা যেন তুঃস্বপ্নে কেটেছে। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে প্রায় দৌড়েই চলে গেলেন লন্ পেরিয়ে অপারেশন থিয়েটারে।

ঢুকতেই দেখলেন রোগী টেবিলের ওপর শুভ্র কাপড় দিয়ে ঢাকা অবস্থায় শোয়ানো —মুখটাও আবৃত।

বড় দেরী হয়ে গেল স্যর, আপনার'—বিমর্ষ ডাঃ তিমিরবরণ প্রায় অনুযোগের সুরেই বললেন।

সে কথা পরে হবে,— ডাঃ ঘোষ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন ;—কি ব্যাপার হ'ল বল ?

ছেলেটি মারা গেছে স্যর!—ডাঃ তিমিরবরণ বললেন।—আপনার জন্যে ঘণ্টা তুই অপেক্ষা করবার পর উপায়ান্তর না দেখে আমরাই চেষ্টা করলাম। কিন্তু স্যর ··আমাদের অসাধ্য কাজ। আপনি এলে হয়তো এ পেশেণ্ট বেঁচে যেত...

বুক চেরা এক দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো ডাঃ ঘোষের। তিনি শুধু একটি 'হু" শব্দ করে অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে ডাঃ তিমিরবরণও। লম্বা করিডোর—পাশে বেঞ্চিতে বসে একজন লোককে তু'হাতে মুখ চেপে কাঁদতে দেখলেন।

সেই দিকে চেয়েই ডাঃ ঘোষ চমকে উঠলেন। আরে, এ যে সেই টাক-মাথা, ভীষণদর্শন লোকটি—যে তাঁর মোটর গাড়ী নিয়ে পালিয়েছিল গত রাত্রে!

এ লোকটা এখানে কেন ?—ডাঃ ঘোষ সহকারীকে প্রশ্ন করলেন।

ইনিই ছেলেটির বাপ স্যর, খবর পেয়ে দেশ থেকে কাল শেষ রাত্তিরে ছুটে এসেছেন এখানে।— ডাঃ তিমিরবরণ বললেন।

ডাঃ ঘোষ শুধু অদ্ভুত দৃষ্টিতে লোকটার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালেন।*

* একটি বিদেশী সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

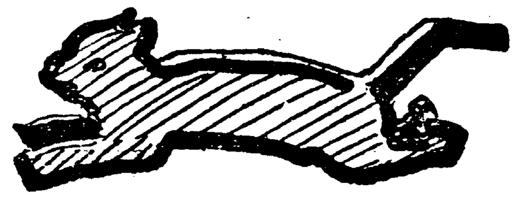

পথিক মেঘের দল

শ্রীআশা দেবী. এম্ এ, বি. টি

মীর—মীর! মাতৃসম্মেলন উপলক্ষ্যে রাশিয়ায় এসে শুধু শুনছি এই কথা।

সবাই সমস্বরে জানায় এঁরা শান্তি চান। শ্বেত পারাবতের মুখে বয়ে-আনা নীবার ধান্যের কণার মত জীবন আর শান্তি।

রাশিয়ার বর্ডার লাইন যেন একটা কাঁটা-তারের বেড়ার মত হাস্যকর। এ যেন হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের বর্ডার। আমাদের এক মাষ্টার মশায়ের স্ত্রীর কথা এই বর্ডার দেখে বার বার মনে পড়ছিল। তাঁর পাস্পোর্ট ছিল না। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, পার হলেন কি করে? তিনি সহাস্যে বলেছিলেন নিজের মাতৃভাষায়: "ক্যান! ফাল দিয়া যাইতে পারি না ?" অর্থাৎ এ বর্ডার তো লাফ দিয়েই পার হওয়া যায়।

এও প্রায় সেই অবস্থা আর কি! পথে, মনে আছে, প্রথম একটা ছোট্ট ষ্টেশন পড়লো। নাম তার 'চোপ'। কি অপূর্ব্ব অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছিল এখানে! নানা রঙের ফুলের তোড়া আর ফুল। আমাদের গাড়ী যেন ভরে গেল ফুলে ফুলে। কিন্তু এ সব ফুলের সঙ্গে আমাদের দেশের ফুলের একটা তফাৎ আছে, তা হয়তো প্রাণ-ধর্ম্মের তফাতের সঙ্গে তুলনীয়। আমাদের ফুলে এতো বর্ণ নেই বটে, তবে গন্ধে তার তুলনা হয় না।

ট্রেন ছাড়ালো ষ্টেশন থেকে। একটা বুনো ফুলের উগ্রগন্ধে গাড়ীর কামরাটা ভরে গেল যেন।

সুইজারল্যাণ্ড থেকে আমরা চেকোশ্লোভাকিয়ায় ট্রেনে প্রাগ্ পর্য্যন্ত এসেছি। এদের কাঞ্চনকৌলীন্য যে খুব বেশী নেই তা বেশ অনুভব করা যায়। প্রাগ্‌কে শিল্প-নগর

বলা চলে। সকালের গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেছি দলে দলে শ্রমিক মানুষ যাচ্ছে। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ অনাড়ম্বর। তবে আমাদের হোটেলটি ভারি সুন্দর ছিল। একটু পুরোনো ধরণের হলেও এর আভিজাত্য ঐতিহ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ গেলেন বাজারে। আমি হোটেলের পেছনটায় ফুটপাথ ধরে খানিকটা এগিয়ে চললাম। এ অঞ্চলের রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার। বাড়ীতে চিঠি লিখতে হবে, হঠাৎ মনে পড়তেই ফিরে এলাম।

'কিউ' ষ্টেশনে আমরা যে অভিনন্দন পেয়েছিলাম তার তুলনা হয় না। লোকে-

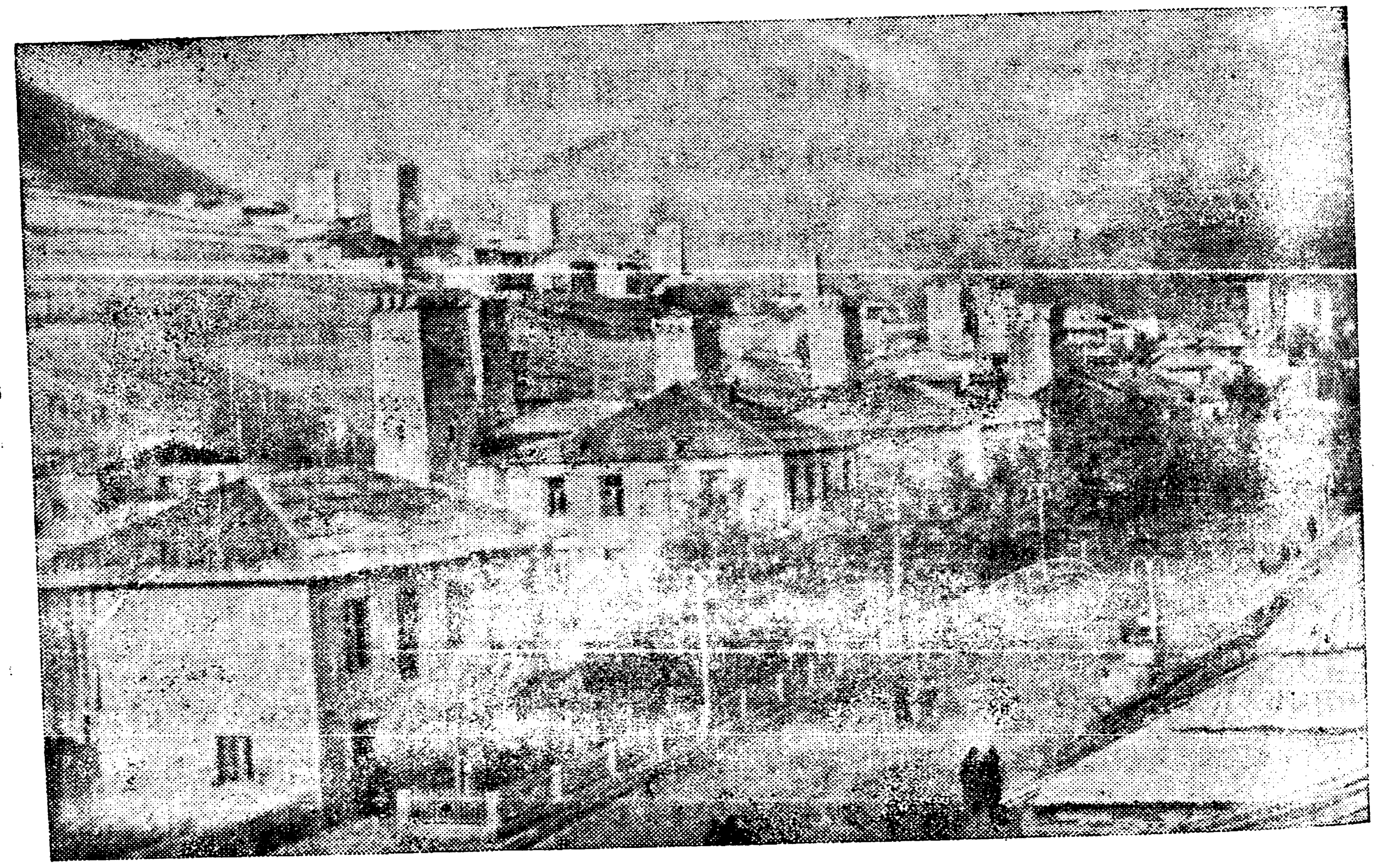

নতুন করে গড়ে-ওঠা একটি ছোট্ট সহরের দৃশ্য—রাশিয়া

লোকারণ্য—সামনের লাইট-পোষ্টের ওপরও লোক। এরা নানা রকমের উপহার দিচ্ছে ছুঁড়ে ছুঁড়ে গাড়ীর মধ্যে—সেন্ট, ছোট ছোট ডালায় ফল, ফুল, আরো কত কি! আমাদের সঙ্গের সাথী সাদিকা সরণ তো উৎসাহে নিজের মূল্যবান্ ওড়না কেটে টুকরো টুকরো করে বিলোতে লাগলো। ইণ্ডিয়ার জিনিষ, স্মৃতি হিসেবে তাই সবাই মণি-মুক্তোর মত আহরণ করলো।

গাড়ীগুলো সোভিয়েটে বেশ ভাল। গাড়ী-বারান্দাওয়ালা বাড়ীর মত। এক এক কামরায় দুটো করে সিট। চারটেও আছে। প্রত্যেক কামরায় রেডিও। রাজকীয় আয়োজন। ভৃত্য সম্মার্জ্জনী হাতে দাঁড়িয়ে আছে, একটু ময়লাও জমতে দেবে না। অবশ্য এখানকার ট্রেনে যাদের দেখেছি তারা সবাই নারী। কিন্তু শক্তিতে, স্বাস্থ্যে, কর্ম্মতৎপরতায় এদের পুরুষের চেয়ে কোন অংশেই হীন বলা চলে না।

আমাদের সঙ্গে দু টি পথপ্রদর্শিকা দো-ভাষী ছিলেন—তানিয়া ও নাদিয়া। এঁরা পথেই স্থির করে নিলেন মস্কোতে গিয়ে আমাদের প্রোগ্রাম কি হবে।

গাড়ীর সঙ্গেই খাবার, রান্নার ব্যবস্থা ছিল এবং তাও বেশ রাজকীয়। প্রচুর ফলের রস, সুপ্, মাংস, আস্ত ফল—সবেরই আয়োজন ছিল।

আমাদের কিন্তু চায়ের জন্য ভারি কষ্ট হতো। ডুয়ার্স অঞ্চলে চায়ের দেশের বাসিন্দা আমি, সারা দিন যেন চায়ের নেশায় অবসাদগ্রস্ত হয়েই থাকতাম। এখানে খাবার টেবিলে এঁরা জল পরিবেশন করেন না। হয় মদ, না হয় ফলের রস,—আনারস বা আপেলের রস। এ সব ভাল ভাল ফলের রস খেয়েও কিন্তু মনের তৃপ্তি আসতো না। বার বার মনটা স্বপ্ন দেখতো ধূমায়িত চায়ের কাপের।

এক একটা ষ্টেশন যায় আর এক একবার লোকারণ্য। লোকের অভিনন্দন—ষ্ট্রবেরি, গুসবেরি প্রভৃতি নানা ফল ও ফুলের উপহার আমাদের মনকে ভরে তোলে। কীভ ষ্টেশনে এসে গাড়ী থামলো। ভীড় যেমন, তেমনি এঁদের আমাদের দেখবার জন্য আগ্রহ। সর্ব্বত্রই আমরা এটা লক্ষ্য করেছি। গাড়ীর ভেতর থেকে আমরা দো-ভাষীর কাছ থেকে শেখা "ইন্দোসোভিয়েৎ স্কায়া দ্রুসবা" ধ্বনি তুলেছি ; সঙ্গে সঙ্গে শত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে সেই মৈত্রীর বাণী

সত্যি কথা বলতে কি, এমন সমস্ত অন্তর দিয়ে অভ্যর্থনা আমি আর কখনও দেখি নি। জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা ছোট্ট ষ্টেশন চোখে পড়লো—যেন আমাদের দেশের হাট। একটা বড় গাছতলায় একটা টেবিল পাতা। তার ওপর সমস্ত পণ্যদ্রব্যসম্ভার সাজান। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো আমাদের দেশের হাটের কথা। সহরতলীতে পাহাড়ের কোলে একটা চা-বাগানের হাটের কথা মনে পড়লো।

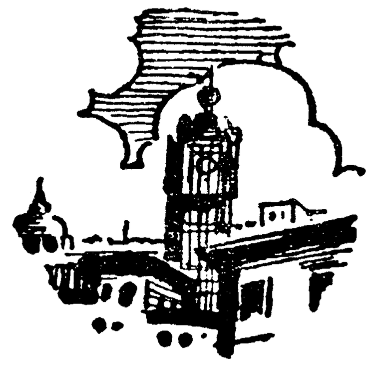

স্বদেশী কুকুর

শ্রীঅরবিন্দ গুহ

বিপদে মধুসূদন ব'লে একটা কথা আছে। এই মধুসূদন হচ্ছেন ভগবান্। তাঁকে আমি এ যাবৎ স্বচক্ষে দেখি নি। আমি যে মধুসূদনকে স্বচক্ষে দেখেছি—এখনো দেখে থাকি—সে-মধুসূদন ভগবান নন, এবং বিপদ-টিপদের ত্রিসীমানায় তিনি থাকেন না। অর্থাৎ, নিজে তিনি কখনো বিপদে পড়েন না, তবে অন্যকে বিপদে ফেলতে তাঁর জুড়ি নেই। এদিক্ দিয়ে অবশ্যই শ্রীভগবানের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে।

এই মধুসূদন আমার দাদা। শুধু আমার নয়, পাড়ার সকলের দাদা,—মধুদা। একটা অসাধারণ ক্ষমতা আছে মধুদার, সেই ক্ষমতার জোরেই মধুদা ক'রে খাচ্ছেন। সেই ক্ষমতার জোরেই সম্প্রতি মধুদার বিয়ে হয়েছে, অদ্ভুত সুন্দরী হয়েছেন আমাদের বৌদি। পরশু দিন মা নু আমাকে বললো যে মধুবৌদির ডাকনাম নাকি রসগোল্লা। তা এটা আমার ভালো লাগে নি। মধু আর রসগোল্লা—মিষ্টির একেবারে ছড়াছড়ি না? এত বাড়াবাড়ি কি ভালো? তার চেয়ে বরং বৌদির নাম পাঁউরুটি হ'লে দিব্যি হ'তো। মধু আর পাঁউরুটি—বাঃ!

পাঁউরুটি-টাউরুটির কথা যেতে দাও, আসল কথা হ'লো গিয়ে মধুদার অসাধারণ ক্ষমতা। তার একটু বিশদ বিবরণ দিয়ে নিচ্ছি।

মুখ একেবারে না খুলে মধুদা আশ্চর্য ভাবে কথা বলতে পারে। তুমি যদি মধুদার কাছাকাছি এসে দাঁড়াও এবং মধুদা যদি ইচ্ছে করে তো তোমাকে বিলকুল বোকা বানিয়ে দিতে পারে। মধুদা বন্ধমুখে এমন ভাবে কথা বলবে যেন আর কেউ কথা বলছে। শুধু যে অন্য মানুষের গলায় কথা বলতে পারে. তা নয়, কুকুর-বেড়াল, কাক-শালিখ ইত্যাদি পশু-পাখী যদি মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারতো তাহলে যেমন ভাবে বলতো, অবিকল তেমনি ভাবে কথা বলতে পারে মধুদা। সিনেমায় ওয়াল্ট-ডিসনের কার্টুন ছবি দেখ নি? এই কার্টুনের জীবের কথা শোনো নি ছবিতে? তার থেকে মধুদার কেরামতিটা একবার আন্দাজ ক'রে নাও।

মধুদা! আমার মধুদা! বিশ্বাস করো, এই অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মধুদা আমাকে যারপরনাই ভালোবাসে।

একেকদিন মধুদা বলে—আরে, একেই বলে প্রতিভা। কারো কাছে শিখি নি, কোনো মাষ্টার-ফাষ্টার গুরু-ফুরুর ধার ধারি নি কস্মিন্‌কালে, কিন্তু কী একখানা বিদ্যা আয়ত্ত করেছি দেখ। ইংরেজীতে একে কী বলে মনে আছে তো?

ভে দিয়ে ভারি শক্ত একটা ইংরেজি নাম। আমি বললাম—ভে-ভে-ভে

আমি তোৎলা নই। কিন্তু নামটা এমন খটমট যে কিছুতেই মনে রাখতে পারি না। মধুদা বললো—হয়েছে, আর বিদ্যা খরচ করতে হবে না। ভেন্ট্রিলোকিজম। যে ভেন্ট্রিলোকিজম জানে তাকে কি বলবি? ভেন্টিলোকিষ্ট। আবার যদি ভুল করিস তো এক ঘুষিতে দাঁত ভেঙে দেবো।

না, আর ভুল করবো না। কিংবা, ঈশ্বরের ইচ্ছায়, ভুল যদি হয়েই যায় তো দুঃখ কি? মধুদার ঘুষিতে যদি আমার দাঁত ভাঙে সে তো আমায় দাঁতের চৌদ্দ পুরুষের সৌভাগ্য!

হাফ্-প্যান্ট পরা একজন দশাসই চেহারার দারোগা কী একটা কাজে সেদিন আমাদের পাড়ায় এসেছেন। ভাগ্যক্রমে মধুদার পরিচয় পেয়ে গেলেন তিনি। এবং, বলা বাহুল্য, বিমোহিত হলেন। খানিকক্ষণ নির্বাক্ হয়ে রইলেন তিনি। তারপর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ব'লে উঠলেন—পেয়েছি, পেয়েছি। আমি তোমাকে ছাড়বো না।

দারোগার কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। ঠাহর ক'রে দেখি, মধুদার মুখও পলকে শুকিয়ে গেছে। ছাড়বে না? কেন ছাড়বে না? ভেন্ট্রিলোকিজম কি খুব খারাপ জিনিস? মধুদা প্রতিভাবান্, কিন্তু প্রতিভাবান্ হ'লেই কি পুলিশের দারোগা তাকে ধরবেন, কিছুতেই ছাড়বেন না? এ কি জুলুমবাজি?

ভারি একটা সাহসের কাজ করলাম আমি। দারোগার সামনেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—জুলুমবাজী—অন্য ছেলেরা হাঁক দিয়ে উঠলো—চলবে না। আমি আবার হাঁকলাম—মধুদাকে—সবাই সমস্বরে বললো—ছাড়তে হবে।

দারোগা বাবু রাস্তার উপরেই ভো ভো করে হাসতে লাগলেন। উদ্দাম ভাবে হাসতে হাসতে মাথার হ্যাটটা খুলে বগলদাবা করলেন। হাসি থামলে বললেন—ছাড়বো না মানে, তোমাদের মধুদাকে,—এই গুণধরকে, এই রত্নকে—আমার জামাই করবো। মানে, আমার বাড়ী হবে তোমাদের মধুদার শ্বশুরবাড়ি।

আমাদের আন্দোলনে ভয় পেয়ে দারোগা বাবু একটা নতুন রকম চাল দিলেন না তো? আমার ঘোরতর সন্দেহ হলো। গম্ভীর মুখে আমি বললাম—শ্বশুরবাড়ি? শুনেছি পুলিশের লোক জেলখানাকে শ্বশুরবাড়ি বলে। মধুদা এমন কোন্ অপরাধ করেছে যে…

কিন্তু যথা সময়ে প্রমাণিত হ'লো, আমার সন্দেহ অমূলক। এই দারোগা বাবুর মেয়ের সঙ্গেই ঘটা ক'রে মধুদার বিয়ে হ'লো। আর এই মধুবৌদিরই তো ডাকনাম শুনছি 'রসগোল্লা'। গোড়াতেই তো বললাম যে নিজের অসাধারণ ক্ষমতার জোরেই মধুদার বিয়ে হয়েছে। মিথ্যে বলেছি নাকি?

মিথ্যে কথা কোনোকালে বলি নি, আজো বলবো না। আগেই বলেছি, অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও মধুদা আমার মতো অপোগণ্ডকে পর্যন্ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, মধুদা আমাকে যতখানি ভালোবাসে. আর কাউকে ততখানি ভালোবাসে না। অন্ততঃ ততকাল ভালোবাসতো না।

কিন্তু সম্প্রতি মধুদার মধ্যে একটা প্রচণ্ড পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। না. না, মধুদার মধ্যে না, মধুদার ভালোবাসার মধ্যে। পাড়ার একটা নেড়ি কুকুরকে মধুদা সাংঘাতিক ভাবে ভালোবাসতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। যদি একটা ভব্য-সভ্য বিলিতি কুকুরকে ভালোবাসতো, আমার কিছু

বলবার থাকতো না। একটা যোগ্য ভালো জিনিষের ওপর ভালোবাসা পড়লে আর দোষ কি? কিন্তু একটা নেড়ি কুকুর! ছ্যাঃ।

একটা নেড়ি কুকুর! টিঙটিঙে চেহারা, গায়ের রঙ খানিকটা ব্রাউন, খানিকটা সাদা। কুৎকুতে দুটো চোখ। ডাষ্টবিন-টাষ্টবিন থেকে কুখাদ্য খায়। তাছাড়া করবেই বা কি? ঐ যমের অরুচিকে কে আর নেমন্তন্ন ক'রে মাছ-মাংস খেতে দিচ্ছে? গুণের দিকেও কিছু কমতি নেই কুকুরটার। চোর-ডাকাত দেখলে কী করবে বলতে পারি না, কিন্তু একটা ইঁদুর দেখলেই ওটা এমনভাবে চিৎকার করে যে মরা মানুষের পর্যন্ত জেগে উঠবার কথা। চিৎকার অবশ্য প্রাণের ভয়ে করে। তখন যদি ওর চেহারাটা একবার ভাখো! পেছনের পা দুটো বেঁকে যায়, লেজটা ঢুকে যায় তার মধ্যে, সারা শরীর কাঁপে থরথর করে। বলিহারি!

যখন-তখন দেখি মধুদা কুকুরটাকে আদর ক'রে ডাকে। অবলীলায় কোলে তুলে নেয়, ঝপাঝপ চুমু খায় কুকুরটার মুখে। (মাগো, একরত্তি ঘেন্না-পিত্তিও কি নেই মধুদার!) আদর ক'রে মধুদা আবার এই কুকুরটার নাম রেখেছে—বিশু। তু-তু ক'রে ডাকে—বিশু, বিশু, বিশু! মধুদার ডাক কানে যাওয়া মাত্র বিশু নাচতে-নাচতে এসে হাজির। একটা নেড়ি কুকুরকে এ ভাবে নাচানো কি মধুদার পক্ষে খুব ভালো হচ্ছে?

মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে। তাই আমি একদিন বললাম—মধুদা, এ সব কি করছো? তুমি কি ক্ষেপে গেলে?

মধুদা বললো—এবার ক্ষেপে যাবো। এমন এক লাথি ঝাড়বো তোকে যে আমাকে উপদেশ দেবার বাসনা তোর এ-জীবনের মতো খতম্ হ'য়ে যাবে।

—কী যে বলো তুমি, মধুদা! উপদেশের কথা আসে কোত্থেকে? আমি তোমাকে ভক্তি করি, তুমি আমাকে ভালোবাসো—সেই সুবাদে যেটুকু না বললেই নয় সেইটুকুই শুধু বলতে এসেছিলাম। তুমি যদি শুনতে না চাও তো, ব্যস, ফুরিয়ে গেলো।

মধুদা একটু ঠাণ্ডা হ'লো। বললো—আচ্ছা, কী বলছিলি বল। আমার মনের প্যাঁচ না জেনে-শুনে মাঝে মাঝে এমন একেকটা কথা বলিস যে খপ্ করে আমার ক্রোধ হ'য়ে যায়। একটু ভেবে-চিন্তে কথা বলতে পারিস না? কোনোদিন ভালোমুখে জানতে চেয়েছিস, আচ্ছা, মধুদা, বিশুকে এত আদর-যত্ন করছো, উদ্দেশ্যটা কি তোমার? না, মধুদা, তুমি কি ক্ষেপে গেলে?

জিভ দিয়ে চু-চু শব্দ করতে করতে খানিকক্ষণ বিশুর পিঠে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো মধুদা। গদগদ গলায় বললো—বিছু, বিছু, বিছু! তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মধুদা বললো—ঐ যে একটা কথা বললি না তুই, দামী কথা।

আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, কোন্ দামী কথাটা আমি বলেছি। মধুদা বললো—ঐ যে, 'আমি তোমাকে ভক্তি করি, তুমি আমাকে ভালোবাসো'। দামী কথা, খুব দামী কথা। তবে আমিও একটা কথা পরিষ্কার ক'রে বলি তোকে। ঐ যে লাথির কথাটা তোকে বললাম, ভেবে দেখতে গেলে এটাও কম দামী না। তোকে আমি লাথি মারলে সেটা হয় তোর কথার খেই ধরেই বলছি, ভালোবাসার লাথি। ওরে ভালোবাসার লাথিতে ব্যাথা লাগে না রে!

ভালোবাসার কথায় মধুদার চোখ দু'টো চকচক্ করে উঠলো। মধুদা বললো,—আর শোন্, ভালোবাসার কি কোনো পাত্রাপাত্র আছে? বাছ-বিচার আছে? তা যদি থাকতো তাহলে আমি জগৎ-সংসারে এত বিষয়বস্তু থাকতে তোকে আর বিশুকে ভালোবাসতে গেলাম কেন?

বিশুর সঙ্গে আমাকে একাকার করে দেখছে মধুদা। আমি আর বিশু মধুদার দৃষ্টিতে অভিন্ন? রাগে আমার সারা শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠলো। কিন্তু, যাই হোক, আমি মধুদাকে ভক্তি করি, মধুদা আমাকে ভালোবাসে। অতএব আমি হজম করে গেলাম। চুপ করে রইলাম।

মধুদার প্রাণে একটু আগে ব্যথা দিয়েছি, এবার মধুদাকে একটু খুসি করবার চেষ্টা করবো?

আমি বললাম—আচ্ছা, মধুদা, 'বিশু' নামটা আমার খুব ভালো লাগছে না। ওর একটা ভালো নাম দিলে হয় না? স্বদেশী কুকুরের স্বদেশী নাম অবশ্যই ভালো, কিন্তু স্বদেশী একটা বিখ্যাত নাম দিলে কেমন হয়? প্রাতঃস্মরণীয় কোনো স্বদেশী নাম…

মধুদা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো—সে কথা গোড়াতেই আমি বলেছিলাম তোর বৌদিকে। কিন্তু তাতে তোর বৌদির ঘোর আপত্তি। সে বলে, ওতে নাকি সেই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিকে অপমান করা হয়।

আমি চুপ করলাম। কিন্তু মধুদা চুপ করলো না।—তারপর আমি তোর কথা তুলেছিলাম। না না, তুই লজ্জা পাচ্ছিস কেন? দু'জনেই ভগবানের জীব তোরা, তাই ভাবলাম তোর নামেই ওর নাম রাখবো। কিন্তু তাতেও তোর বৌদি রাজি হ'লো না।

বৌদিকে আমি মনে মনে প্রণাম করলাম। বৌদি দীর্ঘজীবী হোন, বৌদিকে ভগবান্ সুখী করুন।

মধুদা বললো—তোর নামে ওর নাম রাখতেও তোর বৌদিকে কিছুতেই রাজি করানো গেলো না। তোর বৌদি বারংবার বললো তাতে কুকুরটাকে অপমান করা হয়।

বিবেচনা করো এই নিদারুণ অপমানও আমি নিঃশব্দে সহ্য ক'রে গেলাম। কেন না আমি মধুদাকে ভক্তি করি, মধুদা আমাকে ভালোবাসে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মধুদার হয়তো একটু দয়া হ'লো। বললো—তুই মনে কোন কষ্ট করিস না। আমার মাথায় একটা দুর্ধর্ষ প্ল্যান আছে। বিশুকে কি আমি খামখা আদর-যত্ন করছি? বিশুকে নিয়েই দেখবি কি একখানা কাণ্ড করি। হ্যাঁ, তোকে দেখাবো, তুই দেখবি। তুই আর বিশু কি আলাদা? তোর বৌদি যাই বলুক, আসলে দু'জনেই তোরা ভগবানের জীব, দু'জনেই তোরা সমান।

দম নেবার জন্যে মধুদা একটু থামলো। তারপর আবার আরম্ভ করলো—সামনের রোববারেই যাবো আসল জায়গায়। আমি যাবো, বিশু যাবে আর তুই যাবি। আগে থেকে প্ল্যান্ ভাঙছি না তোর কাছে, দেখতেই পাবি সব। কিন্তু একটা কথা আগে থাকতে ব'লে রাখছি তোকে, যা দেখবি সেদিন, পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য তার কাছে নস্যি।

মধুদা একবিন্দু বাড়িয়ে বলে নি। মধুদা, না, শুধু মধুদা নয়, মধুদা আর বিশু আমাকে যা

দেখালো পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য সত্যি সত্যি তার কাছে নস্যি ছাড়া আর কিছু নয়। সেদিনের ঘটনা সারাজীবন মনে থাকবে।

গোড়া বেঁধে বলি সেদিনের ঘটনাটা।

চৌরঙ্গী-পাড়ার একটা বিখ্যাত রেষ্টুরেন্ট—বঙ্গবাসী রেষ্টুরেন্ট। আমাকে আর বিশুকে নিয়ে সেই রেষ্টুরেন্টে ঢুকে পড়লো মধুদা। আগে থাকতেই মধুদা আমাকে পই-পই ক'রে শাসিয়ে রেখেছে—খবরদার, একটি কথা বলবি না। স্রেফ বোবা হ'য়ে থাকবি। একটি কথা যদি বলেছিস তো একসঙ্গে তিন-তিনটে সর্বনাশ হ'য়ে যাবে—তুই খুন হবি, আমি ফাঁসি যাবো, আর তোর বৌদিকে নিরামিষ খেতে হবে সারাজীবন। খবরদার!

বঙ্গবাসী রেষ্টুরেন্টে তো জাঁক ক'রে ঢুকে পড়া গেলো। টেবিলে নানারকম লোকজন মহানন্দে চমৎকার-চমৎকার সব খাদ্যবস্তু খাচ্ছে, সুখাদ্যের গন্ধে প্রাণ আনচান ক'রে ওঠে। আমার কথা যেতে দাও, মধুদার কোলে ব'সে বিশুও দেখি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আহা, বেচারা! জীবনে কখনও তো দেখে নি এ সব বস্তু! মধুদার দৌলতে বিশুর কুকুরজন্ম সার্থক হ'লো। মধুদার দয়ায় আমার মানবজন্মও অবিশ্যি ব্যর্থ যাচ্ছে না।

কয়েকজন মানুষ ঘাড় তুলে আমাদের দিকে তাকালো একটু। একটা কুকুর মানুষের কোলে চেপে রেষ্টুরেন্টে খেতে এসেছে, দেখবার মতো দৃশ্য বৈ কি!

কিন্তু মধুদা কোনোদিকে বারেকের জন্যেও তাকালো না। গটগট ক'রে সটান ঢুকে পড়লো একটা কেবিনে। বলা বাহুল্য, আমিও সেই কেবিনেই ঢুকলাম। মধুদা একটা চেয়ারে বসলো, বিশুকে সমাদর ক'রে বসালো তার পাশের চেয়ারে। আমি বসলাম ওদের উল্টোদিকে, ওদের মুখোমুখি হ'য়ে।

অবিলম্বে একটা বয় ব্যাজার মুখে এসে ঢুকলো কেবিনে। সাধারণতঃ অত তাড়াতাড়ি বয়ের শুভাগমন ঘটে না, অত ব্যাজারও দেখা যায় না বয়ের মুখ। এ রকম কেন হ'লো? সেটা বয়ের মুখ থেকেই পরিষ্কার জানা গেলো—এখানে কুকুর নিয়ে ঢোকা বারণ স্যর! আপনি যদি এক্ষুণি

মধুদা বললো—এটা ঠিক কুকুর নয়। তুমি মহাভারত পড়েছো? তাহলে জানতে সব কুকুরই কুকুর নয়, সব মানুষই মানুষ নয়। কুকুররূপী মানুষ আছে, মানুষরূপী কুকুর আছে। আমার বিশু কুকুররূপী মানুষ। কী রে বিশু, তাই না?

বয় শুনলো যেন বিশু বলছে—আলবৎ।

আসল ব্যাপারটা আমি পলকে বুঝলাম এবং চমকে উঠলাম। উপায় নেই, মধুদার হুকুমে আমাকে বোবা হ'য়ে থাকতে হবে। নইলে আমি খুন হবো মধুদার ফাঁসি হবে, বৌদিকে নিরামিষ খেতে হবে সারাজীবন।

কিন্তু বয় তো জানে না যে মধুদা একজন, ইংরেজিতে যাকে বলে, ভেন্ট্রিলোকিষ্ট। কুকুর কথা বলছে, এই শুনেই বয়ের দু'চোখ কপালে উঠবার উপক্রম করলো। বয় বললো—স্যর, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি বুঝতে পারি নি যে আপনার কুকুর মানুষ। আমাকে ক্ষমা করুন স্যর!

স্যর তখন ক্ষমার অবতার।—আরে যেতে দাও, যেতে দাও। মানুষ মাত্রেই ভুল করে। কী রে বিশু, কী খাবি?

—একটা প্রন-কাটলেট, দুটো মাটন-চপ, তিনটে মোগলাই-পরোটা।

বয়ের মুখে আর বাক্য নেই। মানুষের কুকুরদেহ দেখে তার দু'চোখ থেকে টপটপ ক'রে জল পড়তে লাগলো। বিশু আগে কোনো পয়সাকড়ি দেয় নি, তৎসত্ত্বেও বিশুকে সে মিলিটারী কায়দায় স্যালুট করলো।

মধুদা বললো—যাও, এনে দাও চট ক'রে। আর শোনো, আমাদের জন্যেও দুটো ক'রে কাটলেট নিয়ে এসো।

বয় চ'লে গেলো। বয়ের মুখ থেকে কী শুনেছেন কে জানে, হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলেন ম্যানেজার। কেবিনে ঢুকেই তিনি বিশুকে জিজ্ঞেস করলেন—এ সব কি সত্যি, মশাই?

বিশুর কথা স্বকর্ণে শুনলেন ম্যানেজার—খামখা আমি মিথ্যে কথা বলবো কেন? দেখতে আপনার মতো নই ব'লেই কি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না? হায়, একেই বলে কলিযুগ। নিজের চোখে দেখছেন, নিজের কানে শুনছেন, তথাপি আপনার সন্দেহ? ঘোর কলি, ঘোর কলি।

ম্যানেজার বিমূঢ়ভাবে বললেন—আপনার কুকুর স্যর?

মধুদা অম্লানমুখে বললো—ও আমার, কিন্তু ও কুকুর নয়। কুকুররূপী মানুষ। ওর নাম বিশু।

এখানে বিশুকে একটু আদর করলো মধুদা—বিছু আমার, ছোনা আমার!

আমার মনে পড়লো, এককালে মধুদার শ্বশুর মধুদাকে দুটো আশ্চর্য বিশেষণ দিয়েছিলেন—গুণধর, রত্ন। খাঁটি কথা বলেছিলেন ভদ্রলোক।

ম্যানেজার দেখি পুনরায় বিশুকে নিয়ে পড়েছেন। বিশুকে বললেন—কী খাবেন আপনি মহারাজ?

বিশুর জবাব স্বকর্ণে শুনলেন ম্যানেজার—অর্ডার দেওয়া হ'য়ে গেছে বয়কে। একটা প্রন-কাটলেট, দুটো মাটন-চপ, তিনটে মোগলাই পরোটা। একটু তাড়াতাড়ি দিতে বলুন। খিদেয় আমার পেট জ্বলছে।

কেবিন থেকেই বয়ের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়লেন ম্যানেজার,—তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। খিদেয় মহারাজের পেট জ্বলছে।

হুকুম মাফিক খাদ্যবস্তু এসে গেলো। ম্যানেজার দেখি স্থানত্যাগ করেন না। উনি মহারাজের ভোজনপর্ব দেখবেন নাকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

আবার বিশুর কথা শোনা গেলো—ম্যানেজার বাবু, বাইরের লোকের সামনে খেতে আমার লজ্জা করে। আপনি দয়া ক'রে নিজের চেয়ারে ব'সে কাজ করুন গিয়ে। মধুসূদন বাবু আর তাঁর ঐ কুকুর ছাড়া আর কারো সামনে আমি খাই না।

ম্যানেজার অবাক্ হয়ে বিশুকে জিজ্ঞেস করলেন—কুকুর! এখানে কুকুর কোথায় মহারাজ? আপনি কুকুর বলছেন কা'কে?

বিশুর জবাব—ঐ যে আমাদের উল্টোদিকে বসে আছে। আমি কুকুররূপী মানুষ, ও মানুষরূপী কুকুর। শুধু তাই নয়, ও আরো এককাঠি সরেস। ও বোবা।

আমার কান গরম হয়ে উঠলো, কিন্তু উপায় নেই। আমি বোবা হয়ে রইলাম, পাথর হয়ে রইলাম। তা না হলে আমি খুন হবো, মধুদার ফাঁসি হবে, বৌদিকে নিরামিষ খেতে হবে সারাজীবন।

ম্যানেজার আর ঘর চলে গেলো। আমি ভাগে পেলাম একটা কাটলেট, একটা চপ, একটা পরোটা। বাকি মাল মধুদা চোখের পলকে উড়িয়ে দিলে।

তারপর ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালেন মধুদা। ম্যানেজার হাতযোড় করে এসে কেবিনের মধ্যে দাঁড়াতেই মধুদা বললো—বড়ো কষ্টে আছি ম্যানেজার বাবু!

ম্যানেজার বললেন—আপনার আবার কষ্ট স্যর! বিশুর মতো ঐশ্বর্য যার আছে, তার জীবনে আবার কষ্ট কোথায়?

মধুদা বললো—বিশুকে পছন্দ হয়েছে আপনার?

ম্যানেজার বললেন—পছন্দ? আপনি কী বলেন! বিশুর মতো অমূল্য রত্নকে পছন্দ করবো না আমাকে কি এমন হাঁদারাম বলে প্রত্যয় হয় আপনার?

মধুদা একটু চুপচাপ রইলেন। এমন ভাব দেখালেন যেন উনি আকাশ-পাতাল ভাবছেন। আমি এখন বোবা, তাই মনে মনে ম্যানেজারকে বললাম—তুমি একটি হাঁদারাম। আমার মধুদা তোমাকে এবার ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দেবে। তুমি আমাকে চিনেছো, বিশুকে চিনেছো? কিন্তু হাঁদারাম হে, তুমি নিজেকে চেনো নি। তুমি একটি কোটপ্যান্ট-পরা পাঁঠা।

তারপর মধুদা বললো—আপনার সঙ্গে এই প্রথম আলাপ আমার, তবু আপনাকে আমার পরমাত্মীয় ব'লে বোধ হচ্ছে। আমার বড়ো কষ্ট ম্যানেজার বাবু!

—একটু খুলে বলুন স্যর!

—কথাটা কী, একটু সঙ্কোচ হচ্ছে বলতে। নেহাৎ দায়ে প'ড়ে বলছি আপনাকে। আপুনি তো জানেন বিশু অমূল্য রত্ন। এদিকে আমার বড্ড টাকার টানাটানি। একশো টাকা ধার দেবেন আমাকে? না না, এমনি নয়। বিশুকে রেখে যাচ্ছি আপনার কাছে। কাল টাকা ফেরৎ দিয়ে বিশুকে ফেরৎ নিয়ে যাবো।

শত হ'লেও ম্যানেজার ব্যবসায়ী ব্যক্তি; দিব্যি ঘুঘু। তাই উনি একটা চাল চাললেন। উনি ভাবলেন একটা অমূল্য রত্ন হস্তগত করবার এই সুযোগ। সুবর্ণসুযোগ নয়,—একে বলতে হয় হীরকসুযোগ।

ম্যানেজার বাবু মধুদাকে বললেন—স্যর, জীবনে আমি কাউকে টাকা ধার দিই নি, দিই না, দেবো না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু আপনার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে, স্যর!

—বলুন।

ম্যানেজার বললেন,—আমার কাছে বিক্রী করুন বিশুকে। যদিও এই অমূল্য রত্নের টাকায় দাম হয় না, সত্যি, টাকার বদলে পাওয়া যায় না এ হেন অমূল্য রত্ন, তবু আমি আমার সাধ্য মতো আপনাকে তিনশো টাকা দেবো।

মধুদা মুখখানায় এমন একটা শোকার্তভাব করলো যেন কেউ তাকে আত্মহত্যা করতে বলছে। মধুদা কাঁদো-কাঁদো গলায় বললো—না না না। ওকে আমি জন্ম থেকে বুকে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছি, নিজের কষ্টের জন্যে সামান্য তিনশো টাকায় ওকে বিদায় দেবো না। বিশু রে!

বিশুর কণ্ঠ শোনা গেলো—হা ভগবান্!

ম্যানেজার কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একটু বাদে মধুদা সুস্থির হ'লে ম্যানেজার বললেন—আপনার কষ্ট আমি বুঝি স্যর! কিন্তু বিবেচনা ক'রে দেখুন স্যর, এই জীবনে বিচ্ছেদ তো অনিবার্য। বিবেচনা করলেন স্যর?

স্যর বিবেচনা-টিবেচনা ক'রে বললেন—আমার কাছে থাকলে তো বিশুর এমনিতেই কষ্ট। নিজেই পয়সার অভাবে ভালো-মন্দ খেতে পারি না, বিশুকে আর কোত্থেকে খাওয়াবো? তার চেয়ে বিশু আপনার মতো সমজদারের কাছে থাক, খেয়ে-প'রে বাঁচবে তবু। তাহ'লে তিনশো টাকায় হবে না, পাঁচশো টাকা দিন আমাকে, আজ থেকে বিশু আপনারই অমূল্য রত্ন হোক ম্যানেজার বাবু!

ম্যানেজার বাবু আর কথা বাড়ালেন না, ঐ পাঁচশো টাকাতেই রাজি হ'য়ে গেলেন।

পাঁচশো টাকা গুণে-গেঁথে নিয়ে মধুদা বিশুকে একটু আদর করলো—বিছু আমার, ছোনা আমার! বিদায়-দৃশ্যটাকে যথাসম্ভব করুণ করবার জন্যে চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জলও ফেললো আমার অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মধুদা।

তারপর মধুদা দেখালো শেষ প্যাঁচ।

ম্যানেজার বাবু, মানে সেই কোটপ্যান্টধারী গাধাটা, মধুদার বিদায়ক্ষণে নিজের কানে শুনলেন বিশুর কথা—মধুসূদন বাবু, আপনি এই করলেন শেষকালে? সামান্য পাঁচশো টাকার জন্যে একজন অচেনা-অজানা লোকের কাছে বেচে দিলেন আমাকে? বুঝলাম, সংসারে ভালোবাসার কোনো দাম নেই, টাকাই আসল। তা না হ'লে···উফ্! ধিক্, শত ধিক্ আপনাকে মধুসূদন বাবু! এত কাল সুখে-দুঃখে একসঙ্গে কাটিয়েছি আপনার সঙ্গে, এই কি তার প্রতিদান? এত বড় অকৃতজ্ঞ আপনি? বেশ, আমিও তাহ'লে আজ থেকে অকৃতজ্ঞ হবো। এতো দিন যা বলেছি, বলেছি; আজ থেকে আমি আর একটি কথাও বলবো না। না, কিছুতেই আমি আর কথা বলবো না এ-জীবনে। না, না, না। কথাবার্তা বন্ধ ক'রে এখন থেকে আমি দেখতে যেমন স্বদেশী কুকুর, কাজে-কর্মেও তেমনি স্বদেশী কুকুরই হবো, স্বদেশী কুকুরের মতোই আওয়াজ দেবো শুধু। এ-জন্মে আর কথা নয়। কেঁউ-কেঁউ-কেঁউ। কুঁই-কুঁই-কুঁই।

এডেন

শ্রীঅজিতকুমার তারণ

জাহাজে চেপে বোম্বাই থেকে বিলেত যেতে প্রথমেই যেখানে জাহাজ থামবে সেটাই হ'ল এডেন বা আদন। লোহিত সাগরের প্রবেশপথে আরবের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ছোট্ট একটা পাহাড়ে জায়গা,—মূল আরবের সঙ্গে ছোট্ট একফালি যোজক দিয়ে যোড়া।

আরবের মধ্যে হলেও এডেন কিন্তু ইংরেজদের দখলে। এটি ওদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বন্দর এবং উপনিবেশ। গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে ধরতে গেলে এডেনই হচ্ছে পূর্বভূমগুলের প্রবেশদ্বার। সুয়েজ খাল কাটার পর থেকেই এডেনের কৌলীন্য আরো বেড়ে গেছে। ইংরেজরাও তাই দেরী না করে ওখানে দুর্গ, সেনানিবাস এবং বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করেছে।

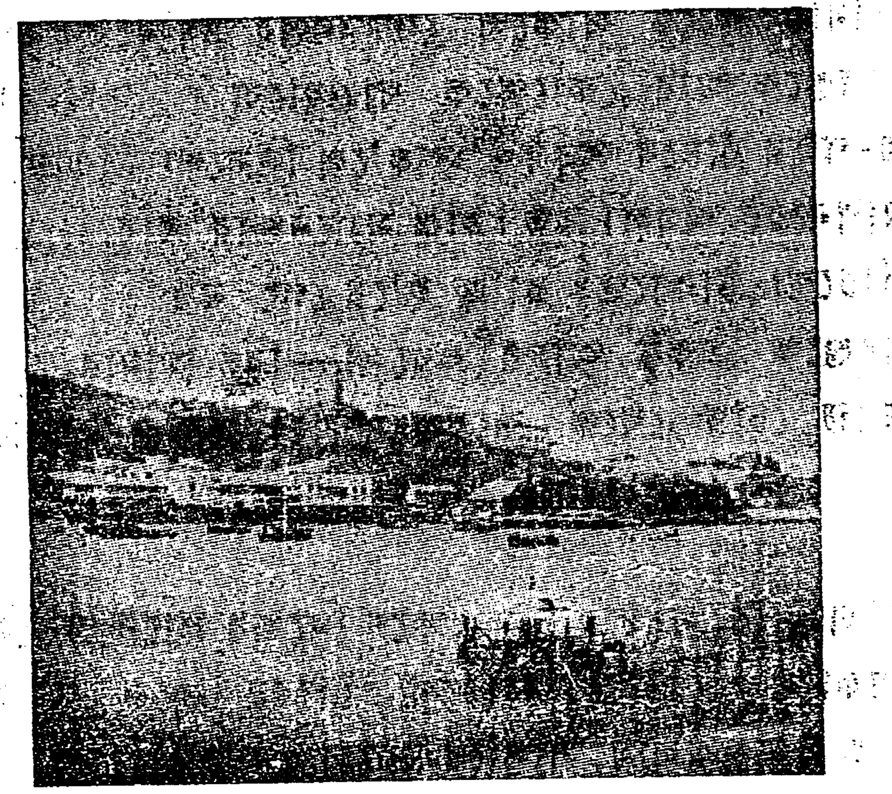

এডেন বন্দর

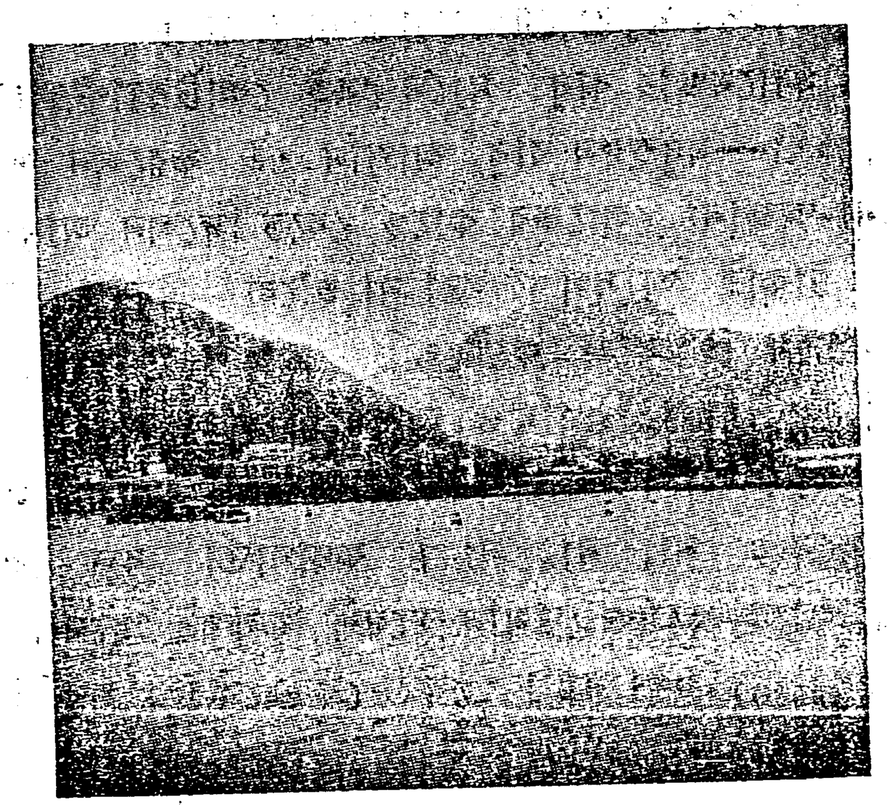

এডেনের আর একটি সুন্দর দৃশ্য

এ ছাড়া এডেনে আছে লবণ তৈরীর বিরাট বিরাট কারখানা,—প্রায় সব ক'টিই ইংরেজদের।

ইংরেজ-আশ্রিত এডেনের আয়তন ১,১২,০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ। বলা বাহুল্য এটি মুসলমান প্রধান স্থান। এদের মধ্যে রয়েছে বেদুঈন, সুবেহি প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ শ্রেণীর জাত।

এখানে এডেনের ইতিহাস নিয়ে একটু আলোচনা করলে হয়তো তোমাদের ভালোই

লাগবে। যতদূর জানা যায় রোমানরাই প্রথমে (খৃঃ পূঃ ২৪) এই জায়গাটা জবর দখল করে এর নাম দেয় আত্তানে।

তারপর পার্তুগীজরা নানান্ জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে ১৬ শতকের গোড়ার দিকে এডেন বন্দরে এসে হাজির হোল। ওরা মহা আনন্দে ওখানে বসবাস করতে লাগল এবং প্রচার করল যে ওরাই সর্বপ্রথমে ওটা আবিষ্কার করেছে।

এডেনে বাঙ্গালী—রামধনুর গ্রাহিকা শ্রীমতী গায়ত্রী ও তার বন্ধু

কিন্তু পর্তুগীজদের এ প্রতাপ বরাবর রইল না। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে তুর্কীরা পর্তুগীজদের যুদ্ধে পরাজিত করে এডেন দখল করে বসল। শেষে আরব শেখেরা, অর্থাৎ প্রধানেরা ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ ক'রে ও নানান্ কৌশল অবলম্বন ক'রে ওঁদের স্বদেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করলেন। কিন্তু, ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে, অতি সহজে এডেন এসে পড়ল ইংরেজদের দখলে।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের একটী জাহাজ আরব উপকূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আসলে এ ব্যাপারে আরবদের কোনো দোষ ছিল না। কিন্তু ইংরেজদের এডেন দখল করার খুবই প্রয়োজন ছিল, তাই ওরা এই অজুহাত নিয়ে আরবদের ওপর দোষারোপ করতে লাগল। স্থানীয় জলদস্যুরা (আরব) জাহাজের নাবিকদের ওপর অত্যাচার করায় এবং জাহাজটীকে আক্রমণ করায়ই নাকি জাহাজটী ভেঙ্গেচূরে ডুবে যায়। ইংরেজরা আরব শেখদের কাছে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দাবী করে বসল এডেন। প্রথমে শেখেরা এতে রাজী হয় নি, কিন্তু ইংরেজ এক রকম জবরদস্তিতেই এডেন দখল করল। তারপর প্রায় একশ' বছর ধরে ইংরেজের দখলে, বোম্বাই প্রদেশের অধীনে ছিল এডেন। পরে, ১৯৩২ সাল থেকে, ভারতের বড়লাটের অধীনে চীফ কমিশনারের ওপর এর শাসন-ভার ন্যস্ত করা হয়। ১৯৩৭ থেকে আবার ওটা ব্রিটিশ কলোনিয়াল অফিসের তত্ত্বাবধানে

চলে যায় এবং ইংরেজ উপনিবেশ বা কলোনী বলে ঘোষিত হয়। ১৯৪৭ সালে ওখানে ব্যবস্থাপক সভার প্রবর্তন হয়; ইংরেজ গভর্ণর হন ওর প্রেসিডেন্ট।

বাস্তবিকই এডেন কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এখান থেকে জলপথে পৃথিবীর নানান্ জায়গায় যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত তো আছেই, তা' ছাড়া ওখান থেকে বিমান ওড়বার জন্যেও রয়েছে পাঁচটা এয়ার সার্ভিস।

এডেনের শেখেরা ব্রিটিশের মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ। সর্বশেষ ১৯৫২ সালে যে

লাহেজের নির্বাসিত সুলতান

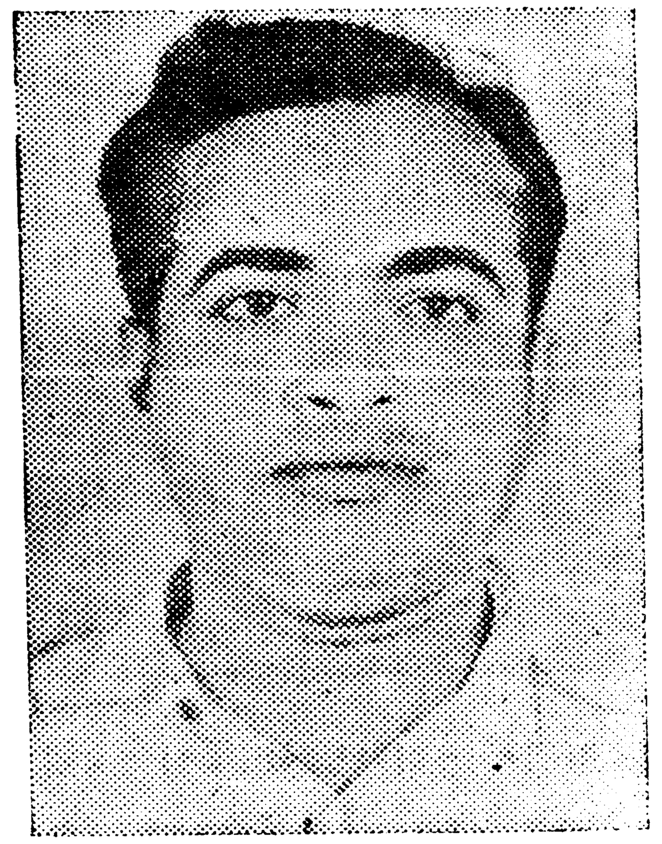

এডেনের বিশিষ্ট বাঙ্গালী বাসিন্দা
ডাঃ সরকার

চুক্তি হয়েছে তাতে ঠিক হয়েছে যে ব্রিটিশেরা তাদেরকে বাইরের শত্রু-আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে (অবিশ্যি নিজেদের স্বার্থের জন্যেই) এবং শেখেরাও ওদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে চলবেন। কিন্তু বর্তমানে আবহাওয়া দাঁড়িয়েছে অন্য রূপ। ও অঞ্চলের শেখেরা এবং জনসাধারণ মধ্য প্রাচ্যের প্রধান নেতা কর্ণেল নাসেরের ভক্ত ও অনুগামী হয়ে পড়েছে। তারা আর এখন ইংরেজ বা অন্য কোনো বাইরের শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে থাকতে চায় না, তাঁবেদারিও পছন্দ করে না। তারা চায় পূর্ণ স্বাধীনতা। ইংরেজরা, বলা বাহুল্য, এতে রাজী নয়। তাই এক বছরের মধ্যে ওরা এডেনবাসীদের ওপর হু'-হু'বার বোমা বর্ষণ করতে কসুর করে নি। অত্যাচার তো আছেই।

বৃটিশ-রক্ষণাবেক্ষণাধীন পশ্চিম এডেনের রাজ্যগুলোর মধ্যে সব চেয়ে বড় হচ্ছে লাহেজ। ওখানকার জনপ্রিয় সুলতান হচ্ছেন স্যর্ আলি বিন্ আবদুল আল করিম। কিন্তু ইংরেজরা ওঁর দাবীকে উড়িয়ে দিয়ে তাঁদের তাঁবেদার আর একজন সুলতানকে ওখানে বসিয়ে তাঁকে অভয় দিচ্ছেন, লাহেজ রক্ষার নাম করে সৈন্যসামন্তও পাঠিয়েছেন।

এডেনের কয়েকখানি নতুন ও পুরোনো ডাকটিকেট

ফলে আসল সুলতান এখন ইংরেজের চক্রান্তে হয়েছেন রাজ্যহারা 'উদ্বাস্তু'। নিজ রাজ্যে তাঁর প্রবেশ নিষেধ। সুলতান অবশ্য এ নিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছেন।

এডেনের পূর্বাঞ্চলে কুয়াইত ও হাদ্রামাউত প্রভৃতি কয়েকটি অপেক্ষাকৃত বড় ষ্টেট বা রাজ্য আছে এবং পশ্চিমের আশ্রিতাংশে আছেন ১৯ জন শেখ। এ ছাড়া কুরিয়া মুরিয়া দ্বীপপুঞ্জ ও কামারণ দ্বীপও এডেন হ'তেই শাসিত হ'য়ে থাকে। এসব আশ্রিত

রাজ্যগুলো প্রকৃত প্রস্তাবে এডেনের গভর্ণর ও জঙ্গীলাটের অধীনে থাকলেও ওরা সবাই বর্তমানে একতাবদ্ধ হ'য়ে চায় ব্রিটিশকে তাড়াতে।

গত মহাযুদ্ধের সময়ে আমি ও অঞ্চলে অনেক দিন কাটিয়েছি। তখনও দেখেছি এবং এখনও ওখানে অনেক বাঙ্গালী ও ভারতীয় ভদ্রলোক রয়েছেন সপরিবারে। 'রামধনু'র গ্রাহিকা কল্যাণীয়া কুমারী গায়ত্রী সরকার মাত্র কিছুদিন আগে ওখান থেকে ফিরে এসেছে হাওড়ায়। ওর মা-বাবা ও বোনেরা এখনও ওখানেই। গায়ত্রীর বাবা ওখানকার একজন বিখ্যাত চিকিৎসক, নাম ডাঃ সুধাংশুকুমার সরকার। তা' ছাড়া শিক্ষা-বিভাগে রয়েছেন শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ডাঃ অশোককুমার মিত্রও ওখানে একজন স্বনামধন্য ও বিখ্যাত চিকিৎসক। শ্রীবিশ্বনাথ বিশ্বাস এবং শ্রীসূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য আরো অনেকে রয়েছেন ওখানে বেশ সসম্মানে, সপরিবারে।

এডেনের ডাকটিকেট বেশ সুন্দর, তাই তোমাদের জন্যে ওর কয়েকটির ছবি এখানে দেওয়া গেল। তোমাদের ভেতরে যাদের ডাকটিকেট সংগ্রহ করবার বাতিক আছে তা'রা এগুলো দেখে খুশী হবে নিশ্চয়ই।

বন্দর এডেন এবং তা'র আশপাশের মরূদ্যানগুলো দেখতে ভারী সুন্দর। তোমরা যদি কখনও পশ্চিমে পাড়ি দাও তবে ও অঞ্চলটি দেখে যেতে ভুলো না। কোথায় উঠবে ভাবছ বুঝি? সে ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া আমার বন্ধু গায়ত্রীর বাবা-মা'র পক্ষ থেকেই আমি তোমাদের নেমন্তন্ন জানাতে পারি। ভারী অতিথিবৎসল ওঁরা। এডেনে নেমে বললেই হ'বে ডাঃ এস. কে. সরকার, ক্রেটার, এডেন। ব্যস্।

নীল শরতে

শ্রীরত্নাবলী ভট্টাচার্য্য

শুধু নীল নীল আকাশের গায়ে রং ছড়ানো,
মৌ ঝুর ঝুর আলতো বাতাসে সুর ঝরানো।
রং-রাঙা রোদে আলোর তুফান,
ঘুম-ভাঙা ভোরে পাখীর কি গান,
লাল টুক্ টুক্ ফুলের কপালে টিপ পরানো;
শুধু নীল নীল দূর গগনেতে রং ঝরানো।

মন উস্‌খুস্ প্রজাপতি দল ফুর ফুরিয়ে,
ডানা ঝিক্‌মিক্ রং ঝ'রে পড়ে ঝুর ঝুরিয়ে—

মধু-মাখা বনে লুটোপুটি খায়,
মেলে পাখা কোন উদাসী হাওয়ায়,
খুশী ভুর্ ভুর্ গালানো সোনায় প্রাণ উড়িয়ে;
মন উসখুস প্রজাপতি ওড়ে ফুর ফুরিয়ে।

সাদা ধব্ ধব্ কাশ কুসুমেরা এই প্রভাতে
দোলে তুল তুল্ কোমর দুলিয়ে ভোর শোভাতে।
বন ভরে যত পাতার ঢাকনা,
মন ভরে তত গানের পাখনা—
উড়ে উড়ে যায় গাঢ় সবুজেতে মন ডোবাতে;
সাদা ধব্ ধব্ কাশ ফুল দোলে এই প্রভাতে।

ঘুমে ঢুল ঢুল শিউলীর চোখে ঘুম জড়ানো,
রঙে ঝিল্‌মিল ফুলের সুবাসে মন হরানো।
সোনা-জলে ধোয়া সোনালী ভুবন
জ্বল্‌জ্বলে বেশে সেজেছে নূতন,
নদী টলমল ঢেউয়ের নাচনে গান ভরানো;
শুধু নীল-নীল নীল শরতে কি রং ছড়ানো!

শরৎ

শ্রীসুচেতা ভট্টাচার্য্য

নীল আকাশে নীল কালি কে মাখিয়ে দিল বল?
শরৎ এলো বিশ্বে জুড়ে আনন্দে চঞ্চল।
শিউলী ডাকে আয়,
পুলক উছলায়;
রক্তজবা রাঙিয়ে দেছে রঙীন ও অঞ্চল।

বন-পারে কী শ্যামল ছবি হাতছানিতে ডাকে,
পূজোর ছুটী—এ দেশ ও দেশ সবাই চেয়ে থাকে।
কোথায় যাবি বল
ওরে পথিক-দল,
সোনার শরৎ এলো রে ঐ ভরা নদীর বাঁকে।

পশ্চিম দিগন্তে

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

জুনাগড়।

ভেরাবল থেকে ট্রেন ছাড়ে সকাল ছ'টায়। সকাল বললাম বটে, কিন্তু ওই অঞ্চলে তখন সবেমাত্র উষালোক দেখা দেয়। সকাল হয় সাতটায়।

মাত্র ৫১ মাইল পথ। কিন্তু এই পথটুকু যেতেই এই ট্রেনের সময় লাগে তিন ঘণ্টারও বেশী। মিটার গজের সব ট্রেনই চলে বেশ ধীরেসুস্থে।

জুনাগড়ে এসে নামলাম, তখন প্রায় দশটা বাজে।

ষ্টেশনের কাছেই ধর্মশালা। দোতলা, পরিচ্ছন্ন ধর্মশালা। এমন ধর্মশালা ওই অঞ্চলে আর একটিও পাই নি। ধর্মশালার মধ্যে কূয়ো আছে, টিউবওয়েলও আছে। একটি সুন্দর হোটেলও আছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে স্নানাহার সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

কিন্তু টাংগা ভাড়া করা নিয়ে বাধলো গণ্ডগোল। আমরা চারজন, কোন টাংগাওয়ালাই চারজনকে এক টাংগায় নিতে রাজী হলো না। এর আগে আর সব জায়গায় আমরা চারজনেই এক টাংগায় ঘোরফেরা করেছি। এখানে, টাংগাওয়ালা বললো,—আইন নেই। তিন জনের বেশী নিতে পারবো না, পুলিশে ধরবে।

কাজেই আমরা দু'খানা টাংগা ভাড়া করলাম।

সামান্য কিছু দূর গিয়েই এক চৌমাথা পার হয়েই দু'খানা টাংগাই থামলো। এক টাংগাওয়ালা বললো—এবার আপনারা চারজনই এক টাংগায় যান। আর কোন ভয় নেই।

বললাম—তোমার ভাড়া চুকিয়ে নাও।

সে মাথা নেড়ে বললো—সেটি হবে না; দু'খানা টাংগার পুরো ভাড়া ওই একখানা টাংগাকেই দিতে হবে।

বললাম—তাহলে যেমন যাচ্ছি তেমনি যাব।

সে বললো—তা হবে না। দু' টাংগা যাবে না, এক টাংগাতেই চারজন যাবে।

আমাদের দেশে নানা ধরণের চোরাকারবার আছে বলে জানি, কিন্তু গাড়ীভাড়ার যে এমন চোরাকারবার আছে তা জানতাম না। নেমে পড়লাম গাড়ী থেকে। টাংগাওয়ালা হেসে বললো—এখানকার সব গাড়ী আমাদের, আর কেউ আপনাদের নিয়ে যাবে না।

তবু আমরা অন্য দু'-একখানা গাড়ীর সঙ্গে দরদস্তুর করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওই দুটি টাংগাওলা ঠিক আমাদের পিছনে আছে। তারা কি বলে দেয়, কেউ আর আমাদের নিতে রাজী হয় না। এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। একদিনে আমরা জুনাগড় দেখে শেষ করবো বলে ধরে রেখেছি। সময় আর নষ্ট করতে পারলাম না। সেই পুরানো টাংগাতেই বাধ্য হয়ে চড়ে বসলাম। দ্বিগুণ ভাড়ায় এক টাংগায় চারজন নিতে আর কোন বাধাই বাধলো না।

প্রথমে গেলাম চক্করবাগে।

নবাববাড়ীর চিড়িয়াখানা। সুদৃশ্য ফুলের বাগান – মাঝে মাঝে পশুপাখীর ঘর। সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে সিংহের খাঁচা। ভারতের একমাত্র এই অঞ্চলেই সিংহ দেখা যায়। এখানে সিংহ ও সিংহী আছে অনেকগুলি। সিংহের খাঁচার পাশেই আছে সুন্দরবনের এক কেঁদো বাঘ। এতো বড় বাঘ এর আগে দেখি নি। সিংহের সর্বাঙ্গে গাম্ভীর্য্যের যেমন লাবণ্য, বাঘের চলন-বলনে তেমনি হিংস্রতার জৌলুষ। সিংহকে ভাল লাগে, কিন্তু বাঘকে শুধু ভয় করতে হয়।

চিড়িয়াখানার মধ্যেই নবাববাড়ী। দোতলা বাড়ী। এক সময় জুনাগড়ের নবাব এখানে থাকতেন। এখন এটি যাদুঘর। নীচের তলে অনেক পুরোনো পাথরের মূর্তি ও শিলালেখ আছে। উপরের তলে আছে যত সৌখীন নবাবী আসবাবপত্র। দেখবার ও দেখাবার মত জিনিষ সেগুলি। সোনা, রূপা, পোর্সিলেনের উপর নানা রঙের কাজ করা। নানা ধরণের অস্ত্রশস্ত্র। স্থানীয় কুটীরশিল্পের রকমারী বস্তু। লাক্ষার কাজ। বাঘ, সিংহ, চিতা, হরিণশিশুর দেহ এমন ভাবে সাজানো আছে যে জীবন্ত বলে ভুল হয়। পাশ কাটিয়ে যেতে পা ওঠে না, মনে হয় এখনি বুঝি জীবন্ত হয়ে লাফিয়ে উঠবে।

মানুষকে তো দানোয় পায় ব'ল শুনেছি, ভাগ্যিস, বাঘ, সিংহকে দানো পায় না! তাহলে রাত্রে এই প্রাসাদের অবস্থা কি ভয়াবহই না হয়ে উঠতো!

সেখান থেকে এলাম নগরের মধ্যে—নরসিংহদাসের মন্দিরে।

সাধক নরসিংহদাস ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণ কৃষ্ণ করেই তাঁর দিন কাটতো। শ্রীকৃষ্ণের ভজন গান সদাই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হতো। তাঁকে কাথিয়াবাড়ের চণ্ডীদাস বলা চলে। তবে চণ্ডীদাস সংসারী ছিলেন না, নরসিংহদাস ছিলেন সংসারী।

ভক্ত নরসীদাস (জুনাগড়)

নরসিংহদাস সংক্ষেপে ভক্ত নরসী নামেই খ্যাত।

নরসী বিয়ে-থা করেছিলেন, দু'টি মেয়েও ছিল। কিন্তু কি করে যে খাওয়া-পরা চলবে সে দিকে তাঁর মন ছিল না, কাজকর্ম কিছুই করতেন না। ভাইয়েরা এজন্য তাঁকে তিরস্কার করতেন, ভ্রাতৃবধূরা গঞ্জনা দিতেন, কিন্তু নরসী সে সব কানেই তুলতেন না। আপন-ভোলা ভক্ত কিছুতেই কাজকর্মে মন বসাতে পারতেন না। সদাই কৃষ্ণনাম করতেন।

"কুল নে ত্যজিয়ে, কুটুম্ব নে ত্যজিয়ে, ত্যজিয়ে মা নে বাপ রে।
ভগিনি সুত দারানে ত্যজিয়ে – জেম ত্যজে কংচুকী সাঁপ রে॥
কৃষ্ণজী মাতা, কৃষ্ণজী পিতা, কৃষ্ণ সহোদর ভাই।
অংতকালে জাউ এক লডা সাথে শ্রীকৃষ্ণ জী সগাই॥"

[কুল ত্যাগ কর, আত্মীয় ত্যাগ কর, মা-বাপকেও ছাড়, ভগিনী, পুত্র, স্ত্রীকে ত্যাগ কর,—সাপ যেমন খোলস ত্যাগ করে। কৃষ্ণই মাতা, কৃষ্ণই পিতা, কৃষ্ণই সহোদর ভাই। মৃত্যুকালে তুমি একলা যাবে, শ্রীকৃষ্ণই তখন তোমার সাথী।

—বাংকেবিহারী লিখিত Minstrels of God দ্রষ্টব্য]

বাপ বেকার বলে তো মেয়ের বিয়ে আটকে থাকবে না। ভাইয়েরা নরসীর বড় মেয়ের বিয়ে দিলেন। বিয়ে হলো গরীবের ঘরে। কিন্তু গরীব হলে কি হবে, গরীবের দুঃখ তারা বুঝতে চাইত না। শ্বশুর-শাশুড়ী সদাই বউকে কষ্ট দিত তত্ত্ব-তাবাস দেনা-পাওনার ব্যাপার নিয়ে। মেয়ে বার বার পিতাকে খবর পাঠাতো—বাবা, একবার এসো, একবার আমাকে দেখে যাও। এদের কথা আর সইতে পারি না।

শেষে নরসী একদিন মেয়ের শ্বশুরবাড়ী গিয়ে উঠলেন। পরনে একখানি আধ-ময়লা কাপড়, কাঁধে ঝুলি, হাতে করতাল, মুখে কৃষ্ণনাম। চাল-চলন দেখে মেয়ের শ্বশুর-শাশুড়ী বললো—এ তো এক বদ্ধ পাগল!

থাকতে দিল বাইরের এক ভাঙা চালাঘরে।

সকাল বেলা স্নান সেরে নরসী পূজায় বসলেন। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টিও নামলো। চালের ফুটো দিয়ে জলধারা নেমে এসে ঘর ভাসিয়ে দিলে। পূজার ফুল, তুলসীও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এমন একটু শুকনো জায়গা নেই যেখানে ফুল-তুলসীগুলি রাখেন। নরসী আকাশের পানে তাকিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—হে ইন্দ্রদেব, শ্রীকৃষ্ণের পূজার ফুল ভাসিয়ে দিচ্ছ? আমাকে পূজা করতে দাও।

আশ্চর্য্য! ঘরের সব জায়গায় জল পড়ে, কিন্তু পূজার ফুলগুলির উপর আর জল পড়ে না! কে যেন অদৃশ্য এক ছাতা দিয়ে সেই স্থানটুকু আড়াল করেছে! যারা পাগলের পূজা দেখতে এসেছিল তারা তো অবাক্।

পূজা-শেষে মেয়ে নিজের গঞ্জনার কথা বাপকে বললো। বলতে বলতে কেঁদে ফেললো। বললো—বাবা, আর আমি সইতে পারি না, তুমি এদের কিছু টাকাপয়সা দেবার ব্যবস্থা করো।

নরসী বললেন—বেশ, জিজ্ঞাসা করো ওঁরা কি চান।

শাশুড়ী বললো—যার একখানা চাদর জোটে না গায়ে দিতে, সে আর কি দেবে? পাবে কোথায়? কুয়োতলায় কাপড়-চোপড় কাচার জন্য দু'খানা পাথর দিতে বলিস্।

মেয়ে এসে বাপকে সেই কথাই বললো।

নরসী বললো—বেশ, তুই কি চাস্ বল্?

—যা চাইবো তাই দেবে তো?

—বল্ না, কি চাই।

—তুমি এসেছ, গাঁয়ের লোক সবাই জানুক। এরা বড় গরীব, এদের সবাইকে একখানি করে কাপড় দাও।

নরসী শ্রীকৃষ্ণকে জানালেন—প্রভু, তোমার কাছ থেকে কখনো তো কিছু চাই নি, আমার মেয়ের মনোবাঞ্ছা তুমি পূর্ণ করো। তুমি ছাড়া তো আমার আর কেউ নেই!

খানিক পরেই হাট থেকে এক দোকানী এসে একগাড়ী কাপড় পৌছে দিয়ে গেল, আর দিয়ে গেল সোনা-বসানো একখানি পাথর আর রূপো-বসানো একখানি পাথর। বললো—এক বাবু দাম চুকিয়ে দিয়ে বলে গেলেন এইখানে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

গাঁয়ের ঘরে ঘরে মেয়ে কাপড় বিলি করলো।

পাথর দু'খানি দেখে শ্বশুর-শাশুড়ী তো হতবাক্!

নরসী বললেন—আমার কাজ তো চুকলো মা, এবার আমি চলি।

মেয়ে বললো—বাবা, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। যেখানে আমার চেয়ে টাকার দাম বেশী, সেখানে আমি আর থাকবো না।

—কি করবি?

—তোমার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করবো।

—বেশ, তবে চল্।

বাপ-বেটিতে ভজন গাইতে গাইতে পথে বেরিয়ে পড়লো।

নরসীর বাড়ীতে এবার ভজনের আসর জমে। বাপ গায়, মেয়ে গায়। ছোট মেয়েটিও বাপের সঙ্গে ভজন ধরে। লোকে বলে—এ কি! ছোট মেয়ের বিয়ে দাও।

মেয়ে বলে—আমি বিয়ে করবো না বাবা!

নরসী কিছু আর বলেন না।

পাড়া-পড়শী এতটা সইতে পারে না। রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করে।

রাজা সালঙ্গ নরসীকে ডেকে পাঠালেন রাজসভায়।

নরসী রাজসভায় এলেন। রাজা ব্যস্ত ছিলেন, বললেন—বসো।

সন্ধ্যা হয়ে এলো, রাজবাড়ীর মন্দিরে শাঁখ-ঘণ্টার আওয়াজ উঠলো। নরসী বললো—মহারাজ, আমার পূজার সময় হলো। মন্দিরে যাবো।

রাজা শুনেছিলেন নরসী পরম ভক্ত, কি ভাবে তিনি পূজা করেন দেখতে তাঁর কৌতূহল হলো, বললেন—চলো, আমিও যাচ্ছি।

রাজবাড়ীর কৃষ্ণমন্দির। শ্রীকৃষ্ণের রাজবেশ দেখে নরসীর ভারী আনন্দ হলো। মহানন্দে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভজন গাইতে সুরু করলেন। আরতি শেষ হলো, ভজনও শেষ হলো। সহসা শ্রীকৃষ্ণের গলার মালা এসে উঠলো নরসীর গলায়। সকলে চকিত

হয়ে উঠলো। রাজা লুটিয়ে পড়লেন ভক্তের পায়ে, বললেন—প্রভু, আজ আপনাকে দেখে আমি ধন্য হলাম।

সেই দিনই রাজার আদেশ নগরমধ্যে প্রচারিত হলো—নরসীর কেউ নিন্দা করলে তার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে তাকে নগর থেকে বের করে দেওয়া হবে।

নরসী স্বপ্ন দেখেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে প্রভাসে ডেকেছেন। নরসী গেলেন প্রভাসে। ভল্লতীর্থে স্নান করতে গিয়ে তিনি নদীগর্ভে একটি কৃষ্ণমূর্তি কুড়িয়ে পেলেন। সেই বিগ্রহটিকে গৃহে নিয়ে এসে তিনি সারাজীবন পূজা করেন।

কৃষ্ণ ছাড়া তিনি আর কিছুই জানতেন না। একমাত্র পুত্র যেদিন মারা গেল, সেদিনও নরসী অচঞ্চল, একান্ত নির্লিপ্তের মত তিনি বললেন—

"ভলুঁ দিয়েঁা ভাসী জঞ্জাল
সুখে ভজস্যুঁ শ্রীগোপাল।"

[জীবনের আকর্ষণ বিদায় নিল, এখন সুখে আমি শ্রীগোপালের ভজনা করবো।]

তারপর গুণ গুণ করে ওঠেন—

"অনেক ভক্ত আগে উগার্যাঁ সহায় থয়া মোরারী রে।
নরসৈং যাচা স্বামী লক্ষ্মীবর মোঠী ওথ তমারী রে॥"

[পুরাকাল থেকে অনেক ভক্তকে তুমি মুক্তি দিয়েছ, হে মুরারি, আমি তোমারি চরণে আত্মসমর্পণ করলাম, আমায় উদ্ধার করো।]

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো, যেখানে নরসী মারা যান সেইখানে এই বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠা করে এই মন্দিরটি করে দিয়েছেন। গল্প আছে যে নরসী মারা যাবার পর তাঁর দেহ পাওয়া যায় নি। মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় চাদরখানি সরিয়ে দেখা যায় একরাশ ফুল পড়ে আছে, দেহ নেই।

নরসীর এই আরাধ্য দেবতার নাম 'চোরা', ননীচোর শ্রীকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত নাম। কষ্টিপাথরের কৃষ্ণমূর্তি। আকারে তেমন বড় নয়। সাধারণ বিগ্রহ। একদিন এই বিগ্রহে নরসী প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজ নরসী নেই, কিন্তু তাঁর সাধনাকে স্মরণ করে মুরলীধর দাঁড়িয়ে আছেন।

"ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ,
ওরে দীন, তুই জোড়-কর করি
কর্ তাহা দরশন।"

(নৈবেদ্য)

বুক টিপ টিপ করছে ভয়ে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আকাশে আজ অনেক তারা—চাঁদ ওঠে না আর,
খোকনমণি বসে আছে মুখটি করে ভার।
পড়তে ওরে বলো তুমি,
রাত হোলে তো পড়বে ঘুমি',
অন্ধকারে ঝিমিয়ে আছে রূপসা নদীর ধার।

জানলা দিয়ে দেখছি আমি বনের কালো ছায়া,
ওরাই কিগো ভূত হয়ে মা, পরশ করে কায়া ?
ভাবছি বসে বইটা লয়ে,
বুক টিপ্ টিপ্ করছে ভয়ে,
ওই দেখ মা, নড়ছে মোদের তক্তপোষের পায়া !

মেঘ বুড়ি তো চরকা কেটে যায় না আকাশ দিয়ে,
বইছে বায়ু ঘুমপাড়ানি গানেরি সুর নিয়ে ;
হুতুম পেঁচা চেঁচায় রাতে
চোখ-জলার-মা তারই সাথে,
কাঁদছে বুঝি ওপারের ওই অশথ গাছে গিয়ে।

জোনাক জ্বলে বাঁশবাগানে, ডাকছে মাঠে ফেউ,
পথের ধারে কুকুরগুলো করছে ঘেউ ঘেউ।
বাঘ যদি মা, বেরিয়ে থাকে,
বেড়া টপকে হেথায় হাঁকে,
গুলি করে মারতে তারে আসবে তখন কেউ ?

শতধারা ও শিউলী

[কথিকা]

স্বপনবুড়ো

নদীর নাম শতধারা।

বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে সাগরের দিকে প্রবাহিত হয়েছে—তাই নদীটির নাম হয়েছে শতধারা। শতধারার দুই তীরে গড়ে উঠেছে কত গ্রাম।

গ্রামগুলির সুখ-দুঃখের সব কথা নিয়ে দিন-রাত বয়ে চলেছে—এই সবাইকার প্রিয় নদীটি। শতধারা আপন মনে গুণ গুণ করে ছড়া কাটে—

সকল জনার সুখ-দুঃখ
বইছে আমার জল,—
কার মুখে রয় মধুর হাসি—
কান্নাটা কার ছল ?
আমার স্রোতে সিনান করি
জানায় মনের ব্যথা—
তাই নীরবে বহন করি
কান্না-হাসির কথা।

এই শতধারা নদী না হলে গাঁয়ের লোকদের একদিনও চলে না। জলের আর এক নাম জীবন। এই শতধারা নদী দুই ধারের গ্রামবাসীদের জীবন হয়ে যেন প্রবাহিত হচ্ছে। শতধারা গ্রামগুলির সব মালিন্য, সব গ্লানি ধুয়ে মুছে দিয়ে যাচ্ছে।

পূজো এসে পড়েছে।

শতধারার বুকের ওপর দিয়ে ভেসে আসছে নানা দেশ থেকে নানা জাতীয় নৌকো। কেউ আন্‌ছে নারকেল, আটা, ময়দা, ঘি ; কেউ বয়ে আন্‌ছে ধান ; আবার কোনো কোনো নৌকোয় আস্‌ছে পূজোর জন্যে রঙীন শাড়ী, ছোটদের জন্যে রঙ-বেরঙের পোষাক। বলির জন্যে নদীর ওপর দিয়ে ভেসে আস্‌ছে কত ছাগ-নন্দন। বিদেশে যারা থাকে—তারা আস্‌ছে পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লী বেঁধে নদীর বুকে কত কথা, কত গান, কত আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণী দিন-রাত গুঞ্জরিত হয়ে উঠ্‌ছে।

সবাইকার কাছে শতধারা নদীর এত আদর—কিন্তু নদীর নিজের মনে কোনো সুখ নেই ! দুই পারের সব গ্রাম যখন ঘুমিয়ে পড়ে—তখন নদী আপন মনে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদে।

নদীর মনে কেন এই দুঃখ কেউ জানে না। নদীর ধারে আছে একটি শিউলী ফুলের গাছ। শরৎকাল আসার আগে থেকেই অজস্র শিউলী ফুল ফুট্‌তে থাকে এই গাছে। গাছের নীচেকার সবুজে-ঢাকা জমি এই শিউলী ফুলে একেবারে ভরে যায়।

নানা অঞ্চল থেকে সাজি হাতে আসে ছেলেমেয়ের দল। তারা আপন মনে ফুল কুড়োয় আর গান গায়—

শিউলী-সুবাস মাতিয়ে দিল
সকাল বেলার হাওয়া—
এমন মধুর দিনে মোদের
চল্‌বে যে গান গাওয়া।

হাসি-গান, নাচ আর হুল্লোড়ে নদীর তীর ক্ষণে ক্ষণে মুখরিত হয়ে ওঠে। শতধারা সেই কোলাহল কান পেতে শোনে—আর আপন মনে নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দেয়।

একদিন গভীর রাতে শিউলী ফুল নদীকে জিজ্ঞেস করলে,—আচ্ছা ভাই শতধারা নদী, তোমার মনে এত কী দুঃখ? অনেক রাত্তিরে একা-একা তুমি কেন গুমরে গুমরে কাঁদ?

শতধারা উত্তর দিলে,—আমার মনের বেদনার কথা আমি মুখ ফুটে কাউকে জানাতে পারি নে।

শিউলী ফুল বল্লে,—আমি তোমার একপাশেই পড়ে আছি। সুখ-দুঃখের সাথী তোমার। আমার কাছে তোমার কি লজ্জার আছে? জানো তো মনের কথা লুকিয়ে রাখলে মন আরো ভারী হয়ে ওঠে। প্রতিবেশীর কাছে নিজের বেদনার কথা জানালে প্রাণটা অনেক হাল্‌কা হয়।

শতধারা ম্লানমুখে বললে,—সে কথা সত্যি। আচ্ছা, তবে শোনো আমার মর্ম্ম-বেদনার কথা। দেখ ভাই শিউলী ফুল, জগতের জননী আসছেন, ঘরে ঘরে তাঁর পূজা হবে। সবাই আনন্দ করবে, মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেবে। কিন্তু আমি মাকে দেখতে পাবো না, তাঁকে স্পর্শ করতে পারবো না, তাঁর চরণে অঞ্জলি দিতে পারবো না! তুমি শিউলী ফুল, আমার তীরে একান্তে ফুটে রয়েছ··কিন্তু তোমার কি ভাগ্যি! প্রত্যহ তুমি মায়ের চরণে পৌঁছে যাবে। ছেলেমেয়েরা তোমায় কুড়িয়ে নিয়ে অঞ্জলি দেবে মা দুর্গার পায়ে। কিন্তু মা যখন আমার বুকে আসবেন—তখন বিসর্জ্জনের বাদ্যি বাজবে, প্রাণহীন প্রতিমা—খড়-মাটির ঠাকুর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাবে সবাই আমার জলে। কি দুর্ভাগিনী আমি, বলো ত' ভাই শিউলী ফুল!

শিউলী ফুল নতমুখে উত্তর দিলে—সে কথা ভাই সত্যি।

ছোট্ট আমি, ক্ষুদ্র আমি,
মায়ের পায়ে থাকি;
তোমার জলের ধারা মিছাই
ভেজায় দুটি আঁখি।

আশ্বিন

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

শিউলি সকালে আশ্বিন এলো ফিরে,
আকাশে উড়িছে হালকা মেঘের ঘুড়ি;
কাঠবিড়ালীরা খোঁজে কি যে চাল চিরে!
ঝিঙে গাছে ফিঙে নেচে ফেরে ঘুরি ঘুরি।

চাও, চাও, চেয়ে থাক টিয়েপাখী মাঠে,
হরিণ-হাওয়ার সেখানে যে ছুটোছুটি;
শামুকের পিঠে যে শরৎ এলো বাটে,
কাশের মাথায় খায় সে যে লুটোপুটি।

উঠোনেতে যায় সোনা রোদ গড়াগড়ি,
সোনামণি খুকু সেথায় পুতুল খেলে;
চাঁদ-মামা তার টিপ করি ছড়াছড়ি
মণি ভাইদের চাঁদ কপালেতে ফেলে।

ডাক ডুমা ডুম ঢাকের বাদ্যি ওঠে,
খোকাখুকুদের মুখে মুখে হাসি ফোটে।

অধ্যাপক জ্যোলিও কুরী

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

১৯৪০ সাল। জগৎ যুড়ে দ্বিতীয় মহাসমর চলেছে। প্রবল শক্তিশালী জার্মান সৈন্যবাহিনী একের পর এক দেশ জয় করে ফরাসী দেশের দোরগোড়ায় এসে হাজির। এই সময়ে ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারিস সহরে পরমাণু থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তাই নিয়ে গবেষণা করছিলেন এক বৈজ্ঞানিক দম্পতি। এ সম্বন্ধে তাঁরা তখন এমন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় আবিষ্কার করেছেন যা পরমাণু-বিজ্ঞানে চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। তা ছাড়া এ বিষয়ে গবেষণা করতে হলে 'ভারী জলের' বিশেষ দরকার। কিন্তু তখনকার দিনে পৃথিবীর মধ্যে ভারী জল তৈরী হ'ত নরওয়ের জুকন সহরে একটি মাত্র কারখানায়। এ কারখানাটি তখন জার্মান অধিকারে। বৈজ্ঞানিক দম্পতি ঐ কারখানাটি জার্মানদের দখলে যাওয়ার আগেই চল্লিশ গ্যালনের মত ভারী জল এনে জমা করে রেখেছিলেন নিজেদের কাজের জন্যে।

জার্মানরা ক্রমে এগিয়ে আসছে প্যারিস সহরের দিকে। প্যারিসের পতন অনিবার্য্য। বৈজ্ঞানিক দম্পতি ভাবলেন, যদি তাঁদের ভারী জল ও মূল্যবান্ আবিষ্কারের ফরমূলা জার্মানদের হাতে পড়ে, তবে? পরমাণু-শক্তির কলকাঠি রয়েছে যে এই ফরমূলার মধ্যে! অনেক ভেবে বৈজ্ঞানিক দম্পতি তাঁদের দু'জন সহকর্মীকে দিয়ে তাঁদের ভারী জল ও মূল্যবান্ ফরমূলা পাঠিয়ে দিলেন ইংল্যাণ্ডে। পরে এই ফরমূলার সাহায্যেই আবিষ্কৃত হ'য়েছিল এটম বোমা—মানবসভ্যতার নির্মম নৃশংস একটি অস্ত্র—বিজ্ঞানের এক মহা অভিশাপ।

এই বৈজ্ঞানিক দম্পতি হ'লেন অধ্যাপক ফ্রেডারিক জোলিও কুরী ও তাঁর স্ত্রী ডক্টর আইরিন জোলিও কুরী—রেডিয়াম আবিষ্কারক মাদাম কুরীরই কন্যা-জামাতা। তোমাদের মধ্যে যারা খবরের কাগজ পড় তারা নিশ্চয়ই জান যে গত ১৪ই আগষ্ট অধ্যাপক জোলিও দেহত্যাগ করেছেন। বছর দুই আগে তাঁর স্ত্রী আইরিন কুরীও মারা গেছেন। রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে অনবরত কাজ করলে এক রকম দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মে, তার নাম লিউকোমিয়া। অধ্যাপক জোলিও এই রোগে আক্রান্ত হ'য়েই প্রাণত্যাগ করেছেন। আইরিন কুরী এবং মাদাম কুরীও এই ব্যাধিতেই মারা গেছেন।

আজ থেকে ৫৮ বছর আগে প্যারিস সহরে এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম হয় ফ্রেডারিক জোলিওর। তাঁর পিতা ছিলেন লুকসেমবার্গ সহরের একটি কারখানার সাধারণ কর্মচারী। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। ২৩ বছর

বয়সে প্যারিসের একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পাশ করেন ফ্রেডারিক। দু' বছর পরে মাদাম কুরীর বিখ্যাত গবেষণাগার রেডিয়াম ইনষ্টিটিউটে সামান্য কাজে যোগদান করেন তিনি। মাদামের প্রধান সহকারী তখন কন্যা আইরিন। পরমাণু-বৈজ্ঞানিক ডক্টর আইরিন কুরীর তখন খুব নাম-ডাক। এখানেই ফ্রেডারিকের সঙ্গে আইরিনের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। পরের বছর, মানে ১৯২৬ সালে এঁদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর ফ্রেডারিক জোলিও আইরিনের পদবী গ্রহণ করে ফ্রেডারিক জোলিও কুরী নামে পরিচিত হ'লেন, আইরিন হ'লেন আইরিন জোলিও কুরী।

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী যুক্তভাবে গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। চার বছর পর ১৯৩০ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী পেলেন ফ্রেডারিক। তার কিছুদিন পর তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৩৫ সালে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কারের জন্যে স্বামী-স্ত্রী যুক্তভাবে বিশ্বের সেরা সম্মান নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রসায়ন বিভাগেই এ পুরস্কার তাঁদের দেওয়া হয়েছিল।

অধ্যাপক জোলিও কুরীর আর একটি শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার 'শৃঙ্খল প্রক্রিয়া' বা চেন রিয়্যাকশন'। এটা আবিষ্কৃত হয় ১৯৩৬ সালে। এই আবিষ্কারের জন্যেই পরমাণুর ভেতরকার বিপুল শক্তি সহজে বের করে আনা সম্ভব হ'য়েছে।

এই সব আবিষ্কারের কথা তোমাদের আর একদিন ভালো করে বলব।

নতুন বই

অনেকগুলি ভাল ভাল বই ইতিমধ্যে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। এখানে সেগুলির নাম উল্লেখ করছি। পরে এদের বিশেষ পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

কবির লড়াই—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক (ছন্দশ্রী), ৯এ বলরাম বসু ফার্ষ্ট লেন, কলিকাতা। এক টাকা। চাষ করি আনন্দে (আলেক্সিস মুসাতভ)—অনুবাদিকা শ্রীইন্দিরা দেবী। কে. গাঙ্গুলী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, ৮বি লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১। চার টাকা। মহাকালের পূজারী—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। কিশোর ভারতী, ৯ ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দুই টাকা। ছোটদের রামকৃষ্ণ—শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত। শ্রীমা প্রকাশনী, ১, রমেশ মিত্র রোড, কলিকাতা-২৫। এক টাকা চার আনা। লাল জুতো ইত্যাদি গল্প (হান্স আণ্ডেরসেন)—অনুবাদক শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। চয়ন, ১৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯। আড়াই টাকা। ইন্দোচীনের কথা—শ্রীঅজিতকুমার তারণ। পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১বি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

মায়ের আশীর্ব্বাদ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

গোলকুণ্ডার সুলতান কুতুব সাহের সহিত সন্ধি ও মিলন স্থাপন করিয়া চলিয়াছেন শিবাজী দক্ষিণ দেশের কর্ণাট বিজয়ে।

একদিন কথা প্রসঙ্গে কুতুব সাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছত্রপতি মহারাজ, আপনার কত হাতী আছে ?"

এ প্রশ্নের কারণ ছিল এই যে কুতুব সাহের অনেক হাতী ছিল। শিবাজী বিন্দু মাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন—"আমার, এই দেখুন না, হাজার হাজার হাতী" তিনি তাঁহার সঙ্গীয় হাজার হাজার মাব্‌লে পদাতিক সৈন্য দেখাইয়া বলিলেন—"এই যে সব আমার হাতী !"

কুতুব সাহ বিস্মিত হইলেন এই উত্তরে। তারপর হাসিয়া বলিলেন : "বেশ তো, আমার এই হাতীর সঙ্গে আপনার এক হাতী লড়াই করুক দেখি !"

কুতুব সাহ তাঁহার এক বিশালকায় মত্ত হাতীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বলিলেন শিবাজীর সৈন্যদলের একজনকে।

তখন সেই বৃহদাকার মত্ত হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিলেন মাব্‌লে সেনাপতি যেসাজী কঙ্ক। উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে যেসাজী কঙ্ক ছুটিয়া আসিলেন—আরম্ভ হইল মানুষে ও হাতীতে লড়াই। শেষ বার এক লম্ফে হাতীর কাছে গিয়া কাটিয়া ফেলিলেন হাতীর শুঁড়। হাতী বেগে ছুটিয়া পালাইল গুরুতর আহত হইয়া, রক্ত ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল চারিদিকে।

শিবাজী একটি কথাও বলিলেন না। সুলতান কুতুব সাহ আনন্দে বলিয়া উঠিলেন—'সাবাস্।'

কর্ণাট বিজয়যাত্রার এই শুভ সুযোগে কুতুব সাহ সুলতান ও শিবাজীর এই মিলনে ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথ হইল ভাগ্যবান্ ছত্রপতি মহারাজা শিবাজীর।

এইভাবে কয়েক মাস কাটিয়া গেলে শিবাজী হায়দারাবাদ ত্যাগ করিয়া চলিলেন দক্ষিণ দিকে। যাইতে যাইতে শুনিলেন দক্ষিণ দিকে কৃষ্ণা নদীর তীরে 'নিবৃত্তিসঙ্গম' নামে একটি তীর্থ আছে। সেখানে পুণ্যসলিলা কৃষ্ণা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে ভবনাশী নদী। এ স্থানটি অতি পবিত্র তীর্থস্থান,—স্নান ও পূজাদি করিবার উপযুক্ত তীর্থ। কাজেই শিবাজী সংকল্প করিলেন সেখানে স্নানতর্পণাদি করিবেন।

মহারাজ শিবাজী আসিলেন এবং দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করায় সকলে তাঁহাকে অসংখ্য

ধন্যবাদ দিতে লাগিল। লোকের মুখে মুখে গীত হইল 'জয় শিবাজী মহারাজার জয়!'

নিবৃত্তিসঙ্গমে শুনিলেন ছত্রপতি—এখান হইতে ৭০ মাইল দূরে পূর্ব্ব দিকে—কৃষ্ণা নদীর তীরে আরণ্য প্রকৃতির মধ্যে বিরাজিত শ্রীশৈল। নদীতীর হইতে তাহার উচ্চতা হাজার ফুট। সেখানে এক বিশাল অধিত্যকা আছে—যেখানে জনহীন অরণ্যের মধ্যে মল্লিকার্জুন শিবের মন্দির বিরাজিত। সে মন্দিরে রহিয়াছেন দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের এক লিঙ্গ। চারিদিকে নিবিড় বনানী, তারই মধ্যে বিরাট মন্দির। মন্দিরটির চারিদিকে প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু দেওয়াল-ঘেরা বৃহৎ অঙ্গন। দেওয়ালটি সমচতুষ্কোণ প্রস্তরনির্ম্মিত, অতি সুন্দর। মন্দিরের গায়ে খোদিত রহিয়াছে হাতী, ঘোড়া, বাঘ, দেবদেবীর মূর্ত্তি, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কত না দৃশ্য! অদ্ভুত কত যোগী, সন্ন্যাসী, সাধু, বীর ও যোদ্ধার খোদিত লিপি।

শিবমন্দিরটিও সমচতুষ্কোণ। বিজয়নগরের বিখ্যাত নরপতি দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ কৃষ্ণদেব রায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মন্দিরের চারিদিকে এই দৃঢ় অথচ কারুকার্য্যখচিত প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরের ছাদ আগাগোড়া সোনার জল করা তামার পাতে মোড়া। সম্ভবতঃ ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে তৈরী হইয়াছিল এই মন্দির ও প্রাচীর।

শিবাজী সঙ্গে কয়েকজন বিশ্বস্ত সৈনিক, রক্ষী এবং অল্পসংখ্যক কর্ম্মচারী সহ কৃষ্ণা নদীর তীর হইতে মল্লিকার্জুন মন্দিরের দিকে রওনা হইলেন। কৃষ্ণা নদীর তীর হইতে মন্দির পর্য্যন্ত রহিয়াছে প্রস্তরসোপান। সেই সোপান-শ্রেণী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন বিজয়নগরের এক ধার্ম্মিকা সম্রাজ্ঞী। আগাগোড়া সান বাঁধান। সিঁড়ির নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত হাজার ফুটেরও বেশী দীর্ঘ পথ। ঘাটের নীচের নাম 'পাতাল গঙ্গা' আর 'নীল গঙ্গা' নামে পারঘাট। এই দুইটিও বিখ্যাত তীর্থ—স্নানদানের জন্য।

শিবাজী মহারাজ সেই সান বাঁধান পথে চলিলেন শ্রীশৈল পাহাড়ের দিকে। পথটির দুই দিকে শ্যামল সুন্দর দীর্ঘ তরুশ্রেণী। দুইপাশে শেফালী ও আমলকির বন। কত বনফুল ফুটিয়া রহিয়াছে! বনগোলাপ ফুল ফুটিয়া আপনার মনে সৌরভ বিলাইতেছে। বাতাসে দুলিতেছে, নাচিতেছে শ্যামলতাকুঞ্জ। সেই পথে চলিলেন শিবাজী। জয় শিব শঙ্কর! বম্ ভোলা ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহারা চলিলেন শ্রীশৈলের দিকে। অগ্রসর হইলেন সদলবলে পর্ব্বতের শিখরে। এ সময়টি ছিল নবরাত্রি। চৈত্র শুক্লপক্ষের প্রথম নয় দিবসকে বলে নবরাত্রি। পথের শ্যামল শোভা ও সৌন্দর্য্য, পাখীর গান শুনিতে শুনিতে শিবাজী প্রফুল্ল মনে আসিয়া পৌঁছিলেন শ্রীশৈল-শিখরে।

মুগ্ধ হইলেন ছত্রপতি সেই রম্য স্থান দেখিয়া। ঠিক্ যেন 'কৈলাস ভূধর অতি

মনোহর !' শ্যামল অধিত্যকার বুকে তরুছায়াতলে দলে দলে যাত্রীদল আসিয়া বসিয়াছেন। ছত্রপতি শিবাজীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণে হাজার হাজার নর-নারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—জয় মহারাজ ছত্রপতি শিবাজী প্রভুর জয়। হর্ হর্ বম্ বম্, শিবশঙ্কর প্রভু !

এমন পুণ্য তীর্থস্থানে আপনা হইতেই শিবাজীর মন দ্রবীভূত হইল। প্রকৃতির অপরূপ রূপ—এবং মন্দিরমধ্যে অন্ধকার গর্ভগৃহে বিরাজিত জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম মল্লিকার্জ্জুনের শিবলিঙ্গ। ভক্ত শিবাজী নতজানু হইয়া সেখানে শিবস্তোত্র পাঠ করিলেন। পূজা দিলেন ষোড়শোপচারে। ঘণ্টাধ্বনি দিগন্ত মুখরিত করিল। সুরভিত ধূপ-ধূনা-চন্দনের গন্ধে প্রাণ আনন্দে অভিভূত হইল শিবাজী মহারাজার।

পূজা-শেষে ব্রাহ্মণ ভক্ত ও তীর্থযাত্রীদের দান করিলেন, ভোজন করাইলেন। সকলে দেশহিতৈষী দিগ্বিজয়ী হিন্দু বীর শিবাজীর দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। শিবাজী নানা ভাবে দান-ধ্যান এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—তোমরা সকলে দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে এই প্রার্থনা কর যেন আমার কর্ণাটক বিজয় সার্থক হয়।

সকলে সেই কথা শুনিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—জয় হিন্দু মাহারাজা শিবাজীর জয়। পর্ব্বত ও অরণ্য প্রতিধ্বনিত হইল সেই বিজয়ধ্বনিতে।

—দুই—

মল্লিকার্জ্জুন মন্দিরের অল্প দূরে ছিল শ্রীদুর্গার মন্দির। মা ভবানী ছিলেন সেখানে বিরাজিতা। মন্দিরটি বৃহৎ না হইলেও অতি সুন্দর মর্ম্মরপ্রস্তরে শোভিত। মন্দির-মধ্যে স্বর্ণ বেদীতে বিরাজিতা রহিয়াছেন মাতা ভবানী ! রত্নমণিশোভিত স্বর্ণমুকুটশীর্ষে দেবী ভবানীর মূর্ত্তি। চক্ষে তাঁহার তীব্র দীপ্তি। হস্তে খড়্গ, শূল, ধনু ও চর্ম। মা যেন ভক্তকে অভয়-দান করিতেছেন। দেবীর সেই ভাবগম্ভীর তেজঃব্যঞ্জক অষ্টভুজা ভবানী-মূর্ত্তি দেখিয়া শিবাজীর মন বিচলিত হইল। তাঁহার হৃদয়ে দেখা দিল আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। জাগিল তীব্র বৈরাগ্য। ভাবিলেন কিসের এ জীবন? এই ত' মরিবার উপযুক্ত স্থান। এইখানে দিব দেহ বিসর্জ্জন! মা ভবানীর দিকে চাহিয়া—ভক্তিভরে চরণে প্রণত হইয়া সেই নিস্তব্ধ মন্দিরমধ্যে তরবারি ধারণ করিয়া যেমন আপনার মস্তক দেহচ্যুত করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন, বলিতেছেন, মা, মা, আমায় গ্রহণ কর!—তরবারি যেমন কণ্ঠনালি ছেদন করিবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছে—অমনি মাতা ভবানী স্বয়ং আসিয়া সেই খড়্গ ধরিলেন; বলিলেন, "বৎস শিবাজী, এইরূপ আত্মবিসর্জনে কখনও কাহারও মোক্ষলাভ হয় না। ক্ষান্ত হও। এমন কাজ ক'রো না। তোমায় যে বৎস, এই খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত

ভারতকে এক সূত্রে বেঁধে দিতে হবে। হিন্দুর কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে দেশে দেশে! অনেক—অনেক কাজ যে তোমায় করতে হবে শিবাজী!

তারপর—উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকশিত হইল সেই মন্দিরমধ্যে। মা ভবানী অদৃশ্য হইলেন।

ছত্রপতি মাতার আশীর্ব্বাণী শুনিয়া মহা উৎসাহের সহিত বলিলেন, জয় জয় শিব শঙ্কর! হর হর বম্ বম্! জয় মা ভবানী! তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠে সেই নিভৃত অধিত্যকা-প্রদেশ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

শিবাজী সদলবলে এইরূপ বিজয়ধ্বনি করিতে করিতে চলিলেন দিগ্বিজয়ের পথে কর্ণাট।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

—নটিলাসের জয়যাত্রা—

বিখ্যাত ফরাসী লেখক জুল ভার্ণের লেখা "সাগরের নীচে ২০ হাজার লীগ্" —ইংরেজীতে "টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগ্স্ আণ্ডার দি সী" বইখানি তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ। সেই যে ক্যাপ্টেন নিমো নামে এক মহাপণ্ডিত ভদ্রলোক অদ্ভুত এক জাহাজ তৈরী করে সমুদ্রের নীচে ঘুরে বেড়াতেন? তখনও সাবমেরিনের আবিষ্কার হয় নি—ওর সবটাই ছিল জুল ভার্ণের কল্পনা। পরে অবশ্য সেই কল্পনা সত্যিই বাস্তবে রূপ নিয়েছে, যদিও জুল ভার্ণে তা দেখে যেতে পারেন নি।

যাই হোক, সাবমেরিন বা ডুবো-জাহাজ এখন আর আমাদের কাছে নতুন জিনিষ

নয়,—বিশেষ ক'রে ছু' ছু'টো মহাযুদ্ধ ঘটে যাবার পর। কিন্তু সম্প্রতি এই রকম একটি সাবমেরিন যে অসাধ্যসাধন করেছে সেই কথা শোন।

সাবমেরিনগুলো সাধারণতঃ চালানো হয় পেট্রোলের সাহায্যে। কিন্তু সম্প্রতি, পারমাণবিক শক্তির সন্ধান পাওয়ার পরে, আমেরিকানরা এমন একখানা সাবমেরিন তৈরী করেছে যা পেট্রোলের বদলে ঐ পরমাণুর শক্তি দিয়েই চালানো যায়। ছোট্ট একটুকরো পরমাণবিক জ্বালানী—আকারে হয়তো একটা হাঁসের ডিমের মত, কিন্তু তারই শক্তিতে এই ডুবো-জাহাজ তিন তিনবার গোটা পৃথিবীটাকে চক্কর দিয়ে আসতে পারে—যা নাকি পেট্রোলের শক্তিতে হাসিল করতে গেলে অন্ততঃ ৩০ লক্ষ গ্যালন পেট্রোলের দরকার হবে। ১৯৫৪ সালে এই ডুবো-জাহাজটি প্রথম জলে ভাসানো হয় আর এর নামকরণ করা হয় 'নটিলাস্'। নটিলাস্ কিসের নাম মনে আছে তো? নিমোর তৈরী সেই অদ্ভুত ডুবোজাহাজ—জুল ভার্ণে যার কল্পনা করেছিলেন।

যে অসাধ্যসাধনের কথা বলছিলাম তা করেছে এই নতুন যুগের 'নটিলাস্'।

উত্তর মেরু কেমন ধরণের জায়গা তা তোমরা বইএ পড়েছ। সেই ছ' মাস রাত আর ছ' মাস দিনের ঠাণ্ডা হিমের দেশ, যেখানে হাজার হাজার মণ বরফের চাঁই জমাট বেঁধে ভেসে আছে মেরুসমুদ্রের ওপর—শত শত মাইল জায়গা যুড়ে, শত শত বছর ধরে। চিরতুষারের রাজ্য এই মেরুর দেশ। এ পর্যন্ত অতি সামান্য কয়েকজন অসমসাহসিক মানুষই কেবল সে রাজ্যে পৌঁছতে পেরেছেন। নটিলাস্ এই মেরুর দেশের জমাট বরফের তলা দিয়ে একদিক্ থেকে আর একদিকে পার হয়ে এসেছে,—যাকে বলে এফোঁড় ওফোঁড় করে পার হওয়া।

গত ২৩শে জুলাই প্রশান্ত মহাসাগরের হনলুলু থেকে নটিলাস যাত্রা সুরু করে জলের তলা দিয়ে ২৯শে হাজির হয় বেরিং প্রণালীতে। দিন তিনেক জলের ওপর ভেসে থেকে, প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ সেরে, ১লা আগষ্ট আবার সে ডুব দেয় সাগরের অতল তলে, তার পর মেরুর তলা দিয়ে মাছের মত তীব্রগতিতে, ঘণ্টায় গড়ে প্রায় ২০ নট্ বেগে এগিয়ে চলে গ্রীন্ল্যাণ্ডের দিকে। মাথার ওপর জমাট বরফের চাঁই, কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। ডুবো-জাহাজের ১১৬ জন আরোহী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে টেলিভিশনের সাহায্যে দেখতে পাচ্ছেন মাথার ওপর সাদা মেঘের মত ভেসে চলেছে সাদা বরফের রাশি সাদা মেঘের মতই স্বচ্ছ—সুন্দর। এক একটি চাঁই গড়ে প্রায় ১১ ফুট পুরু, কোন কোনটা ৫০ ফুটও আছে। ঠিক মেরুর তলা দিয়ে যখন জাহাজ চলছিল তখন তাঁদের মনের অবস্থা না জানি কি রকম হয়েছিল! যাই হোক, ৫ই আগষ্ট যখন জাহাজ আবার ভেসে উঠল, তখন সে একেবারে গ্রীন্ল্যাণ্ডের তরল জলের

সমুদ্রে এসে পৌঁছেছে। পার হয়েছে ১৮৩০ মাইল পথ। এ জন্য তাকে একটানা ৯৬ ঘণ্টা জলের তলায় থাকতে হয়েছে—যা এর আগে কোন ডুবো-জাহাজই পারে নি।

এই আশ্চর্য অভিযান শুধু সাহসিকতার দিক্ দিয়েই স্মরণীয় নয়, এই অভিযানে মেরুরাজ্যের অনেক অজানা রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সে কথা সুবিধে মত আর একদিন আলোচনা করব। একটা কথা এখানে বলা দরকার। গভীর সমুদ্রে দিক্ ঠিক রাখবার জন্য যে চুম্বকের তৈরী কম্পাস্ ব্যবহার করা হয় মেরুর রাজ্যে তা অচল; কারণ পৃথিবীটাও একটা বিরাট চুম্বক আর পৃথিবীর মেরু হচ্ছে সেই বিরাট চুম্বকের মেরু। জলের তলায় বসে আকাশের গ্রহনক্ষত্র দেখে দিক্ ঠিক করাও সম্ভব নয়। তবে? নটিলাসকে এ জন্যও এক নতুন পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়েছিল—যার নাম 'ইন্টার্নাল নেভিগেশন সিষ্টেম্'।

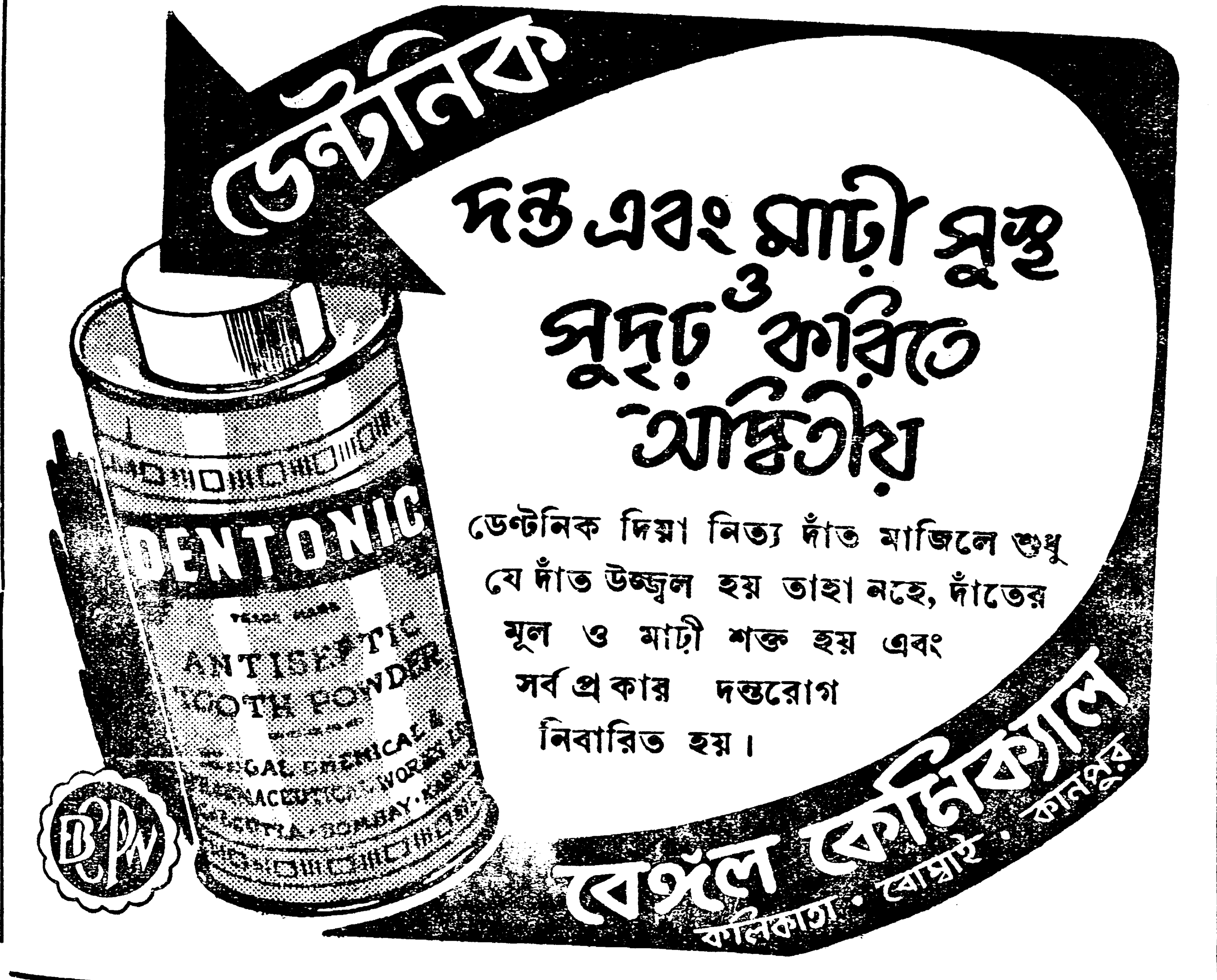

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

পূজো প্রায় এসে গেল। আকাশে-বাতাসে তারই সাড়া টের পাচ্ছি। স্কুল-কলেজও বন্ধ হয়ে এল। যারা এদিক্ ওদিক্ বাইরে যাবে ঠিক করেছ তারা হয়তো এখনই পোঁটলাপুঁটলি বাঁধতে সুরু করেছ। এখন কি আর লম্বা চিঠি ভাল লাগবে, না পড়বার ধৈর্য থাকবে ?

শ্রীসৃষ্টিধর মুখোপাধ্যায় (চাঁদবাটী)—কোথায় বেড়াতে যাওয়া যায় জিজ্ঞাসা করেছ। সেটা নির্ভর করে কোন্ কোন্ জায়গা তুমি দেখ নি, কোথায় যাবার, থাকবার ব্যবস্থা তুমি করতে পারবে তারই ওপর। দেখবার মত জায়গা তো সারা ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে রয়েছে—ওদিকে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী আর এদিকে আসাম থেকে পাঞ্জাব। যদি কাছাকাছি কোথাও যেতে চাও তবে বাংলা দেশটাই ভাল করে দেখে নাও না! "বাংলাকে চিনতে শেখ" এই বিভাগে তো আমরা অনেক জায়গার পরিচয় দিয়েছি—তার থেকেও বেছে নিতে পার। শ্রীমুরারিমোহন মণ্ডল (চন্দননগর)—বাইরে-থেকে-আসা ধাঁধা গ্রহণ করলে বিপদের ঝুঁকি তো আছেই! দেখা যাচ্ছে মৌলিক ধাঁধা তৈরীর আগ্রহ এখন প্রায় দুর্লভ। তোমার বৈজ্ঞানিক প্রশ্নটির উত্তর সংক্ষেপে দিলে হয়তো বুঝবে না—কারণ তোমার পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান কতটা আমি জানি না। পরে ছবি (গ্র্যাফ) এঁকে পৃথক্ ভাবে তোমাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করব। শ্রীশুক্লা ও শ্রীযমুনা গাঙ্গুলী (ধুবড়ী)—পূজা-সংখ্যায় আমরা প্রায় সব বারই ধারাবাহিক রচনাগুলি বন্ধ রাখি। কাজেই এবারে তোমাদের হয়তো আরও হতাশ হতে হবে। তবে অন্য গল্পে তা পুষিয়ে যাবে নাকি? পরে ধারাবাহিক লেখাগুলো আরও বেশী করে দেবার চেষ্টা করব। শ্রীমালবিকা দত্ত (করিমগঞ্জ)—তোমার গোপনে-পাঠান কবিতাটি পেয়ে খুসী হয়েছি। ওটি সুবিধামত দেবার চেষ্টা করব।

শারদীয় শুভেচ্ছা আগেভাগেই জানিয়ে আজ চিঠি শেষ করি। —ইতি রাঃ সঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

পূজা উপলক্ষে আমাদের কার্যালয় কিছুদিন বন্ধ থাকবে। তাই কার্তিক সংখ্যা রামধনুও ঐ মাসের শেষ দিকেই প্রকাশিত হবে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

এই ভাবে দাঁড়াতে হবে :—

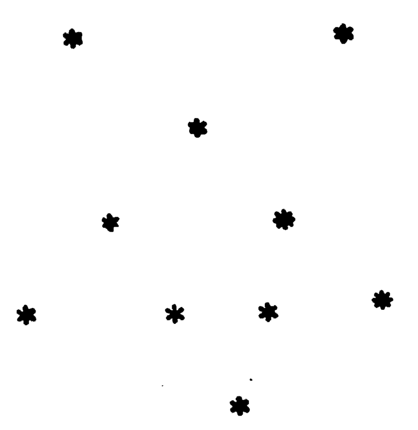

উত্তরদাতাদের নাম :— ভাস্কর ও প্রণব চট্টোপাধ্যায় (আন্দুল) ; দিলীপকুমার সমাজদার (কলিকাতা-১২) ; বিবেক, জ্ঞান, শিপ্রা, দয়া, মা, বাবা, বৌদি (শ্রীবরা) ; কাণ্টু, শুক্লা, জাহ্নবী ও যমুনা (ধুবড়ী) ; পার্বতীনাথ ও শঙ্করকুমার মিত্র (সালিখা) ; দেবপ্রসাদ সেন ও কৃষ্ণা সেন (কলিকাতা-৫), হারুন, রুহুল, দারুল, রফিউল আজাদ পুরকাইত, জিতেন্দ্র জানা (হাওড়া) ; কেদার মুখার্জি, শোভা চক্রবর্তী, কালী চ্যাটার্জি, রামকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় (জাগাছা) ; ভবেশচন্দ্র পাত্র (ভাটোরা) ; মুরারিমোহন মণ্ডল ও পাঁচু পাল (চন্দননগর) ; সুবিমল, পরিমল, সুভাষ, সুকুমার, সুবীর ও মামা (কলিকাতা-২) ; মানবী চৌধুরী (কুলিয়া) ; তিস্তুরপাড়া ধর্মতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীবৃন্দ (ধুলাসিমলা) ; বেবী, বৌদি, মিঠু, দীপু, নীপু (কলিকাতা-১৯) ; বাবুন (অভিজিৎ) সেন (কলিকাতা) ; সুচেতা ও রত্নাবলী ভট্টাচার্য (কলিকাতা-২৫) ; অমিতাভ ও অশোকনাথ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর) ; কাজল বসু, উজ্জ্বল, শ্যামল, বাচ্চু, দেবল, বুলু, রুণু, উৎপল মণিয়া, বাপ্পা (কলিকাতা-২৯) ; টুটুল, বাচ্চু, পটু, মালা, বনু (জামসেদপুর) ; আলোক ও মঞ্জুশ্রী চ্যাটার্জী (দানাপুর) ।

নূতন ধাঁধা

তারা দু' দল। সার বেঁধে সর্বদাই মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র সৈন্যের মত—রণং দেহি ভাব নিয়ে। দু' দলেরই সাজ-পোষাক এক রকম,—যেন সাদা-পোষাকী পুলিশ! অবশ্য লাল পাগড়ীটা নেই।

হঠাৎ যদি ওদের সামনে কোনও শিকার এসে পড়ে অমনি দু'দল একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর, আর যতক্ষণ না সেটাকে ছিঁড়ে, পিষে টুকরো টুকরো করতে পারবে ততক্ষণ তার রেহাই নেই। কিন্তু মজা এই, শেষ পর্যন্ত সে শিকারের ভাগ কিন্তু ওদের কেউই পায় না। ফাঁকতালে অপরে সেটা দখল করে নেয়।

ওদের কোন দলের কেউ যদি হঠাৎ মারা যায় তা হ'লে অপর পক্ষের সুবিধা হওয়ার কথা ; কিন্তু আসলে দেখা যায় দু' দলই কাবু হয়ে গেছে। অবশ্য দলের কেউ অল্প বয়সে গত হলে তার জায়গায় আর একজন এসে জোটে। বেশী বয়সে গেলে কিন্তু তার জায়গা কেউ দখল করতে আসে না। তবে তখন বাইরে থেকে বিজাতীয় কাউকে এনে সাময়িক ভাবে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালানো যেতে পারে। বল তো এরা কারা ? থাকেই বা কোথায় ?

শিশুসাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত পুজার শ্রেষ্ঠ উপহার

বিংশ শতাব্দীর বৃহত্তম ও অভিনব বার্ষিকী

আহরণী

॥ বিদ্যাসাগরের যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের, বিশেষভাবে শিশুসাহিত্যের লেখক-লেখিকাদের অপূর্ব সমাবেশ ॥

*

॥ বিগত এক শ' বছর ধরে যাঁদের সাধনায় ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে, বাংলার শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সামনে তাঁদের সেই সাধনার পরিচয় তাঁদের লেখা সরস গল্প, প্রবন্ধ ও ছড়ার মাধ্যমে এই বার্ষিকীতে পরিবেশিত হয়েছে ॥

*

॥ লেখক-লেখিকাদের সাহিত্যিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সহ প্রতিটি লেখা কালানুক্রমিক ভাবে সাজানো ॥

*

॥ লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা বহু চিত্রে সুশোভিত সুন্দর ছাপা পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার বিরাট বই ॥

*

॥ দাম : মাত্র চার টাকা ॥

*

। এজেন্টগণকে আগে থেকে টাকা জমা দিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বইয়ের জন্য অর্ডার দিতে হবে ॥

*

। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি : ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট : কলিকাতা-১২ ॥

সাত-সমুদ্দুর

ছবি, গল্প, ছড়া, প্রবন্ধ, কবিতা বোঝাই হয়ে তোমাদের জন্য শরৎকালীন উপহার—

এবারে তোমাদের জন্যে যাঁরা লিখেছেন :—

নরেন্দ্র দেব, ধীরেন্দ্রলাল ধর, অখিল নিয়োগী, পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, কুমারেশ ঘোষ, মনোজিৎ বসু, প্রভাতকিরণ বসু, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, আশা দেবী, শিশির চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, জয়দেব রায়, প্রভাকর মাঝি, বেণু গঙ্গোপাধ্যায়, যাদুকর শঙ্কর দাস, মনোতোষ রায়, ইন্দিরা দেবী, অলক চক্রবর্ত্তী, প্রবাসজীবন চৌধুরী, শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, তারক মিত্র, অমলেন্দু দত্ত, আশাবরী দেবী, বেলা দে, রেখা চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অরুণ চক্রবর্ত্তী, দিলীপ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সম্পাদিকা— ইন্দিরা দেবী
প্রকাশক— অরুণালোক প্রকাশনী
৪০, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,
কলিকাতা-১২
দাম—দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

এবার পূজায়

শ্রীননীগোপাল মজুমদারের

স্বপ্ননেশা
(তৃতীয় সংস্করণ)

রামধনু বলেন, "পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না।"

মৌচাক বলেন, "এক নিশ্বাসে সমস্ত বইখানি শেষ করবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে।"

দেশ বলেন, "লেখকের গল্প বলার নৈপুণ্যে এই কাহিনী রুদ্ধনিশ্বাস পাঠককে অভিভূত করে।"

বাঁধাই সংস্করণ—দুই টাকা
সুলভ সংস্করণ—পাঁচসিকা।
প্রকাশক : রিভ্যু পাবলিশার্স :
কলিকাতা

বাহাদুর
(আনকোরা নতুন বই)

একদল স্কুলের ছেলে এক ভীষণ রহস্যের ভেতর পড়ে কী ক'রে রহস্যের সমাধান করলো তারই কাহিনী।

দ্বিতীয় খণ্ডে কী করে একজন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক সোনা তৈরী করলো, কী করে একদল সাহেব ডাকাতদের হারিয়ে দিল, তার রোমাঞ্চকর কাহিনী।

দাম দুই টাকা।
পরিবেশক : অভিজিৎ প্রকাশনী
৭২।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—শিশুসাহিত্যের কয়েকখানা সেরা বই—

।। লাইব্রেরীতে রাখার — প্রাইজ দেবার ।।

অশোক গুহের
আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ২৲
কী করে আমরা স্বাধীনতা পেলাম তার কাহিনী ছোটদের জন্য সহজ ভাষায়।

শেফালি নন্দীর
পান্নাদ্বীপ ১৲
আয়ার্লাণ্ডের কাহিনী।

অজিতকুমার তারণের
ইন্দোচীনের কথা ২৷৹
একাধারে গল্প, কাহিনী, ইতিহাস, হাসি-ঠাট্টা অথচ প্রচুর শেখার ও জানার জিনিস রয়েছে। অসংখ্য চিত্রশোভিত।

য়ুরি স্যোট্নিকের
আজব পাখী ২।০
আটটি মজার রুশ গল্প। সচিত্র।

ভেরা চ্যাপলিনার **চিড়িয়াখানার খোকাখুকু** ৪৲
মস্কো চিড়িয়াখানার জন্তুদের নিয়ে গল্প। আর্ট প্লেটে ছাপা উনিশটি ছবি। মনোরম প্রচ্ছদ। দু'খণ্ড একত্রে।

ভোমুস্কিনের
বরফের দেশে আইভ্যাম ১৷৷০
মেরুদেশের বরফে আট্‌কা পড়ে গেল আইভ্যাম মাছ শিকার করতে গিয়ে। দুঃসাহসিক তার অভিযান·········অদ্ভুত কাহিনী। সচিত্র।

আলেক্সি তলস্তয়ের
নিকিতার ছেলেবেলা ৩৲
সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক তলস্তয় নয়, দুর্দান্ত কৌতুকপ্রিয় আলেক্সির ছোটবেলার বিচিত্র কাহিনী। সচিত্র।

।। কিশোর উপন্যাস ।।

ভেরা পানোভার
পিতা ও পুত্র ২৷৷০
আন্তর্জাতিক কিশোর সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই। সচিত্র।

ইসরাইল মেটারের
সাথী ৩৲
গ্রামের ছেলে, গেছে মস্কোয় কারিগরী শিখতে। হারিয়েও যায় নি, পথও হারায় নি, হয়ে উঠল দক্ষ শ্রমশিল্পী। অনেক কিছু শেখার আছে।

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫।১বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শ্রীচরণেষু

ফোন : ৫৫-৪০৪৬

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা—গোরাচাঁদ দাশগুপ্ত

* নতুন আদর্শ এবং পরিকল্পনা নিয়ে প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই প্রকাশিত হয়।
* নীট্ আয় দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যয়িত হয়।
* 'বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর লেখা' এবং 'বিদ্যালয়ের খবর' বিভাগ দু'টি আমাদের সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পিত।
* প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকদের রচনায় প্রতিটি সংখ্যা সুসমৃদ্ধ।

বার্ষিক (সডাক) ৩৲, ষাণ্মাসিক (সডাক) ১৷৹, প্রতি সংখ্যা ।৹

অন্যান্য বিষয়ের জন্য কর্মসচিবের সহিত পত্রালাপ করুন।

"সম্পাদক"
শ্রীননীগোপাল দত্ত

'শ্রীচরণেষু' কার্য্যালয়,
৪বি, রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৫

লে—খা—চা—ই

অভিনব কিশোর-মাসিক। ২য় বর্ষ (১৩৬৫—বৈশাখ হইতে)। বার্ষিক সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸৴৹, প্রতি সংখ্যা ।১০, নমুনা বিনা মূল্যে।

শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল, সম্পাদক ; দেবালয়—২৪ পরগণা

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ! আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ৷৹ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১৷৹ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বি.এ

সদ্য প্রকাশিত হল

শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদারের

হাসির টেক্কা

হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরবে। পেট চেপে ধরেও হাসতে হবে। রেবতীভূষণ চিত্রিত। দু রঙে ছাপা। দাম—১'৫০।

হাসির তুবড়ি

হাসির টেক্কাকেও হার মানায়। পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা অধিকর্ত্তা কর্ত্তৃক সমাজ শিক্ষা, সাধারণ পাঠাগার, প্রাইজ লাইব্রেরী ও কিশোরপাঠ্য রূপে অনুমোদিত। শৈল চক্রবর্ত্তী চিত্রিত।
—১'৫০ টাকা।

আশুতোষ লাইব্রেরী—কলিকাতা-১২
এম. সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২
ও অন্যান্য দোকানে পাওয়া যাবে।

কিশোর-কিশোরীদের জন্য

এ দেশ আমার

কিশোর-কিশোরীদের জন্য ভারত-পরিচায়ক গ্রন্থমালা। সদ্য প্রকাশিত প্রথম খণ্ডে সরল ভাষায় ভারতবর্ষের ভূ-প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বহু মানচিত্র ও ডায়াগ্রাম সংবলিত। সম্পাদনা : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ২'৫০।

*

প্রাণী ও প্রকৃতি। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১'৫০
ঘুরে এলাম সুন্দরবন। ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী। ০'৭৫
রংচং। চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ১'০০
গল্প লেখা হ'ল না। চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ১'৫০
লালু-ভুলু। বাণভট্ট। ৩'০০
হারানো ছেলে। তেজেশচন্দ্র সেন। ১'২৫
পুঁথিপুরাণের গল্প। যামিনীকান্ত সোম। ২'০০
দেশবিদেশের রূপকথা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ২'৫০
খুনী দরওয়াজা। বিক্রমাদিত্য। ১'৫০
এবংপুরের টিকটিকি। ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়। ১'০০

*

তোমাদের নিতি স্মরি

সুনির্মল বসু রচিত জীবনী-গ্রন্থমালা। বাঙ্‌লার নব-জাগরণের মন্ত্রদ্রষ্টা পাঁচজন মনীষীর কীর্তিকাহিনী এই গ্রন্থমালায় সংগ্রথিত : রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রত্যেকটি ১'০০

সোনার বাঙ্‌লা

বারোখানি বইয়ের গ্রন্থমালা। বাঙ্‌লা দেশ, বাঙালী জাতি আর বাঙ্‌লার পার্থিব ও মানস সভ্যতার পরিচয়দানের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থমালা পরিকল্পিত। সহজ বর্ণনাভঙ্গি, উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রেরাও পড়ে বুঝবে। অসংখ্য চিত্র। প্রতিটি বই দু' টাকা।

*

ছোট এবং বড়রা পড়ে সমান আনন্দ পাবেন এমন কয়েকটি বিশিষ্ট বই।

জলে-ডাঙায়। সৈয়দ মুজতবা আলি ৩'৫০
নেপোলিয়নের দেশে। দিলীপ মালাকার ২'০০
ডাকটিকিট। অমরেন্দ্রকুমার সেন ১'২৫

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

রামধনু-সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের

লেখা বই

—বিজ্ঞানের গল্প—

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা
আবিষ্কারের গল্প
মহাবিজ্ঞানী নিউটন
*আকাশের গল্প
*বিজ্ঞান বুড়ো

—উপন্যাস—

ধূমকেতু
রাত যখন সাতটা

—বিদেশী বই অবলম্বনে—

দি ব্ল্যাক্ টিউলিপ্
দি ইলিয়াড্
দি অডিসি

—ছোট গল্প—

*জন্মদিনের উপহার
৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের সহযোগে
*গল্পসল্প
*ছুটীর গল্প
*আজব গল্প
*অনেক গল্প

—নাটিকা—

অয়েল পেন্টিং

—যন্ত্রস্থ—

ছোটদের বিশ্বকোষ
(আনুমানিক ১২ খণ্ডে)

* চিহ্নিত বইগুলি বর্তমানে ছাপা নেই

সবার বন্ধু স্বপনবুড়োর বই

স্বপনবুড়োর ঝুলি…
স্বপনবুড়োর মজার গল্প…
স্বপনবুড়োর রকমারী গল্প…
তাল-বেতাল (নাটক)
পালা-পার্ব্বণ-ছড়া-ছন্দ…
কমলা (নৃত্যনাটিকা)…
স্বপনবুড়োর স্বনির্বাচিত গল্প
উড়ন্ত চাকী (উপন্যাস)
প্রেতপুরী (রোমাঞ্চ উপন্যাস)
নরহরি পণ্ডিতের কাহিনী (উপন্যাস)

—নামকরা বইয়ের দোকানেই মিলবে।—

এবার পুজোয় ছড়ার

ছড়াছড়ি

ঈগলের

প্রথম ছড়া

দাম ৩·০০

রাজা মহারাজার ইতিহাসই
শুধু তোমরা জান
এবারে
অশ্বাদের গাড়ী ঘোড়ার
ইতিহাসও জানতে পারবে

গাড়ী ঘোড়ার গল্প

দাম ১·০০

কি চাও শুনতে ?
ছড়া কেবল বলতে ?
বলছি ছড়া !
শিখবে কিন্তু গুণতে।

গুণতে শেখা

ছবি : শ্রী প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়
দাম ১·০০

প্রকাশক :
চণ্ডীচরণ দাস এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
১৫০, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

গৃহিনীরা বলেন—

সবচেয়ে ভাল

লক্ষ্মী ঘি

গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী. কলিকাতা. ফোন-২২-৭২৪৩

Regd. No. C—1641

স্থাপিত – ১৩৩৭ ফোন-৩৫-২৭৭৪
ভারত অয়েল মিলের
আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পতাকা মার্কা
খাঁটী সরিষার তৈল
/২৷৷০,/৫,।৮ সেরা ডাইস্ টীনে,
মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।
প্রোঃ- শ্রীঅমৃত লাল কুমার।
মিল ও অফিস – ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য সডাক ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২ টাকা ২৫ ন. প., প্রতি সংখ্যা ৩৭ ন প.। ভি.পি তে নিলে আরও অতিরিক্ত ৭১ ন. প. লাগে। নমুনার জন্য ৩৯ ন প.র ডাকটিকেট পাঠাতে হয়। বিনামূল্যে নমুনা পাঠানো সম্ভব নয়। ভি. পি তেও নমুনা পাঠানো হয় না।

২। বৈশাখে বছর সুরু, যে কোনও মাসে চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যায়; কিন্তু পত্রিকা নিতে হবে বৈশাখ কিংবা কার্ত্তিক থেকে। তবে এতে অসুবিধা হলে মাঝের সংখ্যাগুলো খুচরা হিসাবে নিয়ে বৈশাখ বা কার্ত্তিক থেকে নিয়মিত ভাবে নেওয়া যেতে পারে।

৩। কোন মাসে পত্রিকা না পেলে ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে তাঁদের উত্তরসহ সেই মাসের মধ্যে আমাদের জানাতে হবে।

৪। পাকিস্তানের গ্রাহকেরা ব্যাঙ্ক মারফৎ (যে সব ভারতীয় ব্যাঙ্কের পাকিস্তানেও শাখা আছে) ড্রাফ্‌ট্‌এ চাঁদা পাঠাতে পারেন। এর নিয়মকানুন ব্যাঙ্কে খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। আমাদের লিখলে আমরা Proforma Invoice পাঠাতে পারি।

৫। গ্রাহকদের সব চিঠিতেই গ্রাহক নং দিতে হবে। চিঠির জবাবের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাকটিকেট দিতে হবে।

৬। লেখা, কপি রেখে, সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। সাধারণ বিভাগে যে কেউ লেখা পাঠাতে পারেন। তা ছাড়া গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখায় উৎসাহ দেবার জন্য একটি পৃথক্ বিভাগও আছে।

৭। বিজ্ঞাপনের হার চিঠি লিখলে জানানো হয়। টাকাকড়ি চিঠিপত্র প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা—
ম্যানেজার, রামধনু; ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫। (টেলিফোন: ৪৮-৩১৮১)

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

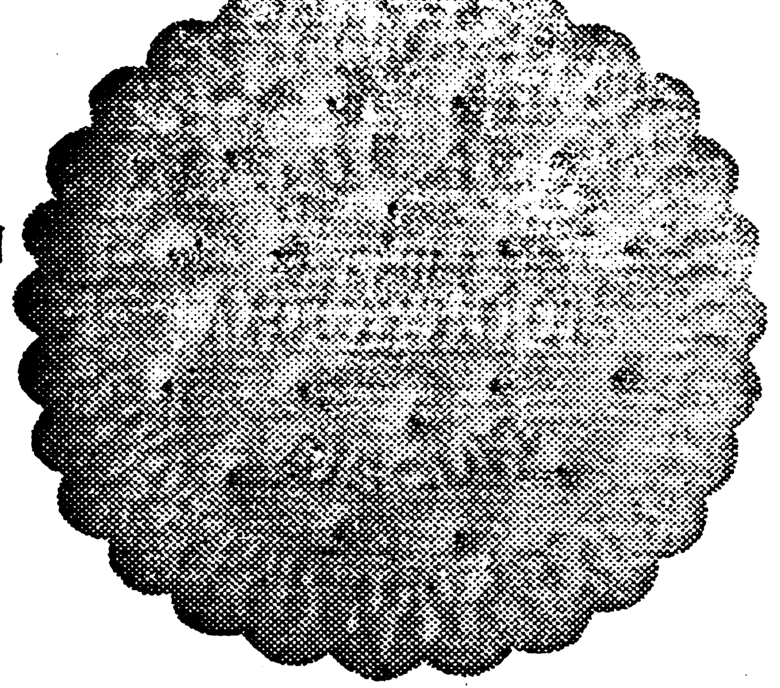

বিজ্ঞাপনের মতামতে
কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে?
স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,
'থিনের' মধ্যে; গুণে, স্বাদে সবার সেরা 'কোলে'

অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,
সবরকমের "কোলে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ

এবার পূজায় নূতন বই

= পূজা বার্ষিকী =

অপরাজিতা

॥ দাম চার টাকা ॥

ঠান দিদির থলে

॥ দাম তিন টাকা ॥

= আশাপূর্ণা দেবীর =

গল্প ভালো আবার বলো

॥ দাম দু' টাকা ॥

= সুনির্মল বসুর =

বরণ ডালা

গল্প ও কবিতা সংকলন

॥ দাম দু' টাকা ॥

= হেমেন্দ্রকুমার রায়ের =

সাজাহানের ময়ূর

(ছোটদের রোমাঞ্চকর উপন্যাস)

॥ দাম দেড় টাকা ॥

দেব সাহিত্য কুটীর···কলিকাতা—৯

রামধনু—

ঝড়ে

শিল্পী শ্রীএস্. বি. পাল চৌধুরীর সৌজন্যে

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩১শ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৬৫ | ৭ম সংখ্যা।

চড়াই

শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত

তোমরা যেন চড়াই,
কিচির মিচির কিচমিচিয়ে
নিত্য কর বড়াই।
একটুখানি হাল্কা ঠোঁটে
একটা খড়ের টুকরো মোটে,—
তাতেই বুঝি পুচ্ছ তুলে
তুচ্ছ কর ধরা-ই!
তোমরা যেন চড়াই।

ভয় কর না মিথ্যে-সাঁচায়,
ভক্তি যে নেই সোনার খাঁচায়,

সকাল বেলার রোদ-ঝলকে
বলছো—"হাসি ছড়াই।"
তোমরা যেন চড়াই।

কল্ কলানো কথার গানে
নাই বা থাকুক কোনই মানে,
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে আছে—
তাই তো বুকে জড়াই ;
তোমরা যেন চড়াই।

আজও মনে পড়ে

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

—পুরাতন ভৃত্য—

রবীন্দ্রনাথের "পুরাতন ভৃত্য" কবিতাটি পড়েছ তো ? তাতে প্রথমেই আছে :

"ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্বোধ অতি ঘোর,
যা কিছু হারায় গিন্নী বলেন — "কেষ্টা বেটাই চোর !"

আমাদের ব্রজেন্দ্র পুরাতন ভৃত্য হলেও চেহারাটা তার ঠিক ভূতের মতন ছিল না, ছিল যাকে বলা যায় চলনসই। স্বভাবটাও একটু সৌখীন ; হপ্তায় দু'দিন করে গায়ে সাবান মাখ্‌ত, চুলে দিত সস্তা দামের সুগন্ধি তেল। আবার হপ্তায় একদিন করে দেখ্‌ত সিনেমা।

একদিন আমরা একখানা ইংরাজী ছবি দেখে এসে গল্প করছিলাম। একটি ছোট ছেলে আর তার আদরের বাচ্চা হরিণের কাহিনী। কী অপূর্ব অভিনয় করেছে ছোট ছেলেটি !— বলাবলি করছিলাম আমরা।

ব্রজেনের কাজ তখন সারা হয়ে গেছে, আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে সে পরম মনোযোগী হয়ে সব শুন্‌ছিল। কিন্তু তখন কি আর আমরা জানতুম ঐ শোনার ফলে কি কাণ্ড করবে সে ? সে রাতে আমাদের বিশেষ অনুরোধ করে একটু তাড়াতাড়ি খাইয়ে-দাইয়ে, কাজকর্ম সেরে, সে রাত ন'টার শোতে সিনেমা দেখে এলো—আমাদের দেখা সেই ছবি। আমাদের আলোচনা শুনে সে-ছবি দেখ্‌বার লোভ সাম্‌লাতে পারে নি ব্রজেন্দ্র।

পরদিন ভোরবেলা ব্রজেনের খুশীর আর অন্ত নেই। বল্‌লে, "দেখে এলাম বাবু ! খাসা ছবি হয়েছে, সত্যি।"

শুধালাম, "কোন্ ছবি দেখে এসেছ ব্রজেন ?"

একগাল হেসে ব্রজেন বললে, "আজ্ঞে ঐ যে ছবি আপনারা দেখে এয়েছেন— সেই বাচ্চা ছেলে আর তার হরিণের গপ্‌পো।"

আমাদের জানা ছিল ব্রজেন দেখে বনজঙ্গলের ছবি, অ্যাড্‌ভেঞ্চারের ছবি, পৌরাণিক ছবি। এ ছবি তো তার ভালো লাগ্‌বার কথা নয় ! এ ছবিতে ঠাকুর-দেবতা নেই, গানের বাহার নেই, লোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার নেই, তবু ব্রজেন হাসিমুখে বল্‌ছে, "খাসা হয়েছে" !!!

বল্‌লাম, "খুব ভাল লেগেছে বুঝি তোমার ?"

ব্রজেন বল্‌লে, "আজ্ঞে। সায়েবি কথাবাত্রা তো আর আমি বুঝি নে, কিন্তু কি অ্যাক্‌টোই যে দেখ্‌লাম বাবু ! যেমন ঐ দশ বছরের ছেলে, তেম্নি হরিণের বাচ্চা।"

"ছবিটার ভেতর তোমার সবচেয়ে বেশী কি ভালো লাগ্‌ল বলো তো ?" শুধালাম কৌতূহলী হয়ে।

ব্রজেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলে উঠ্‌ল, "এই এতটুকুন দশ বছরের ছাওয়াল, কি সুন্দর ইংলিশ কয় !!!" মাত্র দশ বছর বয়সে ছেলেটি ইংরাজি ভাষায় কথা কয়, যা ব্রজেন পঁচিশ বছর পেরিয়েও পারে না, ব্যাপারটা আশ্চর্য্য বই কি ! ইংরাজি না-জানা ব্রজেন তাই ছেলেটির অদ্ভুত ইংরাজি-প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে।

এই আমাদের ব্রজেন। সেবারে কল্‌কাতা শহরে বসন্ত রোগের হিড়িক শুরু হবে ব'লে করপোরেশন থেকে শহরের সকলকে অনুরোধ করা হ'ল টিকা নিতে। আমরা বাড়ীশুদ্ধ সবাই নিয়ে নিলাম, কিন্তু ব্রজেনকে কিছুতেই রাজী করা গেল না। কাটা-ছেঁড়া, ফোঁড়াফুঁড়িকে সে ভারী ভয় করে।

যতই আমরা জোর করি ততই সে মরিয়া হয়ে বলে, "না বাবু, শরীরে ওসব

ফোঁড়ন-ফাড়ন নেবো না আমি। নিলেই আমি মরে যাবো, এ আমার কুষ্ঠীতে লেখা আছে বাবু।"

কোথা থেকে মা শীতলার আশীর্বাদী মাছলি এনে সে কণ্ঠে ধারণ করলে। বোধ হয় ভাবলে মা শীতলা সহায় থাকলে বসন্ত তার ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষতে পারবে না।

কয়েক দিন বাদে গায়ের ব্যথায় বাবা-মাকে ডাকাডাকি শুরু করে দিল আমাদের ব্রজেন। ডাকাডাকির যখন বড় বাড়াবাড়ি, তখন আর স্থির থাকা গেল না. এলেন ডাক্তার। ব্রজেনের সারা গায়ের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস-এর মধ্যস্থতায়; তারপর বাইরে নিভৃতে এসে বললেন, মায়ের দয়া হয়েছে প্রবল ভাবে। তু'-চার দিনের ভেতর সারা গায়ে গুটির পর গুটি স্পষ্ট হয়ে উঠল। তখন হাসপাতালে পাঠানো ছাড়া আর উপায় রইল না। খবর দেওয়া হল; অ্যামবুল্যান্স গাড়ী এসে ব্রজেনকে নিয়ে গেল ট্যাংরার বসন্ত হাসপাতালে। সেখানে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে বসন্ত-রোগী যাচ্ছে. হাসপাতালের 'হাউস ফুল' অবস্থা। জানা গেল ব্রজেন ঠাঁই পেয়েছে সাতান্ন নম্বর বিছানায়—বেড্‌ নাম্বার ফিফ্‌টিসেভেন।

বাড়ীশুদ্ধ সবারই মন খারাপ। পুরাতন ভৃত্য কালব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে সরকারী হাসপাতালে রোগীদের ভিড়ের ভেতর পড়ে আছে, আর ফিরে আসবে কিনা কে জানে? কারণ সেবার বসন্ত রোগীদের মৃত্যুহারটা ছিল ভয়ানক রকম বেশী।

রোজ একবার খবর নিয়ে আসবার চেষ্টা হয়েছিল প্রথম প্রথম। কিন্তু খবর পাওয়াও এক হাঙ্গামার ব্যাপার। কেমন আছে সাতান্ন নম্বরের রোগী? এই প্রশ্ন। রোগীর নামের চাইতে নম্বরটাই বেশী দরকার খবর জান্‌তে গেলে। খবর জানাবার বিভাগ থেকে যা বললে তার ভাবটা এই রকম: "চাকরের জন্যে রোজ রোজ এত মাথাব্যথা কেন মশাই? চার-পাঁচদিন অন্তর কিংবা হপ্তায় একবার এসে খবর নিয়ে যাবেন।"

ভাবলাম এদের দোষ দেওয়া বৃথা। পুরাতন ভৃত্যের মর্ম এরা কি বুঝবে? তা ছাড়া রোজ তু'বেলা রোগীর ভিড় দেখে দেখে এদের মনের নরম জায়গাগুলোও পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে।

এরপর একদিন খবর নিতে গিয়ে জানা গেল সাতান্ন নম্বর বেডের রোগী গত কাল মারা গেছে এবং তার মৃতদেহ সৎকার করা হয়ে গেছে। গত কাল এ ছাড়া আরো চারটী রোগী মারা গেছে, আজও জনা পাঁচেক মরি মরি করছে. এ খবরও পাওয়া গেল।

ব্রজেনের মৃত্যুতে আমাদের সবার মনেই বিষাদ। একে পুরাতন ভৃত্য, তায় বড় সরল, নিরীহ মানুষ ছিল ব্রজেন।

এইবারে তোমাদের প্রশ্ন করি: তোমরা কেউ কোনো সন্ধ্যাবেলা নিরালায় একা ঘরে বসে ভূত দেখেছ?

হয় তো দেখেছ, অথবা হয় তো দেখ নি। যাক্ সে কথা, আমার গল্প (সত্য) শোনো। উক্ত ঘটনার কয়েকদিন বাদে এক সন্ধ্যাবেলা একতলার ঘরে বসে পরীক্ষার পড়া পড়ছি। বাড়ীতে আমি একা; বাড়ীর অন্য সবাই গেছেন একটা সামাজিক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। পরদিন পরীক্ষা বলে আমি যাই নি। রাত ন'টার মধ্যেই সবাই ফিরে আসবেন।

টেবিলের ওপর বই রেখে পড়বার ভান করছিলাম। একা বাড়ীতে—তোমাদের কানে কানে বলি—গা ছম্ ছম্ করছিল; সে অবস্থায় কখনও পড়া হয়? আমার সামনে অল্প দূরে খোলা দরজা, ওপাশে ছোট্ট সিমেণ্টে বাঁধানো উঠোন। উঠোনের ওপাশে দোতলায় উঠ্‌বার সিঁড়ি।

আমার ঘর থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে কিছু দূর গিয়ে বাড়ী থেকে রাস্তায় বেরোবার সদর দরজা, আমার সেই ঘরের ভেতর থেকে সেটা দেখা যায় না। সদর দরজা ইচ্ছা করেই বন্ধ করি নি, ভেজিয়ে রেখেছিলাম মাত্র। কারণ আটটা-ন'টার সময় তো আবার খুলতেই হবে, তাহ'লে আর বন্ধ করা কেন?

গা ছম্ ছম্ করছিল, আর মনে মনে ভাবছিলাম, কই, বাড়ীর সবাই যখন ওপরে থাকেন তখন তো একতলার এই ঘরে একা থাকতে গা ছম্ ছম্ করে না! কিন্তু ফাঁকা বাড়ীতে গা ছম্ ছম্ করছে কেন?

সহসা সারা দেহে একটা শিহরণ বোধ করলাম। কার যেন রহস্যময় পদধ্বনি শুনছি—থপ্...থপ্...থপ্...থপ্...থপ্! কে যেন এগিয়ে আস্‌ছে আমার ঘরের দরজার দিকে। মনকে বোঝবার চেষ্টা করলাম এ আমার কানের ভুল।

কিন্তু ভুল নয়। পদধ্বনি এসে থাম্‌ল আমার সামনের দরজায়। আতঙ্কে শিউরে উঠে দেখ্‌লাম চৌকাঠের ওপাশে দাঁড়িয়ে···পুরাতন ভৃত্য ব্রজেনের ভূত!!! সারা মুখে বসন্তের দাগ. নিদারুণ বসন্তের অত্যাচারে শরীর বেজায় রোগা হয়ে গেছে। সামনে ঝুঁকে নমস্কার করে নাকী সুরে ব্রজেনের ভূত বল্‌লে, "বাঁবুঁ, আঁমি এঁলাম।"

চকিতে মনে পড়ল। চীৎকার করে কোনো লাভ হবে না, বাড়ীতে আমি ছাড়া কেউ নেই। আর ভয় পেয়েছি টের পেলেই ভূত পেয়ে বস্‌বে। কে জানে ভূত আবার অন্তর্যামী কিনা!

ব্রজেন না এলেই ভালো হ'ত; কিন্তু এসে যখন পড়েছে তখন কি কৌশলে তাকে তাড়ানো যায়?

ব্রজেনের ভূত বল্‌লে, তেমনি নাকী সুরে,—"আঁজ ছুঁটী পেঁয়ে এঁলাম।"

তবে কি পরলোকে গিয়ে অবধি ব্রজেন আসি আসি কর্‌ছিল? পরলোকের ম্যানেজার ছুটী দেয় নি? আজ কোনো রকমে ছুটী আদায় করে একবার দেখা করে যেতে এসেছে? মরেও ব্রজেন পুরানো মনিব-বাড়ীর মায়া একেবারে কাটাতে পারে নি ভেবে এই গা-ছম্‌-ছম্‌-করানো ভয়ের ভেতরও আমার দুটী চোখ ছলছলিয়ে উঠ্‌ল।

কথা কইবার মত অবস্থা ছিল না, কিন্তু হঠাৎ মনে হ'ল এখনও যদি বোবা হয়ে থাকি তা'হ'লে ব্রজেনের ভূত ভাববে আমি ভয় পেয়েছি আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পেয়ে বসবে। তাই প্রাণের দায়ে মরিয়া হয়ে সাহস সংগ্রহ করে ঢোক গিলে বল্‌লাম,—

"ছ্‌ ছ্‌ ছুটি! ক্‌ ক্‌ কে দিলে?"

ব্রজেনের ভূত বল্‌লে, "হাঁস্‌পাতালের বাঁবুরা। আঁজ বিঁকেল বেঁলা।"

সে কি! সেই কবে মরে ভূত হয়েছে ব্রজেন, তাকে হাস্‌পাতালের বাবুরা অ্যাদ্দিন বাদে ছুটী দেয় কি করে? তবে কি কোথাও কোনো ভুল হয়েছে? মরে ভূত হয় নি ব্রজেন? তাকিয়ে দেখ্‌লাম ব্রজেনের শরীরের ভেতর দিয়ে কিছু দেখা যাচ্ছে না। ভূতের শরীর স্বচ্ছ হয় বলে শুনেছিলাম, গায়ে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌ল যেন। আমার সামনে দাঁড়িয়ে ব্রজেনের ভূত নয়, ব্রজেনই। জলজ্যান্ত না হলেও আধজ্যান্ত ব্রজেন। অসুখে ভুগেই হয়তো গলার স্বরটা একটু নাকী হয়ে গেছে, নাকি ও আমারই ভয়জাত ভুল?

তখন বললাম, "বোসো ব্রজেন।"

ব্রজেন বসে পড়্‌ল মেঝের ওপর। ওর মুখে শুনলাম সব কাহিনী। সাতান্ন নম্বর বেডের রোগী সত্যিই মারা গিয়েছিল; কিন্তু সে বেচারা অন্য লোক, ব্রজেন নয়। একটু ভালোর দিকে যেতে ব্রজেনকে বেড থেকে নামিয়ে মেঝের ওপর জায়গা দেওয়া হয়েছিল, আর তার ছেড়ে-আসা সাতান্ন নম্বর বিছানায় একজন খারাপ অবস্থার রোগীকে রাখা হয়েছিল। মারা গিয়েছিল সেই রোগী।

সেণ্ট হেলেনায় বন্দী নেপোলিয়ন

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত

মহাবীর নেপোলিয়ন ওয়াটালু'র যুদ্ধে পরাজিত হলে কি ভাবে তাঁকে সেণ্ট হেলেনায় নির্বাসিত করা হ'ল সে গল্প তোমরা শুনেছ। নেপোলিয়নের সেণ্ট হেলেনায় প্রথম আগমনের কাহিনীও তোমাদের এর আগে বলেছি। ওখানকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেণ্ট ব্যালকম্বির বারো বছরের মেয়ে বেটসির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথাও হয়তো তোমাদের মনে আছে।

মানুষের মনের উপর কখন যে কিসের প্রতিক্রিয়া হয় তা কেউ বলতে পারে না।

মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টি—বিশ্বত্রাস নেপোলিয়ন—তাঁর মধ্যে এ কিসের প্রতিক্রিয়া? এ কি পরিবর্ত্তন তাঁর?

ইংরেজ মিলিটারী অফিসার ককবার্ণ এবং বারট্রাণ্ড দেখলেন বারো বছরের মেয়ে বেটসির সঙ্গে চোর চোর খেলা করছেন নেপোলিয়ন। কে কাকে ধরতে পারে। একটা ঝোপের আড়ালে লুকোলো বেটসি। তার ভেতর যেতে পারলেন না নেপোলিয়ন। হাততালি দিয়ে হেসে গুপ্তস্থান থেকে আবির্ভূত হোল বেটসি। হেরে গেলেন বোনাপার্টি।

বিশ্বত্রাস বোনাপার্টি,—ফ্রান্স, ইটালি, অষ্ট্রীয়া, হল্যাণ্ড, রাশিয়াকে যিনি বিধ্বস্ত ও পদদলিত করেছেন,—কিছুদিন আগেও কেউ কি কল্পনা করতে পেরেছিল তাঁর আজকের এই ক্রীড়াবিলাস?

আর একদিনকার কথা। গাছতলায় চেয়ারে বসে নেপোলিয়ন কি একখানা বই পড়ছেন। বেটসি এবং তার কুকুর টমী কাছ দিয়ে চলে গেল, সেদিকে তাকালেন না ভূতপূর্ব সম্রাট্‌। হাততালি দিলে বেটসি, কিন্তু নির্বিকার রইলেন নেপোলিয়ন। বোধ হয় অভিমান হোল বেটসির।

কিন্তু কুকুর টমী! সেও কি বুঝতে পারলে বেটসির মনের কথা? ছুটে গিয়ে নেপোলিয়নের হাঁটুর উপর দুই পা তুলে দাঁড়ালো। তুষারশুভ্র তাঁর প্যাণ্টের উপর মুদ্রিত হয়ে গেল টমীর কাদামাখা দুটো পায়ের ছাপ।

সিংহ এবার গর্জ্জন করে উঠলেন। ভয়ে টমী পালালো, বেটসিও। উচ্চকণ্ঠে কি বলে উঠলেন মহাবীর। ছুটে এলেন দোকান থেকে ব্যালকম্বি,—বেটসির বাবা। দেখলেন সাদা প্যাণ্টের উপর দুটো কাদার ছাপ। গুড় গুড় করে উঠলো তাঁর বুক। এ ঔদ্ধত্য তো কিছুদিন আগেও স্বয়ং রোম-সম্রাট্‌ বা ইংলণ্ডেশ্বরেরও হতে পারতো না!

উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে নেপোলিয়ন বললেন, শাস্তি দেব তোমার মেয়েকে। ডাকো তাকে।

এগিয়ে গেলেন নেপোলিয়ন। ব্যালকম্বির দোকানের মাটির তলায় একটা গুদাম-ঘর ছিল, তাকে বলতো সেলার (Cellar)। হুকুম হোল, ওই ঘরে ওকে বন্দী থাকতে হবে।

সে হুকুম অগ্রাহ্য করার সাধ্য কারও নেই। বেটসি এসে দাঁড়ালো। দুঃখপ্রকাশ বা ক্ষমা প্রার্থনা কিছুই করলে না। অভিমানে তার মুখ এবং ঠোঁট দুটো উঠেছে ফুলে। চোখে জল নেই একফোঁটাও।

নিয়ে যাওয়া হোল তাকে সেই ভূগর্ভের গুদাম-ঘরে। গম্ভীর ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন নেপোলিয়ন রাস্তার উপরে। একজন ভৃত্য এসে কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে ট্রাউজারটা এখনই বদল করা হবে কি না।

শুধু একটা 'না' সিংহগর্জ্জনের মতো বেরিয়ে এলো তাঁর কণ্ঠ থেকে। ভীত পরিচারক অদৃশ্য হয়ে গেল।

হঠাৎ ঝন্ করে একটা আওয়াজ শোনা গেল সেলারের ভিতর থেকে। ঘরটার একটা জানালা ছিল রাস্তার রুজু রুজু—তা দিয়ে দেখতে পেলেন ব্যালকম্বি—একটা বোতলের চূর্ণাংশ ঘরময় ছড়িয়ে। পরমুহূর্ত্তেই আবার তেমনি শব্দ।

এবার কারণটা বোঝা গেল। একটা মস্ত বড় ইঁদুর এগিয়ে আসছিল, তাকেই বধ করবার উদ্দেশ্যে নিক্ষেপিত হয়েছে ওই বোতলাস্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে আবার শোনা গেল 'ঝন্'। ইঁদুরটা নিরাপদেই পালালো, তিনটে বোতলের একটারও আঘাত তাকে স্পর্শ করতে পারে নি।

অত্যন্ত বিনীত ভাবে ব্যালকম্বি ব্যাপারটা নিবেদন করলেন সম্রাটের কাছে। এই ভাবে যদি বোতলের পর বোতল চুরমার হয়ে যায়, তা হলে তার ছোট দোকানের যা ক্ষতি হবে তা বলবার নয়। অতএব হে সম্রাট—

এবার ঠোঁটে হাসির রেখা দেখা গেল নেপোলিয়নের। হুকুম দিলেন, আচ্ছা, নিয়ে এসো তাকে।

মুক্তি পেল বেটসি। কিন্তু সম্রাটের সামনে এসে তেমনি মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

এক পা এক পা করে এগিয়ে গেলেন নেপোলিয়ন। তার হাতখানি ধরলেন। ছুড়ে ফেলে দিল সে সেই হাত। সবাই উঠলো শিউরে। কি সর্ব্বনাশ! নেপোলিয়ন বোনাপার্টির হাত—যা স্পর্শ করতে পারলে ইয়ুরোপের বহু নরপতি কৃতার্থ বোধ করতেন, তাই কিনা অবজ্ঞায় ছুড়ে ফেলে দিল সেণ্ট হেলেনার একটা ছোট্ট দোকানদারের এই বারো বছরের মেয়েটা! ব্যালকম্বিও কেঁপে উঠলেন। ভাবলেন এর প্রায়শ্চিত্ত বুঝি তাঁকেই করতে হয়!

কিন্তু বোনাপার্টি দু' হাত দিয়ে বেটসিকে তুলে ধরলেন তাঁর বুকের ওপরে। এইবার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে অবোধ মেয়েটা।

আট দশ দিনের মধ্যেই লংউড বাড়ীটার মেরামতের কাজ শেষ হয়ে গেল। তাঁবু এইবার তুলে ফেলা হবে। সম্রাট্‌কে এবার যেতে হবে পাহাড়ের উপরে তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট বাড়ী লংউডএ।

কেমন যেন মনমরা হয়ে গেল বেটসি। অবশ্য লংউড বাড়ীতে যাওয়া কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু তার পক্ষে একলা সেখানে যাওয়া অসুবিধার কথা। পাহাড়ের উপর বাড়ীখানা দেখতে পাওয়া যায় অনেক দূর থেকে,—এমন কি ব্যালকম্বির দোকান থেকেও। কিন্তু তবু ব্যবধানটা বড় বেশী বোধ হয়।

বাপের সঙ্গে মাঝে মাঝে যেতো বেটসি। এই মেয়েটিকে দেখলেই সম্রাট্ যেন ফিরে পেতেন তাঁর নিজের হারিয়ে-যাওয়া শৈশব। বেটসির সঙ্গে খেলা করতেন যেন ছেলেমানুষের মত। জেনা, অষ্টারলিট্‌জ, ওয়াটারলুর স্মৃতি অবলুপ্ত হয়ে যেতো মনের ভেতর থেকে।

এমনি করে কাটতে লাগলো মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—দীর্ঘ সাত বছর। বারো বছরের বেটসি ক্রমে উনিশ বছরের হোল।

সেই সময় একদিন পৃথিবীময় ঘোষিত হোল বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মৃত্যুসংবাদ।

বেটসিদের ইতিহাসও বড় বিচিত্র। তার বাবা সেই সময়ে সেণ্ট হেলেনার দোকান তুলে দিয়ে চলে গেলেন সুদূর অষ্ট্রেলিয়া। সেখানেই একদিন বেটসির বিয়ে হোল মিষ্টার আরবেলের সঙ্গে। তার পরে সে হোল একটি কন্যার জননী। ১৮৩৫ সালে আরবেলের মৃত্যু হোল। বেটসি অর্থাৎ মিসেস আরবেল তখন তাঁর মেয়েকে নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া থেকে এলেন ইংলণ্ডে।

এই সময়ে ফরাসী দেশবাসীরা প্রচার করলে যে বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়নের দেহাবশেষ তুলে আনা হবে সেণ্ট হেলেনা থেকে এবং মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত করা হবে প্যারী সহরে। এই উপলক্ষে সারা ফ্রান্সময় উৎসবের বন্যা দেখা দিল। সেই সময় মিসেস আরবেল প্রকাশ করলেন তাঁর স্মৃতিকথা। বইখানা খুবই জনপ্রিয় হোল, কয়েকটা সংস্করণও পর পর ছাপা হয়ে গেল, কিন্তু প্রকাশকের কৃপায় বেটসির অর্থলাভ হোল সামান্যই।

অর্থাভাবে পড়ে, অবশেষে একদিন বেটসি, অর্থাৎ মিসেস আরবেল হাজির হলেন প্যারীতে সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়নের দরবারে। সম্রাজ্ঞী ইউজিনির পার্শ্বচরী হওয়ার জন্য আবেদন জানালেন, কিন্তু সে আবেদন মঞ্জুর হোল না। খুব সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত ঘরের মহিলা না হলে সাম্রাজ্ঞীর পার্শ্বচরী হওয়া সম্ভব নয়। তবে তৃতীয় নেপোলিয়ন বেশ ভাল করে শুনলেন তাঁর সমস্ত কাহিনী এবং আফ্রিকার আলজেরিয়ায় তাঁর জন্য খানিকটা জায়গীরের ব্যবস্থা করে দিলেন।

বেটসি—এলিজাবেথ বা মিসেস আরবেল পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরলোকে চলে গিয়েছেন ১৮৭২ সালে।

পঞ্চায়ুধ কুমার

শ্রীজয়দেব রায়

বোধিসত্ত্ব একবার বারাণসীর রাজার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। দৈবজ্ঞেরা কোষ্ঠী গণনা ক'রে বললেন যে এই পুত্র 'খড়্‌গ, শক্তি, ধনু, পরশু এবং চর্ম' এই পাঁচটি আয়ুধের অর্থাৎ অস্ত্রের অধিকারী হয়ে উত্তরকালে প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করবেন। তাঁদের নির্দেশানুসারে পুত্রের নামকরণ করা হ'ল 'পঞ্চায়ুধ কুমার'।

কালে কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে তাঁকে বিদ্যার্জনের জন্য তক্ষশিলায় প্রেরণ করা

হ'ল। পঞ্চায়ুধ কুমার সেখানে পঞ্চায়ুধে জ্ঞান অর্জন ক'রে পাঁচটি আয়ুধ লাভ করলেন। বিদ্যাচর্চা সমাপ্ত হ'লে কুমার পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা করলেন।

পথে যেতে এক নিবিড় অরণ্য পড়ে। সেই অরণ্যে শ্লেষলোম নামে এক দানব বাস করত। শ্লেষলোমের আকৃতি ছিল বিশেষ ভীতিজনক। তার শরীর তালগাছের মতো দীর্ঘ, মস্তক একটি চিলকোঠার মতো, চোখ দুটিও গামলার মতো. উপরের দাঁতগুলো মূলোর মতো, মুখ বাজপাখীর মুখের মতো, উদর নানা বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত, হাত ও পা নীল রঙের।

পথচারী পথিকেরা কুমারকে নিষেধ করল—'এই বনে প্রবেশ করা যুক্তিসঙ্গত নয়, আপনি ফিরে যান।'

পঞ্চায়ুধ কুমার সদর্পে বললেন—'আরে, আমার কাছে যতক্ষণ অস্ত্র আছে ততক্ষণ আমি কাউকেই ডরাই না।'

বনের মধ্যে প্রবেশ করার অল্পক্ষণ পরেই দানব তাঁকে তাড়া করল। কুমার দেখলেন, দানবের সর্বাঙ্গ লোমাবৃত, কোন অস্ত্রই সেই নিবিড় লোমরাজি ভেদ করে তার দেহে বিদ্ধ হওয়ার সম্ভবনা নেই।

দানব বল্‌ল—'ওহে, এই বনে প্রবেশ ক'রে তুমি আমার ভক্ষ্য হয়েছ।'

কুমার বললেন 'আমি বিষাক্ত শর মেরে তোমাকে এখনই সংহার করছি।'

এই ব'লে কুমার এক এক ক'রে ৫০টি শর নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু প্রত্যেকটি শরই দৈত্যের লোমে আটকিয়ে ঝুলতে লাগল। দানব একবার গা ঝাড়া দিয়ে সকল বাণ মাটিতে ফেলে দিল।

কুমার তখন একে একে মুষল, মুদ্গর, অসি, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলেন, কিন্তু কোন অস্ত্রই সেই নিবিড় লোম ভেদ করতে পারল না। কুমার তখন ব্যাকুল হয়ে বললেন—'অস্ত্র দিয়ে তোকে মারতে পারলাম না, তবে দৈহিক বল দিয়ে তোকে শেষ কর্‌ব।'

এই ব'লে তিনি দক্ষিণ হস্ত দিয়ে দানবকে মারতে গেলেন। দক্ষিণ হস্ত তার দেহে আটকে গেল। এবার বাম হস্ত প্রয়োগ করলেন, বাম হস্তও লোমে আবদ্ধ হ'ল। পদদ্বয় দিয়ে আঘাত করলেন, মস্তক দিয়ে আঘাত করলেন, পা এবং মাথা লোমজালে আবদ্ধ হ'ল। এই ভাবে পঞ্চায়ুধ আবদ্ধ হয়ে দানবের দেহে ঝুলতে লাগলেন।

এদিকে তখন দানব মনে মনে চিন্তা করছে—এ লোকটি দেখছি অসমসাহসী, এমন লোককে খাওয়া কি ঠিক হবে? হজম করতে পার্‌ব কি?

সে কুমারকে বল্‌ল—'তোর কি মরবার ভয় নেই? এখনই যে তোকে খেয়ে ফেল্‌ব!'

কুমার সদর্পে বললেন—'একবার যখন জন্মেছি তখন আমাকে মরতেই হবে। সে জন্য ভয় কি? তবে বাপু, তুমি আমাকে খেয়ে হজম করতে পারবে না।'

বুদ্ধিমান্ কুমার দানবের মন বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি তাই আবার বললেন—'এতক্ষণ তোমাকে যে সব অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছি সে সব বাইরের অস্ত্র. এগুলো তোমার দেহে বিদ্ধ হ'ল না। কিন্তু আমার দেহের ভিতরে যে মহান্ অস্ত্রটি আছে, সেই বজ্রায়ুধে তোমার মরণ হবে।'

কুমার মনে মনে তাঁর জ্ঞানরূপ হৃদয়কে আয়ুধ ব'লে গণ্য করছিলেন। কিন্তু দৈত্য মনে করল, বোধ হয় সত্য সত্যই তাঁর দেহে আরও কোনও গোপন অস্ত্র লুকানো আছে। সে আপন মনে বলল—একে ছেড়ে দেওয়াই ভাল, এর মাংস আমি হজম করতে পারব না।

শ্লেষলোম দানব কুমারকে ছেড়ে দিয়ে বল্‌ল—'যান, আপনি মশাই চলেই যান।'

এবার কুমার আর শ্লেষলোমকে ছাড়তে চাইলেন না। তিনি পঞ্চশীলের মহত্ত্ব ঘোষণা ক'রে বললেন—'হে দানব, আমি তো মুক্তি পেলাম, কিন্তু তুমি কি ক'রে এই পাপপঙ্ক থেকে মুক্তি পাবে? হিংসার সমান পাপ নেই, তুমি হিংসাদ্বেষ ত্যাগ ক'রে দেবচরিত্র লাভ করো।'

দানব বল্‌ল—'সত্যিই তো! তবে তাই হোক। আজ থেকে আমি প্রাণিহিংসা ত্যাগ করলাম। তুমি আজ থেকে আমার পরম বন্ধু হ'লে।'

অধ্যাপক জোলিও কুরীর আবিষ্কার

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

ইতিপূর্বে তোমাদের বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী জোলিও কুরীর কথা ও সম্প্রতি তাঁর পরলোকগমনের কথা বলেছিলাম। এবারে তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে কিছু বলি, শোন।

তোমরা হয়তো জান, পদার্থপরমাণু ইলেক্ট্রন-প্রোটন-নিউট্রন দিয়ে তৈরী। পরমাণুর মোটামুটি গঠনবিধি এই রকম : এর ভারী অংশটির নাম নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীন। এখানে রয়েছে প্রোটন ও নিউট্রন—বাইরের অংশটায় অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের চারদিকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ইলেকট্রন প্রচণ্ড বেগে অনবরত ঘুরে বেড়ায়। কেন্দ্রীনে প্রোটন-নিউট্রনের সংখ্যা ও বাইরে ইলেকট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন হয় বলেই আমরা ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু পেয়ে থাকি। পৃথিবীতে মৌলিক বা আদি পদার্থ রয়েছে মোটের উপর ৯২টি ; আজকাল আবার এ সংখ্যা এক শ'র উপরে উঠেছে। হাইড্রোজেন নামে যে গ্যাসটি রয়েছে তার নিউক্লিয়াসে রয়েছে একটি মাত্র প্রোটন, আর বাইরে ঘুরছে একটি মাত্র ইলেকট্রন। হাইড্রোজেনই হ'ল একমাত্র পরমাণু যার নিউক্লিয়াসে কোন নিউট্রন নেই। হাইড্রোজনের পরমাণবিক ভর এক। হিলিয়াম গ্যাসটির কেন্দ্রীনে রয়েছে ২টি প্রোটন ও ২টি নিউট্রন, আর বাইরে ঘুরছে ২টি ইলেকট্রন। এমনি ভাবে হালকা বা ভারী পদার্থের পরমাণুর গঠনবিধি আমরা পেতে পারি। কেন্দ্রীনে যে প্রোটন-নিউট্রন রয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে কঠিন বাঁধন, কাজেই এ বাঁধনযুক্ত নিউট্রন-প্রোটনকে আলাদা করা খুবই শক্ত ব্যাপার।

যে ৯২টি মৌলিক পদার্থের কথা উল্লেখ করেছি তাদের মধ্যে আবার কয়েকটি ধাতু আছে যা থেকে অনবরত আলফা-রশ্মি, বিটা-রশ্মি ও গামা-রশ্মি বেরোয়। একে বলে তেজস্ক্রিয়া। এমনি তেজস্ক্রিয়ার ব্যাপারটা চলতে থাকে কোটি কোটি বছর ধরে। ফলে প্রাকৃতিক নিয়মেই একই তেজস্ক্রিয় পদার্থ অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়। তারপর একেবারে শেষে সাধারণ সীসায় এসে পৌঁছায়। তেজস্ক্রিয়া ব্যাপারটা প্রাকৃতিক নানা রূপ পরিবর্ত্তনের উপর একদম নির্ভর করে না। পণ্ডিতেরা দেখলেন, এই যে তেজস্ক্রিয়া ব্যাপারটা ঘটছে এটা হ'ল কেন্দ্রীনের ধর্ম—বাইরে থেকে এর তো কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব নয় ! আগেই বলেছি, কেন্দ্রীনে ভীষণ বাঁধন। কিন্তু এ বাঁধন মুক্ত করে কেন্দ্রীনকে কি কোন প্রকারে ভাঙ্গা যাবে না ?

বিজ্ঞানীরা কোন বাধা দেখে বসে থাকবার লোক ন'ন। নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীন ভাঙ্গার চেষ্টা চলতে লাগল নানা দেশে—নানা গবেষণাগারে। বিজ্ঞানীরা খুঁজতে

লাগলেন উপযুক্ত অস্ত্র—যা দিয়ে পরমাণু-কেন্দ্রীন ভাঙ্গা যাবে। সফলতা এল ১৯১৯ সালে। লর্ড রাদারফোর্ড নাইট্রোজেন গ্যাসের কেন্দ্রীন ভাঙতে সমর্থ হলেন। অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হ'ল আলফা-রশ্মি। তারপর আস্তে আস্তে বোরোন, ফ্লুরিন, সোডিয়াম, এলুমিনিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতির কেন্দ্রীন ভাঙ্গা হয়ে গেল। সব ক্ষেত্রেই অস্ত্র ঐ আলফা-কণিকা !

বিজ্ঞানীরা যে খুব খুসী হলেন তা নয়। তেজস্ক্রিয় ধাতু থেকে পাওয়া যায় আলফা-কণিকা। কিন্তু তেজস্ক্রিয় ধাতুর পরিমাণ পৃথিবীতে খুব বেশী নয়। তা হ'লে ? না, একমাত্র আলফা-কণিকার উপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে কি ? খোঁজ অন্য অস্ত্র।

১৯৩৪ সাল। প্যারিসে ফ্রেডারিক জোলিও ও আইরিন কুরী একসঙ্গে কাজ করছিলেন এ ব্যাপার নিয়েই ; অর্থাৎ তাঁরাও খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন উপযুক্ত একটি অস্ত্র। পোলোনিয়াম একটি তেজস্ক্রিয় ধাতু। অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থের মতই এ থেকে বেরোয় আলফা-রশ্মি। কিন্তু মজার ব্যাপার, এর সঙ্গে বিটা বা গামা-রশ্মি মেশান থাকে না। কুরী দম্পতি এই আলফা-কণিকা দিয়ে এলুমিনিয়াম কেন্দ্রীনে আঘাত করতে লাগলেন। তাঁরা দেখলেন, আলফা-কণিকা বন্ধ করে দিলেও এলুমিনিয়াম থেকে একটা রশ্মি বেরোচ্ছে। অবশ্য রশ্মিটা আস্তে আস্তে কমে আসে। কুরী দম্পতি ভাবলেন, এলুমিনিয়াম কি তেজস্ক্রিয় হয়ে দাঁড়াল ? নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে লাগল। তাঁরা প্রমাণ করলেন এলুমিনিয়াম বাস্তবিকই তেজস্ক্রিয় হয়ে গেছে। এমনি ভাবে বোরোন, ম্যাগনেসিয়াম নিয়ে পরীক্ষা করা হ'ল ; দেখা গেল এরা সকলেই সাময়িক ভাবে তেজস্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে। একেই বলে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া। এই আবিষ্কারের জন্যেই কুরী দম্পতি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

এই নতুন আবিষ্কারের জন্যে আসল ব্যাপার কিন্তু চাপা পড়ে নি। আলফা-কণিকা ছাড়াই প্রোটন, ডয়টেরন (ভারী হাইড্রোজেন) ও নিউট্রন-কণিকা দিয়ে কেন্দ্রীনে ঘা মেরে বহু রকমের তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরী করা সম্ভব হ'ল। ভারী হাইড্রোজেন আসলে সাধারণ হাইড্রোজেনের দ্বিগুণ ভারী কণিকা। প্রকৃতিতে যে তেজস্ক্রিয় ধাতু ছিল আর যা ছিল প্রকৃতির একান্ত নিজস্ব ব্যাপার—তা এবারে বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে তৈরী হতে লাগল।

তোমরা প্রশ্ন করতে পার কৃত্রিম ভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরী করে আমাদের এমন কি উপকার হ'ল ? শোন সে কথা।

তোমরা বোধ হয় জান, যে, ক্যানসার হলে তার চিকিৎসা চলে রেডিয়াম দিয়ে।

কারণ হ'ল, রেডিয়াম থেকে যে আলফা, বিটা ও গামা-রশ্মি বেরোয় তারাই ক্যানসারের ঘা সারিয়ে দেয়। কিন্তু শরীরের ভেতরে ক্যানসার হলে রেডিয়াম দেওয়া চলে না। শরীরের ভেতরে যদি একটুখানি রেডিয়াম ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তবে ক্যানসার হয়তো সারবে, কিন্তু রোগী বাঁচবে না। কারণ রোগ সারানোর পরও রেডিয়াম রশ্মি ছড়াতে থাকবে। ফলে রোগী মরবে, কারণ সুস্থ শরীরের উপর এ সব রশ্মির ক্রিয়া খুবই খারাপ। কিন্তু রোগীকে যদি নির্দ্দিষ্ট তেজের কৃত্রিম ভাবে তৈরী রেডিও-সোডিয়াম দেওয়া হয় তবে তা শরীরের মধ্যে গিয়ে রোগ সারিয়ে নিজে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে—সোডিয়াম পরিবর্ত্তিত হয়ে ম্যাগনেসিয়াম হয়ে যাবে। আর ম্যাগনেসিয়াম শরীরের কোন ক্ষতি করবে না।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ আগে সাইক্লোট্রোন যন্ত্রে তৈরী করা হ'ত। আজকাল অবশ্য সহজে এবং সস্তায় 'এটমিক্ পাইল' যন্ত্রে এগুলি তৈরী করা হচ্ছে।

একটুখানি রেডিও-নুন যদি তুমি খাও তবে তা অল্প সময়ের মধ্যেই তোমার শরীরের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে। সেটা কতদূর পৌঁছুচ্ছে তা ধরবার যন্ত্র হচ্ছে 'গাইগার কাউণ্টার'। গাছে সার দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু আমাদের জানা নেই গাছের কত বয়সে কোন্ সারের দরকার। বিভিন্ন সারকে কৃত্রিম ভাবে তেজস্ক্রিয় করে গাছের গোড়ায় দেওয়া হ'ল। কখন কোন্ সার তার শরীরে ঢুকবে তা গাইগার কাউণ্টারে ধরা পড়বে। ফলে সময় মত দরকারী সার দেওয়া যাবে, তা ছাড়া সারের অপচয়ও বন্ধ হবে। এমনি ভাবে হাজার রকমের ব্যবহার রয়েছে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের।

এবারে শোন জোলিও কুরীর দ্বিতীয় প্রধান আবিষ্কার সম্বন্ধে। আগেই বলেছি, এ আবিষ্কার হ'ল এটমের ভেতরকার শক্তি সংগ্রহের গোড়ার কথা।

আগের কথায়ই আসা যাক। আমরা দেখলাম, কেন্দ্রীন ভাঙ্গা কঠিন কর্ম্ম। আলফা রশ্মি, প্রোটন কণিকা, ডয়টেরন বা নিউট্রন দিয়ে এ অসাধ্য কাজটি করা যেতে পারে। পরীক্ষায় অবশ্য দেখা গেল নিউট্রনই হ'ল এ কাজে সেরা অস্ত্র। পরমাণুর কেন্দ্রীনের চারদিকে ইলেকট্রন ঘুরছে, এরা আবার ঋণবিদ্যুৎপূর্ণ। কাজেই প্রোটন, ডয়টেরন বা আলফা-রশ্মি পদার্থের কেন্দ্রীনের দিকে ছুড়ে দিলে তারা কেন্দ্রীনে পৌঁছুবার আগেই অনেকটা শক্তি হারিয়ে ফেলবে। এ সব বাধা কাটিয়ে সামান্য এক-আধটা যা কেন্দ্রীনে পৌঁছুবে তাকে আবার কেন্দ্রীন দেয় অন্য দিকে ঘুরিয়ে। কারণ কেন্দ্রীন তো ধনবিদ্যুৎপূর্ণ, আর প্রোটন-ডয়টেরন-আলফা-কণিকা এরাও ধনবিদ্যুৎপূর্ণ। কাজেই বিকর্ষণ হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং লাখ লাখ কণিকা ছুড়ে দিলে ভাগ্যক্রমে তার দু'-একটা কেন্দ্রীনে আঘাত করতে পারবে মাত্র। কিন্তু নিউট্রনের বেলা এ সব ঝামেলা নেই, কারণ সে নিজে হ'ল বিদ্যুৎশূন্য। তাই নিউট্রনই কেন্দ্রীন ভাঙ্গার কাজে

যোগ্যতর। কিন্তু নিউট্রন নিজে আটকা রয়েছে কেন্দ্রীনেরই মধ্যে। তাকে ওখান থেকে সরাতে হ'লে ঐ প্রোটন-ডয়টেরন-আলফা-রশ্মিই কিন্তু চাই!

ইউরেনিয়াম একটি তেজস্ক্রিয় ধাতু। পরমাণবিক ভর এর ২৩৫ এবং ২৩৮। ২৩৮ ভরের কেন্দ্রীনে রয়েছে ৯২টি প্রোটন ও ১৪৬টি নিউট্রন। আবার, আমাদের জানা আছে, কেন্দ্রীনে মোট যতগুলি প্রোটন ও নিউট্রন থাকে সেটাই হবে কোন পরমাণুর ভর। এ হেন ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীনকে লক্ষ্য করে নিউট্রন-কণিকা ছুড়ে দেওয়া হ'ল। ফলে ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীন ভেঙ্গে দু' টুকরো হয়ে গেল। তার একটা হ'ল বেরিয়াম ধাতুর কেন্দ্রীন, অন্যটা ক্রিপটন। মজার ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু হিসাব করে দেখা গেল যে নতুন দু'টি কেন্দ্রীনের ভর ইউরেনিয়ামের ভরের চাইতে কম। বাকী যে অংশটি পালিয়ে গেল সে কোথায় গেল তা খোঁজার পালা সুরু হয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তার সন্ধান পাওয়া গেল। বিজ্ঞানীরা অবাক হ'লেন। আসলে পালিয়ে-যাওয়া অংশটুকু শক্তিতে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন অবশ্যি এ কথাটা অনেক আগেই বলে রেখেছিলেন। এটম বোমার অমিত শক্তির গোড়ার কথা এখানেই।

কিন্তু এ রকম ভাবে এটম ভাঙ্গার কাজে দরকার হয় বহু নিউট্রনের। তার মধ্যে সামান্য কয়েকটা মাত্র কেন্দ্রীনে আঘাত করে। এ রকম ভাবে এটম ভেঙ্গে বিরাট কোন কাজ করা যায় না তো! বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল। অধ্যাপক জোলিও কুরী বললেন, বাইরে থেকে আঘাত হেনে যখন ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীন ভাঙ্গা হ'চ্ছে তখন নিউট্রনের আঘাতে শক্তি ছাড়া আরও একটা জিনিষ পাওয়া যাচ্ছে। সে হ'ল দু'-একটি করে নিউট্রন-কণিকা যারা নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীন থেকে আপনা আপনি বেরিয়েছে। বেরিয়েই আবার কেন্দ্রীন ভাঙ্গতে সুরু করে দেয় এরা। ইউরেনিয়াম আবার ভাঙ্গল, শক্তি বেরোল, আর উপরি পাওয়া গেল নিউট্রন-কণিকা। চলল এমনি ভাবে। কাজেই বাইরে থেকে আর নিউট্রন জোগান দেবার দরকার নেই। একবার কাজ সুরু করে দিতে পারলেই হ'ল, যত ইউরেনিয়াম রয়েছে তার সবটুকু ভেঙ্গে তবেই এদের রেহাই। মাছের তেলে মাছ ভাজা আর কি! একেই বলে শৃঙ্খল-ক্রিয়া বা 'চেন রিয়্যাক্শন'। পরীক্ষায় এও দেখা গেল, কম বেগযুক্ত নিউট্রন-কণিকারাই এ কাজে ভারী ওস্তাদ।

ব্যাপারটা কি দাঁড়াল তাহ'লে দেখা যাক। একটি কম বেগযুক্ত নিউট্রন-কণিকা গিয়ে ২৩৫ পরমাণবিক ভরযুক্ত একটি ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীনে আঘাত করল। ১৩৭ ভর-যুক্ত বেরিয়াম আর ৮৩ ভরযুক্ত ক্রিপটন কেন্দ্রীন তৈরী হ'ল। উপরি দু'টি নিউট্রন-কণিকা

বেরিয়ে গিয়ে আর একটি ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীনকে ভাঙবে। তাহ'লে মোট ভর দাঁড়াল ১৩৭+৮৩+২=২২২ ; অথচ ইউরেনিয়ামের ভর ছিল ২৩৫। বাকী ১৩ গেল কোথায়? সেটা সত্যি পালিয়ে যায় নি ; শক্তিতে পরিণত হ'য়েছে মাত্র।

এটম ভাঙতে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল তার এমনি ভাবে সমাধান করলেন ফ্রেডারিক জোলিও কুরী। কিন্তু তিনি কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন যে এটমের ভেতরকার লুক্কায়িত শক্তি ব্যবহার করা হবে মানুষ ধ্বংসের কাজে? বিজ্ঞান হবে স্বার্থপর নৃশংস একদল রাজনীতিজ্ঞের হাতের পুতুল!

১৯৪৩ সাল। বৃটিশ-আমেরিকা এটম বোমা বানানোর জন্যে একটা বোর্ড বসাল। অধ্যাপক কুরীর সহকর্মীদ্বয় এই বোর্ডের হাতে তুলে দিলেন ৪০ গ্যালন ভারী জল আর শৃঙ্খল-ক্রিয়ার ও অন্যান্য পরমাণবিক গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ ফরমুলা।

১৯৪৫ সাল। এটম বোমা পড়ল জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর।

শুধু শৃঙ্খল-ক্রিয়া নয়, ২৩৫ ভরযুক্ত ইউরেনিয়াম থেকে ২৩৮ ভরযুক্ত ইউরেনিয়াম পৃথক্ করবার উপায়ও বের করেছিলেন অধ্যাপক জোলিও কুরী, কারণ পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছিল যে ২৩৮ ভরযুক্ত ইউরেনিয়াম থেকে ২৩৫ ভরযুক্ত ইউরেনিয়াম শক্তি বের করে দেওয়ার ব্যাপারে বেশী উপযোগী।

ফ্রেডারিক জোলিও কুরী শুধু বিজ্ঞানী ছিলেন না, তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক ও শান্তির পূজারী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী যখন ফরাসী দেশ অধিকার করে তখন তিনি মুক্তিসেনাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ১৯৪২ সাল থেকে তিনি কমিউনিষ্টপন্থী ছিলেন, আর এ জন্যে তাঁকে যুদ্ধের পর কিছুটা অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে তিনি ফরাসী একাডেমীর সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে ফরাসী পরমাণবিক শক্তি কমিশনের তিনি হাই কমিশনার নিযুক্ত হন। বছর পাঁচেক আগে অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে জোলিও কুরী ষ্টালিন শান্তি পুরস্কার লাভ করেছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকপদে ছিলেন। তিনি যে সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন সে সব জায়গায় কত দেশী-বিদেশী ছাত্র গবেষণা করেছেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই অধ্যাপক দম্পতির অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন। এমন কি আমাদের দেশেরও বহু ছাত্র অধ্যাপক জোলিওর কাছে কাজ করেছেন। তাঁরাও একবাক্যে অধ্যাপক জোলিওর মধুর ব্যবহারের কথা স্বীকার করেছেন। কয়েক বছর পূর্ব্বে আমাদের দেশেও এসেছিলেন কুরী দম্পতি।

অধ্যাপক জোলিও কুরীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে একটি সভার ব্যবস্থা হয়েছিল। কলকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত

ছিলেন সে সভায়। মৃত্যুসময়ে অধ্যাপক জোলিও একটি পুত্র ও একটি কন্যা রেখে গেছেন। মেয়েটি বৈজ্ঞানিক, এবং পরমাণবিক গবেষণায়ই রত। প্যারিসে নাকি তাঁর গবেষণাকার্য্যে নানা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। তাঁকে এ দেশে নিয়ে আসবার জন্যে একটা চেষ্টার কথা সে সভায় আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক হ্যালডেন্ (যিনি ভারতীয় নাগরিক হিসেবে কলকাতার কাছেই বসবাস করছেন) অধ্যাপক জোলিও কুরীর কন্যাকে এ দেশে আনার খরচ বাবদ এক হাজার টাকা দিতেও রাজী হয়েছেন। সুসংবাদ সন্দেহ নেই। এমনি ঐতিহ্যপূর্ণ বংশের কোন বৈজ্ঞানিক যদি আমাদের দেশে এসে গবেষণা করেন তা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয় হবে।

পশ্চিম দিগন্তে

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

জুনাগড়।

নরসিংহদাসের মন্দির দেখে আমরা এলাম নগরের শেষ প্রান্তে,—এক দুর্গদ্বারে।

প্রাচীন দুর্গ, উপর কোট একটি পাহাড় যুড়ে দুর্গটি। ফটক পার হয়েই সিঁড়ি। সিঁড়ি শেষ হয়েছে ফটকের মাথায় পর্যবেক্ষণ তোরণে। সেখান থেকে প্রশস্ত রাস্তা চলে গেছে কেল্লার পাঁচালের উপর দিয়ে। কিছু নীচে পাহাড়ের গায়ে আরেকটি পাঁচালের ভগ্নশেষ চোখে পড়ে। পথের চারিপাশে অযত্নসঞ্চিত আগাছার জঙ্গল। পথও মাঝে মাঝে ভেঙেচুরে অগম্য হয়ে গেছে। পিছনের দিকের তোরণ ও পাঁচীল প্রায় ভগ্ন। কয়েকটি পুরানো কামানের মুখ পূর্বগৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

পথের বাঁ পাশে গভীর জলাধার ও পাম্পিং ষ্টেশন। এখান থেকে সারা নগরে জল সরবরাহ করা হয়।

জলাধার থেকে কিছুদূর এলেই এক মসজিদ। পাথরের তৈরী পুরানো মসজিদ। মসজিদের নীচে ভূগর্ভে কয়েকখানি ঘর আছে। দেখে মনে হয় এটি বোধ হয় কোন সময় মন্দির ছিল, পরে মসজিদ হয়েছে।

মসজিদের সামনেই একটি গভীর কূপ আছে। সোজা একটি সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে শতাধিক সিঁড়ি নেমে গেছে জল অবধি। এই ঢালু পথ বেয়েও জল আনা যায়, আবার উপর থেকে দড়ি ঝুলিয়েও জল তোলা যায়। স্বচ্ছ মিষ্টি পাহাড়ী জল।

এই কূয়াটির কাছেই মাটির নীচে কয়েকখানি বাড়ী আছে। এক এক সঙ্গে দু'-তিনখানি করে ঘর। উপর থেকে আলো আসার জন্য এক একটি ফুকর কাটা আছে। উপর থেকে এই ফুকর দিয়ে দেখলে মনে হবে, জলহীন এক একটি ফুকর। তার নীচে যে ঘর আছে, মানুষ বাস করতে পারে, তা মনে হয় না। এক গৃহ থেকে আরেক গৃহে যাবার জন্য মাটির নীচেই সুড়ঙ্গ আছে। এ যেন পাহাড়ের গর্ভে একখানি ছোট গ্রাম। ইচ্ছা করলে একদল মানুষ এখানে দীর্ঘকাল লুকিয়ে থাকতে পারে, কেউ টের পাবে না। কেন যে এই পাহাড়ের গর্ভে এমন ভাবে ঘর কাটা হয়েছিল, কে যে কিসের জন্য এই কেল্লার মধ্যে এই অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিল আজ আর তা জানা যায় না। সেই জংগলাকীর্ণ দুর্গে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করে আমরা নেমে এলাম।

এরপর গিরনার।

জুনাগড় থেকে কয়েক মাইল দূরে গির পাহাড় সুরু হয়েছে। গিরনার সেই পার্বত্য শ্রেণীর প্রথম পাহাড়। সম্রাট্ অশোকের শিলালিপির জন্য এই পাহাড় ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ভারতের এই অঞ্চলেই একমাত্র সিংহ দেখা যায়। সংখ্যায় তারা কমে এসেছে বলে ভারত সরকার এখানে তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। এই গির পাহাড় জৈনদের মহাতীর্থ। পাহাড়ের উপর অনেকগুলি হিন্দু-মন্দিরও আছে।

পথে পাহাড়ের কোলে একটি সুদৃশ্য বিরাট জলাধার আছে। পাহাড়ের কোলে একটি পার্বত্য নদীর মুখে বাঁধ দিয়ে এই জলাধারটি তৈরী। দু'-পাশে উঁচু পাহাড় সামনে সমতলভূমিতে বাঁধ। বাঁধের পাশ দিয়ে পাহাড়ের কোল অবধি ধাপে ধাপে ফুলের বাগান। জলাধার ও বাগানের মধ্যে দিয়ে বাঁধের পথ। অপূর্ব রমণীয় স্থান।

জলাধারটি কয়েক মাইল ব্যেপে আছে। এই অঞ্চলে জলকষ্ট নিবারণের জন্য কয়েক বছর আগে এটি তৈরী হয়েছে। ইংরাজদের তৈরী, নাম ওয়েলিংডন ড্যাম।

এই বাঁধ ছাড়িয়ে কিছুদূর গেলেই গির পাহাড়। পাহাড়ে ওঠার মুখেই অশোকের একটি শিলালেখ আছে। ভারত সরকার সেটি রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন। এই অঞ্চলে অশোকের ১৪টি শিলালেখ আছে, এটি তারই মধ্যে একটি। তা থেকে ধারণা করা যায় যে সেই সুদূর অতীতে এখানে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। এখন অবশ্য পাহাড়ের কোলে দু'খানি মাত্র খাবারের দোকান আছে।

গিরনারে তীর্থযাত্রী আসে সব সময়েই। জৈনদের এটি মহাতীর্থ। আদিনাথ থেকে মহাবীর পর্য্যন্ত ২২ জন তীর্থঙ্কর এই ধর্মনীতির প্রবর্তক ও সাধক ছিলেন। তার মধ্যে নেমিনাথের জন্মভূমি ও কর্মভূমি এই গিরনার।

নেমিনাথ রাজার ছেলে। তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল। বিবাহ করতে গিয়ে তিনি দেখেন অনেকগুলি পাঁঠা কাটা হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলেন—এত পাঁঠা কাটা হচ্ছে কেন?

কন্যাপক্ষ বললেন—বরযাত্রীদের ভুরিভোজের জন্য।

বিবাহ ব্যাপার আনন্দ-উৎসব! সেই উৎসবকে সম্পূর্ণ করার জন্য এতগুলি প্রাণিবধ হবে? পাঁঠাগুলির আর্তনাদ ও রক্তধারা নেমিনাথকে ব্যাকুল করে তুললো। সকলের অলক্ষ্যে তিনি বিবাহসভা ত্যাগ করলেন। সেইদিন থেকে নেমিনাথ হলেন সন্ন্যাসী। তাঁর পূর্ব নাম আর কিছু ছিল, সিদ্ধিলাভ করে তিনি হলেন নেমিনাথ। নেমিনাথ বললেন—অহিংসাই পরম ধর্ম। জীবে দয়া করাই ধর্ম।

এই গির পাহাড়ই নেমিনাথের সাধন-ক্ষেত্র।

তখন অবশ্য এই অঞ্চলকে গিরনার বলতো না। গিরনার কথাটি এসেছে গিরি-নগর থেকে। তখন এই অঞ্চলের নাম ছিল রৈবতক।

রৈবতক জনপদ মহাভারতেরও আগের যুগের।

অনেক—অনেক কাল আগে এক রাজা ছিলেন। শয্যাতি। তাঁর তিন ছেলে। উত্তানবর্হি, আবর্ত ও ভূরিসেন। আবর্ত্ত ছিলেন বিষ্ণুভক্ত মানুষ। রাজকর্ম তাঁর ভালো লাগতো না, পূজা-অর্চনা নিয়েই থাকতেন। একদিন কথায় কথায় তিনি পিতাকে বললেন—এই রাজ্য, এই সম্পদ,—এ সব কারোরই কিছু নয়, সবই শ্রীবিষ্ণুর—সবই নারায়ণের।

রাজা শয্যাতির অংহকারে আঘাত লাগলো, তিনি বললেন—বটে! আমি রাজা, আর রাজ্য আমার নয়? বেশ, চলে যাও আমার রাজ্য ছেড়ে তোমার নারায়ণের রাজ্যে।

আবর্ত নারায়ণের নাম করে বেরিয়ে পড়লেন। সমুদ্রতীরে গিয়ে, স্নান করে

বিষ্ণুর পূজা কয়লেন। নারায়ণ প্রসন্ন হলেন। ভীমনাদী নামক সাগরের উপর তিনি সুদর্শন চক্র স্থাপন করলেন। সেই চক্রের উপর শত যোজন ভূমি উপড়ে এনে রাখলেন। সে ভূমি আর সাগরে ডুবলো না। আবর্তকে তিনি সেখানকার রাজা করে দিলেন। আবর্তেরই এক ছেলের নাম রেবত। তাঁর নাম থেকেই এখানকার নাম হলো রৈবতক। রেবত-রাজা একটি নগরও পত্তন করেছিলেন। সেই নগরীর নাম কুশস্থলী। মহাভারতের যুগে এই কুশস্থলীই হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশের রাজধানী দ্বারাবতী,—এখনকার দ্বারকা।

গিরনারের সিঁড়ি—বরাবর বারো হাজার সিঁড়ি।
সামনে সুধীন, প্রভাস ও লেখক।
ফটো : শ্রীভবেশ দাশগুপ্ত।

গিরনারে ওঠা সহজ ব্যাপার নয়। সিঁড়ি আছে প্রায় বারো হাজার। বারো হাজার সিঁড়ি উঠতে হলে, যত বড় জোয়ানই হোক্, হাতে একগাছি লাঠি না হলে চলে না। খাবারের দোকানে তাই লাঠি ভাড়া পাওয়া যায়। মাত্র দু'টি পয়সা দিলেই একগাছি পাকা বাঁশের লাঠি যাত্রীর সিঁড়ি ভাঙ্গার সহকারী হবে।

আমার সঙ্গী শিল্পী সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায় বললো,—লাঠি আমার দরকার নেই।

দোকানী হেসে বললো,—সঙ্গে রাখুন, দরকার না হলে আমি পয়সা নেবো না।

লাঠি হাতে নিয়ে আমরা চার জন পাহাড়ে উঠতে সুরু করলাম।

পাহাড়ের গা বেয়ে শুধুই সিঁড়ি উঠে গেছে। দু'পাশে জংগল, মাঝে প্রশস্ত পাথর-বাঁধানো সিঁড়ি। উঠতে উঠতে মনে হয়, এর বুঝি আর শেষ নেই, কোন দিনই এই সিঁড়ি বুঝি আর ফুরোবে না!

জানি না এ সিঁড়ি কোথায় শেষ,
চলেছি বুঝি মোরা নিরুদ্দেশ!

মাঝে মাঝে সিঁড়ির গায় ইংরাজীতে সংখ্যা লেখা আছে। তা থেকে জানা যায়, ঠিক কত সিঁড়ি ওঠা হলো এবং আর কত বাকী আছে।

আমরা হাজার সিঁড়ি পার হয়ে গেলাম।

দু'হাজারও পার হ'লাম।

এবার সত্যি লাঠির দরকার হয়। পা দু'খানি ভারী হয়ে ওঠে, গলা শুকিয়ে যায়, নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়তে থাকে। বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই করতে থাকে। তখন পাহাড়ের উপর পৌষ মাসের শীত আর গায়ে লাগে না, ঘাম দেখা দেয়।

এই কষ্টটা ওখানকার লোকেরা বোধ হয় জানে। সিঁড়ির পাশে একটি ছোট চাতাল, সেখানে একটি জালা আর তিন কলসী জল নিয়ে এক রমণী বসে আছে: তৃষ্ণার্ত্ত যাত্রীদের সে জল দেয়। যাত্রীরা জল পান করে স্নিগ্ধ হয়, চাতালে বসে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেয়। এটি কোন জলসত্র নয়, এটি ওই রমণীর জীবিকা। দু'হাজার সিঁড়ি ভেঙে প্রতিদিন সে এখানে জল নিয়ে আসে, সারাদিন বসে যাত্রীদের জল দান করে, আবার সন্ধ্যায় নেমে যায়।

জল খেয়ে বললাম—কি দিতে হবে?

রমণী বিনীত কণ্ঠে বললে—যা আপনাদের মরজি। আপনারা তীর্থযাত্রী, আপনাদের জলপান করালাম এই তো আমার সৌভাগ্য। তবে খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে তো, তাই কিছু সাহায্য চাই। যা দেবেন তাতেই হবে।

আমরা কলকাতার মানুষ, রমণীর কথা শুনে বিস্মিত হলাম। সেখানে এক গ্লাস জলের দাম দু' আনা চাইলেও কেউ আপত্তি করবে না। কলকাতা হলে তাই হতো! তাকে আমরা দু'-আনা দিলাম। তাতেই সে খুসি।

সঙ্গী প্রভাস দে বললো,—আর আমি উঠবো না, আমার কষ্ট হচ্ছে।

সুধীন বললো,—আমরা তাহ'লে এইখানেই বসি, আপনারা দেখে আসুন।

এ কি অল্পক্ষণের ব্যাপার যে এখনি দেখে নেমে আসবো? এই সবে মাত্র দু' হাজার, এখনও সামনে দশ হাজার সিঁড়ি পড়ে আছে। কতক্ষণ বসে থাকবে এরা এখানে? আমার মুখের পানে তাকিয়ে ভবেশ দাশগুপ্ত বোধ হয় আমার মনের কথাটাই বুঝতে পারলো; বললো,—আমাদের দেরী হতে পারে, তোমরা নীচে নেমে খাবারের দোকানে অপেক্ষা করো, সন্ধ্যা নাগাদ আমরা নেমে আসবো।

সন্ধ্যা হতে তখনও আড়াই ঘণ্টা দেরী।

আমরা ছু'জনে এবার উঠতে সুরু করলাম।

সিঁড়ির পর সিঁড়ি উঠে চলেছি। কখনো ডান পাশে, কখনো-বা বাঁ পাশে গভীর খাদ,—জংগলাকীর্ণ, ঢালু হয়ে শত শত ফুট নীচে নেমে গেছে। আরেক পাশে সোজা পাথরের দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও গাছপালা আছে, আবার কোথাও বা শুধু কঠিন মসৃণ পাথর, ফাটলে ফাটলে গুচ্ছ গুচ্ছ ঘাস ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। উঠতে উঠতে শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছিল,—কত নিষ্ঠা, নৈপুণ্য ও অধ্যবসায় থাকলে মানুষ এইভাবে শত সহস্র সিঁড়ি গেঁথে পাহাড়ের মাথায় উঠে মন্দির গড়তে পারে! তখন হয়তো এই পাহাড় এতটা জংগলাকীর্ণ ছিল না। এর ঢালু উপত্যকায় জনপদ ছড়িয়ে ছিল অনেক দূর অবধি, গিরিনগরীর শীর্ষে তারা গড়েছিল গিরিমন্দির। তখন এখানে কত উৎসব হতো, কত মানুষের সমাগম ছিল। সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঘরে আলো জ্বলতো, আলোর সমারোহে এই পাহাড় অপরূপ হয়ে উঠতো রাত্রির অন্ধকারে।

এই রৈবতকে যত্নবংশের কত উৎসবের আসর বসেছে।

১৫

বামুনগাছি জায়গাটা খুব তুর্গম না হলেও ঠিক সুগম নয়। রেল-ষ্টেশন থেকে সাইকেল-রিকসায় প্রায় মাইলখানেক এসে পাওয়া গেল এক নদী। সেখানে যাত্রীবাহী নৌকা পাওয়া যায়। তাতে চড়ে আরও মাইল তুই গিয়ে যে জায়গাটায় নামিয়ে দেয় সেটার নাম বকটুলি। বেশ গঞ্জ জায়গা। প্রকাণ্ড বাজার, অনেক দোকানপাট, পাটের

আড়ত, খাবারের দোকান, চায়ের দোকান। একটা হেয়ার কাটিং সেলুনের সাইন বোর্ডও চোখে পড়লো। দূরে কোথায় যেন একটা বাজনা বাজছে এবং একটা হিন্দী গানের আওয়াজ এসে কানে পৌঁছুচ্ছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে সম্প্রতি সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে একটা ভ্রাম্যমাণ সিনেমা কোম্পানী এসে আসর জমিয়েছে।

একটা চায়ের দোকানে বসে আমি আর দিলীপ চা আর গরম সিঙ্গাড়া খেয়ে নিলাম। শুনলাম বামুনগাছি যেতে গেলে এখান থেকে আমাকে গরুর গাড়ী ভাড়া করে যেতে হবে কাঁচা রাস্তায় প্রায় পাঁচ মাইল। সেখানে গিয়ে বকটুলির এই নদীকেই আবার পাওয়া যাবে। সেখানে উঠতে হবে আবার নৌকায়। মাইল তিনেক গেলেই বামুনগাছিতে পৌঁছুতে পারবো। এখান থেকেই নৌকায় যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু উজান স্রোতে নৌকা পৌঁছুতে প্রায় পনেরো-ষোল ঘণ্টা লাগবে। কিন্তু গরুর গাড়ীতে পাঁচ মাইল যেতে বড় জোর তু' ঘণ্টা এবং সেখান থেকে নৌকায় আরও তু' ঘণ্টা। কাজেই বামুনগাছির যাত্রীদের এই পথে যাওয়াই সুবিধা। হিসেব করে দেখলাম এই সোজা পথের দূরত্বেও নিকটতম রেল-ষ্টেশন থেকে বামুনগাছি দশ-বারো মাইলের কম নয়।

গরুর গাড়ীর পরিবর্ত্তে একটা বিচিত্র যান পাওয়া গেল। গরুর গাড়ীর যোয়ালের সামান্য একটু পরিবর্ত্তন করে তাতে যোড়া হয়েছে একটা মেঠো ঘোড়া। সে ঘোড়া দৌড়ুতে পারে না। তবু সহজ ভাবে হেঁটে গেলেও তার গতি গরুর চেয়ে দ্রুত। আড়াই টাকা দিয়ে এই রথ ভাড়া করে আমি আর দিলীপ যাত্রা সুরু করলাম।

জগবন্ধু সরকারের ঘটনার পরে কোনও অজানা লোকের সঙ্গে আলাপ জমাতে আমি একটু ইতস্ততঃ করি। কিন্তু দিলীপ আমাদের রথের সারথিটীর সঙ্গে অল্পক্ষণের মধ্যেই আলাপ জমিয়ে ফেললে।

লোকটির নাম সেখ গুলমহম্মদ তরফদার। কিন্তু এই গালভরা নামে তাকে কেউ সম্বোধন করে না, সেজন্য তার পরম ক্ষোভ। লোকে তাকে গুলু মিয়া বলেই ডাকে। নামটা যেমন লম্বা-চওড়া, চেহারাটা তার ঠিক বিপরীত। শীর্ণকায় এবং কঙ্কালসার। শুনলাম এ দেশের মুসলমানদের পদবী সাধারণতঃ চার রকমের। যথা,—বিশ্বাস, মণ্ডল, মল্লিক এবং তরফদার। সুতরাং নামের প্রথম অংশ না শুনলে হিন্দু মুসলমানের নামের পার্থক্য বোঝার অসুবিধা।

গুলু মিয়া আমাদের সখেদে জানালে যে এক সময়ে তাদের আড়াই শো বিঘা চাষের জমি ছিল, সবই নষ্ট করেছে বাপ-চাচারা। তা নইলে আজ তাকে গাড়ীর গাড়োয়ানী করতে হয়?

বামুনগাছির খবরও এ লোকটা জানে। রাজার মন্দিরের কথার উল্লেখে সে তো উল্লসিত হয়ে উঠলো। বললে.—সে যে কি কাণ্ড, তা মুখে বলবার নয়। গিয়ে দেখবেন। তবে আল্লার মরজিতে সবই ক্রমে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পাপ ঢুকেছে কিনা তুনিয়ায়। তার ফলেই এই অবস্থা।

গুলু মিয়ার রথযাত্রার পর্ব্ব ক্রমে শেষ হয়ে যে জায়গায় নামলাম তার নাম পানিখালি। একটা প্রকাণ্ড বটগাছকে কেন্দ্র করে কয়েকখানি দোকান। আর ওপাশে যে জলধারা চিক চিক করছে. শুনলাম সেইটাই বকটুলির নদী। সেই নদীর অবস্থা ভাল নয়, জলের ভিতর থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে বড় বড় শেওলার দাম; তা ছাড়া কচুরি পানা তো আছেই! হয়তো আর বিশ-পঁচিশ বছর পরে এ নদীর আর কোনও চিহ্ন থাকবে না, ভরাট হয়ে যাবে। এমনি ভাবে বাংলাদেশের কত নদীই তো লুপ্ত হয়ে গিয়েছে!

ভাড়া মিটিয়ে দিলাম গুলু মিয়াকে। একটা খাবারের দোকান ছিল, তার তেলেভাজা বাসি খাবারের চ্যাঙ্গারি দেখে আমাদের গা ঘিন ঘিন করে উঠলো। কিন্তু দোকানদারকে বলে গুলু মিয়া অল্পক্ষণ পরেই আমাদের জন্য তু কাপ চা তৈরী করালে। মাটির গেলাসে যদিও সেই চা পরিবেশিত হোল, তবু এই পাঁচ মাইল গোযান বা অশ্বযানে এসে যে ক্লান্তিবোধ করছিলাম সেটা দূর হোল।

ওখান থেকে নৌকাযাত্রা। আমরা বিদেশী দেখে নৌকাওয়ালারা কিছু বেশী আদায়ের চেষ্টা করছিল, কিন্তু এবারেও আমাদের সাহায্য করলে গুলু মিয়া। তু' টাকা চার আনায় একখানা নৌকা ভাড়া করে আমরা সুরু করলাম আমাদের যাত্রার শেষ পর্ব্ব।

যখন বামুনগাছিতে পৌছুলাম তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। রাজার মন্দির নদীর ধারেই, 'সুতরাং সেখানে পৌছুতে বেশী সময় লাগলো না। অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এত বড় বিরাট ব্যাপার বাংলাদেশের একটা গণ্ডগ্রামের জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে সেটা আমাদের কল্পনার অতীত। পুরানো ধ্বংসস্তূপের বহু স্থানের বহু ছবি দেখেছি, গিয়েছিও অনেক জায়গায়, কিন্তু এ কি কাণ্ড! আমাদের তুর্ভাগ্য যে বাংলার এই সব অতীত কীর্ত্তির কোনও প্রচার হয় না।

শুনলাম এর ইতিহাস. অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে। এই জেলা বর্ত্তমানে যাঁর নামে পরিচিত, সেই রাজাধিরাজেরই কীর্ত্তি এটা। তাঁর মা নাকি শেষ বয়সে কাশীধামে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের নিত্যপূজা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ছেলে তখন প্রতাপশালী রাজা। কাশীধামে যাওয়া তখনকার দিনে সুগম ছিল না। আজকের মত রাত্রের

ডিনার খেয়ে ট্রেনে বিছানা পেতে শুয়ে ঘুমিয়ে মোগল সরাইয়ে মর্ণিং টি, তার পর আধঘন্টার মধ্যে বিশ্বনাথের মন্দির—এ ব্যাপার তখনকার দিনে স্বপ্নে দেখতেও কেউ সাহস করতেন না। কাজেই মায়ের প্রস্তাব শুনে ছেলে বললেন যে কাশী যাওয়ার দরকার নেই, তিনি এখানেই বিশ্বনাথের প্রতিষ্ঠা করবেন।

তাই হোল। রাজার আদেশে তৈরী হোল বিশাল মন্দির। চারিদিকে তার অতিথিশালা, নাটমঞ্চ, আরও কত কি! প্রতিষ্ঠিত হোল শিবলিঙ্গ। দেশ দেশান্তর থেকে লোক ছুটে আসে এই অদ্ভুত কীর্ত্তি দেখতে। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গিয়েছে, এখনও আসে জনস্রোত। অর্ঘ্য নিবেদন করে শিবের কাছে। সবাই বলে এত বড় শিবলিঙ্গ নাকি বাংলা দেশে আর কোথাও নেই।

আজ মন্দিরের অনেক জায়গা নষ্ট হয়েছে। অশ্বত্থ ও বটগাছ গজিয়েছে দেওয়ালে। নাটমঞ্চ গিয়েছে ভেঙ্গে। অতিথিশালার অসংখ্য ঘরের মধ্যেও জীর্ণতার লক্ষণ। তবুও এখনও বামুনগাছির এই শিব স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। শিবরাত্রি ও চড়কের সময় এখানে নাকি বিরাট মেলা বসে। হাজার হাজার লোকের সমাগম হয় সে সময়ে।

কিন্তু আমরা শিবলিঙ্গের পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করতে এখানে আসি নি। আমরা এসেছি যার অনুসন্ধানে সেটি বিষ্ণুমূর্ত্তি। তেরোশো বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত মৌখরি অনন্তবর্মার প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমূর্ত্তির উপরের অংশ খুঁজে বার করাই আমাদের সংকল্প।

অতীতে একদিন কানাইদাসও এসেছিলেন বামুনগাছির শিব দর্শন করতে। এখানে এসেই তিনি জেনেছিলেন যে নদীর ধারে রাজার প্রতিষ্ঠিত এক ভাঙ্গা মন্দির আছে, তাতেই ছিল বিষ্ণুমূর্ত্তি, যার চোখ তুটো ছিল নীলার; এবং হয়তো তারই জন্য সেই মূর্ত্তি হয়েছিল অপহৃত আর পূজারী ঠাকুরকে সহ্য করতে হয়েছিল মারাত্মক আঘাত।

সে মন্দির কোথায়? অপহৃত মূর্ত্তির কোনও সন্ধান আর পাওয়া গিয়েছিল কি না? নির্য্যাতিত সেই পুরোহিত আজও বেঁচে আছেন কি না, এবং যদি বেঁচে থাকেন তবে কোথায় আছেন?

এই প্রশ্নগুলি আমাদের মনের সামনে ভেসে উঠলো। এইগুলির সমাধান করাই আপাততঃ আমাদের কাজ।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, কাজেই একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন। শিবমন্দিরের অতিথিশালায় আশ্রয়প্রার্থী হলাম।

(ক্রমশ:)

শিশুসাহিত্যিক-পরিচিতি

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

জন্ম—৪ঠা জানুয়ারী, ১৯২১। জন্মস্থান—ভাণ্ডারিয়া, বরিশাল।

ছাত্রজীবন সুরু হয় ভাণ্ডারিয়া হাই স্কুলে। তার পর বরিশাল বি. এম্. কলেজ থেকে রসায়ন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি. এস্-সি পাশ করেন। পরবর্তী কালে ইনি এ. আই. সি এবং এফ. আই. সি. এস্‌ও হয়েছেন।

কর্মজীবনে ইনি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পাট নিয়ে রাসায়নিক গবেষণা-কার্যে নিযুক্ত হন। এই সূত্রে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় এঁর প্রায় ১৬টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে ইনি সেণ্ট্রাল জুট মিউজিয়ামে কিউরেটর পদে নিযুক্ত আছেন।

সাহিত্যজীবন সুরু হয় প্রায় ১৬ বছর আগে। শিশুসাথী পত্রিকায় প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। তার পর ক্রমে রামধনু, কৈশোরক, চয়নিকা প্রভৃতি অন্যান্য শিশুপত্রিকায়ও ইনি নিয়মিত লেখক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এ ছাড়া বড়দের আনন্দবাজার, যুগান্তর, প্রবাসী, সচিত্র ভারত, বিজ্ঞান পরিচয়, জ্ঞানবিজ্ঞান প্রভৃতি পত্রিকায়ও এঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দী তরঙ্গ, বিশ্বমিত্র এবং নানা ইংরেজী পত্রিকায়ও ইনি লিখে থাকেন। এঁর বেশীর ভাগ রচনাই বিজ্ঞান বিষয়ে, তবে গল্প বা অন্য বিষয় নিয়েও লেখেন।

ইনি কিছুদিন ছোটদের কৈশোরক পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। শিশুসাহিত্য-পরিষদের সঙ্গেও ইনি দীর্ঘকাল ধরে যুক্ত। অনেক দিন তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহ-সম্পাদক ছিলেন, বর্তমানে অন্যতম সম্পাদক।

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

জন্ম—৩রা জুলাই, ১৯১২। জন্মস্থান—কলকাতা।

ছাত্রজীবন সুরু হয় ঢাকা কলিজিয়েট স্কুলে। তার পর ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ এবং কলকাতা স্কটিশচার্চ কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৬ সালে ইংরাজী সাহিত্যে এম্. এ পাশ করেন।

কর্মজীবনে প্রথম দিকে ইনি বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ (ডাকব্যাক্) প্রতিষ্ঠানের প্রচার-সচিব ছিলেন। তার পর সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। বর্তমানে ইনি গোবরডাঙ্গা কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক।

সাহিত্যচর্চা সুরু হয় ছাত্রজীবন থেকেই। ছোটদের জন্য খোকাখুকু, মাসপয়লা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রথম লিখতে সুরু করেন। তার পর রামধনু প্রভৃতি পত্রিকারও নিয়মিত লেখকশ্রেণীভুক্ত হন। এ ছাড়া শনিবারের চিঠি ও বড়দের অন্য নানান্ পত্রিকায় (বাংলা ও ইংরাজীতে) লিখে

বড়দের সাহিত্যেও খ্যাতিলাভ করেন। সাধারণতঃ রসরচনাতেই এঁর খ্যাতি বেশী এবং অ কৃ ব. এই সংক্ষিপ্ত নামে ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত।

এঁর লেখা বই :- খামখেয়ালী ছড়া (ছোটদের), পাগলা গারদের কবিতা, নে-তে-তেরে-তোম (কবিতা), জীবন-সাহারা (গল্প), প্রজ্ঞাপারমিতা (উপন্যাস) প্রভৃতি।

নতুন বই

সম্প্রতি আমাদের কাছে অনেকগুলি ভাল ভাল বই এসেছে সে খবর তোমাদের গত মাসেই দিয়েছি। এবারে সেগুলির একটু পরিচয় দেই।

'মহাকালের পূজারী' একখানি বেশ বড় গোছের উপন্যাস—ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা। এতে ঐতিহাসিক ঘটনাও যেমন আছে, লেখকের কল্পনায় আঁকা ছবিও আছে তেমনি। লেখক কিন্তু এ দু'য়ের মধ্যে আশ্চর্য সামঞ্জস্য রেখেছেন। ফলে এত বড় বইটা পড়তে আগাগোড়া কৌতূহল বজায় থাকে। বইখানি লিখেছেন সুসাহিত্যিক শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। এই ধরণের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ছোটদের জন্য উপন্যাস লিখে তিনি আগেও সুনাম অর্জন করেছেন। এ বইটায় সে খ্যাতি বাড়বে বই কমবে না। এই উপন্যাসখানি ১৩৬০-৬২ সালে ধারাবাহিক ভাবে রামধনুতেই বেরিয়েছিল। যাদের পড়বার সুযোগ হয় নি তারা পড়লে আনন্দ পাবে। বইএর মলাটটিও ভারী সুন্দর হয়েছে'।

'বাহাদুর' আর একখানি নতুন উপন্যাস, কিন্তু একেবারে অন্য পটভূমিকায় লেখা। এর দু'টি খণ্ড। প্রথম খণ্ডে আছে একদল স্কুলের ছেলে কি করে এক গভীর রহস্যের ভেতরে পড়ে তার সমাধান করল, আর দ্বিতীয় খণ্ডে আছে এক বাঙ্গালী বিজ্ঞানীর কথা—আর তাঁর আবিষ্কার নিয়ে নানা রকম রোমাঞ্চকর ঘটনা। সে না পড়লে দু' কথায় লিখে বলা যায় না। মোট কথা, এই সরস, সুখপাঠ্য বইখানি ছোটদের মনে সাহস যোগাবে, তাদের কল্পনারও খোরাক যোগাবে অনেকখানি। লেখক শ্রীননীগোপাল মজুমদার এক সময়ে শিশুসাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর রত্ননেশা, টাঁ্যাসুরাম প্রভৃতি বই এক সময়ে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিল। তাঁর পর শিশুসাহিত্য ছেড়ে শিশুচিকিৎসাই হ'ল তাঁর প্রধান অবলম্বন। কিন্তু দ্বিতীয়টির সঙ্গে প্রথমটির পাশাপাশি চলতে বাধা নেই। তাঁর শিশুসাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনে আমাদের মত তোমরাও খুসী হবে।

'চাষ করি আনন্দে' একখানি বিরাট অনুবাদ গ্রন্থ। মূল বইখানি লিখেছেন রুশ লেখক আলেক্সি মুসাতভ, এবং এ বইটি লিখে তিনি স্তালিন পুরস্কারও পেয়েছেন। মাটী, ক্ষেত, ফসল—এদের সঙ্গে আমাদের যে নিবিড় যোগাযোগ তারই পটভূমিকায় লেখা এই সুবৃহৎ উপন্যাস। অনুবাদ

করেছেন সুলেখিকা শ্রীইন্দিরা দেবী। ঝরঝরে সাবলীল ভাষায় লেখা অনুবাদ বেশ সুখপাঠ্য হয়েছে। মূল রুশ ভাষা যখন আমাদের বেশীর ভাগ লোকেরই জানা নেই তখন এই রকম সুন্দর সুন্দর অনুবাদের মধ্যে দিয়ে বিশ্বসাহিত্যের পরিচয় লাভ করা খুবই কাম্য সন্দেহ নেই।

আর একখানি অনূদিত গল্পসংগ্রহের নাম করি—'লাল জুতো ইত্যাদি গল্প'। ডেনমার্কের বিখ্যাত গল্প-যাদুকর হান্স অ্যাণ্ডারসনের লেখা গল্প থেকে ১০টি গল্প বেছে নিয়ে বাংলায় তর্জমা করেছেন শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যতটা সম্ভব মূলের কাছাকাছি রেখে। অবশ্য অনুবাদ মূল ভাষা থেকেই করা হয়েছে না তার ইংরেজী থেকে করা হয়েছে তার উল্লেখ বইএ নেই। যাই হোক, অনুবাদ যে বেশ স্বচ্ছ এবং সুখপাঠ্য হয়েছে এ স্বীকার করতেই হবে। বাঙালী ছেলেমেয়েরা আগ্রহের সঙ্গেই এ বই পড়বে এবং প্রচুর আনন্দ পাবে। তবে বহু বাংলা শব্দের প্রচলিত বানান অযথা বদলাবার যে অনাবশ্যক পরিশ্রম লেখক করেছেন আমরা তার পক্ষপাতী নই। বইটির ছাপা, বাঁধাই এবং কাগজ অতি সুন্দর; কিছু ছবিও আছে।

ছোটদের জন্য গল্পচ্ছলে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী পরিবেশন করেছেন শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত তাঁর 'ছোটদের রামকৃষ্ণ' গ্রন্থে। এ ধরণের সদ্‌গ্রন্থ যত প্রচারিত হয় ততই ভাল।

'ইন্দোচীনের কথা' একখানি ভ্রমণকাহিনী। লিখেছেন শ্রীঅজিতকুমার তারণ। অজিত বাবুর লেখার সঙ্গে রামধনুর পাঠকেরা যথেষ্ট পরিচিত এবং এই বইটিরও কিছু কিছু অংশ তাদের অপরিচিত নয়। লেখক সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত থাকাকালীন ইন্দোচীনে যাবার এবং বেশ কিছুদিন সেখানে থাকবার সুযোগ পেয়েছিলেন। জেনেভায় ইন্দোচীনের যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুসারে যে আন্তর্জাতিক তদারকী কমিশন ও-দেশে গিয়েছিল ভারত ছিল তার সভাপতি, আর অজিত বাবু গিয়েছিলেন এই কমিশনেরই সঙ্গে। কাজেই ইন্দোচীনকে খুঁটিয়ে দেখবার সুযোগও তাঁর হয়েছিল। আর, সবচেয়ে বড় কথা, শুধু দেশভ্রমণের উদ্দেশ্যই তাঁর ছিল না—ওদেশের অন্তরের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। নানা অঞ্চল ঘুরেছেন, নানা ধরণের লোকের সঙ্গে মিশেছেন, এমন কি ও দেশের ভাষা শুদ্ধ শিখে নিয়েছেন। কাজেই ইন্দোচীনের সঙ্গে তাঁর প্রায় একটা নাড়ীর যোগই ঘটে গেছে। তাঁর ওখানকার নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা এই বইএ তিনি বর্ণনা করেছেন। বিষয়ের বৈচিত্র্যে এবং লেখকের রসাল ভাষায় বইটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে।

সব শেষে মধুরেন সমাপয়েৎ করি একখানি মজার কবিতার বইয়ের কথা বলে—কবি শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিকের 'কবির লড়াই'। এমন মজাদার, এমন মিষ্টি, ছন্দমধুর রসোত্তীর্ণ বই ইদানীং খুব বেশী চোখে পড়ে না। এমন একখানি বই যে নানা জায়গায় অভিনীত হয়ে রসজ্ঞদের সমাদর লাভ করবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এতদিন পরে পুস্তকাকারে বইখানা পেয়ে সকলেই খুসী হবেন। অবশ্য এর অনেক কবিতাই হয়তো রামধনুর পুরানো পাঠকদের কাছে অপরিচিত নয়, তবু নতুন করে পেয়ে সেগুলো মন্দ লাগবে না। বইটির দাম আর একটু কমাতে পারলে কিন্তু আমরা আরও খুসী হতাম।

[এই বইগুলির প্রকাশকের নাম, ঠিকানা এবং বইএর দামের কথা ইতিপূর্বেই, আশ্বিন সংখ্যা রামধনুতে (পৃ ৩০৭) প্রকাশিত হয়েছে।]

সোনা-চরের মৃত্যু

৺ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এপারে পদ্মা—ওপারে পদ্মা—মাঝখানে সোনা-চর
ছবির মতন—কলাঝাড়ে ঘেরা, সেথা দুইখানি ঘর।
বাদলের দিনে দোলে কচি ধান, আশ্বিনে দোলে কাশ,
সোনা হেমন্তে বাসা বাঁধে সেথা দূরের প্রবাসী হাঁস।
ভরা বাদরের পদ্মা ডুবায়ে আধখানি সোনা-চরে—
দু'খানি কুঁড়ের ছেলেমেয়েদের সাথে কত খেলা করে।
এ ঘরে নকিব—ও ঘরে নন্দ—আয়েষা ও ইতুরাণী,
চার ভাইবোন তারা একমন—সোনার জীবনখানি।
স্যাঙাৎ সালেম, বন্ধু বিপিন—বাঁধা তারা বুকে বুকে,
পদ্মার চরে স্নেহ-বাঁধা ঘরে থাকে তারা কত সুখে।
বাপের স্নেহেতে বাড়ে ভাই-বোন—মা নেই তাদের হায়,
নদী-মা তাদের ঘিরে স্নেহ ঢালে—সুখে দিন কেটে যায়।

বাঙলার ছেলে—বাঙলার মেয়ে গায় বাঙলার গান,
বাঙালীই তারা—নয় ত' হিন্দু—নয় ত' মুসলমান।
শ্যামলে কোমলে বিকশিত স্নেহে এই বাঙলার বুকে
ফুলের মতন ফুটে ওঠে তারা—থাকে স্বর্গের সুখে।
জানে তারা শুধু পদ্মা নদীরে—জানে সোনা-বালুচর,
বিগলিত স্নেহে কোমল শ্যামল ওই ক'টি অন্তর।
বন্ধু সালেম—বন্ধু বিপিন সাত জনমের ভাই,—
বাঙলা মায়ের সন্তান দোঁহে—কোনো ভেদাভেদ নাই।
নকিব, নন্দ, আয়েষা ও ইতু পৃথক্ ত' নহে কেহ,
ঘনীভূত যেন ওদের জীবনে বাঙলা মায়ের স্নেহ।

পাল-তোলা ডিঙা নায়ে বাপ-ছেলে যায় পদ্মার জলে,
মাছ ধরে আর গায় ভাটিয়াল নীল আকাশের তলে।

কত না সাঁতারে—এপারে ওপারে খেলে মিলে দুটী ভায়ে,
ইলিশ বেচিয়া ভাব করে আসে সকলের সাথে গাঁয়ে।
কাল বৈশাখে পাগল নদীতে ঝঞ্ঝা ঘনায়ে আসে,
ঢেউ কেটে কেটে মাঝ দরিয়ায় যেতে তারা ভালবাসে।
বাদলের দিনে ফুলে ফুলে নদী দু' পার ভাসায়ে চলে,
ভেসে যায় চর, ভেসে যায় গ্রাম উদ্দাম ঘোলা জলে !
আশ্বিনে দোলে চরে চরে কাশ—শুভ্র কোমল ঢেউ,
দু' পারে শ্যামল স্বর্ণের শোভা—দেখে নি কোথাও কেউ।
অঘ্রাণে নীল জলে নেমে আসে নীল গগনের মায়া,
সোনার বরণ হয়ে ওঠে মাঠ—ঘরে ঘরে সুখছায়া।
শীতের পহরে বনে পাতা ঝরে, নীচে জল যায় নেমে,
ডিঙা বেয়ে যায়—ওরা দুটী ভায়ে এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে থেমে।
মধু মাসে নেমে আসে মাধবিকা বাঙলার গাঁয়ে গাঁয়ে—
চরে, মাঠে, বনে, কোকিল-কূজনে, মধুর দখিন বায়ে।
সারা বরষের সুখ-দুখ বয়ে দিন চলে যায়, আর
থাকে বুকে বুকে মিলে দুখে সুখে দীন দু'টী পরিবার।

দিন চলে যায়—সালেম ও বিপিন নকিব নন্দে ডাকি
বুকে জড়াইয়া বলে স্নেহভরে মুছে জলভরা আঁখি—
'কোনো দিন বাছা, ভুলেও কারেও ভেবো না ক' যেন পর,
চির একমন তোরা ভাইবোন—এই যে মায়ের ঘর।'
আয়েষা ও ইতু বাপের পায়ের ধূলা লয় শিরে তুলি,
পূবের বাতাসে কলাঝাড় ওঠে পুলকেতে দুলি দুলি।
এপারে পাখীর গান চলে যায় দূরের কাজল পারে,
চরের মাটীতে পদ্মার ঢেউ মাথা কোটে বারে বারে।
সোনার আকাশে অতি দূর পারে মেঘে জাগে রাঙা হাসি,
নদী, মাটী, জল বলে—'ভাইবোন, তোমাদের ভালবাসি।'

সুন্দর ধরা বড় সুখে ভরা বিধাতা-আশীষে জানি,
মাটী মধুমাখা, স্নেহ মধু-ঢাকা বাঙলার হিয়াখানি।

মধুর তটিনী, মধু বনভূমি, মধুর বিহগ-গাথা,
মধু বাঙলার মাঠে বাটে আছে লক্ষ্মী-আসন পাতা।
কুসুমেতে কীট পশিয়া গোপনে মাধুরী তাহার হরে,
ঘৃণা-বিদ্বেষ-পরশে হিয়ার করুণা মমতা ঝরে।
প্রেমে মধু-মাখা মানবের হিয়া এ বিধান বিধাতার,
দেবতা-আশীষে তাই দিশে দিশে সুন্দর সংসার।
গোপনে দানব রয়েছে জাগিয়া আদি-হীন যুগ হ'তে,
নীরবে কুটিল করিছে মানবে ঘৃণা-বিদ্বেষ-স্রোতে।
নরকের কোণে বসিয়া বিরলে ছড়াইছে হলাহল,
পলকে শুকায় পুলক বিকচ স্নেহ-হৃদি-শতদল।
নীল হয়ে ওঠে দানবের বিষে সুন্দর ধরাখানি,
দেবতা দানবে—অসুরে মানবে সুরু হয় হানাহানি।

এপারে ওপারে কাল বৈশাখী—অসুরের চীৎকার,
এ কি দুর্দ্দিন আসিল ঘনায়ে চারিদিকে বাঙলার !
নারী ও শিশুর ব্যথিত কণ্ঠ উঠিছে আকাশ জুড়ি,
ঘৃণা-বিদ্বেষে ভাই বসাইছে ভায়ের বুকেতে ছুরি।
ছিল পাশাপাশি—সুখে হাসাহাসি—কত প্রীতি, কত গান,
ছিল ত' বাঙালী—ছিল না ক' তারা হিন্দু-মুসলমান !
ছিল ভারতের—ছিল পৃথিবীর—ছিল মানবতা সাথে,
পশুর দীক্ষা পেল তারা আজি কোন্ দানবের হাতে ?
গৃহদাহ-ধূম ওঠে গাঁয়ে গাঁয়ে,—ব্যথিতের চীৎকার,
লাল হয়ে ছোটে পদ্মার জল কেঁদে ভেঙে দুই পার।
সাত জনমের ভিটা ছেড়ে যায় বাঙলা মায়ের ছেলে,
পথের ভিখারী—ধনী আর দীন—জোলা, মাঝি, মুটে, জেলে।

গভীর নিশীথে সোনা-বালুচরে কে আসে গোপন পায়ে,
বিপিনে টানিয়া আনে ঘর থেকে কলা-বনটীর ছায়ে।
স্বরগমধুর ঘুমের পরশে সুখে ছিল ক'টি প্রাণী,
কোন্ নরকের অসুর নামিল নিঠুর আঘাত হানি !

আঁধারের কোলে ঝক্ ঝক্ দোলে বিপিনের বুকে ছুরি,
ছুটিয়া আসিয়া সালেম তাহারে লইল বক্ষ জুড়ি'।
চীৎকারি' বলে—'এসো, কে লইবে মোর সাঙাতের জান্!
বুকের কল্‌জে করে লও মোর তার আগে খান্ খান্।'
'মুসলমান কি হিঁদুরে বাঁচায়?—কাফের যে ওরা—শোন!'
দুই বাপ চেপে রাখে লোহা-বুকে চারিটি ভাই ও বোন।
দয়ামায়া গেছে—গিয়েছে দরদ—পশুর অধম তারা—
দুই বৃদ্ধেরে বধিতে বাধে না—ঝরিল রক্তধারা।
নিকষ আঁধারে লোহু-ফেনারেখা পদ্মার জলে ছোটে,
দেবতার মত কচি ছেলেমেয়ে ফুলে ফুলে কেঁদে ওঠে।

সহসা নকিব ঘরে ছুটে গিয়ে কাটারি উঠায়ে আনে,
বুকে আগুলিয়া ধরে ভাইবোনে—বাঁচাবে তাদের প্রাণে।
শান্ত মধুর আঁধারের বুকে নরক নামিয়া আসে,
আকাশ, বাতাস, পদ্মার জল চমকি উঠিল ত্রাসে।
লাঠি ওঠে পড়ে—ছুরি চম্‌কায় চারিটি শিশুর 'পরে,
উঠিল কাঁপিয়া দশ দিগন্ত সহসা রুদ্র ঝড়ে।
গুমরি' গুমরি' উঠিল ঝলকি' ভরা পদ্মার জল,
সুদূরের পারে বনতরু-সারে উন্মাদ কোলাহল।
দুষ্‌মন্ যারা সোনা-চরে আসি মহাপাপখানি সাধি'
বিধাতার কাছে শিশু ও বৃদ্ধ হত্যার অপরাধী—
একটীও প্রাণী বাঁচে নি তাদের—রাতের উতলা ঝড়ে
তলিয়ে গিয়েছে পদ্মার নীচে চিরজনমের তরে।

দুখের রাত্রি হ'ল অবসান—রবির কিরণ হাসে
নদীর দু' পারে—বনতরুশিরে, ফুলবনে, ঘাসে ঘাসে।
আকুলি' পদ্মা ছুটেছে অকূলে—কোথা সোনা-বালুচর!
কোথা ভাইবোন—কোথা দুই বুড়া—কোথা রে সে দু'টী ঘর!
রাতের আঁধারে ডুবে গেছে সব পাগল নদীর নীরে,
বেদনা-কাহিনী ছল ছল করি' কাঁদে শুধু দুই তীরে।

সে বেদনাখানি শুনি প্রকৃতির নয়নে অশ্রু ঝরে,
ক্ষণেকের লাগি মায়া ওঠে জেগে নির্দ্দয় অন্তরে।
বুকে বুকে সুখে ছিল ঘরে ঘরে ভাই ভাই ব'লে যারা—
কার অভিশাপে হ'ল বল আজ জনমশত্রু তারা?
কি শিখাল আজ ধর্ম-বিভেদ, জাতিবিদ্বেষ-বাণী?
কলুষিত করে দিল কে গরলে বাঙলার হিয়াখানি!

জানি আমি জানি রবে না এ দিন জাগিবে ও সোনা-চর,
ওই কলাঝাড়ে ঘেরা দেখা দেবে আবার দু'খানি ঘর।
চার ভাইবোন, দুই বুড়া সাথী আবার আসিবে ফিরে,
প্রীতির স্বর্গ নামিবে আবার সোনার বাঙলা ঘিরে।
এপারে ওপারে উঠিবে আবার জীবনের স্নেহগান,
নবীন বাঙলা রচিবে আবার হিন্দু-মুসলমান। *

* বছর দশেক আগে রচিত।

কাশ্মীরী কুসুম

শ্রীশামুক

মিতা কাশ্মীর বেড়িয়ে ফিরে এসে আর কথা বলে না। একেবারে যে বোবা হয়ে গিয়ে শুধু কয়েকটা অস্পষ্ট বিকট আওয়াজ করতে লাগল তা বলছি না। মানে, স্বাভাবিক কথাবার্তা বন্ধ করে দিল, বিশেষ করে বাড়ির বুড়োমানুষটির সঙ্গে।

আশ্চর্য এই, যে, বাড়ির সকলে মনে মনে দোষ দিতে থাকে ঐ বুড়ো মানুষটিকেই। ওঁরই তো উচিত আগেকার মতন সকাল সন্ধ্যে তামাক খাবার সময় কাছে ডেকে আদর করে বসানো, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত জিজ্ঞেস করা, মান-অভিমান হলে তা ভাঙানো, আর কারণে-অকারণে ফোকলা মুখে অট্টহাসি হেসে মনের গুমোট সাফ্ উড়িয়ে দেওয়া।

তা কিচ্ছু নয়। দেড় চোখ বন্ধ করে ভুড়ুক ভুড়ুক টান আর মিটি মিটি মিচকি হাসি। বুড়ো মানুষটির কাছে কি কোন আভাস এসে গিছল যে আদরিণীর মেজাজের ঘূর্ণিঝড় তাঁকে কেন্দ্র করেই? তাই সময় বয়ে যেতে দেওয়া—যাতে ঝড়ের গতি ছড়িয়ে যেতে যেতে উগ্রতা কমে যাবে?

মিতার আর ধৈর্য থাকে না। চারপাশে কয়েকবার এলোমেলো ঘুরে দাঁড়িয়ে যায়,—কলকেটা বদলে দেব?

—দাও।

নতুন কলকেতে টান সুরু হয়, তবু বসতে বলে না কেউ।

—ভালো সাজা হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—কথা বলছ না কেন?

—কি বলব?

ঝংকার দিয়ে,—এতোদিন কি আমি শিখিয়ে দিতাম?

—যোগান দিতে।

মিতা রেগেমেগে গা ঘেঁষে ধপ্ করে বসে পড়ে।

—জানো, তোমার বিয়ের চেলী পরেই আমার এমন বিপদ্ হ'ল?

—আগে জানলে অমন অপকর্ম কিছুতেই করতাম না!

—আমি কি তাই বলছি?

—আমি তো তা বলছি না।

মিতার ইচ্ছে হ'ল কলকেটা তুলে আছড়ে ভেঙে ফেলে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখলে। দেখে আধখানা খোলা চোখও বুজে গেল। ভুড়ুকের টান ও আওয়াজ ধাপে ধাপে চলল বেড়ে।

মিতা বুড়ো মানুষটির পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিল, কাঁধ, কনুই ও হাতের গোছ জোরে জোরে টিপে দিল, তারপর চক্চকে টাকের ওপর চুলকে সুড়সুড়ি দিতে দিতে বলে,—শোন না, সত্যি, বড় বিপদে হয়েছে তোমার ঐ বিয়ের চেলীখানা পরে—তোমায় ছাড়া কাকে বলি?—কেউ জানে না।

এবারে দুটো চোখ পুরোপুরি খুলে, ফোকলা মুখে একগাল হেসে প্রশ্ন আসে,—বিপদ্ কেন হতে যাবে? কি হয়েছে?

—তুমি তো তোমার চেলীখানা আমায় দিয়েছিলে, এতোদিন তুলে রেখেছিলাম, এই কলকাতায় কোথায় প'রে যাবো—সকলে হাসবে, ঠাট্টা করবে। অনেক দিন ধরে কিন্তু পরবার বড় সাধ ছিল, তাই সেখানি কাশ্মীরে নিয়ে গেছলাম। শ্রীনগরের নিষাদবাগ জান তো?

—জানি—স্বপ্নে।

—না না, আমারই ভুল, তুমি দেখবে কি করে? শোন না, নিষাদ বাগ সত্যি

চমৎকার বাগান। কত রঙিন ফুল, কত পাতাবাহারি গাছপালা!—জানো, দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে যায়, ফিরে আসতে ইচ্ছে হয় না!

—না ফিরলেই হ'ত!

—আঃ, শোন না। চেলীখানা প'রে সকালে সেখানে গেছলাম। বেড়াতে বেড়াতে দলছাড়া হয়ে শেষ প্রান্তে চলে গেলাম। সেখান থেকে দূরের বরফ-ঢাকা পাহাড়ের চূড়ো আর নীচের গভীর সবুজ উপত্যকা একসঙ্গে চোখে পড়ে যায়। খুব ছোট ছোট নরম হলদে ফুলের গাছের তলায় পৌঁছে দাঁড়ালাম। ফুলওয়ালা একটা ভাঙা ডাল পড়ে ছিল। সেটা কুড়িয়ে শুঁকতে শুঁকতে আর অন্য হাত গাছের ওপর রেখে যেন আনন্দে জ্ঞান হারিয়ে গেল। এমন তন্ময় হয়ে গেলাম যে আশপাশের কোন কিছুর দিকে খেয়াল ছিল না। সত্যি বলছি! হঠাৎ কিট্ কিট্ আওয়াজ শুনে চমকে দেখি চারজন আমেরিকানের এক দল ছবি তুলছে আমার। তুমিই তো বলেছ ওরা ঠিক হনুমানের মত দেশ ভ্রমণ করে—এক লাফে লংকায় গেল আর এল। এমন রাগ হ'ল যে হাতের ডালটা দিলেম ছুঁড়ে। তাড়া-হুড়ো করে পালাতে গিয়ে—দু'জনার মাথা গেল ঠুকে, আরেকজনের টুপি পড়ে গেল খাদের ভেতর। এখন আমার বিপদ তো বুঝছো? ঐ ছবি দেখলে সকলে ভাববে আমি বুঝি—

—হুঁ, আমারও তো তাই মনে হয়!

—কী? ইচ্ছে করে?

—নিশ্চয়ই!

ধড়ফড় করে উঠে মিতা চলতে সুরু করে।—আর যদি কোন দিন তোমার সঙ্গে কথা বলি! যত দিন বেঁচে থাকবো—

—দাবার ছকটা নিয়ে আয়, অনেক দিন খেলা হয় নি।

পিছন থেকে বুড়ো মানুষটির হাঁক শুনতে পেয়েও মিতা কোন উত্তর দিল না। কিন্তু কয়েক মিনিট পরে দুম্ দুম্ করে ফিরে এসে দাবার ছক পেতে ঘুঁটি সাজিয়ে নিল।

দু'জনে চুপ করে খেলে, কারুর মুখে কোন কথা নেই। মিতা ফোঁস্ ফোঁস্ করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, আর বুড়ো মানুষটি ফিক্ ফিক্ করে মিচ্‌কি হাসে।

বুড়ো মানুষটির 'ঘোড়া' ডান দিকে আড়াই ঘর লাফ দিয়ে তড়াক করে নিজের জায়গায় ফিরে আসে—সামনে যে ভয়ানক বিপদ্ সেটা আগে চোখে পড়ে নি।

কট্‌মট্ করে ঘোড়ার দিকে চেয়ে মিতা বলে,—চাল দিয়ে ফিরিয়ে নেওয়া নিয়ম নয়।

বোড়ে ঠেলতে ঠেলতে উত্তর আসে,—অঙ্কের চাল দেবার আগে ফিরিয়ে নেওয়া আলবৎ যায়।

মিতা যেন হঠাৎ কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে,—কেন তুমি এ রকম ক'রছো আমার সঙ্গে? তুমি ছাড়া বিপদ্ থেকে কে আমায় বাঁচাবে? সকলে ঐ ছবি দেখলে কি করবে?

—যোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বলবে—আহা, সাক্ষাৎ ভগবতী রে! কী সুন্দর যে হয়েছে ছবিখানি—আহা!

—তুমি দেখেছ?

—একশো বার।

—আছে তোমার কাছে?

এবারে মিতা ঝাঁপিয়ে জড়িয়ে ধরে,—দেখাও, দেখাও আমাকে, দু'টি পায়ে পড়ি তোমার।

পাশে রাখা কাগজের স্তূপের নীচে লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা। তাতে আর্ট-পেপারে পরিষ্কার ছাপা হয়েছে রঙিন ছবিটি—নীচে নাম দেওয়া হয়েছে—'কাশ্মীরী কুসুম'।

দু'জনে বার বার দেখে, পরস্পরের মুখের দিকে চায়, আর খুশিতে হাসিতে টল টল করে,—ফুলে ফুলে ওঠে ঢেউএর মত।

—দেখ দাদু, আরেক দিন অমনি করে সাজবো তোমার ঐ বিয়ের চেলী প'রে—যে দিন বাড়িতে আর কেউ থাকবে না—শুধু তুমি আর আমি, আর কেউ না—কেমন? কেমন?

বুড়ো মানুষটি ঘন ঘন মাথা নেড়ে নেড়ে সায় দেয়। এক জব্বর ফন্দী মাথায় এসেছে বটে! এবারে খুসির জোয়ার বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে আসে। দু'জনে হাসে—প্রাণ খুলে হাসে—সে কত সুরে, কত ছন্দে!

বাড়ির লোকেরা দূর থেকে কান খাড়া করে শোনে। শুনে আশ্বস্ত হয়—যাক এবারের মত ফাঁড়া গেল কেটে!

মেঘনাদ

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

৫

সে রাত্রে ইন্দ্রনীল আর ঈজি-চেয়ার ছেড়ে উঠল না। পৃথার উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তরে কেবল হুঁ-একটা হুঁ-হাঁ করে জানাল আজ সে বড্ড পরিশ্রান্ত, কোন কথাবার্তা বলবার মত শরীরের অবস্থা তার নেই। যা বলবার কাল বলবে। কিছুই খেল না সে। ফলে পৃথাও রাগ করে, হাঁড়ীতে জল ঢেলে, অভুক্ত অবস্থায় গিয়ে নিজের ঘরে খিল দিল।

শেষ রাত্রের দিকে আবার সুরু হ'ল বৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া। ইন্দ্রনীল তেমনি কাৎ হয়ে ঈজি-চেয়ারে পড়ে আছে। পৃথা একবার ভাবল, একটা চাদর নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি দাদার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আসে। যে রকম কথায় কথায় ঠাণ্ডা লাগে ওর, একটু অসাবধান হলেই শর্দী-কাসি ধরে যাবে। তখন ভুগতে হবে পৃথাকেই। কিন্তু নাঃ, দাদার আজকের ব্যবহারের পর পৃথা আর 'সেধো' সেজে ওকে খোসামোদ করতে যাবে না। ভোগে ভুগুক গে! বয়ে গেল তার।

তবু ২।৩ বার উঠি উঠি করে বহু কষ্টে নিজেকে দমন করল সে। ইন্দ্রনীল যেমন ঘুমকাতুরে, হয়তো কিছুই টের পেত না। কিন্তু পৃথাও কি ঘুমুতে জানে না?

শেষে শেষ রাত্রের দিকে সেও সত্যি সত্যি গভীর ঘুমে ঢুলে পড়ল।

অন্য দিনের চেয়ে একটু বেলা করেই ঘুম ভাঙ্গল পৃথার। জানালার ভিতর দিয়ে রোদ এসে গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেতে। ইন্দ্রনীলের ঘুম ভাঙ্গতে দেরী হলেও পৃথার বড় একটা দেরী হয় না। দাদা ওঠার অনেক আগেই উঠে সে মুখ-হাত ধুয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দেয়। আজ কিন্তু উল্টো ব্যাপার। পৃথা জাগবার আগেই ইন্দ্রনীল

উঠে পড়েছে। শুধু মুখ-হাত ধোয়াই শেষ করে নি, গলায় একটা চাদর জড়িয়ে খবরের কাগজ নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ে চলেছে। এ রকম ব্যাপার বড় একটা দেখা যায় না। পৃথা লজ্জা পেল, তাড়াতাড়ি তোয়ালে নিয়ে স্নানের ঘরে চলে গেল সে।

ফিরে এসে দেখে যা ভেবেছিল ঠিক তাই হয়েছে। সারা রাত্রি ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে ঈজি-চেয়ারে আ-ঢাকা অবস্থায় শুয়ে থেকে দস্তুর মত ঠাণ্ডা লেগে গেছে ইন্দ্রনীলের। থেকে থেকে খুক্ খুক্ করে কাসছে। পৃথাকে দেখে আস্তে বল্‌ল, 'তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা করে দে ত'।' চেঁচিয়ে কথা বলবারও ক্ষমতা নেই তার, ঠাণ্ডায় গলা একদম বসে গেছে।

পৃথা জবাব দিল না কোন, নীরবে চা তৈরী করতে লাগল। মনে মনে ভাবল, বেশ হয়েছে, ঠাণ্ডায় গলা ভেঙ্গে গেছে। কালকে একটি কথা বলার ফুরসৎ হ'ল না বাবুর! ওঃ, পারিশ্রম হয়েছে তো ভারী হয়েছে! এদিকে ও যে অত রাত্রি পর্যন্ত ছট্‌ফট্ করেছে, ক্রমাগত ঘর-বার করেছে—তা যেন কিছু নয়? ভাবতেই অভিমানে চোখ ছল ছল করে উঠল।

কিন্তু ইন্দ্রনীলের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কাগজ পড়ছে তো পড়ছেই। পৃথা চায়ের কাপ্‌টা ঠেলে দিতেই সে আলগোছে সেটি তুলে নিল কেবল, পৃথার দিকে ফিরেও তাকাল না একবার।

পৃথাও চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভাবছিল এইবার হয় তো ইন্দ্রনীল মুখ খুলবে। গত কালকার ঘটনা—কি এমন ঘটেছিল যার জন্য অত রাত হ'ল, অত ক্লান্তি ভোগ করতে হয়েছিল ওকে, সব খুলে বলবে, বীতং দিয়ে—হাত-পা নেড়ে অদ্ভুত ভঙ্গীতে—যেমন ওর স্বভাব। কিন্তু নাঃ, আজ যেন খবরের কাগজে পেয়ে বসেছে ওকে।

হঠাৎ ইন্দ্রনীল এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'ওঃ, সাড়ে আটটা বাজে! আমি যাচ্ছি, অফিসে ভীষণ কাজ পড়েছে, এখনই যেতে হবে। ওখানকার ক্যান্টিনেই খেয়ে নেব আজ।'

'কিন্তু'—পৃথা এবার লজ্জার মাথা খেয়ে বল্‌ল, 'এই শরীর নিয়ে? গলাটা যে এখনও ধরে আছে—স্বর বেরোচ্ছে না! একটু গার্গল্ করে যাও। গরম জল তো রয়েছেই, আমি নুন মিশিয়ে দিচ্ছি।—নাকি লিষ্টারিন্ দেব?'

'ও পথে একটা ওষুধ-টোষুধ কিনে খেয়ে নেব।' বলেই ইন্দ্রনীল তাড়াতাড়ি জুতো পায়ে দিয়ে গট্ গট্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ব্যাপার দেখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল পৃথা।

কলেজে গিয়েও মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল পৃথার। অধ্যাপিকার বক্তৃতায়

মন লাগছিল না একদম। তবু কোন রকমে ক্লাসগুলো কাটিয়ে দিল সে। কিন্তু তিনটের সময় ছিল একটা প্র্যাক্‌টিকাল্ ক্লাস্. সেটাতে আর গেল না। তু' তু'টো পার্সেন্টেজের মায়া কাটিয়ে তখনই বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। দাদা ফিরবে পাঁচটার পর। আজ আর নিশ্চয় দেরী করবে না। তখন একবার ভাল করে বোঝাপড়া করে নিতে হবে। মনে মনে তারই খসড়া করতে করতে বাড়ী ঢুকল সে।

একটু পরেই মনে হ'ল ঘরটা যেন কেমন কেমন লাগছে! কেমন খালি খালি—কি যেন নেই! হ্যাঁ, ঠিকই বটে। আলনায় দাদার কাপড়-জামাগুলো উধাও হয়েছে। ওদিকে স্যুটকেসটাও তো দেখা যাচ্ছে না! বিছানাটাও পূরো নেই! তবে কি তুপুরে ঘরে চোর ঢুকেছিল? কিন্তু ঘরে তো চাবি দেওয়া থাকে। ডুপ্লিকেট চাবি, একটা তার কাছে, আর একটা ইন্দ্রনীলের কাছে। ওরা একজন খুলে না দিলে তো ঘরে ঢোকা যায় না! আর ঘর তো আজ ঠিক মত তালা দেওয়াই ছিল! তার চাবিটা তো তার কাছেই আছে! ইন্দ্রনীল অবশ্য তাড়াতাড়ি যাবার সময় চাবিটা ফেলে গিয়েছিল, সে-ই দেখতে পেয়ে ডেকে দিয়ে দিয়েছে সঙ্গে। কাজেই সে চাবিও তো হারাবার কথা নয়!

ভাবছে, এমনি সময়ে পাশের ফ্ল্যাট্ থেকে মাসিমা অর্থাৎ মিসেস্ বোস ডেকে বললেন, 'পৃথা, এসেছ? ইন্দ্রনীল তো একটু আগেই এসেছিল। তোমার খোঁজ করছিল। না পেয়ে আমাকে বলে গেল। ওকে আপিসের কাজে আজই দিল্লী যেতে হচ্ছে। ফিরতে দেরী হবে। আবার নাকি আপিস হয়ে যেতে হবে, তাই তুপুরে এসে বিছানা, স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়ে গেছে। তোমাকে বলে দিতে বল্‌ল। গিয়ে খবর দেবে। সাবধানে থাকতে বলে গেছে।'

'কিন্তু ··'

'হাঁ, বুঝেছি কি বলবে। ওর শীররটা তেমন ভাল নেই মনে হ'ল। ঠাণ্ডায় গলা একদম বসে গেছে। কাসিও রয়েছে দেখলাম একটু। আমি অবিশ্যি ওকে খুব সাবধান করে দিয়েছি। বল্‌ল, সঙ্গে ওষুধ নিয়ে যাবে, ভয়ের কারণ নেই। ও বিশেষ কিছু না। তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল না তাই তুঃখ করছিল।'

মিসেস্ বোস প্রবোধ দিয়ে চলে গেলেন।

এবারে অভিমানে ভেঙ্গে পড়ল পৃথা। হুঁঃ, তুঃখ করছিল না হাতী! এ সময়ে যে পৃথা বাড়ী থাকে না—কলেজে যায় তা যেন দাদার জানা নেই? ঢং দেখাবার আর জায়গা পায় নি। কিন্তু কেন?—কেন? দাদার হ'ল কি? হঠাৎ এমন লুকোচুরি সুরু করবার মানে? (ক্রমশঃ)

সাঁতার দিয়ে সাগর পাড়ি

শ্রীকৌটিল্য

ফ্রান্স আর ইংল্যাণ্ডের মাঝখানে ছোট্ট এক ফালি সাগর—ইংলিশ চ্যানেল। নামে চ্যানেল হলেও আসলে এটি সমুদ্রই, এবং দুরন্ত সমুদ্র বলতে যা বোঝায় তাই। আড়াআড়ি ভাবে মাপলে হয়তো এই সমুদ্রের বেড় হবে ২১।২২ মাইল, কিন্তু এতে স্রোতের এমন টান যে সাঁতরে পার হতে গেলে এঁকেবেঁকে কম করে প্রায় ৪০ মাইল পথ সাঁতরাতে হয়। শুধু তাই নয়, আরও অনেক বাধা আছে এ কাজে। দু' দিক্ থেকে দু'টি স্রোতে বইছে এই সমুদ্রে এবং তার একটি এত ঠাণ্ডা যে তার ফলে এর জল সর্বদাই মনে হয় বরফ-গলা জলের মত। তা ছাড়া বড় বড় ঢেউ, ঝড়, নোনা জল আর সামুদ্রিক প্রাণী—বিশেষ করে জেলিফিশের উৎপাত এই সমুদ্রে সাঁতার কাটার আরও কয়েকটি অন্তরায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নানা দেশের অসমসাহসিক সাঁতারুরা এই সমুদ্র সাঁতরে পাড়ি দিয়েছেন এবং যাঁরা সফল হয়েছেন তাঁদের সম্মান বড় কম নয়।

কিন্তু এত দিন পর্যন্ত কোন এশিয়াবাসী এই চ্যানেল সাঁতরে পার হতে পারেন নি। এবারেই প্রথম এবং অল্প দিনের ব্যবধানে দু' জন এশিয়ান্ সাঁতারু এই দুরূহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আবার মজা এই, এঁরা দু'জনেই বাঙ্গালী।—পূর্ব পাকিস্তানের শ্রীব্রজেন দাস ও পশ্চিম বাংলার শ্রীমিহির সেন (ব্যারিষ্টার)। প্রথম কৃতিত্বটা অবশ্য ব্রজেন দাসেরই।

ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হবার একটা প্রতিযোগিতায় ৩০ জন প্রতিযোগীর সঙ্গে এঁরা দু' জনও যোগ দেন। সাঁতরাতে হবে কেপ্ গ্রিজ নেজ থেকে ডোভার পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত ব্রজেন দাস ১৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিটে এই দূরত্ব পার হয়ে ২য় স্থান অধিকার করেন প্রথম হন আমেরিকান্ মহিলা সাঁতারু গ্রেটা এণ্ডার্সন (১১ ঘঃ)। ইনি অবশ্য আসলে ডেনমার্কের মেয়ে। গত বছরও ইনি এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন। ৩০ জনের মধ্যে মাত্র ৪ জন বাদে কেউই চ্যানেল পার হতে সমর্থ হন নি। মিহির সেনও ছিলেন সেই ২৬ জনের মধ্যে।

ব্রজেন দাসের বাড়ী ঢাকা। পূর্ব পাকিস্তানের লোক হলেও ইনি কলকাতার সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবেরও সভ্য এবং বিখ্যাত সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষের ছাত্র।

মিহির সেন এর আগেও দু'বার—অর্থাৎ পর পর মোট তিন বার ইংলিশ চ্যানেল পার হবার চেষ্টা করে বিফল হন। কিন্তু অদ্ভুত তাঁর অধ্যবসায়! এই অসাফল্যের

অল্প দিন পরেই তিনি আবার একক ভাবে ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ে নামেন—এবারে ডোভার উপকূলের কাছাকাছি শেক্সপীয়ার বে থেকে ফ্রান্সের কালে পর্যন্ত। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ড যাওয়ার চাইতে ইংল্যাণ্ড থেকে এ ভাবে ফ্রান্সে পৌছান আরও কঠিন। কিন্তু প্রবল ইচ্ছাশক্তির কাছে কিছুই আটকায় না শ্রীমিহির সেন ১৪ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে এই সাগর পাড়ি দিয়ে বাংলা দেশের তথা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

সর্বপ্রথম ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হয়েছিলেন ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েব (ইংল্যাণ্ড) ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। মেয়েদের মধ্যে এ কাজ সব প্রথম হাসিল করেন গার্ট্রুড ইয়ার্ডলি আমেরিকা)। আর সব চেয়ে কম সময়ে (১০ ঘণ্টা ৫০ মিনিট) এই চ্যানেল অতিক্রম করে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন হাসান আব্দেল রহিম (মিশর)।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

প্রথমেই ৺বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ জানাচ্ছি তোমাদের সবাইকে। আশা করি ছুটীর দিনগুলি তোমাদের বেশ সুখে, আনন্দে কেটেছে। তোমাদের তরফ থেকেও অসংখ্য চিঠি পেয়েছি ৺বিজয়ার শুভেচ্ছাসূচক। পৃথক্ ভাবে প্রত্যেককে জবাব দিতে পারলাম না, কিন্তু খুবই খুসী হয়েছি রামধনুর প্রতি তোমাদের এই স্নেহের পরিচয় পেয়ে। অন্যান্য চিঠির গোছাও বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। তারও কিছু কিছুর জবাব এই সঙ্গে দিচ্ছি।

শ্রীগুণধর বর্দ্ধন (ঝাড়বনী)—তোমার দীর্ঘ চিঠিতে তোমার অকপট মনের পরিচয় পেয়ে খুব ভাল লাগল। জীবনে সুখদুঃখ আছেই, তাতে ভেঙ্গে না পড়ে—তাকে তুচ্ছ করে যে এগিয়ে চলতে জানে তার জয় অবশ্যম্ভাবী! তুমিও নিশ্চয়ই জয়ী হবে। শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী (জাগলগড়ী)—তোমার অনাড়ম্বর মাতৃপূজার কথা শুনে বেশ ভাল লাগল। আমারও তো ঐ মত। কিন্তু লোকে তা বোঝে কই? শ্রীবিজলী সরকার (বজ্‌বজ্)—পূজোর দিনে মেঘলীলার যে ছবিটি তুমি কালির আঁচড়ে এঁকেছ তা বড়ই সুন্দর। খাতাটি আর একটু ভাল করে দেখে তোমায় খবর দেব। শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় (গড়বেতা)—তোমার অনুসন্ধিৎসাপূর্ণ দু'খানি চিঠিই পেয়েছি। শিশুসাহিত্যিক-পরিচিতি তো একে একে বেরুচ্ছেই। সময় মত সকলেরটাই বার করবার ইচ্ছা আছে। হাতের

কাছে যাদেরটা পাচ্ছি তাদেরটাই আগে যাচ্ছে। শ্রীমান্ অমল মিত্রকে খেলাধুলা সম্বন্ধে (শুধু ক্রিকেট, ফুটবল নয়—সব রকম খেলা) আরও লিখতে বলব। আদিনিবাস সম্বন্ধে তোমার এত কৌতূহল কেন? শ্রীমীনা মুখার্জি (কলিকাতা-২৫)—লেখক হবার সঙ্গে গ্রাহক হবার কোন সম্পর্ক নেই। তবে হ্যাঁ, রামধনুতে ছোটদের লেখার জন্য যে বিভাগটি আছে তার সুযোগ কেবল গ্রাহকদেরকেই দেওয়া হয়; —স্থানাভাবই এর কারণ। সাধারণ বিভাগ সকলের জন্যই খোলা। শ্রীদীপঙ্কর ঘোষ (বিষ্ণুপুর — গত সংখ্যা রামধনুতে প্রকাশিত 'এডেন' প্রবন্ধে যে গায়ত্রীর কথা আছে সে তোমার দিদির মেয়ে তা জানতাম না, জেনে খুব ভাল লাগল। গায়ত্রীর সঙ্গে অন্য যে মেয়েটির ছবি ছাপা হয়েছিল গায়ত্রীর বন্ধু বলে,—সে ওরই ছোট বোন এ খবরটাও পরে জানলাম। তা বোনের পক্ষে বন্ধুও হতে বাধা কি? শ্রীমুরারিমোহন মণ্ডল (চন্দননগর)—তুমি ঠিকই ধরেছ, 'ভেন্টি্লোকিজ ম্'ই "ছাপাখানার ভূতের উপদ্রবে" 'ভেন্টে্াসোকিজ ম্' হয়ে গেছে। শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ (আমতলা)—রামধনু পাবার এক সপ্তাহের মধ্যে ধাঁধার উত্তর পাঠালে চলবে। প্রবন্ধ বা গল্প ফেরৎ পেতে হলে সঙ্গে টিকেট থাকা দরকার। কবিতা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব হয় না। শ্রীসৃষ্টিধর মুখোপাধ্যায় (চাঁদবাটি)—পি টি. আই, রয়টার—এগুলি হচ্ছে সংবাদ পরিবেশনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম। এখান থেকে খবর-কাগজের অফিসে খবর যোগান হয়। এ রকম অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। রয়টারের নাম সবচেয়ে বেশী। টেলিফোন হচ্ছে এখন ডাক বিভাগের একচেটিয়া সম্পত্তি। তারা ছাড়া আর কেউ যদি নিজেরা পৃথক্ টেলিফোনের সরঞ্জাম বসায় তা হলেই সেটা 'অননুমোদিত' অর্থাৎ বে-আইনী হবে। শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা-৪০)—তোমার ছোট্ট কিন্তু সুলিখিত চিঠিখানা বেশ লাগল। বিজয় বাবু হচ্ছেন বিখ্যাত ব্যায়ামী শ্রীবিজয় মল্লিক।

আজকের মত এখানেই শেষ করি—প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে। —ইতি রাঃ সঃ

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

দাঁত। থাকে মুখের মধ্যে।

উত্তরদাতাদের নাম:— দিলীপ সমাজদার (কলিকাতা ১২); কল্যাণকুমার কীর্ত্তি (এলাহাবাদ); রাণী চ্যাটার্জী, নেবু ও আলোক চ্যাটার্জি, নিমাইএর মা, নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দানাপুর); প্রশান্ত পাঠক (সোনামুখী), রজত চন্দ ও সঞ্জয় চন্দ (শিলং); ওস্তাদ, স্বস্তিকা ও সুদর্শন (বর্দ্ধমান); স্বপন, তপন, টুনু, কাকু, মাস্তু ও গোলা (নৈনীতাল); বারিদদা, নীরোদদা, শম্ভু বাবু, দিদি, বৌদি ও মুরারি (চন্দননগর); সুনীলকুমার ঘোষ (আমতলা); রবীন্দ্র শোভনা, ডলি, শৈলী, বেবী, ছবি, দেবু, দিলু, মণ্টু, সণ্টু, বাবা, মা, খোনা, বামুনদি (কলিকাতা-২); ভবেশ, মোহনলাল, অরবিন্দ (উত্তর ভাটোরা); বকুলতলা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ (দফরপুর), তুষার, সিপ্রা, অমল, শুভ্রা, চন্দ্রা, সানি, কাঞ্চন (কাঞ্চননগর); অমিতাভ ও অশোকনাথ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর); রীতা, কৃষ্ণা, টুলটুল, বুবু, প্রভাস, টুবলু, বেতুন, দেবাণী, বন্দনা (ডাল্টনগঞ্জ); পিলপিলি ব্যানার্জী (লিলুয়া); বিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, চম্পা দেবী, সুমিত্রা দেবী, জয়ন্তকুমার (কলিকাতা-৪০); সুচেতা ও রত্নাবলী ভট্টাচার্য (কলিকাতা-২৫)।

নূতন ধাঁধা

নীচের লেখাটা পড়া যাচ্ছে না তো? আচ্ছা, প্রত্যেকটি সংখ্যার জায়গায় একটি করে পছন্দসই বাসনকোসন বা ঐ জাতীয় নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের নাম বসিয়ে দেখ তো পড়তে পার কি না! সবটা পড়তে পারলে পত্রিকা পাবার এক সপ্তাহের মধ্যে লিখে পাঠাও। (সঙ্গে নিজের গ্রাহক নম্বর অবশ্যই দিতে হবে।)

হাকিম বড় ১। ২ কথায় না ভুলিয়া মামলা ৩মিস করিয়া দিলেন। যা খরচ হইয়াছে তবে ৪শীল হইবে? আহ্লাদে ডগ৫ হইয়া ৬র ৭ ফিরিল। কিন্তু ফিরিয়া দেখে সব ৮ফ হইয়া গিয়াছে। এমন কি দড়িতে বাঁ৯র ১০ড়খানাও ১১ইয়াছে। মা ১২পানা মুখে বসিয়া ১৩ প্যান করিতেছেন। জ১৪ হইলে করিবেন হয়তো। এমন যে ১৫বে তা সে ভাবে নাই। স১৬মা ছাড়াইয়া গিয়াছে যেন! নিশ্চয় এ ১৭মোহনের কাজ। লা১৮গানো ঘোড়ার মত তাহাকে আটকানো দরকার। অত্যন্ত ১৯ হইলে এমন করে? সামনে পাইলে 'নর্ঘাৎ ২০হাতি হইয়া যাইত। কয়লার ঘরটায় ২১ হইয়া ঢুকিতে হয়। দরজায় হাত দিতেই সে২২ করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। মনটা ও ২৩এর মত চুপসাইয়া গেল। কিন্তু বৃ২৪ফালাফি করিয়া তো লাভ নাই!

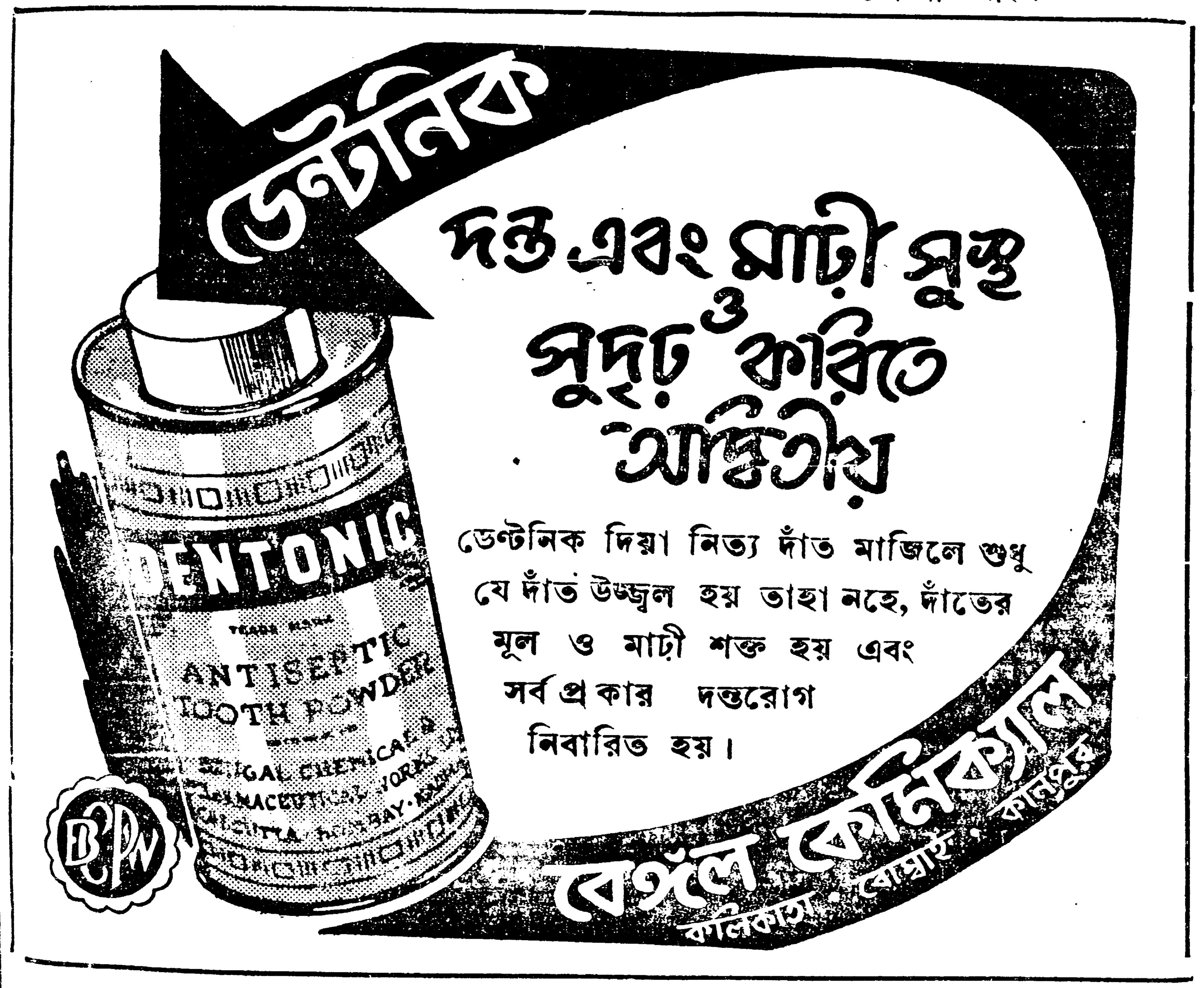

এবার পূজায়

শ্রীননীগোপাল মজুমদারের

স্বপ্নদেশে

(তৃতীয় সংস্করণ)

রামধনু বলেন, "পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না।"

মৌচাক বলেন, "এক নিশ্বাসে সমস্ত বইখানি শেষ করবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে।"

দেশ বলেন, "লেখকের গল্প বলার নৈপুণ্যে এই কাহিনী রুদ্ধনিশ্বাস পাঠককে অভিভূত করে।"

বাঁধাই সংস্করণ—দুই টাকা
সুলভ সংস্করণ—পাঁচসিকা।

বাহাদুর

(আনকোরা নতুন বই)

একদল স্কুলের ছেলে এক ভীষণ রহস্যের ভেতর পড়ে কী ক'রে রহস্যের সমাধান করলো তারই কাহিনী।

দ্বিতীয় খণ্ডে কী করে একজন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক সোনা তৈরী করলো, কী করে একদল সাহেব ডাকাতদের হারিয়ে দিল, তার রোমাঞ্চকর কাহিনী।

দাম দুই টাকা।

প্রকাশক : রিভ্যু পাবলিশার্স
কলিকাতা

পরিবেশক : অভিজিৎ প্রকাশনী
৭২।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীচরণেষু

ফোন : ৫৫-৪০৪৬

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা—গোরাচাঁদ দাশগুপ্ত

* নতুন আদর্শ এবং পরিকল্পনা নিয়ে প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই প্রকাশিত হয়।
* নীট্ আয় দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যয়িত হয়।
* 'বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর লেখা' এবং বিদ্যালয়ের খবর' বিভাগ দু'টি আমাদের সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পিত।
* প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকদের রচনায় প্রতিটি সংখ্যা সুসমৃদ্ধ।

বার্ষিক (সডাক) ৩৲ ষাণ্মাসিক (সডাক) ১॥০ প্রতি সংখ্যা ।০

অন্যান্য বিষয়ের জন্য কর্মসচিবের সহিত পত্রালাপ করুন।

সম্পাদক"
শ্রীননীগোপাল দত্ত

'শ্রীচরণেষু' কার্য্যালয়,
৪বি রাজা কালীকৃষ্ণ লেনকলিকাতা-৫

জ্যোতির্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ॥০ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১॥০ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য
বি,এ

Regd. No. C—1641

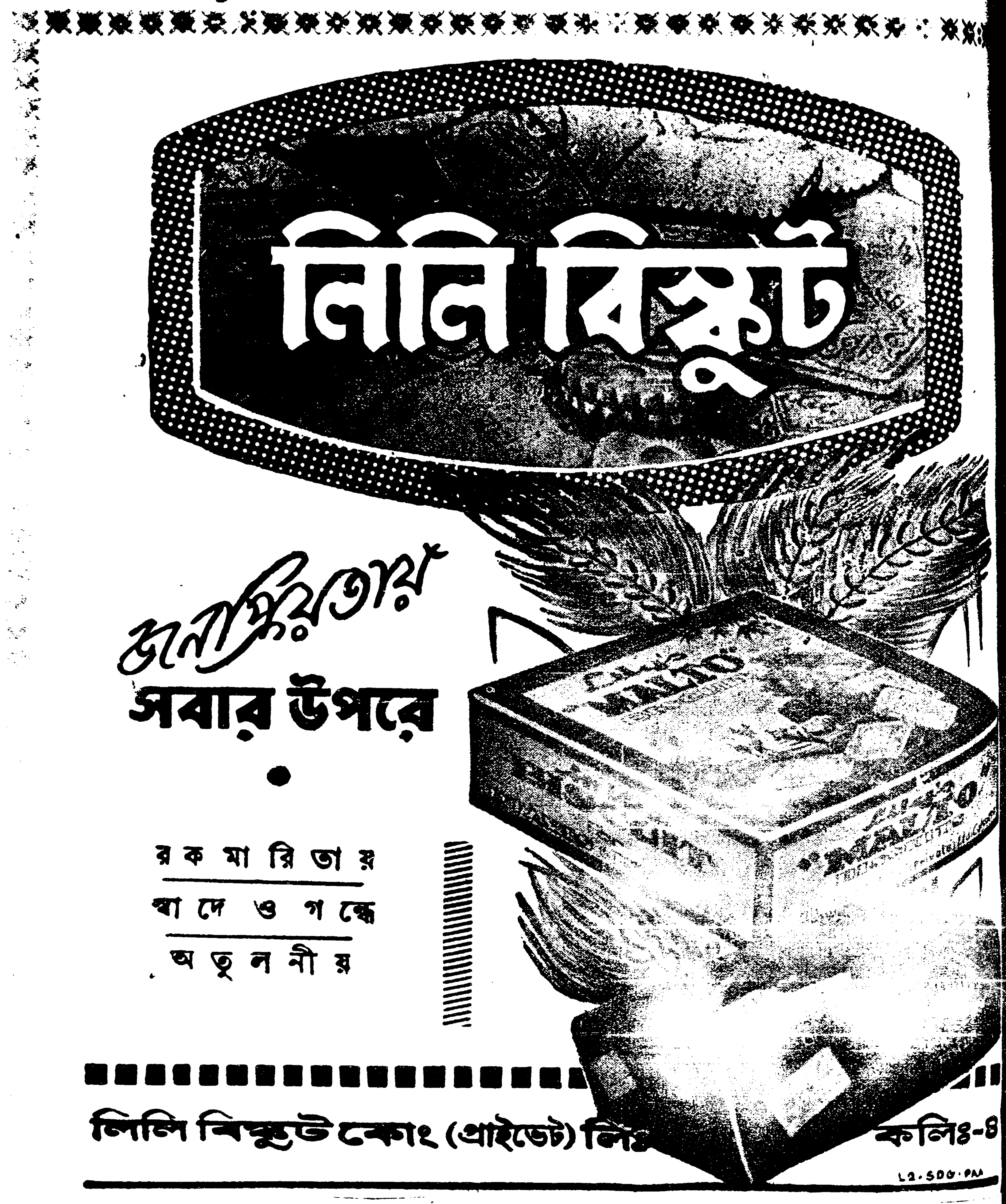

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

স্থাপিত – ১৩৩৭ ফোন-৩৫-২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পতাকা মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

৴২৷৷০, ৴৫, ।৮ সেরা ডাইস্ টীনে,
মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ- শ্রীঅমৃত লাল কুমার।
মিল ও অফিস - ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য সডাক ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২ টাকা ২৫ ন. প., প্রতি সংখ্যা ৩৭ ন প ভি. পি তে নিলে আরও অতিরিক্ত ৭১ ন. প. লাগে। নমুনার জন্য ৩৯ ন. প.র ডাকটিকেট পাঠাতে হয়। বিনামূল্যে নমুনা পাঠানো সম্ভব নয়। ভি পি তেও নমুনা পাঠানো হয় না।

২। বৈশাখে বছর সুরু, যে কোনও মাসে চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যায়; কিন্তু পত্রিকা নিতে হবে বৈশাখ কিংবা কার্ত্তিক থেকে। তবে এতে অসুবিধা হলে মাঝের সংখ্যাগুলো খুচরা হিসাবে নিয়ে বৈশাখ বা কার্ত্তিক থেকে নিয়মিত ভাবে নেওয়া যেতে পারে।

৩। কোন মাসে পত্রিকা না পেলে ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে তাঁদের উত্তরসহ সেই মাসের মধ্যে আমাদের জানাতে হবে।

৪। পাকিস্তানের গ্রাহকেরা ব্যাঙ্ক মারফৎ (যে সব ভারতীয় ব্যাঙ্কের পাকিস্তানেও শাখা আছে) ড্রাফ্‌ট্‌এ চাঁদা পাঠাতে পারেন। এর নিয়মকানুন ব্যাঙ্কে খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। আমাদের লিখলে আমরা Proforma Invoice পাঠাতে পারি।

৫। গ্রাহকদের সব চিঠিতেই গ্রাহক নং দিতে হবে। চিঠির জবাবের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাকটিকেট দিতে হবে।

৬। লেখা, কপি রেখে, সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। সাধারণ বিভাগে যে কেউ লেখা পাঠাতে পারেন। তা ছাড়া গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখায় উৎসাহ দেবার জন্য একটি পৃথক্ বিভাগও আছে।

৭। বিজ্ঞাপনের হার চিঠি লিখলে জানানো হয়। টাকাকড়ি চিঠিপত্র প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা— ম্যানেজার, রামধনু; ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫। (টেলিফোন: ৪৮-৩১৮১)

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

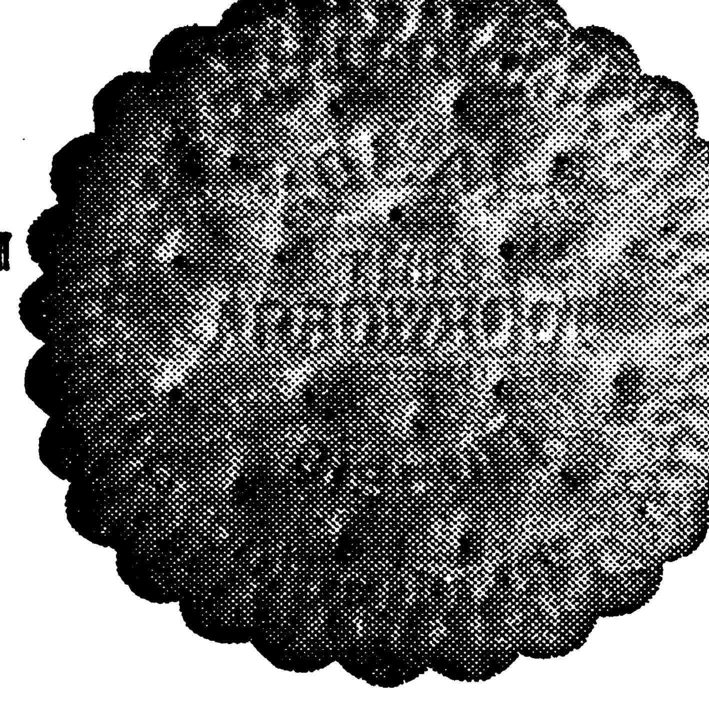

বিজ্ঞাপনের মতামতে:

কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে?

স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,

'থিনের' মধ্যে; গুণে, স্বাদে সবার সেরা "কোলে"

অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,

সবরকমের "কোলে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

ভিটামিন সমৃদ্ধ

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ

এবার পূজায় নূতন বই

— পূজা বার্ষিকী —

অপরাজিতা

॥ দাম চার টাকা ॥

চাঁদ দিদির থলে

॥ দাম তিন টাকা ॥

— আশাপূর্ণা দেবীর —

গল্প ভালো আবার বলো

॥ দাম দু' টাকা ॥

— সুনির্মল বসুর —

বরণ ডালা

গল্প ও কবিতা-সংকলন

॥ দাম দু' টাকা ॥

— হেমেন্দ্রকুমার রায়ের —

সাজাহানের ময়ূর

(ছোটদের রোমাঞ্চকর উপন্যাস)

॥ দাম দেড় টাকা ॥

দেব সাহিত্য কুটীর … কলিকাতা—৯

মহাবিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩১শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ { ৮ম সংখ্যা

ছেড়ে-আসা দেশ

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ছেড়ে-আসা দেশের তরে প্রাণটা আজও কাঁদে গো !
ভাড়া-বাড়ীর ছোট্ট ঘরে পড়েছি ঘোর ফাঁদে গো !
আকাশ-ছোঁয়া মস্ত মাঠে
সুখ ছিল রে পল্লীবাটে,
আজকে দুখে বক্ষ ফাটে, বল্‌তে মুখে বাধে গো !
ঘুঘু-ডাকা হিজল গাছের শোকে হৃদয় কাঁদে গো !

গুবাক্‌-ফুলের মধুর সুবাস কর্‌ত অবাক্‌ প্রভাতে,
দোয়েল, কোয়েল, 'বৌ-কথা-কও' গাইতো বনের সভাতে।
নদী, দীঘির বিমল জলে
স্নান করেছি কৌতূহলে,

সাঁতার দিতাম দলে দলে,—কী অপরূপ শোভাতে!
গুবাক্ ফুলের গন্ধ পথে করতো অবাক্ প্রভাতে।

চন্দ্রালোকে তন্দ্রা-চোখে 'চোখ-গেল' ওই পাখী রে
রাত্রি জেগে গভীর সুখে করতো আকুল ডাকি' রে!
ফুল-কাননে আপন মনে
পরীর খোঁজে সঙ্গোপনে
ঘোর নিশীথে বেড়াই বনে,—জানে সকল শাখী রে!
'চোখ-গেল' তা দেখতে পেয়ে সবকে জানায় ডাকি' রে!

টাট্‌কা ফলে, দুগ্ধে, মাছে স্বাস্থ্য ছিল সেখানে,
আজকে চোখে আঁধার দেখি বিজ্‌লী-আলোয় এখানে।
পীচ্-ঢালা এই পথের বুকে
ধন্দাতে আজ মরছি ধুঁকে,
চায় না যেতে ল্যাঠা চুকে, মজাতে চায় বাখানে;
চালিয়ে ভেজাল লুঠ্‌ছে টাকা, মারছে মানুষ এখানে।

তোমরা আমায় যাও—নিয়ে যাও, রইবো না এ-শহরে;
মোদের বিপুল দুখের বোঝা তোমরা কিছু বহ রে!
ছেড়ে-আসা দেশটাকে, ভাই,
দেখতে সদাই কেঁদে বেড়াই,
তুলনা তার কোথাও নাই, কোথায় পাবো কহ রে?
ছেড়ে-আসা সে-দেশ যেতে তোমরা আমায় লহ রে!

স্বাধীনতার মূল্য দিতে সইনু দারুণ যাতনা,
আজ ভারতের বন-বাদাড়ে মরছি মোরা কত না!
ব্যর্থ হোলো রাজ্যনীতি,
ধ্বংস হোলো ধর্ম্ম, প্রীতি,
দেশ-জোড়া ঘোর চৌর্য্যরীতি আর তো মেনে লবো না!
দেশ বিভাগের দুর্গতি, হায়, এই প্রাণে আর সবো না!

গর্ব্ব নিয়ে মরতে রাজী, থাকবো না দীন বিদেশে,
মা-মরা সব ছেলের মতো রইবো না আর এ-বেশে।
থাকতো পূর্ব্ববঙ্গজেরা
সোনার দেশে—স্বর্গ সেরা,
কেউ ছিল না কাঙাল এরা, রইতো সুখের আবেশে;
যাবো রে ভাই, যাবোই যাবো, যাবোই ফিরে সে-দেশে।

পশ্চিম দিগন্তে

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

গিরনার পাহাড়ের কথা এর আগের সংখ্যায় বলেছিলাম। আরও একটু বলি।

সেদিন এই পাহাড়েই শ্রীকৃষ্ণের পদাংক অংকিত হয়েছিল। কত বার কত ভাবে এই পথ দিয়ে তিনি চলাফেরা করেছেন, এই পাহাড়ের গায় তাঁর কণ্ঠ কত প্রতিধ্বনি তুলেছে। এই পথ তখন এমনি ছিল কিনা কে জানে! তার পর কত যুগ চলে গেছে, এই গিরিনগরী জংগলাকীর্ণ হয়েছে। তবু এই সংকীর্ণ পথ-রেখা ধরে কত তীর্থ-যাত্রী এসেছে, কত সাধক, কত পুণ্যাত্মা কত মহদাশয়ের পদক্ষেপে এই পথ পবিত্র হয়েছে। আমরাও আজ সেই পদ-রেখা অনুসরণ করে চলেছি,—পনেরো শো মাইল দূরের দুই আধুনিক তীর্থকামী। একই পথ যাত্রার নির্দেশ রেখে যাচ্ছে যুগ থেকে যুগান্তরে।

ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছি। দম ফুরিয়ে গেছে, দেহের অনেকখানি ভার এখন নির্ভর করছে এই লাঠিখানির উপর। শরীরটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে লাঠির যে এতটা প্রয়োজন হয় তা এমন ভাবে আর কোন দিন বুঝি নি।

একে একে চার হাজার সিঁড়ি পার হলাম। আবার এক 'ঝোপড়ি' পাওয়া গেল। এখানে চা পাওয়া যায়, নেবু-চিনির সরবৎও পাওয়া যায়। তিন আনা করে গ্লাস। আমরা এক এক গ্লাস সরবৎ খেলাম। শুষ্ক কণ্ঠ সজল হতেই আবার নতুন শক্তি জুগিয়ে গেল, আবার সুরু করলাম উঠতে।

গিরনারের ১২০০০ সিঁড়ি
মধ্যপথে লেখক ও সঙ্গীদের দেখা যাচ্ছে

ফটো : ভবেশ দাশগুপ্ত

এবার দু'-চারজন করে কয়েকটি ছোট ছোট দল আমাদের পাশ কাটিয়ে নেমে গেল। সবার শেষে ধীরে ধীরে নামছিল দুটি বুড়ো-বুড়ী। ঘাটের নীচে কেউ নয়। আমাদের দেখে বুড়ী পরম উৎসাহে বলে উঠলো—বেটা, বাংগালসে আয়া?

বললাম—হ্যাঁ, মাঈজী!

—জোয়ান হ্যায়, জলদি জলদি উঠ্ যা। ঔর তো থোড়া হ্যায়।

—এখনও তো আট হাজার সিঁড়ি বাকি, থোড়া কি?

—চার হাজার যখন হয়ে গেছে বাকি আট হাজারও হয়ে যাবে, ঘাব্ড়াস নি। আমরা বুড়ো মানুষ উঠে গেলাম, আর তোরা পারবি না? ভগবানের নাম নিয়ে উঠে যা।

তাদের দেখে সত্যই মনে বল পেলাম। তবে ভগবানের নাম যে করতে হবে, তা-ও বুঝলাম। তবে উঠতে যখন সুরু করেছি তখন উঠবোই।

ইতিমধ্যে সূর্য্য কখন পশ্চিমে চলে পড়েছে। নীচের খাদে সুরু হয়ে গেছে আলো-ছায়ার খেলা। খাদের শেষে সমতলভূমিতে দিগন্ত অবধি দেখা যাচ্ছে সবুজ ক্ষেত আর হলুদ বালির ছক কাটা। সরু পথের ফালি দিয়ে বাড়ীগুলি যোগ করা, ছোট ছোট কতকগুলি দেশলাইয়ের বাক্স বাঁধা যেন। কতটুকু আশ্রয়ের জন্য আমরা কত বেশী দ্বন্দ্ব করি তা এখান থেকে দেখলে হাস্যকর বলে মনে হয়। ওখানকার শোক-দুঃখ, আশা-আনন্দ, অন্যায়-অনাচার, সমাজ-সমারোহ আর বুঝি আমাদের স্পর্শ করতে পারে না। আমরা এখন ওদের অনেক উপরে, অন্তরীক্ষে, ভগবানের কাছাকাছি চলে এসেছি। এখান থেকে জনপদের কোলাহল শোনা যায় না। জগদীশ্বর আরো কত উপরে আছেন, মানুষের ডাক তাই তাঁর কাছে পৌঁছায় না, মানুষের অনাচার তাই তাঁর চোখে পড়ে না। অনেক উপরে থাকাটাই বোধ হয় জনতার ছোঁয়াচ বাঁচাবার সেরা পন্থা; আমাদের সাধু-সন্ন্যাসীরা তাই বোধ হয় পাহাড়ের উপর সাধনা করাটাই বেশী পছন্দ করতেন।

সূর্য্য অস্ত গেল। সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এলো পাহাড়ের কোলে। সাড়ে পাঁচ হাজার সিঁড়ি পার হয়ে আমরা উঠে এলাম প্রথম পাহাড়টির চূড়ায়। পথের দু' পাশে সাতটি জৈন মন্দির। বিচিত্র কারুকার্য্যময় পাথরের মন্দির। প্রথম মন্দিরটি দেখতে দেখতে অন্য মন্দিরগুলি বন্ধ হয়ে গেল। সূর্য্যাস্তের সময় মন্দির বন্ধ করে দেওয়াই এখানকার রীতি। বাকী মন্দিরগুলি আর আমাদের দেখা হলো না।

মন্দিরের কাছেই একখানি খাবারের দোকান। কলা, পেঁড়া, চানাচুর ও চা সেখানে পাওয়া গেল। দাম নীচের নগরের দোকানের চেয়ে বেশী নয়। সেখানে জলযোগ শেষ করে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম, তার পর আবার সুরু করলাম উঠতে।

আরো শ' তিনেক সিঁড়ি ভেঙে একেবারে পাহাড়ের মাথায় এক শিবমন্দিরে এসে পৌঁছলাম। সাধারণ ছোট মন্দির। গোমুখী মহাদেব। সামনে একটি পানীয় জলের কুণ্ড। একখানি ছোট ঘর। ঘরের একপাশে একটি 'ঝোপ্ড়ি'। ঝোপ্ড়ির সামনে দু'জন সন্ন্যাসী ধূনী জ্বালিয়ে বসে আছেন। মন্দিরের ছোট চত্বর, পাথর দিয়ে বাঁধানো। তারই একপাশে আমরা বসলাম। সন্ধ্যার বাতাস আমাদের সারা দেহে স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দিল।

মন্দিরের পাশ দিয়েই ঢালু খাদ নেমে গেছে। নীচে বহু দূর অবধি দৃষ্টি চলে। দিগন্ত থেকে স্নিগ্ধ ছায়া গড়িয়ে আসছে পাহাড়ের কোলে, রুক্ষ ধূসর প্রান্তর সন্ধ্যার আলোকাভাসকে ম্লান করে দিচ্ছে। ধরিত্রী স্নেহাঞ্চলে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছেন সব কিছু। দিনের তীব্র আলোক-উজ্জ্বল প্রকাশকে মুছে দিয়ে লাল মাটি, ধূসর পাহাড়,

নীল আকাশ সবই একাকার হয়ে মিশে গেছে। উঁচু-নীচু, এলোমেলো সব কিছু কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে মিশেছে রাত্রির কোলের পাশে। সেই স্নিগ্ধ আঁধারকে মনোরম করে পূর্ণিমার চাঁদ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আকাশে। ঠিক সেই সময় আমাদের পিছনে পাহাড়ের মাথায় কে একজন সুর ধরলো—'ম্যাঁয় নে চাকর রাখো জী,—চাকর রাখো, চাকর রাখো, চাকর রাখো জী!'

সে গানের সুর ভালো কি মন্দ, সংগীতের আসরে পূরো মর্য্যাদায় সে গান উৎরাবে কি না, তা জানি না। কিন্তু সাধকের ব্যাকুল" হৃদয়ে বিশ্ব-নিয়ন্তার চরণে আত্ম-নিবেদন করার এই যে আকুতি, তা এইখানে এই সময়ের জন্যই বুঝি রচিত হয়েছিল। মনের তারে তারে এর সুর অব্যক্ত ভাবে ছন্দিত হয়ে ওঠে, মনের মাঝে ব্যাকুলতা জাগে সেই লোকাতীতের চরণে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে।

"মানুষ দুই রকম করে নিজের মহত্ত্ব উপলব্ধি করে—এক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, আর এক মিলনের মধ্যে। এক ভোগের দ্বারা, আর এক যোগের দ্বারা। ভারতবর্ষ স্বভাবতঃই শেষের পথ অবলম্বন করেছে। এইজন্যেই দেখতে পাই যেখানেই প্রকৃতির মধ্যে কোন বিশেষ সৌন্দর্য বা মহিমার আবির্ভাব সেইখানেই ভারতবর্ষের তীর্থস্থান। মানবচিত্তের সঙ্গে বিশ্ব-প্রকৃতির মিলন যেখানে স্বভাবতঃই ঘটতে পারে সেই স্থানটিকেই ভারতবর্ষ পবিত্র তীর্থ বলে জেনেছে। এ সকল জায়গায় মানুষের প্রয়োজনের কোনো উপকরণ নেই, এখানে চাষও চলে না, বাসও চলে না, এখানে পণ্য সামগ্রীর আয়োজন নেই, এখানে রাজার রাজধানী নয়,—অন্ততঃ সেই সমস্তই এখানে মুখ্য নয়। এখানে নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ আপনার যোগ উপলব্ধি করে আত্মাকে সর্বগ ও বৃহৎ বলে জানে। এখানে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজন সাধনের ক্ষেত্র বলে মানুষ জানে না, তাকে আত্মার উপলব্ধি-সাধনের ক্ষেত্র বলেই মানুষ অনুভব করে; এই জন্যেই তা পুণ্যস্থান।

"ভারতবর্ষের হিমালয় পবিত্র, ভারতবর্ষের বিন্ধ্যাচল পবিত্র, ভারতবর্ষের যে নদীগুলি লোকালয় সকলকে অক্ষয়ধারায় স্তন্যদান করে আসছে তারা সকলেই পুণ্য-সলিলা। হরিদ্বার পবিত্র, হৃষীকেশ পবিত্র, কেদারনাথ, বদরিকাশ্রম পবিত্র, কৈলাস পবিত্র, মানস সরোবর পবিত্র, গঙ্গার মধ্যে যমুনার মিলন পবিত্র, সমুদ্রের মধ্যে গঙ্গার অবসান পবিত্র। জগৎকে ভারতবর্ষ পূজার দ্বারা গ্রহণ করেছে, তাকে কেবল মাত্র উপভোগের দ্বারা খর্ব করে নি, তাকে ঔদাসীন্যের দ্বারা নিজের কর্মক্ষেত্রের বাইরে দূরে সরিয়ে রেখে দেয় নি; এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পবিত্র যোগেই ভারতবর্ষ আপনাকে

বৃহৎ করে—সত্য করে জেনেছে, ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলি এই কথাই ঘোষণা করছে।" [—রবীন্দ্রনাথ]

গোমুখী মহাদেবের আরতি হলো। জনবিরল পর্বতশীর্ষ, স্তব্ধ জ্যোৎস্নাময়ী রাত ঘণ্টা-শংখধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো। সন্ন্যাসীরা ধূনীর পাশে সুর ধরলেন—

"পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং।
গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্॥
জটাজূট মধ্যে স্ফুরদ্‌গাঙ্গ্যবারিং।
মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিম্॥" [—শংকরাচার্য্য]

[যিনি সকল প্রাণীর ঈশ্বর, যিনি পরমেশ্বর, যিনি সকলের পাপ বিনাশ করেন, যিনি গজচর্ম পরিধান করেন, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ দেবতা, যাঁর জটার মধ্যে গঙ্গাজল তরঙ্গায়িত, যিনি মদনকে ভস্ম করেছিলেন, সেই মহাদেবকে আমি প্রণাম করি।]

আমাদেরও মনে জাগলো—

"একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু-
র্য ইমাং লোকানীশত ঈশনীভিঃ॥
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ॥ [—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্]

[মহেশ্বর এক, দ্বিতীয় নেই, তিনি এই জগৎ চরাচর নিজের শক্তির দ্বারা ব্যাপ্ত করে আছেন। তিনিই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর—তিনি মহেশ্বর। দেবতারও তিনি দেবতা, তিনিই পরমপুরুষ।]

আরতি শেষ হলো। দেবতাকে প্রণাম করে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। পিছনের পাহাড় থেকে তখনও মীরার ভজনের সুর ধ্বনিত হচ্ছে—ম্যাঁয় নে চাকর রাখো জী!

পুরোহিত বললেন—পিছনে ধর্মশালা আছে, রাতে থেকে যান, কাল সকালে বাকী সিঁড়িগুলি উঠে অম্বা দেবী ও দত্তাত্রেয় মন্দির দর্শন করে যাবেন।

কিন্তু আমাদের তো থাকবার উপায় নেই, নীচে প্রভাস ও সুধীন অপেক্ষা করছে। আমরা নামতে সুরু করলাম।

খাবারের দোকান অবধি নেমে এসে দেখি সুধীন আসছে। তার সঙ্গে এক স্থানীয় রমণী। ধপ্ করে একপাশে বসে পড়ে সুধীন বললো—আমরা দু'জনে নেমে যাচ্ছিলাম, এমন সময় এই বুড়ীর সঙ্গে দেখা, বললো—'এতটা উঠে নেমে যাচ্ছিস্? আমি বুড়ো মানুষ, উঠ্‌ছি, আর তোরা পারবি না? চল্ আমার সঙ্গে।' প্রভাস পারলো না, আমি ওর সঙ্গে উঠে এলাম।

বুড়ী হাসলো, হাসতে হাসতে হিন্দিতে বললো—এই তো বাবা, উঠে এলি। নীচে কত ডর পাচ্ছিলি ! গোমুখী মহাদেব দর্শন করে, তারপর নেমে যাস্।

ভবেশ বললো—প্রভাস যদি আসতো তো ভালো হতো, চারজনে এই পাহাড়ের উপর যেতাম আজ রাতে। কাল শেষ অবধি উঠে দেখে যেতাম সব কিছু।

কিন্তু তা আর হলো না।

সুধীন বুড়ীর সঙ্গে উঠে গেল গোমুখী মহাদেব দর্শন করতে।

এবার নামার পালা। পাঁচ-হাজার সাতশো সিঁড়ি নামতে হবে।

এক আকাশ জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের বুকে। দিনে যে জংগল দুর্গম বলে মনে হয়েছিল এখন তা হয়েছে স্বপ্নময়। চড়াই ও খাদ একাকার হয়ে গেছে। দূরের নিম্নভূমির বাড়ীগুলি থেকে যে আলো চোখে পড়ছে, তা যেন একগুচ্ছ দীপ্তিময় ফুল, থোকা করে বাঁধা ! এই পথ গড়িয়ে গেছে ওই আলোর দিশারায়।

পূর্ণিমার রাত, আলো না হলেও চলে। তবু আমাদের কাছে টর্চ ছিল। আমরা আলো ধরেই নামতে লাগলাম। পথের মাঝে মাঝে এমন বাঁক আছে যে একটু অসতর্ক হলে একেবারে শত শত ফুট নীচে গড়িয়ে যেতে হবে। সাবধান হওয়া ভালো।

উঠতে যে সময় ও যে শ্রম লেগেছিল, নামতে সে কষ্ট নেই। যে সিঁড়ি উঠতে আমাদের সাড়ে তিন ঘণ্টা লেগেছিল, তর তর করে সেটুকু নেমে এলাম ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই। সাড়ে চার ঘণ্টায় ১১৫৪৬ সিঁড়ি ওঠা নামা হলো। তবু শেষ অবধি যেতে পারলাম না, এ ক্ষোভ মনে রইল।

প্রভাস নীচের দোকানে আপক্ষা করছিল। একখানি টাংগাও দাঁড়িয়েছিল। দু' টাকায় রফা করে সেই টাংগাতেই আমরা চারজন উঠে পড়লাম !

ধর্মশালায় যখন ফিরলাম তখন আর সময় হাতে ছিল না। তাড়াতাড়ি হোটেলে খেয়ে নিয়েই রওনা হলাম। রাত দশটায় ট্রেন

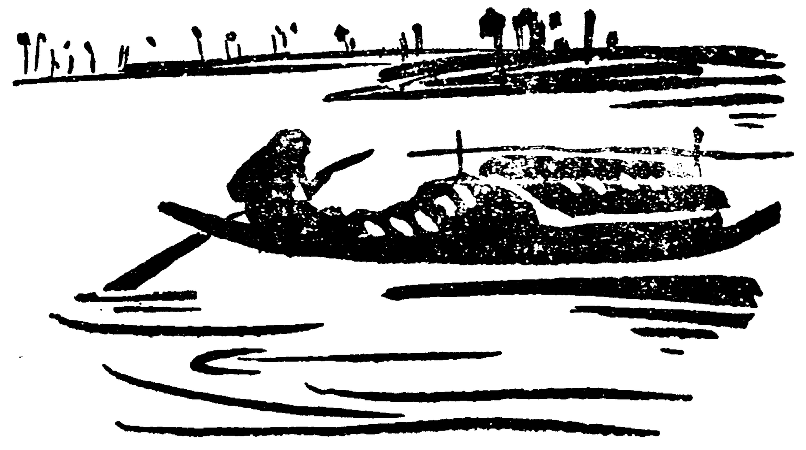

আজও মনে পড়ে

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

—সুধন বাবু—

জুতো জোড়া বগলে চেপে খালি পায়ে হন হন্ করে চলেছেন সুধন বাবু। গলা-বন্ধ কোটের সবগুলো বোতাম আট্কানো, কাঁধে চাপানো ভাঁজ করা চাদর, আনকোরা নতুন ধুতি হাঁটুর ওপর তুলে মাল্কোঁচা মারা।

আমরা বল্লাম, "ও কি সুধন বাবু, জুতো পায়ে দেন নি কেন ?"

"আর বলিস নে। নাকে বড্ড ব্যথা।" বলে যেমন চলছিলেন তেম্নি চল্তে লাগলেন সুধন বাবু।

নাকে ব্যথা হলে পায়ে জুতো পরতে আমাদের না আট্কালেও সুধন বাবুর আট্কাত।

অবশ্য নাকে ব্যথা না থাক্লেই যে জুতো প'রে পথ চল্তে হবে এমন কথা সুধন বাবুর সংহিতায় লেখা ছিল বলে মনে হয় না, কারণ ব্যথাহীন নাক নিয়েও জুতো বাড়ীতে রেখে খালি পায়ে পথ চল্তে দেখেছি তাঁকে।

অনেক. দিন আগের কথা, লিখ্তে বসে এখন মনে হচ্ছে হয়তো ব্যথাটা আসলে হয়েছিল সুধন বাবুর পায়ে; ঐ পায়ের ব্যথাটাই তিনি নাকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

সেই যে জুতো বগলে চেপে বেরিয়েছিলেন সুধন বাবু, তার পর তিনি ফিরেছিলেন বটে, কিন্তু জুতো জোড়া আর ফেরে নি। কোথায় তাদের ফেলে এসেছিলেন তিনিই জান্তেন। অথবা হয়তো তিনিও জান্তেন না।

সুধন বাবুর দাদা নিয়মিত ভাবে বেশ ভালো পয়সা কামাতেন। যেমন খোশ্-খেয়ালী তেম্নি খামখেয়ালী মানুষ ছিলেন তিনি ! মাথায় ছিট্ তাঁরও ছিল, কিন্তু গোটা পরিবারের জন্যে তাঁকে মোটা পয়সা কামাতে হবে বলেই বোধ করি ভগবান্ তাঁকে সুধন বাবুর মতো নিরক্ষর বা পাগ্লাটে করেন নি। জুতো হারিয়েছে জেনে আরেক জোড়া জুতো কিনে দিলেন সুধন বাবুর দাদা। সেই জুতো জোড়াকে কিন্তু কখনও

বাড়ীর বাইরে বেরোতে দেখি নি। বেরোলেই যখন হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তখন আর নাই বা বেরোলাম!—এই বোধ হয় ভেবেছিল সুধন বাবুর জুতো জোড়া।

আগেই বলেছি সুধন বাবুর অক্ষর পরিচয় হয় নি। সে জন্যে অক্ষরদের মনে হয়তো দুঃখ ছিল, কিন্তু সুধন বাবুর মনে ছিল না। যে কোনো ইংরেজী কথার মানে জিজ্ঞাসা করলে সঙ্গে সঙ্গে অম্লান বদনে সে প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিতেন, জবাব কখনো আট্‌কাতো না তাঁর মুখে। মনে আছে- তখন আমি ঢাকা কলিজিয়েট স্কুলের সব চেয়ে উঁচু ক্লাশের ঠিক নীচের ক্লাসে পড়ি—একদিন ভোরবেলা কোনান ডয়েলের লেখা একটা গল্প পড়্‌ছি। বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ শার্লক হোম্‌সের গল্প। এমন সময় সুধন বাবুর আবির্ভাব।

তামাসা করে প্রশ্ন কর্‌লাম, "সুধন বাবু, বলুন তো মানে কি—'শার্লক হোম্‌স স্‌মাইল্‌ড্‌?"

সুধন বাবু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "শিবের বাহন একটি ষাঁড়।"

সম্ভ্রান্ত বংশে, যাকে বলে ভদ্র ঘরে, জন্ম হয়েছিল সুধন বাবুর। কিন্তু ভদ্রলোকদের সঙ্গে তিনি বড় একটা মিশ্‌তেন না। নাক উঁচু করে যাদের আমরা 'ছোটলোক' বলে ভাবতাম, সুধন বাবু মিশ্‌তেন তাদেরই সঙ্গে। তাদের তিনি ছোট বলে মনে করতেন না, তারাই ছিল তাঁর প্রাণের সুহৃদ্‌, অন্তরঙ্গ। ঢাকা শহরের যে পাড়ায় আমরা থাক্‌তাম তার নাম গেণ্ডারিয়া। 'গেণ্ডারি' মানে ইক্ষু অর্থাৎ আখ। এককালে হয়তো এদিকে খুব আখের চাষ ছিল বলে এ পাড়ার নাম হয়েছিল গেণ্ডারিয়া। পাড়ার পূব দিকে রেল-ষ্টেশন, তার নামও পরে হয়েছে গেণ্ডারিয়া,—তখন তার নাম ছিল দোলাইগঞ্জ।

ষ্টেশনের কাছাকাছি পথের ধারে একটা বটগাছ ছিল। ঐ বটগাছের তলায় বসে রোজ হারু নাপিত ভোর থেকে তার চুল ছাঁটা আর দাড়ি কামাবার ব্যবসা চালাত। যদ্দুর মনে পড়ে তার পারিশ্রমিকের হার ছিল চুল ছাঁটাই এক আনা, দাড়ি-গোঁফ কামানো দু' পয়সা। অতি ছেলেবেলা থেকেই কাঁচি আর ক্ষুর চালিয়ে হাত পেকেছে হারুর।

এই হারুর সঙ্গে খুব খাতির ছিল আমাদের সুধন বাবুর। অনেক সময় কাছাকাছি বসে বেশ মন দিয়ে হারু নাপিতের পাকা হাতের কাঁচি আর ক্ষুর চালানো দেখতেন তিনি।

একদিন হয়েছে কি, বাড়ী থেকে কি একটা কাজে হারুর ছোট ছেলেটা ডাকতে এসেছে হারুকে। মিনিট পনেরো কি আধ ঘণ্টার জন্যে একবার যেতে হবে বাড়ীতে।

হারু নাপিত সুধন বাবুকে বল্‌লে, "ভাই, আমি চট্‌ করে বাড়ী থেকে ঘুরে আস্‌ছি, তুমি ততক্ষণ একটু বোসো। আমার যন্তরপাতি, সাজ-সরঞ্জাম সমস্ত রইল। খদ্দের এলে বসিও, বোলো হারু এই এলো বলে।"

সুধন বাবু মাথা নেড়ে ভরসা দিয়ে বললেন, "আচ্ছা।" হারু নাপিত নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী গেল।

হারু চলে যাবার পরই এক চুল ছাঁটাবার খদ্দের এসে হাজির। সুধন বাবু তখন হারু নাপিতের জায়গায় বসে। সাম্নে সাজ-সরঞ্জামের বাক্‌সটা খোলা।

লোকটি এ পাড়ার নয়। সে ভাবলে সুধন বাবুই নাপিত। এসে তাঁর সাম্নে বসে পড়ে বললে, "দাও তো ভাই, চট্‌পট্‌ চুলটা ছেঁটে। আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে।"

যেমন হুকুম তেম্নি তামিল। বাঁ-হাতে চিরুণী আর ডান হাতে কাঁচি নিয়ে সুধন বাবু প্রাণের আনন্দে লোকটির চুলের ওপর কচাকচ সুরু করে দিলেন।

লোকটি আগেও অনেকবার চুল ছাঁটিয়েছে। এবারকার চুল ছাঁটাইয়ের কায়দাটা তার কাছে একটু পরেই যেন কেমন একটু খাপছাড়া বলে মনে হতে লাগ্‌ল। সে একটু ব্যস্ত হয়ে বললে, "এ কি রকম ছাঁটছ?"

সুধন বাবু তাকে এক রকম ধমক দিয়েই বললেন, "চুপ করে বোসো। মেলাই হাঙ্গামো কোরো না। অ্যাদ্দিন ধরে কাঁচি চালানো দেখ্‌ছি, আর তুমি কিনা আমাকে চুল ছাঁটা শেখাচ্ছ?" বলে আবার বেপরোয়া কাঁচি চালাতে লাগ্‌লেন। সাম্নে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে কাঁচি সমানে কচাকচ করে চলেছে। কোথায় কম ছাঁটতে হবে কোথায় বেশী ছাঁটতে হবে সে দিকে সুধন বাবুর ভ্রূক্ষেপ নেই। তা ছাড়া মাথার ওপর কাঁচি চালানো সুধন বাবুর জীবনে এই প্রথম।

ছাঁটের রকম দেখে খদ্দেরের হঠাৎ কেমন সন্দেহ হলো, সে হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললে, "দেখি তোমার আয়না?"

আয়নাতে দেখেই তো খদ্দেরের চক্ষু চড়কগাছ। নাপিত হতভাগা করেছে কি? তার এত শখের চুল, যাতে চমৎকার টেরি কাটা যায়, তাকে এমন ছাঁটাই করেছে যে এখন হয় কদম ছাঁট, না হয়তো মাথা ন্যাড়া- এ ছাড়া আর উপায় নেই। কেটে ফেলা চুল তো আর জোড়া লাগানো যাবে না, অথচ যে সব জায়গায় চুল বড় রাখ্‌বার জন্যে কম ছাঁটবার কথা সে সব জায়গাতেও একেবারে ছোট করে চুল কেটে ফেলেছেন সুধন বাবু।

ভীষণ চটে গিয়ে লোকটা হাঁউমাউ করছে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলো

হারু নাপিত। এসে দেখে খদ্দের লোকটা সুধন বাবুকে এই মারে তো এই মারে। সুধন বাবুও ক্ষেপে গিয়ে হিন্দীতে কড়া কড়া কথা শোনাচ্ছেন, মাঝে মাঝে দুটো-চারটে কথা বলছেন বাংলায়।

হারু নাপিত তখন লোকটিকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করলে কি হবে, লোকটা চীৎকার করে বলতে লাগল —"ও যদি নাপিত নয় তো চুল ছাঁটতে গেল কেন?"

সুধন বাবু চটেমটে বললেন, "নাপিত নই! নাপিত নই। আরে বাপু, কেউ কি প্রথম থেকেই নাপিত হয়ে জন্মায়, না নাপিত গাছ থেকে পড়ে?"

"তাই বলে আমার মাথার ওপর চুল ছাঁটা মক্‌সো করবে? আমার মাথাটাকে কি বে-ওয়ারিশ মাল পেয়েছে?" চেঁচিয়ে বললে লোকটা।

সুধন বাবু এতটুকু না দমে হারু নাপিতকে বলতে লাগ্‌লেন, "লোকটা কি রকম বে-আক্কেল দেখছো হারুচরণ? নিজেই আমায় বল্‌লে চট্‌পট্‌ চুল ছেঁটে দিতে। যাই ছেঁটে দিলুম, অম্নি গোঁসা হয়েছে গোঁসাইর।"

যাই হোক, হারু নাপিত ছিল যেমন মিঠে কথার ওস্তাদ, তেম্নি চালাক। ক্ষেপে-যাওয়া লোকটাকে সে ডেকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে কি সব বলে ঠাণ্ডা করে ফেললে। লোকটা এসে ভালো মানুষের মতো বসে গেল, হারু নাপিত পরম যত্নে কাঁচি চালিয়ে কদম-ছাঁট দিয়ে দিলে তার চুলে। তার পর তার থেকে পয়সা না নিয়ে উল্‌টে তাকেই দু' গণ্ডা পয়সা দিয়ে বল্‌লে, "এই নাও ভাই, পান খেয়ো।"

লোকটা চলে গেল। জানি না এর পর আর কারো মাথায় সুধন বাবু কাঁচি চালিয়েছিলেন কিনা।

রিম্‌লি

শ্রীসাগরিকা শ্যাম, এম্‌-এ, বি-টি

রুমা পড়ার ঘরে বসে তারস্বরে চেঁচিয়ে পড়ছিল, 'হুমায়ুনের যখন মৃত্যু হইল তখন আকবর ও বৈরাম খাঁ দিল্লীতে ছিলেন না। সেই সুযোগে হিন্দুবীর হিমু দিল্লী অধিকার করিয়া ফেলেন।' ওপাশে আরেকটি চেয়ার-টেবিল দখল করে অঙ্ক কষছিল রন্টু, একটুক্ষণ সে পিট্‌পিট্‌ করে রুমার দিকে তাকিয়ে রইল—তারপর ইতিহাস বই বের করে রুমায় চেয়েও চড়া-পর্দায় গলা উঠিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'হুমায়ুনের যখন মৃত্যু হয় তখন আকবর ও বৈরাম খাঁ…।' পাল্লায় হাঁপিয়ে পড়ল রুমা।

থেমে গিয়ে, বলল, 'এই রন্টু, বুষত মানে জানিস্?' রন্টু গম্ভীর ভাবে পড়া থামিয়ে রুমার দিকে একটু তাকিয়ে বলল, 'জানি—জানি, খুব। গাধা আর কি।' 'হ্যাঁ, তুইও সেই রকম একটা বুষত!' বলেই হেসে নেতিয়ে পড়ল রুমা। 'কি বললি?' চোখ পাকিয়ে দাঁড়াল রন্টু। 'আমি—আমি গাধা? তাহ'লে তুই হচ্ছিস একটা—একটা বিল্লী—ঠিক আমাদের ঐ পুষির মত মিন্‌মিনে—' কথা শেষ হলো না রন্টুর, হঠাৎ ঝটপট শব্দ শোনা গেল একটা। রুমা ও রন্টু তাকিয়ে দেখল ছোট্ট একটা তোতা-পাখী ছটফট করতে করতে তাদের ঘরে এসে ঢুকে পড়ল। পিছনে প্রায় শূন্যে লাফাতে লাফাতে এসে ঢুকল বিশু—তাদের বাড়ীর বাচ্চা চাকর। বিশু এসেই ঊর্দ্ধশ্বাসে দরজা বন্ধ করতে করতে হাঁপাতে লাগল, 'এই দাদাবাবু, এই দিদিমণি, তাড়াতাড়ি সব দরজা-জানলা বন্ধ কর।' এই নতুন বৈচিত্র্যে রুমা ও রন্টু একটু অবাক্‌ হয়ে গেছিল—বিশুর কথায় তাদের সে ঘোরটা কেটে গেল। সমস্ত দরজা-জানালা তাড়াতাড়ি ভেজিয়ে ফেলল ওরা। বন্দী হলো বাচ্চা পাখীটা। কয়েকবার অসহায় ভাবে এ-কোণে ও-কোণে আছাড় খেয়ে পড়ল, তারপর যেন সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়েই নিরাশ হয়ে বসল গিয়ে রুমার পড়ার টেবিলে। বিশুও চট করে জাপটে ধরল তার দুই ডানা। উল্লসিত হয়ে উঠল রুমা, রন্টু। দরজা খুলে রান্নাঘরে ছুটল তারা,—'মা, মা, দেখো 'সে বিশু একটা তোতাপাখী ধরেছে!' বিশুও পাখীটাকে নিয়ে হাসিমুখে এসে দাঁড়াল সামনে। মা লুচি ভাজছিলেন, গরমে ও আগুনের তাপে লাল হয়ে উঠেছিল তাঁর মুখ। ঝাঁঝালো সুরে বললেন, 'হুঁ, পড়াশুনো ফেলে যত সব দুষ্টুমি—আবার বিশুটাও জুটেছে এই সঙ্গে!'

অধ্যাপক পরিতোষ মিত্রের যমজ সন্তান—রুমা ও রন্টু। এ দুটি ছেলেমেয়ের কলধ্বনিতে ছোট্ট সংসারের দিনগুলো সোনালী হয়ে আছে।

বিকেলবেলা একটা বড় খাঁচা এল পাখীটার জন্য। পায়ের দড়ি খুলে খাঁচার মধ্যে তাকে ঢুকিয়ে দিল বিশু। একবার ডানা ঝটপট করে গা ঝেড়ে সোজা হয়ে খাঁচার চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল বাচ্চাটা। 'আচ্ছা, কথা শেখানো যাবে না পাখীটাকে বিশু? বলল রুমা। 'যাবে বই কি দিদিমণি!' বিশু ঘাড় নাড়ল। কোথা থেকে ছোট্ট একটা তীরধনুক নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল রন্টু, বলল, 'দুষ্টুমি করলে কিন্তু এই তীরধনুক দিয়ে অর্জ্জুনের মত আমি পাখীটার চোখে লক্ষ্যভেদ করব।' রুমা চোখ গোল গোল করে বললে, 'দেখেছ, রন্টুটা কি রকম? হুঁ! আমি থাকতে দিচ্ছি কিনা তোমাকে লক্ষ্যভেদ করতে!' রন্টু বড়দের মত হাঃ হাঃ করে হাসতে হাসতে তীরধনুক কাঁধে নিয়ে ভারী ভারী পা ফেলে পায়চারী করতে লাগল,—'জানিস, প্রতাপাদিত্য এই রকম করে হাঁটত।' 'রাখ্‌ তোর প্রতাপাদিত্য।' রুমা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল—'এখন কি নাম দেওয়া যায় পাখীটার তাই বল্‌।' বিশু বলে উঠল, 'আমি একটা সুন্দর নাম দিচ্ছি, তোমাদের নামের প্রথম অক্ষর নিয়েই হবে ওরও নাম।—রিমলি। কেমন, হলো তো?' নামটি মনঃপূত হলো দু'জনেরই।

পরিতোষ বাবু কলেজে চলে যাবার পরেই বাড়ীতে এই নতুন অতিথির আবির্ভাব। তাই কিছুই জানলেন না তিনি। সিঁড়িতে পা দিয়েই বারান্দায় দরজার কাছে খাঁচায় একটা তোতা ঝুলছে দেখে একটু অবাক্‌ হয়ে বললেন, 'এ আবার কি?' রুমা বাবাকে দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে একমুখ হেসে বললে, 'বিশু এটাকে ধরেছে বাবা! বেচারাকে কাকে তাড়িয়ে এনেছিল কিনা! আমি

এটাকে পুষব বাবা!' মেয়ের কপালে লুটিয়ে পড়া কোঁকড়া চুলগুলি ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে একটু হাসলেন পরিতোষ বাবু। তারপর নিজেকে ওর আলিঙ্গনমুক্ত করে বললেন, 'তা বেশ, মা-মণি, কিন্তু পাখীটা দেখছি তোমারই সমবয়সী!'

দিন যায়। পাখী নিয়ে মেতে উঠল রুমা, রণ্টু, বিশু। পাখীটার সব রকম ভাবভঙ্গীই অবাক্ করে তোলে ওদের। রুমা তো ঘুম থেকে উঠেই পাখীটার কাছে ছুটে আসে। তারপর কোনো মতে পড়াশুনো সেরেই ওর কাছে এসে বসে। বলে—'বলো রিমলি. রুমা, রুমা'। রণ্টু ভেংচি কাটে, 'আহা-হা, উনি নিজের নামই শেখাতে ব্যস্ত! যা শেখাবার বিশুই শেখাচ্ছে ওকে, তোর আর নিজের নাম শেখাতে হবে না।' বলে, পাখীটার দিকে ফিরে বলল, 'বলো রিম্‌লি, 'আসুন, বসুন, ঠাকুর, ভিক্ষা দাও—বলো বলো—রাধাকৃষ্ণ বলো।' রুমা হেসে গড়িয়ে পড়ল, 'ও রকম তাড়াতাড়ি করে বললে মানুষই কথা শিখতে পারবে না, তা পাখী!' কিন্তু দীর্ঘদিনের অধ্যবসায়েও পাখীটা রাধাকৃষ্ণ বলতে শিখল না. শিখল না 'আসুন বসুন' বলতে—শুধু শিখল রুমা, রুমা বলে ডাকতে। যেদিন ও প্রথম অস্পষ্ট উচ্চারণে রুমা রুমা বলতে লাগল সেদিন রুমার আনন্দ দেখে কে? হৈ-চৈ করে সারা বাড়ী সে মাথায় করল সেদিন। সবাই-ই একটু অবাক্ হলো—খুসীও হলো খুব।

সেদিন ভোরবেলা চায়ের টেবিলে দুধ-রুটি খাচ্ছিল ওরা ভাই-বোনে। বাবা কাগজ পড়ছিলেন আর চা খাচ্ছিলেন। মাও চুপচাপ বসে রণ্টুর জন্য একটা সোয়েটার বুনছিলেন। এমন সময় রিমলি হঠাৎ যেন উতলা হয়ে ডানা ঝট্‌পট্ করে 'টি-টি' করে চেঁচাতে লাগল—আর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা পাখীরও 'টি-টি' শোনা গেল। রুমা, রণ্টু তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া ফেলে বারান্দায় ছুটে এসে দেখল একটা বড় তোতা পাখী খাঁচার উপর বসে। রিমলি ও ঐ পাখীটা সমস্বরে অস্থির হয়ে 'টি-টি' করে ডাক্‌ছে। রুমাদের দেখেই তোতাটা উড়ে গিয়ে দেওয়ালের ঘুলঘুলিতে বসল, কিন্তু চিৎকার থামালো না। আরও খানিকক্ষণ রিম্‌লির দিকে চেয়ে, টি-টি করে উড়ে চলে গেল। রুমা ও রণ্টু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। রিমলি তখনও ছট্‌ফট করছে আর আকুল ভাবে ডেকে চলেছে। রুমা খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে আদর করতে লাগল কিন্তু সে শান্ত হলো না কিছুতেই, সমানেই চেঁচিয়ে চলল টি-টি করে। পরিতোষ বাবু কাগজ থেকে মুখ তুললেন, 'কি হলো আবার?' রণ্টু ও রুমা ধীরে ধীরে আবার খাবার ঘরে গিয়ে বসল। রুটি দুটো ডোবাতে ডোবাতে রণ্টু বলল, 'আরেকটা বড় তোতা পাখী রিমলির কাছে এসেছিল মা!' মা বললেন, 'হুঁ', তাহলে মা-পাখীটা আজো এসেছে। কাল ভোরবেলা আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি ঐ পাখীটা রিম্‌লির খাঁচার চারদিকে ঘুরছে আর ডাকছে। আর রিমলিটাও খাঁচার ভেতর থেকে পাগলের মতো বেরিয়ে আসতে চাইছে। আহা-রে!' পরিতোষ বাবু বললেন, 'ছেড়ে দিলেই হয় পাখীটাকে, কি দরকার ওদের কষ্ট দেবার?' একটু অভিমান হলো রুমার। 'বাঃ, কত রকম খাবার খেতে দিচ্ছি ওকে আমি, আদর করছি কত! বাইরে অত ভালো ভালো খেতে পাবে ও?' পরিতোষ বাবু বললেন একটু হেসে,—'বাইরে ওরা যা পায় তাতেই ওরা খুব খুসী। আচ্ছা, তোমাকে যদি কেউ আমাদের কাছ থেকে ধরে নিয়ে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখত, কোথাও যেতে দিত না, কিন্তু আদর করত খুব, খুব ভালো ভালো খেতে দিত,—তা হলে তোমার কি

কোনো দুঃখ থাকত না? খুসী হতে খুব? আর, তোমার মা যদি অনেক খোঁজাখুঁজি করে তোমার সন্ধান পেয়ে চুপি চুপি একদিন জানালা দিয়ে তোমাকে ডাকতে যেতেন কিন্তু তোমাকে বের করে আনতে পারতেন না, আর তুমিও পারতে না বেরিয়ে আসতে তখন তোমার কি রকম লাগত, আর তোমার মায়েরই বা লাগত কেমন?'

রুমা শিউরে উঠল। এ রকম অসহায় অবস্থা কল্পনাও করতে পারল না সে।

এরপর থেকে প্রায়ই ভোরবেলা মা-পাখীটা রিমলির কাছে আসতে লাগল আর রুমারা এসে পড়লেই পালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু রুমার এখন আর এ দৃশ্য দেখতে ভালো লাগে না। নিজেকে রিমলির অবস্থায় ফেলে মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায় তার। বাবা ঠিকই বলেছেন; তা'হলে কি করত সে? পাগল হয়ে যেত না কি! মা-বাবাকে ছেড়ে বন্দী-জীবন যাপন করতে কিছুতেই পারত না রুমা। এত দুঃখ সহ্য হতো না তার। ভয়ে কেঁপে ওঠে রুমার ছোট্ট বুক।

রবিবার সেদিন। মা-পাখীটা এলো যথারীতি। রুমা কি মনে করে পা টিপে টিপে সামনে দাঁড়াল গিয়ে রিমলির। উড়ে চলে গেলো মা-পাখীটা; আর রিমলি কিছুক্ষণ অসহায় ভাবে টি-টি করতে লাগল, তারপর হঠাৎ চিঁ চিঁ করে আর্তস্বরে রুমার দিকে চেয়ে ডাকল—রুমা রুমা! রুমা চমকে উঠল। তাই তো, কি বলতে চায় রিমলি? ও তো আর মানুষের ভাষা জানে না! ঐ দুটি কথাই কি রকম করুণ, কাতর ভাবে বলল ও! আহা, যেন বলছে—আমাকে ছেড়ে দাও রুমা, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার মায়ের কাছে যাবো। রুমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চারদিকে তাকালো। কেউ কোথাও নেই দেখে চুপি চুপি খাবার টেবিল থেকে নিজের দুধভরা বাটীটা এনে একটু একটু করে খাঁচার ভেতর রিমলির বাটিতে ঢেলে দিতে লাগল। রিমলি দুধ খুব ভালোবাসে। একদিন ওকে একটু দুধ চাখতে দিয়েই রুমা বুঝতে পেরেছিল সেটা। তারপর রোজই নিজের অংশ থেকে একটু একটু দুধের ভাগ দিত রিমলিকে। মার ভয়ে সবটুকু দিতে পারত না। আজ কিন্তু সবটুকুন দুধই ও ঢেলে দিল রিমলির বাটিতে। রিমলিও চুক্ চুক্ করে সব খেয়ে নিয়ে শরীরের লোমগুলো ফুলিয়ে চুপচাপ এক কোণায় গিয়ে বসে রইল।

প্রতি রবিবারেই রিমলিকে নিজে স্নান করায় রুমা। আজ সে খুব ভালো করে হলুদ দিয়ে স্নান করালো ওকে। তারপর সারাদিন ধরে নানা রকম খাবার খাওয়াতে লাগল পাখীটাকে। রাতে ঘুমোবার আগে রিমলিকে খুব খানিকটা আদর করে নিজের বিছানায় গিয়ে শুল। সত্যি, ভীষণ মায়া পড়ে গেছে ওর রিমলির উপর। বলতে গেলে নিজের হাতেই মানুষ করেছে ও পাখীটাকে। রুমা কি থাকতে পারবে ওকে ছেড়ে? নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হবে ওর। কিন্তু তাই বলে কি রিমলিকে আরো কষ্ট দেওয়া উচিত হবে রুমার? আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ল তা সে নিজেই জানে না।

খুব ভোরবেলা ঘুম ভাঙল রুমার। বিছানা থেকে চট্‌পট উঠে পড়ল সে। একটুক্‌রো আপেল নিয়ে চুপি চুপি দাঁড়াল গিয়ে রিমলির সামনে। চুপ করে বসেছিল রিমলি। রুমাকে দেখেই ধড়মড় করে উঠে ঠোঁট বাড়িয়ে আপেলের টুকরোটা নিল সে। তারপর এক মিনিটেই সাবাড় করল সেটা। রুমা একটু জল খাওয়ালো তাকে। হঠাৎ ঘুলঘুলির মধ্যে থেকে শোনা গেল টি-টি।

মা-পাখীটা ঘুলঘুলিতে এসে বসেছে, কিন্তু খাঁচার কাছে আসতে পারছে না রুমার ভয়ে। রুমা ইতস্ততঃ করল একটু, কিন্তু তারপরই সে ধীরে ধীরে খুলে দিল খাঁচার দরজাটা। কি হয়েছে বুঝতে পারল না প্রথমে রিম্‌লি। একটু গলা বাড়াল সে দরজাটা দিয়ে। লোহার শিক আর বাধা দিল না তাকে। তখন রিমলি 'টি' করে একটা হর্ষধ্বনি করে উঠল। ডানা মেলে দিয়ে একবার কেঁপে উঠেই বিদ্যুৎবেগে খাঁচা থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে বসল মায়ের পাশে। মা-পাখীটা আনন্দে ডেকে উঠে ঠোঁট দিয়ে একটুখানি আদর করল রিমলিকে। তারপর তারা দু'জনেই টি-টি করতে করতে রুমার মাথার উপর ঘুরপাক খেল বার কয়েক। 'রুমা—রুমা!' রিমলি হঠাৎ ডাকতে সুরু করল। টি-টি ডাকল মা-পাখীটা। পরক্ষণেই দুটিতে বারান্দা ছেড়ে মহাশূন্যে ডানা মেলে দিল। তাকিয়ে রইল রুমা। নীল আকাশের বেশ উঁচু থেকেও রিমলির কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'রুমা রুমা'। ক্রমেই দূরে চলে যেতে লাগল পাখী দুটি। মা-পাখীর টি-টি ডাককে ডুবিয়ে, দিয়ে ভেসে আসতে লাগল রিমলির রুমা রুমা ডাকের ক্ষীণ রেশ। যতক্ষণ পারল কান পেতে শুনল রুমা। কিন্তু এক সময় আর শোনা গেল না রিমলির ডাক—দেখাও গেলো না আর আকাশের কোনো প্রান্তে পাখী দুটিকে। শূন্য খাঁচাটা হাওয়ায় দুলতে লাগল। ছোট্ট রুমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিন্তু চেয়ে রইল তবুও আকাশের দিকে। আচম্‌কা কে যেন তাকে দু'হাত দিয়ে কাছে টেনে নিল। রুমা চমকে তাকিয়ে দেখল বাবা, মুখ তাঁর হাসিতে উদ্ভাসিত। দরজার কাছে মা-ও দাঁড়িয়ে আছেন হাসিমুখে। মা ও বাবা যে কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, রুমা টেরও পায়নি তা। অপ্রতিভ হলো সে একটুখানি। ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন বাবা, 'খুব ভালো করেছ, মা-মণি, রিম্‌লিকে ছেড়ে। দেখলে তো কত আনন্দ করতে করতে চলে গেল ওরা। তোমার উপর ওরা কত খুসী হয়েছে! সমস্ত আকাশ-বাতাস ভরে রিমলি তো কেবল তোমাকেই ডাকছে—ডাকবেও। ওদের জগতে ওরা ফিরে যাবে এখন। সেখানে গিয়ে বলবে রিমলি, রুমা নামে মানুষের ছোট্ট একটা মেয়ে ওকে মুক্তি দিয়েছে, কেমন কিনা মা-মণি?' রুমা একটু ভেবে বলল, 'ও এখন ওর বাবার কাছে ফিরে যাবে, না বাবা?' তার পর বাবাকে জড়িয়ে ধরে জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল আবার, 'আরেক জন্মে আমি পাখী হয়ে জন্মালে বেশ হবে, না বাবা?' ওপাশ থেকে মা বলে উঠলেন 'ও কি কথা! ছিঃ ছিঃ। বালাই, ষাট, বলতে নেই ও কথা। মানুষ হয়ে জন্মানো কত পুণ্যের ফল!'

কিছু না বলে একটু হেসে পরিতোষ বাবু মেয়ের গাল দুটো টিপে দিলেন।

১৬

অতিথিশালার ভার নিয়ে যিনি আছেন শুনলাম তিনি রাজ এষ্টেটের গোমস্তা। লোকের শত্রুর বা নিন্দুকের অভাব হয় না, এঁরও নেই, সেটা বোঝা গেল। অতিথিশালায় আশ্রয় নেবার আগেই আমরা দোকানদারের কাছে শুনেছিলাম যে অতিথিশালায় অতিথি কেউ আর আজকাল আসে না, অথচ অতিথিসেবার বরাদ্দ খরচ এষ্টেট থেকে ঠিকমতই ইনি নিয়ে থাকেন। নিজের গ্রামে এঁর জমিজমা এবং পুকুর-বাগানের তালিকা শুনতেও আমাদের দেরী হোল না।

যাই হোক, গোমস্তা মশায়ের ব্যক্তিগত ইতিহাস শুনবার জন্য আমাদের ব্যগ্রতা ছিল না। লোকটির নাম নীলাম্বর ঘটক। বয়স ষাটের কাছাকাছি বলেই মনে হোল।

এখানেও আবার অম্লশূলের উপাখ্যানটা বলতে হোল। এবার দিলীপকেই রোগী সাজিয়ে নিলাম। ভাল করে আমার অনুসন্ধান করতে গেলে কিছুদিন এখানে থাকা দরকার, সুতরাং একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন। পল্লীগ্রামের মধ্যে বাইরে থেকে হঠাৎ আমাদের মত দু'জন নূতন লোকের আবির্ভাবে নানা আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা, কাজেই আমাদের এখানে আসা এবং থাকার উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করতে হবে। কাজে কাজেই অম্লশূলের চিকিৎসার কথাটা নেহাৎ বেমানান হবে না।

ঘটক মশাইকে বললাম, আমার এই বন্ধুটি প্রায় তিন বছর ধরে অম্লশূলের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, পেটেণ্ট ওষুধ,—কিছু আর বাকী রাখি নি। হঠাৎ একদিন স্বপ্নে দেখা গেল যেন এক বিষ্ণুমূর্ত্তি এসে বলছেন যে বামুনগাছিতে আমার যে মন্দির আছে, সেখানে একমাস নদীতে প্রাতঃস্নান করে, নদীর জল সাত গণ্ডূষ খেয়ে তার পর নিত্যপূজা দিবি।

বললাম, আজকালকার লোক আমরা, সহজে এ সব স্বপ্ন-টপ্নর কথা বিশ্বাস করি না, কিন্তু কিসে কি হয় তা কে বলতে পারে? কাজেই বহু অনুসন্ধান করে এখানে এসেছি। আমাদের একমাস থাকার মত একটু জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে হবে, সেই সঙ্গে নিত্যপূজার।

ঘটক মশাই বিচক্ষণ লোক। জমিদারী কাজে মাথার চুল পাকিয়েছেন, কাজেই বেশ সন্দেহের চোখেই আমাদের দিকে চাইলেন। কিন্তু এখনও জাতিগত সংস্কারের কল্যাণে ঠাকুর-দেবতার নামে তাচ্ছিল্য করবার সাহস কারও হয় না। বোধ হয় এই কারণেই ঘটক মহাশয় বেশী কিছু আর বললেন না।

বাঁধানো হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে বললেন, ঠাকুর-দেবতার মহিমা বোঝা ভার। কার ওপর কখন যে কৃপাদৃষ্টি করেন কেউ বলতে পারে না। এই যে আমি সারাটা জীবন তাঁদের সেবায় কাটিয়ে দিলাম, মামলা-মোকর্দ্দমার স্বপ্ন ছাড়া আর কোনও স্বপ্নই এতখানি বয়স পর্য্যন্ত দেখলাম না। বরাত মশাই, সবই বরাত!

হুঁকোয় একটা টান দিয়ে তিনি আবার বলতে লাগলেন,—শিবমূর্ত্তির কথা যদি বলেন তো এত বড় শিব এ তল্লাটে কোথাও পাবেন না। কাশী, গয়ায় কখনও যাই নি বটে কিন্তু শুনেছি এত বড় শিব সেখানেও নাকি নেই! কিন্তু আপনারা তো বলছেন স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন বিষ্ণুমূর্ত্তি, তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তাতেই তো গোলমাল ঠেকছে মশাই! রাজা ছিলেন শিবভক্ত, তাঁর মা ঠাকরুণও তাই, সে জন্য তিনি এই বিরাট মন্দির তৈরী করে শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু রাণী ঠাকরুণ ছিলেন গোঁসাই-বাড়ীর মেয়ে, তিনি কৃষ্ণভক্ত। কাজেই রাণীর জন্য মহারাজকে বিষ্ণুমন্দিরও তৈরী করতে হোল। ওই জানলার ধারে গেলেই দেখতে পাবেন সে মন্দিরের ভাঙ্গা চূড়ো, এখন মাথায় গজিয়েছে অশ্বত্থ গাছ। বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হোল, সে মূর্ত্তিরও কি একটা কাহিনী আছে শুনেছিলাম আমার বাবার কাছে।

ঘটক মশাই বলতে লাগলেন, তার পর রাজাও স্বর্গে গেলেন, রাণীও গেলেন; কত পুরুষ এলো আর গেলো, কিন্তু মন্দিরের দেবতার পূজো চলে আসছিল মামুলীভাবে। তার পরেই ঘটলো এক কাণ্ড।

কি রকম?—জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

সে আজ প্রায় বিশ-বাইশ বছরের কথা। হঠাৎ এক রাত্রে ডাকাতি হয়ে গেল ওই বিষ্ণুমন্দিরে। ঠাকুরের গায়ে অবশ্য গহনাপত্র ছিল, কিন্তু সব গহনা তো ঠাকুরকে সব সময়ে পরানো হোত না, সবই থাকতো কাছারীর সিন্ধুকে। ঝুলন, রাস, দোল—

এই সব সময়েই সব গহনা পরানো হোত। কিন্তু মশাই, আশ্চর্য্য কাণ্ড! দোল নয়, রাস নয়, কোন পালাপার্ব্বণ নয়, হঠাৎ একদিন হা রে রে রে করে ডাকাতের দল এসে একেবারে ঠাকুর শুদ্ধ তুলে নিয়ে লোপাট! পূজারী ঠাকুর ছিলেন নিশু ঘোষাল, তিনি চেঁচামেচি শুনে ছুটে গিয়েছিলেন। কি বোকা দেখুন! একলা কখনও যায় ওই রকম করে? আমার তখন জোয়ান বয়স, সবে চাকরিতে ঢুকেছি, সে চীৎকার আমিও শুনেছিলাম, কিন্তু কই, আমি তো যাই নি! ফলে কি হোল? মাথায় মারলে এক লাঠি। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান, মাথা ফেটে রক্তারক্তি। তাঁর এক ছেলে থাকতো কলকাতায়, খবর পেয়ে সে এসে বাপকে নিয়ে গেল।

তারপর?

তার পর আর কি, সেই থেকে আর কোনও খোঁজ পাই নি ঘোষালের। তাও তো মানুষ একখানা পোষ্টকার্ড দিয়েও খোঁজ নেয়, কিন্তু কি বলবো মশাই, মানুষের কি আর ধর্ম বলে কিছু আছে? কোন খবরই দিলে না। এতকাল হয়ে গেল, সম্ভবতঃ ঘোষাল আর বেঁচে নেই। আমারই মরবার বয়স হোল, সে তো ছিল আমার চেয়ে অনেক বড়!

একটু থেমে ঘটক মশাই বললেন,—কিন্তু আজ বিশ বছরেরও বেশী দিন হয়ে গেল এই ঘটনা। সেই থেকে ও-মন্দিরে আর কোনও ঠাকুরই নেই। রাজাদের কাছে আমি কথাটা দুই-একবার পেড়েছিলাম, কিন্তু তাঁরা বিশেষ উৎসাহ দেন নি। কাজেই মন্দিরও ক্রমে ভেঙ্গে পড়ছে। আশ্চর্য্য হচ্ছি মশাই, এতকাল পরে তিনি স্বপ্নে দেখা দিলেন আপনাদের কাছে? আচ্ছা, কি রকম মূর্ত্তি স্বপ্নে দেখলেন বলুন তো?

মূর্ত্তির বিবরণ আমি শুনেছিলাম কানাইদাসের কাছে, কাজেই হুবহু বর্ণনা করতে কোনও অসুবিধা হোল না।

শুনে তাঁর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। হুঁকোর টান বন্ধ হয়ে গেল।

আমি আবার বললাম,—শুধু তাই নয়, আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিলাম, চোখের কি অদ্ভুত জ্যোতিঃ! যেন আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে!

ঘটক মশাই অভিভূত হয়ে গেলেন। বললেন,—চুপ চুপ, আর বলবেন না, আর বলবেন না। ওই চোখের জন্যই সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। বুঝতে পারছি আপনারা সত্যই ভাগ্যবান। সত্যই তাঁর দয়া আপনাদের ওপরে হয়েছে।

মনে মনে বুঝলাম ঘটক মহাশয়কে আমরা জয় করেছি। এর ফলে আমাদের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে এলো। মাসখানেক আমাদের এখানে থাকতে হবে এবং এজন্য একটা বাসার প্রয়োজন, সে কথা আবার জানালাম।

তিনি বললেন, পাড়াগাঁয়ে বাসা পাওয়া তো সোজা কথা নয়! অথচ মন্দিরের কাছাকাছি হওয়া চাই। একটু ভেবে বললেন, ঘোষালের বাসাটা তো খালি পড়ে আছে, বাসা মানে অট্টালিকা ভাববেন না। একখানা ঘর, তারও অবস্থা ভাল নয়। বৃষ্টি হলে হয়তো ছাদ দিয়ে জল পড়বে। একটা রান্নার চালা-ঘর ছিল, সেটা ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছে। কাজেই রোয়াকের উপরেই একখানা চালা তুলে তাতেই আপনাদের রান্নার কাজ চলতে পারবে। কিন্তু ঘরটা একবার ভাল করে পরিষ্কার করতে হবে, উঠানের জঙ্গল সাফ করতে হবে, একখানা চাল তৈরী করতে হবে, তার জন্য খুব কম করেও তো আট-দশ টাকা খরচ পড়বে।

আমি একখানা দশ টাকার নোট বের করে তাঁর হাতে দিলাম। তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বললেন, ব্যস্, ব্যস, আর কিছু ভাবতে হবে না। কালই আমি লোক লাগিয়ে সব ঠিক করে ফেলছি। পরশু দিন আপনারা গিয়ে উঠবেন ওই ঘরে। অসুবিধা অবশ্য হবেই, তা ছাড়া জায়গাটা বড্ড নির্জ্জন, একেবারে পাড়ার বাইরে আম-বাগানের পশ্চিম দিকটায়। তা হোক, তবু যাতে আপনাদের কোনও কষ্ট না হয় তা আমি দেখবো বৈ কি! ভাগ্যবান্ লোক আপনারা মশাই, তা নইলে কি ঠাকুরের দয়া যার তার উপর হয়?

(ক্রমশঃ)

চিঠি

শ্রীনবগোপাল সিংহ

স্নেহের সুচেতা,
অবাক্ হ'য়ে গেলুম তোমার
গড়গড়িয়ে পদ্য বলা শুনে,
রামধনুর ঐ 'জিজ্ঞাসা' মোর
ছাপলো যেটা এবারে ফল্গুনে।
সত্যি, ভারী হলুম খুসী,
আবৃত্তিতে অবাক্ হ'লুম আরো
দশ বছরের আগের লেখাও
অনায়াসে বলতে তুমি পারো।
কোন্ বোশেখে, কোন্ আষাঢ়ে
কবে কোথায় বেরুল মোর লেখা—
তোমার চোখে এড়ায় নি তা
মনের মাঝে পড়েছে তার রেখা।

আমার প্রতি থাক বা না থাক,
শ্রদ্ধা আছে আমার কবিতাতে—
আমারও যে ভক্ত আছে
প্রমাণ পেলুম এবার হাতে হাতে।
হাজার কবির লেখার পাহাড়
ভেদ ক'রে যে আমার লেখা পড়ে
অস্বাভাবিক নয় তো মোটে
শ্রদ্ধা হওয়া সে পাঠিকার 'পরে।

আমার কথা অনেক হলো,
এবার কিছু বলি তোমার কথা—
তোমার লেখাও খুবই ভালো
এ উক্তিতে নেই কো কপটতা।
কচি হাতের লেখা তোমার
কিন্তু তোমার কাব্য কাঁচা নয়,
ভাব ও ভাষা, ছন্দ ও মিল
লেখায় দেখি নিখুঁত সমন্বয়।
অকপটেই করছি স্বীকার
পম্পা, তুমি সত্যিকারের কবি,
অক্ লেগেছে প'ড়ে তোমার
না যাওয়া ঐ দার্জ্জিলিংএর ছবি।
অল্পদিনের সাধনাতেই
কাব্যে তুমি পাল্লা দিতে পারো—
সব কবিরাই করবে স্বীকার;
কিন্তু তোমায় লিখতে হবে আরো।
লিখতে হবে, পড়তে হবে,
শিখতে হবে আরো অনেক কথা,
লেখার মাঝে ডুবতে হবে—
তবেই হবে পূর্ণ সফলতা।

ভাগ্য তোমার সত্যি ভালো,
জন্ম নিলে সাহিত্যিকের ঘরে,
রামধনুকের সাতটী রঙে
নিত্য তোমার চিত্ত থাকে ভ'রে।
হিংসে আমি করছি নে কো
"মস্ত কবি হবেই তুমি জানি,"
জ্যোতিষী নই, তোমায় তবু—
জানিয়ে রাখি আমার ভবিষ্-বাণী।
পড়াশোনা বজায় রেখে
সময় মত চিঠির জবাব দিও,
শ্রদ্ধেয়দের প্রণাম দিয়ে
তোমরা আমার শুভেচ্ছাটুক্ নিও।
ইতি—শ্রীনবগোপাল সিংহ।

স্নেহের—
রত্নাবলী, তোমায় বলি,
সত্যি তোমার লজ্জা কন অত?
সঙ্কোচেতে পড়ছো নুয়ে
পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট মেয়ের মত!
কাব্যমাঝে আঁকছো ছবি—
বলছো তুমি কত নতুন কথা,
সবার কাছেই মুখ খুলেছো,
আমার কাছেই থামলো মুখরতা?
ভাবলে আমায় মস্ত কবি—
ধরবে বুঝি কত রকম পড়া,
সত্যি, তুমি ঠকলে ভারী,
উচিত ছিল একটু আলাপ করা।
গান শোনাতেও লজ্জা পেলে
শোনালে তা, শুনতে আমার কাছে;

সত্যিকারের গাইয়ে নহি—
তবু আমার গাওয়ার সাহস আছে।

তোমার লেখাও লাগলো ভালো—
ছন্দে মিলে দিব্যি দখল আছে,
মুখে যাহার নেই কো কথা
লেখনীতে এত কথাও নাচে।
অনেক দূরের মানুষ আমি,
কলকাতাতে ক্বচিৎ যাওয়া-আসা,
আবার দেখা হবে কিনা,
আপাততঃ নেই কো তেমন আশা।
সামনে না হয় মুখ ঢেকেছো,
মূক থেকেছো সারা সকালটাই,
লিখতে চিঠি লজ্জা তো নেই ?
কাব্য ক'রে জবাব দেওয়া চাই।

ইতি—শ্রীনবগোপাল সিংহ।

চিঠির উত্তর

শ্রীসুচেতা ভট্টাচার্য্য

শ্রদ্ধাস্পদেষু—নবগোপাল কাকা,
কবিতাতে চিঠি পেয়ে
আনন্দের আর রইল না মোর শেষ,
সবার কাছে শুনিয়ে বেড়াই—
প্রশংসাটা যোগাড় করি বেশ।
প্রাপ্য সেটা সবই কবির,
তবুও আমি হলাম অংশীদার ;
যা হোক তবু ভাগ্য ভালো
আমার তো নয়, আমার কবিতার !
পদ্য আমি ভালবাসি
পড়তে এবং লিখতে দু'টোতেই,
মুখস্থও করতে রাজী,
বলতে রাজী একটু ছুতোতেই।
'রজত-জয়ন্তীতে' সেবার,
'রামধনুর' ঐ 'উদয়-তিথির' ডাক,
আমায় যেন জানিয়ে দিল
আবার এলো পঁচিশে বৈশাখ।
সেই সেদিনের সে সুরগুলি
আজও আমার কানের কাছে ভাসে,
আওড়ে চলি যখন তখন—
নানা রকম স্বপ্ন ভেসে আসে।
সেইটি দিয়েই আলাপ হ'ল
কবিতা মোর হয় নি সুরু তখন,
ভাল খুবই লেগেছিল
সহজ ভাবে আলাপ হ'ল যখন।
শ্রদ্ধা আমার হয়েইছিল
সত্যি করেই—প্রথম লেখা দেখে,
তখনই সেই কাব্য আমি
মনের মাঝে দিলেম তুলে রেখে।

এবার থেকে আরেক কবির
খাঁটি মনের শুভেচ্ছাটুক নিয়ে,
করব সুরু চলা আমার
নতুন করে নতুন সে পথ দিয়ে।
মনে মনে রাখছি আশা
এমনি আবার অনেক চিঠি পাবো,
পদ্যে আমার লাগবে কাজে
এমনি কিছু যখন আমি চাবো।
—ইতি পম্পা (সুচেতা)

যাদুর খেলা

যাদুকর পি. কে. চৌধুরী

সেদিন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখি একজন লোক পথের মধ্যে বসে ভেল্কি বাজি দেখাচ্ছে। চারদিকে বেশ লোক জমে গেছে। লোকটি কিন্তু নেহাৎই একজন 'রাস্তার যাদুকর' অর্থাৎ যারা ডুগ্‌ডুগি বাজিয়ে খেলা দেখায়। কিন্তু তার খেলাটি ভারী সুন্দর লাগল। যাদুকরদের কাছে পুরোনো হলেও তোমাদের কাছে এর রহস্য বলে দিলে খুবই মজার লাগবে সন্দেহ নেই, এবং তোমাদের মধ্যে যারা এ সব ব্যাপারে উৎসাহী তারা এই ম্যাজিক দেখিয়ে বন্ধুবান্ধবদের আমোদও দিতে পারবে খুব। ম্যাজিকটা আগে বলি শোন :

যাদুকর প্রথমে দর্শকদের একটি সরু দড়ি পরানো কাগজের নল দেখালেন। তার পর নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে নলটি তাঁর খুবই বাধ্য। প্রমাণ স্বরূপ তিনি দড়ির এক প্রান্তে পা দিয়ে এবং অপর প্রান্ত হাত দিয়ে ধরে যেই নলটিকে আদেশ করলেন আপ্—ওঠো, আর, কি আশ্চর্য্য, নলটিও সুড় সুড় ক'রে দড়ি বেয়ে নীচ থেকে ওপরে উঠতে লাগলো। আবার যেই বললেন, "ডাউন" নামো, অমনি নল সুড় সুড় করে নীচে নামতে লাগল।

খেলার কৌশলটি কিন্তু অত্যন্ত সোজা এবং তোমরা সহজেই এই জিনিষটি বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারবে।

প্রথমে পাতলা 'পেষ্ট-বোর্ড' দিয়ে বারো বা চৌদ্দ ইঞ্চি লম্বা একটি নল বানিয়ে ফেল এবং নলের একদিকে একটি 'কাগজের ক্লিপ্' (পেপার ক্লিপ্) লাগাও। এবার চক্‌চকে রঙ্গীন কাগজ দিয়ে নলটি মুড়ে দাও (তা হলে দেখতে সুন্দর হবে)। এখন ছু' টুকরো সরু দড়ি, আন্দাজ দেড় ফুট ছু' ফুট করে, নাও এবং তার মধ্যে থেকে একটিকে নলের মধ্যে 'পেপার ক্লিপের' যে মাথাটা রয়েছে তার সঙ্গে বেঁধে দাও ও অপরটি একটি 'লুপ্' বানিয়ে প্রথমটির মধ্যে পরিয়ে নলের মধ্য দিয়ে অপর প্রান্তে বের করে দাও। এখন নলের যে দিকে 'পেপার ক্লিপ' লাগান রয়েছে সে দিকের দড়িটি পা দিয়ে চেপে এবং অপর দিক্ হাত দিয়ে ধরে টানলেই নলটি সুড় সুড় করে ওপর দিকে উঠতে থাকবে। আবার দড়ি ঢিলে দিলে নীচে নেমে যেতে থাকবে। দড়ি ছু'টো টুকরো হ'লেও দর্শকরা একটি বলেই জানবেন। কেন না নলের ভেতরের কারসাজি তো দর্শকরা কিছুই বুঝতে পারবেন না। দড়ির ছু'টো টুকরোই যেন এক রকম হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখবে। দেখাবার পূর্ব্বে কয়েকবার অভ্যাস করে নিও।

ছেলেধরা

শ্রীনীলিমা সেন (গঙ্গোপাধ্যায়)

আদালতে আজ ভীষণ ভীড়। লোকে লোকারণ্য; অমি শুক্‌নো মুখে বাবার পাশে বসে আছে। পিছনের দিকে সারি সারি অনেকেই বসে মা, ঠাকুমা, ঠাকুরদা আর রোমি। ফর্সা মুখটা সাদা করে অমি কড়িকাঠ থেকে কড়িকাঠে চোখ চালিয়ে দিল। ধুক্ ধুক্ করছে বুক; কারণ ওরই বিচার। আজকের অনুষ্ঠানের ও-ই প্রধান নায়ক। তোমরা হয়তো ভাববে—এ কি রকম কথা? অমি কি চোর না ডাকাত? পকেটমার না গাঁটকাটা? সেন্ট ল— স্কুলের ক্লাস ফাইভের ছাত্র অমিতাভ রায়, যে কিনা স্কুলবিখ্যাত হকি-খেলোয়াড়—যার নাকি পাঁচ হাজার ষ্ট্যাম্প কালেক্‌সন্,— তারই বিচার? পাতলা হাত দিয়ে লাটাই ঘুরিয়ে পাড়ার আকাশ তোলপাড় করে যার ঘুড়ি—সেই জুলজুলে-চোখ কপালের-ওপর-নেমে-আসা চুল—মিহি-গলা আর ধবধবে-রংএর অমিতাভ রায়ের বিচার!

চ্যাটার্জ্জি-বাড়ীর বৈঠকখানাটাই হ'ল আজকের আদালত। বিচার দেখতে অনেকেই হাজির হয়েছেন—পাড়ার মাতব্বরেরা। অমির বন্ধু-বান্ধবরা উদ্বেগভরা মুখে সময়

গুণ্‌ছে—কখন না জানি ভয়ানক একটা শক্ত শাস্তির কথা উচ্চারিত হবে বিচারক অর্থাৎ রায় বাহাদুরের মুখ থেকে! অমির শত্রুরাও এসেছে—যারা ডাং-গুলিতে অমিকে মারতে পারে না—যাদের ঘুড়িগুলো অমির বাড়ীর আকাশ পার হবার আগেই ঘাড় মট্‌কে লট্‌কে পড়ে। তারাও উৎসুক চোখে চেয়ে ফিস্ ফিস করছে—বেশ হয় যদি অমি একটা ভয়ানক শাস্তি পায়।

কিন্তু বিচারটা কেন?

তাহ'লে বলি শোনো:

অমি আর রোমি ছুই ভাইয়ে রোজ স্কুল থেকে একসঙ্গে ফেরে; বালীগঞ্জের মাঠের ধার দিয়ে নির্জ্জন রাস্তাটা ধরে এগিয়ে যায়। এদিকে যারা থাকে তারা বেশীর ভাগ আধুনিক সমাজের, বিলিতী-চালচলন-ঘেঁষা। ছু'ধারে বড় বড় বাগানওয়ালা বাড়ী—প্রত্যেক বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ফুলের গাছ, ছাঁটা ঘাস। গেটের ওপর ট্যাবলেটে বড় বড় নাম। কোন ট্যাবলেট মার্ব্বেল পাথরের, আবার কোনটা বা চক্‌চকে পিতলের; রোজ ব্র্যাসো দিয়ে পালিশ্ করা হয়। কালো রাস্তা গাছের ছায়ায় ঠাণ্ডা, তার ওপর ঝরা ফুলের রাশি! অমি আর রোমি ছু'টো দশ বছর আর আট বছরের মানুষ নির্জ্জন রাস্তাকে ভয় করে না। তা ছাড়া মস্ত হকি-খেলোয়াড় অমি কি আর ছোট ভাই রোমিকে সামলাতে পারবে না? বিকেলে স্কুল থেকে ফেরার সময় রীতিমত একটা ইভ্‌নিং ওয়াক্ দিয়ে বাড়ী যায়। যেতে যেতে প্রত্যেকটা বাড়ীর নেম-প্লেটগুলো চীৎকার করে পড়বে—হাতের স্কেলটা দিয়ে ঝরা-ফুলগুলোকে মারবে; নেপালী আয়াদের লেস্ লাগানো ওড়নার দিকে চেয়ে হাসবে। যদি দেখে যে আয়াগুলো গল্প করছে আর কোনো বেবী অর্থাৎ বাচ্চা ছেলেমেয়ে প্র্যামের মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে তাহ'লে রক্ষা নেই, অমনি দৌড়ে গিয়ে প্র্যাম্‌টা এক চক্কর ঘুরিয়ে আনবে।

সেদিন ওরা স্কুল থেকে একই বাঁধা রুটিনে বালীগঞ্জের নির্জ্জন ঝরাফুল-ঢাকা রাস্তাটা দিয়ে ফিরছে—হঠাৎ দেখে একটা ছোট্ট বেবী (এ পাড়ায় খোকা বা খুকী কেউ বড় একটা বলে না—সবাই বেবী) ফুটফুটে দেখতে—রাস্তাটার পাশের ঘাসের ওপর বসে বসে আঙুল চুষছে আর কাঁদছে। একটা প্র্যাম রয়েছে তার খানিকটা দূরে—আর ধারে-কাছে কেউ কোথাও নেই। অমি আর রোমি ছুই ভাইকে দেখে ছোট্ট এক বছরের "বেবী" আরো জোরে চিৎকার করে উঠলো।

ছুই ভাই থম্‌কে দাঁড়ালো। 'আহা, কার বাচ্চা কাঁদছে ভাই?' রোমি অমিকে বললো।

—'ও বোধ হয় হারিয়ে গেছে ; ওর আয়া বোধ হয় দুষ্টু—খারাপ লোক, ওকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে।' বললো অমি।

—'তাহ'লে ওকে কে বাড়ী নিয়ে যাবে—ও খাবেই বা কি ?' রোমি বললো মুখটাকে করুণ ক'রে।

—'এক কাজ করি চল, ওকে আমরা বাড়ী নিয়ে যাই ; আমরাই খাওয়াবো।'

তক্ষুনি কাজ সুরু। অমি প্র্যামটার ওপর বেবীটাকে বসিয়ে নিল—বইপত্তর-গুলোও ফেলে দিল তার মধ্যে ; তারপর দু'ভাই এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে মুহূর্তের মধ্যে হাওয়ার মতো স্পীডে ছুটতে লাগলো প্র্যামটা ঠেলতে ঠেলতে ! এতক্ষণে বেবীর কান্না থেমেছে—আপেলের মতো গালে টোল ফেলে, মোট সম্পত্তি দু'-তিনটে দাঁত বার করে খিল খিল করে হাসতে সুরু করছে।

সোজা বাড়ী। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলো অমি—এখনও দুপুরের ঘুম ঠিক মত ভাঙ্গে নি—কারণ জানালাগুলো বন্ধ। তাড়াতাড়ি বাড়ীর আউট হাউসটাতে দু'জনে চলে গেল—যেটাতে মালী থাকতো এত দিন। ভগবান্ রক্ষে করেছেন যে মালী দু'দিন হ'ল কাজ ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছে।

বেবীর স্থান হ'ল সেখানে। একটা সতরঞ্চিতে বসে বেবী খেলা করতে লাগলো। কি সুন্দর মেজাজ—একটুও কাঁদে না।

অমি রোমিকে বললো—'রোমি, তুই ব'স্ বেবীর কাছে, আমি দুধ নিয়ে আসি।'

অমি দৌড়াল, দেখল গোয়ালা দুধ দুইছে।

একটা মগ হাতে করে বলল—'আমাকে একটু দুধ দাও না সীতুলাল !'

—"দুধ ? তুমি কাঁচা দুধ নিয়ে কি করবে ?"—সীতুলাল চীৎকার করে বললো।

—'উঃ, চুপ করো না ; চেঁচাচ্ছ কেন ?' অমি দাঁত চেপে বললো। তার পরেই নরম গলায় ফিস্ ফিস্ করে বললো—'লক্ষ্মী সীতুলাল, একটু দুধ দাও—একটু বেশী করে !'

'সীতুলাল অনেক দিনের লোক। একটু স্নেহের হাসি হেসে বলল—'ব্যাপার কি বল তো অমি বাবু ? কুকুর পুষছ নাকি ?'—এই বলে এক পো দুধ ঢেলে দিল অমির মগে।

দুই ভাই মিলে বেবীকে খাওয়াতে লাগলো। বেবীটা হাততালি দেয় আর একটু করে চুমুক দিয়ে কাঁচা দুধ খেতে থাকে। তারপর ওরা অনেকক্ষণ খেলা করল ; খেলা করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে গেল, তখন বেবীর ঘন ঘন হাই উঠতে লাগলো। অমি তখন

প্র্যাম থেকে বেবীর বিছানাটা পেতে তাকে শুইয়ে দিল। বেবী মনের সুখে ঘুমুতে লাগলো।

অমি আর রোমি বাড়ী গিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত পড়তে বসলো। কিন্তু ওদের মন রয়েছে বেবীর ভাবনায় ডুবে—কান রয়েছে বেবীর কান্নার আশঙ্কায় খাড়া হয়ে। পড়া কি হয় ? রাত্তির বেলা যখন সকলে ঘুমিয়েছে—তখন অমি উঠলো চুপি চুপি, পা টিপে টিপে দরজা খুলে বাইরে এলো। রোমি ছোট্ট ছেলে হলে হবে কি—বেড়ালের মত নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল আবার। অমি এদিকে এক দৌড় দিয়ে আউট হাউসের মধ্যে। বেবী নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। হাতে মাথা রেখে অমিও ঘুমিয়ে পড়ল বেবীর পাশে।

সকালবেলা দুই ভাই নিজেদের ভাগের দুধ বেবীকে খাইয়ে দিল। স্কুলে যাবার সময় মাঝরাস্তা থেকে অমি আবার পালিয়ে এল ; কারণ বেবী কাঁদবে একলা ঘরে। তা ছাড়া বেবীকে একটু ভাতও খাওয়ানো হবে তো ' একটু মাছের ঝোল আর ভাত অমি অনেক কষ্টে ঠাকুরকে বলে-কয়ে এনে রেখেছে।

সন্ধ্যেবেলায় অমির ঠাকুরদাদা রায় মশাই লাঠি হাতে বেড়াতে বেরিয়েছেন, পথে দেখা স্কুলের রেক্টরের সঙ্গে। 'এই যে, গুড্ ইভনিং।' এক গাল হেসে রায় মশাই বললেন।

রেক্টর বললেন—'গুড্ ইভনিং মিষ্টার রায়। কোথায় চলেছেন, সান্ধ্য ভ্রমণে ?'

'—কি আর করি, একটু না বেড়ালে ঘুম হয় না। তা আমার নাতিগুলি লেখাপড়া করছে কেমন ?' বললেন রায় মশাই।

—'করছে তো ভালই। কিন্তু আজ একটা পরীক্ষা ছিল, অমিতাভ দিল না কেন ? অসুখ করেছে নাকি ? স্কুলে যায় নি তো !'

—'এ্যাঁ ! বলেন কি ? আমার সামনে দু' ভাই খেয়ে বেরিয়ে গেল বই হাতে করে ! স্কুলে যাবার নাম করে তাহ'লে খেলা করছিল রাজ্যের ভবঘুরে ছেলেদের সঙ্গে !'

বেড়ান হোল না। রায় মশাই ফিরে এলেন ভাবতে ভাবতে। তাই ত'—ছেলেটা পরীক্ষা দিল না—ছেলেটা বখে গেল এতটুকু বয়সে !

বাড়ী এসে জলদগম্ভীর স্বরে হাঁক পাড়লেন—'অমি—অমি—!' সারা বাড়ী সেই রাগের স্বরে কেঁপে উঠলো। চাকর-বাকর, দরোয়ান, বাবা, মা, ঠাকুমা, পিসিমা দিদি, দাদারা দল বেঁধে ছুটে এল বারান্দায়। অমি-রোমি তখন আলো জ্বেলে সবে মাত্র

পড়তে বসেছে। অমি রোমির মুখের দিকে চাইল। তুই ভাইয়ের ঠোঁট সাদা হয়ে এল।

অমি কি যেন আশঙ্কা করছিল। ধীরপায়ে ঠাকুরদার কাছে গেল। 'কি হয়েছে—কি হয়েছে?'—সবার কাছ থেকে এই রকম একটা গুঞ্জরণ গুণগুণিয়ে উঠলো। ঠাকুরদা বললেন—'তুমি স্কুল পালিয়েছ—তোমায় শাস্তি পেতেই হবে। আজ সারা রাত আউট হাউসে একলা বন্ধ থাকবে।'

ঠোঁট চেপে, মুখ নীচু করে, ভীত চোখে চাইতে চাইতে অমি চলল; সঙ্গে তালা-চাবি হাতে রায় মশাই। বাইরে থেকে বন্ধ করে দেবেন। পিছনে পিছনে রোমি, রামের ভাই লক্ষণের মতো ছায়া হয়ে অনুসরণ করলো।

রায় মশাই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। অমি প্রায় আধমরা হয়ে রয়েছে তখন, মনে মনে মা তুর্গাকে ডাকছে। (বিপদে পড়লে এ পাড়ার ছেলেরাও মা তুর্গাকে ডাকে!) ঘরে আলো জ্বালাই ছিল। রোমি মনে মনে ভাবছে কি বলে অমিকে উদ্ধার করা যায় এ বিপদ্ থেকে।

রায় মশাইয়ের চশমা-পরা চোখ তখন তীক্ষ্ণ হয়ে দেখছে।—'এ প্র্যামটা এলো কোত্থেকে? আরে, ছোট্ট একটা বিছানায় ছোট্ট একটা খুকী! 'এ কাদের বাচ্ছা?' রায় মশাই বিরাট এক হাঁক পাড়লেন। ছুটে এলো চাকরাণীরা—যারা তখন আউট হাউসের সামনে বসে মনিবের গল্প করছিল। সকলে বিস্ফারিত চক্ষে দেখল—'সত্যিই তো, এ কাদের বাচ্ছা! কে আনল?'

ততক্ষণে বাড়ীর মধ্যে খবর গেছে। দ্রুত পায়ে সবাই আউট হাউসের দিকে এগোলেন—ঠাকুরমা, মা, পিসিমা; চটির ফট্‌ফটানি তুলে হাজির হোল দাদা আর দিদির দল। ঠাকুরমা বললেন—'ও মা, হ্যাঁগা, তাই তো! একে আনলে কে?'

মা কাছে এগিয়ে এলেন—'আরে, এ যে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জির মেয়ে। এই তো পরশু ওদের বাড়ী গিয়েছিলাম! ও মা, কি হবে? এ কি কাণ্ড!'

মা তাড়াতাড়ি কোলে তুলতে গেলেন; বেবী ততক্ষণে এত লোক দেখে কাঁদতে সুরু করেছে।

—রোমিও কান্না জুড়ে দিল—'ও মিসেস্ চ্যাটার্জ্জির বাচ্ছা নয়,—ও অমির আর আমার। আমরা ওকে পেয়েছি। ওকে তোমরা দিয়ে দাও আমাদের কাছে।' রোমি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো—নরম নরম হাত তুটো দিয়ে চোখ ঢেকে। ঠাকুরদা গম্ভীর হয়ে গেছেন আরও। প্রশ্ন করলেন, 'অমি, একে কোথায় পেয়েছ?'

ঠাণ্ডা স্বরে জবাব দিল অমি—'রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি।'

—'আজ স্কুলে যাও নি কেন?'

—'বেবীকে দেখছিলাম।' অমির শান্ত কথার ভঙ্গীতে চুপ করে গেলেন রায় মশাই। ভাবলেন, যা হোক, ছেলেটা যত্ন করেছে বাচ্ছাটাকে।

ওদিকে গাড়ী বেরোবার শব্দ হ'ল। বাচ্ছাকে নিয়ে মা চলে গেলেন ফেরৎ দিয়ে আসতে। আর অমি সারা রাত বন্ধ রইল আউট হাউসে। সতরঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটালো।

রোমির একেবারেই ঘুম হোল না, কারণ অমি শাস্তি ভোগ করছে সেই তুঃখে জানলা দিয়ে সেও আকাশের তারা গুণতে লাগলো।

পরের দিন বিকেলে সারা বাড়ীর নিমন্ত্রণ চ্যাটার্জ্জি-ভবনে। অমি যে ছেলে চুরি করেছিল তারই বিচার হবে। বিচার করবেন রায় বাহাতুর ডি. বি. চ্যাটার্জ্জি। তাঁর নাতনীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার অপরাধের শাস্তি তিনিই দেবেন। অমির বিচার হবে শুনে ইতিমধ্যে অনেক ছোট ছোট চোখ উঁকি মারছে এদিক্ ওদিক্ থেকে।

রায় বাহাতুর বললেন—'তোমার নাম অমিতাভ রায়?'

অমি জুলজুলে চোখে অবাক্ হয়ে চেয়ে বললো—'হ্যাঁ।'

—'তুমি আমার নাতনীকে না বলে নিয়ে গিয়েছিলে?'

—'না—। রাস্তায় একা কাঁদছিল, তাই কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছি।'

বেবীর মা মুখে রুমাল দিয়ে খুক্ খুক্ করে হেসে উঠলেন।

—'ঠিক বলছ?'

—'ঠিক।'

—'তুমি ওকে কাঁদিয়েছিলে?'

—'না, ওকে ঘুম পাড়িয়েছি, তুধ খাইয়েছি।' নির্ভীক্ ভাবে জবাব দিতে লাগলো অমি।

এবার অমির ঠাকুরদা রায় মশাই উঠে দাঁড়ালেন, 'বেশ, শাস্তিটা আমিই বলি। অমি আসছে মাস থেকে বোর্ডিংএ থাকবে, আর ওর সমস্ত খেলা বন্ধ।'

কঠিন দৃষ্টিতে অমি ঠাকুরদার দিকে তাকালো। সারা রাত একা থাকায় ভয় পায় নি, কিন্তু এখন ভয়ে শিউরে উঠলো বোর্ডিংএ থাকার নামে। বেবীর বাবা বললেন—'আমি বলি কি, অমি তো আর খারাপ কাজ করে নি, বরং বেবীকে যত্নেই রেখেছিল। তার জন্যে ওর পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। দোষ তো আমার,—রাস্তার ধারে বাচ্ছাকে একা ফেলে অন্য দিকে যাওয়া কেন? যদি অমি না হয়ে অন্য কেউ নিত? তাহ'লে কি আমরা বেবীকে ফিরে পেতাম?'

TIGHT BINDING

বৈঠকখানার আদালতে গুণ্‌গুণিয়ে উঠলো—'সত্যিই তো. বেবীকে কি ফিরে পাওয়া যেত ?'

বেবীর বাবা বললেন, 'আমি তাই অমির জন্য একটা ছোট্ট ফাউন্টেন পেন এনেছি। এইটে দিয়ে ও পরীক্ষা দেবে। ও উপকার করেছে. তারই পুরস্কার।'

• অমির বাবা বললেন,—'অমি. এবার ক্ষমা চাও লক্ষ্মী ছেলের মত মিঃ চ্যাটার্জ্জির কাছে ; বলো. আর কখনো এমন কাজ করব না—ক্ষমা করুন।'

'ক্ষমা চাইব ? কেন ক্ষমা চাইব ? কি করেছি আমি তোমাদের ?'—হু হু করে কেঁদে উঠলো স্কুল-বিখ্যাত খেলোয়াড়।— 'চাইব না—কিছুতেই ক্ষমা চাইব না—' বলতে বলতে অমি ছুটে বেরিয়ে যেতে গেল। তক্ষুণি রায় বাহাদুর, মানে স্বয়ং বিচারক মশাই, অমিকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে ফেললেন।

—'না দাদা, তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে না। তুমি মহৎ ছেলে ; তুমি কোঁদো না।' *

* একটি বিদেশী গল্পের আংশিক ছায়া অবলম্বনে।

মনীষী বিপিনচন্দ্র শতবার্ষিকী

এ বছর বাংলা দেশের দু'জন মনীষীর জন্মশতবার্ষিকী। বাংলা দেশকে গড়ে তুলবার কাজে এঁদের দু'জনেরই দান অসামান্য,—যদিও দু'জনে কাজ করে গেছেন দু'দিক্ দিয়ে। এঁদের মধ্যে মহাবিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্রের কথা এবারে একটু বিস্তৃত ভাবে বলা হ'ল। এই সঙ্গে আমরা স্বাধীনতা এবং জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রধান ঋত্বিক মনীষী বিপিনচন্দ্র পালকেও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

বিপিনচন্দ্রের বাড়ী ছিল শ্রীহট্ট। ছাত্রজীবন থেকেই উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়ে তিনি তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। ফলে আমরা পাই সুবিদ্বান্, সুলেখক, সুবক্তা এবং সবার ওপর আদর্শ দেশপ্রেমিক বিপিনচন্দ্রকে। শিক্ষাগুরু রূপে, রাজনীতিক রূপে এবং সাংবাদিক রূপে তাঁর অসামান্য প্রতিভার কথা ভুলবার নয়। ভুলবার নয় তাঁর সেই ওজস্বিনী বাগ্মিতার কথা। দেশকে বিদেশী অধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি নিজের সারা

জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সম্পাদক। এ ছাড়া শ্রীহট্টের পরিদর্শক, লাহোরের ট্রিবিউন, লণ্ডনের স্বরাজ, এলাহাবাদের ডেমোক্রাট ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এবং কলকাতার লিবার্টি এবং বেঙ্গলীর সম্পাদক রূপে তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন।

ভারত সরকার বিপিনচন্দ্রের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ ডাকটিকেট বার করেছেন। সে টিকেট নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছ এবং সংগ্রহ করেও রেখেছ। কিন্তু শুধু টিকেট সংগ্রহ করলেই তো হবে না ! তাঁকে বুঝতে হবে, জানতে হবে, শ্রদ্ধা জানাতে হবে এবং তাঁরই মত দেশকে ভালবাসতেও হবে। তবেই বাংলার ঘরে ঘরে আমরা সত্যিকার মানুষ দেখতে পাব।

বিপিন-স্মরণে

শ্রীবিভা সরকার, বি. এ

বাগ্মী-শ্রেষ্ঠ বিপিনচন্দ্র, মনীষী দীপ্তচেতা,
স্মরণধন্য ওগো বরেণ্য, দুঃখ যুগের নেতা,
পরাধীন দেশে বন্ধুর বেশে শোনালে সত্য বাণী,
এ জাতির প্রাণে চেতনা জাগালে স্বাধীন মন্ত্র দানি'।
নবভারতের নূতন যুগের তোমরা যে রূপকার,
তোমাদের স্মরি' তাই তো আমরা জানাই নমস্কার।
এনেছিলে সাথে নির্ভীক্ প্রাণ জাতির মুক্তি লাগি,'
বিঘ্ন-বাধায় পরাণ মায়ায় চিরবরাভয় মাগি'।
জনে জনে তাই চেতনা জাগালো তোমার অগ্নিবাণী,
প্রাণের কুসুমে সাজালে মায়ের বরণমাল্যখানি।

TIGHT BINDING

মেঘনাদ

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

৬

সারা বিকেলটা অভিভূতের মত বসে রইল পৃথা। এমন কি চা-টা পর্যন্ত বানিয়ে খাওয়ার আগ্রহ দেখা গেল না তার। বিকেলে মিলিদের বাড়ী যাবার কথা ছিল একটা জরুরী নোট্ নিয়ে আসবার জন্য, তাও গেল না। এমন কি রাতে রান্না পর্যন্ত চাপাল না। পর পর দু'টো রাতই না খেয়ে কাটল তার।

পর দিন কলেজেও গেল না সে। অবশ্য আজ কলেজ না হবার সম্ভাবনাই বেশী। তাদের কলেজ ইন্টার-কলিজিয়েট স্পোর্ট্স্এ অনেকগুলো কাপ্ জিতেছে। যারা খেলেছিল তাদের উৎসাহ থাক বা না থাক, যারা খেলে নি তাদের উৎসাহ এ সব ব্যাপারে অনেক বেশী। এমন একটা ব্যাপারের নাম করে যদি একটা দিন ছুটীই আদায় করা না গেল তা হলে আর কলেজে পড়া কেন? কাজেই কলেজে আজ না গেলেও ক্ষতি নেই।

দুপুর বেলা হঠাৎ মনে কি সন্দেহ জাগায়, পৃথা গিয়ে পাশের ফ্ল্যাটে হাজির হ'ল। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, একটা ফোন করা, কারণ কাছাকাছি এই বাড়ীটাতেই একটা টেলিফোন আছে এবং তা কারণে-অকারণে ব্যবহার করবার সুযোগও আছে পৃথার।

'হ্যালো! পি-সেক্শনের রায়কে একটু ডেকে দিন না। আই মীন্ আই. রায়।'

সঙ্গে সঙ্গে মিহি গলা শোনা গেল টেলিফোন-অপারেটরের—'হোল্ড্ দি লাইন্ প্লীজ'—'ধরে থাকুন দয়া করে।'

একটু পরেই তারের অপর দিক্ থেকে আওয়াজ কানে এল—'কাকে চাই? আই. রায়? ইন্দর্? কে, পৃথা নাকি?'

'কে, দাদু?' বটব্যাল মশাইএর গলা চিনতে দেরী হ'ল না পৃথার। বটব্যাল

মশাইকে আপিসের সকলেই শুধু নয়, পৃথাও চেনে, তার দাদার দৌলতে। ২।১ বার ওদের বাড়ীতেও তিনি এসেছেন, এবং দাদার দেখাদেখি পৃথাও তাঁকে দাদু বলেই ডেকেছে।

'দাদা'কে কেন বল তো? ও যে কাল সন্ধ্যাবেলা দিল্লী চলে গেল, ভুলে গেলে এরই মধ্যে?'

'ও! না, মানে,—আমার সঙ্গে দেখা বা কথাবার্ত্তা কিছু হয় নি কিনা কাল, তাই ঠিক বুঝতে পারছিলাম না—'

এবারে 'ও!' বলার পালা বটব্যাল মশাইএর। বললেন, 'ও! তা দেখা করবেই বা কখন? পরশুই তো এক রকম ঠিক হয়ে ছিল ওকে পাঠানো হবে। আপিসের জরুরী কাজ, দিল্লীতে গিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে। আর ওই কাগজপত্রগুলোর খুঁটিনাটি ভার ওরই ওপর কিনা! কিন্তু পরশু যে কাণ্ড হয়ে গেল! ওকে আর আপিস থেকে বলে দেবার ফুরসৎই পাওয়া গেল না। কাল যখন এল তখন আর সময় কোথায়? বহু কাগজপত্র, সব গুছিয়ে নিয়ে তাই এখান থেকেই সোজা ষ্টেশনে চলে যাবে ঠিক হ'ল। কিন্তু দুপুরে একবার তো বাড়ী গিয়েছিল—জামাকাপড়, বিছানা নিয়ে আসতে। তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি বুঝি?'

'না, আমি তো কলেজে ছিলাম। কিন্তু পরশু—পরশু—কি হয়েছিল?—আমি তো কিচ্ছু জানি না—!'

'বল কি? অত বড় হৈ-রৈ ব্যাপার, পুলিশের টানা-হ্যাঁচড়া—সে তো এক সপ্তকাণ্ড মহাভারত, থুড়ি রামায়ণ। সবাই জানে আর তুমিই জান না! খবরের কাগজে দেখ নি?'

'না তো!'

'ও, পুলিশই তা হলে বারণ করে দিয়ে থাকবে কাগজওয়ালাদের ও নিয়ে হৈ-চৈ করতে। কিন্তু ইন্দর্ও কিছু বলে নি তোমাকে? আশ্চর্য তো!'

আবার অভিমানে গলা ধরে এল পৃথার। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'যাক্ গে, তা হ'লে সত্যি সত্যি আপিস থেকেই পাঠিয়েছে? অনেক দেরী হবে ফিরতে? আপনি জানেন কিছু?'

'এই দেখ! আমি কি সব জানি? তবে হ্যাঁ, কাজ অনেক, দিল্লীতেই তো এক হপ্তার ওপর লেগে যাবে শুনেছি। তার পর আরও কয়েক জায়গায় যাবার কথা আছে। বম্বে, পুনা, ব্যাঙ্গালোর। ইন্দর্কেই যদি সব জায়গায় যেতে হয় তবে তো মাস খানেকের ধাক্কা! যাক্ ভয় ক'—

ঘটাং করে টেলিফোন রাখার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলেন বটব্যাল মশাই। মনে মনে বললেন, 'মেয়েটার আর সব ভাল, কিন্তু বড্ড মেজাজ। বেচারা ইন্দ্রকে এই বোন সামলাতে কম বেগ পেতে হয় না নিশ্চয়ই।'

ঘটাং করে টেলিফোন রেখে পৃথা নিজের ঘরে ফিরে এল। এবারে ইন্দ্রনীলের প্রতি একটু যেন মায়া হ'ল তার। সত্যি, কি ব্যাপারটা না জেনে আগেই অমন ক্ষেপে যাওয়া উচিত হয় নি তার। বেশ বোঝা যাচ্ছে পরশু এমন কিছু ঘটেছিল যার জন্য দাদাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেন? দাদা তো নির্বিরোধী লোক,—যাকে বলে সদাশিব। পুলিশের সুনজরে পড়তে পারে এমন কোন কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব। নিশ্চয়ই ভয়ানক কিছু একটা ঘটে থাকবে। নইলে দাদা হেন লোক অমন মুষড়ে পড়বে কেন? কী গম্ভীরটাই না হয়ে ছিল কাল সকালে! তবে ভরসার কথা, ব্যাপারটা বোধ হয় মিটে গেছে। বটব্যাল মশাইএর কথা শুনে অন্ততঃ তাই তো মনে হচ্ছে।

কিন্তু একা একা তারই বা সময় কাটবে কি করে? মাসিমার ওখানে ২।৪ দিন কাটিয়ে আসবে? তার চেয়ে বরঞ্চ চন্দননগর ঘুরে আসা যাক্। ভাস্বতী কত দিন ধরে বলছে। গঙ্গার ধারে বাড়ী। ২।৪ দিন ভালই লাগবে। ঘরে তো এমনিই তালা বন্ধ থাকে, মিসেস্ বোসকে একটু নজর রাখতে বলে গেলেই হবে। সে-ই ভাল।

ভাস্বতীরা পৃথাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ভাস্বতীর মা ওর সম্পর্কে পিসীমা হন। কিন্তু তার চেয়ে সম্পর্কটা বেশী ভাস্বতীর সঙ্গে। ভাস্বতী ওর ছেলেবেলার বন্ধু, এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু।

চন্দননগরের কথা মনে পড়তেই মনে পড়ল ভাস্বতীর ছোট ভাই পটুর কথা। বয়সে ওদের চেয়ে বছর দেড় কি দুইএর ছোট, কিন্তু পড়ে ওদেরই সঙ্গে, অবশ্য অন্য কলেজে। আর কী ডানপিটে ছেলে রে বাবা! তবে ডানপিটে হলেও মনটা ওর বড় ভাল, আর বড্ড হাসিখুসি ছেলেটা। যাকে বলে দিলখোলা। এত মজাও করতে পারে! সেবারে—

ভাবতে গিয়ে পৃথা আপন মনেই ফের ফিক্ করে হেসে ফেলল।

(ক্রমশঃ)

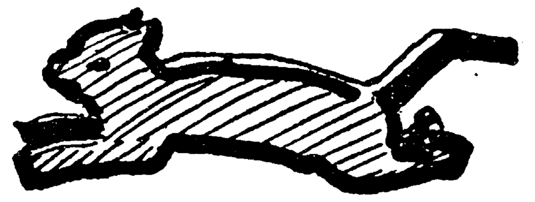

নতুন বই

শ্রীগৌরী দেবী

'ঘুরে এলাম সুন্দর বন' লিখেছেন—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী। ঘরের কাছে সুন্দর বন, কিন্তু ক'জন তার সত্যিকার খবর রাখে আর ক'জনই বা তা দেখতে যায়? আর যাতায়াত তো সহজ নয়। জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ, গাছে সাপ—এই হ'ল সুন্দর বন। কিন্তু এ ছাড়াও অনেক কিছু দেখবার, জানবার এবং উপভোগ করবার আছে সুন্দর বনে। পাকা লিখিয়ে ননী বাবু নিজে ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে এসে তারই কথা এই ছোট্ট বইখানার মধ্যে সরস করে লিখেছেন। পড়লে একসঙ্গে ভ্রমণকাহিনী এবং গল্প পড়ার আনন্দ পাওয়া যাবে। বড় বড় অক্ষর আর কয়েকখানি রেখাচিত্র আছে। প্রকাশ করেছেন বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম ৭৫ নঃ পঃ।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু—'বিজ্ঞান-সাধক-চরিতমালা' নাম দিয়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের জীবনী ও আবিষ্কারের কথা ছোটদের কাছে পরিবেশনের ভার নিয়েছেন ওরিয়েণ্ট বুক কোং। এটি সেই গ্রন্থমালার ১ম বই, লিখেছেন শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত লোকের জীবনকথা নিয়ে এই গ্রন্থমালা সুরু হয়েছে সন্দেহ নেই। এতে আচার্য জগদীশচন্দ্রের গৌরবোজ্জ্বল জীবনকথা আর সেই সঙ্গে তাঁর আবিষ্কারের বিষয় সংক্ষেপে অথচ বেশ গুছিয়ে বলা হয়েছে। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের এ বই পড়ে দেখা উচিত।

মহাবিজ্ঞানী নিউটন—এটি উপরোক্ত বিজ্ঞান-সাধক-চরিতমালার ২য় গ্রন্থ। লিখেছেন তোমাদেরই সম্পাদক মশাই শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য। নিউটন সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অন্যতম। তাঁর জীবনী ও আবিষ্কারের কথা তোমাদের যে খুবই ভাল লাগবে এ তো জানা কথা। আর ছোটদের জন্য সহজ করে, সরস করে এবং চিত্তাকর্ষক ভাবে বিজ্ঞানের গল্প লিখতে এই লেখকের যুড়ি যে কমই আছে তা তো তোমরা জানই। এই বইটিও তাঁর সেই অনবদ্য লিপিচাতুর্যের সঙ্গে লেখা। রোমাঞ্চকর গল্প চিরকালই ছোটদের প্রিয় এবং সে কাহিনী যদি মন-গড়া না হয়ে সত্যিকার হয় তবে তা আরও বেশী কৌতূহলকর হয়। এই রকম বহু সত্যিকার রোমাঞ্চকর কাহিনীর সন্ধান বোধ হয় দিতে পারে একমাত্র বিজ্ঞান। আবার বিজ্ঞানীকে বাদ দিয়েও বিজ্ঞানের গল্প হয় না। লেখক এই সব ভেবে-চিন্তে সেই ভাবে, প্রচুর সতর্কতার সঙ্গে, তাঁর বই লিখেছেন। ছেলেমেয়েদের কাছে এ বইএর আদর হবেই। বইএর ছবিগুলিও সুন্দর।

দু'খানি বই-ই প্রকাশ করেছেন ওরিয়েণ্ট বুক কোং, ৯, শ্যামচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২, প্রত্যেকখানির দাম ১ টাকা ২৫ নঃ পঃ।

আচার্য জগদীশ-শতবার্ষিকী

দেখতে দেখতে একশ' বছর পার হয়ে গেল।

আজ থেকে ঠিক একশ' বছর আগে বাংলা দেশে এমন এক মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন যিনি নিজের প্রতিভাবলে সারা পৃথিবীর কাছে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে তোলেন। ইনি আর কেউ ন'ন—ভারতের, তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

আচার্য জগদীশ (যৌবনে)

এ বছর সমারোহের সঙ্গে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালিত হ'ল। এখনকার ছেলেমেয়েরা, যারা এই মনীষীর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পায় নি, তারা তাঁকে চিনবার, তাঁর কথা ভাল করে জানবার, তাঁর বহুমুখী প্রতিভার কথা স্মরণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার সুযোগ পেল। ভারত সরকারও জগদীশচন্দ্রের ছবি দিয়ে ডাকটিকেট বার করে এই মহাবিজ্ঞানীকে সম্মানিত করে নিজেরাই সম্মানিত হলেন। এই টিকেট বোধ হয় এখনও তোমরা ব্যবহার করছ।

জগদীশের কর্মময় জীবনের কথা বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। রামধনুতে ইতিপূর্বেই তাঁর সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। পুরোনো রামধনু (১০ম বর্ষের – পৌষ, ১৩৪৪) যদি কারো কাছে থাকে তবে তার মধ্যেও দেখতে পাবে প্রায় ঐ সময়টায়ই তাঁর মহাপ্রয়াণ হয়েছিল কিনা! কিন্তু আজ মৃত্যুতিথির কথা নয়—আজ জন্মতিথি—একশ' বছরের জন্মতিথি। তাঁকে নমস্কার জানাবার এমন সুযোগ সহজে পাওয়া যাবে না।

কবি রবীন্দ্রনাথ আচার্যকে সম্বোধন করে লিখেছিলেন—"ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্ত্তি তুমি?" আর এক জায়গায়—"হে তপস্বী, তুমি একমনা,— নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে, অরণ্যের একান্ত বন্দনা শুনেছ একান্তে বসি।" সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"মরমী তুমি চরম-খোঁজা, মরম শুধু খুঁজেছ গো, লজ্জাবতী লতার কি যে সরম তাহা

বুঝেছ গো।" এবং "দরদী তুমি, দরদ দিয়ে দেখছ তৃণলতার প্রাণ, খনির লোহা, প্রাণীর লোহ পরশে তব স্পন্দমান।" এই সামান্য কয়েকটি ছত্রে জগদীশের মহান্ আবিষ্কারের কথা বড় সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। উপনিষদের বাণী বৈজ্ঞানিক জগদীশের হাতে পড়ে মূর্ত হয়েছিল। এই বিশ্বের তৃণলতা, পশুপাখী, কীটপতঙ্গ, এমন কি প্রত্যেকটি ধূলিকণা পর্যন্ত এক আত্মীয়তার বাঁধনে বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি। পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানীরা এ ধরণের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা কল্পনাও করতে পারেন নি।

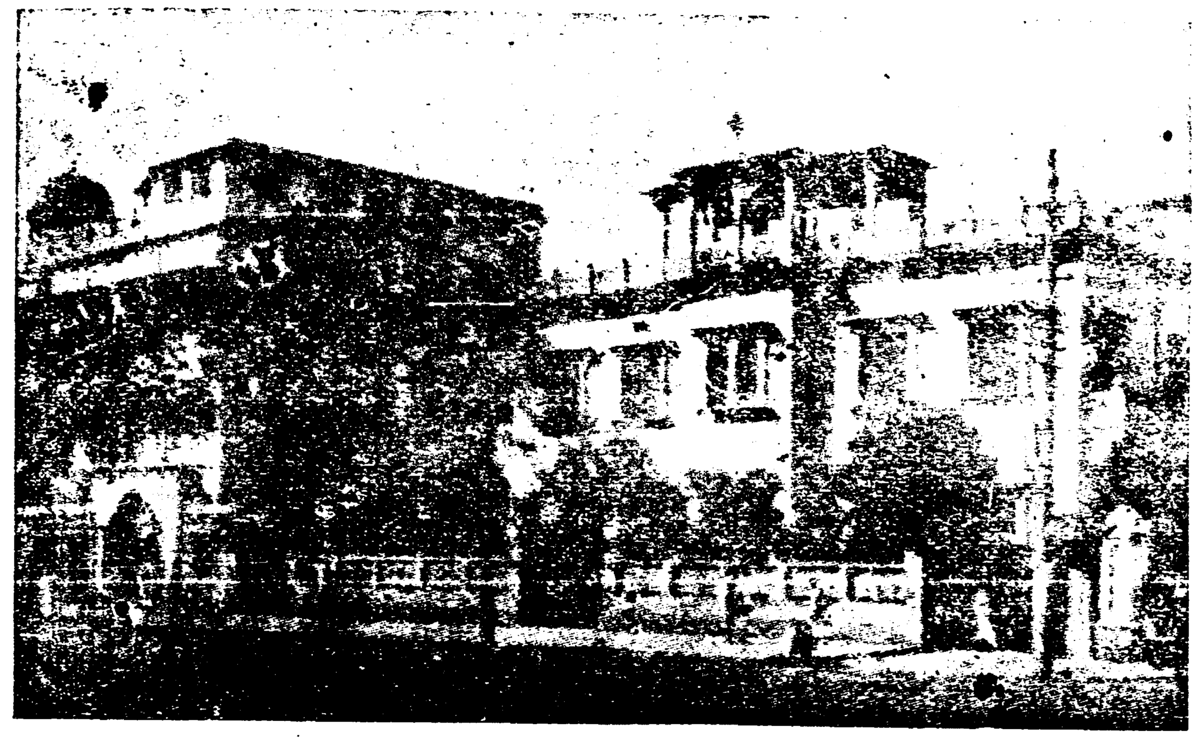

বসু বিজ্ঞান-মন্দির। বাঁ-দিকে আচার্যের বাসভবন

কিন্তু শুধু এই নয়, পদার্থবিজ্ঞান— বিশেষ করে বেতার সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার কথাও ভুললে চলবে না। বেতারের প্রথম যুগে যাঁরা এই আশ্চর্য বিষয় নিয়ে গবেষণা সুরু করেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম, অগ্রণী বললেও ভুল হবে না। প্রচারের অভাবেই বেতার-আবিষ্কারের গৌরব তিনি পান নি। বেতার-আবিষ্কারক মার্কনীর অসামান্য প্রতিভাকে খাটো না করেও এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়।

জগদীশচন্দ্রের প্রচণ্ড দেশাত্মবোধ, প্রাচীন ভারতের সাধনার ওপর অপরিসীম শ্রদ্ধা, অচপল ভগবদ্ভক্তি আর অসামান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভা—সমস্ত মিলে তাঁর জীবনকে মহিমামণ্ডিত করে গেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রতিও তাঁর অনুরাগ বড় কম ছিল না। তাঁর বাংলায় লেখা চিঠিপত্র ও অন্যান্য রচনাতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। চমৎকার ছিল তাঁর রচনাভঙ্গী। তাঁর লেখা 'অব্যক্ত' বইখানা পড়লেই তা বোঝা যায়।

বিদেশী মনীষীরা—বিজ্ঞানীরা উচ্চকণ্ঠে—শতমুখে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের প্রশংসা করে গেছেন। এঁদের মধ্যে আইনষ্টাইন, লর্ড কেলভিন, লর্ড র‍্যালে, অলিভার লজ্, উইলিয়াম্ র‍্যামজে প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা, রোমাঁ রোলাঁ, বার্ণার্ড শ' প্রভৃতি চিন্তানায়করা এবং আরো অনেকে ছিলেন।

কিন্তু কত আর বলব? তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির শুধু একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়ে আজ তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই।

জগদীশচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

জন্ম—১৮৫৮, ৩০শে নভেম্বর। ময়মনসিংহ সহরে। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে রাড়িখাল গ্রামে ছিল তাঁদের পৈত্রিক নিবাস। পিতার নাম ভগবান্‌চন্দ্র বসু (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট), মাতা—বামাসুন্দরী দেবী।

ফরিদপুর সহরে ৫ বছর বয়সে এক বাংলা স্কুলে লেখাপড়া সুরু হয়। তার পর কলকাতায় এসে প্রথমে হেয়ার স্কুলে এবং পরে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজে পড়তে

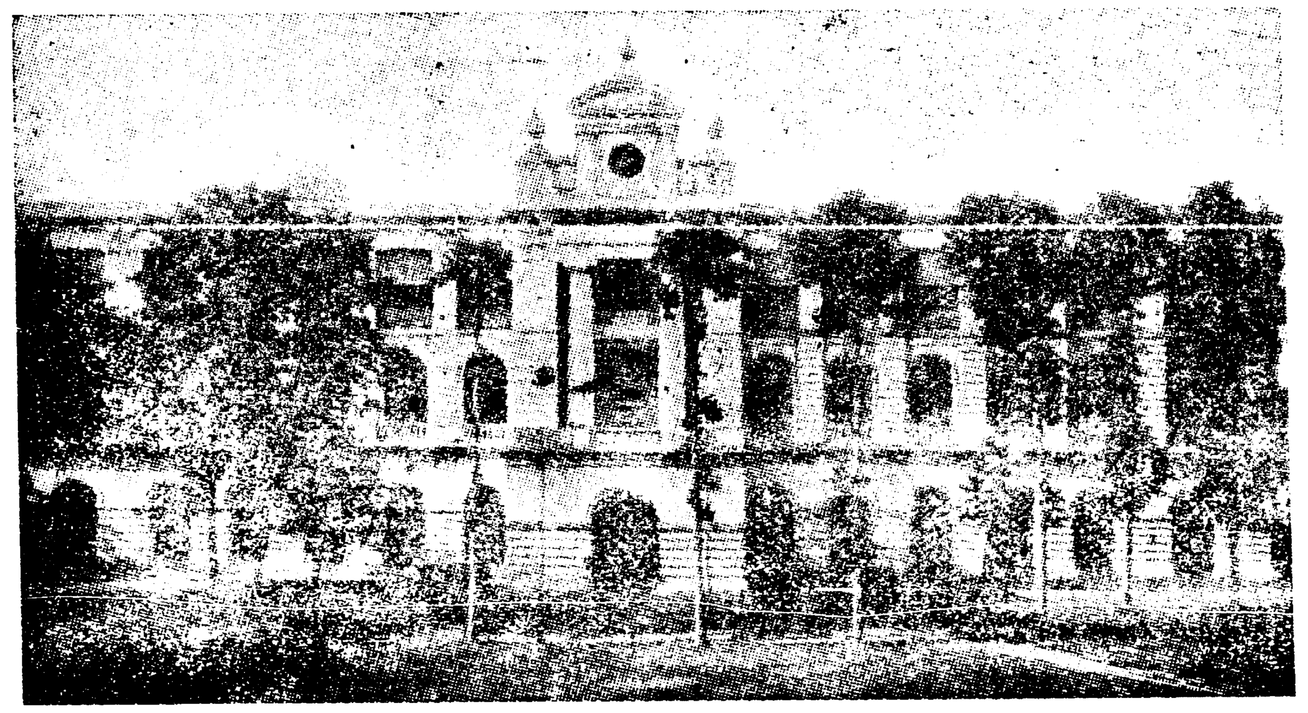

আচার্য জগদীশের প্রথম কর্মস্থল—প্রেসিডেন্সী কলেজ

থাকেন। ১৮৭৯ সনে বি. এ পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ডে যান। প্রথমে ডাক্তারী পড়া সুরু করেন। পরে তা ছেড়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে ট্রাইপোজ নিয়ে লণ্ডন থেকে বি. এস্‌-সি ডিগ্রী লাভ করেন।

১৮৮৫ খৃঃ প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৮৭ সালে দেশবন্ধুর পিতৃব্য দুর্গামোহন দাশের কন্যা অবলা দাশের (ইনিও তখন ডাক্তারী পড়তেন) সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের বিবাহ হয়। কিন্তু এঁরা নিঃসন্তান ছিলেন। ১৮৮৭ সাল থেকেই প্রেসিডেন্সী কলেজে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিকে আকৃষ্ট হন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে নিজেই দেশী মিস্ত্রীদের সাহায্যে আশ্চর্য আশ্চর্য যন্ত্রপাতি তৈরী করে নিয়ে

গবেষণা সুরু করেন।—বেতার ও বিদ্যুৎতরঙ্গ নিয়ে গবেষণা। ১৮৯৫ সালে আরও ভাল করে গবেষণার জন্য বিলেত যান, এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৭ সালে ফিরে আসেন এবং এই বছরই কলকাতায় প্রথম বেতারে সংবাদ প্রেরণের পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন। ঐ বছরই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে। ইতিমধ্যে প্রাণিবিজ্ঞান ও উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানেও তাঁর যুগান্তকারী গবেষণা সুরু হয়।

১৯০০ সালে বাংলা ও ভারত সরকারের প্রতিনিধি হয়ে প্যারিস প্রদর্শনীতে আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগদান করেন। প্রায় এই সময়েই তাঁর আশ্চর্য আবিষ্কার পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত হয়।

১৯০৭ সালে আবার ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় গিয়ে নিজের বিভিন্ন আবিষ্কার হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখান। এই সময় জাপানেও যান।

১৯১১ সালে ৪র্থ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে (ময়মনসিংহ) মূল সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯১৪ সালে আবার ইয়োরোপ যান এবং নিজের আবিষ্কারের কথা প্রচার করেন।

১৯১৫ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর নেন কিন্তু এমেরিটাস অধ্যাপক পদে (আজীবন) নিযুক্ত হন।

১৯১৬ সালে স্যর উপাধি লাভ করেন।

১৯১৭ সালে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার "বসু বিজ্ঞান-মন্দির" প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯১৯ সালে আবার ইয়োরোপে যান এবং ১৯২০ সালে রয়াল সোসাইটির সদস্য (এফ্. আর. এস্) নির্বাচিত হন।

১৯২৩, ১৯২৬, ১৯২৭, ১৯২৮ ও ১৯২৯এ পুনরায় ইয়োরোপ যাত্রা (মোট দশবার)। ইতিমধ্যে ভারতের ও ইয়োরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে বক্তৃতা দিতে ডাকা হয়, সম্বর্দ্ধনা জানানো হয় এবং অনেক জায়গা থেকে সম্মানসূচক ডক্টর উপাধিও দেওয়া হয়। ১৯২৭ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে মূল সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯২৮ সালে কলকাতায় তাঁর সপ্ততিতম জয়ন্তী-উৎসব হয়।

১৯৩৭ সালে ৮০ বছর বয়সে গিরিডিতে অকস্মাৎ পরলোক গমন করেন।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

অনেক দিন পরে আবার তোমাদের সামনে হাজির হলাম। ইতিমধ্যে কাগজের অভাব নিয়তই বাড়ছে। এতদিন যা ছিল দুর্মূল্য এখন তা হয়েছে দুষ্প্রাপ্য। পছন্দ মত কাগজ পর্যাপ্ত পরিমাণ সংগ্রহ করা যে কি কষ্টকর তা ভুক্তভোগীরাই জানে। রামধনুতেও তার ছাপ তোমাদের চোখে পড়বে।

গত মাসের মুখপত্রের ছবিটিতে (ঝড়ে) একটা ছাপার ভুল হয়ে গিয়েছিল। শিল্পীর নাম এস. বি. পাল চৌধুরী নয়,—বি.বি পাল চৌধুরী হবে। পুরো নাম শ্রীভানুভূষণ পাল চৌধুরী। ইংরেজী কায়দায় সংক্ষিপ্ত করতে গিয়েই এই বিভ্রাট ঘটেছে। যাই হোক, আমরা লজ্জিত। নামটা তোমরা সংশোধন করে নিও।

এবারে চিঠি লেখার বড়ই স্থানাভাব। খুব অল্প কথায় তাই শেষ করব। শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় (গড়বেতা)—মৌলানা আজাদের জন্ম মক্কা শহরে, শিক্ষাও মিশরের অল্-আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। কলকাতার স্থায়ী অধিবাসী হলেও উর্দ্দুকেই তাঁদের পরিবার মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করেছিলেন। ডাঃ শিশিরকুমার মিত্রের পরিবার আগে গিরিডির স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন। শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত (ভাগলপুর)—শ্রীসৌরেন্দু গোস্বামী মহাশয়ের ঠিকানা আমার জানা নেই। নেতাজীর রহস্যের এখনও সমাধান হয় নি—এখনও অনেক কিছু অজ্ঞাত। কাজেই এ সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ মতামত দেওয়া কঠিন। শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় (বাঁকুড়া)—আশ্বিন সংখ্যা রামধনুতে শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'আশ্বিন' কবিতাটি ১৩৬৩ সালে ভারতবর্ষের 'কিশোর জগৎ' বিভাগে বেরিয়েছিল জানতে পারলাম। এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় জানিয়েছেন যে ওটা তিনি বহুদিন আগে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁরা যে ওটি প্রকাশ করেছেন সে খবর আর সেই সংখ্যা ওঁর কাছে এ যাবৎ না পৌঁছানোয় এই বিভ্রাট ঘটেছে। ওটি ভারতবর্ষে প্রকাশিত হবে না বুঝেই উনি অন্যত্র পাঠিয়েছিলেন। পল্লী অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়ায় তাঁর পক্ষে সব পত্রিকা প্রতি মাসে দেখা সম্ভব হয় না। যাই হোক, এবারকার কাণ্ড দেখে তিনি ঠিক করেছেন ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ নতুন লেখা কবিতা ছাড়া পূর্বের কোনও কবিতা কোন পত্রিকায় পাঠাবেন না।

আজ এখানেই শেষ করি। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। ইতি —রাঃ সঃ

পাকলো ধান

শ্রীমাধব পাল

পাকলো ধান পাকলো ধান,
গাইছে চাষী খুসীর গান।
সাত সকালে— ভোর না হতে
গিলাপ গায়ে কাস্তে হাতে
চলছে চাষী; সঙ্গে ছেলে,
শিশির-ভেজা মাঠের কোলে।
আশায় ভরা চাষীর প্রাণ;
পাকলো ধান পাকলো ধান।

এলো গেলো, বর্ষা কাল,
শুক্‌নো ভুঁয়ে চললো হাল।
বীজ ছড়ানো, মই দেওয়া,
আকাশপানে জল চাওয়া।
গাছ গজালো, ধরল শীষ—
সুরলোকের স্নেহাশীষ।
চাষীর বুকে খুসীর বান;
পাকলো ধান পাকলো ধান।

আঁটি বেঁধে জড়িয়ে ধর্,
গোলায় নিয়ে ভর্তি কর্।
চাষীর বৌ, চাষীর ঝি,
ঢেঁকীর তালে শুনছো কি?

নবান্ন ঐ দেখবি চল্,
সবার বুকে আশার বল।
বছর পরে শ্রমের দান ;—
পাকলো ধান পাকলো ধান।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১—কড়া, ২—চাটু, ৩—ডিস, ৪—তাওয়া, ৫—মগ, ৬—শিশি, ৭—বাটী, ৮—মালসা, ৯—ধামা, ১০—কাপ, ১১—সরা, ১২—হাঁড়ী, ১৩—প্যান ১৪—পরাত, ১৫—ঘটি, ১৬—কলসী, ১৭—জগ, ১৮—গামলা, ১৯—বদ্না, ২০—হাতা, ২১—কুঁজা, ২২—টিপট্, ২৩—বেলুন, ২৪—থালা

উত্তরদাতাদের নাম :—প্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু) (কলকাতা-৬)—রত্না, স্বপ্না, ছন্দা ও জয়ন্ত রায় (বাঁকীপুর) ; রবি, হিড়ু, জলি, শোভনা, দিদি, জামাইবাবু জয়শ্রী, বাণীশ্রী, মীনু বুনু, ফুল, বুড়ো, সৌরেন, মিমি (কলকাতা-২) ; বেবু, মিঠু দীপু, নীপু, তুলু, বাবা, মা, দাদা, বৌদি, মামা (কলকাতা-১৯) ; দিলীপ সমাজদার (কলকাতা-১২) ; অশোক, কাকা, জামাইবাবু, ফুটিদি, মন্টু, সন্টু, ঝন্টু, গোপাল, দিলু, রবিদা, মামীমা, খুকু, জয়শ্রী, ছোট মামা, ছোট মামীমা, দাদু, দিদিমা ও আরও ১৬ জন (নিউ দিল্লী); অমিতাভ ও অশোকনাথ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর) ; লব (ভবানীপুর)।

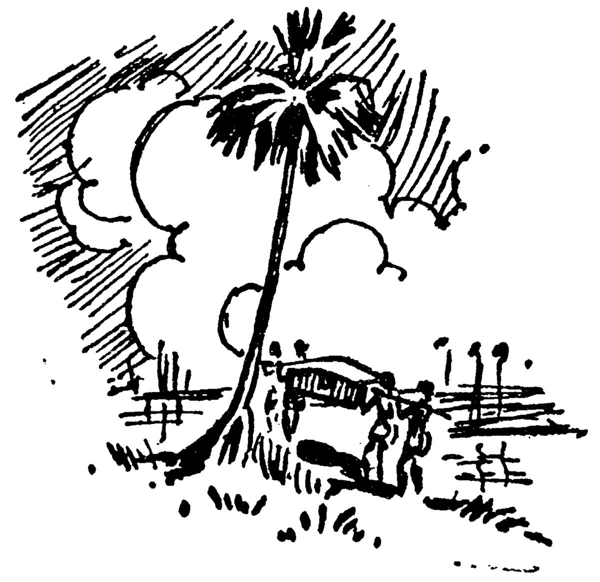

নূতন ধাঁধা
(হেঁয়ালী)

১। ঠিক পাখীও নয়, আবার মানুষও নয়—সে এক আজব প্রাণী। আবার তার মধ্যে রয়েছে এক চতুষ্পদ জন্তু। কে সে ?

২। কোন্ গাছ তার মধ্যে একটা আস্ত ঘোড়াকে আটকে রেখেছে ?

৩। কোন্ সহরে গেলে ইংরেজরা একটি লম্বা স্ত্রীলোককে দেখতে পাবে ?

৪। কোন্ দেশের জঙ্গলে পশুরাজ না থেকেও আছেন ?

দ্রষ্টব্য : পরবর্তী কয়েক মাস রামধনু মাসের শেষ দিকে প্রকাশিত হবে।

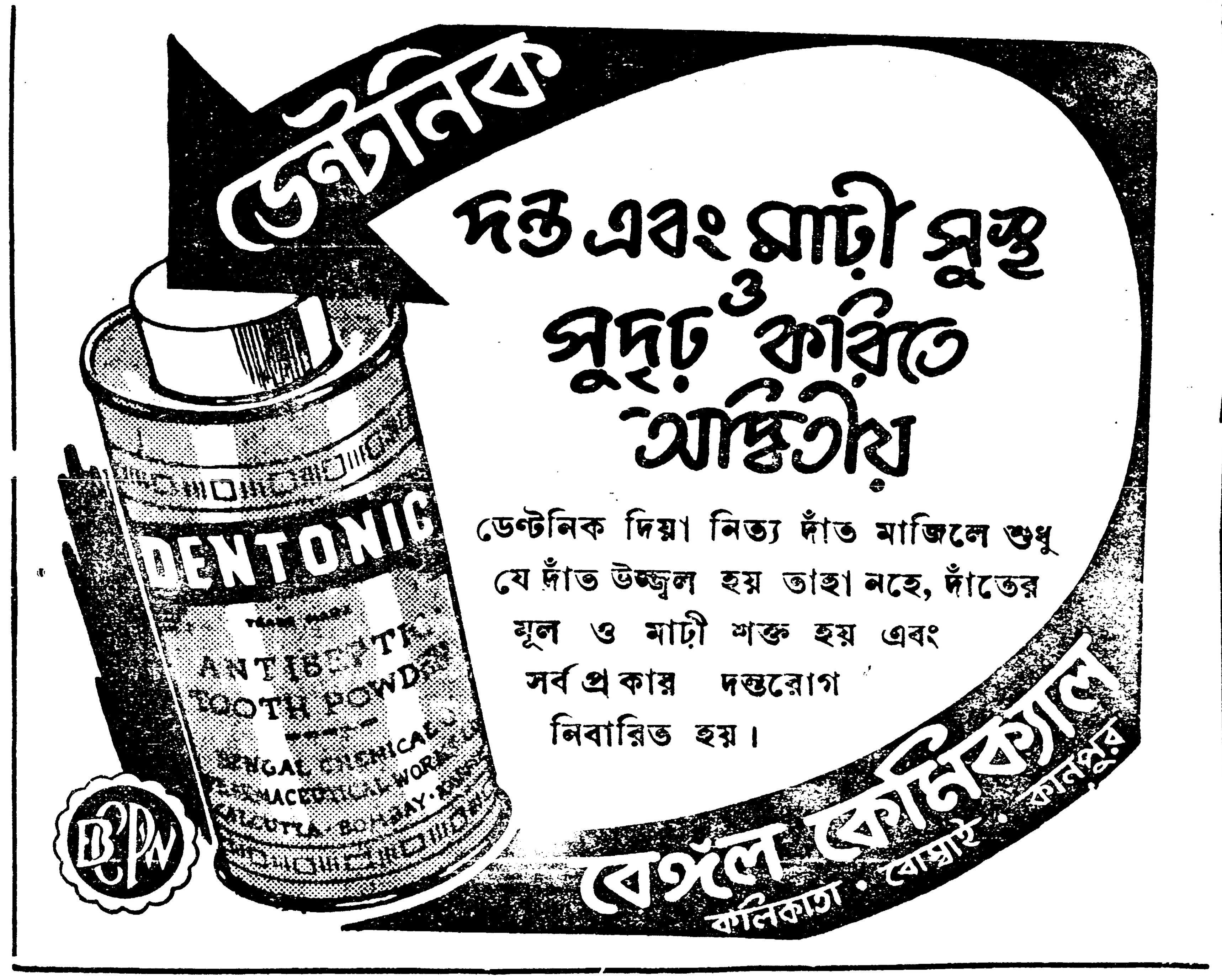

তোমাদের পড়বার মত বই

শ্রীননীগোপাল মজুমদারের লেখা

এ্যাডভেঞ্চারের গল্প

রত্নন্বেশা (৩য় সংস্করণ)

পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না—রামধনু। দাম দুই টাকা ও পাঁচসিকা

ডিটেকটিভের গল্প

বাহাদুর—দাম দুই টাকা

বিনামূল্যে গ্রাহক

শব্দ ভারতী

শ্রীননীগোপাল মজুমদার

ছোটদের অভিনব অভিধান—খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবে। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য কেবল কয়েক কপি ছাপা সম্ভব। আজ নাম লিখে গ্রাহক হও।

অভিজিৎ প্রকাশনী ' ৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅজিত কৃষ্ণ বসু-র

(অ-কৃ-ব)

খামখেয়ালী ছড়া

(ছোটদের হাসির কবিতা)

দাম—১.৫০ (দেড় টাকা)

প্রকাশ করেছেন

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৭

শ্রীচরণেষু

ফোন : ৫৫-৪০৪৬

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা—গোরাচাঁদ দাশগুপ্ত

* নতুন আদর্শ এবং পরিকল্পনা নিয়ে প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই প্রকাশিত হয়।
* নীট্ আয় দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যয়িত হয়।
* 'বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর লেখা' এবং 'বিদ্যালয়ের খবর' বিভাগ দু'টি আমাদের সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পিত।
* প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকদের রচনায় প্রতিটি সংখ্যা সুসমৃদ্ধ।

বার্ষিক (সডাক) ৩৲ ষাণ্মাসিক (সডাক) ১৷৹ প্রতি সংখ্যা ।৹

অন্যান্য বিষয়ের জন্য কর্মসচিবের সহিত পত্রালাপ করুন।

সম্পাদক

শ্রীননীগোপাল দত্ত

'শ্রীচরণেষু' কার্য্যালয়,

৪বি রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৫

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ! আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ॥৹ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১॥৹ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কার্য্যালয়

১৩১বি, রসা রোড

কলিকাতা-২৬

সম্পাদক

শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য বি.এ

লালু ভুলু খোঁড়া লালু আর অন্ধ ভুলু। রাজপথ তাদের ঠিকানা, পথচারীদের গান শোনান তাদের পেশা। সুখ-দুঃখে বেশ কাটছিল দুজনার। কিন্তু অঙ্গহানি করেই শুধু সন্তুষ্ট নয় ভাগ্য, তাই বিপদের অমোঘ কালো মেঘ গ্রাস করল দুই বন্ধুকে এক সময়ে। কিন্তু ঝড়ের পরে প্রশান্ত আকাশ—এই তো প্রকৃতির নিয়ম! আর লালু-ভুলুর জীবনেও তার ব্যতিক্রম হল না। বাণভট্টের মিষ্টি কলমের দৌলতে এই অচেনা ছেলে দুটির সঙ্গে তোমাদের ঘনিষ্ঠ সখ্য গড়ে উঠবে, তাদের হাসিতে হাসবে আর কান্নায় কাঁদবে। ॥ ২.৫০ ॥

বাণভট্ট

আমার বাংলা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

'আমার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। প্রতি ছত্রে সেই ভালবাসা দিয়ে লেখা 'আমার বাংলা', পর্বত যার প্রহরী, সমুদ্র যার পরিখা, সেই বাংলা দেশের বিচিত্র জীবনের কাহিনী আছে 'আমার বাংলায়' ॥ ২.০০ ॥

যুগের পর যুগ। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

আদিম যুগ থেকে শুরু করে আজকের যুগ পর্যন্ত মানুষের সভ্যতা আর সংস্কৃতির গল্প। এক এক যুগের কীর্তি নিয়ে এক একটি বই - অজস্র ছবিতে ভর্তি। বারোটা বই থাকবে এই গ্রন্থমালায়। প্রতিটির দাম ॥ ১.০০ ॥

কিশোর বিজ্ঞান। অভিজিৎ

যে সব বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দুনিয়াজোড়া আলোড়ন এনেছে তারই পরিচয় সহজ করে বলা। প্রথম বই : অ্যাটম বোমা ; দ্বিতীয় বই : রোগজয়ের কাহিনী। প্রতিটির দাম ০.৭২।

আষাঢ়ে দেশে : পরিমল গোস্বামী : ১.০০ ॥ অ্যাং ব্যাং : শৈল চক্রবর্তী : ০.৭৫ ॥ এবংপুরের টিকটিকি : ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় : ১ ০০ ॥ কাকলী-মুখর : আবুল কালাম শামসুদ্দীন : ২.০০ ॥ কালটু গুলটু (১ম) : ০.৭৫ : মৌমাছি : (২য়) : ১.০০ ॥ কুহকের দেশে : প্রেমেন্দ্র মিত্র ২.২৫ ॥ ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : ১.২৫ ॥ খুনী দরওয়াজা : বিক্রমাদিত্য : ১ ৫০ ॥ গল্প লেখা হল না : চারুচন্দ্র চক্রবর্তী ১.৫০ ॥ : ঘুমতি নদীর ঢেউ : আশা দেবী : ॥ ১.০০ : টুনটুনি আর ঝুনঝুনি : মৌমাছি : ২.০০ ॥ দুর্গমের ডাক : প্রবোধকুমার সান্যাল ১.৫০ ॥ দুর্গম পথের যাত্রী : ননীগোপাল চক্রবর্তী : ॥ ১.০০ ।

ছোটদের বই

দেশ-বিদেশের রূপকথা : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ॥ ২.৫০ ॥ পুঁথিপুরাণের গল্প যামিনীকান্ত সোম ২.০০ ॥ বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ : রবীন চট্টোপাধ্যায় ॥ ১.৫০ ॥ চিড়িয়াখানার গণৎকার : জগৎমোহন সেন ॥ ১ ২৫ ॥

ডাকটিকিট : অমরেন্দ্রকুমার সেন ॥ ১.২৫ ॥ যুগান্তর : মনোজ বসু ॥ ২.০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা বারো।

খবর কি!
আখর গুলি হয় না কালো,
বলে না কেউ দেখলে ভালো,
সবাই শুধু ধমক লাগায়,
করব আমি কি ?
দোয়াত কলম ছিকেয় তুলে
ভাবতে বসেছি।
খোকন মনি, খোকন মনি,
ভাবছ বসে কি ?
ইস্কুলেতে হাতের লেখায়
শূন্যি পেয়েছি
ভাবনা রাখো খোকন মনি
ভালো কালির খবর জানি,
কালির সেরা 'সুলেখা'তে
লেখাটি হয় কালো,
সেই কালিতে হাতের লেখা
লাগবে সবার ভালো॥
সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড, সুলেখা পার্ক
কলিকাতা -৩২ হইতে প্রচারিত।

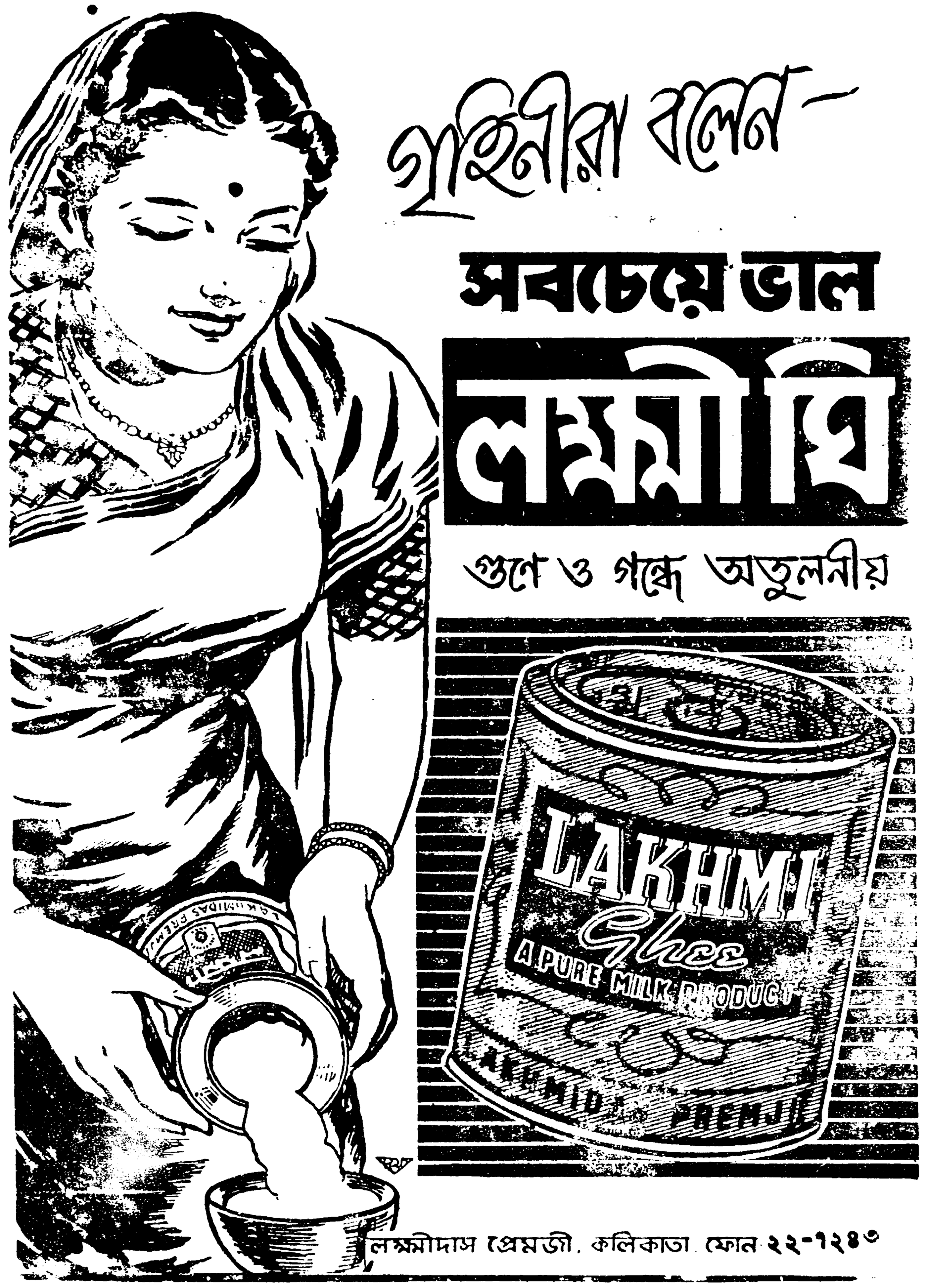
গৃহিনীরা বলেন —
সবচেয়ে ভাল
লক্ষ্মী ঘি
গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়
LAKHMI
Ghee
A PURE MILK PRODUCT
LAKHMIDAS PREMJI
লক্ষ্মীদাস প্রেমজী, কলিকাতা ফোন ২২-৭২৪৩

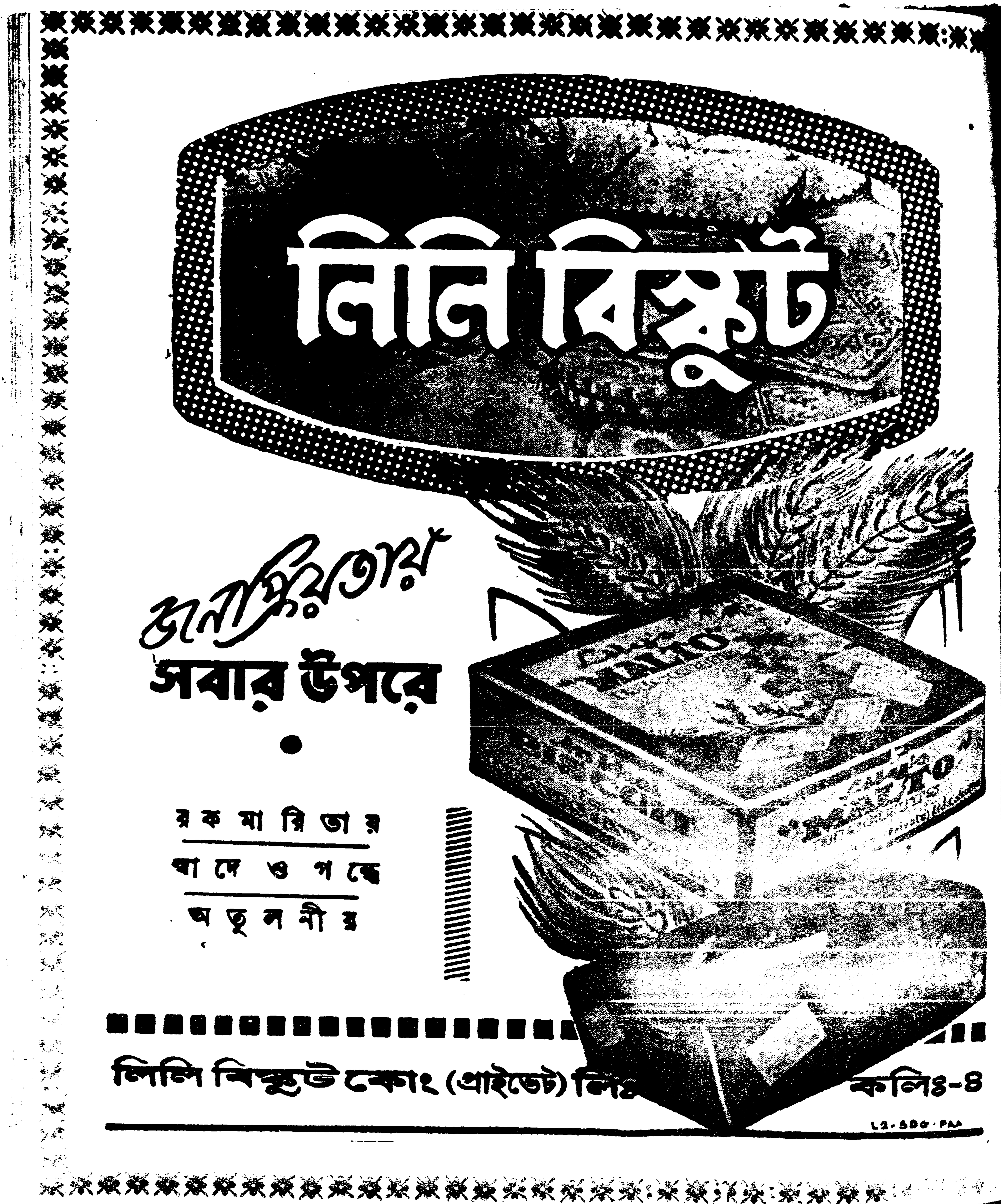
লিলি বিস্কুট
জনপ্রিয়তায়
সবার উপরে
রকমারিতায়
স্বাদে ও গন্ধে
অতুলনীয়
লিলি বিস্কুট কোং (প্রাইভেট) লিঃ কলিঃ-৪

রামধনু
বার্ষিক ৪ টাকা
ষাণ্মাসিক ২'২৫
প্রতি সংখ্যা '৩৭

স্থাপিত - ১৩৩৭ ফোন-৩৫-২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পতাকা মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

/২৷৷০, /৫, ।৮ সেরা ডাইস্ টীনে,
মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ- শ্রীঅমৃত লাল কুমার।
মিল ও অফিস - ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য সডাক ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২ টাকা ২৫ ন. প., প্রতি সংখ্যা ৩১ ন. প. ভি.পি তে নিলে আরও অতিরিক্ত ৭১ ন. প. লাগে। নমুনার জন্য ৩৯ ন.. প.র ডাকটিকেট পাঠাতে হয়। বিনামূল্যে নমুনা পাঠানো সম্ভব নয়। ভি পি.তেও নমুনা পাঠানো হয় না।

২। বৈশাখে বছর সুরু, যে কোনও মাসে চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যায়; কিন্তু পত্রিকা নিতে হবে বৈশাখ কিংবা কার্ত্তিক থেকে। তবে এতে অসুবিধা হলে মাঝের সংখ্যাগুলো খুচরা হিসাবে নিয়ে বৈশাখ বা কার্ত্তিক থেকে নিয়মিত ভাবে নেওয়া যেতে পারে।

৩। কোন মাসে পত্রিকা না পেলে ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে তাঁদের উত্তরসহ সেই মাসের মধ্যে আমাদের জানাতে হবে।

৪। পাকিস্তানের গ্রাহকেরা ব্যাঙ্ক মারফৎ (যে সব ভারতীয় ব্যাঙ্কের পাকিস্তানেও শাখা আছে) ড্রাফ্‌ট্‌এ চাঁদা পাঠাতে পারেন। এর নিয়মকানুন ব্যাঙ্কে খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। আমাদের লিখলে আমরা Proforma Invoice পাঠাতে পারি।

৫। গ্রাহকদের সব চিঠিতেই গ্রাহক নং দিতে হবে। চিঠির জবাবের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাকটিকেট দিতে হবে।

৬। লেখা, কপি রেখে, সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। সাধারণ বিভাগে যে কেউ লেখা পাঠাতে পারেন। তা ছাড়া গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখায় উৎসাহ দেবার জন্য একটি পৃথক্ বিভাগও আছে।

৭। বিজ্ঞাপনের হার চিঠি লিখলে জানানো হয়। টাকাকড়ি চিঠিপত্র প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা—
ম্যানেজার, রামধনু; ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫। (টেলিফোন: ৪৮-৩১৮১)

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনের মতামতে:
কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে?
স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,
'থিনের' মধ্যে; গুণে, স্বাদে সবার সেরা 'কোলে'

অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,
সবরকমের "কোলে-বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

ভিটামিন সমৃদ্ধ

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড, সুলেখা পার্ক
কলিকাতা-৩২ হইতে প্রচারিত।

জ্ঞাতি ভাই

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩১শ বর্ষ | পৌষ, ১৩৬৫ | ৯ম সংখ্যা

রিপু জয়

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

ষড় রিপুর একটি রিপু ক্রোধ ;
পিসে মশাই পণ করেছেন
করবেন তা রোধ
যেমন করেই পারেন।
গঙ্গা নেয়ে, পূজো করে,
চণ্ডী পাঠ বা গীতা পড়ে,
পরখ করে দেখতে চান যে
জেতেন কিংবা হারেন,
রাগ থামাতে হবেই তাঁকে
যেমন করেই পারেন।

ফি শনিবার বিকেল বেলায়
বেলুড় মঠে যাবেন,
মাংস-মুরগী কমিয়ে দিয়ে
শাক-সব্‌জি খাবেন।
ছেড়েই দিতে চেষ্টা করবেন
কাটলেট আর চপ;
রোজ সকালে ছাতে গিয়ে
নামাবলী গায়ে দিয়ে,
তুলসীর মালা হাতে নিয়ে
করবেন জপ-তপ।
নাঃ, খাবেন না আর চপ—
খাবেন না আর চপ!

ইলিশ মাছের ঝালে
ঠাকুর যদি চিনি মেশায়,
কিংবা অড়র ডালে
সরষে বাটা ফোড়ন ছাড়ে,
পিসে মশাই তাও তারে
বলবেন না কিছু;
মুচকি হাসি হেসেই যাবেন
মুখটি করে নীচু।
কারণ তিনি জানেন এটা
স্রেফ্‌ একটা ছল—
ভুলিয়ে ভালিয়ে মিথ্যে তাঁকে
চটিয়ে দেবার কল!

যত টাকাই চান পিসিমা
দেবেন তত টাকা,
হাত যদি হয় ফাঁকা?

কারো কাছে ধার চাইবেন—
কপালে যা থাকে,
"টাকা হাতে নেই" এ কথা
বলবেন নাক' তাঁকে।

চা করতে দেরী হলে
বকবেন না কা'কেও,
চিনি যদি নাও থাকে,
পিঁপড়ে যদি থাকেও।

ভাত যদি হয় ঠাণ্ডা,
আর ডাল যদি হয় আ-নুন,
রাগটি চেপে হেসে হেসে
খেয়ে যাবেন ভালবেসে,
পিসিমা সে খাবার খবর
জানুন বা'না জানুন!
ডাল যদি হয় আ-নুন!

তাতেও যদি না হয় ত'
কথকতা শুনবেন,
হঠাৎ রাগটা এসে গেলে
সাতের নামতা গুণবেন।
রাগটা তাতে হয়ে যাবে ফিকে,
কারণ তখন মনের গতি
ফিরবে গোণার দিকে।
নামতা-মুখী মনে তখন
ফিকে রাগের রং
মুছে নেবেন হাত বুলিয়ে,
মুচকি হেসে, বুক ফুলিয়ে
ফিক্‌ ফিক্‌ ফিক্‌ হেসে বলবেন—
"গুড বাই সো লং!"
ফিকে রাগের রং!

তাতেও যদি না হয় ?
একটা কিছু বোঝাপড়া
করবেন তিনি যা হয়
ধরে ক্রোধের চুলের ঝুঁটি,
থেঁতলে দিয়ে দাঁত কপাটি,
ধুম ধড়াক্কা পিলে ফাট্টা
গরম গাঁট্টা মারবেন আটটা :
ডোণ্ট্ পরোয়া তাতে যদি
ক্-ক্-ক্রোধের মাথায় ঘা হয় ;
তার পরে সে
যা হয়
আর তা হয় ।।

আজও মনে পড়ে

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

* রবীন্দ্রনাথ *

রবীন্দ্রনাথকে একটা কথা বলা হয় নি, সে দুঃখ আমার কোনোদিন যাবার নয়। সেই দুঃখের কাহিনীই বলি।

তখন ঢাকা কলিজিয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। "কথা ও কাহিনী"র সবগুলো কবিতা ছাড়াও আরো অনেক কবিতা পড়েছি ; পড়ে মুগ্ধ হয়েছি বললেও অল্পই বলা হয়। যাঁর লেখা কবিতা মনের ভেতর অমন স্বপ্নজাল বোনে, মনে হ'ত তিনিও যেন স্বপ্নলোকের মানুষ। তাঁর ছবি দেখেছি, তাঁকে চোখে দেখি নি, চোখে

দেখবার সৌভাগ্য কোনোদিন হবে তাও তখন ভাবি নি। তবু তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়েই যেন তাঁকে পেতাম ; তাঁকে মনে হ'ত পরমাত্মীয় বলে।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তারও আগে কলকাতায় দাদামশায়ের বাড়ীতে, তাঁরই মুখে শুনে শুনে। তিনি ছিলেন কবিতার পরম ভক্ত, কবিতা লিখ্‌তেও পারতেন চমৎকার, কিন্তু নিজের নামে কখনো প্রকাশ করেন নি। কবিতা পড়া ছাড়া কবিতা লেখারও প্রেরণা যে তাঁরই কাছ থেকে প্রথম পেয়েছিলাম সে কথাটা এখানে বলে রাখ্‌লে বোধ হয় কিছু অন্যায় হবে না।

মাঝে মাঝে ভোর বেলা কবিতা লেখা শেখাতেন আমার মামাদের আর মাসীদের। তিনি মন থেকে একটী লাইন বলে বল্‌তেন, "এর সঙ্গে মিলিয়ে পরের লাইনটী তৈরী করো।" পরের লাইনটি এক একজনের এক এক রকম হ'ত, এ কথা বলাই বাহুল্য।

একদিন তাঁর দেওয়া প্রথম লাইনটী ছিল ঃ

"আয় রে সাধের পায়রা আমার।"

এর সঙ্গে মিলিয়ে পরের লাইনটী বানানো হয়েছিল (কে বলেছিলেন মনে নেই)

"যতনে ছড়ায়ে রেখেছি আহার।"

আমি তখন নেহাৎ ছোট্ট ; অল্প দূরে বসে বসে শুনতাম, এগিয়ে গিয়ে কবিতা লেখার ক্লাসে যোগ দিতে ভরসা পেতাম না। তবু মামা আর মাসাদের ঐ ভাবে কবিতা বানানো শুনে শুনে মনে সাধ জাগ্‌লো আমিও ছড়া তৈরি করব। করেছিলামও। জীবনে প্রথম রচনা করেছিলাম চার লাইনের ছড়া, কাল্পনিক কোনো মালীকে লক্ষ্য করে ঃ

"আমার বাগানে ফুটেছে যে কত ফুল।
জল দেওয়া হয় নাই, হয়ে গেছে ভুল ।।
ওরে মালী, বাগানেতে রোজ জল দিস।
মনে করে ছ্যাখ্ ব্যাটা কত করে নিস ॥"

মাসে কত ক'রে মাইনে নেয় সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যথোচিত কর্ত্তব্য করবার নির্দেশ দিয়ে ফাঁকিবাজ মালীকে যে 'ব্যাটা' বলে সম্বোধন করেছিলাম, সত্যি বল্‌ছি তার পেছনে মালী জাতির প্রতি বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা, অবহেলা, তাচ্ছিল্য বা ঘৃণা ছিল না।

উক্ত লাইন চারটির কাব্যমূল্য কতখানি ছিল বা আছে জানি না, কিন্তু তবু ওরাই আমার মনে প্রথম ভরসা দিয়েছিল যে আমাদ্বারাও কবিতা লেখা অসম্ভব নয়। তাই এর পর ঢাকা কলিজিয়েট স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে যখন নোটিস এলো স্কুল ম্যাগাজিনে

আমরা, যে কোনো ছাত্র. লেখা দিতে পারি তখন ঠিক করলাম একটা কবিতা লিখে দেবো।

ভেবে স্থির করলাম কবিতা লিখ্‌ব সন্ধ্যা সম্বন্ধে। এই সিদ্ধান্তটি মাথায় এলোও এক সন্ধ্যায়। আমাদের বাড়ীর অনতিদূরের আশ্রমে তখন মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজছিল, কিছু দূরের ঝোপে-ঝাড়ে শোনা যাচ্ছিল এক ঝাঁক শেয়ালের হুক্কা-হুয়া; বাতাস বইছিল মৃদুমন্দ। ভাবলাম এই সব বর্ণনা করে বেশ গুরু-গম্ভীর একখানা কবিতা ফাঁদা যাবে। তা ছাড়া সন্ধ্যাবেলায় যে সব ফুল ফোটে তাদের ভেতর একটী হচ্ছে রজনীগন্ধা, যার নামের সঙ্গে সন্ধ্যার মিল চমৎকার। সুতরাং লিখলাম :

"ওগো সন্ধ্যা !
তব আগমনে ফুটিয়াছে কত
মালতী, রজনীগন্ধা।
বুলায়ে দিয়েছ স্নেহময় কর
কোলাহলে ভরা পৃথিবীর 'পর,
জ্বলিতেছে দীপ প্রতি ঘর ঘর,
পবন বহিছে মন্দা !" ইত্যাদি

কবিতাটির নাম দিলাম "সন্ধ্যার প্রতি।" সেটি ছাপা হলো স্কুল ম্যাগাজিনে। তখন খৃষ্টাব্দ ১৯২৫ চল্‌ছে। আমার জীবনে সেই প্রথম ছাপার হরফে প্রকাশিত রচনা।

এরই কিছু দিন পর শুনলাম রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় আসছেন কয়েকদিনের জন্য। ছাত্রমহলে হৈ হৈ শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেক হৃদয়ে যেন অসহ আনন্দ,—আশাতীত আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ আসছেন !!

এলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের কচি প্রাণগুলো উল্লসিত হয়ে উঠ্‌ল,—বিশ্বকবি এসেছেন বলে নয়, 'আমাদের' কবি এসেছেন বলে।

একদিন তিনি এলেন আমাদের স্কুলে। শিক্ষকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা সেরে তিনি আমাদের নিয়ে মেতে উঠ্‌লেন। মনে হলো অত বড় দাড়ি থাক্‌লে কি হবে, আসলে তিনি আমাদেরি মতো ছেলেমানুষ। সেদিন তাঁকে যত কাছে পেয়েছিলাম অত কাছে জীবনে আর কখনো পাই নি। তাঁর কোন্ কোন্ কবিতা আমরা পড়েছি, জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। একবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন আমরা কেউ কবিতা লিখেছি কিনা। কেউ এগিয়ে এল না জবাব দিতে। ভাবলাম, বল্‌ব, "হ্যাঁ, আমি লিখেছি।" ভাবলাম আমার "সন্ধ্যার প্রতি" কবিতাটা তো কিছু দিন আগেই বেরিয়েছে স্কুল ম্যাগাজিনে। কিন্তু কোথা থেকে সংকোচ বা জড়তা এসে বাধা দিল; কবিতা লিখেছি এবং সেই

কবিতা ছাপা হয়ে বেরিয়েছে এ কথাটা রবীন্দ্রনাথকে সেদিন বলা হলো না। তার পর আর কোনো দিনই বলার সুযোগ হয় নি।

সেদিনের প্রায় ষোল বছর পরে রবীন্দ্রনাথ পরলোকে চলে গেলেন। তার কিছু দিন পরে তাঁকে দেখেছিলাম আমার পড়ার ঘরে। যেন বসে বসে টেবিলের ওপর খাতায় কি লিখ্‌ছি। এমন সময় কবিগুরুর সেই অপরূপ সৌম্য মূর্ত্তি দেখ্‌লাম চোখের সামনে। দেহ-মন অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠ্‌ল তাঁর আবির্ভাবে।

তিনি বল্‌লেন, "একটা নতুন কবিতা মাথায় এসেছে। আমি বলে যাই, তুই লিখে নে।"

তিনি তাঁর নতুন কবিতা বলতে শুরু করলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে লিখে যেতে লাগ্‌লাম। কি চমৎকার সে কবিতা। তুলনা নেই তার। এক একটি কথা যেন এক একটি হীরের টুক্‌রো। মনে হলো রবীন্দ্রনাথ এমন অপূর্ব কবিতা কখনো লেখেন নি। এ কবিতা পৃথিবীর কবিতা-সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ্ হয়ে থাকবে।

হঠাৎ কার ডাকে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, অদৃশ্য হয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে কাগজ পেন্সিলের খোঁজ কর্‌লাম,—যদি স্বপ্নে শোনা গুরুদেবের অপূর্ব নতুন কবিতার অন্ততঃ কয়েকটা লাইনও লিখে ফেল্‌তে পারি।

কিন্তু পার্‌লাম না। একটী লাইনও আর মনে করা গেল না। কবিগুরুর একটি অনবদ্য কবিতা থেকে পৃথিবীর শ্রোতারা চিরদিনের জন্য বঞ্চিত রইল।

বহুবার চেষ্টা করেছি রবীন্দ্রনাথের মুখে স্বপ্নে-শোনা সেই কবিতার অনবদ্য লাইনগুলো মনে করতে। কিন্তু পারি নি।

বোধিসত্ত্বের গল্প

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীর রাজা ছিলেন তখন সে রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি বড় হলে তাঁর পিতামাতা তাঁর শিক্ষার জন্য তাঁকে নিয়ে তক্ষশীলা গেলেন এবং বোধিসত্ত্ব সেখানে বিদ্যাশিক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই তাঁর পিতামাতার মৃত্যু হ'ল। তিনি বড় কষ্টে পড়লেন। তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হ'ল, তিনি সংসার ছেড়ে হিমালয়ে চলে গেলেন এবং সেখানে সাধন-ভজন করতে লাগলেন।

দীর্ঘকাল পরে তিনি বারাণসীতে ফিরে এলেন এবং রাজার উদ্যানে এক কুটীরে বাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি ভিক্ষা করতে বেরোলেন এবং রাজার হাতী যে পরিচালনা করে তার বাড়ীতে এলেন। হাতীর শিক্ষকের কিন্তু, ভিক্ষুবেশী বোধিসত্ত্বকে দেখে, মনে খুব শ্রদ্ধার উদয় হ'ল। সে তাঁকে খুব যত্ন করে খাওয়াল এবং তাঁর থাকবার জন্য নিজের বাড়ীর একটা ভাল ঘর ছেড়ে দিল। তা ছাড়া সব সময়েই সে তাঁর আদেশ পালন করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এদিকে রাজবাড়ীতে যে কাঠের যোগান দিত সে একদিন কাঠ আনতে জঙ্গলে গেল কিন্তু দিনে দিনে শহরে ফিরতে পারল না, রাত হয়ে গেল। তখন সে কাছেই একটা মন্দির দেখে সেখানে গিয়ে শুয়ে রইল তার কাঠের আঁটিটা মাথার বালিশ করে।

সেই মন্দিরের কাছে একটা বড় গাছে অনেকগুলো মুরগী থাকত। সবার উঁচু ডালে যে মুরগীটা বসে ছিল, ভোরের দিকে সে নীচের মুরগীটার পিঠে নোংরা ফেলায় নীচের মুরগীটা বল্লে, "কে রে আমার পিঠে এ সব ফেলছে ?"

"কেন, আমি।"

"কেন এ সব ফেলছ ?"

"তাতে কি হয়েছে ?" এই বলে উপরের মুরগীটা ফের সুরু করল ময়লা ফেলতে। তখন দুই মুরগীতে খুব ঝগড়া বেধে গেল। দু'জনেই পরস্পরকে গালি-গালাজ করতে লাগল। শেষে একটা আর একটাকে বলল, "তোর কি ক্ষমতা আছে বল ?"

নীচের মুরগীটা বল্লে, "যদি কেউ আমাকে কেটে আগুনে ঝলসিয়ে খায় তবে রোজই সে ভোরবেলা এক হাজার মুদ্রা পাবে।"

—উপরের মুরগীটা বল্লে, "দূর দূর, এটুকুর জন্যই তোর এত জাঁক ! জানিস, আমার কি ক্ষমতা ? যদি কেউ আমাকে কেটে আমার মাংস খায় তবে সে রাজা হবে। যে উপরের চামড়া, চর্ব্বি খাবে সে স্ত্রীলোক হলে রাণী হবে, পুরুষ হলে সেনাপতি হবে আর যে আমার হাড়ের মাংস খাবে সে রাজার কোষাধ্যক্ষ হবে। আর সে যদি সাধু হয় তা হলে রাজার অতি প্রিয়পাত্র হবে।

কাঠুরে কথাগুলো শুনে ভাবল, "আমি যদি রাজাই হই তবে রোজ এক হাজার টাকার আমার কোন দরকারই নেই।" সে চুপি চুপি গাছে উঠে সবার উপরের মুরগীটাকে ধরে নীচে নামল, তারপর সেটাকে মেরে কাপড়ে লুকিয়ে বাড়ী চলল, আর নিজের মনে বলতে বলতে চল্ল —"এবার আমি রাজা হব।"

বাড়ী পৌঁছেই সে মুরগীটাকে যত্ন করে কেটে, ধুয়ে বউকে দিল্ল রাঁধতে, আর বউও খুব যত্ন করে মুরগীটা রেঁধে থালাতে সাজিয়ে ভাত আর মাংস দিল কাঠুরেকে।

কাঠুরে বউএর উপর খুব খুসী হয়ে বল্লে, "জানিস, এটা হ'ল মন্ত্রপূত মুরগী। এটার মাংস খেলে আমি হব রাজা আর তুই হবি রাণী।" এই বলে সে যত্ন করে ভাত আর মাংস পোঁটলা বেঁধে বউকে বল্লে, "চল্, গঙ্গাতীরে, সেখানে গঙ্গাস্নান করে তবে দু'জনে এই মন্ত্রপূত মাংস-ভাত খাব।"

এই বলে কাঠুরে বউকে নিয়ে গঙ্গাতীরে গিয়ে পৌঁছল। বালুচরায় খাবার রেখে তারা দু'জনে নদীতে নামল ডুব দিতে। হঠাৎ খুব হাওয়া ছুটল, নদীতে ঢেউ উঠল, আর একটা ঢেউ এসে তীরের সেই মাংস-ভাত ভাসিয়ে নিয়ে গেল। পোঁটলাটা ভাসতে ভাসতে গিয়ে যেখানে হাজির হ'ল সেখানে হাতীর শিক্ষক দাঁড়িয়ে ছিল, আর তার অনুচর হাতীকে ডলাই-মলাই করে স্নান করাচ্ছিল। হঠাৎ সেটা নজরে পড়তেই হাতীর শিক্ষক বল্লে, "দেখ ত' ওটা কি ভেসে এসেছে ?"

অনুচরটি পোঁটলা খুলে দেখে বল্লে, "প্রভু, মুরগীর মাংস আর ভাত।" তখন হাতীর শিক্ষক বল্লে, "এটা ফের বেশ করে পোঁটলা বাঁধ আর বাড়ী গিয়ে আমার স্ত্রীর কাছে দিয়ে এসো। ব'লো আমি না এলে যেন সে এটা খোলে না।"

এদিকে কাঠুরে নদীতে হাবুডুবু খেতে খেতে জলে-বালিতে পেট ভরে উপরে উঠল। উঠে দেখে, তার মাংসের পোঁটলা কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

এদিকে হাতীর পরিচালকের গুরু দিব্যদৃষ্টিতে তার ভবিষ্যৎ দেখতে পেলেন।

শিষ্য বাড়ী ফিরে এসে দেখতে পেল, তার গুরু তার অপেক্ষায় বসে আছেন। গুরুর পদবন্দনা করে সে তাঁর কাছে বসে পড়ল এবং অনুচরকে তার সেই খাদ্যের পোঁটলাটা আনতে বল্ল। পোঁটলা এলে সে গুরুর কাছে সব খাদ্য নিবেদন করল।

গুরু বল্লেন, "তোমরা সব খেতে বস, আমি মাংস ভাগ করে দিচ্ছি।" এই বলে মাংসগুলো সব তাকেই খেতে দিলেন, তার স্ত্রীকে দিলেন চামড়া ও চর্ব্বি এবং নিজে নিলেন হাড়গোড়গুলো। খাওয়া শেষ হলে তিনি বল্লেন, "আজ থেকে তৃতীয় দিনে তুমি রাজা হবে। আর এখন থেকে সব কাজই বিশেষ বুদ্ধিপূর্ব্বক যত্ন সহকারে করবে।" এই বলে গুরু বিদায় নিলেন।

তৃতীয় দিনে নিকটবর্ত্তী এক রাজ্যের রাজা বারাণসী আক্রমণ করলেন। বারাণসী-রাজ হাতীর পরিচালককে ডেকে বল্লেন, "তুমি এক কাজ করো, আমার এই পোষাক পরে হাতীতে চড়ে তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যাও।" এই বলে নিজে সাধারণ লোকের ছদ্মবেশে জনতার সঙ্গে মিশে গেলেন। কিন্তু এমনই বিধিলিপি, শত্রুপক্ষের এক তীরে সেখানেই তাঁর প্রাণবিয়োগ হ'ল।

এদিকে হাতীর পরিচালক যেই শুনল তাদের রাজার মৃত্যু হয়েছে অমনি সে কোষাগার থেকে বহু অর্থ প্রজাদের বিলিয়ে দিতে লাগল, আর রাজ্যে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিল, "যার অর্থ চাই সে এসে অর্থ আর অস্ত্র নিয়ে যাও, আর দেশের জন্য যুদ্ধ কর।"

দলে দলে লোক এসে অর্থ নিয়ে গেল, আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে তারা বিপক্ষের রাজার মাথা কেটে ফেলল। শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। বারাণসীর প্রজারা বিজয়গর্ব্বে ফিরে এল।

তখন প্রশ্ন উঠল—কে রাজা হবে?

রাজ্যের লোকেরা একবাক্যে বল্ল, "আমাদের রাজা জীবিত অবস্থায়ই এই হাতীর পরিচালককে নিজের পোষাক পরিয়ে দিয়েছেন। এই ব্যক্তি অতি সাহসী এবং বুদ্ধিমান্; এরই জন্য আমাদের শত্রুদমন সম্ভব হয়েছে। সুতরাং একেই রাজা করা উচিত।"

তখন সবার অনুমতি নিয়ে সে রাজসিংহাসনে গিয়ে বসল আর তার স্ত্রী হ'ল রাণী। বোধিসত্ত্ব তার গুরু হয়ে রইলেন। তাঁর কাছে সে সমস্ত গুপ্ত কথা বলত এবং তাঁর উপদেশ নিয়েই রাজ্য চালাতে লাগল।

১৭

খেয়ালের খেসারত দিতে হবে বই কি! আমাদের এই অভিযানের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, সাধারণ লোকে একে খেয়াল ছাড়া আর কিছুই বলবে না। অথচ সে জন্য পয়সা খরচ এবং কষ্টের সীমা নেই।

যে ঘরে এসে আমি আর দিলীপ অতিথি হলাম তাকে ঘর বললে ভুল করা হবে। অতীত কালে এটা অবশ্য পাকা ঘর ছিল কিন্তু আজ তাকে সে পর্য্যায়ে ফেলা ঠিক হবে না। বিষ্ণু-মন্দিরের পূজারী নিশু ঘোষাল মশাই তাঁর সেই দুর্ঘটনার পরেই এই ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তার পর দীর্ঘ বিশ-বাইশ বছরের মধ্যে এ ঘরে আর কোনও মানুষের প্রবেশ ঘটে নি। জরাজীর্ণ ঘরখানির সংস্কার দশ টাকার মধ্যে যতটুকু হওয়া সম্ভব তার চেষ্টা করতে অবশ্য ঘটক মশাই ত্রুটি করেন নি, তবুও এর দৈন্য ঢাকা অসম্ভব।

একটা হারিকেন লণ্ঠন, গোটা দুই চায়ের বাটি, এলুমিনিয়মের দু'-চারটে খুচরো জিনিষ কিনে আমাদের সংসারযাত্রা গুছিয়ে বসলাম। রান্নার ব্যাপারে আমার কিছুমাত্র পটুতা নেই, দিলীপ এ বিষয়ে আরও অপটু, কাজেই সেইটাই চিন্তার বিষয় হয়ে উঠলো। কিন্তু সে সমস্যারও সমাধান করলেন নীলাম্বর ঘটক মশাই। তিনি হিসেবী লোক, সুতরাং অনেক হিসেব করে জানালেন যে আমরা প্রত্যেকে যদি এক মাসের জন্য সতেরো টাকা সাত আনা হিসাবে তাঁকে দিতে পারি, তাহ'লে আমাদের নিত্যভোজের ব্যবস্থা অতিথিশালাতেই হতে পারবে। সুতরাং চৌত্রিশ টাকা চৌদ্দ আনা ব্যয়ে সব চেয়ে বড় সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেল।

বিষ্ণু-মন্দিরে গিয়ে সমস্ত দেখলাম! কারুকার্য্য ও আড়ম্বর হিসাবে শিবমন্দিরের চেয়ে এ মন্দির অনেক ছোট, কিন্তু তবু এর বর্ত্তমান জীর্ণ অবস্থাতেও এর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হয়। ইটের উপর যে অত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করা যেতে পারে সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কতকটা জোড়বাঙ্গলা ধরণের গঠন। ছাদের অনেক জায়গা জখম হয়েছে, দীর্ঘকালের মধ্যে কোনও মিস্ত্রীর হাত এতে পড়ে নি। দু'-তিনটে অশ্বত্থ গাছ বেশ বড় হয়ে মন্দিরকে বেষ্টন করেছে, সংস্কার না হলে এই বনস্পতিরাই একদিন এই পুরাকীর্ত্তিকে ভূমিসাৎ করবে।

মন্দিরের ভেতরের অবস্থা আরও ভয়ানক বড় বড় মন্দিরে যে রকম হয়ে থাকে, অর্থাৎ একটি মাত্র দরজা ছাড়া আলো বাতাস যাওয়ার আর কোনও পথ নেই, এ মন্দিরেরও তাই। ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। টর্চ্চ জ্বালিয়ে দেখলাম ভেতরের অবস্থা। শেয়াল, কুকুর বা অন্য হিংস্র জীব এখানে বাস স্থাপন করেছে কিনা জানি না, কিন্তু আবর্জ্জনায় ভরা! আমাদের টর্চ্চের আলোতে একঝাঁক চামচিকে ঝটপট করে উঠলো।

মূর্ত্তি যেখানে ছিল সে বেদীটা পাথরের, সুতরাং নষ্ট হয় নি। শূন্য মন্দিরের ভেতর দাঁড়িয়ে আমাদের বুকের ভেতর গুর গুর করে উঠলো। অথচ প্রাতিদিন স্নান

করে, সাত গণ্ডুষ জল খেয়ে, নিত্যপূজার অর্ঘ্য দেবার অছিলা করে যেতে হবে আমাদের। জানি না কি উদ্দেশ্য সাধিত হবে তা'তে।

আমাদের অধমতারণ ঘটক মশায়ের শরণাপন্ন হতে হোল আবার। পাঁচসিকে এবং ছ'পয়সা জলখাবার ও দু' পয়সার বিড়ি—মোট এক টাকা ছয় আনা দিয়ে একটি মজুর লাগিয়ে মন্দিরের ভেতরটা পরিষ্কার করিয়ে দিলেন তিনি। ব্যস্, এইবার আমাদের স্বপ্নলব্ধ অম্লশূলের চিকিৎসা পর্ব্ব সুরু করতে হবে।

আমাদের এই অভিযানের একটা বিস্তৃত বিবরণী লিখে পাঠালাম ডক্টর রামশাস্ত্রীর কাছে। যদি তিনি কলকাতায় ফিরে এসে থাকেন তাহ'লে একবার এখানে যেন অতি অবশ্য আসেন এ কথাও জানিয়ে দিলাম চিঠিতে।

দিলীপের সঙ্গে বসে ব্যাপারটার আগাগোড়া আলোচনা করলাম। আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা স্থির করতে হবে। আমরা বেরিয়েছি তারই খোঁজে তেরো শো বছর পূর্ব্বে অনন্তবর্ম্মা যে বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারাজ হর্ষের সময়ে; এবং, ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে যতটুকু জানা গিয়েছে, তা'তে পালবংশের শেষ সময়ে যে মূর্ত্তি সাগরদীঘির জল থেকে তোলবার সময় ভাঙ্গা অবস্থায় পাওয়া যায় এবং অনন্তবর্ম্মার বংশধরেরা যা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তার পর ইতিহাসের সূত্র গেছে হারিয়ে। আমাদের অনুসন্ধান পর্ব্বের প্রথম প্রশ্ন হোল, সেই মূর্ত্তি এখন কোথায়? বামুনগাছির মন্দিরে পা ভাঙ্গা বিষ্ণুমূর্ত্তির সন্ধান দিয়েছেন কানাইদাস বাবাজী। যে মূর্ত্তি আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি সেই মূর্ত্তি আর এই মূর্ত্তি এক কিনা? এখানকার মূর্ত্তিও তো লুঠ হয়ে গিয়েছে বিশ-বাইশ বছর আগে, কাজেই সে মূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া যাবে কোথায়? তা ছাড়া সন্ধান নিতে হবে সে মূর্ত্তি কতদিন আগে কি সূত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যে রাজা এই মন্দিরে সেই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি কি নূতন মূর্ত্তি তৈরি করিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন না কোনও পুরোনো মূর্ত্তি পেয়েছিলেন? নূতন মূর্ত্তি যদি তিনি তৈরি করিয়ে থাকেন, তাহ'লে কানাইদাস বর্ণিত ভাঙ্গা পা কি করে হোল? চোখের ঝিনুক এবং নীলা—অবশ্য পরবর্ত্তী যুগে কেউ মূর্ত্তিতে বসিয়ে থাকবেন তাতে আর সন্দেহ নেই।

ব্যাপারটার আলোচনা যতই করা গেল, ততই যেন বেশী গোলমাল হয়ে যেতে লাগলো।

রাত্রের আহার পর্ব্ব সেরে এসেছিলাম, কাজেই শুয়ে পড়লাম আমাদের রাজশয্যায়। পাঁচসিকে দিয়ে একখানা মাদুর কিনে এনেছিলাম, ঘটক মশাইয়ের কৃপায় দু'টো থলির ভেতরে কুচো বিচালি বোঝাই করে দুটো বালিশও তৈরি করানো হয়েছিল।

রামশাস্ত্রী বলেছিলেন, সাধনা না হলে কি সিদ্ধি হয়? সুতরাং সাধনা করে যেতে হবে।

এটা বর্ষাকাল নয়, বৃষ্টিরও সময় নয়। তবু আমাদের রাজশয্যায় শুয়ে আকাশের গর্জ্জন শুনে আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। দরজাটা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলাম একেবারে নিবিড় অন্ধকার, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই কড় কড় করে মেঘের ভয়াবহ গর্জ্জন।

আমাদের এই একান্ত নিবাসটির কাছাকাছি কোনও লোকালয় নেই। শিবমন্দির এবং তার সংলগ্ন অতিথিশালায় তবু লোকের আনাগোনা থাকে, কিন্তু এ দিক্‌টা একেবারেই নির্জ্জন। দু'টো মন্দিরের মাঝখানে যে আমবাগান, সেটাকে এখন বাগান বললে ভুল করা হবে, আধ মাইল-ব্যাপী একটা দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে পুরাকালের কতকগুলি আমগাছ দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। হয়তো যে মহারাজ শিব এবং বিষ্ণু-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনিই রোপণ করেছিলেন এই সব বৃক্ষ।

বর্ষণ যখন সুরু হোল তখন আমাদের বিপত্তিও সুরু হোল। সেই ভাঙ্গা ঘরের ছাদের বহু স্থান দিয়ে জলধারা পড়তে লাগলো, তার ফলে আমাদের মাদুর এবং খড়ের বালিশ এবং আমার ও দিলীপের সুটকেস এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ক্রমাগত স্থানান্তরিত করতে হোল। সরীসৃপ জাতীয় আগন্তুকদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা দু'জনে দু'গাছা লাঠি সংগ্রহ করেছিলাম। অবশেষে দেওয়ালের একটা ফাটলের মধ্যে একটা লাঠি চালিয়ে দিয়ে আর একটা লাঠিকে তার অবলম্বন করে আমাদের সেই পাঁচসিকের মাদুর তারই উপর বিছিয়ে একটা তাঁবুর মত করা গেল এবং তারই মধ্যে গুড়ি মেরে বসে রইলাম দু'জন—আমি আর দিলীপ।

বাইরে মেঘের গর্জ্জন তখনও থামে নি, বৃষ্টির ধারাও নেমেছে বেশ জোরে।

ঠিক এই সময়ে শোনা গেল দরজায় দুম দুম আওয়াজ।

(ক্রমশঃ)

জয়সমন্দ

শ্রীশামুক

পশ্চিমের শেষ আলোর দিকে চেয়ে ছিলাম, কর্কশ শব্দ করে বাস্ থেমে গেল। কন্ডাক্টার বললে—ঐ হ'ল জয়সমন্দ।

বাসের পিছনে দৌড়ে ধূলির ঘূর্ণি অদৃশ্য হয়ে যেতে খেয়াল হ'ল মানুষের চিহ্ন নেই, কোন আওয়াজ নেই—একটা কুকুরও ডেকে উঠলো না। মন চুপি চুপি বলে—জিদের বাজি না রাখলে হ'ত—হঠকারিতার ফল ভুগতে হতে পারে।

কিন্তু আঙুল দিয়ে যে দেখালে ও তা এক বিরাট পাঁচীল, পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু দুর্গ-প্রাকারের মত। জল কই? ভারতের সবচেয়ে বড় হ্রদ জয়সমুদ্র কোথায়—যাকে মেওয়াড়ী ভাষায় বলে জয়সমন্দ? ঘাড় উঁচিয়ে আকাশের দিকে ঘুরিয়ে দূরে পাহাড়ের চূড়ো দেখি। তাহ'লে ঐ পাঁচীল নিশ্চয়ই বাঁধ, বুক দিয়ে জল আটকে রেখেছে।

আর দাঁড়িয়ে ভাবার সময় নেই, এখুনি অন্ধকার কালি ঢেলে সমস্ত নিশ্চিহ্ন করে দেবে—তার আগে বাজির প্রথম সর্ত সেরে ফেলা চাই। পাঁচীল ঘেঁষে সিঁড়ি দিয়ে আধখানা উঠেও দিগন্তের সীমানার মধ্যে কোন জনবসতি দেখতে পেলাম না। উঁচু-নীচু প্রান্তরে বাবলা গাছ ও কাঁটার ঝোপ নিজেদের চারপাশে অন্ধকার জড়ো করছে, আর আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারছে একটি দু'টি তারা। বাকি সিঁড়ি লাফিয়ে উঠে চোখে যা পড়লো তা একেবারে স্তম্ভিত করে দিল।

দু'পাশ থেকে নাকের মত এগিয়ে এসেছে উঁচু পাহাড়ের ফালি—থিয়েটারের সিনের মত। কাচের মত পরিষ্কার গভীর নীল জলকে কেটে কেটে ভাগ করে দিয়েছে। সে জলের শেষ নেই - সীমা নেই। ওদিকের সবুজ রেখা দেখা যায় না। কয়েকটা ছোটবড় দ্বীপ গাছপালার সাজ-পোষাক পরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, যেন ইসারা পেলেই নানা ভংগীতে অভিনয় সুরু করবে—ওরাই নাটকের বীরের দল যেন! অদ্ভুত দৃশ্য—অদ্ভুত! চোখ ফেরানো যায় না, নিজেকে একলা মনে হয় না, নিজেকে আলাদা মানুষ বলে আর মনে থাকে না—একেবারে মিশে গেলাম ওদের মধ্যে।

আস্তে আস্তে চোখের সামনে ফুটে ওঠে তীরে বাঁধা নৌকা একটু একটু দুলছে। মনে পড়ে যায় বাজির কথা। ওপারে এখুনি গিয়ে লাল নিশানটা গাছে বেঁধে আসতে হবে ও তার পরে রাত কাটাতে হবে ঐ নৌকাতেই—হ্রদের নিঝুম বুকে—সকালে যতক্ষণ না ওরা এসে পৌঁছায়।

দাঁড়ের ছপ্ ছপ্ আওয়াজে নিজেই চমকে উঠি। এমনি নিস্তব্ধ চারিধার! পৌষের শীত, তাই পাখীরাও তাড়াতাড়ি ডানা গুটিয়ে শুয়ে পড়েছে। মনে হ'ল কয়েকটা যে তারা দেখা যাচ্ছিল তাদের ফিস্ ফিস্ কথা যেন শুনতে পেলাম।

ওপারে নিমগাছের ডালের ওপর নিশান বাঁধছি—প্রথম শব্দ শুনলাম। কে কাসলো? মানুষ না জন্তু বোঝা গেল না। নেমে এসে নৌকার কাছে দাঁড়িয়েছি, আবার একবার—আরো দূর থেকে। বলে নেকড়ে বাঘ কাসির মত আওয়াজ করে—তাই নাকি?

যাই হোক, তীরের কাছাকাছি থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কেউ লাফিয়ে উঠলে, তখন? দাঁড় ফেলে এগিয়ে চলি। এতক্ষণে ঘন আঁধার সমস্ত আলোটুকু চুষে খেয়ে ফেলেছে। চারিদিকে শুধু কালোয় কালো—কোথাও গাঢ় আর কোথাও অল্প ফিকে, এই যা। মেঘে ঢাকা আকাশও হ্রদের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে জমাট হয়ে আছে।

আলগোছা ভেসে চলতে মন্দ লাগছিল না। হঠাৎ বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে ওঠে। পরে নিজেরই অবিশ্বাসের হাসি। না, চোখের ভুল, ছোট দ্বীপ হবে—মনে হচ্ছে ভেসে চলেছে। নিজে ভাসছি কিনা, তাই ওরকম মনে হ'ল। রেলগাড়ীতে বসে যেমন গাছপালাকে ছুটতে দেখা।

সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে ওঠে। গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। দ্বীপ নয়—আর এক খানা নৌকা—আর দু'জন—হ্যাঁ, দু'জন মানুষ! ওদের একজনকে মানুষ বলা চলে কি? দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অমন বেঢপ বাড়াবাড়ি তো সম্ভব নয়! তবে কি?

প্রথমে প্রাণ বাঁচানো, পরে অন্য হিসেব। মোড় ফিরিয়ে উলটো দিকে যত জোরে সম্ভব চালাই। একটা দ্বীপের আড়াল দিয়ে পাহাড়ের গলির মধ্যে ঢুকে পড়ি। কিন্তু স্থির থাকবার জো কোথায়? ঘন আঁধারে সামনে, পাশে যে কোন দিকে দেখলেই মনে হয়—ঐ ঐ সেই—ভূতুড়ে বা হাতুড়ে যাই হোক! কিন্তু এই নির্বান্দা পুরীতে ওরা কে ও কেন?

এবারে সত্যি মনে হয় এমন পাগলামির বাজি রেখে বোকামি হয়েছে। কয়েক জন বন্ধু মিলে রাজস্থানে ঘুরতে ঘুরতে চিতোরগড়ের পথে উদয়পুরে এসে পৌঁছেছি চারদিন হ'ল। ফতে-মেমোরিয়ালে আড্ডা গেড়ে হৈ-হল্লা করে দেখা হ'ল পিচোলা হ্রদ, স্বরূপ সাগর, ফতে সাগর—দূরের উদয় সাগরও। আবার জলে ও স্থলে সবগুলো প্রাসাদই—সজ্জন গড় পর্যন্ত। পরশু রাতে সহেলিয়া-বাড়ীর বাগানে তর্ক উঠলো সাহস বেশী কার। প্রমোদ আগে একবার এদিকে এসেছিল বাবা-মার সঙ্গে। বললে, —জয়সমন্দের বুকের ওপর রাত যে কাটাবে পৃথিবীতে সে পয়লা নম্বর।

আগে কখনো দেখি নি, তাই এই বিরাট সৃষ্টির আন্দাজ ছিল না। লাফিয়ে ওদের সব সর্ত মেনে নিলাম। আগের দিন বাসে বত্রিশ মাইল একলা এসে নামতে হবে, তার পর নৌকা নিয়ে ওপারে লাল নিশান বেঁধে জলে রাত কাটাতে হবে—ওরা সকালের বাসে যতক্ষণ না আসে। শীত হলেও কম্বল সঙ্গে থাকবে না; কোন খাবার নয়, টর্চও নয়। আরামে যাতে ঘুমিয়ে না পড়ি তাই এ সব ব্যবস্থা।

কিন্তু আর একখানা নৌকা যে থাকতে পারে ও তা'তে করে অন্য লোকেরা পিছু ধাওয়া করতে পারে—সে কথা তো মনে আসে নি! আর ঐ একজনও মানুষ কি গরিলা স্পষ্ট বোঝা যায় না এই জমাট অন্ধকারে। ঐ বিপুল শরীরে একবার জাপটে ধরলেই, ব্যস্, খেল খতম, জয়সমন্দের তলায় হজম।

ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, অন্য নৌকাটা হুড়মুড় করে এগিয়ে আসে। প্রাণপণে পালাই কিন্তু ঐ নৌকাও পিছনে ফিরে উলটো দিকে জোরে চালায় কেন? বুঝেছি, ঐদিক্ থেকে ঘুরে সামনে এসে ধরবে। আমি পাশ ফিরে বড় দ্বীপের ঝুলে-পড়া গাছের আড়ালে গা ঢাকা দেবার চেষ্টায় চলি।

এই চললো সারা রাত—এই লুকোচুরি খেলা। না—খেলা কোথায়? গরিলার সঙ্গে 'গেরিলা' লড়াই। ও চায় ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি চেপে ধরতে, আর আমি গলাটি সামলে উর্দ্ধশ্বাসে এদিক্ ওদিক্ করি। সারা শরীর টনটন্ করে, বুকে হাঁফ ধরে, কিন্তু যেই একটু দাঁড় ছেড়ে জলে ভাসছি—ঐ ঐ এল আবার—আবার দাঁড় মুঠো করে—হেঁইও। মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে বেঁচে থাকার এই আপ্রাণ চেষ্টায় সময়ের জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

ঘুম যেন সিঁদেল চোর, কি করে কোথা দিয়ে শরীরে ঢুকে পড়ে তার ঠিকানা নেই! ঐ ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যে কখন মাথাটা ঝুলে পড়েছে আর দাঁড়টা যে কি করে কাঁধের ওপর সঙ্গীনের মত ধরেছিলাম তা ভগবান্ই জানেন। হঠাৎ ভূমিকম্পের ধাক্কার মত উপুড় হয়ে পড়লাম দাঁড় সমেত।

চোখ খুলে দেখি ঐ নৌকার সঙ্গে কলিশন্ হয়েছে, গরিলা ও তার বাচ্চা ভীষণ চীৎকার করতে করতে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল—আর পূবদিকে সোনার ছড়ির আভাস এসে পৌঁছেছে।

জলে পড়ে কেউ সাহায্য চাইলে দিতেই হয়, তা সে শত্রু হলেও। ওদের নৌকায় লাফিয়ে পড়ে হাতে ধরে ধরে তুলি। একে মোটা মানুষ, তার ওপর কোট, ওভারকোট ও পাগড়ি জড়ালে ভয়ংকর দেখায় বৈ কি! আর অন্যটি সত্যি ওরই ছেলে।

বাপের এ্যাড্ভেঞ্চারের নেশা ছেলেতেও বর্তেছে। আমার আসার কথা ওরা স্বপ্নেও ভাবে নি। আর আমি যেমন ওদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম, ওরাও তেমনি আমার ভয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে সারা রাত। শেষে ওরাও একটু ঝিমুচ্ছিল, হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে জেগে দেখে আমি বন্দুকের (!) তাগ্ করছি।

বেচারারা রাত্রের খাবার, চায়ের সরঞ্জাম সঙ্গে এনেছিল কিন্তু আমার জন্যে সমস্ত মাটি। তার পর গোদের ওপর বিষফোঁড়া—এই ভোরের দারুণ শীতে জলে চোবানি। সঙ্গে অন্য জামা-কাপড় ছিল তাই রক্ষা।

আমি মাপ চাইলাম, আবার ওরাও মাপ চাইল। আমি বেশী করে চাইলাম কারণ ওদের ভোগ হয়েছে বেশী। নৌকার পেটের ভেতর ষ্টোভে জল চড়িয়ে খাবারগুলোর সদ্ব্যবহার করছি আর বাঁধের ওপাশের পাঁচালের ওপর এক একটি করে আমার চেনা মুখ ভেসে উঠতে লাগল। ওদের সকলের মুখ-ভংগী দেখবার মত হয়েছিল বৈকি!

পশ্চিম দিগন্তে

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

বেলা প্রায় দু'টোর সময় এসে নামলাম দ্বারকায়।

ষ্টেশনের কাছেই এক বাঙালী ধর্মশালা আছে, কিন্তু সেখান থেকে মন্দির ও সহর মাইল খানেকেরও বেশী। আমরা সেখানে না উঠে চলে গেলাম নগরের মধ্যে এক ধর্মশালায়। দোতলার উপর ভালো ঘর পাওয়া গেল।

দ্বারকায় কল নেই, সবই কূয়া। কূয়ার জলে স্নান সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কিছু খাওয়া তখন একান্ত প্রয়োজন।

সামনেই পথের চৌমাথা। হোটেল, দোকান অনেক। আমরা একটি হোটেলে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু আমাদের আর সেখানে বসতে হলো না। মালিক বললো—এখানে তো এখন কোন খানা মিলবে না। বেলা বারোটা-সাড়ে-বারোটার পর থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এখানকার কোন হোটেলেই খানা মিলবে না। মিঠাই আর চা খেয়ে 'নাস্তা' করে নিন্।

কথাটা বিশ্বাস করতে পারলাম না। পশ্চিমের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র দ্বারকা। দূর থেকে প্রথম যে যাত্রীবাহী ট্রেন এখানে পৌঁছায় সেই গাড়ীতেই আমরা এসেছি। কত যাত্রী এই ট্রেনে প্রতিদিন আসে, তারা এসে তাহ'লে কি কিছুই খায় না? আমরা আরো দু'-একটি হোটেলে খোঁজ নিলাম, সব মালিকের মুখেই সেই এক কথা। পথের মোড়ে ঠেলাগাড়ীতে কলা ও কমলালেবু বিক্রী হচ্ছিল, তারই সঙ্গে চানাচুর আর পেঁড়া যোগ করে জলযোগ শেষ করলাম। তার পরেই টাংগা ধরে বেরিয়ে পড়লাম নগর দেখতে।

দ্বারকা পুরানো সহর। ঠিক কতদিনের যে পুরানো তা বলা কঠিন। মহাভারতের সভাপর্বে যুধিষ্ঠির বলছেন 'কুশস্থলী' পুরানো নগর। রেবত নামে এক রাজা এই নগরটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে সেখানে শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশের রাজধানী করেন। যদুবংশ আগে ছিল মথুরায়। মথুরার রাজা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মামা কংস। কংস শ্রীকৃষ্ণের সাতটি ভাইকে হত্যা করেন। শ্রীকৃষ্ণকেও হত্যা করার জন্য তিনি রাজসভায় এক মল্লযুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন, আর মল্লদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন সুবিধা পেলেই শ্রীকৃষ্ণকে যেন তারা বধ করে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে সেই সভার মাঝে শ্রীকৃষ্ণের হাতে কংসই নিহত হলেন! রাজা হলেন শ্রীকৃষ্ণের বাবা বসুদেব। কংসের অত্যাচার থেকে রেহাই পেয়ে মথুরার লোকেরা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কিন্তু ব্যাপারটা অতো সহজেই মিটলো না। কংসের বিয়ে হয়েছিল মগধের প্রতাপশালী রাজা জরাসন্ধের কন্যার সঙ্গে। জরাসন্ধ তখনই মথুরা আক্রমণ করলেন। পর পর তেরো বার জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে শান্তিতে মথুরায় রাজত্ব করা চলবে না। তখন তিনি একেবারে মধ্যভারতের মরুভূমি পার হয়ে চলে গেলেন কুশস্থলীতে, সেখানে যদুকুলের নতুন রাজধানী তৈরী হলো দ্বারাবতী।

অবশ্য সেই পুরানো দ্বারাবতার কোন চিহ্ন এখন নেই, তবে পশ্চিমের আর আর পুরানো সহরের যে রূপ এরও তাই,—পুরানো বাড়ী ও পুরানো ধূলো, জলাভাব ও

মাছি। অবশ্য এগুলি স্বীকার করে নিয়েই তীর্থভ্রমণে বেরুতে হয়, কিন্তু এখানে আরেকটা অসুবিধাও চোখে পড়লো। কোথাও হিন্দি বা ইংরাজীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই, দোকানের সাইনবোর্ড থেকে যেখানে যা কিছু লেখা সবই গুজরাটী ভাষায়। তার ফলে আমাদের একটি মুস্কিল হয়েছিল। অধিকাংশ হোটেলই বাড়ীর মধ্যে, কিন্তু কোন্ সাইনবোর্ডে যে হোটেল বলে লেখা আছে, তা আমরা ধরতে পারি না। রাত্রে সেই জন্য অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল।

আমরা প্রথমে গেলাম রুক্মিণী-মন্দিরে। দিগন্তবিস্তারী রুক্ষ মাঠের মাঝে প্রাচীন মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের মন্দির। একদা এর গায়ে নানা কারুশিল্পের মাধুর্য্য ছিল, সমুদ্রের নোনা হাওয়া ধীরে ধীরে তাকে ক্ষয় করেছে। এখনও যেটুকু আছে তা তার অতীত মাধুর্য্যের সাক্ষ্য মাত্র।

মন্দির থেকে আর কিছু গেলেই প্রকাণ্ড সিমেন্টের কারখানা আর কর্মচারীদের কোয়ার্টার্স। এটি বিড়লাদের। এই অঞ্চলে সিমেন্ট তৈরীর খরচ কম পড়ে। অনেকখানি জায়গা যুড়ে এই কারখানা। অনেক লোক এখানে কাজ করে। অনেক লোকের দু' মুঠো অন্নের সংস্থান হয়েছে সত্যি, কিন্তু তীর্থস্থানের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়েছে। অবশ্য আজকাল ভারতের অনেক পুরানো নগরের পাশেই নতুন নগর তৈরী করার একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে। এতে পুরানো নগরের আভিজাত্য ম্লান হয়ে যায়, কিন্তু কলিযুগের কৌলিন্য বাড়ে। তার উপর কল-কারখানার আনুষঙ্গিক তাড়িখানা ও জুয়ার আড্ডা যখন জমে ওঠে তখন আমাদের সভ্যতা সম্পূর্ণ হয়। জানি না এই সিমেন্টের কারখানায় এই দু'টি জিনিষ এখন গিয়ে পৌঁছেছে কিনা।

কলকাতার মানুষ আমরা, কারখানার কেন্দ্রেই আমরা বাস করি। কারখানা দেখার ব্যাপারে আমাদের মোটেই কৌতূহল ছিল না। আমরা ভিন্ন পথ দিয়ে এলাম রামচন্দ্র-মন্দিরে। অনেকগুলি পুরানো মন্দির পাশাপাশি,—রামচন্দ্রের মন্দির, শিবমন্দির প্রভৃতি। পাণ্ডারা সুবিধা মত মন্দির ও তার প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে মনের মত কাহিনী বলে যায়। তার সঙ্গে পৌরাণিক কোন উপাখ্যানের কোন যোগ নেই, আর ইতিহাসের কথা তো ওঠেই না। তা তারা যে কথাই বলুক, মন্দিরগুলি সাধারণ, এবং তিন-চার শতকের বেশী পুরানো হবে না। দেব-বিগ্রহ আরো পুরানো হতে পারে, নতুন মন্দির হয়তো পরে তৈরী হয়েছে।

সেখান থেকে বরাবর চলে এলাম গোমতী-ঘাটে।

পশ্চিমের বালি-বহুল নদী গোমতী। সংকীর্ণ ও অগভীর। দু' পাশে অনেক দূর অবধি বালির চর। অনেকখানি বিস্তৃত উঁচু পাথর বাঁধানো ঘাট। ঘাটের শেষ

প্রান্ত এসে পড়েছে সাগরসংগম অবধি। গোমতী এখানে সাগরে এসে পড়েছে। সাগরের মুখেই ঘাটের শেষ প্রান্তে একটি মন্দিরের ভগ্নশেষ। মন্দিরে বিগ্রহ নেই, ঔজ্জ্বল্যও নেই। সামনেই সাগর।

পশ্চিম সাগর শান্ত, টলমল করছে। পূর্ব সাগরের মত ঢেউ নেই, দক্ষিণ সাগরের মত ঝড়ো হাওয়াও বয় না। ছোট ছোট ঢেউগুলি একটা শাদা ফেনার রেখা টেনে দিয়ে চলেছে বালির উপর দিয়ে। সূর্য্য তখন অস্তগামী। নীল জল যেখানে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে সেখান ফিকে মেঘালি আমেজ। সেই মেঘের পিছনে অস্ফুট সূর্য্য নীল আকাশ আর নীল জলের উপর আলোর ঝলক ফেলেছে। পাতলা মেঘের গা গড়িয়ে শেষ সূর্য্যের রক্তিমাভা জলের এখানে সেখানে পড়ে লাল-নীলের লুকোচুরি খেলায় মেতে উঠেছে। মেঘের পাশ দিয়ে গোলাকার সূর্য্য সকল দীপ্তি সম্বরণ করে নিয়ে শান্ত ভাবে ডুবে যাচ্ছে। তটভূমির পিছন থেকে সবটুকু অন্ধকার ঠেলে পিছিয়ে দিতে চাইছে সূর্য্যকে দিগন্তের বাইরে।

সূর্য্য অস্ত গেল। আমরা ক'জন ছাড়া সমগ্র তটভূমি জনহীন। অন্ধকার ধীরে ধীরে আমাদের চারিপাশ ঢেকে দিল। নীল জল কালো হয়ে গেল। পিছনের বৃক্ষ-বিরল ধূসর প্রান্তর মিশে গেল সেই সাগরের বুকে। শুধু দু'য়ের মাঝে শাদা ফেনার একটা সীমা-রেখা ছাড়া আর কিছু রইল না।

আমরা ফিরলাম। গোমতীর বাঁধানো ঘাটের প্রান্ত দিয়ে এগিয়ে চললাম। ঘাটের পাশ দিয়ে ছোট ছোট বাড়ী সুরু হলো। কিছু দূর গিয়েই আমরা এসে পড়লাম মন্দিরের সামনে। ঘাট থেকে বরাবর সিঁড়ি উঠে গেছে দু' পাশের বাড়ীকে ছাড়িয়ে। সিঁড়ির দু' পাশে ছোট ছোট দোকান,—পট, তুলসীর মালা প্রভৃতি বিক্রী হয়। তারপর মন্দির-তোরণ। মন্দিরটি পাঁচতলা। চূড়াটি ১৭০ ফুট উঁচু। ৬০টি থামের উপর বিরাট নাটমণ্ডপ। প্রবাদ আছে যে এই মন্দিরটি নাকি বিশ্বকর্মা এক রাত্রির মধ্যে নির্মাণ করেছিলেন।

মন্দিরের মধ্যে তেমন ভীড় নেই। দর্শনার্থীদের চেয়ে পাণ্ডাদের ভীড়ই যেন বেশী বলে মনে হলো। নাটমণ্ডপের এক পাশে দু'-তিন জন ফুলওয়ালী বসে। ফুলতুলসীর এক একগাছি মালার মূল্য তিন আনা। আমরা মালা নিয়ে মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করলাম।

কালো পাথরের মূরলীধর কৃষ্ণমূর্ত্তি। সন্ধ্যার শৃঙ্গার বেশ। বংকিম সুঠাম কমনীয় মূর্ত্তি! স্মিত হাস্যময় এই মুখখানি ভাবব্যাকুল ভক্তের অন্তর অশ্রুভারাক্রান্ত করে তোলে।

চিনতে পার?—নীচে কতকগুলি বিভিন্ন ধরণের ছবি দেওয়া হ'ল। কোন্‌টি কিসের ছবি বলতে হবে। না পারলে ৪৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

১

২

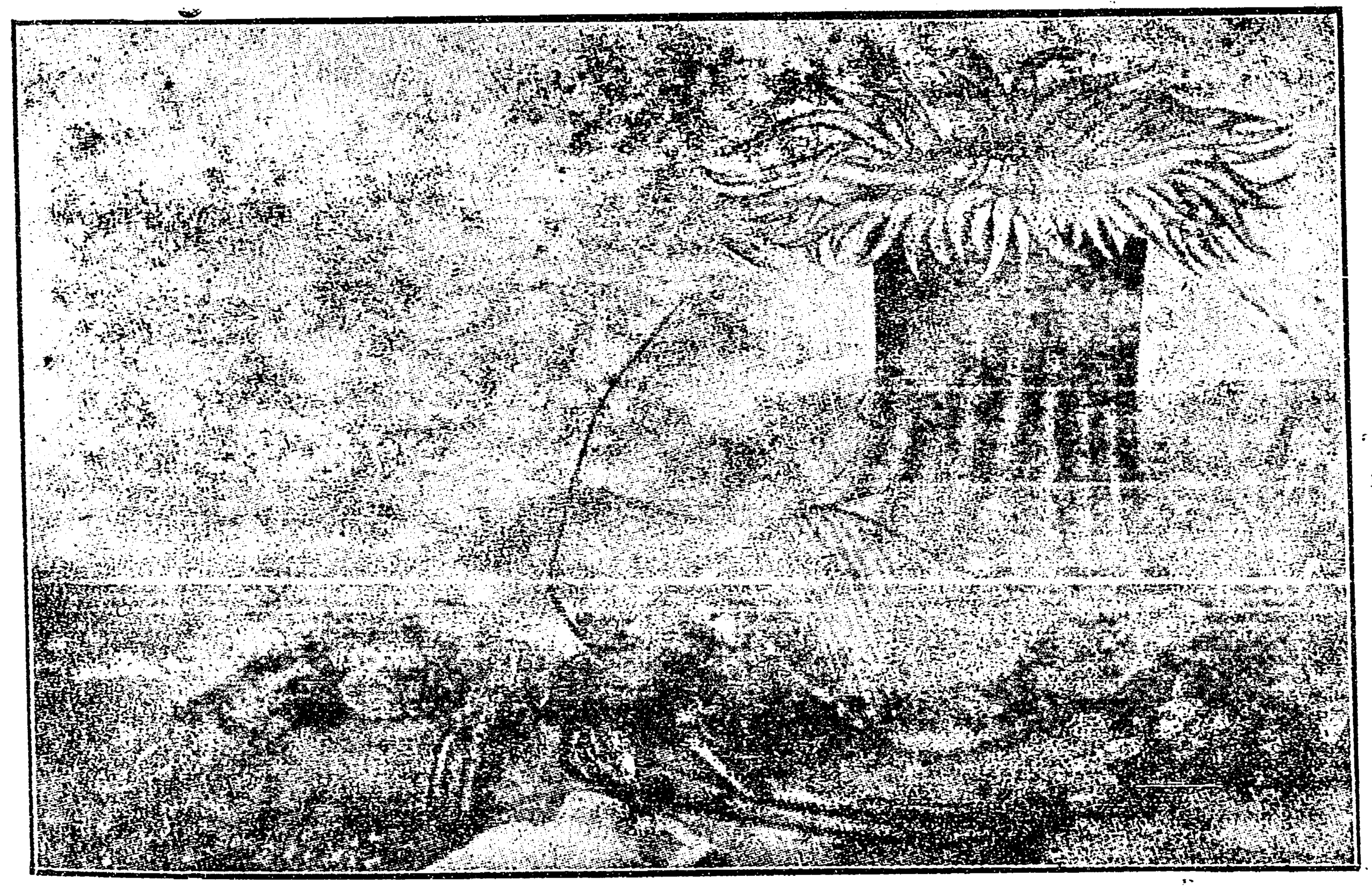

৩

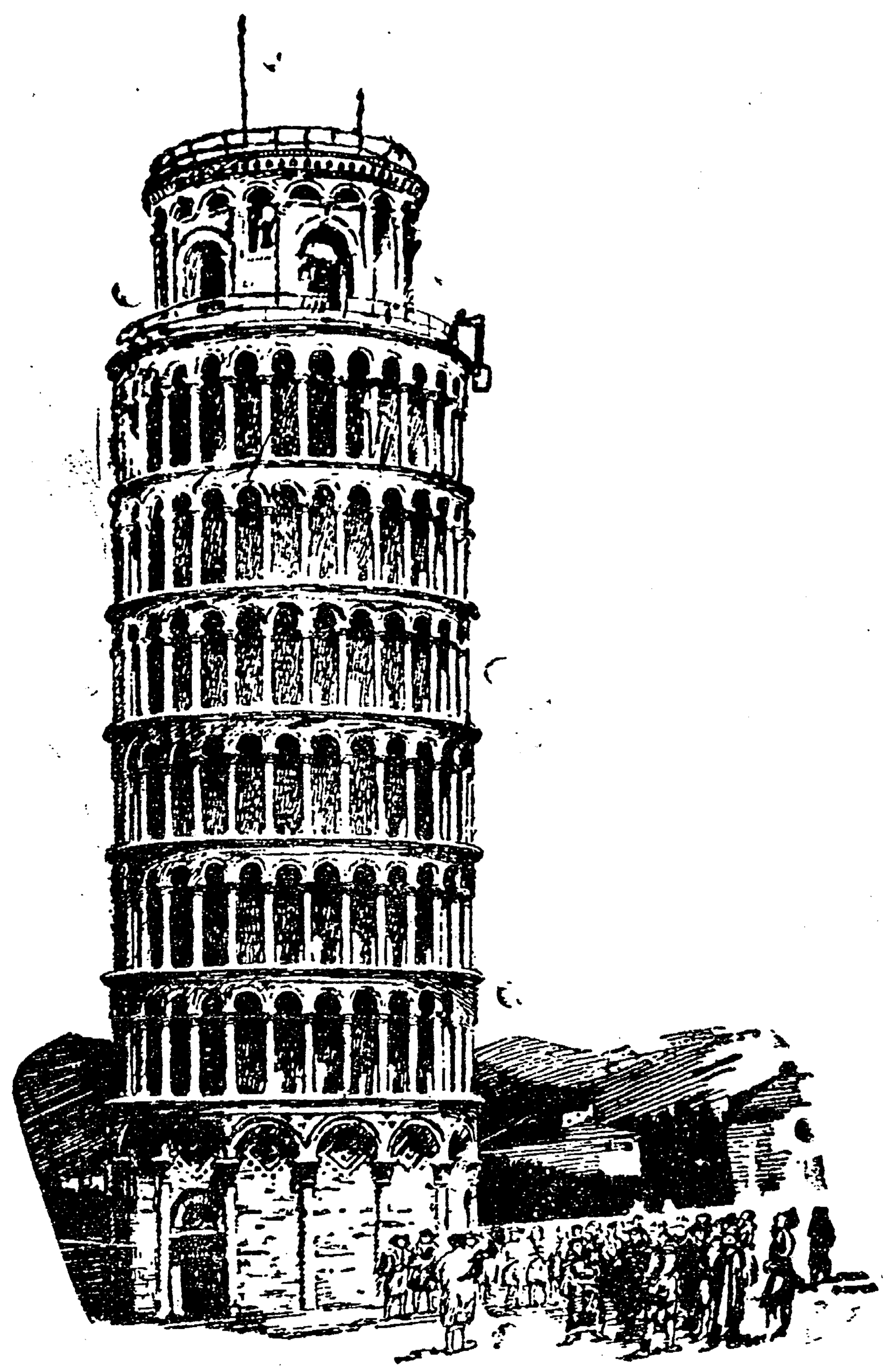

৪

৫

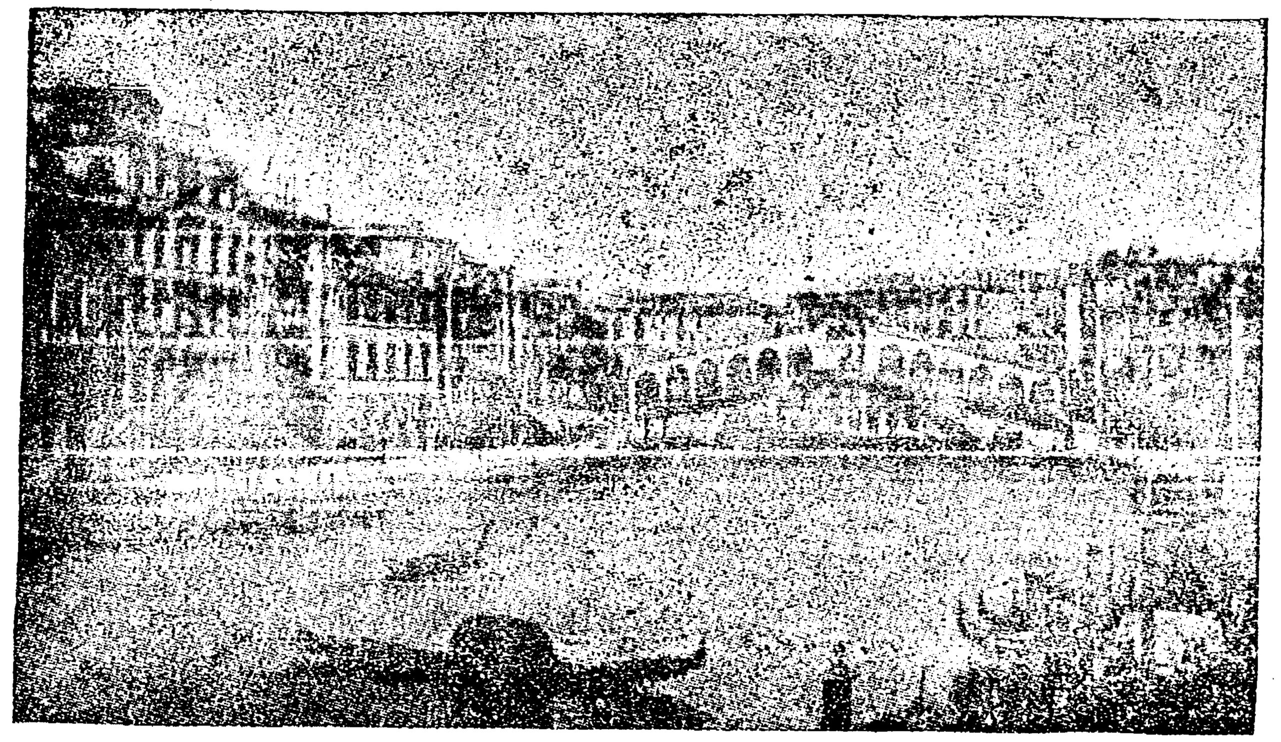

৬

দ্বারকাধীশের এই মূর্তি কিন্তু আধুনিক। গত দু'শো বছরের মধ্যে এই মন্দির থেকে দু'বার কৃষ্ণমূর্তি অপসারিত হয়। আদি মূর্তি ছিল 'রণছোড়জীর মূর্তি'। পুরুতেরা সেই মূর্তি চুরি করে নিয়ে যায়। ঢাকুর নামক স্থানে সেই মূর্তি এখনও আছে। তারপর শূন্য মন্দিরে দ্বিতীয় মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। রামদাস নামে এক ভক্ত সেই মূর্তিও চুরি করে নিয়ে যান। শংখের দ্বীপ নামক স্থানে সেই মূর্তি এখনও আছে। (এই দ্বীপটিকে 'বটদ্বীপ'ও বলে)। তারপর আবার শূন্য মন্দিরে এই 'বিজয়মূর্তির' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এখানে হয়তো কথা উঠবে, অপহৃত মূর্তির যখন সন্ধান পাওয়া যায়, তখন সেই পুরানো মূর্তিকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে আবার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয় না কেন? কেন যে তা করা হয় নি সে সম্পর্কে 'ভক্তমাল' গ্রন্থে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। রামদাস বৈরাগীর মূর্তি চুরির কাহিনী। পরের বারে সে গল্প শোনাব।

ছুটি

শ্রীউৎপল সেনগুপ্ত

কাল যে ছিলো, আজ সে নেই!

নিয়তির এই নিষ্ঠুর ভাঙ্গাগড়া খেলা কত দেখেছি, অনুভব করেছি কিন্তু তবু উদাস না হয়ে পারি না।

অথচ কী আশ্চর্য্য! হরিদার সঙ্গে আমার কোনও রক্তের সম্বন্ধ ছিলো না,—ছিলো না কোন জ্ঞাতি-কুটুম্বিতা! জ্ঞান-বয়স থেকে শুধু তাকে দেখে আসছি—জেনে আসছি আমাদের রাঁধুনে বামুন ঠাকুর হিসেবে।

হ্যাঁ, রান্নার ঠাকুর। বাবার বিয়েরও বহু আগে এ বাড়ীতে ঠাকুর হয়ে এসেছিলো হরিদা—হরিদাস শর্মা। ছিপছিপে লম্বা, ফর্সা, দোক্তা-চিবুনো কালো দাঁতের একগাল হাসি আর কদম-ছাঁট চুলের মাঝে খোঁপা-বাঁধা দেড় হাত শিখা—এই ছিলো হরিদার পরিচিতি।

একটানা চল্লিশ বছরের উপর আমাদের বাড়ীতে ঠাকুরের কাজ করেছিলো হরিদা। আমাদের বাড়ীতেই থাকতো। শেষটায় কেমন খিটখিটে হয়ে পড়েছিলো—প্রায়ই দেখতাম মা'র সঙ্গে খিটমিটি চল্ছে. এমন কি বাবার মুখেও জবাব দিয়ে দিতো কোনও কোনও দিন। কিন্তু তবু এতটুকু অসহিষ্ণু হ'তে দেখি নি মা কিংবা বাবাকে। বাড়ীর এক বৃদ্ধ আত্মীয়ের মত মনে করতেন ওঁরা হরিদাকে।

বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতো হরিদা বোধ হয় আমাকে। মেলা, বাজার, যাত্রা, পার্ক সবই হরিদার কোলে-কাঁধে চড়ে ঘুরেছি। শুধু বনতো না হরিদার আমার বছর আটেকের ছোট ভাই মণ্টুর সঙ্গে। তারি দুষ্টু হ'য়ে উঠেছিলো মণ্টু। ইদানীং হরিদার খিটখিটে মেজাজের জন্য ওর আরও সুবিধা হয়েছিলো। কবে নাকি রান্না করতে করতে হরিদা কি একটা গান গুণ্ গুণ্ করছিলো, মণ্টুর কান তা এড়ায় নি। দিনরাত সেই গান গেয়ে গেয়ে হরিদার পেছনে লেগে তাকে ক্ষেপিয়ে তুলতো মণ্টু। শুধু তাই নয়, পাড়া শুদ্ধু ওর বন্ধু-বান্ধব সকলকে সেই গানের কলি বেশ ফলাও করে শুনিয়ে দিয়েছিলো সে, ফলে—হাটে-বাজারে পথেঘাটে যেখানেই পাড়ার ছেলেদের মুখোমুখী হ'য়ে পড়তো হরিদা —অঙ্গভঙ্গী সহ সেই গানের বিকৃত সুর হরিদার মস্তিষ্ককে আরও বিকৃত করে তুলতো। শেষটায় এমন হ'ল যে অনেক বয়স্ক ব্যক্তিরাও হরিদাকে দেখলেই একটু মুচকী হেসে গুণ গুণ করে গেয়ে উঠতো নেইচে নেইচে আয় মা ছামা। আর সেই জন্যই হয়তো দারুণ রাগ ছিলো হরিদার মণ্টুর উপর।

সেদিন মঙ্গলবার। কলেজে মাত্র তিনটে পিরিয়ড ছিলো। মণ্টুদেরও তিনটেয় ছুটি হয়ে গিয়েছিলো—ওদের স্কুলের টিমের ফাইনাল ফুটবল ম্যাচে উৎসাহ দেবার জন্য। মা শোবার ঘরে কি একটা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছেন। স্কুল ছুটির পর যথাস্থানে ব্যাগ রেখে মণ্টু ছুটলো রান্নাঘরে—দু'টো পরোটা আর কিছু ভাজা এই ছিলো আমাদের বিকেলের জলখাবার। যে দিন ফিরতে সন্ধ্যে হ'য়ে যাবে ভাবতো, মণ্টু আগেই জলখাবার খেয়ে যেত। তা ছাড়া মণ্টুর মতে, কিছু খেয়ে না গেলে ম্যাচে স্বপক্ষ দলকে চেঁচিয়ে উৎসাহ দেওয়া যায় না।

এদিক্ সেদিক্ ঘুরে-ফিরে আমিও সন্ধ্যার কিছু আগে বাড়ী ফিরলাম। খেলায় মণ্টুদের স্কুল কি করলো জানবার জন্য দু'-একবার মণ্টুকে হাঁক দিলাম। মা জানালেন, মণ্টু তখনও বাড়ী ফেরে নি।

ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল—রাস্তার বিজলী-বাতিগুলো জ্বললো—বাইরের কোলাহল কিছুটা শান্ত হ'য়ে এলো, কিন্তু তবু মণ্টু ফিরলো না।

বাবা বল্‌লেন, "ছোঁড়াটা আজকাল বড্ড বেশী বয়াটে হ'য়ে গেছে—কারুর কথায় কোনও গ্রাহ্য নেই! দিন-রাত হরিদাসের পেছনে লেগে আছে—আসুক আজ বাড়ীতে… "

মণ্টুর পক্ষ হ'য়ে উত্তর দিলেন মা,—"হয়তো ওদের স্কুল জিতেছে—শীল্ড নিয়ে তাই হৈ-চৈ করছে—একটা তো দিন!"

কিন্তু রাত ন'টা পর্য্যন্ত যখন মণ্টু ফিরলো না তখন আমার সত্যিই ভয় হ'লো—আজ যদি বাবা মণ্টুকে হাতের কাছে পান, আর আস্ত রাখবেন না। এক সময়ে তাই বাবার অলক্ষ্যে মাকে বলে বেরিয়ে পড়লাম মণ্টুর খোঁজে।

কিছুটা দূরে ওরই ক্লাসে পড়ে দীপকের বাড়ী। দীপক জানালো মণ্টুকে সে আজ মাঠে খেয়ালই করে নি।

সেখান থেকে আবার রজতের বাড়ী। কিন্তু অবাক্ করে দিল রজত, বললে, 'মণ্টুটা বড় বাজে বক্ বক্ করে। জানো রবিদা, এত সব প্ল্যান করে স্কুল থেকে বাড়ী ফিরলাম—কি ক'রে ওদের

গোলকীপারকে নার্ভাস করে দেব—অথচ ও মাঠেই এলো না! ওঃ, সারাটা মাঠ ওর খোঁজে চষে বেরিয়েছি।"

চুপি চুপি বাবাকে গিয়ে জানালাম। সারা রাত অর্দ্ধ-জাগরণ অর্দ্ধ-নিদ্রায় মণ্টুর আশায় বসে রইলাম সবাই, কিন্তু মণ্টু ফিরলো না।

শেষে আর কোনও উপায় না দেখে থানায় একটা রিপোর্ট দিয়ে এলেন বাবা। কিন্তু রিপোর্ট দেওয়াই সার হ'ল।

ক্রমে তিন দিন অতীত হ'ল—অথচ না মণ্টু ফিরলো, না মণ্টুর কোনও খবর পাওয়া গেল। সারা বাড়ীটা যেন শ্মশান হয়ে উঠলো। সবচেয়ে অপ্রকৃতিস্থ মনে হ'ল হরিদাকে। রাঁধতে রাঁধতে কেমন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে…আড়ালে কেমন গুম্ হ'য়ে বসে থাকে—বোধ হয় কাঁদে। আশ্চর্য! মণ্টুর জন্যে এত দরদ লুকিয়ে ছিলো হরিদার মনে!

পৃথিবী ঘুরছে…ঘুরছে · আর এক একটা দিন ছায়া ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। এমনি করে এগিয়ে গেল আরও কয়েকটা দিন। ধীরে ধীরে মণ্টুকে হারাবার শোক সামলে নিল যেন বাড়ীটা। হয়তো কালের গতিতে ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে যেত সে শোক, কিন্তু হঠাৎ একটা অসম্ভব কঠিন আঘাত পেলাম আমরা। এই আঘাতপ্রাপ্তির জন্য হয়তো খানিকটা দায়ী ছিলাম আমিই।

দারুণ গরম পড়েছে সে রাতে। ঘুম ছিলো না চোখে। কেন জানি না, মণ্টুর কথাই বার বার মনে জাগছিলো। রাস্তার আলোর রশ্মি দেওয়ালে ঝুলানো মণ্টুর বাঁধানো ফটোটার উপর পরে চক্‌চক্ করছিলো। এক কোণে রাখা রয়েছে ওর প্রিয় ক্রিকেট ব্যাটটা।

হঠাৎ চাপা আওয়াজ কানে এল। কে যেন কাঁদছে। না, কান্নার প্রবল বেগ সামলে নিয়ে কে যেন নিঃশব্দে কাঁদবার চেষ্টা করছে!

নিস্তব্ধ নিঝুম রাতে সেই শব্দই বেশ জোরালো হয়ে উঠেছে।

ঝট্ ক'রে বিছানায় উঠে বসলাম, তারপর শব্দ লক্ষ্য করে খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

রান্নাঘরের পিছনে বহু বছরের স্তূপীকৃত ছাই আর আবর্জনার মধ্যে কচুবনের সৃষ্টি হয়েছে। অন্ধকার সেই কচুবনে একটা প্রদীপের আলো, আর সেই আলোর সামনে বসে দু' হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে এক ছায়ামূর্ত্তি।

তাড়াতাড়ি নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাম।

অবাক্ কাণ্ড। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ছায়ামূর্ত্তি নয়—আমাদের হরিদা!

কি জানি কেন তখন হরিদাকে ডাকতে পারি নি। নিঃশব্দে আবার উপরে উপরে উঠে এসে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। বাকী রাতটুকু আর ঘুম হয় নি।

পরদিন সকালে বাবাকে সব বললাম। শুনে বাবা কিছুক্ষণের জন্য কেমন চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন। তার পর মাত্র আধঘণ্টা। আধ ঘণ্টা পরেই রহস্যের সমাধান হ'ল। ইন্সপেক্টার এলো, পুলিশ এলো। ছাইয়ের গাদা খোঁড়া হ'ল। আর আমাদের সকলকে অবাক্ করে দিয়ে হাতে হাতকড়া পরিয়ে হরিদাকে নিয়ে গেল থানায়।

হরিদা খুনী। মণ্টুকে খুন করেছে হরিদা। কিন্তু কেন? কেন?

শুনলাম সব। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে হরিদা বলেছিলো, "বিশ্বাস করো—বিশ্বাস করো খোকাবাবু, আমি ওকে ভয় দেখাতে গিয়েছিলাম, কিন্তু···কিন্তু কেমন করে ওর লেগে গেল · লেগে গেল আর···" ব্যস্, তার পরেই বিড় বিড় করতে করতে হরিদা কেমন মোহাচ্ছন্নের মত চুপ করে বসে পড়েছিলো।

হরিদার জবানবন্দীতেই বাকিটা জানা গেল। পরোটা আর আলুভাজা খেতে খেতে মণ্টু প্রথমে হরিদাকে বক দেখায়, তারপর আবার সেই বিকৃত গান। প্রথমটা সামলে নিলেও পরে হরিদা নিজেকে সামলাতে পারে নি, তাই হাতের সামনে পেয়ে লোহার ডালের কাঁটাটা নিয়েই তেড়ে এসেছিলো মণ্টুকে ভয় দেখাতে। আর সেই সময়েই, কেমন করে, ডালের কাঁটার তিনটে দাঁত ওর কানের পাশে রগ ঘেঁষে মাথার ভেতর ঢুকে গিয়েছিলো। একটা টুঁ শব্দ পর্য্যন্ত করতে পারে নি মণ্টু। কয়েকবার থর থর করে কেঁপে চিরদিনের মত নিথর হয়ে গিয়েছিলো ওর দেহ।

বিচারে ফাঁসির হুকুম হয় নি হরিদার, হয়েছিলো আজীবন কারাবাস।

তারপর আট বছর পেছনে ফেলে এসেছি। সংসারে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। হরিদার কথা, সত্যি বলতে কি, এক রকম ভুলেই গেছি।

বাজার ফেরত সেদিন খোকাবাবু ডাক শুনে চম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

হ্যাঁ, হরিদাই। অস্তিচর্মসার শীর্ণদেহ বয়সাধিক্যে একেবারে নুয়ে পরেছে। খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি-গোঁফ আর একরাশ জট-পাকানো তৈলবিহীন চুলের ফাঁকে কোটরাগত ছলছলে ছু'টো চোখে নিষ্প্রভ দৃষ্টি হেনে বলেছিলো হরিদা—"আমি মরি নি খোকাবাবু, গারদের লোকগুলো ছু' বেলা খাইয়েছে—মরতে দেয় নি।"

কিন্তু এ তো বেঁচে থাকা নয়। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তুমি ছাড়া পেলে কবে হরিদা?"

—"ছু' মাস। সেই যে কবে ঘরবাড়ীতে আলো জ্বললো, বাজনা বাজলো, তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়লো—সেই সে দিন। জানো খোকাবাবু, সরকার আর বসিয়ে বসিয়ে আমাদের খাওয়ালো না; আমাকে ছেড়ে দিলে, আরও অনেককে ছেড়ে দিলে···।" হরিদা একটু ক্ষীণ হাসি হাসবার চেষ্টা করেছিলো।

আমার মনের কথা টের পেয়েই ফের বললো, "ঐ যে গাছের তলায় একটা পাথরে তেল-সিঁদূর মাখিয়ে রেখেছি, ওখানেই থাকি। গায়ের জামাটা খুলে পেতে দিয়ে ভিক্ষে চাই। ভিক্ষে করতে করতে যে দিন এই দাগী জীবনটা টুপ্ করে মরে যাবে, ব্যস্, সে দিনই ছুটি।"

পকেট হাতড়ে কিছু খুচরো পয়সা বার করে হরিদার হাতে দিয়ে বলেছিলাম, "আপাততঃ এগুলো রাখো হরিদা, বিকেলে এসো দেখবো তোমার জন্য কি করতে পারি।"

ছু'চোখ ভরা জল নিয়ে হরিদা আমার চিবুক ধরে বলেছিলো, "জানি খোকাবাবু, জানি, সারা পৃথিবীটা অমাকে অবিশ্বাস করলেও তুমি আমায় অবিশ্বাস করবে না।"

কিন্তু আর যাওয়া হ'য়ে ওঠে নি হরিদার কাছে। বিকেল থেকে হঠাৎ আরম্ভ হ'ল

প্রচণ্ড ঝড় আর মাঝে মাঝে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। সেই একটানা ঝড়-জলের বিরাম হ'ল রাত প্রায় ন'টায়।

পরদিন সকালে বেরোই বেরোই করেও অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিলো। ছুটো পুরোনো ধুতি আর শার্ট নিয়ে যখন সেই গাছটার কাছে এলাম, দেখি একটা ছোটখাটো ভীড় জমা হয়ে গিয়েছে।

ব্যাপার কী! ভীড় ঠেলে একটু এগিয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। কালকের ঝড়ে প্রকাণ্ড গাছটা ভেঙ্গে পড়েছে। হরিদা ছিল তারই নীচে।

সেই মরে-থাকা হরিদা মরলো। সত্যিই এবার সে ছুটি পেয়েছে।

পড়ার কথা

শ্রীশিবানী রায় চৌধুরী

পাশ করেছ গোটা চারেক, বই পড়েছ আরও,
কে করেছেন পড়ার সৃষ্টি?—বল্‌তে কি তা পার?
কবে যে কোন্ নিরেট বোকা চিনলো বর্ণমালা—
লক্ষ পুরুষ হাজার গুষ্টি সামলাও তার ঠেলা!
বুদ্ধিশুদ্ধি বিন্দুমাত্র ছিল না তার তরে,
নইলে কি কেউ বেছে বেছে এমন কাজও করে?
এতই যদি লাগতো ভাল গেলেই কেন ফেলে?
দোষ কি ছিল যাবার সময় সঙ্গে করে নিলে?

সেই সেদিনের শান্ত-শিষ্ট পড়ুয়াদের দল,
কাটিয়েছে দিন তারই সাথে, পেয়েছে বেশ বল।
সেই বোকাটির মত অনেক আকাট বোকা এসে
বিশ্ব মাঝে পড়ার বুলি শুনিয়ে গেছে কষে।
বই লিখেছে দেশ-বিদেশের পণ্ডিতেরা সব—
রোগা-মোটা নানান্ সাইজ—কিচির্-মিচির্ রব।

কেউ লিখেছে বাঙ্‌লা, ভূগোল কঠিন এবং সোজা,
তার ওপরে বদ্‌মেজাজী সংস্কৃতের বোঝা।

অঙ্ক মশাই ঠাণ্ডা মাথায় থাকেন নাকি বসে,
উষ্ণ হবেন হঠাৎ যদি পান থেকে চূণ খসে।
গোম্‌রামুখো ইতিহাসের ভর্ত্তি সকল ঝুলি,
সারা গায়েই জড়িয়ে আছেন লম্বা নামাবলী।
আর সব তো ছেড়েই দিলাম হরেক রকম বই,
এমনি বড়, পড়তে হ'লে লাগবে তোমার মই।

যদু-মধুর যুক্তি

শ্রীশিবনারায়ণ ঘোষাল

যদু—পালিয়ে চ' আজ দিল্লী যাই,
নামতা প'ড়ে কাজ কি ছাই?
সট্‌কে পড়ি তার চেয়ে
গ্রাম ছেড়ে দূর পথ বেয়ে।
দিল্লী যদি অনেক দূর?
বেশ, তবে চল্‌ ভাগলপুর।
ভাগলপুরের রাস্তাটাই
যাচ্ছে সোজা কল্‌কাতাই।
মধু—কলকাতা নয়—বাপ্‌রে বাপ,
লোকগুলো সব কেউটে সাপ!
সুযোগ পেলেই দেয় ছোবল,
ভেল্কি খেলায় পাল্টে ভোল।
পট্‌লারা যায় তাই জানি—
যদু—বেশ, তবে চল্‌ জার্ম্মানী।
জার্ম্মানীতে শুনতে পাই
নামতা পড়ার নেই বালাই।
একটু হেঁটেই কাশ্মীরে
কিন্‌বি যত চাস্‌ চিঁড়ে।
গামছা বেঁধে ঘুরবি বেশ
ইরাণ, কাবুল, কঙ্গো দেশ।
মধু—আপত্তি নেই জার্ম্মানী,
হাঁটতে কি আর হার মানি?
একটু তবে ভাবনা হয়,
জার্ম্মানী তো বাংলা নয়।
কড়মড়িয়ে কয় কথা—
বলতে মুখে হয় ব্যথা।
যদু—জ্ঞান দেখি তোর টন্‌টনে!
চল তবে যাই লণ্ডনে।
আজ দুপুরে যাই যদি
কাল সকালে নীল নদী;
সাঁতরে সেটা মিনিট চার
পৌঁছে যাবো জাঞ্জিবার।
একটু গেলেই ব্যস্‌—বিলেত
নেই কো সেথা গাঁট্টা, বেত।
খেলবো সুখে ডাং-গুলি
তুই, আমি, শ্যাম গাংগুলি।
মধু—একটা যে ছাই বিচ্ছিরি—
পড়তে হবে ইন্‌জিরি!
যদু—থাক্‌ তবে মন নাম্‌তাতেই,
পালিয়ে গিয়ে কাজটি নেই।

তুষারতীর্থ শ্রীকৈলাস

তীর্থঙ্কর

পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের পবিত্র অধিষ্ঠান-ভূমি কৈলাস গিরি।

সেই মহাতীর্থে পৌঁছবার কাহিনী ইতিপূর্ব্বে তোমাদের শুনিয়েছি। এবারে ফেরার পালা।

আবার সেই বিখ্যাত বরখার মাঠ,—যেখানে জীবন-মৃত্যুর ঝড় বয়। তিব্বতীয়দের প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী এই মাঠ হচ্ছে দেবতার পরীক্ষার স্থল,—ব্যক্তিগত ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পাপ-পুণ্যের মাপকাঠি। এটি একটি বিস্তৃত বালুকাময় প্রান্তর। আসলে ঠিক কচ্ছপের পিঠের মত এর আকার। তবে সবটা সমতল নয়, কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু। মাঝে মাঝে নদী-নালা বয়ে গেছে। মাঝে মাঝে টেমা ও পেসা নামক কাঁটা গাছ। তাদের আড়ালে আড়ালে খরগোস কান খাড়া করে বসে আছে। মাথার উপরে বিস্তৃত চাঁদোয়ার মত নীল নির্ম্মল আকাশ। এপাশে ওপাশে, দূরে দূরে পাহাড়ের শ্রেণী। এখানকার উচ্চতা হবে তের হাজার ফুটের উপর। প্রস্থেও এই মাঠ ১৪।১৫ মাইল। এক দিনেই আমাদের এত বড় মাঠখানা অতিক্রম করতে হয়েছিল।

সকাল ৯টায় বেরিয়ে বেলা চারটা নাগাদ আমরা সবাই এসে পৌঁছলাম মানস সরোবরের কূলে। জায়গাটার নাম "মালাঠক"। পাহাড়ের কোলে আমাদের তাঁবু ফেলা হ'ল।

ক্লান্তি দূর করবার জন্য খানিকটা গরম কফি খেয়ে নিয়ে আমরা মানস সরোবরের তীরে বেড়াতে গেলাম। সেখানে নানা রংএর, নানা আকারের ছোট ছোট পাথর দেখে সংগ্রহ করতে ইচ্ছা হ'ল। আমার বন্ধু-বান্ধবেরা কিছু কিছু সংগ্রহও করলেন। দেখতে দেখতে চোখের সামনে সূর্য্য ডুবে গেল। তার রক্তবর্ণ রশ্মি বরফ-ঢাকা পাহাড়ের গায়ে এবং মানস সরোবরের স্বচ্ছ জলে ছড়িয়ে পড়ে সুন্দরকে সুন্দরতর করে তুললো। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল, ঝড়ের বেগেই। সে হাওয়ায় যেমন ছিল মানস ও রাবণ হ্রদের সলিল-শীকর, তেমনি ছিল পাহাড়ের তুষার-শৈত্য। তাই এই সব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য ইচ্ছা থাকলেও বেশীক্ষণ উপভোগ করা গেল না। আবছা অন্ধকার চারিদিকে প্রসার

লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাকৃতিক শোভা যেমন বিদায় নিল আমরাও তেমনি বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম তাঁবুতে।

সে রাত্রে শীতের চাপে কম্বলের অন্তরালে ঘুমটা বেশ ভাল ভাবেই জমেছিল। পরদিন ভোর ৬টায় উঠে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম মানস সরোবরের তীরে সূর্য্যোদয় দেখবার উদ্দেশ্যে। সেদিন যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখেছিলাম তা জীবনে ভুলবো না।

একটু রোদ উঠতে আমরা সকলে গায়ে তেল মেখে মানস সরোবরে স্নান করলাম। স্নানের পর পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশে মন্ত্র পড়ে তর্পণ করলাম। স্নানের পরই কিন্তু অসম্ভব শীত করছিল, তাই তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ফিরে এসে জামা-কাপড় পরার দরকার হ'ল।

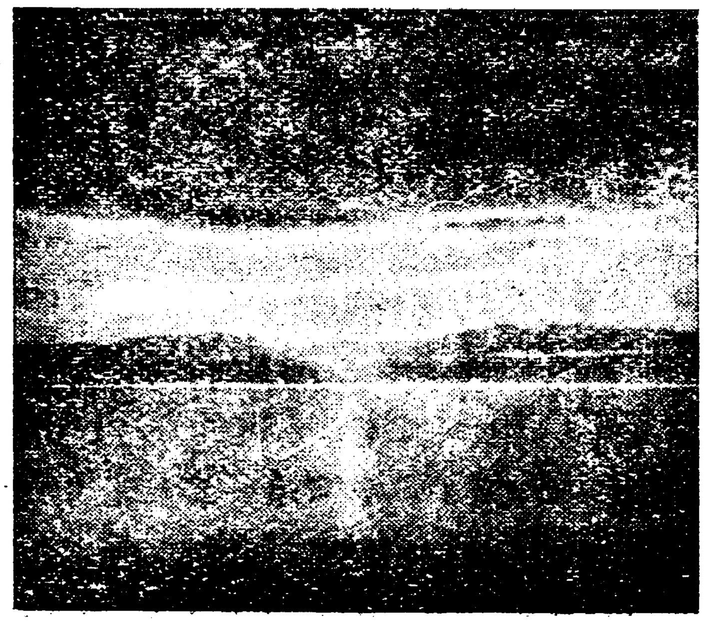
মানস সরোবরের তীরে সূর্য্যোদয়

কিছুক্ষণ পরে আমরা সদলবলে বেরিয়ে পড়লাম। মানস সরোবরের তীরে তীরে নুড়ি-বিছান রাস্তা ধ'রে কিছু দূর চলার পর আমাদের চোখে পড়লো সমস্ত আকাশটা গাঢ় নীল রংএ ছেয়ে আছে এবং তারই তলায় একদিকে রাবণ হ্রদের আর অন্য দিকে মানস সরোবরের অফুরন্ত গাঢ় নীল জলরাশি। একটা উঁচু জায়গায় উঠে দু'টি সুবৃহৎ হ্রদের দৃশ্যই একসঙ্গে দেখা যেতে লাগল। রাবণ হ্রদের দৃশ্যও মানসের চেয়ে কোন অংশে কম সুন্দর নয় মনে হ'ল।

এর পর আমরা রেজ্যাংএর দিকে চলতে লাগলাম। বেলা দেড়টা নাগাদ একটা জায়গায় এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার আমাদের চলা শুরু হ'ল। এখানে পথ চলতে ঝোড়ো হাওয়ার মুখে এতই বাধা পেতে লাগলাম যে মনে হতে লাগলো অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। অনেক কষ্টে বিকেল বেলায় আমরা রেজ্যাংএ এসে পৌঁছে গেলাম। এখানেই আমাদের রাত্রি-বাসের তাঁবু ফেলা হ'ল।

পরদিন সকালে বেলা ন'টা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা রেজ্যাং ছেড়ে অগ্রসর হ'লাম। মাঠের উপর দিয়ে পথ, পথ উঁচু-নীচু, গাছপালা বড় বিশেষ কোথাও নেই। কেবল ঝুপি-ঝুপি কাঁটাগাছ, এদেশে যা খুব বেশী লাগে জ্বালানীর কাজে। বেলা তিনটে নাগাদ লাজিকাপে এসে পৌঁছানো গেল। এখানে এসে শ্রীকৈলাসকে আর দেখা গেল না। পাহাড়ের পর পাহাড়ের আড়ালে তাঁকে ফেলে এসেছি অনেক দূরে।

লাজিকাপের তাঁবুতে রাত কাটিয়ে আগের মতই বন্ধুর ও নুড়িতে ভরা পথ ধরে আমরা চলেছি তক্‌লাকোট অভিমুখে। এ পথে অনেক তিব্বতী চলাচল করছে দেখা গেল। তাক্‌লাকোটে দোকানপাট কিছু কিছু আছে। এ অঞ্চলের এটাই একমাত্র ব্যবসা-কেন্দ্র কিনা। একটু পরেই দূর থেকে শিম্বলিং গুম্ফার চূড়া দেখতে পাওয়া গেল। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত বলেই এই গুম্ফাটির উপরিভাগ অনেক দূর থেকে দেখা যায়।

ধীরে ধ'রে আমরা এগিয়ে চললাম।

মেঘনাদ

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

৭

বিকেলের ট্রেনেই পৃথা রওনা হয়ে গেল চন্দননগর। আগে একটা খবর দিতে পারলে ভাল হ'ত, কিন্তু এই তো এখান থেকে এখানে, কী-ইবা দরকার তার।—মনে মনে ভাবল পৃথা। চিঠি লেখ রে, তার পর জবাবের জন্য লেটার বক্স হাতড়াও রে, জবাব আসতে দেরী হলে মন খারাপ কর রে। কাজ কি ও সব ঝঞ্ঝাটের? তা ছাড়া সব কাজই গরম গরম সেরে ফেলা পৃথার চিরকালের স্বভাব। নইলে, কাজও যে মীইএ-যাওয়া মুড়ীর মত বিস্বাদ লাগতে পারে এ সে অনেক বার দেখেছে।

সন্ধ্যার আগেই চন্দননগরের প্ল্যাটফর্মে ভস্ ভস্ করে লম্বা গাড়ীখানা এসে দাঁড়াল। ষ্টেশনের গায়েই পুরোনো আমলের সেই বিরাট গোলাপী রংএর বাড়াটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে; চিনতে এক মুহূর্ত দেরী হয় না। বাড়ীখানা দেখেই পৃথা

উঠে দাঁড়াল, তার পর কুলীর মাথায় বিছানা আর স্যুটকেস তুলে দিয়ে বুকের কাছে ভ্যানিটি ব্যাগ্‌টা আঁকড়ে ধরে সাইকেল-রিক্সায় গিয়ে উঠল।

অনেক পরিবর্তন হয়েছে চন্দননগরের। প্রায় তিন শ' বছর ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফরাসীরা এখানে রাজত্ব করেছে। চারিদিকে বিশাল ভারতভূমি যুড়ে ইংরেজদের প্রভুত্ব, মাঝখানে সামান্য কয়েক মাইল জায়গা—বিরাট সমুদ্রের বুকে ছোট্ট প্রবাল-দ্বীপের মতই যেন ছিল এই ফরাসী অঞ্চল। কি করে যে এর পৃথক্ অস্তিত্ব বজায় ছিল ভাবতে অবাক্ লাগে পৃথার। অবশ্য মাঝে মাঝে কয়েকবার যে হাতছাড়া হয় নি এমন নয়, কিন্তু আবার ফিরে এসেছে ফরাসীদের হাতে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের পর আর ইংরেজরা এর ওপর হামলা করে নি।

ইতিহাসের ছাত্রী নয় পৃথা কিন্তু তবু, কৌতূহলের বশেই, চন্দননগরের ইতিবৃত্ত খানিকটা পড়েছে সে। প্রায় তিন শ' বছর আগে দিল্লীর বাদশাহ ঔরংগজেবের কাছ থেকে সনদ নিয়ে ফরাসীরা এখানে ঘাঁটি গাড়ে। তার পর তৈরী করে কেল্লা। ইংরেজদের সঙ্গে এই অঞ্চল নিয়ে বহু লড়াই হয়েছে তাদের। ভারতে মুসলিম রাজত্ব যখন ভেঙ্গে পড়ছে তখন ধীরে ধীরে, বাণিজ্যের নাম করে, গোটা ভারত দখল করবার জন্য যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়েছিল বিদেশীদের মধ্যে,—চন্দননগর তার একটা বড় সাক্ষী। ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের ভাগ্য-পরীক্ষাও হয়ে গেছে এখানে কয়েকবার। চন্দননগরকে সত্যিকার বড় সহর করে গড়ে তুলেছিলেন ফরাসী শাসনকর্তা দুপ্লে। অবশ্য তাঁর পরে সহরের সে আভিজাত্য আর নেই। তবু তার বহু স্মৃতি এখনও ছড়িয়ে আছে সহরের এদিক্ ওদিক্।

রিক্সায় চলতে চলতে পৃথার হাসি পাচ্ছিল। প্রায় দার্শনিকের হাসি। আজ কোথায় সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজ! যাদের দেশ তাদেরই হাতে তা বুঝিয়ে দিয়ে পোঁটলাপুঁটলি গুছিয়ে মানে মানে সরে পড়তে হয়েছে তাদের। অবশ্য যাবার আগে খানিকটা ক্ষতচিহ্ন রেখে যেতে ছাড়ে নি—যে ঘা আজ পর্যন্ত শুকোলো না। ইংরেজের পিছু পিছু ফরাসীদেরকেও পাততাড়ি গোটাতে হ'ল। কাদের ভরসায় আর তারা থাকবে? চন্দননগর আর এখন ফরাসী চন্দননগর নয়, বাংলার চন্দননগর,—বাঙ্গালীর চন্দননগর। মায়ের কোলে ফিরে এসেছে হারানো ছেলে। হুগলী জেলা তাকে মহকুমা করে নিয়ে নিজের কোলে টেনে নিয়েছে।

মনে পড়ল গোয়ার কথা। ক্ষুদে, পুঁচকে পর্তুগাল, আজও সে বাস্তবকে উপলব্ধি করতে চাইছে না। মধ্যযুগের সেই পর্তুগীজ প্রতাপ যে কোন্ কালে জল-বুদ্বুদের মত শূন্যে বিলীন হয়ে গেছে,—এ সত্য কি সত্যি তার জানা নেই? তবে কিসের জোরে

তার এই দম্ভ? আবার হাসি পেল পৃথার। শিখবে,—একদিন ঠেকেই শিখবে হয় তো। কিন্তু শক্তিমান্ স্বাধীন ভারতের বন্ধুত্বের হাত কি তখন আর তার দিকে প্রসারিত থাকবে?

আচমকা ভঁপ্ ভঁপ্ শব্দে হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এল তার। না, মোটরকার নয়, রিক্সার হাঁক। এ-দেশে রিক্সারাই ঐ রকম বেসুরো হাঁক ছাড়ে। পেছনের একটি দ্রুতগামী রিক্সা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবার প্রচেষ্টায় ঐ রকম গাঁক্ গাঁক সুরু করেছে। পৃথার রিক্সা-চালক কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ধীরমন্থর গতিতে যেমন চালাচ্ছিল তেমনি প্যাডেল চালাতে লাগল। পেছনে গাঁক্ গাঁক্ আওয়াজও সমানে চলতে লাগল। শেষে অসহ্য বোধ হওয়ায় পৃথা রিক্সা-চালককে অস্ফুটকণ্ঠে বল্‌ল, "একটু পাশ দিলেই হয়, কান যে ফেটে গেল!" পূর্ব-বঙ্গাগত রিক্সা-চালক হাসিমুখে জবাব দিল—"আপনি বইয়া থাহেন দিদি, শ্যাষে আসচে শ্যাষেই যাইবো, ফাল দিয়া আগাইবার হাউশ ক্যান্?"

পেছনের রিক্সা তখন প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। ধাক্কা লাগায় আর কি! এবারে স্পষ্ট কানে এল পৃথার—"ধুত্তোর, বাঙ্গালের নিকুচি করেচে।···যত্তো সব!"

বাংলা ভাষা কি বৈচিত্র্যময়! শব্দসম্ভারের তুলনা নেই তার। এক শব্দকে অন্য শব্দে টেনে আনতেও যুড়ি নেই এর। পৃথা মনে মনে হিসেব করতে লাগল—কতগুলো নতুন কথা শিখলাম এক মুহূর্তে। ফাল—মানে বোধ হয় লাফ, হাউশ নিশ্চয়ই আশা। কিন্তু নিকুচি কথাটার মানে কি? কথাটা সে তার খাস কলকাতাবাসী বন্ধুবান্ধবদের মুখে অনেকবার শুনেছে কিন্তু ওর অর্থের কথা তলিয়ে দেখে নি কোন দিন। দফারফা বা ঐ রকম কোন অর্থ হবে হয় তো! কিন্তু কি করে এল শব্দটা? নিকুঞ্চিত শব্দের অপভ্রংশ কি ওটা? সম্ভবতঃ তাই। ভাস্বতীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে। ও বাংলায় অনার্স নিয়েছে, ও-ই বলতে পারবে।

হঠাৎ ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় বাধা পড়ল। একটা মোড়ের কাছে এসে রাস্তা শেষ হয়েছে। তার পরেই গঙ্গা। রিক্সাওয়ালা গাড়ী থামিয়ে নেমে পড়ল। পৃথাও উঠতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে বল্‌ল, "থাক্ থাক্, আপনি বহেন দিদি! এই তো আইয়া পরছি, ইট্টু ঠেলনের কাম। ও আমারে এতখান পথ টাইনা আনলো, আমি ওয়ারে ইট্টু টানুম না?"

ও অর্থাৎ রিক্সা। রিক্সাওয়ালার মমতা-মাখা কণ্ঠে পৃথা বেশ আমোদ অনুভব করল।

পৃথার অপ্রত্যাশিত আগমনে স্বভাবতঃই ভাস্বতীদের বাড়ীতে হুলস্থূল পড়ে গেল। পিসীমা খুব খুশী।—"ইন্দ্র এল না কেন? ওকেও ধরে আনলে পারতিস?"

"দাদা যে দিল্লী গেছে, আপিসের কাজে।" প্রণাম করতে করতে বল্‌ল পৃথা। "একা একা ভাল লাগছিল না, তাই তো চলে এলাম।"

ভাস্বতী কৃত্রিম অভিমান দেখিয়ে বল্‌ল, "তাই বল্। ইন্দ্রদা দিল্লী গেছে, তাই মেয়ের মনে পড়েছে আমাদের কথা। ওঃ, কত দি-ঈ-ঈন ধরে আসবার জন্য লিখছি।" খুশীতে প্রায় ফেটে পড়ছিল সে।

পট্টু কোথায়? বেরিয়েছে বুঝি?"

"না, কোথায় যাবে? সকালে যে কাণ্ড বাধিয়েছিল। এই পট্টু—পট্টু, দেখ্ কে এসেছে। তোর লাড্ডু খাবার লোক খুঁজছিলি না?"

মুখ-হাত ধুতে ধুতে পৃথা শুনল পট্টুর এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী। আজই সকালে গঙ্গার ঘাটে নাইতে নেমেছিল পট্টু তার বন্ধুদের নিয়ে। নাওয়া না হাতী, একটা বড় মাল-টানা নৌকোয় উঠে ছেলে ডাইভ্ দেওয়া অভ্যাস করছিলেন। ঘাটের ধারে ছিলেন এক বয়স্ক অবাঙ্গালী ভদ্রলোক। ফুল-বেলপাতা নিয়ে পুজোয় বসেছিলেন তিনি। পট্টুদের ডাইভের ফলে জল ছিটকে আসছিল বার বার, তাই ভদ্রলোক যান ক্ষেপে। প্রথমে ধমক-ধামক, তার পর সুরু করলেন দস্তুর মত গালাগালি। এদিকে যখন গালাগালি দিতে ব্যস্ত তখন কোন্ ফাঁকে আচম্‌কা একটা ঢেউ এসে যে পুজোর ফুল-বেলপাতাগুলো ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার আর খেয়াল নেই। যখন খেয়াল হ'ল তাড়াতাড়ি উপুড় হয়ে কুড়োতে গেলেন। কিন্তু সুউচ্চ ভূঁড়ির ভার সামলাতে পারবেন কেন, উল্টে পড়ে গেলেন জলে আর স্রোতের টানে হাবুডুবু খেতে খেতে ভেসে চললেন মাঝ দরিয়ায়।

সবাই হায় হায় করে উঠল। ভদ্রলোকের সঙ্গে যে মহিলাটি ছিলেন, ওঁর স্ত্রীই হবেন বোধ হয়,—হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। চোখের সামনে সে দৃশ্য দেখে সবাই হতবাক্ হয়ে গেছে। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। এমন সময় পট্টু ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, তার পর বহু কষ্টে নিজেও নাকানিচুবুনি খেতে খেতে কোন রকমে গিয়ে টেনে নিয়ে এল ভদ্রলোককে। দু' জনেই তখন প্রায় সংজ্ঞাহীন।

ভদ্রলোক সামলে নিলেন আগে। পট্টুকে "বেটা, বাছা" বলে, গায়ে হাত-টাত বুলিয়ে মাপ-টাপ তো চাইলেনই, তারিফও করলেন খুব ওর সাহসের। তার পর বিকেলে দেখা গেল ভদ্রলোকের সেই স্ত্রী এক ঝুড়ি লাড্ডু পাঠিয়ে দিয়েছেন ওদের বাড়ী—তাঁর নতুন পাতানো 'বেটা'র জন্য। লাড্ডু পেয়ে পট্টু তো ভারী খুসী। বাড়ীশুদ্ধু ভোজ

দেবে আজ তার স্বোপার্জিত খাদ্যে। কিন্তু ও মা, সেই 'মিঠা' আর 'ঘিউ'-সুবাসিত লাড্ডু যথোচিত ভাবে সদ্ব্যবহার করা কি বাঙ্গালী জিভের কাজ? সে লাড্ডুর সবই প্রায় তেমনি পড়ে আছে। জিভের আড় ভাঙ্গলে পট্টু আবার চেষ্টা করবে ঠিক করেছে। ভাস্বতীও একটা চেখে দেখেছে, কাল সকালে আবার একটা হয়তো চাখবে। কিন্তু বাকিগুলো?

পৃথাকে দেখে তাই ভাস্বতী চেঁচিয়ে উঠল—"পট্টু পট্টু।"

লাড্ডু নয়, গরম গরম লুচি আর সেই সঙ্গে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে পৃথা এসে ঝোলানো বারান্দায় বসল। পট্টুর শরীর এখনও দুর্বল, তাই তার চলা-ফেরা আজকের মত বারণ। কিন্তু মুখের ওপর তো কোন নিষেধ নেই, তাই আসর বেশ জমিয়ে তুলেছে সে। লাড্ডুর মাহাত্ম্য সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। এক একবার ভাস্বতীকে অনুরোধ করছে লাড্ডু খাবার জন্য—স্বরচিত ছড়ায়:

"ভাস্বতী!
সময় চলি' যাস্থতি,
লাড্ডু খাও।
ভাইটামিনে পুষ্ট হবে,
চর্বি-মেদে তুষ্ট হবে,
কান্তি হবে বর্দ্ধমান।
একটা, না হয় অর্দ্ধখান
লাড্ডু খাও।"

ভাস্বতী মুখ বিকৃত করতেই, পৃথাকে বলছে, "আচ্ছা, ও না খাক, তুমি নিশ্চয়ই খাবে?—

শুন্‌ছ পৃথা, বলছি কি তা?
লাড্ডু ছাড়া জীবন বৃথা।
স-শর্করা, সহ-ঘৃতা,
আষ্টেপৃষ্ঠে রসাশ্রিতা,
দিল্লীবাসীর দোস্ত—মিতা।
মিথ্যে কেন হচ্ছ ভীতা?
শুনছ পৃথা।"

"হুঁ, দিদিদের নাম ধরে ডাকা। ভাস্বতী, পৃথা এ সব কি আবার? বল্ ভাস্বতী দি, পৃথা দি।"

"ঠিক বলেছ। দেড়টি বছরের। অর্থাৎ আঠারো মাস—আটাত্তর সপ্তাহ—পাঁচশ' ছেচল্লিশ দিন—বত্রিশ হাজার সাতশ' ষাট ঘণ্টা; সোজা নয় তো! সেকেণ্ডের হিসাব দেব কি? উনিশ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার ছ' শ'…"

বক্তৃতায় বাধা পড়ল। পিসিমার ডাক শোনা গেল—"পটু, বক্তৃতা থামিয়ে পৃথু আর ভাস্মুকে নিয়ে ভেতরে আয়।"

(ক্রমশঃ)

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

অন্যান্য বছর পৌষ মাসটা ছিল তোমাদের অনেকের কাছেই পরম লোভনীয়। বাৎসরিক পরীক্ষার পর অঢেল ছুটী—পড়াশোনার বালাই নেই, এখানে ছোটো, ওখানে বেড়াও। আজ চিড়িয়াখানা, কাল বোটানিক্যাল গার্ডেন, পরশু পিক্‌নিক্‌। সেই পৌষ মাস আবার এল, কিন্তু ইস্কুলের নতুন নিয়মে সেই প্রাণ-খোলা স্ফূর্তির অবসর কোথায়? সামনেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে বাৎসরিক পরীক্ষা-রূপী বিরাট দৈত্য। সারা বছরের অগ্নিপরীক্ষা।

তবু এই শীতকালটাই হচ্ছে লোকের নড়ে-চড়ে বেড়াবার সময়। যারা উৎসাহী এবং উদ্যোগী তারা এরই মধ্যে এখানে-ওখানে ঘুরে পিক্‌নিক-টিক্‌নিক্‌ সেরে নিচ্ছে এবং তার মজাদার কাহিনীও পাচ্ছি প্রায় প্রতি ডাকেই। সে সব কাহিনী পড়ে তোমাদের সঙ্গী না হয়েও আমি সমান মজা পাচ্ছি। আর যাবই বা কোথায়? কাগজে পড়লাম, বড়দিনের ছুটীতে একদিনেই কলকাতার সীমান্তবর্তী বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভেতর লক্ষাধিক লোক জড় হয়েছিল। ভাব দেখি ব্যাপারখানা! এরই নাম কি নিরিবিলি? আবার শোন আর একদিক্‌। আমার একদল বন্ধু কাকদ্বীপ যাবেন ঠিক করেছিলেন,—বাস্‌ কিংবা ষ্টেশন-ওয়াগন্‌ রিজার্ভ করে। কিন্তু গাড়ী মিলল না। গাড়ীর মালিক বললেন, "ওরে বাবা, ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত আমরা ফুল্‌লি বুক্‌ড্‌। কোন উপায় নেই।" বল তো, এ সব শুনলে সত্যি কি কেউ বিশ্বাস করবে ভারতবর্ষ গরীব দেশ? আমার মনে হয়, এক দলের (এবং এরাই সংখ্যায় সর্বাধিক) হাতে যেমন বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু দরকার সেই ন্যূনতম

পয়সারও অভাব, আর একদলের হাতে তেমনি মাত্রাতিরিক্ত পয়সা জমে গেছে। ভারসাম্য না হলে দেশের শ্রী ফিরতে পারে না। দেশের মানুষকে নিয়েই তো দেশ!

কিন্তু রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাব না, ওর জন্য আলাদা লোক আছেন, তাঁদের আলাদা আলাদা দল আছে। (এবং দল থাকলে দলাদলি তো থাকবেই!) তার চেয়ে খানকয়েক চিঠির জবাব দেবার চেষ্টা করি।

শ্রীউৎপল রায় (ভাগলপুর)—তুমি রামধনুর দাম বাড়িয়ে পৃষ্ঠা আরও বাড়াতে লিখেছ। বাস্তবিক কাগজের যা হাল হয়েছে তাতে পৃষ্ঠা বাড়াতে গেলে দাম বাড়ানো দরকার হতে পারে। কোন কোন পত্রিকার কর্তৃপক্ষ বাড়াতে সুরুও করেছেন। কিন্তু যারা কিনবে তাদের দিক্‌টাও ভেবে দেখা দরকার। এ বিষয়ে এখনও কিছু ঠিক করি নি আমরা। শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় (গড়বেতা)—তুমি যে রকম ভাষা নিয়ে মেতে উঠেছ তাতে মনে হচ্ছে ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান্‌, হিন্দী, উর্দু', তামিল—কোন ভাষাই তুমি না শিখে ছাড়বে না। এরই মধ্যে সুরু করে দিয়েছ নাকি? আমার কথা বলছ? হিন্দী যেটুকু শিখেছিলাম আবার ভুলে' যাচ্ছি। তবে হ্যাঁ, সংস্কৃতটা আমার খুব মিষ্টি লাগে। বিশেষ করে কালিদাসের কাব্যগুলো। সত্যি, ওর তুলনা নেই। শ্রীপ্রণতি রায় (কলিকাতা-২৯)—জব্বলপুরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হয়ে গেল। আমার পক্ষে ওতে যোগ দেওয়া সম্ভব হয় নি। তবে আমার সাহিত্যিক বন্ধুরা অনেকে গিয়েছিলেন। একটা দুঃখের কথা, এবারে আবার সম্মেলন থেকে শিশুসাহিত্য শাখাটি বাতিল করা হয়েছিল। এ নিয়ে কিছু কিছু আন্দোলনও হয়েছে, আশা করি পরের বার থেকে কর্তারা এ বিষয়ে অবহিত হবেন। শিশু-সাহিত্য এখন অন্যান্য শাখার মত বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অংশ দখল করে আছে, তাকে গায়ের জোরে তাড়াব বললেই তো তাড়ানো যায় না। তবে একটা সুখবর এই, কলকাতায় আগামী ইষ্টারের ছুটিতে তিন দিন ব্যাপী একটি বিরাট শিশুসাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন হচ্ছে—শিশুসাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে। এর বিস্তৃত বিবরণ যথা সময়ে তোমরা জানতে পারবে। আশা করি তোমরা, যারা কাছাকাছি থাক, এতে অংশগ্রহণ করতে চেষ্টা করবে। নামকরা শিশুসাহিত্যিক-দের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়—মেলামেশা করার মস্ত সুযোগ এটা। শ্রীশোভনলাল চৌধুরী (মেদিনীপুর)—'যে গল্প জানা নেই' এই ধারাবাহিক বারোয়ারী উপন্যাসটি বন্ধ হয় নি, এটি চালিয়ে যাবার ভার তোমাদেরই ওপর। তোমাদের কাছ থেকে উপযুক্ত লেখা পাওয়া মাত্রই আবার সুরু হবে। এবারে ধীরে ধীরে গুটিয়ে ফেলার সময় কিনা—তাই আগের মত লেখা আর আসছে না। কিন্তু এইখানেই তো লেখার বাহাদুরী! আশা করি তোমরা কেউ না কেউ এগিয়ে এসে গল্পটিকে 'পক্ষাঘাতমুক্ত' করতে পারবে। তুমিও চেষ্টা করে দেখ না! শ্রীবিজয়া রায় (কর্ণাল)—আইজটনগর. ছাড়ার দুঃখ তা হলে ধীরে ধীরে ভুলতে পারছ? নতুন জায়গায় খাপ খাইয়ে নিতে একটু সময় লাগে বৈ কি! বাঙলা লেখা সম্বন্ধে তুমি যে সংকোচ দেখিয়েছ তার যে সত্যি কোন কারণ নেই তার প্রমাণ স্বরূপ তোমার চিঠির খানিকটা অংশ এবারে ছাপিয়ে দিলাম। দেখো, সকলেরই ভাল লাগবে। জয়ার খবর কি? শান্তিনিকেতনে যাবার পর ওর চিঠি বিশেষ পাই নি।

কিন্তু চিঠি আর বড় করব না। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। —ইতি রাঃ সঃ

—খেলাধূলার কথা—

এখন ক্রিকেটের মরশুম চলছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থেকে আলেক্জাণ্ডারের নেতৃত্বে শক্তিশালী একটি দল এসেছে ভারতে। ভারতের সঙ্গে তাদের পর পর তিনটে টেষ্ট ম্যাচ্ও হয়ে গেছে।

বোম্বাইএ প্রথমে টেষ্টে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হবার কথা ছিল গোলাম আমেদের। তিনি খেলতে না পারায় উমরিগরের ওপর সেই ভার পড়ে। এই খেলাটি শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস ২২৭, ২য় ইনিংস—৩২৩ (৪ উইকেটে)। সোবার্স একাই করেন ১৪২, নট আউট থেকে। প্রত্যুত্তরে ভারত করে প্রথম ইনিংসএ ১৫৭, ২য় ইনিংসএ ২৮৯ (৫ উইকেটে)। এর মধ্যে ২য় ইনিংসএ পঙ্কজ রায়ের ৯০ রান্ উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় টেষ্ট হয় কানপুরে। এবারে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ভারতকে তিন উইকেটে হারিয়ে দেয়। গোলাম আমেদ ছিলেন এবারে ভারতীয় দলের নেতা। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের রান্ হয় ১ম ইঃ ২২২, ২য় ইঃ ৪৪৩ (৭ উইকেটে)। সোবার্স্ এবারেও ২য় ইনিংস্এ একা ১৯৮ রান্ তোলেন, আর ভারতীয় দলের বোলার গুপ্তে প্রথম ইনিংসের ৯ খানা উইকেট একাই নেন, ১০২ রানে। ভারতীয় দল ১ম ইনিংসএ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ঠিক সমান (২২২) রান্ তুললেও ২য় ইনিংসএ তোলে মাত্র ২৪০।

কিন্তু তৃতীয় টেষ্টে কলকাতার মাঠে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ভারতকে অতি বিশ্রী ভাবে হারিয়ে দিয়েছে। বলতে গেলে ভারত এই ম্যাচে বিপক্ষ লের সামনে দাঁড়াতেই পারে নি, পূরো এক ইনিংস ও ৩৩৬ রানে পরাজয় বরণ করেছে। এই খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের কানহাইয়ের খেলার কথা ক্রিকেট-রসিকরা বহু দিন মনে রাখবেন। কানহাই একাই করেন ২৫৬ রান্। কানহাই ছাড়া এবারেও সোবার্স এবং বুচার সেঞ্চুরি করেন। ৫ উইকেটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৬১৪ রান্ করে ডিক্লেয়ার করলে ভারত প্রত্যুত্তরে ১ম ইনিংসএ ১২৪ রান্ করে ফলো অন্ করতে বাধ্য হয় এবং ২য় ইনিংসএও

নৈরাশ্যজনক ভাবে খেলে ১৫৪ রান্ করে সকলে আউট হয়ে যায়। ভারতের এই শোচনীয় পরাজয়ে স্বভাবতঃই চারদিকে খুব বিরূপ সমালোচনা চলছে।

ওদিকে অষ্ট্রেলিয়ায় ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট ম্যাচও চলছে প্রায় একই সময়ে। ইংল্যাণ্ডের দল এবারে খুব শক্তিশালী ; কিন্তু হলে হবে কি, অষ্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ২টি টেষ্টেই হারিয়ে দিয়েছে। ১ম টেষ্ট :—ইংল্যাণ্ড—১৩৪ ও ১৯৮, অষ্ট্রেলিয়া ১৮৬ ও ১৪৭ (২ উইকেট)। ২য় টেষ্ট :—ইংল্যাণ্ড—২৫৯ ও ৮৭, অষ্ট্রেলিয়া—৩০৮ ও ৩৯ (২ উইকেটে)।

—তুমি কি জান—

হরতাল :

আজকাল নানা জায়গায় কথায় কথায় ধর্মঘটের রেওয়াজ হয়েছে। এজন্য অনেক সময় হাট-বাজার, দোকানপাটও বন্ধ রাখা হয়—চলতি কথায় তাকেই বলে হরতাল। হরতাল কথাটার উদ্ভব কি করে হ'ল ? কথাটা এসেছে 'হরিতাল' থেকে। হরিতাল হচ্ছে এক রকম হলদে রংএর রাসায়নিক পদার্থ. ইংরেজীতে ওর নাম অর্পিমেণ্ট। প্রাচীন কাল থেকেই এদেশে ওর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। আলাউদ্দীন খলজী যখন দিল্লীর সম্রাট্ তখন তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর নানা রকম নিয়ম-কানুন বেঁধে দেন। তাঁর হুকুমে একজন করে সরকারী কর্মচারীর (শাহান-ই-মণ্ডী—বা বাজারের তত্ত্বাবধায়ক) ওপর প্রত্যেক বাজার নিয়ন্ত্রণের ভার থাকত। যে দিন বাজার বন্ধ থাকত সেদিন তিনি নির্দেশ স্বরূপ তাঁর কাছারীর দেয়ালে হরিতাল দিয়ে হলদে চিহ্ন এঁকে দিতেন। তাই দেখে লোকে বুঝত আজ বাজার বন্ধ থাকবে। সেই থেকে হরিতাল কথাটাতেই বাজার বন্ধ বোঝাত। লোকের মুখে এই হরিতালই দ্রুত উচ্চারণে 'হরতাল'এ রূপান্তরিত হয়েছে।

তপশীলী সম্প্রদায় :

হিন্দু সমাজের অনুন্নত সম্প্রদায়কে আজকাল বলা হয় তপশীলী সম্প্রদায়। ভারত শাসনতন্ত্রে এঁরা, অনুন্নত বলে, এখনও কতকগুলি বিশেষ সুবিধা পাচ্ছেন। কিন্তু এঁদের তপশীলী নাম দেওয়া হ'ল কেন ? তপশীলী বলে সত্যি কোন জাত নেই, আসলে তপশীল হচ্ছে একটি আরবী শব্দ। ওর মানে বিবরণ বা ফর্দ। এদেশে আদালতের দলিলপত্র সব এক সময় ফারসীতে লেখা হ'ত। অনেক আরবী শব্দও তার মধ্যে ছিল। এখনও আদালতে যে সব বাংলা দলিলপত্র লেখা হয় তাতে প্রচুর ফারসী শব্দ মেশান থাকে। সাধারণতঃ এই সব দলিলের শেষ দিকে একটা করে ফর্দ বা বিবরণ দেওয়া থাকে—দলিলে উল্লিখিত

বিষয়ের বিবরণ। একে বলা হয় দলিলের তপশীল। এখন, ইংরেজ আমলেই, অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য যখন আইনে কতকগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল তখন কোন্ কোন্ সম্প্রদায় এই সুযোগের অধিকারী হবেন তাঁদের একটা তালিকাও যুড়ে দেওয়া হ'ল আইনের শেষে এক তপশীলের অর্থাৎ ফর্দের মধ্যে। সেই থেকে যে সব সম্প্রদায়ের নাম এই তপশীলে তালিকাভুক্ত হয়েছে তাঁদেরই বলা হয় তপশীলী সম্প্রদায়।

নকল গ্রহ

রাশিয়া যখন নকল উপগ্রহ স্পুটনিক ছাড়ল আর সেই স্পুটনিক পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের মত ঘুরতে লাগল তখন সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অল্প দিন পরেই তার চেয়েও অনেক বড় কৃতিত্ব যে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা দেখাতে পারবেন এ কেউ ভাবে নি। কিন্তু সত্যিই তাঁরা তা সম্ভব করেছেন। রকেটের সাহায্যে তাঁদের নতুন স্পুটনিক চাঁদের পাশ ঘেঁষে ছুটে বেরিয়ে গেছে আরও লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে—এবং শেষ পর্যন্ত সেটি পৃথিবীর মতই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সুরু করেছে। হিসেব করে দেখা গেছে মানুষের তৈরী এই নকল গ্রহ প্রতি ১৫ মাসে একবার করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবে—পৃথিবী যেখানে করছে ১২ মাসে। কি করে এই অদ্ভুত কাণ্ড বিজ্ঞানীরা হাসিল করলেন তার বিশদ বিবরণ এখনও জানানো হয় নি। যখন হবে তখন তোমাদেরকেও তা বলবার চেষ্টা করব। আপাততঃ শুধু অবাক্ হয়ে বাহবা দেওয়া ছাড়া কিছু করবার আছে কি?

চিঠি

শ্রীবিজয়া রায়

শ্রীচরণেষু—সম্পাদক মশাই,

•• আমরা আইজট্নগর থেকে পাঞ্জাবের কার্ণালে বদলী হয়ে আসার পর আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম। প্রথমটা এখানে এসে বড় একা একা লাগত। কিন্তু এখন আমাদের

সকলকারই নতুন জায়গায় অল্প মন বসেছে, তার প্রধান কারণ এই যে এখানে যে ক'জন বাঙালী আছেন তাঁরা সকলেই খুব উৎসাহী এবং মিশুকে। আমরা এর মধ্যে এদিক্কার কয়েকটা জায়গা দেখে নিলাম। এখানকার সব বাঙালীরা মিলে প্রায় কুড়ি জন গিয়েছিলাম ভাকরা ও নাঙ্গাল ড্যাম দেখতে। প্রথমতঃ দল বড় এবং মনের মত হওয়ার জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ জায়গাগুলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য খুব আনন্দ করেছি দু'দিন। নাঙ্গাল তৈরী শেষ হয়ে গেছে কিন্তু ভাকরার এখনও দেরী আছে। ভাকরার দৃশ্য খুবই সুন্দর। বিরাট বিরাট পাহাড় চারিদিকে, মধ্যিখানে ড্যাম। এই রকমই দুই বিরাট পাহাড়ের মধ্যে একটা সেতুর মত ড্যামটা হবে। এখানে এলে মনে হয় শতদ্রু নদী যেন বিপুল বেগে আসতে আসতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে।

এর পর আমরা জয়পুর আজমীর, পুষ্কর ইত্যাদি বেড়াতে গিয়েছিলাম। অম্বরের প্রাসাদ অপূর্ব্ব লাগল। এই প্রাসাদে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের আরাধ্য দেবী যশোরেশ্বরী কালীমূর্ত্তি আছে। (মহারাজ প্রতাপাদিত্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। একই বংশে আমাদের জন্ম।) এই মূর্ত্তি রাজা মানসিংহ যশোর জয় করার পর সেখান থেকে নিয়ে এসে ওখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে দেবীর পূজারীকেও সঙ্গে এনেছিলেন। সেই পূজারীর বংশধর যিনি এখন আছেন, বাবার পরিচয় পেয়ে আমাদের খুব আদর-যত্ন করলেন। পুষ্কর তীর্থে বাবা-মা পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করলেন। পুষ্কর থেকে সাবিত্রী পাহাড়ে সাবিত্রী দেবীর মন্দির দর্শন করতে গেলাম। প্রায় তিন মাইল খাড়াই ভেঙে মন্দিরে উঠতে হ'ল। সাবিত্রী পাহাড়ের উপর থেকে পুষ্কর সহরটা ছবির মত সুন্দর দেখায়। আজমীরে সবচেয়ে সুন্দর লাগল আন্নাসাগর লেক। তিনদিকে পাহাড়, আর একদিকে বিরাট মার্বেল পাথরের চত্বর। এই চত্বরটা মোগল সম্রাট্ শাহজাহান তৈরী করিয়েছিলেন। লেক্টা মস্ত বড়, আর ওর ধারে পাহাড়ের উপরের বাড়ীগুলো অদ্ভুত রকম সুন্দর দেখাচ্ছিল।

বেশ আনন্দে কয়েকদিন কেটেছিল, তাই আপনাকে সব লিখলাম।•• ইতি বিজয়া রায়

'চিনতে পার'-র (পৃঃ ৪২৫-২৬) উত্তর: ১। বিজ্ঞানী মার্কনী ২। কবি কীট্স্ ৩। সী-য়্যানিমোন ও হার্মিট ক্র্যাব্ ৪। পিসার হেলান স্তম্ভ ৫। কীটভোজী কলস গাছ ৬। ভেনিসের রিয়াল্টো সেতু।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। গরুড়। ২। অশ্বত্থ ৩। শিলং (শি সে (স্ত্রীলোক), লং লম্বা) ৪। সিংহল।

উত্তরদাতাদের নাম:—অশোককুমার ঘোষ ও তার আত্মীয়বন্ধুরা (নিউ দিল্লী); অমিতাভ ও অশোকনাথ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর); নূরজাহান বেগম (ঢাকা); কল্যাণী রায় (বেহালা); শিবচরণ মাইতি (মেদিনীপুর); খোকা ও যোচন (কলিকাতা-২৮); শান্তি ও মুক্তি (কলিকাতা-২৯); শ্যামলী ও রূপালী সেন (এলাহাবাদ); মানবেন্দ্র দত্ত (পাটনা); মৃণালিনী দেবী (বনারস), নটু, বটু ও খুকু (কলিকাতা-২৬), রত্নাবলী ও সুচেতা ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা-২৫)।

নূতন ধাঁধা

আমাদের ভুলে দা' সব কথাই হেঁয়ালীতে বলতে ভালবাসে। সেদিন ছেলেদের আসরে সে গল্প করছিল। তার গল্পের একটু নমুনা তুলে দিচ্ছি. তারই ভাষায়—

"তার পর আমি তো সুন্দর একটা বাড়ী চিবুতে চিবুতে রওনা হলাম। সামনেই একটা পাহাড়, কিন্তু পাহাড় হলে কি হবে আসলে সেখানে লোকে স্নান করে। সেখানে একটা বড় গাছ দেখে ভাবলাম তার নীচে গিয়ে বসব, কিন্তু গাছের সামনে ছিল কাঁটা আর বসতে গিয়ে তার শেষটাও সামলাতে পারলাম না। ফলে একদম অনেকগুলো পা! তারই মধ্যে যেন ভাবছি কোথায় যাই। মানুষের পথে গেলে কেমন হয়? বেশ বাংলা-ইংরেজী মেশান দেশ হবে! কিংবা আরও দূরে সবুজ দেশে যদি যাই? এমন সময় সামনে এসে দাঁড়ালেন এক মস্ত রাজা। চেয়ে দেখি তাঁর পেছনে শত্রু। বললেন, আমি রাজবাড়ী থেকে আসছি। সেখানেই চল। যাদছি তখন আমার অনেকগুলো পা, তাই বলে কি সেগুলো নিয়ে গোলাকার হয়ে যাব?"

বুঝতে পারলে কিছু? যেখানে যেখানে কথায় হেঁয়ালী মেশান আছে সেগুলি বুঝিয়ে দিতে পার?

(রামধনু হাতে পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব দেবে।)

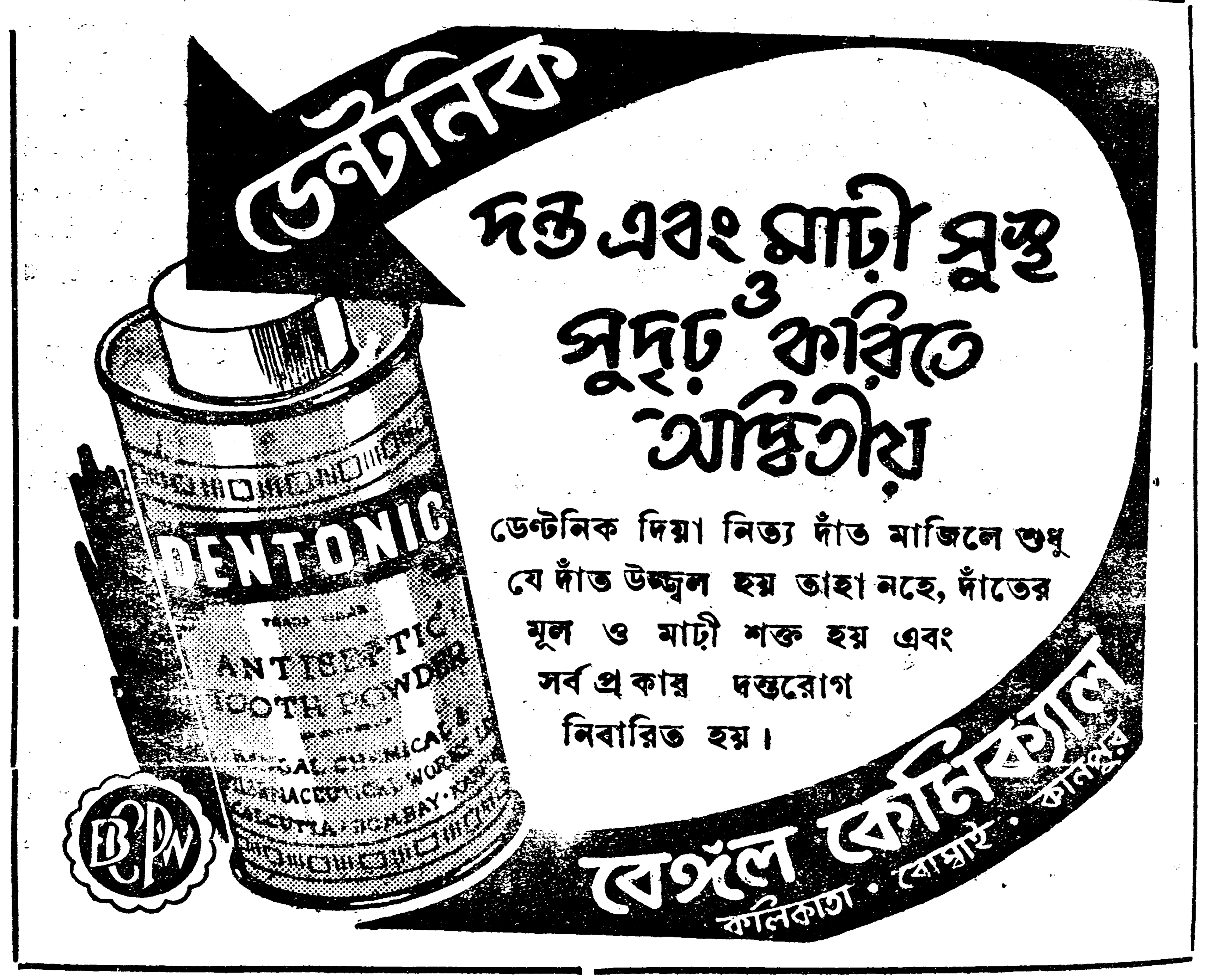

শুকতারা

ফাল্গুন মাসে দ্বাদশ বর্ষে পড়বে

প্রতি সংখ্যা আট আনা
বার্ষিক চাঁদা পাঁচ টাকা
ষাণ্মাসিক চাঁদা পূর্ব্বের মত
আড়াই টাকা

= নীহার রঞ্জন গুপ্তের =
বিষের তীর—১৲ রাতের আতঙ্ক—১৲
রক্তমুখী ড্রাগন—১৲

✻ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ✻
দেড়শো খোকার কাণ্ড
দাম এক টাকা চার আনা

অপরাজিতা-৪৲
ঠানদিদির থলে-৩৲
সুনির্মল বসুর
বরণ ডালা-২৲
আশাপূর্ণা দেবীর
গল্প ভালো আবার বলো-২৲

= নরেন্দ্র দেবের বাছাই করা গল্প =
অনেক দিনের অনেক কথা —২৲

= আশাপূর্ণা দেবীর বাছাই করা গল্প =
শোনো শোনো গল্প শোনো —২৲

= দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত =
ভূত পেত্নী দত্যি দানা —৩৲
ঠাকুরমার ঝুলি —৩৲
পুরনো দিনের পুরনো গল্প —৩৲

আজই গ্রাহক হও

শ্রীননীগোপাল মজুমদারের

শব্দ-ভারতী

ছোটদের অভিনব অভিধান
আনুমানিক ৫০ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে।

কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য যাহারা আগে নিজেদের নাম গ্রাহক তালিকাভুক্ত করিবে, শুধু তাহাদের কাছেই বিক্রয় করা সম্ভব হইবে।

গ্রাহক তালিকাভুক্ত হইতে কোন পয়সা লাগে না।

অভিজিৎ প্রকাশনী
৭২।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু-র
(অ-কৃ-ব)

খামখেয়ালী ছড়া

(ছোটদের হাসির কবিতা)

দাম—১'৫০ (দেড় টাকা)

প্রকাশ করেছেন
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭

শ্রীচরণেষু

ফোন : ৫৫-৪০৪৬

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা—গোরাচাঁদ দাশগুপ্ত

* নতুন আদর্শ এবং পরিকল্পনা নিয়ে প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই প্রকাশিত হয়।
* নীট্ আয় দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যয়িত হয়।
* 'বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর লেখা' এবং 'বিদ্যালয়ের খবর' বিভাগ দু'টি আমাদের সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পিত।
* প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকদের রচনায় প্রতিটি সংখ্যা সুসমৃদ্ধ।

বার্ষিক (সডাক) ৩৲ ষাণ্মাসিক (সডাক) ১৷৹ প্রতি সংখ্যা ।৹

অন্যান্য বিষয়ের জন্য কর্মসচিবের সহিত পত্রালাপ করুন।

সম্পাদক
শ্রীননীগোপাল দত্ত

'শ্রীচরণেষু' কার্য্যালয়,
৪বি রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৫

জ্যোতির্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ॥৹ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১॥৹ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্বিবজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বি.এ

Regd. No. C– 1641

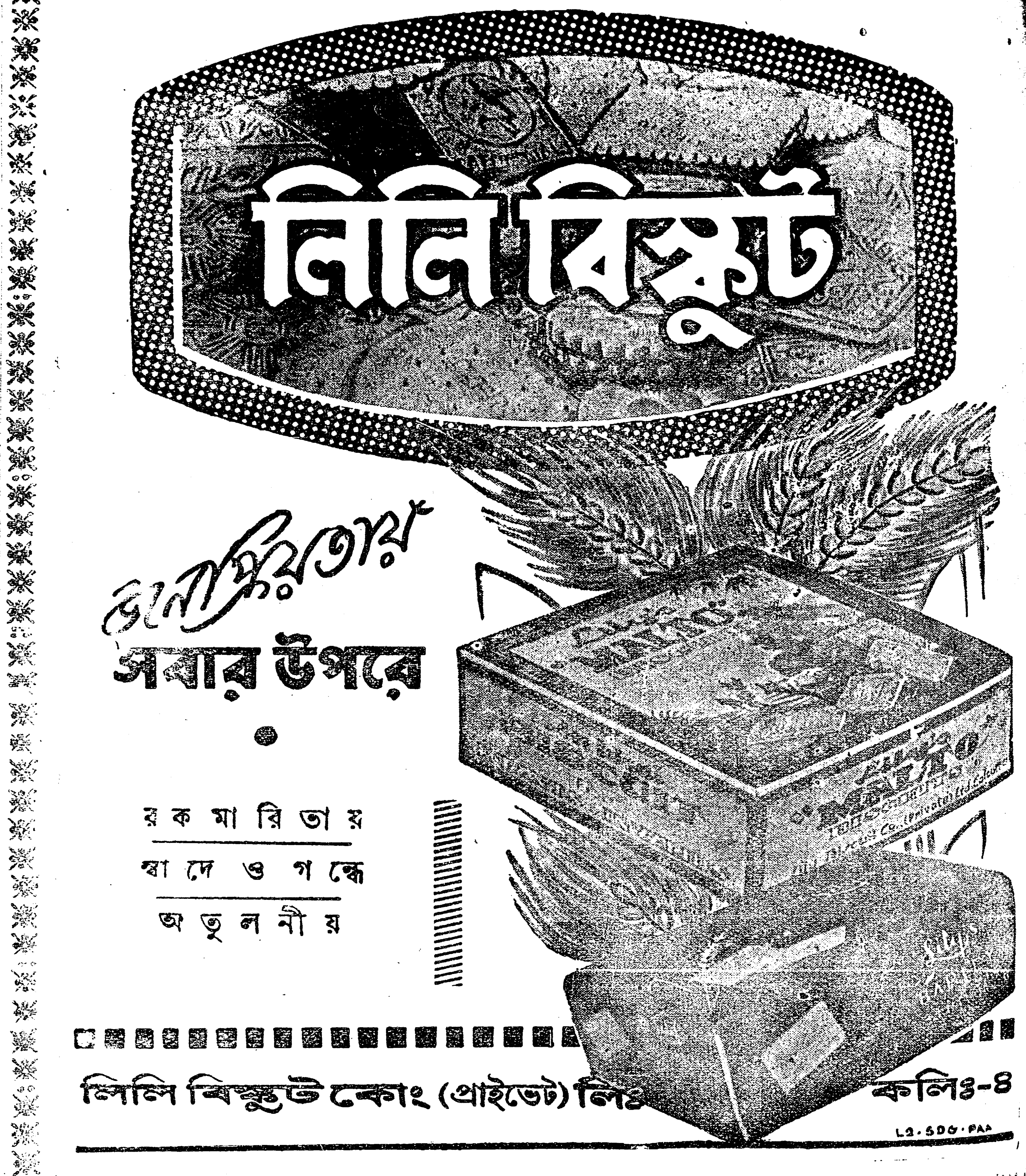

স্থাপিত - ১৩৩৭ ফোন-৩৫-২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পতাকা মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

৴২৷৷০,৴৫,।৮ সেরা ডাইস্ টীনে,

মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ- শ্রীঅমৃত লাল কুমার।

মিলও অফিস - ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য সডাক ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২ টাকা ২৫ ন. প., প্রতি সংখ্যা ৩৭ ন প. ভি.পি তে নিলে আরও অতিরিক্ত ৭১ ন. প. লাগে। নমুনার জন্য ৩৯ ন. প.র ডাকটিকেট পাঠাতে হয়। বিনামূল্যে নমুনা পাঠানো সম্ভব নয়। ভি পি.তেও নমুনা পাঠানো হয় না।

২। বৈশাখে বছর সুরু. যে কোনও মাসে চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যায়; কিন্তু পত্রিকা নিতে হবে বৈশাখ কিংবা কার্ত্তিক থেকে। তবে এতে অসুবিধা হলে মাঝের সংখ্যাগুলো খুচরা হিসাবে নিয়ে বৈশাখ বা কার্ত্তিক থেকে নিয়মিত ভাবে নেওয়া যেতে পারে।

৩। কোন মাসে পত্রিকা না পেলে ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে তাঁদের উত্তরসহ সেই মাসের মধ্যে আমাদের জানাতে হবে।

৪। পাকিস্তানের গ্রাহকেরা ব্যাঙ্ক মারফৎ (যে সব ভারতীয় ব্যাঙ্কের পাকিস্তানেও শাখা আছে) ড্রাফ্‌ট্এ চাঁদা পাঠাতে পারেন। এর নিয়মকানুন ব্যাঙ্কে খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। আমাদের লিখলে আমরা Proforma Invoice পাঠাতে পারি।

৫। গ্রাহকদের সব চিঠিতেই গ্রাহক নং দিতে হবে। চিঠির জবাবের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাকটিকেট দিতে হবে।

৬। লেখা, কপি রেখে, সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। সাধারণ বিভাগে যে কেউ লেখা পাঠাতে পারেন। তা ছাড়া গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখায় উৎসাহ দেবার জন্য একটি পৃথক্ বিভাগও আছে।

৭। বিজ্ঞাপনের হার চিঠি লিখলে জানানো হয়। টাকাকড়ি. চিঠিপত্র প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা— ম্যানেজার, রামধনু; ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫। (টেলিফোন : ৪৮-৩১৮১)

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনের মতামতে
কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে ?

স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,
'থিনের' মধ্যে; গুনে, স্বাদে সবার সেরা "কোলে"

অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,
সবরকমের "কোলে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড, সুলেখা পার্ক
কলিকাতা-৩২ হইতে প্রচারিত।

অতীতের পৃথিবী

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩১ শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৬৫ { ১০ম সংখ্যা

ঘুম

শ্রীশান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়

এই রাত চুপ্ চুপ্ কালো নিঝ্ঝুম—
পিয়ালের বন দেখি মাখানো কাজল ;
আকাশের চোখে দেয় হাতছানি ঘুম
জোনাকিরা টিপ্ টিপ্ ; দুলছে হিজল।

ঘুম আসে, ঘুম আসে, সে আসে রে,
ঝাউবনে লাগে হাওয়া, তোলে মর্মর ;
ঘুম ভাসে, ঘুম ভাসে, সে ভাসে রে,
পথঘাট চুপচাপ ; মন থর্‌থর্।

রাত-পাখী থেকে থেকে ডাক দিয়ে যায়,
যাদুকাঠি হাতে আসে সাগরের ঘুম ;
নিম ফুল থেকে থেকে আড়চোখে চায়,
ঘুম আসে, ঘুম আসে, কালো নিঝ্ঝুম্।

পশ্চিম দিগন্তে

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

এর আগে দ্বারকার মন্দিরের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলাম রামদাস নামে এক ভক্ত এই মন্দির থেকে মূর্ত্তি চুরি করে নিয়ে যান শংখের দ্বীপে। সেই কথা এবারে বলি।

রামদাস বৈরাগী ছিলেন পরম ভক্ত। দ্বারকার কাছেই তাঁর বাড়ী। কিন্তু তাঁর সারাটা দিনই কাটতো রণছোড়জীর মন্দিরে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসে বসে তিনি নামগান করতেন। সন্ধ্যারতি শেষ হলে রাতে বাড়ী ফিরতেন, আবার চলে আসতেন অতি প্রত্যূষে।

দেখতে দেখতে বৈরাগীর বয়স হয়ে গেল আশী বছর। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় এতটা পথ যাতায়াত করা আর সামর্থ্যে কুলায় না। তার উপর আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অথচ রণছোড়জীর কাছে গিয়ে নামকীর্ত্তন করতে না পারলে মনে শান্তি পান না। অসুস্থ দেহেই লাঠি ভর করে তিনি যাতাযাত করেন। রণছোড়জীকে বলেন—প্রভু, তোমার কাছে এসে একটু নামগান করবো সেটুকু থেকেও তুমি আমাকে বঞ্চিত করবে?

শেষ রাতে রণছোড়জী স্বপ্ন দিলেন, বললেন—আমার কাছে তুই আসবি কেন! আমাকে নিয়ে চল্ তোর বাড়ী, আমি তোর কাছেই থাকবো।

—আমার মত অধম মানুষ কি করে তোমাকে আনবে প্রভু?

—মাঝ রাতে পিছনের দরজায় গাড়ী নিয়ে যাস, আমায় তুলে আনবি, কেউ টের পাবে না।

বৈরাগী রাত্রে গাড়ী নিয়ে এলেন মন্দিরের পিছনের দরজায়। রুগ্ন, আশী বছরের বৃদ্ধের দেহে কি করে শক্তি এলো কে জানে, রণছোড়জীকে তিনি তুলে নিয়ে এলেন গাড়ীতে। কেউ টের পেলে না।

প্রত্যূষে মন্দিরের পুরুত ঠাকুর তো অবাক্। সিংহাসন শূন্য, পিছনের দরজা খোলা। কে দরজা খুললো? কে বিগ্রহ চুরি করলো? খোঁজ। খোঁজ!

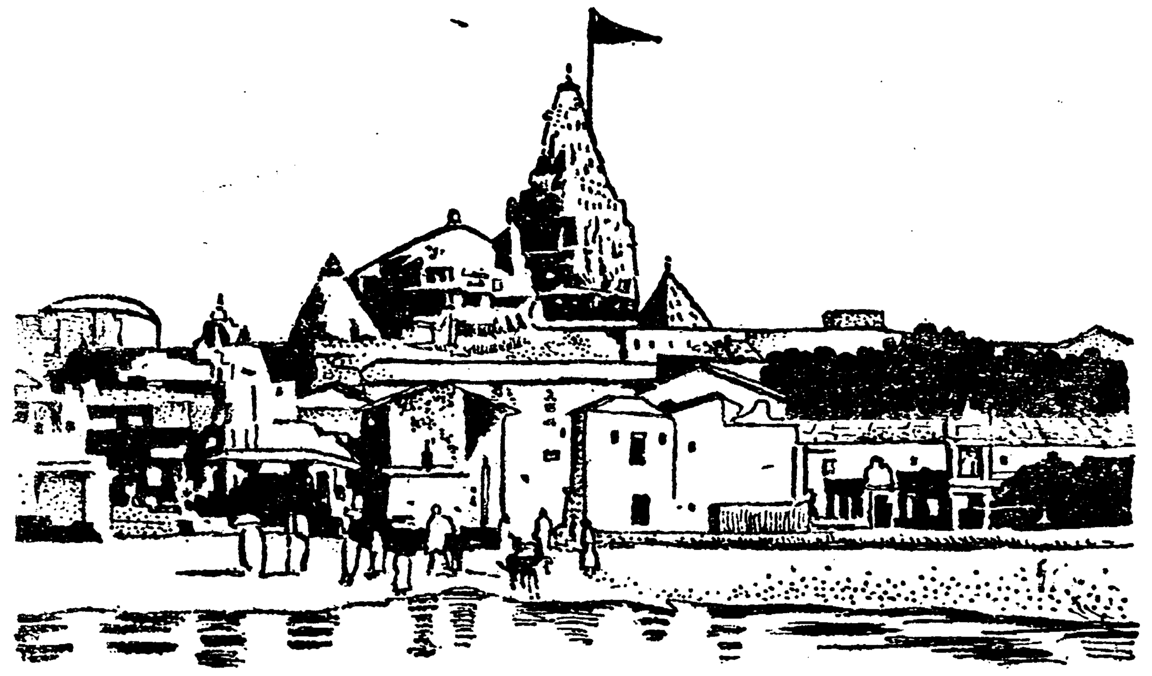

দ্বারকার মন্দিরের সামনের ঘাট

রামদাস বৈরাগী বেশী দূর যেতে পারেন নি। সবাই গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললো। পাশেই ছিল এক পুষ্করিণী। রণছোড়জী বললেন—আমাকে পুকুরের মধ্যে ফেলে দে!

রামদাস শ্রীকৃষ্ণকে পুকুরের জলে ডুবিয়ে দিলেন।

পাণ্ডারা কিন্তু ছাড়লো না। শেষ রাতে অনেকে দেখেছে বৈরাগীকে গাড়ী করে ঠাকুর নিয়ে যেতে। বৈরাগীকে তারা রীতিমত প্রহার দিল,—বল্, ঠাকুর কোথায় রাখলি?

বৃদ্ধ রামদাস, প্রহারে জর্জ্জরিত। সারা অঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরছে। কাঁদতে কাঁদতে বললেন—প্রভু, সারা জীবন তোমাকে ডাকলাম, আজ এইভাবে তুমি তার পুরস্কার দিলে? তুমি আমাকে পরীক্ষা করছ প্রভু, আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়বো না।

ইতিমধ্যে পাণ্ডারা 'বাউনি পুকুর' থেকে বিগ্রহ তুললো। মূর্ত্তি তুলেই তারা চমকে গেল। রণছোড়জীর কালো পাথরের মূর্ত্তি থেকে রক্ত ঝরছে। এ কি! এ কি! তবে কি ভক্তের দেহের আঘাত দেবতার গায়ে এসে লেগেছে? রামদাসের পায়ে ধরে সবাই ক্ষমা চাইল। রামদাস বললেন—কিন্তু এ ঠাকুর তো আমি ছাড়বো না!

পাণ্ডারা বললেন—এ তো চুরি নয়, এ রণছোড়জীর ইচ্ছা। ভক্তের কাছে তিনি থাকতে চান, ঠাকুর নিয়ে রামদাস যেখানে খুসি যাক্!

রণছোড়জীকে কোলে নিয়ে রামদাস ফিরে এলেন নিজের ঘরে।

শ্রীকৃষ্ণ সেই রাত্রেই পাণ্ডাদের স্বপ্ন দিলেন—গরীব বৈরাগী আমার পূজা করবে কি দিয়ে? আমার ওজনের সোনা দিস্ ওকে।

সবাই মিলে রামদাসকে সোনা এনে দিল। সেই পয়সায় রামদাস মন্দির তুললেন।

কিন্তু দ্বারকার মন্দির কি শূন্য থাকবে?

ঠাকুর স্বপ্ন দিলেন—না রে, না, ওখানে আমার বিজয়মূর্তি স্থাপনা কর।

মন্দিরে এখন যে মূর্তি আমরা দেখি তা সেই রণছোড়জীর বিজয়মূর্তি।

আরতি সুরু হবার আগেই পুরোহিত এসে আমাদের কাছ থেকে মালাগুলি নিলেন। একে একে মালাগুলি তিনি পরিয়ে দিলেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে। তার পর সুরু হলো সন্ধ্যারতি।

আরতি শেষ হলো। যাঁরা আরতি দেখছিলেন এবার তাঁরা মন্দির প্রদক্ষিণ করলেন। আমরা তাঁদের অনুগামী হলাম। দ্বারকাধীশের মন্দিরকে ঘিরে আরো কয়েকটি মন্দির আছে প্রাঙ্গণের চারিপাশে। লক্ষ্মী, রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী প্রভৃতির মন্দির। কিন্তু সব থেকেও সারা মন্দিরটি যুড়ে কেমন যেন একটা বিষাদের ভাব। মনে হয় চারিপাশে যেন একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। এই দ্বারাবতীকে একদিন শ্রীকৃষ্ণ নিজ ব্যক্তিত্বে সারা ভারতের রাজনীতির কেন্দ্র করে তুলেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে সেখানে যে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিল তা যেন আজও এর পরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। ভাবপাগল ভক্তের বুকে এই বিষাদ জমাট বাঁধে, দীর্ঘশ্বাসে চোখের জল তখন আর বাধা মানে না। এখানে যারা আসে তারা কাঁদে। যুগে যুগে মানুষ যাঁকে স্মরণ করে কাঁদে, যাঁর মূর্তি গড়ে হাজার হাজার বছর ধরে পূজা করে, শ্রীচৈতন্যের মত অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক সারা জীবন ধরে যাঁর নাম গান করে তৃপ্তি পেলেন না, তাঁর যুগে কি অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ তিনি ছিলেন, তা আমরা ধারণাও করতে পারি না।

কোন এক সময় আর পাঁচজনের সঙ্গে ধীরপদে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি। আনমনা হয়ে যাই।

তোরণের সামনে একটি ছোট্ট ছেলে এসে সহসা আমার হাত ধরে বলে—পয়সা দে।

পাঁচ-ছ' বছরের ফুটফুটে একটি ছেলে, পাণ্ডার ছেলেই হয়তো। মুখখানি বড়

স্নিগ্ধ। দ্বারকাধীশের দু'টি চোখের সঙ্গে এর চোখ দু'টির কোথায় যেন একটা মিল আছে বলে মনে হয়। বলি—পয়সা কি হবে?

—মিঠাই খাবো। কিষণজীকে ফুল দিলি, আমায় পয়সা দে।

ভারি মজার কথা। ঠাকুরকে ফুলের মালা দেওয়ার সঙ্গে এই শিশুকে পয়সা দেবার কি সম্পর্ক আছে? তবে অতীত কাহিনীর একটা ক্ষীণ চিত্র মনের গভীরে একটা সম্পর্ক রচনা করে। অতীতের সেই প্রাচীন যুগে এমনিই এক সুদর্শন শিশু মথুরার ঘরে ঘরে ননী চেয়ে খেতো। দ্বারকায় তাঁকে স্মরণ করেই যখন মাল্যার্ঘ্য দিচ্ছি, তখন এই শিশুকেই বা মিঠাই খাবার পয়সা দেবো না কেন? আবার আধুনিক কালের যুক্তি এই দাবীটাকেই আরো দৃঢ় করে। সে বলে প্রাণহীন দেবতার চেয়ে প্রাণবন্ত এই শিশু জাতীয় জীবনে যে অনেক বেশী সম্পদ্, এর দাবী তো দেবতার আগে!

ছেলেটির হাতে একটি আনি দিলাম। চকচকে নতুন আনিটি সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো, তারপর আমার মুখের পানে তাকিয়ে হাসলো। সে হাসিতে মন ভরে ওঠে।

এক দৌড়ে ছেলেটি মন্দিরমধ্যে চলে গেল। আমিও নেমে এলাম পথে।

মন্দিরের পাশ দিয়ে আমরা বাজারে এসে পড়লাম। পশ্চিমের আর পাঁচটা তীর্থস্থানের বাজার যেমন হয়, এখানকার বাজারও সেই রকম। সব কিছুই পাওয়া যায়, তবে বাসন, খেলনা ও কাপড়ের দোকানই বেশী। এই সব জিনিষই তীর্থযাত্রীরা এখানে বেশী কেনে। ফিরে গিয়ে আত্মীয়দের কাছে এই সব পাঠায় তীর্থস্থানের উপহার স্বরূপ। ভবেশ কয়েকটি দোকানে গুজরাতী 'কাছেড়ী' (পাড়ওয়ালা চাদর), 'ভারেরা' (হাতে-বোনা পশমের চাদর) ও 'কাঁড়িয়া' (ফ্রক কোট) খুঁজলো, কিন্তু পেলো না। এগুলি গুজরাতের নিজস্ব জিনিষ। কিন্তু দ্বারকার কোন দোকানে এ সব পাওয়া যায় না, সেখানে আছে যত ছাপা শাড়ী।

আমরা একটা হোটেলের খোঁজ করলাম। কিন্তু গুজারাতী সাইনবোর্ড বোঝবার তো উপায় নেই। যেগুলিকে হোটেল বলে মনে হয়, ঢুকে পড়ি। কিন্তু 'চাউল' (ভাত) খাবো শুনলেই তারা ঘাড় নাড়ে, বলে—হবে না, চাপাটি খেতে হবে। কয়েকটি হোটেল ঘুরে শেষে ভাত খাবার আশা ছাড়তে হলো। এক হোটেলে বসে চাপাটিই খেলাম। ভয়ে ভয়ে খেলাম। কারণ, তার প্রতি গ্রাসেই তো লংকা– আলুর দমের সঙ্গে লংকা, বাঁধাকপির তরকারীতে লংকা, ডালে গোটা গোটা লংকা। শুধু লংকা দিয়েই একটি তরকারী এবং শেষে লেবুর রসে ভেজানো লংকার চাট্‌নী। এরই সঙ্গে কয়েকখানি আলুভাজা, একখানি পাঁপড় ভাজা। শেষে কিছু দই ছিল বলেই রক্ষা।

হোটেল থেকে বেরিয়ে ভবেশ বললো—চাঁদনী রাত, চলুন সমুদ্রতীরে খানিকটা ঘুরে আসি।

কিন্তু তখন সারাদিনের অবসাদ এমন ভাবে দেহের উপর ক্লান্তি জমিয়েছে যে সাগরতটে যাবার আর উৎসাহ পেলাম না। আমরা ফিরে এলাম ধর্মশালায়।

দুই বোন

শ্রীশামুক

সরস্বতী ও সাবরমতী। দুই যমজ বোন যেন। হুবহু একই রকম দেখতে। আরব সাগরের উপকূলে ভারতের পশ্চিম কিনারায় ভেসে ভেসে আসা-যাওয়া করে। ছোট দু'টি জাহাজ। বড় ষ্টিমারও বলা যায়।

বোম্বাই থেকে কোচীন আর কোচীন থেকে বোম্বাই। এই ওদের যাওয়া-আসা। যাবার পথে গোধূলি বেলায় রত্নগিরির সোনালী বেলাভূমি পেরিয়ে যায়। আর রাতের অন্ধকারে চোখ বন্ধ করে এক নিঃশ্বাসে এড়িয়ে যায় গোয়াকে। গোঁয়ার লোকদের রাজত্ব ওখানে—মনে পড়লে বড় কষ্ট লাগে। ভোরবেলায় কালী নদীর মোহনায় ছোট বন্দর কারওয়ারে পৌঁছে বাঁশী হাঁক দেয় খুসিতে ভোঁ ভোঁ—এসেছি, এসেছি গো!

এরপর ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে কুমটা—টাডরী—মালপে—ব্যস্, ম্যাংগালোর। ম্যাংগালোরে অনেক মানুষ, অনেক মালপত্তর ওঠানামা করে। বাকী পথটা যেন ঘুমিয়ে কেটে যায়। ঘন সবুজ বনের ইসারা, ঝিরঝিরে বাতাস আর রাতের আকাশ ভরা তারা—এরা সবাই নেশা লাগিয়ে দেয়। সকালে কোচীন পৌঁছে চোখ রগড়াতে রগড়াতে আপশোস্ জাগে মনে—এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেল সব?

ফেরার পথ ঐ একই, শুধু একবার নীলগিরি পাহাড়শ্রেণীর বেগুনী ছায়ার তলায় দাঁড়াতে হয়—কালিকটে।

জলের জোয়ার-ভাঁটার ওপর যাওয়া-আসা নির্ভর করে। তবু গতি বাড়িয়ে কমিয়ে যতটা সম্ভব একই সময়ের মধ্যে বন্দরগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। কুমটার আশে-পাশে কোন না কোন জায়গায় দু' বোনের দেখা হয়—প্রথম রাত্রি থেকে শেষ রাতের যে কোন সময়ের মধ্যে।

কোচান থেকে এ আসে উত্তরমুখো, আর বোম্বাই থেকে ও আসে দক্ষিণমুখো।

যতটা সম্ভব কাছাকাছি পাশাপাশি দাঁড়ায়। কাপ্তেন থেকে খালাসী পর্যন্ত সকলে জড় হয় ডেকের ওপর। আর হাত নেড়ে চীৎকার করে পরস্পরকে সাদর অভিবাদন জানায়। কত যাত্রীও হঠাৎ ঘুম ভেঙে দৌড়ে আসে কেবিন থেকে, জাহাজের খোলের ভেতর থেকে;—হল্লায় মেতে যায়। সরস্বতী ও সাবরমতী আনন্দের উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপে আর টলমল করে দুলে দুলে ওঠে পরম খুসিতে। দু' দিন বাদে বাদে দেখা হয় কিন্তু এমন করে যেন কত দিন পরে দু'টি বোনে মিললো! প্রথম দেখা হওয়ার সময় থেকেই নাকি এই নিয়ম চলে আসছে বহুদিন।

সেদিন অমাবস্যার রাত। ঝুপ্ ঝুপ্ করে বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশে ঘন কালো মেঘ নীল রঙের সবটুকু আর তারার ঝিকিমিকি একেবারে ঠেসেঠুসে ঢাকা দিয়ে দিয়েছে। বাতাস স্থির। ঢেউ-এর আথালি-পাথালি স্তব্ধ। সমুদ্র যেন ভারী ঘন অন্ধকারের চাপে গুমরে মরছে। কোথায় আকাশ আর কোথায় সাগর বোঝা যায় না—নিশানা নেই এতটুকুও।

সাবরমতী বয়লারের যত জোর সবটুকু কাজে লাগিয়ে ছুটে যাবার চেষ্টা করছে। পথে এন্‌জিন বিগড়ে বেশ দেরী হয়েছে। এখুনি রাত দু'টো, এর অনেক আগেই মালপে বন্দরে কাজ সেরে এগিয়ে যাবার কথা। কিন্তু মালপেই বা এল কই? পথ ভুল হয়নি তো? সাবধানে বার বার দিক্ হিসেব করে চলতে হচ্ছে। একটু আগে ক্যাপ্তেন ডি-সুজা সমস্ত খুঁটিনাটি নির্দেশ জানিয়ে মেট রহমানের কাঁধে এক উৎসাহের ঝাঁকুনি দিয়ে শুতে গেল।

রহমান কালো বর্ষাতি আর মাথা-ঢাকা টুপি পরে চাকা ঘুরিয়ে চলে। সারা শরীর দিয়ে জল ঝরে কিন্তু হাতের ইসারার এতোটুকু ভুলচুক নেই। আর চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অন্ধকার ফুঁড়ে ফুঁড়ে জলের ওপর ঘুরে বেড়ায়। যত কম ঝাঁকুনি লাগে, যত কম দোলা খাওয়া যায় সেই রকম আন্দাজ করে সাবরমতীকে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। আহা, যাত্রীরা যারা ঘুমাচ্ছে তারা আরাম করেই ঘুমাক। বাতাস যখন নেই বললেই হয়, আর ভাঁটার সময় যখন জলের গতি কম, তখন সমস্ত জোর দিয়ে জাহাজ চালানো মোটেই সহজ নয়। কিন্তু সহজ কাজ তো সকলেই করতে পারে।

রহমান হঠাৎ সজাগ হয়ে ওঠে। কাল স্তূপটা কি? বর্ষাতির ভেতর থেকে গলায় ঝোলানো দূরবীণ বার করে দেখে ছোট একটি জাহাজ যেন চরায় আটকে কাৎ হয়ে পড়েছে। সমুদ্রে যাওয়া-আসার শক্ত আইনে কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করতে হয়। কিন্তু মানুষের চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায় না, কোন সাড়া-শব্দ তো দূরের কথা! সকলে মরে গেছে নাকি? মাত্র একটি ছোট আলোর আন্দাজ পাওয়া যায়।

ডি-সুজাকে ডাকতে সে দেখে-শুনে রহমানকে বলে,—ছোট নৌকো নামিয়ে চারজন খালাসী নিয়ে যাও, দেখে এস ব্যাপার কি। তা ছাড়া তোমার বড় লাভও হয়ে যেতে পারে।

এই 'লাভ'ও একটি সমুদ্রের আইন। জলের ওপর কোন পরিত্যক্ত জাহাজ যে নাবিক প্রথম দখল করবে মাল শুদ্ধ সেটা তারই হয়ে যাবে।

দড়ির মই দিয়ে উঠে রহমান যেই সঙ্গীদের নিয়ে ঐ জাহাজের ডেকে লাফিয়ে পড়ল, ছ'জন লোক একটা কেবিন থেকে বেরিয়ে এল—যেন আওয়াজ শুনেই বেরিয়ে এসেছে।

করুণ সুরে বড় দুঃখের কাহিনী বলে গেল। চরায় আটকে জাহাজ বিকল। এদিকে সঙ্গীদের অসুখ, তার ওপর জল নেই এক ফোঁটা—জল চাই এখুনি। আবছা আবছা রহমানের এতোক্ষণে চোখে পড়ে সামনে পিছনে কয়েকটা লোক শুয়ে আছে ডেকের ঢাকা জায়গাটার নীচে—কোন সাড় নেই। রহমান চেঁচিয়ে খবর দেয় সাবরমতীকে,—জল পাঠাও এখুনি।

ওদের আরো দুঃখের কথা শুনতে শুনতে রহমান ভাবে যে আগে কখনো নাবিকদের এতো বেশী ভেঙে পড়তে দেখে নি। নাবিকের জীবনে কঠোর দুঃখ ও কষ্ট নিত্যকার ব্যাপার। নিজের জীবনে দেখেছে, অন্যদেরও নজর করেছে, যখন ভয়ানক কষ্ট তখন নাবিক যেন পাথর বনে যায়। আর এরা ছেলেমানুষের মত হাউ-মাউ করছে! এ রকম লোকেরা জমি কামড়ে পড়ে থাকলেই পারে—সমুদ্রে পাড়ি জমাবার দুরন্ত অভিলাষ কেন? আর বেশী ভাবতে হ'ল না—সব উলটে-পালটে গোলমাল হয়ে গেল।

আরো চারজন সাবরমতীর খালাসী জলের ভারী পিপে টেনে টেনে ওপরে যেই তুলেছে, সেই শুয়ে-থাকা লোকগুলো ধড়ফড় করে উঠে কাঁদুনে ছ'জনের সঙ্গে মিলে এদের হঠাৎ আক্রমণ করে বসলো।

এরা ভাবতেও পারে নি যে এ রকম কিছু হতে পারে। কিন্তু ওরা দড়িদড়ার ফাঁস লাগিয়ে তৈরী ছিল। রহমান শুদ্ধ সকলকে কাবু করতে দেরি হ'ল না।

কিন্তু ওদিকে আবার কি? সাবরমতীর বাকি নাবিকরা রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে এদিকে চেয়েছিল। পিছন থেকে ভূতের মত তিড়িং-মিড়িং করে কতকগুলো লোক তাদের মাথা ফাটাবার জোগাড় করে যে! ওরাও এই ডাকাত দলের লোক। জলে ডুবে লুকিয়ে ছিল, পিছন থেকে উঠে দু' নম্বর আক্রমণ সুরু করেছে। খুব ফন্দী করে আগে থেকে সমস্তই সাজিয়েছে বটে! কিন্তু ওরা জানলো কি করে যে মালপত্তরের সঙ্গে গোপনে কিছু সোনাও যাচ্ছিল কোচীনের পথে?

দু' হাত পিছনে দুমড়ে বাঁধা ডি-সুজা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ মনটা আনন্দে ভরে গেল—কোন শব্দ শোনে নি,—কোন আওয়াজ পায় নি, তবুও। মুখ তুলে তাকাতেই তার দু'চোখ জলে ভরে গেল। বুক দিয়ে ঢেউ ঠেলতে ঠেলতে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে সরস্বতী!

সরস্বতীর সার্চ-লাইটের আলো চারিদিক্ দিন করে দেয়। আশ্চর্য, আলো দেখে বাঁধা লোকগুলো হঠাৎ ভীমের বল পেয়ে গেল। তর তর করে সরস্বতী থেকে নৌকো নামে,—টিকটিকির মত এঁকেবেঁকে মানুষ নামে,—ছুটো বন্দুকের গুলি ডাকাত-জাহাজের গায়ে মোক্ষম টোকা মেরে হুঁশিয়ার করে দেয়—সাবধান, আর নয়। অনেক বেয়াদপি হয়েছে। এবারে বোন এসেছে নিজের বোনকে উদ্ধার করতে।

সরস্বতী ও সাবরমতী ডাকাত-জাহাজকে মাঝখানে রেখে যখন মালপে বন্দরে এসে ঢুকলো তখন ঘন ঘন গুরু গুরু মেঘের মাদল বাজছে, আকাশেও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৃষ্টি হয়ে চলেছে ঝর—ঝর—ঝর।

এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেস

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের এবারকার অধিবেশন বসেছিল দিল্লীতে, দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। এ অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রায় তিন হাজার বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। এ ছাড়া সোভিয়েট ইউনিয়ন, আমেরিকা, বৃটেন, কানাডা, ফ্রান্স, চীন, জাপান ও অন্যান্য দেশ থেকেও ৮৫ জন বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত সব বৈজ্ঞানিক ছিলেন, আর ছিলেন এডিনবরার ডিউক—প্রিন্স ফিলিপ। বৃটীশ এসোসিয়েশন্ ফর্ দি এ্যাডভান্সমেণ্ট অব্ সায়েন্স-এর সভাপতি স্যর আলেকজাণ্ডার ফ্লেক, সুইডেনের উপশালা বিশ্ববিদ্যালয়ের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত টিসেলিয়াস্, কানাডার ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের ডক্টর ষ্টিয়াছি, রাশিয়ার একাডেমিসিয়ান ভিক্টর অ্যাম্বার সুমিয়ান প্রভৃতিও ছিলেন।

তোমাদের মধ্যে যারা রীতিমত খবরের কাগজ পড় বা দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদির সঙ্গে সামান্য পরিচিত, তারা অবশ্যই জান যে বিজ্ঞান কংগ্রেস ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মিলন-ক্ষেত্র। শুধু আমাদের দেশে কেন, পৃথিবীর সব দেশেই বিজ্ঞানীদের

এই জাতীয় সংস্থা আছে যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত বিজ্ঞানীরা একত্রিত হয়ে বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা বা দেশের বৈজ্ঞানিক কর্মধারা সম্বন্ধে নীতি ঠিক করতে পারেন। রাশিয়ার একাডেমী অব্ সায়েন্স, বিলাতের ব্রিটিশ এসোসিয়েশন, আমেরিকার ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট এই জাতায় প্রতিষ্ঠান। কাজেই আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে আমাদের বিজ্ঞান কংগ্রেসের কর্মধারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া গত এক বছরের মধ্যে, যে সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা বিস্ময়কর আবিষ্কার আমাদের মুগ্ধ করেছে, সে সময়ে দিল্লীতে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন এবং বহু বিদেশী বিজ্ঞানীর আগমন নানা দিক্ দিয়েই উল্লেখ করবার মত।

আজকাল বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন বসে ১৩টি বিভিন্ন শাখায়। মূল সভাপতি ছাড়া প্রতি বিভাগে একজন করে শাখা সভাপতি থাকেন। বলা বাহুল্য, এঁরা সকলেই নিজের নিজের বিষয়ে মহা পণ্ডিত ব্যক্তি। সভাপতিদের অভিভাষণ ছাড়া প্রত্যেক বিভাগে কয়েকটি করে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। তারপর সে সম্বন্ধে আলোচনা চলে। তা ছাড়া এ অধিবেশন উপলক্ষে যে সব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ কংগ্রেসের হাতে আসে তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এবারে এ রকম প্রবন্ধের সংখ্যা হয়েছিল পনের শ'র উপর। এবারকার প্রথম দিনে দর্শক, দেশবিদেশের বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের প্রধান মন্ত্রী শত কাজের মধ্যেও প্রতিবার এ অধিবেশনে যোগদান করেন এবং বৈজ্ঞানিকদের নানা কথা শোনান। এবারেও তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তৃতা দিয়েছেন। বলেছেন,—বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি। তোমাদের অনেকের হয়তো জানা নেই, যে, পণ্ডিতজী আসলে বিজ্ঞানেরই ছাত্র; জটিল রাজনীতি নিয়ে অধিকাংশ সময় কাটানো সত্বেও তাঁর ভেতরকার সুপ্ত বিজ্ঞানী মনটি তিনি মুছে ফেলতে পারেন নি।

এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে প্রায় এক লাখের মত টাকা খরচ হয়েছে। তা ছাড়া এই উপলক্ষে ভারতে তৈরী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হয়েছিল।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের এতো জাঁকজমক, চিরদিন কিন্তু এ রকম ছিল না। কত সামান্য অবস্থা থেকে বিজ্ঞান কংগ্রেস আজকের এ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে সংক্ষেপে শোন সেই কথা।

১৯১২ সাল। দু'জন বৃটিশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ম্যাকমহোন ও অধ্যাপক সাইমনসেনের উদ্যোগে ঠিক হ'ল যে প্রতি বছর জানুয়ারী মাসে এ দেশের বিজ্ঞানীদের একটি

অধিবেশন বসবে। ২রা নভেম্বর ভারতের বিভিন্ন স্থানের ১৭জন বিজ্ঞানী কলকাতার ১নং পার্ক ষ্ট্রীটের এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহে একত্রিত হ'লেন। সভাপতিত্ব করলেন অধ্যাপক এইচ্. এইচ্. হেডেন। তৎকালীন বাংলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক হতে রাজী হলেন। সমিতির সম্পাদক হলেন ডি. কুপার।

১৯১৪ সাল। ১৫ই থেকে ১৭ই জানুয়ারী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসল। স্থান কলকাতা, এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহ। সভাপতি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ১০৫ জন বৈজ্ঞানিক উপস্থিত ছিলেন এই অধিবেশনে। মোট খরচ হয়েছিল ৫০৪ টাকা। ৩৫টি প্রবন্ধ উপস্থিত করা হয়েছিল এই অধিবেশনে।

১৯১৫ সাল। মাদ্রাজ সহরে দ্বিতীয় অধিবেশন বসল। ১৫০ জন বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন এই অধিবেশনে; প্রবন্ধের সংখ্যা ৬০।

১৯১৭ সাল। বাঙ্গালোরে চতুর্থ অধিবেশন। নিয়ম-কানুন প্রবর্তনের ব্যবস্থা হ'ল।

১৯২৩ সালে অধিবেশন কয়েকটি বিভাগে ভাগ হয়। প্রতি বিভাগে একজন করে শাখা-সভাপতি থাকবেন—এও ঠিক হয়।

১৯৩৮ সাল। কলকাতায় রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান। সভাপতি নির্বাচিত হ'য়েছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড রাদারফোর্ড। অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যুতে স্যর জেম্স্ জীন্স্ সভাপতি হ'লেন। এ বছর বিজ্ঞান কংগ্রেস এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সদস্যসংখ্যা ছিল এ বছর ১৫০০ এবং প্রবন্ধের সংখ্যা ৮৭৫। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এর পর থেকেই প্রতি বছর বহু বিদেশী বিজ্ঞানী এ অধিবেশনে যোগ দিতে থাকেন।

১৯৪৪ এবং ১৯৪৭ সালেও দিল্লীতে বিজ্ঞান কংগ্রেসর অধিবেশন বসেছিল। ১৯৪৭ সালে সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত নেহেরু। ১৯৪৩ সালেই পণ্ডিত নেহেরু বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু ৪২এর স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য পণ্ডিতজীকে তখন বিদেশী শাসকের কারাগারে রুদ্ধ হ'তে হয়েছিল বলে তাঁর পক্ষে সে বার সভাপতিত্ব করা সম্ভব হয় নি।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রধান কার্য্যালয় বর্ত্তমানে কলকাতায়, নিজস্ব বাড়ীতে।

দীর্ঘদিন ধরে নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে আজকের এই উন্নত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে বিজ্ঞান কংগ্রেস।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের এবারকার অধিবেশনে যিনি মূল সভাপতি এবং যাঁরা শাখা-সভাপতি ছিলেন তাঁরা আমাদের দেশের নামকরা বৈজ্ঞানিক সে কথা আগেই বলেছি। তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় শোন:

মূল সভাপতি—ডাঃ এ, লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র। জন্মগ্রহণ করেছেন ১৮৮৭ সালে। কর্মজীবনে বিখ্যাত চিকিৎসক ইনি। ১৯২২ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেষজ বিদ্যায় ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর হন এফ. আর. সি. ও. জি (ইউ. কে. ১৯৩০) এফ. এ. সি. এস (১৯৪০)। কত দেশী-বিদেশী কমিশন, বোর্ড, কাউন্সিলের ইনি যে সদস্য তা বলে শেষ করা যায় না। নিম্নলিখিত ডিগ্রী ইনি বিভিন্ন সময়ে লাভ করেছেন: এল-এল. ডি (সিলোন, ১৯৪২); ডি. এস্-সি (অন্ধ্র, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, এবং উৎকল); ডি. সি. এল (অক্সফোর্ড, ১৯৪৮); এল-এল. ডি (গ্লাসগো ১৯৫১); ডি. লিট (আন্নামালাই, ১৯৫৫); ডি. এস্-সি (কলিকাতা, ১৯৫৭); এল-এল. ডি (মন্ট্রিল, ১৯৫৮); পদ্মভূষণ (১৯৫৪)।

গণিতশাস্ত্র—ডক্টর এম. রায়, এম. এস্-সি (কলিকাতা, ১৯৩০); ডি. এস্-সি (কলিকাতা, ১৯৪০); ইনি আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডীন। এঁর জন্মস্থান বর্ধমানের নসিগ্রামে; জন্ম সন ১৯০৮।

পদার্থবিজ্ঞান—ডক্টর এ. কে. দত্ত, এম. এস্-সি (ঢাকা, ১৯২৫); ডি. এস্-সি (এলাহাবাদ, ১৯৩৩); ইনি বর্ত্তমানে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক। ইনি জন্মগ্রহণ করেছেন ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায়।

রসায়ন বিজ্ঞান—অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন পালিত, এম. এস্-সি (কলিকাতা ১৯৩৩; স্বুবর্ণপদক প্রাপ্ত); ডি. এস্ সি (কলিকাতা, ১৯৪২); এফ. আর. আই. সি. এফ্.; এন. আই। বর্ত্তমানে ইনি যাদবপুরের ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব্ সায়েন্সের রসায়নের অধ্যাপক। ডক্টর পালিতের 'ফিজিকাল কেমিষ্ট্রী' বই পড়েন নি, অথচ বি. এস্-সি পাশ করেছেন (বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের) এ রকম ছাত্র আজকাল বিরল। ইনি জন্মগ্রহণ করেছেন ১৯১২ সালে। আদি বাসস্থান ছিল বরিশাল জেলার ঝালকাঠি বন্দরের কাছে।

ভূতত্ত্ব ও ভূগোল—ডক্টর এস্. সি. চাটার্জ্জী, এম্. এস্-সি (কলিকাতা, ১৯২৮); ডি. এস্-সি (কলিকাতা); পি আর. এস; এফ. এন. আই; এফ. জি. এস্ (ইণ্ডিয়া); এফ. জি, এম. এম (ইণ্ডিয়া); ইনি বর্ত্তমানে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের প্রধান অধ্যাপক।

কৃষিবিজ্ঞান—ডক্টর বি. কে. কর, এম্. এস্-সি (এলাহাবাদ); পি, এইচ ডি (লাইপ্‌জিগ্)। ইনি বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় পাট সমিতির কৃষি-গবেষণাগারের ফিজিওলজিষ্ট। এঁর জন্মস্থান এলাহাবাদ।

এঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুতত্ত্ব—ডক্টর এম. দত্ত, এম. এস-সি (কলিকাতা, ১৯২৭,

স্বুবর্ণপদক প্রাপ্ত); এম. এস-সি, টেক (ম্যানচেষ্টার, ১৯৩৫); পি-এইচ. ডি, (এডিন, ১৯৫০); এম. আই. ই. ই (লণ্ডন)। ডক্টর দত্তের জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলা। ইনি বর্ত্তমানে ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের প্রধান এঞ্জিনিয়ার।

উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব—অধ্যাপক আর. মিশ্র, পি-এইচ. ডি (লীডস, ১৯৩৭); এফ. এন. আই; এফ. এন. এ, এস-সি; এফ. বি. এস। ইনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের প্রধান অধ্যাপক। এঁর জন্মস্থান উত্তর প্রদেশের জৌনপুর।

জীববিদ্যা ও কীটতত্ত্ব—ডক্টর বি. এস. ভীমাচার, এম. এস-সি (কলকাতা, ১৯৩০); ডি. এস-সি (কলিকাতা, ১৯৪৬); এফ. এন. আই; এফ. আই. আই. এস-সি। এঁর জন্মস্থান মহীশূর রাজ্যে। ইনল্যাণ্ড ফিসারীজ-এর কলিকাতা কেন্দ্রের প্রধান গবেষক।

নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব—সরকারী পুরাতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রী ভি. ডি. কৃষ্ণস্বামী, এম. এ (মাদ্রাজ)। এঁর জন্ম সন ১৯০৫।

চিকিৎসা ও পশুবিজ্ঞান—ইণ্ডিয়ান ভেটারিনারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর শ্রী পি. জি. পাণ্ডে, এম. এস-সি (এলাহাবাদ, ১৯২৮); এম. আর. সি. ভি. এস্।

শরীরতত্ত্ব—গোয়ালিয়র মেডিক্যাল কলেজের শরীরতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর এন্. পি. বেনওয়ারী, এম. ডি (লক্ষ্ণৌ)।

মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান—কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর এস, জালোটা, এম এ (কলিকাতা), ডি. ফিল (কলিকাতা)।

১৮

চমকে উঠলাম। বুকের ভেতরটা গুর গুর করে উঠলো। এখানে আমাদের অন্তরঙ্গদের মধ্যে আছেন একমাত্র নীলাম্বর ঘটক। তিনি যে এই দুর্য্যোগে এত রাত্রে আমবাগান পার হয়ে এখানে আসবেন সেটা কল্পনা করাও অসম্ভব। পাঁচুর মা নামে যে বৃদ্ধাটি সকালে এসে ঘর এবং উঠানটা ঝাঁট দিয়ে আমাদের চায়ের বাসন পরিষ্কার করে দিয়ে যায়, এ সময়ে তার আগমনও সম্ভব নয়। কাজেই কি ব্যাপার ?

আত্মরক্ষার অস্ত্রের মধ্যে ছিল দু'গাছি বংশদণ্ড, কিন্তু সে দু'টির সাহায্যে মাদুরের তাঁবু তৈরী করা হয়েছে, কাজেই আমরা একেবারে নিরস্ত্র।

দিলাপ বললে, কে ?

উত্তর এলো বাইরে থেকে।—আমি বংশী। খুলে দিন

বংশী ? বংশী কে ? মনের মধ্যে তোলাপাড়া করলাম। বংশী নামা কোনও পরিচিতের ছবিই মনের সামনে ভেসে উঠলো না।

দিলীপ বললে,—যাই হোক, গলার আওয়াজটা ঠিক কর্কশ নয়। আর আমাদেরও এমন 'কিছু মূল্যবান্ সম্পত্তি নেই যে লুঠ করবে। সুতরাং দোর খুলে স্বাগতম্ করা যাক।

সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত যে ব্যক্তি ঘরে ঢুকলো, তার চেহারা দেখে কিন্তু ঠিক শ্রদ্ধা এলো না। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পাকসিটে ধরণের শীর্ণকায় চেহারা, গায়ে একটা ছিটের জামা ভিজে জব জব করছে, খালি পা, কাঁধে একটা ঝোলা। বয়স নির্ণয় করা সেই মিটমিটে

আলোতে অসম্ভব, তবে খোঁচা খোঁচা দাড়ির কিছু অংশ সাদা দেখে মনে হোল পঞ্চাশের কম নয়।

আগন্তুক ঘরে ঢুকেই বললে,—মামা কই ? মামা ?

আমাদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। মামা ! কাকে খোঁজে এই বিচিত্র আগন্তুক ?

জিজ্ঞাসা করলাম, কাকে খোঁজেন আপনি ?

কাকে খুঁজি মানে ? আমার মামা—নৃসিংহদাস ঘোষাল। তাঁরই তো বাড়ী—তাকেই খুঁজছি।

আশ্চর্য্য হলাম। লোকটার মাথায় গোলমাল আছে না কি ? তা নইলে যে নিশু ঘোষাল আজ বাইশ বছর আগে এই ভিটে ছেড়ে চলে গিয়েছেন, আজও জীবিত আছেন কিনা কেউ বলতে পারে না, তাকেই আহ্বান করছে এই ব্যক্তি ! কোথায় ছিল এ লোকটা এতদিন ? কোনও এক উন্মাদ-আশ্রম থেকে ছাড়া পেয়ে এলো নাকি ?

বললাম, কত দিন আগে এসেছিলেন মামার বাড়ী ?

লোকটা যেন চমকে উঠলো। বললো, তা অনেক দিন হবে বৈকি। আমি তো ছিলাম না এ দেশে কিনা।

কোথায় ছিলেন ?

সে অনেক কথা মশাই ! বলবো পরে। দাঁড়ান, ভিজে জামাটা খুলে ফেলি। এ কি ! আলনাটা এখানে ছিল, কোথায় গেল ? কোণের বড় তক্তপোষটাও তো নেই দেখছি ! সিন্দুক, বাক্স, কোনও কিছুরই চিহ্ন নেই ! আচ্ছা, আপনারা কে তা তো বুঝছি না !

একটু মিথ্যার অভিনয় করতে হোল। বললাম, এ বাড়ী রাজসরকার থেকে দখল হয়ে গিয়েছে। আমরা তাদেরই লোক। শিবমন্দিরের গোমস্তা আছেন নীলাম্বর ঘটক মশায়, তাঁর কাছে গেলেই আপনি খোঁজ পাবেন।

কার নাম বললেন ? নীলাম্বর ঘটক ? সেই নীলে হতভাগা ? সে সয়তান এখনও বেঁচে আছে ? উঃ, কি ঝকমারি মশাই !

ঘটক মশাইয়ের সম্বন্ধে তাঁর এই মনোভাব দেখে আশ্চর্য্য হলাম। ভেতরে কোনও একটা রহস্য আছে বলেই যেন মনে হোল। বললাম, বসুন স্থির হয়ে। পরিচয়টা আগে হোক। কি নাম আপনার ? এত রাত্রে কোথা থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হলেন ? তার পর বলুন ব্যাপারটা কি ?

লোকটা বললে,—দেবো বই কি পরিচয়। নিশ্চয়ই দেবো। আমার নাম তো

বলেছি, বংশীধর চাটুয্যে। বি. ডি. চ্যাটার্জ্জি। এই বাড়ীর মালিক ঘোষাল মশাই আমার মামা হন।

বললাম, কিন্তু কত দিন পরে মামার বাড়ীতে এলেন সে কথা তো বলেন নি।

প্রায় বিশ-বাইশ বছর কিংবা তারও বেশী হবে। হিসেবটা ঠিক মাথায় আসে না। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে এত রাত্তিরে কি করে এলাম? সন্ধ্যা সাতটা সাঁইত্রিশের ট্রেনে নেমে এতখানি রাস্তা হেঁটে আসতে কতটা সময় লাগে একবার নিজেই হিসেব করে দেখুন না। তার পর ঝড়বৃষ্টিতে ঠিক সহজ ভাবে আসা যায় না। কাজেই খানিকটা দেরী হয়েছে।

আপনার তিন নম্বর প্রশ্ন হোল - ব্যাপারটা কি? সেইটাই সব চেয়ে বড় কথা। কিন্তু আরব্য রজনীর কথা তো এক রাত্তিরে ফুরোবে না মশাই! কাজেই ধীরে ধীরে সে সব কাহিনী বলতে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু তার আগে আপনারা বলুন দিকিনি আমার মামার খবর।

নিশু ঘোষাল সম্বন্ধে যতটুকু জানা ছিল, বললাম।

শুনে লোকটার চোখ দু'টো গোল হয়ে উঠলো। তা হলে পূরো পরিচয়টা দেওয়া আজ আর হোল না। আসবো আর একদিন আসবো। তখন সব বলবো। আজ এখনই রওনা হচ্ছি। যদি একটু পা চালিয়ে যাই তাহ'লে ভোরের ট্রেনখানা ধরতে পারবো। এখনই যাবো কলকাতায়। মামার খোঁজ করাটা আমার প্রথম কাজ। যদি তিনি বেঁচে থাকেন তো ভালই, নইলে শোধ আমি নেবই। আপনি সেই নীলে রাস্‌কেলটাকে কেবল একটা কথা বলবেন যে বংশী চাটুয্যে ফিরেছে আর নিস্তার নেই।

উত্তেজিত হয়ে লোকটা ভিজে শার্টটা আবার গায়ে দিল। আমি বললাম, দাঁড়ান, দাঁড়ান, ব্যস্ত হবেন না। আপনার মামা তো আজ বাইশ বছর দেশছাড়া, বেঁচে আছেন কিনা কেউ বলতে পারে না। কোথায় খোঁজ করবেন তাঁর?

তাঁর ছেলে চাকরি করতো পোষ্ট অফিসে। একবয়সী আমরা। ঠিকানা না জানলেও আমার পক্ষে খুঁজে বার করা শক্ত হবে না। গুড বাই, স্যর!

আমি তার মামাতো ভাইয়ের নামটা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল। বাইরে এসে দেখলাম তখনও টিপ্ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার, দু' হাত দূরের মানুষও দেখা যায় না।

আশ্চর্য্য লোক এই বি. ডি. চ্যাটার্জি বা বংশী চাটুয্যে!

(ক্রমশঃ)

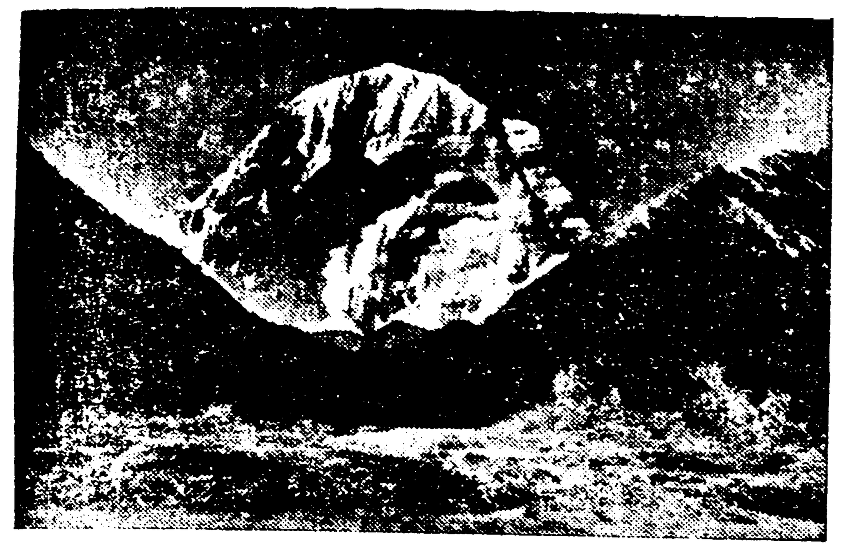

তুষারতীর্থ শ্রীকৈলাস

তীর্থঙ্কর

কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শন করে ফিরে আসছি। ফিরবার পথে প্রায় তাকলাকোট পৌঁছে গেছি সে খবরও ইতিপূর্বেই বলেছি। বেলা থাকতে থাকতেই আমরা পূর্ব-বর্ণিত সেই কাঠের সেতুটি পার হয়ে গেলাম। সামনেই পড়ল চীনাদের চেক্ পোষ্ট ও ওয়ারলেস্ ষ্টেশন। আমরা দু'জনে চেক পোষ্ট অফিসের ভিতরে গেলাম। চীনা কর্ম্মচারীদের চমৎকার ব্যবহার এবং তাঁদের পরিবেষণ-করা চীনা চা আমাদের ক্লান্তি দূর করল। এখান থেকে বেরিয়ে আমাদের চোখে পড়লো বাঁদিকে তিব্বতীদের একটি গ্রন্থ-গম্বুজ। শুনলাম যে বছরে একবার কোনও পর্ব্বোপলক্ষে ঐ বইগুলি বার করে ঝাড়পোঁছ করা হয়। তার পর বইগুলির পূজা হয় ও বইগুলি মাথায় করে রাস্তায় কয়েকজন ঘুরে আসে। এর পর আবার বইগুলিকে গম্বুজের মধ্যে আবদ্ধ করা হয়।

চেক পোষ্টে থাকতে থাকতে আমাদের চোখে পড়লো চীন দেশের পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প, আর দেখলাম চীনা ডলার। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে আমরা কয়েকটা ষ্ট্যাম্প চেয়ে নিলাম। সেই সঙ্গে গাইডের কাছ থেকে কিছু চীনা ডলার ও নেপালের টাকা-আধুলিও সংগ্রহ করা গেল।

এর পর চীনা চেক পোষ্ট ছেড়ে গেলাম তাকলাকোট মণ্ডীতে। মণ্ডীটি বেশ খানিকটা উঁচু জায়গায়। মণ্ডী শব্দের অর্থ বাজার। বেশী কিছু নেই। কয়েকটী ঘরের দেওয়ালে খাঁজ করা রয়েছে, মাথায় কোনও স্থায়ী আচ্ছাদন নেই। শুনলাম দরকার হলে তিব্বতীরা কোনও মোটা কাপড়ের আবরণ দিয়ে দেয়ালের মাথায় ঢাকা দেয়। এখানে বিক্রী হচ্ছিল গোয়া বলে এক ধরণের জন্তুর ছানা, লোমশ বখ্‌রীর ছানা, চুটকা, কম্বল ও চমরীর লেজ ও মৃগনাভি। আরও কয়েকটি জিনিষ রয়েছে দেখলাম,—যেমন হরিণের ছাল, গোয়ার ছাল, বখরীর ছাল। আমরাও কিছু সওদা করলাম। এর পর খোঁজ করতে করতে মোহন সিংএর দোকানে গেলাম আমাদের গচ্ছিত টাকা ফেরত নিতে। মোহনসিং আমাদের স্থানীয় লজেন্স দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। মনে রেখো এ লজেন্স তোমরা যে লজেন্স খাও তা নয়,—একরকম মিষ্টি মাত্র।

এর পর আমরা গেলাম তসর সিংএর দোকানে। তিনিও আমাদের অনুরূপ ভাবে আপ্যায়িত করলেন। মণ্ডী ছেড়ে আমরা কর্ণালীর সেতু পার হয়ে অনেকখানি নীচে নেমে গেলাম যেখানে আমাদের তাঁবু পড়েছিল। পথশ্রমে তখন সবাই আমরা এত ক্লান্ত যে একটু আশ্রয় ও বিশ্রাম পেলে যেন বেঁচে যাই। তাঁবুর বাইরে আমাদের গাইড ও জব্বুর দল অপেক্ষা করছিল। তাঁবুর ভিতরে যে যার বিছানা খুলে একটু গড়িয়ে নিতে লাগলাম। এরই মধ্যে চা তৈরী হয়ে গেল। চা ও জলযোগ সেরে নিয়ে আমরা জব্বুওয়ালাদের পারিশ্রমিক মিটিয়ে দিয়ে এখান থেকে বিদায় দিলাম।

পরদিন সকালে আমাদের দলের দু'জন গেলেন খোচরনাথ দর্শন করতে। আমরা বাকী তিনজন কিচখাম্পাকে নিয়ে গেলাম শিম্বলিং গুম্ফা দেখতে। পাথরের উপরে অবস্থিত এই গুম্ফাটি। কর্ণালীর উপর কাঠের সেতু পার হয়ে খুব সরু একটি রাস্তা উঠে গেছে এই গুম্ফার দ্বারদেশ পর্য্যন্ত। গুম্ফাটি তিনতলা উঁচু হবে। আগাগোড়া কাঠের তৈরী। এখানে থাকেন যত লামারা ও দাবারা। লামা বলতে যেমন গুরু বা পুরোহিত বোঝায়, "দাবা" বলতে তেমনি বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী বোঝায়। এরা সবাই তান্ত্রিক বৌদ্ধ। মূল কক্ষে রয়েছে প্রকাণ্ড একটি পিতলের তৈরী বুদ্ধের উপবিষ্ট মূর্ত্তি। গুম্ফার একটি কক্ষে কিছু প্রাচীন জিনিষপত্র রক্ষিত রয়েছে দেখলাম। এই জিনিষপত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি মৃত পশুই উল্লেখযোগ্য। মূল কক্ষে বুদ্ধমূর্ত্তির আশেপাশে রয়েছে সহচর দেব-দেবীদের ছোট ছোট মূর্ত্তি। অপর দিকে রয়েছে কিছু ধর্ম্মগ্রন্থ। মাথার উপরে এক চিত্রিত চাঁদোয়া। দেওয়ালের গায়েও সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা রয়েছে। আমরা ঘিয়ের দীপ জ্বালিয়ে দিয়ে প্রণাম করলাম।

গুম্ফাটি, আগেই বলেছি, তিনতলা। ছাদে ওঠা যায়। ছাদ থেকে দূরের দৃশ্য লক্ষ্য করতে বেশ ভাল লাগছিল অনেকখানি নীচে, যেখানে আমাদের তাঁবু পড়েছে, তার আশপাশ সমস্তটা মিলিয়ে দেখাচ্ছিল একটি রঙচঙে পুতুলের দেশের মত। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাম। গাইড একটা জায়গা দেখাল যেখানে কয়েক বছর আগে কাশ্মীরী ও তিব্বতীদের মধ্যে একটা যুদ্ধ হয়েছিল। শেষ অবধি তিব্বতীদেরই জয় হয়েছিল বটে, তবে তাদের পক্ষের বীর সেনাপতিকে হারাতে হয়েছিল।

তাঁবুতে ফিরে এলাম। পরদিন সকালেই আবার এসে গেল নতুন কুলির দল।

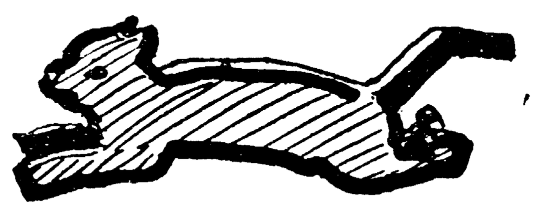

আজও মনে পড়ে

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

—নীরব সিনেমা—

সিনেমা একদিন নীরব ছিল। আমিও তখন ছোট ছিলাম।

পর্দার বুকে ছবি একদিন কথা কইবে আর গান গাইবে এ কথা তখন কল্পনা করি নি, তাই সিনেমা নীরব বলে কোনো নালিশ ছিল না। বরং কল্পনার পাখা মেলে দেবার যে প্রচুর অবকাশ ছিল তাতে আনন্দই পেতাম। পর্দার বুকে দৃশ্যমান ছবিগুলোর সঙ্গে যখন যে রকম আওয়াজ দরকার মনে মনে জুড়ে দিতাম। অর্থাৎ কল্পনা করে নিতাম।

তখন ঢাকা কলিজিয়েট স্কুলের নীচু ক্লাসে পড়ছি, এই সময় "জয়দেব" ছবিখানা দেখানো শুরু হলো ঢাকা শহরের জনপ্রিয় ছবিঘর 'সিনেমা প্যালেসে'। সিনেমা প্যালেস প্রায় বুড়ীগঙ্গা নদীর ধারে অবস্থিত। সিনেমা প্যালেসের অনতিদূরে নদীর ঘাটে আশ-পাশের গ্রাম থেকে নৌকো আসতে লাগল যাত্রী নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, "জয়দেব" দেখবার জন্যে উৎসুক সবাই। গ্রামে গ্রামে এই বার্ত্তা রটে যেতে দেরি হয় নি যে ঢাকা শহরের সিনেমা প্যালেসে "জয়দেব" দেখানো হচ্ছে। একে শহরের লোকের আগ্রহ, তার ওপর এই সব আগন্তুকদের ভিড়। বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণের নানা রকমের মিষ্টি দুষ্টুমি ছিল ছবিটিতে, ভক্তেরা যাকে বলেন "লীলা"। ভক্ত দর্শকরা তাই ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে লাগলেন। অনেকে একবার দেখে তৃপ্ত না হয়ে বার বার দেখতে লাগলেন। সুতরাং প্যালেসে "জয়দেব" এক নাগাড়ে অনেক দিন চলেছিল—যতদূর মনে পড়ছে মাস তিনেকের কম নয়।

তখনকার অন্যান্য ছবিঘরের মত সিনেমা প্যালেসেও একটি নিজস্ব অর্কেষ্ট্রা, অর্থাৎ ঐকতান-বাদক দল ছিল। সিনেমা-পর্দার কাছাকাছি এক কোণে ছিল তার জায়গা। বেহালা, পিয়ানো, অর্গ্যান প্রভৃতি ছিল অর্কেষ্ট্রায়। পর্দায় ছবি প্রতিফলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তারি সঙ্গে তাল রেখে, অর্থাৎ ছবির ভাবের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে, বাজনা বাজত। কখনো করুণ উদাস সুর, কখনো রুদ্র সুর, কখনো ঘুমপাড়ানি সুর, কখনো লড়াই-মার্কা বাজনা…ইত্যাদি।

সিনেমা প্যালেসের কর্ত্তারা "জয়দেব"-ছবির জন্যে বিশেষ করে নিয়োগ কর্‌লেন তখনকার জনপ্রিয় গায়ক নিত্য বাবুকে। গায়ক হিসেবে নিত্য বাবুর বিশেষত্ব ছিল এই যে তিনি কালোয়াতি গানের চর্চা করলেও কীর্ত্তন, রামপ্রসাদী, শ্যামা-সঙ্গীত, বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি নানা বিভিন্ন ধরণের গানও ভালো গাইতে পারতেন—বেশ দরদ দিয়ে এবং দরাজ গলায়। তখনো গানের আসরে মাইকের প্রচলন হয় নি, কাজেই বড় বড় আসরে যাদের গাইতে হ'ত তাঁদের কণ্ঠ দরাজ না হলে চল্‌তো না।

"জয়দেব" নাটকের গানগু'ল (যেমন—আমায় কি দিয়ে সাজাবি মা, কার তরে তুই কাঁদিস মাসি. প্রলয়পয়োধিজলে, এই বলে নূপুর বাজে…ইত্যাদি) নিত্য বাবু ছবির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে যথাসময়ে গাইতেন। পর্দার বুকে ছবি আর পর্দার বাইরে নিত্য বাবুর গান—এ দু'য়ের অপূর্ব সংমিশ্রণে সিনেমা হলের ভেতর চমৎকার ভাবের যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'ত, সে অভিজ্ঞতার কথা বোধ হয় কোনো দিনই ভুল্‌তে পার্‌ব না। সিনেমার নীরব যুগ হিসেবে "জয়দেব" ছবিখানা হয়তো ভালোই হয়েছিল, কিন্তু ঢাকা শহরে ছবিটীর জনপ্রিয়তার মূলে নিত্য বাবুর গানের অবদানও যে কম ছিল না এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

লম্বা ধারাবাহিক অনেক ছবি তৈরী হ'ত তখন—৩৬ থেকে ৪০ রীল পর্য্যন্ত এক একটী ছবি। এত বড় ছবি সাধারণতঃ একবারে দেখানো সম্ভব ছিল না বলে কয়েক কিস্তিতে দেখানো হ'ত, ধারাবাহিক উপন্যাস যেমন করে মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রে ছাপা হয়। অবশ্য বিশেষ বিশেষ তারিখে—যেমন জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি ইত্যাদিতে—সম্পূর্ণ বড় ছবিটাই দেখানো হ'ত, রাত্রি থেকে শুরু করে পরদিন ভোরবেলা পর্য্যন্ত। দেয়ালের বুকে ইস্তাহারে এই ধরণের লেখা থাক্‌ত :

সিনেমা প্যালেসে
শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে
ফুল সিরিয়াল !! ফুল সিরিয়াল !! ফুল সিরিয়াল !!!
সার্কাস কিং
শ্রেষ্ঠাংশে—এডি পোলো।

আমরা, 'সিরিয়াল'-ভক্তরা, তখন এডি পোলোর আসাধারণ ভক্ত ছিলাম। লম্বায়, যত দূর মনে পড়ে, তিনি খুব বড় ছিলেন না বটে, কিন্তু দেহটী বেশ মজবুত আর চট্‌পটে ছিল। ঘোড়ায় চড়তে, ছুটতে, লাফাতে, কুস্তি লড়্‌তে, ঘুঁষোঘুঁষি কর্‌তে,

তলোয়ার চালাতে…এবং এ ছাড়াও নানা রকম শারীরিক কস্‌রতে তাঁর জুড়ি মেলা সহজ নয় বলেই মনে হ'ত। পর্দার বুকে তাঁর লোমহর্ষক কীর্ত্তিকলাপ দেখে আমরা মুগ্ধ হতাম, পুলকিত হতাম, শিহরিত হতাম। দেখ্‌তাম, অসংখ্য শত্রু তাঁকে বার বার নানা ফাঁদে ফেলেও আট্‌কে রাখ্‌তে পারছে না, আর ভদ্রলোক বার বার প্রায় মৃত্যুর মুখে পড়েও বেঁচে যাচ্ছেন। একবার তাঁর শত্রুরা তাঁকে বাগে পেয়ে একটা ঘরের পুরু থামের সঙ্গে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে গেল, একটু পরে ফিরে এসেই তাঁকে সাবাড় কর্‌বে। আমরা সবাই মহা বিমর্ষ—এবার আর এডি পোলোর রক্ষা নেই। তখন এডি পোলো অসাধারণ ক্ষমতার যাদুতে দেহের মাংসপেশীগুলোকে এমন ফুলিয়ে তুললেন যে বাঁধন-দড়িগুলো পট্ পট্ করে ছিঁড়ে গেল, এডি পোলো এক ঝট্‌কায় নিজেকে মুক্ত করে নিলেন। আমরা, হলশুদ্ধ সবাই, তখন উল্লাসে একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠ্‌লাম। সেই হাততালির হুল্লোড় যখন বন্ধ হলো ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে একটী মোটর গাড়ীতে চেপে এডি পোলো দ্রুতবেগে রওনা হয়ে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতায় নবীন গায়ক কাশীনাথ সম্পর্কে বলেছেন যে সে নাকি

"আপনি গড়ি তোলে বিপদজাল,
আপনি কাটি দেয় তাহা।"

আমাদের 'সিরিয়াল' ছবির প্রিয় তারকা মহাবীর এডি পোলোরও অনেকটা ঐ ধরণের বাতিক ছিল। তিনি নিজের অসীম সাহস আর কেরামতি দেখাবার জন্যেই যেন বার বার সাধ করে ফ্যাসাদে পড়তেন।

সারা রাত 'ফুল সিরিয়াল' দেখতে গেলে টিকিটের দাম ডবল দিতে হ'ত, অর্থাৎ চার আনার আসনে বস্‌তে হলে আট আনার টিকেট কিন্‌তে হ'ত। কিনতাম। কারণ পাঁচ বা ছয় সাধারণ কিস্তিতে যে ছবি দেখতে হ'ত সে ছবি ডবল টিকিট কিনেও এক কিস্তিতে দেখলে অনেক সস্তা পড়ে বলে মনে মনে ধারণা ছিল। সে ধারণা কিন্তু আসলে ভুল। কারণ ফুল সিরিয়াল শুরুই হ'ত সাড়ে ন'টায়। তার পর রাত এগরোটা, কি বড় জোর বারোটা থেকেই ঘুমে চোখ ভার হয়ে আস্‌ত। ভয়ানক ঝিমুতে শুরু কর্‌তাম। তখন থেকে ভোর পর্য্যন্ত বার বার ঝিমুনো আর মাঝে মাঝে ক্ষণিকের জন্যে চোখ মেলা এ ভাবে যা দেখা হ'ত তাকে ঠিক সিনেমা দেখা বলা চলে না। পর দিন ভোরে যখন ক্লান্ত দেহে বাড়ী ফিরতাম তখন গত রাতের দেখা ছবির কাহিন মেলাতে গিয়ে দেখতাম ঝিমুনিটা এত বেশী হয়ে গিয়েছে যে কাহিনী মেলাতে পারছি না, লম্বা লম্বা বাদ থেকে যাচ্ছে।

এডি পোলোর চাইতে ঢের বেশী আভিজাত্যপূর্ণ 'মহাবীর' অভিনেতা ছিলেন এল্‌মো লিংকন। ঢের বেশী লম্বা-চওড়া সুপুরুষ, মুখের চেহারাটিও বেশী সুন্দর। টার্‌জানের ভূমিকায় অভিনয় করেই তিনি বোধ করি বিশ্বযোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এর পর সবাক্‌ চিত্রের যুগে টারজানের ভূমিকায় একাধিক অভিনেতার অভিনয় দেখেছি, কিন্তু মনের চোখে 'প্রথম 'টারজান' এল্‌মো লিংকনের যে ছবি এখনো ভাস্‌ছে তার তুলনায় এঁদের ছবি যেন ম্লান। সেটা হয়তো অতীতের একটা নিজস্ব মাধুর্য্যে।

আর সেই জন্যেই হয়তো নীরব সিনেমার স্মৃতি মনে জাগলে এখনো মনটা মাঝে মাঝে উদাস হয়ে ওঠে। মনে হয় সে যুগের নীরব সিনেমাই বরং বেশী ভালো ছিল এ যুগের সরব চিত্রের চাইতে। হয়তো এ আমার মনের ভুল, কিন্তু এ কথা যে মাঝে মাঝে মনে হয় তাতে আর কোনো ভুল নেই।

পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণে

সু—মো—দে

প্রবীণ, বৃদ্ধ জ্ঞানতপস্বী
প্রাজ্ঞ হরিচরণ,
'বাংলা শব্দকোষ' অভিধান—
অপূর্ব্ব প্রণয়ন।

সুধী ও কৃতধী শতায়ু মনীষী,
বঙ্গবাণীর ঋত্বিক্‌ ঋষি,
বিদ্বান্‌, গুণী, পূতচরিত্র,—
ছাত্র চিরজীবন।

'দেশিকোত্তম' উপাধি প্রদানে
বরি' নিল দেশ মহা সম্মানে,
হাহাকার জাগে তাই তো পরাণে,—
শূন্য যে 'নিকেতন'।

ক্ষুব্ধ বাঙ্গালী প্রার্থনা করে
দিব্যপ্রয়াণ-শোকে,
বিদেহী আত্মা শান্তি লভুক
পরমব্রহ্মলোকে।

শিশুসাহিত্যের তিনজন

শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত

—যোগীন্দ্রনাথ সরকার—

বাঙলার ইতিহাস দেখেছি যে খুলে—
ছোটদের কথা সব গিয়েছিল ভুলে।
সরকার জেনেছেন দরকার তারি,
"হাসিখুসী" লেখা তাঁর—খুস্‌ দিল্‌ ভারি।

বর্ণের পরিচয়-ভরা যত ছড়া,—
তুলে তুলে পড়া আর মনগুলো গড়া।
রং-চংএ রাঙাছবি—টুকটুকে লাল,
কত মজা কাহিনীর বোনা তাতে জাল!
দাড়িমুখো ছাগলের শোনো পরিহাস—
সিংহের মামা সে যে ভোম্বলদাস।
গিজ্‌গিজে হিজিবিজি—বিদ্‌ঘুটে ছবি,
শিশুদের বাল্মীকি 'সরকার' কবি।

—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার—

তেপান্তরের মাঠ যেখানে
কোন্ সে সুদূর প্রান্ত—
রাজার কুমার কোটাল-ছেলে
খবরটা তো জানতো।
পাখীর পিঠে বুদ্ধু-ভুতুম
উড়তে থাকে শূন্যে,

নীলকমলের প্রাণটি বাঁচে
লালকমলের পুণ্যে।
গজমোতি কণ্ঠে ঝোলে,—
উজল হীরের মাল্য,
ঘুম পাড়ানো গল্পগুলো
রঙের বাতি জ্বাল্‌লো।

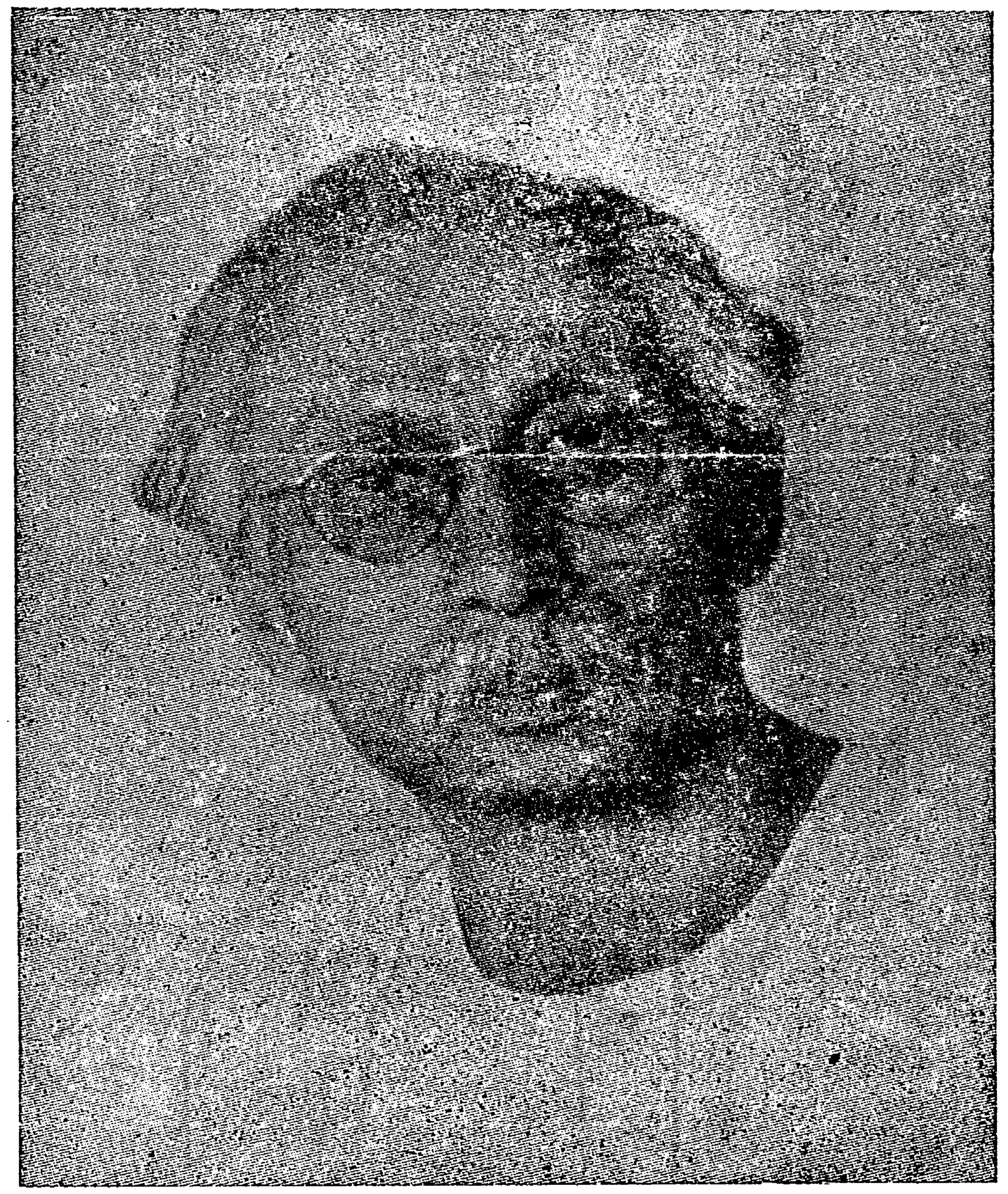

বন্দিনী সে রাজকুমারীর
সজল কালো চোখ কি--
রাক্ষুসীটার প্রাণটি রাখে
সাগরতলের পক্ষী।
তাকেই মেরে রাজার ছেলে
আনলো রাজার কন্যা,

কিশোর-চোখে ভাসিয়ে তোলে
কল্পনারই বন্যা।
আলপনারই জাল বোনা যে
স্বপ্নভরা চিত্র,
ঠাকুমা'দের ঝুলির থেকে
বার ক'রেছেন মিত্র।

—সুকুমার রায়—

আবোল তাবোল বক্‌বকানি—
পাগল ভাবে লোকে,
আজব দেশের গুজব নিয়ে
মাথার ভেতর ঠোকে।
ধম্ ধমাধম্ শব্দ যে তার—
জব্দ জ্ঞানী গুণী,
"পাগলা দাশুর" কীর্ত্তিকলাপ
"ঝালাপালাও" শুনি।

এই সেরেছে! "শিং-ব্যাকরণ"
"ব্যা" ক'রেছে আজ,
শক্তিশেল-এ 'ভ্যা' করা কি
লক্ষ্মণেরই কাজ!
কোন্ দুনিয়ার গল্প লেখা—
কোন্ আকাশের নীচে,
মিথ্যেটাকে ব'লছে সাঁচা—
সত্যিটাকে মিছে!

ম্যাজিক শেখ

যাদুরাজ এস, ডি. মুখার্জি

এর আগে তোমাদের বিখ্যাত বিদেশী যাদুকর ওয়াট্‌সনের একটি মজার খেলার কথা বলেছিলাম। এবারে তাঁর আর একটি খেলার কথা বলি। এই খেলাটির নাম হচ্ছে 'পেনিট্রেটিং বল্‌',—অর্থাৎ যে বল্‌ কোন কিছু ফুঁড়ে ওঠে।

খেলাটি এই রকম: একটি কাঠের বল্‌ ও তার মাপের ও একই রংএর একটি খোল অর্থাৎ আধখানা ফাঁপা বল্‌ যোগাড় কর। চার আনা-ছ' আনার বেশী দাম হবে না।

খেলা দেখাবার সময় বলের উপর তার খোলটি লাগিয়ে রাখবে, তাহলেই দর্শকরা মনে করবেন যে এটা একটা সাধারণ বল্‌। এইবার দর্শকদের কাছ থেকে একটা রুমাল চেয়ে নাও ও সেটা বাঁ-হাতের চেটোর উপর মেলে ধর ও বলের যে দিকে খোল লাগান আছে সেই দিক্‌টা ডানহাতের তালুর উপর রেখে বল্‌টি সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে রুমালের তলায় রাখ ও খোলটী ডানহাতের তালুতে লুকিয়ে রেখে হাত বার করে নিয়ে এসে এমন ভাবে ডান হাত রাখ যাতে দর্শকের দৃষ্টি সেই হাতের দিকে না পড়ে। এইবার দর্শকদের দৃষ্টি রুমালের নীচে বলের দিকে আন ও ডান হাত বাঁ-হাতের উপর ধরা বলের উপর যে রুমাল আছে তার উপর এনে সামান্য চাপ দিয়ে বলের মাথায় খাপটা পরিয়ে দাও এবং হাত সরিয়ে আন। দর্শকরা দেখবেন যে বল্‌টী রুমাল ফুঁড়ে অর্দ্ধেক উপরে উঠে এসেছে ও অর্দ্ধেক নীচে রয়েছে।

এইবার আবার ডান হাত চাপা দিয়ে ও খোলটী ডান হাতের তালুর নীচে ধরে সরিয়ে আন ও কৌশলে যে কোন উপায়ে পকেটে বা অন্যত্র চালান করে দাও সকলের অলক্ষ্যে। তার পর বল্‌ ও রুমাল দর্শকদের পরীক্ষা করতে দাও। দর্শকরা আশ্চর্য্য হয়ে দেখবেন যে রুমাল অক্ষত আছে এবং বল্‌টীও নিরেট,—কোথাও কোন কিছু কৌশল করা নেই।

আমরা সাধারণতঃ থিম্‌বল বা আঙ্গুলের ঠুসি দিয়ে এই খেলাটী দেখিয়ে থাকি। তবে আমার মনে হয় ওয়াট্‌সন সাহেবের প্রণালীটা আরও সহজ।

ভুল ভাঙ্গা

শ্রীরেণুকা দেবী

পাড়ার মোড়ের মাথাতেই দোকানটা। ছোট্ট মনিহারি দোকান। খুব দামী, নাম-করা জিনিস না পাওয়া গেলেও গৃহস্থের সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পাওয়া যায়; আর নিতান্ত দরকারী জিনিসের জন্যেই পাড়ার লোক এখানে আসে। দোকানের সাইনবোর্ডে "শান্তি ষ্টোর্স" না কি একটা নামও লেখা আছে, কিন্তু সবাই বলে হরেন মাষ্টারের দোকান।

দোকান-বাজার থেকে ফিরে হয়তো দেখা গেল, ভুলে কাপড়-কাচা সাবান আনা হয় নি, অথচ এখনি সাবানের দরকার। যা হরেন মাষ্টারের দোকানে, নিয়ে আয় এখনকার মত। লেস বুনতে বুনতে সুতো ফুরিয়ে গেলো। মেয়েরা বলে,—যাক, এখন একটা গোলা হরেন মাষ্টারের দোকান থেকে আনিয়ে নিই, পরে হাই স্ট্রীটের দোকান থেকে বেশী করে আনা যাবে। এই বেশীটা হরেন মাষ্টারের দোকান থেকে কেনা যায় না কিছুতেই। কোন কারণ নেই, তবু এইটাই চল হয়ে গিয়েছে। নেহাৎ পাড়ার মোড়েই দোকানটা, সময়-অসময়ের সামান্য দরকার মিটোবার কাজটুকু চলে। দোকানদারও তার ছোট্ট দোকানটি খুলে অল্প বিত্তের স্বল্প পসার নিয়ে কুণ্ঠিত থাকে। তার মধ্যে পাড়ার লোকের হঠাৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্যটি দিতে পারলে কৃতকৃতার্থ হয়ে যায় যেন!

অরিজিত সেদিন স্নান করতে গিয়ে দেখে তেল নেই। দু'দিন আগেই আনবে ভেবেছিল কিন্তু একদম ভুলে গিয়েছে। ও আবার একটু বাবু মানুষ, জবাকুসুম ছাড়া মাখে না। তাড়াতাড়ি চাকর দামুকে ডেকে বলল, যা তো দৌড়ে, হরেন মাষ্টারের দোকান থেকে একশিশি তেল নিয়ে আয়।

দামু ফিরে এল শূন্য হাতে। হরেন মাষ্টারের দোকানে ওই তেল নেই।

রেগে ওঠে অরিজিত।—হুঁঃ, একশিশি জবাকুসুম তেল নেই, আবার দোকান খুলেছে কি জন্যে? ওই জন্যেই দোকানের অমন দশা! বক্‌ বক্‌ করতে থাকে সে।

সুচন্দ্রা বলে,—দাদা, আজ আমার ক্যাষ্টর অয়েল একটু মাখ।

—অগত্যা।—বলে অরিজিত।

চক্রবর্তী-বাড়ীর রেখা, সেলাইয়ের সূতো ফুরিয়ে যাওয়ায় গিয়েছিল হরেন মাষ্টারের দোকানে; ফিরে এল বকতে বকতে।—কি দোকান রে বাবা, না আছে ডি, এম, সি সূতো, না আছে ক্লার্ক সূতো! পাড়ার লোকই যদি অসময়ে জিনিস না পায় পাড়ার মধ্যে দোকান খোলা কেন বাপু?

নেপু বলে,— ঠিক বলেছো। সেদিন স্কলার খাতা চাইলাম, নেই।

এমনিতর মন্তব্যের মধ্যে দিয়েই দিন কেটে চলেছে হরেন মাষ্টারের দোকানের। মুখুজ্জেদের বাড়ীর রোয়াকের উপর টিনের চালা নামানো, তার মধ্যে তিনটে খোপ। প্রথমটা

এক পানওয়ালার, দ্বিতীয়টা এক দরজীর, শেষ সবচেয়ে ছোট খোপটা হরেন মাষ্টারের। এই পাড়ার বাসিন্দা হরেন মাষ্টার নিজেও। নিজের বাড়ীর গলি থেকে বার হয়ে, পাড়া এবং সহরের নাম-করা "লাহিড়ী-বাড়ী"। তাদের নামেই এই "লাহিড়ী রোড" ধরে এগিয়ে এলেই মোড়। আসবার সময়ে রোজই নজরে পড়ে লাহিড়ী-বাড়ীর প্রকাণ্ড ফটক, তার মধ্যে দিয়ে বৈঠকখানা ঘরগুলো। কয়েকটা মুহূর্ত্তের জন্য রোজই থেমে যায় হরেন মাষ্টার। ফটকের মধ্যে দিয়ে তার দৃষ্টি ঘরগুলোর মধ্যে ঘুরে আসে। তারপর এসে দোকান খুলে বসে। বয়স বাহান্ন হলেও হরেন মাষ্টারকে দেখায় বাষট্টির মত। মানুষটা ভীরু, শান্ত প্রকৃতির। হরেন মাষ্টারকে ছোট দেখেছেন এমন দু'-চার জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এখনও পাড়ায় আছেন। তাঁদের মধ্যে নরনাথ চৌধুরী একজন। তাঁকে নিয়মিত হরেন মাষ্টারের দোকানে দেখা যেতো। তবে সেটা যে স্নেহবশতঃ নয় সেটা জানা গেল একদিন। সেদিন শোনা গেল চৌধুরী মশায় চীৎকার করে বলছেন,—বেশ, না হয় আর আসবো না তোমার দোকানে। ভয় দেখাচ্ছ নাকি? এই তো পাড়ায় দোকান, পড়শীরা ক'জন আসে শুনি? না হয় ক'টা টাকা বাকীই পড়েছে, তার জন্যে আমি বাড়ীঘর বেচে পালিয়ে যাব? আমাকে অবিশ্বাস?

হরেন মাষ্টার হাতযোড় করে, নরম স্বরে যা বলছিল সে কথা শোনাই যাচ্ছিল না। তাই শেষ কথাটা শুনে, রাস্তার একজন বলে,—অ্যাঁ, তাই নাকি? পাড়ার লোককেই অবিশ্বাস!

আর একজন বলে,—দোকান চালাতে গেলে বাকীতে না দিলে চলে কখনও? ইতিমধ্যে একজন আরোহী নিয়ে একটা সাইকেল-রিক্‌শা পাড়ার মধ্যে এসেছিল। আর তাকে দেখেই ছুটে আসেন নরনাথ বাবু।

—এই যে কল্যাণ, তুমিই বল তো, কাজটা কি হরেনের উচিত হয়েছে? পাড়ার বুড়ো মানুষ আমি।

কথা শুনে কল্যাণ, দোকানের সামনে হেঁট-মাথায়-দাঁড়িয়ে-থাকা হরেন মাষ্টারের দিকে চোখ তোলে।—ব্যাপার কি?

মুখ কাঁচুমাচু করে হরেন মাষ্টার বলে,—না, কিছু না, আমারই অন্যায় হয়েছে। দোকানদারী করতে এসে খদ্দের চটানো উচিত নয়।

ইতিমধ্যে জমায়েত ছেলের দল চৌধুরী বুড়োর কথায় মেতে চীৎকার শুরু করেছে,—কিনবো না, হরেন মাষ্টারের দোকান থেকে কিনবো না, কিনবো না।

কল্যাণের রিক্‌শাও আবার চলতে শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে। হরেন মাষ্টার আবার চুপ করে নিজের স্থানটিতে এসে বসে। এলোমেলো চিন্তা আসে মনে।

অনেক টাকা বাকী পড়েছে। আজ টাকার কথাটা তুলেছিল, আর পেতে দেরী হবে শুনেই বলেছিল,—তার মালপত্রের খুবই দুরবস্থা, কিছু না পেলে…

কথাটা কেড়ে নিয়েই চৌধুরী মশায় আরম্ভ করেন,—তুমি জিনিস দেবে না? কেন, টাকা মারা যাবে? পাড়া ছেড়ে পালাবো?… ইত্যাদি।

অনেক ভেবে দেখলো হরেন মাষ্টার। দোকান রাখা চলবে না। এ ভাবে আর ভালও লাগে না। অনেক আশা নিয়ে দোকানটা খুলেছিল। পাড়ায় দোকান হলে, সবাই জিনিস নিলে, ঠিক ঠিক মাল আনিয়ে দোকানটাকে চালু করতে পারবে। বড় আশা সফল করে সবাই এল বটে প্রথমে, কিন্তু বেশীর ভাগই বাকী-টাকার খদ্দের! ফলে টাকা ফিরে পেয়ে জিনিস কেনা আর হয়ে উঠলো না। তাই দামী দামী জিনিস আনা গেল বন্ধ হয়ে আর ক্রমশঃ রটে গেল হরেন মাষ্টারের দোকানে কিছুই পাওয়া যায় না। লেখাপড়া খুব বেশী শেখে নি। অনেক ঘুরে, নানা দোকানে কাজ করে, তার নিজের এই দোকান চালাবার পর মনে হচ্ছে এ কাজ সে পারবে না। লেখাপড়া তেমন শেখে নি, কিন্তু তবু ছেলে পড়ানোর কাজই যেন পেলে করতে পারে। জীবনের প্রথম উপার্জ্জন তো এই কাজ দিয়েই আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু নন্‌-ম্যাট্রিক দিয়ে আজকাল শিশুকেও পড়ানো চলে না। কিন্তু এই যে কল্যাণ, লেখাপড়ায় এত নাম-যশ,—তারি ছাত্র ছিল। এই হরেন মাষ্টারের কাছেই বর্ণবোধ হয় তার। আজও প্রত্যেক দিন লাহিড়ী-বাড়ীর ছোট বৈঠকখানাটার মধ্যে তার দৃষ্টি শিশু কল্যাণকে খুঁজে বেড়ায়। হঠাৎ উঠে পড়ে হরেন মাষ্টার। দোকান বন্ধ করে আর ভাবে এবারে হয়তো একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে।

বাড়ী আসে কল্যাণ। সে কলকাতার এক কলেজে প্রফেসার। মাঝে মাঝে বাড়ী আসে। মাতৃহীন ছেলেটিকেই দেখতে আসে। বাড়ীতে কাকীমা, জ্যেঠিমা আছেন। আশ্চর্য্য, কল্যাণ নিজেই শিশুকালে মাতৃহীন, তার ছেলেরও সেই অবস্থা হয়েছে। ছেলের ভাবনার মধ্যেও আর একটা ভাবনা রয়েছে তার। দু' বছরের জন্য তাকে বিদেশে যেতে হচ্ছে। আমেরিকায় যাওয়ার স্কলারশিপ পেয়েছে, তাই যাওয়ার আগে ছেলের জন্য বহু ছবির বই, খেলনা ইত্যাদি এনেছে। দুপুরবেলা নিজের মায়ের বাক্স খুলে নিজের ছোটবেলার জিনিস-গুলোও বার করছিল,—সব দিয়ে যাবে ছেলের জন্যে। ছেলের জন্য একজন ভাল গার্জ্জেন টিউটারের জন্যও বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, কয়েকটা জবাব এসেছে। তার মধ্যে থেকেই একজনকে ঠিক করে যাবে। মায়ের বড় তোরঙ্গটা খুলে, নিজের ছোটবেলার নানান্ জিনিস, বই ইত্যাদি বাছতে বাছতে একটা অতি পুরোনো হাসিখুসী বইএর উপর চোখ পড়ে। ওর বাবা নিজে মলাট দিয়ে দিয়েছিলেন বইটাতে। বড় হয়ে কল্যাণ অন্য সব জিনিষের সঙ্গে এটাও মার এই বাক্সটার মধ্যে রেখে দিয়েছিল।

অ-আ'র পাতাটার উপরেই চোখ পড়ে। লেখা আছে, আমার প্রথম ছাত্রকে …প্রথম দিনের উপহার…হরেন্দ্রলাল দত্ত। …সন…

হরেন্দ্রলাল দত্ত! আজকের এই হরেন মাষ্টার! মনটা কেমন হয়ে যায়। হাঁা, মনে পড়ছে বটে, পড়াতে আসতেন। তারপর ম্যাট্রিক পাশের খবরও নিয়ে গেছেন বাড়ী এসে। তারপর কল্যাণ চলে গেল প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে…আর…মনে নেই তেমন।

আরো দশ-বারো দিন পরে কল্যাণ আবার এসেছে। এবার গিয়েই চলে যেতে হবে তাকে। ছেলের জন্য একজন মাষ্টারও ঠিক করেছে, তাঁর সঙ্গে ব্যবস্থা করে যাবে। এই সব

ভাবনার মধ্যেই খুড়তুত ভাই সুভাষের চীৎকার শুনতে পেল জান, হরেন মাষ্টার দোকান ছেড়ে দিচ্ছে।

তাই নাকি! কেন?—প্রশ্ন করে কল্যাণ ও সুভাষের মা একসঙ্গে।

পানওয়ালা কানাইকেই দোকানটা দিয়ে দিচ্ছে। শুনছি নাকি টিউশানী করবে। কে যে ছেলে দেবে পড়াবার জন্য তা কে জানে!

ওমা, তাই নাকি? পড়াবে তো বড় জোর টু, থ্রি, পর্য্যন্ত। মনে আছে কল্যাণ, তোকেও পড়াতো হরেন মাষ্টার?—বলেন কাকীমা।

জান বড়দা, সেটাই হরেন মাষ্টারের সবচেয়ে বড় গর্ব্ব। বলে, আমার ছাত্র য়ুনিভারসিটির সেরা ছাত্র।—হেসে ওঠে সুভাষ।

"আমার ছাত্র" কথাটাই কেমন লাগে সেরা ছাত্রটির। তার ছেলে তার চেয়েও ভাল হোক কিন্তু তার চেয়ে কম যেন না হয়—এটাই মনে হয়। কোন কথা না বলে কল্যাণ বার হয়ে যায়।

হরেন মাষ্টার তখন কানাইয়ের সঙ্গে কথা বলা শেষ করে দোকানের ভার বুঝিয়ে চলে আসছেন, কল্যাণ প্রায় দৌড়ে এসে পথ আটকে দাঁড়ালো—দোকান বন্ধ করা হবে না মাষ্টার মশায়!

মাষ্টার মশায়! অবাক্ হয়ে যায় হরেন মাষ্টার।

আপনার বড় ছেলে বিজুকে প্রেসের ওই কাজটা থেকে ছাড়িয়ে আনুন, তাকে দোকানে বসান, আর আপনি আমার ছেলের ভার নিন মাষ্টার মশায়! এবার সকলেই আপনার দোকান থেকে জিনিষ নেবে, আমি বাড়ী বাড়ী গিয়ে বলে আসবো।

…আমি!…ছেলের ভার!…তোমার ছেলে!…হরেন মাষ্টার থতমত খেতে লাগলো। তবু দেখা গেল তার চোখে, মুখে এমন কি সারা মুখের রেখাগুলিতেও আনন্দ আর খুসীর জোয়ার বয়ে চলেছে।

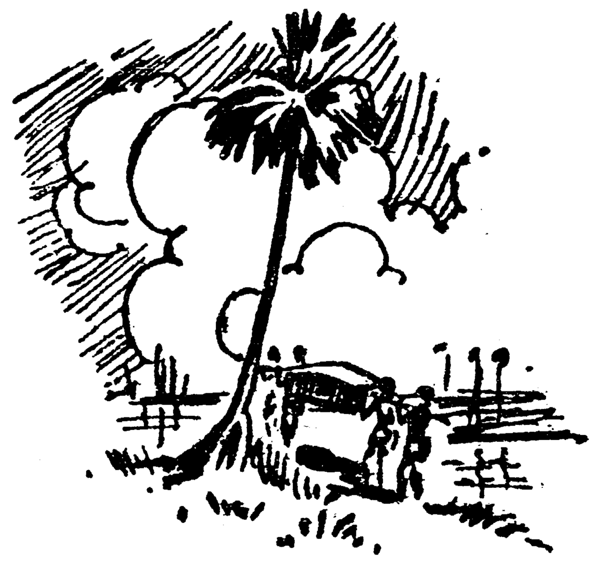

মনোচিকিৎসক স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র দাস

শ্রীকৌটিল্য

বাংলার বাইরে প্রবাসী বাঙ্গালী হিসেবে প্রায় সারা জীবন কাটিয়ে যাঁরা বাঙ্গালীর জন্য প্রচুর সম্মান অর্জ্জন করে গেছেন তাঁদেরই একজনের কথা আজ বলব। ইনি বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসক স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র দাস।

৺প্রকাশচন্দ্র দাস

প্রকাশচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে, পশ্চিমের মীরাট সহরে। তাঁর বাবা ৺যোগেন্দ্রনাথ দাস সামরিক সরবরাহ বিভাগে কাজ করতেন। সেজন্য প্রকাশচন্দ্রের ছেলেবেলা উত্তর প্রদেশেই কেটেছে। কিন্তু আগ্রা সেন্ট জনস কলেজ থেকে বি. এস্ সি পাশ করে তিনি চলে এলেন বাংলায়, ভর্ত্তি হলেন কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে। এখান থেকে ১৯১৬ সনে এম্. বি পাশ করে তিনি আবার ফিরে গেলেন প্রবাস-জীবনে, যোগ দিলেন বিহার প্রভিন্সিয়াল মেডিক্যাল্ সার্ভিসে। ইতিমধ্যে লাহোর-প্রবাসী সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কন্যা হিরণপ্রভা দেবীর সঙ্গে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

ডাক্তার দাস সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলায় সম্মানের সঙ্গে কাজ করে গেছেন। মনস্তত্ত্ববিদ্ চিকিৎসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর। কয়েক বছর তিনি রাঁচীর বিখ্যাত মানসিক হাসপাতালেও অধ্যক্ষ রূপে কাজ করেছিলেন। এই সময় তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজকীয় চিকিৎসা ও মনোবিজ্ঞান সমিতি (রয়্যাল মেডিকো-

সাইকোলজিক্যাল এসোসিয়েশন)-এর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সনে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানসিক স্বাস্থ্য সম্মেলনে যোগদান করবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়।

ডাক্তার দাস সম্মোহন বিদ্যায়ও (হিপ্নোটিজ্‌ম্) কিছুটা পারদর্শী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি এ নিয়ে খুব চর্চা করতেন। চক্ষুরোগের চিকিৎসায়ও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। এ ছাড়া মস্তিষ্কের ব্যাধি, হুক্‌ওয়ার্ম্‌এর অসুখ—এ সব নিয়েও তিনি কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। তোমরা হয়তো লক্ষ্য করেছ, কোন কোন লোকের ডান হাতের বদলে বাঁ হাত দিয়ে কাজ করার একটা অভ্যাস দেখা যায়। চলতি কথায় একে বলা হয় 'ন্যাটা'। মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়ে এরও কারণ অনুসন্ধান করে তিনি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক। তাঁর সামাজিক শিষ্টতা ও সততা ছিল উল্লেখযোগ্য। বন্দুক ছোঁড়া, দীর্ঘ পথ মোটর চালানো, টেনিস খেলা প্রভৃতিতেও তাঁর ছিল প্রচুর সখ। ৫৩ বছর বয়সেও তিনি সুন্দর টেনিস খেলতে পারতেন। দেশ ভ্রমণের সখও তাঁর কম ছিল না। যৌবনে তিনি খাইবার পাস পর্যন্ত ঘুরে এসেছিলেন।

শেষ জীবনে তিনি দিনের বেশীর ভাগ সময়ই ধর্মচর্চায় কাটাতেন। ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৬৮ বছর বয়সে রাঁচীতে তাঁর 'সাধনালয়' ভবনে তিনি দেহ-ত্যাগ করেছেন। একটি প্রতিভাবান্ প্রবাসী বাঙ্গালীকে আমরা হারিয়েছি।

প্রকাশচন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

এবারকার রামধনুতে ৺ডাক্তার প্রকাশচন্দ্র দাসের কথা তোমরা পড়েছ। তাঁরই স্মরণে এই পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেছেন তাঁর পুত্র শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস। প্রতিযোগিতার বিবরণ নীচে দেওয়া হ'ল :—

বিষয়—একটি বৈজ্ঞানিক রচনা। বিজ্ঞানের যে কোন শাখা থেকে বিষয় নির্বাচন করা চলবে। রচনাটি দীর্ঘ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ১২০০ শব্দের বেশী না হ'লেই ভাল হয়। উপযুক্ত বিবেচিত হলে পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা রামধনুতে প্রকাশিত হবে।

রামধনুর যে কোন পাঠক-পাঠিকা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারবেন। রামধনুর কর্তৃপক্ষের বিচারই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে।

মোট তিনটি পুরস্কার দেওয়া হবে। ১ম পুরস্কার—১৫ টাকা দামের বই, ২য় পুরস্কার—১০ টাকা দামের বই, ৩য় পুরস্কার ৫ টাকা দামের বই।

রচনা আগামী ১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৬ (২৯শে এপ্রিল, ১৯৫৯) তারিখের মধ্যে রামধনু কার্যালয়ে অবশ্যই পৌঁছান চাই। প্রত্যেক রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা পরিষ্কার ভাবে লিখে দিতে হবে।

শিশুসাহিত্যিক-পরিচিতি

শ্রীরেণুকা দেবী

জন্ম—২১শে শ্রাবণ, ১৩২৪ (ইং ১৯১৭)। জন্মস্থান—জামতাড়া (সাঁওতাল পরগণা)।

ছাত্রজীবন কেটেছে কৃষ্ণনগরে। সেখানকার লেডী কারমাইকেল স্কুলের ছাত্র ছিলেন ইনি।

সাংসারিক কাজকর্মের অবসরে সাহিত্যচর্চার প্রতি এঁর প্রবল ঝোঁক। তিরিশ বছর বয়সে প্রকাশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে নামেন—বিশেষ করে শিশুসাহিত্যে। এঁর লেখা ছোটদের গল্পের মধ্যে বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং তা পরিবেশনে এমন একটা নিজস্ব ভঙ্গী আছে যা গতানুগতিক থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। এঁর লেখা পড়লে সেইটাই আগে চোখে পড়ে এবং সেইখানেই এঁর বৈশিষ্ট্য। বেশীর ভাগই সাংসারিক তুচ্ছ ছোটখাট ঘটনা নিয়ে লেখা গল্প, কিন্তু লেখার কৌশলে পরম উপভোগ্য। এই ধরণের গল্প ছাড়াও রহস্য বা গোয়েন্দা-কাহিনী এবং ছড়া-কবিতা লিখতেও ইনি অভ্যস্ত। এঁর লেখা ছোটদের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় আনন্দ-বাজার পত্রিকার আনন্দমেলায়, প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় রামধনুতে (১৩৫৯)।

ইনি শুধু ছোটদের জন্যই লেখেন না, বড়দের জন্যও লেখেন। এঁর রচিত অনেক গল্প প্রবাসী, কথাশিল্প, মহিলামহল প্রভৃতি পত্রিকায় বেরিয়েছে। অনুবাদ-সাহিত্যেও ইনি সুপটু। ইংরেজী ও মূল ফরাসী থেকে বহু গল্প ইনি অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। আবার এঁর লেখা অনেক রচনা হিন্দীতেও অনূদিত হয়েছে (মায়া, মনোরমা, মনোহর কহনিয়াঁ প্রভৃতি পত্রিকায়)।

এঁর লেখা বই—মেঘমালা, ভেলভেটের বাক্স, এভারেষ্ট অভিযান-কাহিনী ইত্যাদি।

জ্ঞানতপস্বী জ্ঞানচন্দ্র

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

বাংলা দেশের নবদ্বীপ ছিল এক সময়ে ন্যায়শাস্ত্র চর্চার পীঠস্থান। নবদ্বীপের পণ্ডিতদের হাতে গড়া এই ন্যায়শাস্ত্রকে বলা হ'ত 'নব্য ন্যায়'। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্র চর্চার যুগ চলে গেছে, কিন্তু বাংলা দেশ তার জন্য পিছিয়ে থাকে নি—তার বদলে বেছে নিয়েছে নতুন যুগের আর একটি নতুন শাস্ত্র—বিজ্ঞান, বিশেষ করে রসায়ন বিজ্ঞান বা কেমিষ্ট্রি। এর পীঠস্থান কলকাতা, আর পথপ্রদর্শক হচ্ছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। 'নব্য ন্যায়ের অনুকরণে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'নব্য রসায়ন'। তোমরা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সেই বিখ্যাত 'আমরা' কবিতাটা নিশ্চয়ই পড়েছ, যার মধ্যে আছে—"মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।" নব্য রসায়ন বলতে সত্যেন্দ্রনাথ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের হাতে গড়া এই সব বিজ্ঞানীদের রাসায়নিক গবেষণার কথাই বলতে চেয়েছিলেন। আর এই বিজ্ঞানীদেরই অন্যতম, শীর্ষস্থানীয়দের একজন ছিলেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।

সম্প্রতি আমরা এই জ্ঞানতপস্বীকে হারিয়েছি। আমাদের পরম দুর্ভাগ্য সন্দেহ নেই।

জ্ঞানচন্দ্রের আদি বাসস্থান ছিল হুগলী জেলা, কিন্তু তাঁর জন্ম হয় পুরুলিয়া সহরে (১৮৯৪) এবং বাল্যজীবন কাটে গিরিডিতে। তাঁর বাবা ৺রামচন্দ্র ঘোষ অভ্রের ব্যবসায় উপলক্ষে তখন গিরিডিতেই থাকতেন।

খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন জ্ঞানচন্দ্র। এন্ট্রান্স, বি. এস্ সি, এম. এস-সি—এর সব ক'টি পরীক্ষায়ই তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। বি. এস্-সিতে তাঁর অনার্স ছিল রসায়ন বিজ্ঞানে, এম. এস্-সিও পাশ করেন সেই বিষয়ে। ছাত্রাবস্থাতেই পাণ্ডিত্যে তিনি এত সুনাম অর্জন করেছিলেন যে এম্. এস্-সি পরীক্ষার ফল বেরোবার আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পরিচালক স্যর আশুতোষ তাঁকে ডেকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করলেন। অবশ্য ফল বেরোলে দেখা গেল—জ্ঞানচন্দ্রই প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

ছাত্রজীবনে জ্ঞানচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি। একই সঙ্গে এতজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ছাত্রের সমাবেশ শিক্ষাজগতের ইতিহাসে

একটা বিস্ময় সন্দেহ নেই। এই সমস্ত ছাত্রই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পান এবং, শোনা যায়, প্রফুল্লচন্দ্র তখন থেকে নিজের গবেষণা ছেড়ে ছাত্র গড়বার কাজেই আত্মনিয়োগ করেন। অন্ততঃ নিজে তিনি তাই-ই বলতেন। এই ছাত্রদের নিয়ে তাঁর গর্বের সীমা ছিল না।—বলতেন, "এই সব দীপ্তিমান্ ছাত্ররাই আমাকে উজ্জ্বল করে রেখেছে, ওদের আলোই আমার গায়ে এসে ঠিকরে পড়ছে বলে আমাকে অমন জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছে। নইলে, সত্যি বলতে কি, আমার নিজের কোন আলো নেই।" কথাটায় হয়তো কিছুটা বিনয় মেশান আছে, কিন্তু আদর্শ গুরুর উপযুক্ত কথা বৈ কি!

কলেজ থেকে বেরিয়ে জ্ঞানচন্দ্র অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে সুরু করলেন মৌলিক গবেষণা। লবণাক্ত জলের প্রকৃতি নিয়ে চলল তাঁর এই গবেষণা। এর বিষয়বস্তু বেশ জটিল; রসায়ন বিজ্ঞানে বেশ খানিকটা জ্ঞান না থাকলে এটা বোঝা কঠিন। তবে এইটুকু শুনে রাখ যে এই গবেষণার ফল যখন প্রকাশ করা হ'ল তখন বিজ্ঞানী-সমাজে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। পরে বিলেতের বড় বড় রসায়ন-বিজ্ঞানীরাও এর ওপর ভিত্তি করে নতুন নতুন গবেষণা সুরু করলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস্-সি ডিগ্রী লাভ করলেন জ্ঞানচন্দ্র। সঙ্গে সঙ্গে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি এবং পালিত বৃত্তিও পেলেন। এর পর উচ্চতর গবেষণার জন্য তাঁকে ইয়োরোপে পাঠান হ'ল এবং ইংল্যাণ্ড ও জার্মেনীতে গিয়ে তিনি কিছু দিন গবেষণার পর তাঁর নতুন মতবাদ নিয়ে বিজ্ঞানী-মহলকে বিস্মিত করে তুললেন। জার্মানীতে তো বিখ্যাত রাসায়নিক নার্ন্‌ষ্ট তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে মস্ত বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন। হেবার প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীরাও এই তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানীর আবিষ্কারে মুগ্ধ হয়ে জার্মান্ ভাষায় ও নিয়ে প্রবন্ধ বার করলেন। এই সময় জ্ঞানচন্দ্রের নাম এত বেশী হয়েছিল যে একখানি বিদেশী বিজ্ঞান-পত্রিকা তখনকার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দশ জন রাসায়নিকের নাম করতে গিয়ে জ্ঞানচন্দ্রকেও তার মধ্যে একজন বলে স্বীকরে করেন। অবশ্য জ্ঞানচন্দ্রের গবেষণা নিয়ে পরে কোন কোন ইংরেজ বিজ্ঞানীকে বিরূপ সমালোচনা করতেও দেখা গেছে। কিন্তু ও রকম সমালোচনা পৃথিবীর অনেক নামকরা বিজ্ঞানীর ভাগ্যেই জুটেছে।

১৯২১ সালে জ্ঞানচন্দ্র ভারতে ফিরে এলেন। তখন ঢাকায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। জ্ঞানচন্দ্রকেই তার রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করা হ'ল। দীর্ঘ ১৮ বছর তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন; এবং, শুধু অধ্যাপনা নয়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় তিনিও ছাত্র গড়ার কাজে নামতে কসুর করেন নি।

ঢাকার ছাত্রদের নিয়ে জ্ঞানচন্দ্রও এক নতুন রাসায়নিক গোষ্ঠী গড়ে তুললেন এবং এই তরুণ রাসায়নিক দল তাঁরই নির্দেশ মত গবেষণা করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করলেন। বিশেষ করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আলোর প্রভাব সম্পর্কে এঁদের গবেষণা অত্যন্ত মূল্যবান্। শুধু ঐ বিষয়ই নয়, আরও এমন অনেক বিষয়ে জ্ঞানচন্দ্র গবেষণার পথ প্রদর্শন করলেন যার ফলে এ দেশের রাসায়নিক শিল্পেরও প্রচুর উন্নতি সম্ভব হ'ল। দেশের সম্পদ্ থেকেই যে দেশের রাসায়নিক চাহিদা অনেকখানি মেটান যায় এ সত্যও তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁর গবেষণার ভেতর দিয়ে।

এর পর জ্ঞানচন্দ্রকে আমরা দেখতে পাই পর পর বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে। ১৯৩৯ সালে তিনি বাঙ্গালোরের বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউট অব সায়ান্সের অধ্যক্ষ হলেন। সেখানেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিলেন তিনি নতুন নতুন বিভাগ খুলে—নতুন নতুন বিষয়ে গবেষণার পথ উন্মুক্ত করে। তার পর তিনি হলেন ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের অধ্যক্ষ, এবং তার পর কিছু দিন খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ টেক্‌নলজীর অধ্যক্ষ। এর অনেক আগেই ইংরেজ সরকার তাঁকে স্যর উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।

১৯৫৪ সালে আবার তাঁর ডাক পড়ল কলকাতায়। এবারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা ভাইস্-চ্যান্সেলরের কার্যভার নিতে হ'ল তাঁকে। মাত্র বছর খানেক তিনি এই পদে ছিলেন কিন্তু এরই মধ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানান্ বিভাগে এত পরিবর্তন এনেছিলেন যে সকলেই শতমুখে তাঁর প্রশংসা করেছে। বিশেষ করে ছাত্রদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তার তুলনা ছিল না। অল্প আয়ের ছাত্রদের পড়াশোনার সুবিধার জন্য 'ষ্টুডেণ্ট্‌স্ হলের' পরিকল্পনাও তাঁরই। এই পরিকল্পনা এতই অভিনব যে, শুনেছি, আমেরিকার শিক্ষাবিদ্‌রাও তাঁর এই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। খড়্গপুর ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেক্‌নলজী থেকে তিনি যখন চলে আসেন তখন ছাত্রেরা প্রথমটা কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে চায় নি, এমন কি তাঁর যাওয়া বন্ধ করবার জন্য তারা অনশন ধর্মঘট পর্যন্ত চালিয়েছিল। এমনি প্রিয় ছিলেন তিনি ছাত্রদের কাছে।

কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও জ্ঞানচন্দ্রকে বেশী দিন ধরে রাখতে পারে নি। দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের সর্ববিধ উন্নতির জন্য পরিকল্পনার দরকার। ভারত সরকারও সেদিকে মন দিলেন। এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১ম, ২য়) কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এই পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য পদ গ্রহণের জন্য এবার ডাক পড়ল জ্ঞানচন্দ্রের। ১৯৫৫ সনে ভারত সরকার তাঁকে এই পদে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু

এ কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। গত ২১শে জানুয়ারী সমস্ত কাজ অসমাপ্ত রেখে তাঁকে চলে যেতে হয়েছে পৃথিবী থেকে।

ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র শুধু বড় বিজ্ঞানী বা বড় অধ্যাপকই ছিলেন না, তাঁর সংগঠনশক্তি এবং কর্মদক্ষতা ছিল অতুলনীয়। ভারতীয় রাসায়নিক সমিতির প্রতিষ্ঠার মূলে তাঁর হাত বড় কম ছিল না। তা ছাড়া ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসকে বড় করে তুলতেও তিনি ছিলেন অগ্রণী। ১৯২৫ সনে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি রসায়ন শাখার সভাপতিত্ব করেন আর ১৯৩৯ সালে হন মূল সভাপতি (লাহোর অধিবেশন)।

তাঁর অকালবিয়োগে বাংলার বিজ্ঞান-আকাশ থেকে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নিবে গেল।

মেঘনাদ

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ন ভট্টাচার্য্য

৮

দিন চার-পাঁচ মহা হৈ-হল্লায় কেটে গেল পৃথার। কলেজও কামাই হ'ল কয়েকটা দিন। কিন্তু উপায় কি? পিসীমা কিছুতেই ছাড়বেন না, বলেন,—"হোক্ গে কামাই কলেজ। কি পড়াশোনা হয় ওখানে জানা আছে আমার। না হয় অল্প বয়সে সংসারে ঢুকেছি বলে তোদের মত দিগ্‌গজী হতে পারি নি, কিন্তু খোঁজখবর রাখি সবই। তা ছাড়া আমাদের সিধু পণ্ডিত মশাইএর কাছে যা শিখেছি তোদের বড় বড় ডি. ফিল্, ডি. এস-সি তার ধারে-কাছেও শেখাতে পারবে না। ...আর ইন্দরও তো বাইরে গেছে, একা একা খালি বাড়ীতে গিয়ে কি করবি? কিছুদিন এখানেই থাক। এখান থেকেই না হয় ডেইলি প্যাসেঞ্জারী করবি। কত ছেলেমেয়েই তো করছে আজকাল।"

অগত্যা পৃথা আপাততঃ রয়ে গেল ওখানেই। বাস্তবিক ফাঁকা বাড়ীতে গিয়েই বা কি করবে ? তাই বলে ডেইলি প্যাসেঞ্জারীও করা সম্ভব হ'ল না। ও কথা পাড়তেই ভাস্বতী ধমকে উঠল, আর পটু সুরু করল খিল খিল হাসি। ছড়া তো তার জিভের ডগায় সব সময়েই তৈরী—

ঝকাং ঝকাং চলবে গাড়ী,
উড়বে বেণী, উড়বে শাড়ী ;
চাহা গরম—পুরী মিঠাই
কোনটা চাখি—কোনটা বা খাই ?
শুনতে মজা, ভাবতে মজা, লুটতে মজা,—হায় রে !

থাম পালাবে টেলিগ্রাফের
বাঁই বাঁই বাঁই,—চমক চোখের ;
পুল পেরোবে ঘড়েং ঘড়েং,
চাকায় চাকায় বাজবে সারেং ;
গুণতে মজা, শুনতে মজা, ভাবতে মজা,—হায় রে !

শক্ত ভাত আর আ-সিদ্ধ ডাল
পাকস্থলীর করবে কি হাল,
চিপ্‌সে মারা লোকের ঠ্যালা,
কয়লা-গুঁড়োয় চোখের জ্বালা—
শুনতে মজা, ভাবতে মজা, সত্যি মজা—হায় রে !
যে দেখেছে যে ঠেকেছে সেই জানে তা—হায় রে !

অতএব ? অতএব এর পরে আর পৃথার পক্ষে, সত্যি, সকালে উঠেই নাকে-মুখে দু'টি গুঁজে উঠি-পড়ি হয়ে ছোটা সম্ভব হ'ল না।

তা ভালই হ'ল। ল্যাবরেটরীর বন্ধ ঘরে বিটকেল বিটকেল গ্যাসের গন্ধ থেকে কয়েকটা দিন রেহাই পাওয়া গেল।

ভাস্বতীর আন্তরিক সাহচর্য আর পটুর এলোমেলো ছড়া আর হৈ-রৈএর মধ্যে দিন মন্দ কাটছিল না পৃথার। এমন সময় হঠাৎ একখানা চিঠি এসে হাজির। চিঠি এসেছে দিল্লী থেকে, কলকাতার ঠিকানায়। সেখান থেকে ঠিকানা কেটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তার কাছে। কে লিখেছে ? আর কে লিখবে ইন্দ্রনীল ছাড়া ?

ইন্দ্রনীল লিখেছে—

'কল্যাণীয়াসু,

হঠাৎ তাড়াহুড়া করিয়া, তোমাকে এক রকম না বলিয়াই, কলিকাতা হইতে চলিয়া আসায় তুমি নিশ্চয়ই খুব ক্ষুণ্ণ এবং, তাহার চেয়েও বেশী, বিস্মিত হইয়াছ। বাস্তবিক আমার অন্যায় হইয়াছে, কিন্তু ইহা ছাড়া আমার অন্য উপায় ছিল না। আপিস হইতে দিল্লী আসিবার একটা কথা উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু উহা যে হঠাৎ রাতারাতি একেবারে কার্যে পরিণত হইবে ইহা ভাবি নাই। কাজেই এ সম্পর্কে পূর্বে তোমাকে কিছু জানাইবারও অবকাশ পাই নাই। যাত্রার পূর্ব দিন রাত্রে শারীরিক অবস্থাও তেমন ভাল ছিল না, তাই সেদিনও এ সম্পর্কে কোন আলোচনা করি নাই। পর দিনই আপিসে গিয়া শুনিলাম আমাকে সেই দিনই, এবং আপিস হইতেই, রওনা হইতে হইবে ; সুতরাং আসিবার পূর্বে আর তোমার সহিত দেখা করিয়া আসাও সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, আশা করি তুমি দুঃখিত হইবে না। ঘটনাচক্রে যাহা ঘটিয়াছে তাহাকে সেই ভাবেই লইবে।

এখানে আসিয়া দিন কয়েক কাজের বড় ভিড় পড়িয়াছিল। একেবারে ফুরসৎ পাইতেছিলাম না। চিঠি লিখি লিখি করিয়াও তাই লেখা হইয়া উঠে নাই। আজ একটু সময় পাইয়া লিখিতেছি।

শুনিলে অবাক্ হইবে, দিল্লী সহরটিও এখন পর্যন্ত ভাল করিয়া ঘুরিয়া দেখা হয় নাই। কেবল একদিন লাল কেল্লা দেখিয়া আসিয়াছি। দেওয়ানী খাস্ বা মোগল বাদশার মন্ত্রণাগৃহ এক কথায় অপূর্ব। যেখানে ময়ুর সিংহাসন থাকিত সেখানে একটি শ্বেতপাথরের মঞ্চ বা বেদীর মত পড়িয়া আছে। এই ঘরেরই দেওয়ালে সোনালী হরফে ফারসীতে লেখা রহিয়াছে নূরজাহানের সেই বিখ্যাত কয়েকটি লাইন—যদি পৃথিবীতে কোথাও স্বর্গ থাকে তবে তাহা এখানেই, তাহা এখানেই, তাহা এখানেই। —উহার ফারসীটাও শিখিয়া লইয়াছি, জানি না বাঙ্গালী উচ্চারণে বা বানানে কোথাও ভুল করিলাম কিনা —

'অগর ফিরদৌস বরুয়ে জামিনস্ত
হামিনস্ত হামিনস্ত হামিনস্ত।'

লাল কেল্লার প্রায় উল্টা দিকে জুম্মা মসজিদ। ইহাও নেহাৎ ছোটখাট ব্যাপার নহে। ভিতরের পাথরে বাঁধান উঠানটিই যেন একটি বিরাট ময়দান।

দিল্লীর অন্যান্য জায়গার বর্ণনা তোমাকে পরে দিব। কত দিন এখানে থাকিতে হইবে বলা যায় না। এখান হইতে সম্ভবতঃ বোম্বাই যাইতে হইবে।

সর্বদা সাবধানে থাকিও। ইতি আশীর্বাদক—দাদা।'

এক নিঃশ্বাসে চিঠিখানা পড়ে ফেলল পৃথা। দাদাটা যেন কি! চিঠি লিখেছে দেখ না! যেন বুড়ো জ্যাঠামশাই চিঠি পাঠাচ্ছে। ভাষাটাও কি রকম বুড়ো বুড়ো। —যেন পঞ্চাশ বছর আগেকার বাংলা। তবু ভাল, 'লিখিতং পত্রমিদঞ্চ' গোছের কিছু একটা দিয়ে আরম্ভ করে নি। আর আশ্চর্য, সারা চিঠিটার মধ্যে কোথাও রসকষের ব'লাই নেই। দেওয়ানী খাসের কথা লিখতে গিয়েও কলমে একটু 'স্লো' আসে নি। একেবারে চাঁচাছোলা বিবরণ। পট্টুর লাড্ডু দেখছি ওকেই পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। এ চিঠি পড়ে কে বলবে লোকটা অমন হাসিখুশি? নাকি উপদেশ দেবার সময় সকলেই এ রকম মুরুব্বিয়ানা দেখায়? বেশ কড়া করে একটা জবাব লিখতে হবে, আজই।

কিন্তু ওমা, কোথায় লিখবে? ওপরে ঠিকানা লেখাটাও দরকার বোধ করেন নি বাবু, এতই অন্যমনস্ক। শুধু লেখা 'দিল্লী'। যেন উনিই খোদ দিল্লীর বাদশাহ। ওঁর নামটুকু দিয়ে তলায় দিল্লী লিখে দিলেই যেন ঠিক জায়গায় চিঠি গিয়ে পৌঁছবে! নাঃ, দাদাটা বড় হচ্ছে, কিন্তু মানুষ হচ্ছে না। (ক্রমশঃ)

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

এবার আর বেশী কথা নয়, চট্‌পট্ কয়েকখানি চিঠির জবাব দিয়ে কলম বন্ধ করব। প্রেস থেকে ভীষণ তাড়া দিচ্ছে।

শ্রীবিমল চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা-৪০)—আমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের মন দিয়ে, ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে অন্য লোকের বিচার করি। এই দিক্ দিয়ে হয়তো ওর কিছুটা মূল্য আছে, অপরের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে না মিললেও। শ্রীঅমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় (বি. ই. কলেজ, শিবপুর)—রামধনুর পাতাতেই তোমার চিঠির জবাব দিচ্ছি। তোমার যে 'মিলন' বলেও একটা নাম আছে তা আমার মনে থাকে না, আমি তো তোমাকে অতিব্রতী লামা বলেই জানতাম।

এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ঢুকে নানা দিকে কৃতিত্ব দেখাচ্ছ (শুধু পড়াশোনা নয়, কলেজের অপাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যেও ঢুকে) এ বহুৎ সুসমাচার। ম্যাগাজিন পাই নি, পেলে তোমার লেখা পড়ব। শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় (গড়বেতা)—বাঙ্গালীর প্রতিভা সম্বন্ধে তোমার সুলিখিত মতামত পড়ে খুসী হলাম। হেমু অধিকারী কিন্তু বাঙ্গালী ন'ন। শ্রীবিজয়া রায় (কর্ণাল)—তোমার লেখা সকলেই উপভোগ করেছে। তুমি যদি তোমার দাদু, অর্থাৎ তোমার মায়ের কাকা নেতাজী সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু কিছু গল্প—যা বাইরের লোকে বিশেষ জানে না—লিখে পাঠাতে পার তা হলে সবাই খুসী হবে। অনেকেই জানতে চায় কিনা! পরীক্ষার পরে চেষ্টা করতে পার। শ্রীশোভনা সেন (বর্দ্ধমান)—তুমি ঠিকই লিখেছ। কাগজের বাজার ক্রমেই যে অবস্থায় এসে দাঁড়াচ্ছে তাতে দস্তুর মত ভাবনার কথা। সাদা মসৃণ কাগজ তো প্রায় ডুমুরের ফুল! কচিৎ পাওয়া গেলেও দামের দিক্ দিয়ে ধরা-ছোঁয়া যায় না।

কিন্তু ভেবে কি হবে? আজ এখানেই দাঁড়ি টানি—প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ।

—ইতি রাঃ সঃ

এই ভাষার ব্যাপার-স্যাপার

শ্রীঅজিতকুমার তারণ

১৯৪৪ সালের কথা। লড়াইএ যোগ দিয়েছিলাম। সেই সূত্রে এসে পায়ে আঘাত পেয়ে সামরিক হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছি। গভীর রাত্তিরে হঠাৎ কার কান্না শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে দেখ, কাঁদছে, আর কেউ নয়, স্বয়ং আনন্দীলাল, —যে নাকি আমারই শিয়রের কাছে বসে ডিউটি দিচ্ছিল,—নারসিং অর্ডার্লীর ডিউটি।

কারণ জিজ্ঞাসা করতে আনন্দীলাল বলল, "আজ এক বছর বাড়ী ছেড়ে এসেছি, বাড়ী থেকে একটাও চিঠি আসে নি। ভাবুন দেখি মনের অবস্থা। দিনের বেলা তবু এটা-ওটা নিয়ে ভুলে থাকি, কিন্তু রাত্তির বেলা ভোলা যায় না—থেকে থেকে মনে পড়ে বাচ্চা ছেলেটার কথা—চার্লি। হ্যাঁ, আদর করে ওই নামই দিয়েছিলাম ওর—আমি আর আমার স্ত্রী। কি আর করব, তাই শুধু কাঁদি। কেঁদে কেঁদে যদি মনটা একটু হালকা হয়!"

কি জবাব দেব? তবু প্রবোধ দিয়ে বললাম, "যুদ্ধের সময় চিঠিপত্র ঠিকমত আসে না; তা ছাড়া ঠিকানা ভুল কর নি তো?"

"আজ্ঞে না।" জোর গলায় জবাব দিল আনন্দীলাল। তার পর খানিক ভেবে

আবার বলল, "আচ্ছা, আপনিই না হয় আর একবার ঠিকানাটা ভাল করে লিখে দিন। আপনারা পণ্ডিত মানুষ, আপনাদের লেখায় তো আর ভুল হবে না।"

আমি রাজী হয়ে তখনই একটা এয়ার মেল কার্ড বার করে লিখতে সুরু করলাম : "আনন্দীলাল। নার্সিং অর্ডার্লী। ১৩১ জি. এইচ্..."

আনন্দীলাল হেসে বলল, "ও কি হ'ল? আমার আসল নাম তো আর্নল্ড ড্যানিয়েল। তাই লিখুন। আমরা যে নেটিভ ক্রিশ্চান।"

"তবে যে সবাই বলে আনন্দীলাল?"

"ও, তার একটা ইতিহাস আছে। আসবার পথে জাহাজে যারা আমার সঙ্গে ছিল তাদের অনেকেই ভাল ইংরেজী জানত না, ঐ ইংরেজী নাম ধরে ডাকতে ওদের অসুবিধে হ'ত। তাই ওদের একজন বললে, এবার থেকে নামটা একটু বদলে আনন্দীলাল করে নেবে। শুনতে অনেকটা এক রকম কিনা। আমি আর কি করে না বলি? বন্ধু লোক সব। তাইতেই সায় দিলুম। তার পর থেকেই এখানে এসে ইউনিটের সব্বাইকার কাছে আমি আনন্দীলালই হ'য়ে গিয়েছি।"

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। বললাম, "ঠিক হ্যায়, কালই তোমাকে অন্ততঃ খান কয়েক বাড়ীর চিঠি পাইয়ে দেবই দেব।"

পরের দিন—একটা নয়, দু'টো নয়, একেবারে পেয়ে গেলুম মোট ছত্রিশটা চিঠি;—সব কয়টারই প্রাপক আর্নল্ড ড্যানিয়েল।

ক্যাপ্‌টেন মুখার্জি ছিলেন আমাদের কর্তা। তাঁকে সব বললাম। তিনি ব্যাপারটা শুনে তখনই হ্যাভিলদার মেজরকে ডেকে পাঠালেন—কেন এই চিঠিগুলো এত দিন বিলি হয় নি তার জবাব চাই।

"সাহেব, মাফ করবেন, এ নামের কোন লোক আমাদের ইউনিটে নেই। পরে হয়তো বা আসতে পারে অথবা ভারত থেকে আসবার পথে জাহাজডুবিতে লোকটা হয়তো মরে গিয়ে থাকবে।"—বল্লে হ্যাভিলদার মেজর।

আর, ঠিক সেই মুহূর্তেই, 'মৃত' আর্নল্ড ড্যানিয়েল সশরীরে এসে আমার হাত থেকে চিঠিগুলো প্রায় ছোঁ দিয়ে তুলে নিল। আনন্দে সে তখন আত্মহারা।

"আনন্দীলাল, তুমি কি পাগল হ'লে? অপরের চিঠি নিয়ে অমন লাফালাফি করছ কেন?" হ্যাভিলদারের কণ্ঠে বিরক্তির আভাস।

"না না, আর আনন্দীলাল নয়। আমার নামটা এবার থেকে শুদ্ধ করে উচ্চারণ করুন, বলুন আর্নল্ড ড্যানিয়েল। আনন্দীলাল হতে গিয়ে খুব শিক্ষা হয়েছে আমার।"

তার পর? তার পর সবাই যখন আসল ব্যাপারটা শুনল তখন কি হাসিটাই না হাসল সবাই!

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

হেঁয়ালীগুলো এই রকম :—

সুন্দর = সু, বাড়ী = পুরী অর্থাৎ সুপুরী। যেখানে লোকে স্নান করে সেটা ঘাট। অর্থাৎ পাহাড়টা হচ্ছে পশ্চিম ঘাট। বড় গাছটা কাঁটাল গাছ (সামনে কাঁটা, পেছনে ল)। কাঁটালের শেষটা অর্থাৎ 'টাল' সামলাতে পারা গেল না। অনেকগুলো পা মানে ফীট, অর্থাৎ সংজ্ঞাহারা। মানুষের পথ হচ্ছে নরওয়ে—বাংলা নর আর ইংরেজী ওয়ে মেশান দেশ। সবুজ দেশ হচ্ছে গ্রীন্‌ল্যাণ্ড। রাজাটি হচ্ছেন অজাতশত্রু (অজাতের পেছনে শত্রু)। রাজবাড়ী হচ্ছে রাজগৃহ—অজাতশত্রুর রাজধানী। অনেকগুলো পা মানে ফীট, সেগুলো নিয়ে গোলাকার হয়ে গেলে 'পাগোল' হতে হয়।

উত্তরদাতাদের নাম : ঠিক ঠিক উত্তর কারোই হয় নি। আংশিক উত্তর দিয়েছেন—বাবুন (অভিজিৎ) সেন (কলিকাতা-৯); চন্দ্রা বসু (নিউ দিল্লী); কাবেরী চক্রবর্ত্তী

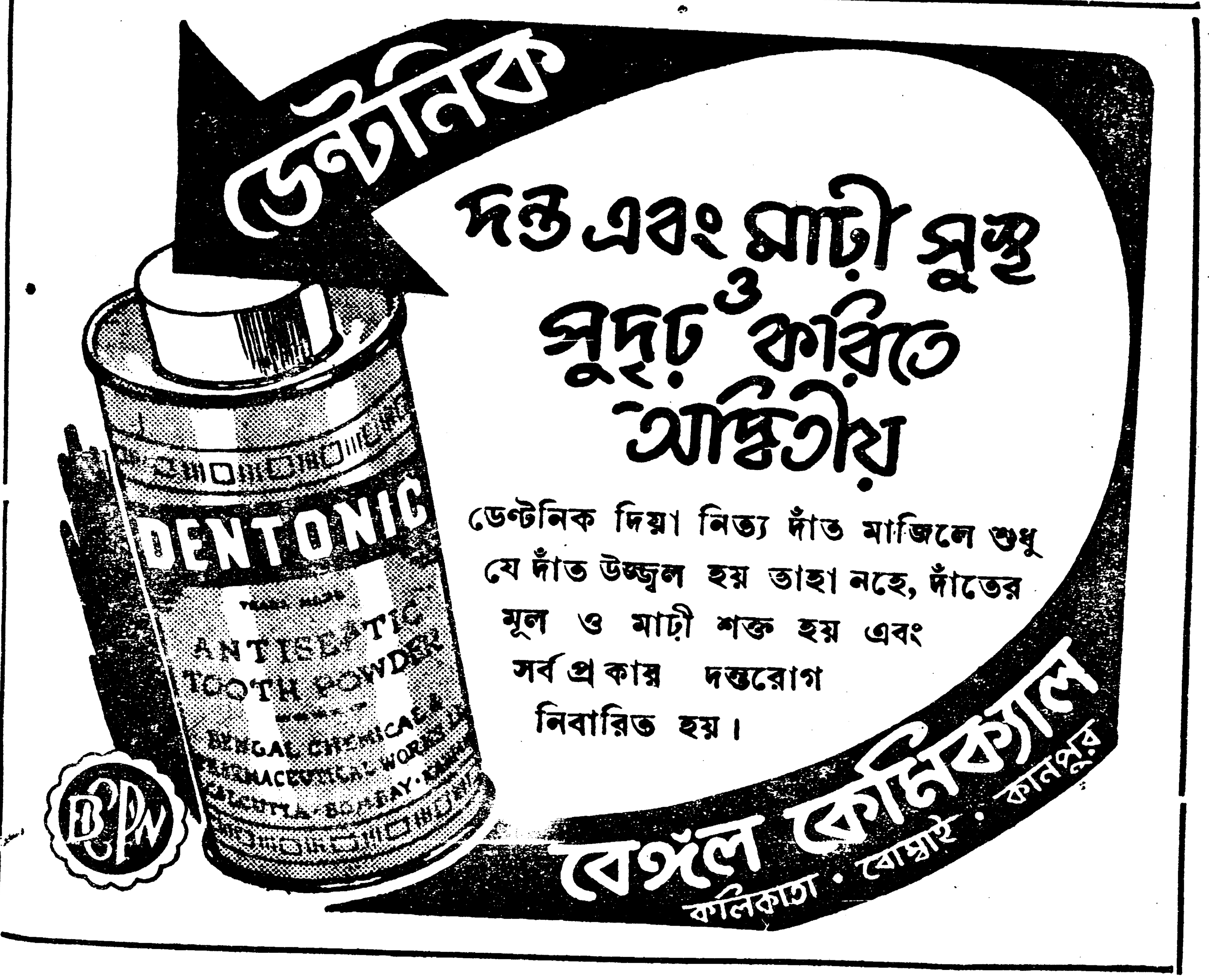

(কলিকাতা-২৯); নির্মল ও বিমল চক্রবর্তী (মেদিনীপুর); শর্মিলা দাস (কলিকাতা-২); নচিকেতা বিশ্বাস (পাটনা); আশালতা দেবী (বর্দ্ধমান); শিখরনাথ, অমিয়, বলাই (এলাহাবাদ); কনক রায় চৌধুরী (কলিকাতা-১২); সীমা ও অসীমা চট্টোপাধ্যায় (বনারস)।

নূতন ধাঁধা

শ্রীঅনামিকা দেবী

টেবিলের ওপর পাশাপাশি দাঁড় করানো রয়েছে দু'খণ্ড ওয়েবষ্টারের ডিক্‌শনারী। দু'টি খণ্ডই খুব মোটা—পুরো চার ইঞ্চি করে পুরু। শুধু বইয়ের ভিতরটা পুরু নয়—মলাটগুলোও বেশ মোটা,—মলাটের এক একটা পিচবোর্ড সিকি ইঞ্চি করে পুরু।

একটি উইপোকার সাধ হ'ল সে প্রথম খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে সুরু করে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত গিয়ে বইটির স্বাদ গ্রহণ করবে। (ঐ ভাবেই পণ্ডিত হওয়া যাবে এই হয়তো তার ধারণা !) এক ইঞ্চি পথ যেতে যদি তার ২ মিনিট সময় লাগে তা হলে ঐ পথটুকু যেতে তার কত সময় লাগবে ? [রামধনু পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে উত্তর পাঠাতে হবে।]

STATEMENT IN FORM IV AS REQUIRED BY RULE 8 OF THE REGISTRATION OF NEWSPAPERS (Central) RULES, 1956

Name of the Newspaper · Ramdhanu.

1. Place of Publication···16, Townshend Road, Calcutta-25
2. Periodicity of its publication Monthly.
3. Printer's Name···Kshitindra Narayan Bhattacharyya.
   Nationality···Indian.
   Address···16, Townshend Road, Calcutta-25
4. Publisher's Name···Kshitindra Narayan Bhattacharyya.
   Nationality···Indian.
   Address···16, Townshend Road, Calcutta-25.
5. Editor's Name··· Kshitindra Narayan Bhattacharyya, M.Sc.
   Nationality···Indian.
   Address···16, Townshend Road, Calcutta-25.
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital···Kshitindra Narayan Bhattacharyya.
   16, Townshend Road, Calcutta-25

I, Kshitindra Narayan Bhattacharyya, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Kshitindra Narayan Bhattacharrya
Signature of Publisher

Date···1. 3. 59.

আজই গ্রাহক হও

শ্রীননীগোপাল মজুমদারের
শব্দ-ভারতী

ছোটদের অভিনব অভিধান
আনুমানিক ৫০ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে।

কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য যাহারা আগে নিজেদের নাম গ্রাহক তালিকাভুক্ত করিবে, শুধু তাহাদের কাছেই বিক্রয় করা সম্ভব হইবে।

গ্রাহক তালিকাভুক্ত হইতে কোন পয়সা লাগে না।

অভিজিৎ প্রকাশনী
৭২।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু-র
(অ-কৃ-ব)

খামখেয়ালী ছড়া
(ছোটদের হাসির কবিতা)

দাম—১'৫০ (দেড় টাকা)

প্রকাশ করেছেন
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭

শ্রীচরণেষু
ফোন : ৫৫-৪০৪৬

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা
প্রতিষ্ঠাতা—গোরাচাঁদ দাশগুপ্ত

* নতুন আদর্শ এবং পরিকল্পনা নিয়ে প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই প্রকাশিত হয়।
* নীট আয় দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যয়িত হয়।
* 'বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর লেখা' এবং 'বিদ্যালয়ের খবর' বিভাগ দু'টি আমাদের সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পিত।
* প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকদের রচনায় প্রতিটি সংখ্যা সুসমৃদ্ধ।

বার্ষিক (সডাক) ৩৲ ষাণ্মাসিক (সডাক) ১৷০ প্রতি সংখ্যা ।০
অন্যান্য বিষয়ের জন্য কর্মসচিবের সহিত পত্রালাপ করুন।

সম্পাদক
শ্রীননীগোপাল দত্ত

'শ্রীচরণেষু' কার্য্যালয়,
৪বি রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৫

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ৷৷০ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১৷৷০ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বি.এ

শুকতারা

ফাল্গুন মাসে দ্বাদশ বর্ষে পড়বে

প্রতি সংখ্যা আট আনা

বার্ষিক চাঁদা পাঁচ টাকা

ষাণ্মাসিক চাঁদা পূর্ব্বের মত আড়াই টাকা

— নীহার রঞ্জন গুপ্তের —

বিষের তীর—১৲ রাতের আতঙ্ক—১৲

রক্তমুখী ড্রাগন—১৲

✱ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ✱

দেড়শো খোকার কাণ্ড

দাম এক টাকা চার আনা

অপরাজিতা-৪৲

ঠানদিদির থলে-৩৲

সুনির্মল বসুর

বরণ ডালা-২৲

আশাপূর্ণা দেবীর

গল্প ভালো আবার বলো-২৲

— নরেন্দ্র দেবের বাছাই করা গল্প —

অনেক দিনের অনেক কথা —২৲

— আশাপূর্ণা দেবীর বাছাই করা গল্প —

শোনো শোনো গল্প শোনো —২৲

— দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত —

ভূত পেত্নী দত্যি দানা —৩৲

ঠাকুরমার ঝুলি —৩৲

পুরনো দিনের পুরনো গল্প —৩৲

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী, কলিকাতা, ফোন-২২-৭২৪৩

লিলি বিস্কুট
জনপ্রিয়তায়
সবার উপরে
রকমারিতায়
স্বাদে ও গন্ধে
অতুলনীয়
লিলি বিস্কুট কোং (প্রাইভেট) লি
কলিঃ-৪

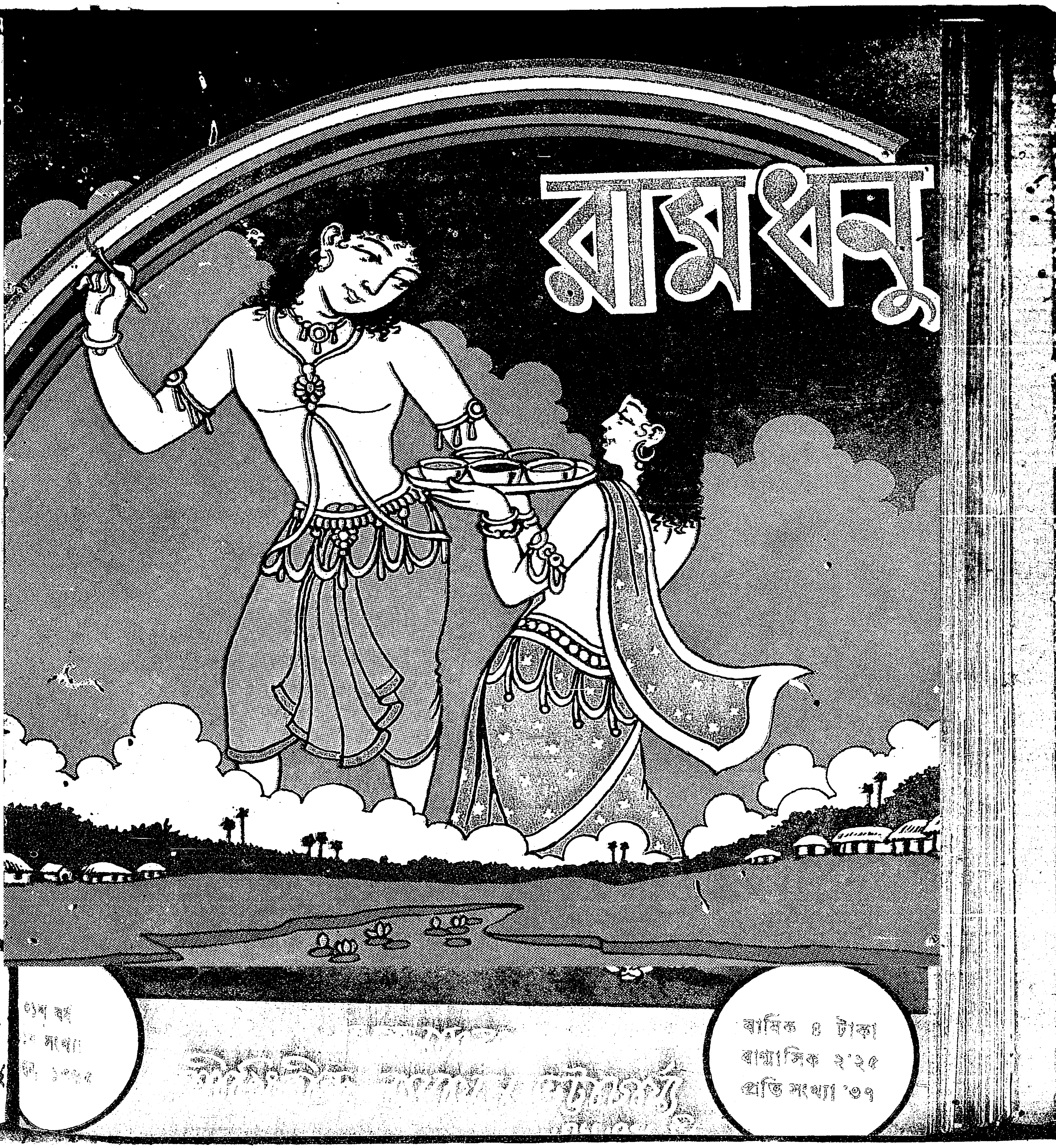

রামধনু
বার্ষিক ৪ টাকা
ষাণ্মাসিক ২'২৫
প্রতি সংখ্যা '৩৭

স্থাপিত – ১৩৩৭ ফোন-৩৫-২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পতাকা মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

/২৷৷০, /৫, ৷৮ সেরা ডাইস্ টীনে,

মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ- শ্রীঅমৃত লাল কুমার।

মিল ও অফিস – ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য সডাক ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২ টাকা ২৫ ন. প., প্রতি সংখ্যা ৩৭ ন প ভি.পি তে নিলে আরও অতিরিক্ত ৭১ ন. প. লাগে। নমুনার জন্য ৩৯ ন.. প.র ডাকটিকেট পাঠাতে হয়। বিনামূল্যে নমুনা পাঠানো সম্ভব নয়। ভি পি.তেও নমুনা পাঠানো হয় না।

২। বৈশাখে বছর সুরু, যে কোনও মাসে চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যায়; কিন্তু পত্রিকা নিতে হবে বৈশাখ কিংবা কার্ত্তিক থেকে! তবে এতে অসুবিধা হলে মাঝের সংখ্যাগুলো খুচরা হিসাবে নিয়ে বৈশাখ বা কার্ত্তিক থেকে নিয়মিত ভাবে নেওয়া যেতে পারে।

৩। কোন মাসে পত্রিকা না পেলে ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে তাঁদের উত্তরসহ সেই মাসের মধ্যে আমাদের জানাতে হবে।

৪। পাকিস্তানের গ্রাহকেরা ব্যাঙ্ক মারফৎ (যে সব ভারতীয় ব্যাঙ্কের পাকিস্তানেও শাখা আছে) ড্রাফ্ট্এ চাঁদা পাঠাতে পারেন। এর নিয়মকানুন ব্যাঙ্কে খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। আমাদের লিখলে আমরা Proforma Invoice পাঠাতে পারি।

৫। গ্রাহকদের সব চিঠিতেই গ্রাহক নং দিতে হবে। চিঠির জবাবের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাকটিকেট দিতে হবে।

৬। লেখা, কপি রেখে, সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। সাধারণ বিভাগে যে কেউ লেখা পাঠাতে পারেন। তা ছাড়া গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখায় উৎসাহ দেবার জন্য একটি পৃথক্ বিভাগও আছে।

৭। বিজ্ঞাপনের হার চিঠি লিখলে জানানো হয়। টাকাকড়ি. চিঠিপত্র প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা— ম্যানেজার, রামধনু; ১৬, টাউনসেণ্ড রোড. কলিকাতা-২৫। (টেলিফোন : ৪৮-৩১৮১)

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

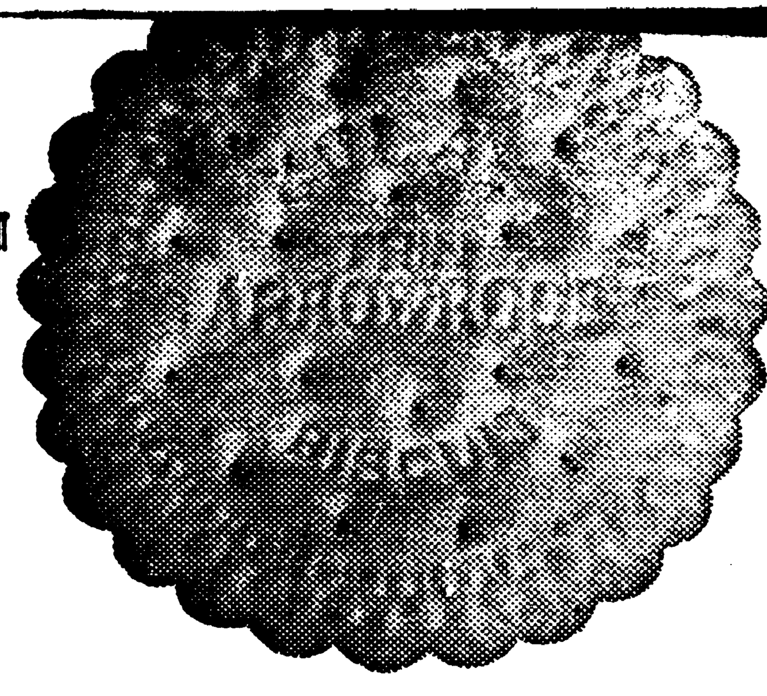

বিজ্ঞাপনের মতামতে

কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে?

স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,

'থিনের' মধ্যে; গুনে, স্বাদে সবার সেরা "কোলে"

অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,

সবরকমের "কোলে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

ভিটামিন সমৃদ্ধ

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড, সুলেখা পার্ক
কলিকাতা -৩২ হইতে প্রচারিত।

প্রবেশ নিষেধ

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩১শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৬৫ { ১১শ সংখ্যা

মাটির ঘরে জনম আমার

শ্রীঅজিতেন্দ্র সিংহ

বিল কুমড়ীর পথের ধারে
বেনেবুড়ীর গাছ,
কুমড়ী বিলের কালো জলে
রূপো রঙের মাছ।

ধূলো বালির পথের ধারে
ছোট্ট মেটে ঘর,
মাথায় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে
রোদ-বৃষ্টি-ঝড়।

গাঁয়ের মাটির মানুষ আমি,
মাটির ঘরে বাস ;
এই ঘরেতে শীত বসন্ত
কাটাই বারো মাস।

ঝিঁঝির ডাকে বনের ফাঁকে
ঘনিয়ে আসে রাতি,
দৃষ্টি আসে ঝাপ্‌সা হয়ে,
নিজেই নিজের সাথী।

ঝিরি ঝিরি হাওয়ায় কেঁপে
বনফুলের বাসে
আমার ঘরের ওপর দিয়ে
সন্ধ্যা নেমে আসে।

একটু পরে জানলা দিয়ে
দেখি—উঠোন ভরে
কুচি কুচি চাঁদের আলো
পড়ছে ঝরে ঝরে।

তোমরা থাক অট্টালিকায়,
লোভ নাহি মোর তায় ;
মাটির ঘরে তৃপ্ত আমি—
মাটির আঙ্গিনায়।

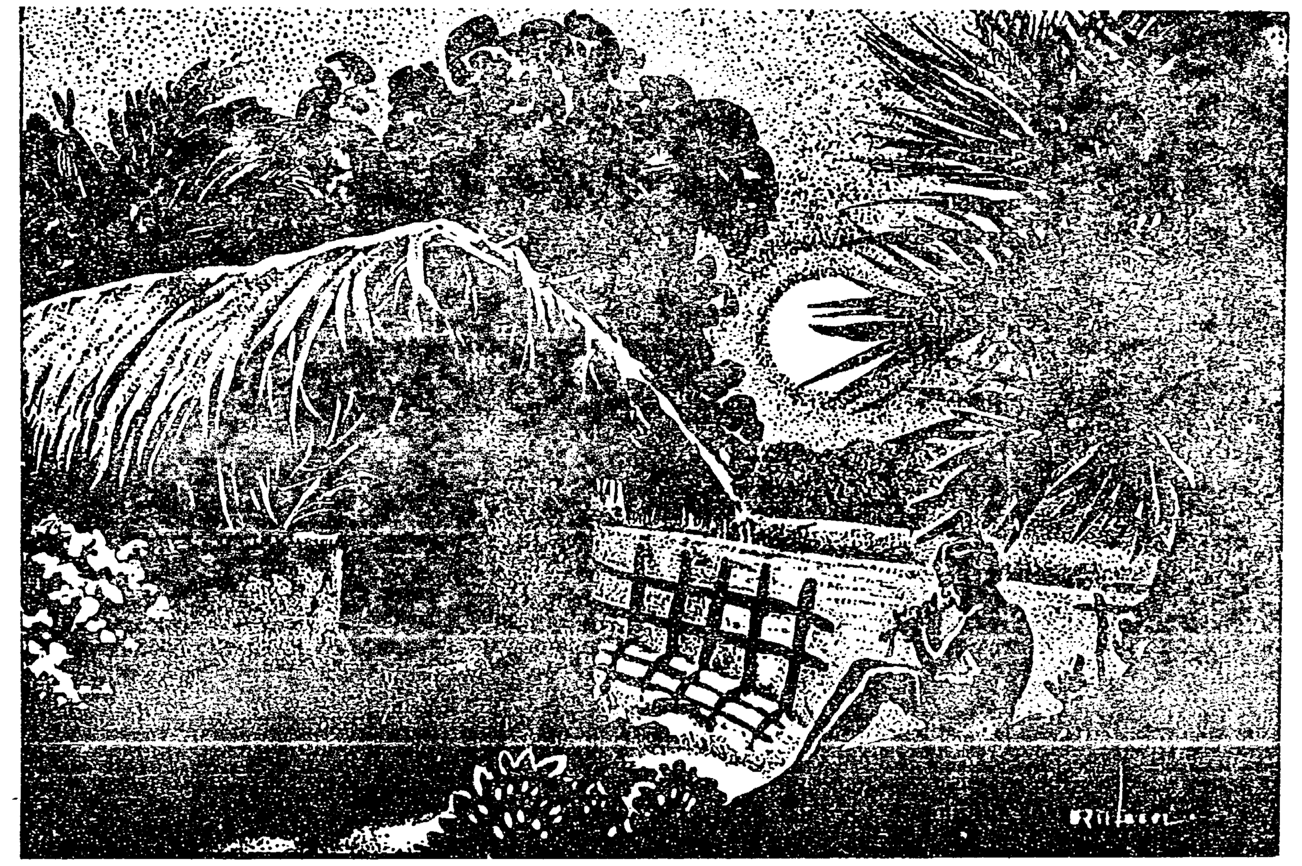

রাজবাড়ীর হাতী

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

তোমরা হাতী আর তার খেলা সার্কাসে অনেকেই দেখেছ, কেউ কেউ হয়ত হাতীর পিঠেও চড়েছ। তা ছাড়া বইতে তোমরা পোষা হাতী, বুনো হাতীর কত গল্প পড়েছ। আমি তোমাদের এক রাজবাড়ীর একটা পোষা হাতীর গল্প বলছি।

বোম্বের অন্তর্গত কোলাপুর রাজ্যের পুরানো রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বারে সর্ব্বদা দুটি হাতী বাঁধা থাকত। রোজই রাজ্যের ছেলেমেয়েরা ভীড় করে হাতী দু'টাকে গিয়ে দেখত। আমরাও মাঝে মাঝে গিয়ে ছেলেমেয়েদের হাতী দেখিয়ে আনতাম। হাতী দুটোর পা মোটা মোটা শিকল দিয়ে বাঁধা থাকত। আর দেখা যেত হাতী দুটো সব সময় কেবল দুলছেই—দুলছেই।

একদিন গিয়ে দেখতে পেলাম মাটির উঁচু ঢিবির মত একটা হাতী মাটিতে শুয়ে আছে, আর তার পিঠের উপর মাহুত বসে আছে জলভরা একটা বালতী নিয়ে। মাহুতের হাতে বড় একটা ঝামা পাথর ; সে তাই দিয়ে ঘষে ঘষে হাতীর গায়ের ময়লা তুলছে, আর হাতীটা চুপ করে সেই স্নানের আরাম উপভোগ করছে। অত বড় হাতীটার পিঠে মাহুতকে একটা ছোট্ট ছেলের মত দেখাচ্ছিল।

রাজবাড়ীতে অনেকগুলো হাতী ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে পুরানো হাতীটার আকৃতি ছিল বিরাট। সেটা যেমি উঁচু তেমি লম্বা আর মোটা। মাঝে মাঝে মাহুত হাতীটাকে নিয়ে সহরে বেড়াতে বের হ'ত। বহুদূর থেকে হাতীর গলার ঘণ্টার টুঙ্‌ টুঙ্‌ আওয়াজ শুনে সবাই ছুটত রাস্তায় হাতী দেখতে। রাজ্যের বিশেষ বিশেষ উৎসবে এই হাতীকে খুব সুন্দর করে সাজানো হ'ত। হাতীর কপাল ও লম্বা শুঁড়টা সাদা ও লাল গুঁড়ো দিয়ে চিত্রিত করে সোনার ও রূপোর বড় বড় ফুল দিয়ে অলঙ্কৃত করা হ'ত। মাহুত হাতীর গলায় বড় রূপোর হার ও পায়ে রূপোর নূপুর পরিয়ে দিয়ে হাতীর অলঙ্কার-পর্ব্ব শেষ করত। সেই সুসজ্জিত হাতীর পিঠে সোনার হাওদায় বসে মহারাজা "দশরার" সময় সোনা লুট করতে বের হতেন।

একবার লর্ড আরউইন যখন রাজ্য পরিদর্শন করতে আসেন তখন এই অতিকায় হাতীটাকে খুব জমকালো ভাবে সাজিয়ে তার পিঠে সোনার কারুকাজ-করা হাওদা বসানো হ'ল। তারপর সেই হাতীর পিঠে মই লাগিয়ে দেওয়া হ'ল হাওদায় চড়বার জন্য। লর্ড আরউইনের জন্য একটা হাতীর গাড়ী তৈরী হ'ল। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। হাতীর

পিঠের উচ্চতার সঙ্গে গাড়ীর সামঞ্জস্য রাখবার জন্য বড় বড় চাকার উপর খুব উঁচু একটা কাঠের গাড়ী তৈরী হয়েছিল। সেটাতে বসতে হলে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। লর্ড আরউইনের একটা হাত ছিল নকল – মেসিনের তৈরী। সেই নকল হাতে ছড়িটা রেখে অপর হাতে সিঁড়ি ধরে ধরে তিনি হাতীর গাড়ীতে চড়ে বসলেন। রাস্তা দিয়ে যখন হাতীর গাড়ী যাচ্ছিল তখন দুদিকে জনতা ভীড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। সে দৃশ্যটা কতকটা লিলিপুটের রাজধানীতে গালিভারের চিত্র মনে করিয়ে দিচ্ছিল। মহারাজা তাঁর ঐ বিশাল হাতীটাকে গাড়ীতে জুতে দিয়েছিলেন অতিথিকে বিশেষ সম্মান দেখাতে।

হাতীটা বেশ বুড়ো ছিল, ক্রমে ক্রমে আরো বুড়ো হ'ল। একদিন রাজ্যে খবর রটে গেল যে সেই হাতীটা মরে গেছে। রাজবাড়ীর অঙ্গন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। সেই বুড়ো হাতীর যে শবযাত্রা হ'ল তা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একটা বিরাট প্ল্যাটফর্ম্ম তৈরী করে তার নীচে চাকা লাগান হ'ল। তারপর বহু বলিষ্ঠ লোকের চেষ্টায় কয়েক ঘণ্টার পর হাতীটাকে তার উপরে তোলা হ'ল। যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিমন্ত্রাদি বলা হলে বিরাট বিরাট ফুলের মালা দিয়ে মৃতদেহটাকে ঢেকে দিয়ে শবযাত্রা সুরু হ'ল। পথে জনতা তার উপর পুষ্পবর্ষণ করতে লাগল। সেই গাড়ীতে অনেকগুলি বলদ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। পালোয়ানরাও মৃত হাতীর তক্তপোষটা টেনে নিয়ে যেতে লাগল। বড় বড় রাজপথ ঘুরে তারা সহরের বাইরে গিয়ে পৌঁছল। এই মিছিলের সঙ্গে শোকবাদ্য বাজছিল। তারপর বহু মজুর মাটি-পাথর খুঁড়ে বিরাট একটা গর্ত্ত করল, হাতীটাকে তার মধ্যে কবর দেওয়া হ'ল। তবে হাতীর সুবৃহৎ মূল্যবান্ দাঁত দুটি কবর দেবার পূর্বেই কেটে রেখে দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যের লোক এই বুড়ো হাতীটাকে খুব ভালবাসত।

হাতী যখন ক্ষেপে যায় বা পাগল হয়ে যায় তখন তারা বড় নিষ্ঠুর কর্ম্ম করে। এবার একটা পাগলা হাতীর গল্প বলছি। পুরানো রাজপ্রাসাদের কিছু দূরে সহরের এক প্রান্তে হাতী খেলার এক ময়দান ছিল। পুরানো মহারাজের আমলে রাজ্যে মাঝে মাঝে হাতী খেলা হ'ত, আর রাজ্যের যত লোক ভেঙ্গে পড়ত সেই খেলা দেখতে। এই হাতী ও মানুষের লড়াই বড় চিত্তাকর্ষক ছিল। পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা বিরাট ময়দান, বহু উপরে দর্শকদের বসবার গ্যালারী। চার-পাঁচ হাজার দর্শক একসঙ্গে বসে এই খেলা দেখতে পারত। ময়দানের নাম "সাঠমাড়ী"।

খেলার প্রাঙ্গণে দূরে দূরে মজবুত পাথরের তৈরী ছোট ছোট আশ্রয়স্থল ছিল। তার দরজা এত সরু যে হাতী তার ভিতর ঢুকে মানুষকে আক্রমণ করতে পারত না। হাতীটাকে এনে খেলার ময়দানের বড় দরজা খুলে সেই পাঁচীল-ঘেরা অঙ্গনে ছেড়ে দেওয়া হ'ত।

হাতীটাকে খেলার আগে বেশ করে মদ খাইয়ে নেওয়া হ'ত। আশ্রয়ের স্থানে বর্শা, অঙ্কুশ —এ সব নিয়ে আরো লোক সতর্ক ভাবে লুকিয়ে থাকত, আর লড়াইয়ে লোকটা মল্লগীরের মত কাপড় পরে, হাতে বর্শা নিয়ে ক্রীড়াঙ্গনে নেমে পড়ত। লোকটা হাতীটাকে বর্শা মেরে পালিয়ে একটা পাথরের ঘরে লুকিয়ে যেত। হাতীটা যখন লোকটাকে খুঁজতে থাকত তখন অন্য দিক্ থেকে লোকটা বের হয়ে এসে আবার হাতীটাকে আঘাত ক'রে আর একটি পাথরের ঘরে লুকিয়ে পড়ত। এই ভাবে লোকটা মত্ত হাতীটাকে বর্শা দিয়ে আঘাতের পর আঘাতে বিপর্য্যস্ত করে পাথরের ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রাণ রক্ষা করত, আর হাতীটা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। কোন কোন সময় হাতীটা লোকটাকে শুঁড় দিয়ে ধরে ফেলত, কিন্তু আশপাশের প্রহরীরা এসে লোকটিকে ছাড়িয়ে নিত।

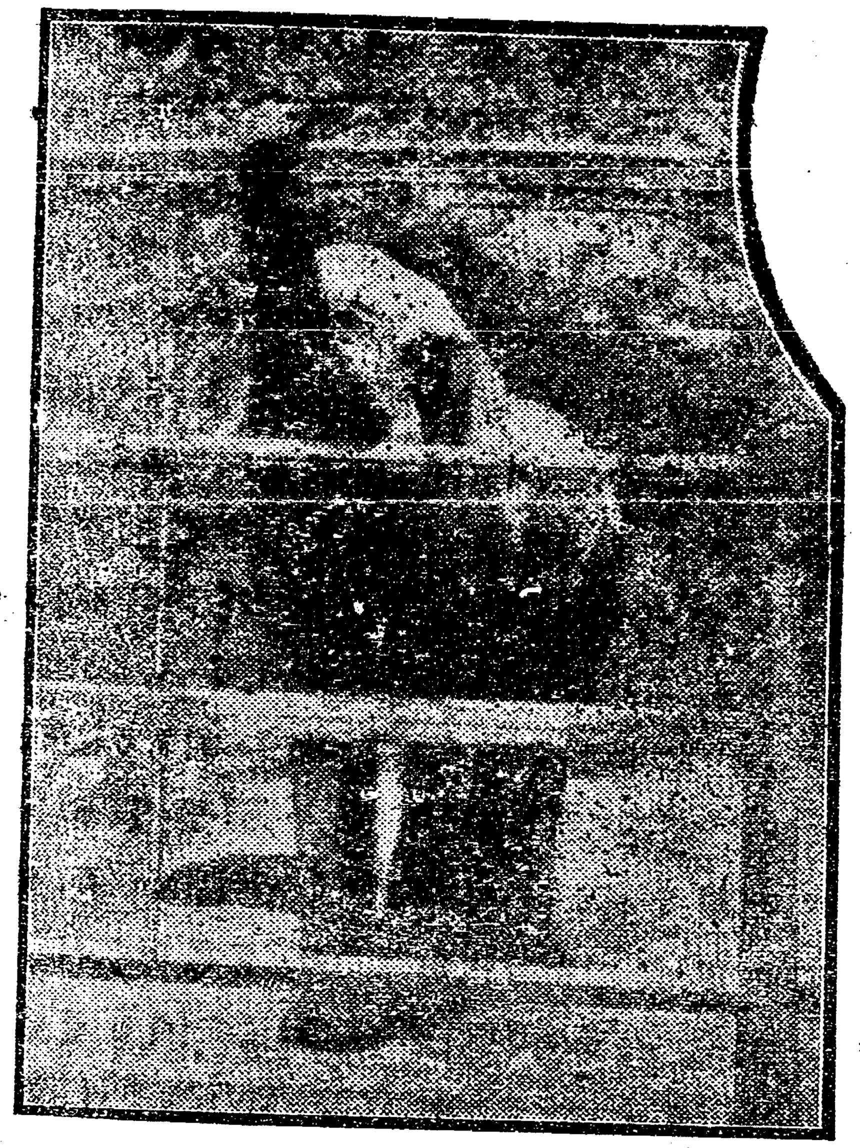

লোহার রেলিং দিয়ে হাতীকে আটকে রাখা হয়েছে।

দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধের মত এ সব খেলা দেখত। চারদিকে উল্লাসের চীৎকার আর হাততালি পড়ত ক্রমাগত। এ যেন অনেকটা স্পেন দেশের ষাঁড়ের লড়াইএর মত। মহারাজের মৃত্যুর পরে নতুন মহারাজার আমলে হাতীর লড়াই বিশেষ হয় নি।

একবার রাজার একটা হাতী পাগল হয়ে যায়। একদিন এই হাতীটা দরজা খোলা পেয়ে পালিয়ে যায় ও সামনে একটি স্ত্রীলোককে দেখে আছড়ে মেরে ফেলে। মাহুতরা সারাদিন হাতীর খোঁজে ঘুরল কিন্তু হাতীটাকে ধরতে পারল না। অবশেষে মাহুতগুলি হাতে বড় বড় লোহার বাঁধানো রিং নিয়ে লুকিয়ে রইল। তারপর হাতীটার দেখা পেয়ে দূর থেকে তার পায়ে রিং ছুঁড়ে ছুঁড়ে হাতীটাকে ধরে ফেল্ল এবং সাঠমাড়ীর অঙ্গনে তাকে সতর্ক ভাবে আটকে রাখা হ'ল। হাতীটা সেখানে একা একা থাকে, খায়-দায়। একদিন রাজার পুরানো এক মাহুত মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে ওদিকে চলছিল। হাতীর ময়দানটা দেখে তার সেই পুরানো দিনের হাতীর সঙ্গে লড়াইএর স্মৃতি মনে

জাগল। সে দেয়ালের উপর উঠে খুব আস্ফালন করতে করতে চীৎকার করে বল্লে, "আয় আদরী, দেখি তোর কত কুদরৎ! আমার সঙ্গে লড়বি?" বলে চোখের পলকে মাতাল মাহুত দিলে এক লাফ সেই ময়দানে। আর যায় কোথা! পাগলা হাতীটা ছুটে এসে মাহুতকে এক পা দিয়ে চেপে ধরল, তারপর শুঁড় দিয়ে তার গলাটা পেঁচিয়ে ধরে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাকে শেষ করে দিল। বেচারা বুড়ো মাহুতের সেই শোচনীয় পরিণাম কল্পনার অতীত ছিল।

এর কয়েক বৎসর পর এই রাজ্যের নিকটবর্ত্তী অপর এক রাজ্যে এমনি এক নিদারুণ ঘটনা ঘটে। সেদিন রাজপুত্রের বিবাহ উপলক্ষে রাজ্যে খুব উৎসব চলছিল। নানা রকম আমোদ-আহ্লাদ চলছে, অগণিত জনতা চারদিকে ভীড় করে আছে। প্রসেশন বের হবে,—ব্যাণ্ড, শানাই, জয়ঢাকএর আওয়াজে রাজ্য সরগরম। রাজ্যের হাতী, ঘোড়া, উট একে একে সুসজ্জিত করে দাঁড় করানো হয়েছে। মাহুত হাতীর খেলা দেখাচ্ছে। কখনও হাতীটা নূপুর পায়ে নাচছে, কখনও বা শুঁড় দিয়ে মাউথ অরগ্যান ধরে বাজাচ্ছে। কখনও বা শুঁড় তুলে রাজা সাহেবকে সেলাম করছে। জনতার কৌতূহল তৃপ্ত করবার জন্য মাহুত বারে বারে হাতীকে দিয়ে এ সব করাচ্ছে। শেষে হাতীটা এত সব খেলা দেখাতে দেখাতে ত্যক্ত হয়ে উঠল। এদিকে রাজা খুব খুসী হয়ে হাতীকে সাবাস্ দিতে গেলেন। মাহুত হাতীর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর জানায়। রাজা সাহেবও হাতীকে আদর করবেন, তবে মাহুতের মত মাথায় হাত না বুলিয়ে তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে হাতীর পিঠে ধীরে ধীরে মেরে তাঁর আদর জানাতে চাইলেন। ত্যক্ত হাতাটা হয়তো মনে করল রাজা বুঝি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে আঘাত করছেন। চোখের পলকে, জনতা কিছু বোঝবার আগেই, হাতীটা চট করে ফিরে মাথা দিয়ে রাজা সাহেবকে জোরে ধাক্কা দিতে দিতে নিকটবর্ত্তী পাঁচীলে ঠেসে ধরল। দুটো দাঁত মহারাজার শরীরে বিদ্ধ হ'ল, বুকের পাঁজর গেল ভেঙ্গে। রাজা সাহেবের প্রাণহীণ দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, জনতা আর্তনাদ করে উঠল। তক্ষুণি হাতীটাকে গুলি করা হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে হাতীর বিরাট মৃতদেহটাও মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আনন্দোজ্জ্বল রাজপ্রাসাদ শোকে নিমগ্ন হয়ে গেল। বিবাহ হয়ে গেল স্থগিত, বিবাহের শোভাযাত্রা করুণ শবযাত্রায় পরিণত হ'ল।

১৯

সমস্ত ব্যাপারটা যখন এইভাবে ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠছিল, সেই সময় ডক্টর রামশাস্ত্রীর আগমনে আমরা অনেকটা সাহস পেলাম।

সমস্ত শুনে রামশাস্ত্রী বললেন, অন্ধকারের মধ্যে খানিকটা আলো পাওয়া যাচ্ছে।

বললাম, কি রকম?

তিনি বললেন, পুরোহিত নিশু ঘোষাল জানতেন যে মূর্ত্তির চোখের জন্য যে কোনও সময়ে যে কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেজন্য তিনি মাটি দিয়ে চোখের নীলা দু'টিকে ঢেকে রাখতেন। তার পর যেদিন মূর্ত্তি চুরি গেল, সেদিনকার কাথাটা ভেবে দেখ। নীলাম্বর ঘটক বলেছিলেন যে ডাকাতরা হা রে রে রে করে চীৎকার করে এসেছিল; সেই চীৎকার শুনে নিশু ঘোষাল ছুটে আসেন, কিন্তু নীলাম্বর ঘটক বাড়ী থেকে বেরোন নি। এইবার ভেবে দেখো দিকিনি, মূর্ত্তি চুরি করে তা থেকে চোখের পাথর দুটো উপড়ে নেওয়াই যদি চোরের অভিপ্রায় হয়, তাহ'লে তারা চুপি চুপি রাত্তিরে এসে মন্দিরের তালা ভেঙ্গে ঠাকুর নিয়ে পালাবে কিংবা সেখানেই বসে চোখের পাথর দুটো উপড়ে নেবে এইটাই তো স্বাভাবিক। তারা হা রে রে রে চীৎকার করে আসতে যাবে কেন? এইখানেই যেন একটু খটকা থেকে যাচ্ছে। কাজেই আমার মনে হচ্ছে এ সম্পর্কে আসল ঘটনাটা জানতো নিশু ঘোষাল। তার ভাগ্নে বংশী হয়তো সে সময় থাকতো এখানে, তার মামার কাছে, কাজেই সেও কিছু কিছু জানে। এবং, আর একজন, যিনি বেশ কিছু জানেন, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং নীলাম্বর ঘটক।

একটু থেমে রামশাস্ত্রী বলতে লাগলেন, এটাও অসম্ভব নয় যে ডাকাতির মূলে ছিলেন হয়তো নীলাম্বর। তিনিও এসেছিলেন চুরি বা ডাকাতির উদ্দেশ্যে। তার পর বংশী আর নিশু ঘোষাল বাধা দিতে যায়। ঘোষালের মাথায় লাঠি মেরে যখন চোরেরা পালায় তখন বংশী হয়তো চিনতে পেরেছিল নীলাম্বরকে। তা নইলে সে ও কথা বলবে কেন যে নীলাম্বরকে বলবেন যে বংশী চাটুয্যে ফিরেছে, আর নিস্তার নেই ?

ভেবে দেখলাম রামশাস্ত্রীর অনুমান বোধ হয় সত্য। বললাম, তা হ'লে এখন কি কর্ত্তব্য ?

তিনি বললেন, প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে নিশু ঘোষালের সন্ধান নেওয়া। তিনি যদি বেঁচে থাকেন তবে তাঁর মুখ থেকে সমস্ত ঘটনাটা শুনলে এই গোলকধাঁধা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কিন্তু তাঁর সন্ধানটা পাওয়ার উপায় কি ?

খুব শক্ত নয়। বংশী বলেছিল যে তাঁর ছেলে কলকাতায় কোনও পোষ্ট অফিসে কাজ করে। বিশ-বাইশ বছর আগেকার ঘটনা। তখন সে ছেলে পোষ্ট অফিসে চাকরি করতেন, সুতরাং এত দিনে তিনি বেশ সিনিয়র হয়েছেন কিংবা চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন। পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের অফিস থেকে খোঁজ করলে নমিন্যাল রোল পাওয়া যাবে, তাতে যে ক'জন ঘোষাল আছেন তাঁদের নামগুলো প্রথমে বেছে ফেলতে হবে। তার পর দেখতে হবে তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ বিশ বছরের বেশী দিনের চাকরি ক'জনের ? সে রকম ঘোষাল মশাইদের সংখ্যা খুব বেশী হবে না বলেই মনে করা যেতে পারে। তার পর সেই ক'জনের মধ্যে খুঁজে দেখতে হবে কার বাপের নাম নৃসিংহ ঘোষাল। কাজেই অনুসন্ধান পর্ব্বটা মোটেই শক্ত নয়। সে লিষ্টের মধ্যে যদি না পাওয়া যায়, তখন দেখতে হবে গত কয়েক বছরের মধ্যে ঘোষাল উপাধিধারী চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন ক' জন। নিশ্চয়ই দুশো পাঁচশো লোক নয়। কাজেই পোষ্ট অফিসের চাকরির সূত্র থেকেই নিশু ঘোষালকে খুঁজে বের করা সহজ।

আমি আর দিলীপ তাঁর সঙ্গী হবো কিনা কিংবা এখনও এখানে থেকে প্রাতঃস্নান আর সাত গণ্ডূষ জল খেয়ে শূন্য মন্দিরে পূজা দেওয়ার অভিনয় করবো জিজ্ঞাসা করলাম।

রামশাস্ত্রী বললেন, তোমাদের এখন এখানে থাকাই বাঞ্ছনীয়। নীলাম্বর ঘটকের কাছে বংশীর কথাটা বলতে হবে এবং তাতে কি রকম প্রতিক্রিয়া হয় সেটা লক্ষ্য করতে হবে। তার পর আমাদের আসল জানবার কথা সে মূর্ত্তিটা কোথায় ? চোখের নীলার জন্য যারা মূর্ত্তি চুরি করেছিল তারা নিশ্চয়ই সেই ভারি পাথরের মূর্ত্তি নিয়ে

বেশী দূর যায় নি। নীলা দুটো খুলে নিয়ে মূর্ত্তি কোথাও ফেলে দিয়েছিল। আমরা নীলার জন্য ব্যস্ত নই, আমাদের আসল উদ্দেশ্য হোল মূর্ত্তির উদ্ধার করা।

সুতরাং স্থির হোল যে রামশাস্ত্রী যখন ওদিকে নিশু ঘোষালের সন্ধান নেবেন, এদিকে আমরা নীলাম্বরের কাছ থেকে মূর্ত্তির ব্যাপারে যতটুকু পারি সন্ধান নেবার চেষ্টা করবো।

অতি সামান্য ঘটনা থেকে বড় বড় আবিষ্কার পৃথিবীতে হয়েছে, তার অনেক বিবরণ আমরা স্কুল-কলেজের বইতে পড়েছি।

অবশ্য কোনও বড় আবিষ্কারের সঙ্গে আমাদের এই ঘটনার তুলনা করতে চাই না, কিন্তু আর একটা ছোট্ট সূত্র থেকে আমরা আর খানিকটা আলোর আভাস পেলাম।

আমাদের জীর্ণ ঘরখানি এবং উঠানটুকু ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করা এবং আমাদের চায়ের বাসনগুলো ধুয়ে দেওয়ার জন্য যে বৃদ্ধাটি নিয়োজিত হয়েছিল তার নাম পাঁচুর মা। ঘটক মহাশয়ই এ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

হঠাৎ সেদিন মনে খেয়াল হোল যে পাঁচুর মা স্থানীয় লোক এবং বয়সও ষাটের উপর। সুতরাং বিশ বছর আগে হা রে রে রে করে যে ডাকাতি হয়েছিল, এবং যার ফলে পুরোহিত নিশু ঘোষাল হয়েছিলেন আহত এবং মন্দিরের মূর্ত্তি হয়েছিল অপহৃত, তার খানিকটা বিবরণ পাঁচুর মা নিশ্চয়ই জানে। সুতরাং তাকে সোজাসুজি ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

পাঁচুর মা বললে, মনে আর থাকবে না কেন বাবা ? দেখতে দেখতে কত কাল হয়ে গেল, তবু তো মনে হয় সেদিনের কথা ! ষেটের কোলে আমার পাঁচু তখন আড়াই বছরের। ছেলেটার গায়ে তখন মায়ের দয়া হয়েছে, সারারাত ছটফট করে, একবারও দু'টি চোখের পাতা বোজায় না। আমিও সারারাত তাকে কোলে করে একবার ঘর একবার বার এই করে বেড়াচ্ছি। তা বাবা, নিশুতি রাত্তির, কোথাও কিছু নেই, একেবারে ডাক ছেড়ে চীৎকার,—ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে রে ! পাঁচুর বাবা তখন বেঁচে। আমি ছুটে গিয়ে তাকে বললাম, শীগ্‌গির দেখ, কে চেঁচিয়ে উঠেছে আমবাগানের মধ্যে ! সে তো তখনই লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে বেরুলো। কিন্তু বাবা, ওই একটি কথা ছাড়া আর কোনও কথা শুনতে পাই নি। পাঁচুর বাবাও ফিরে এসে বললে—সর্ব্বনাশ হয়েছে গো, আমাদের ঠাকুর মশাইয়ের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে ! আমরা সবাই ধরাধরি করে দিয়ে এলাম তাঁকে বাড়ীতে। কি রক্তারক্তি কাণ্ড ! তার দু'দিন পরে দারোগা এলো, আর সব কত লোক এলো। শুনলাম মন্দির থেকে ঠাকুর চুরি হয়ে গিয়েছে। এমন কথা

কখনও শুনি নি বাবা। ঠাকুর-দেবতার গায়ে হাত দিলে তো হাত খসে যায় এই শুনেছি। তা এখন কলিকাল, কতই হবে!

বললাম, তবে যে শুনেছিলাম হা রে রে রে চীৎকার করে ডাকাতের দল এসেছিল?

কই,, তা তো শুনি নি বাবা। পাঁচুর জন্যে তো সারা রাত্তিরের মধ্যে একটু শুতেও পারি নি, ঘুমুতেও পারি নি। ডাকাতির চেঁচামেচি হলে কি আর শুনতে পেতাম না? কানের মাথা তো আর খাই নি। আর তা হলে ওই কথাটা কি করেই বা শুনতে পেলাম?

বললাম, তা হলে সোরগোল করে ডাকাতির কথাটা মিথ্যে?

পাঁচুর মা বললে, সত্যি কি মিথ্যে তা ভগবান্ জানেন বাবা। তবে আমরা তো কিছু শুনি নি।' ঘোষাল মশাইয়ের মাথা ফেটে গিয়েছে, হৈ হৈ কাণ্ড তাই নিয়ে। তার পর তাঁর ছেলে এসে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গেল। এই ঘরেই তো তিনি থাকতেন।

আমার মনের সন্দেহটা বেড়েই গেল। একটা কোনও অসামঞ্জস্য কোথায় যেন রয়েছে সেটা বেশ বুঝতে পারলাম। রামশাস্ত্রীর কথাটা মনে যেন দাগ কেটে দিয়েছে। চীৎকার এবং সোরগোল করে ডাকাতের দল একটা নির্জ্জন মন্দিরের দেবমূর্ত্তির চোখের মণি লুঠ করতে আসবে কেন? কোন ব্যক্তি যদি লোভাতুর হয়ে থাকে সেই নীলা দু'টির জন্য তাহ'লে সে নির্জ্জনে এসে চুপি চুপি তার কাজ শেষ করবে। বড় জোর তার দুই-একজন সহকারী থাকতে পারে।

কিন্তু নীলাম্বর ঘটক বলছেন—ভীষণ চীৎকার করে ডাকাতের দল এসেছিল, অথচ পাঁচুর মা বলছে যে নিশু ঘোষালের আঘাত পাওয়ার চীৎকার ছাড়া আর কোনও চীৎকার তারা শুনতে পায় নি।

কেমন যেন খটকা লাগলো। একটা গোপন রহস্য এর মধ্যে রয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় অতিথিশালায় আমাদের প্রসাদ-ভোজনের সময় ঘটক মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, দিলীপ বাবুর অম্লশূলের কিছু উপশম হোল?

অম্লশূল ব্যাপারটায় আগাগোড়া মিথ্যা অভিনয় করে এসেছি। কাজেই বললাম, আগে যে রকম হেঁচকি উঠে খুব কষ্ট হ'ত, এখন কিছুদিন দেখছি যে সে রকম আর হয় না।

প্রসঙ্গটা যখন উঠলো তখন তার সুযোগ নিলাম। বললাম, ঠাকুরের স্বপ্নাদেশ

পেয়ে আমরা তো আমাদের কাজ করে যাচ্ছি, কিন্তু শূন্য বেদীতে পূজা দিয়ে ঠিক ফল পাওয়া যাবে কিনা তা তো জানি না।—বলেই জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, ঘটক মশাই, ঠাকুর চুরি হয়ে যাওয়ার কথা একদিন আপনি বলেছিলেন। কি ব্যাপারটা ভাল করে বলুন তো। চুরি যাওয়ার পরে আপনারা আর ঠাকুরের উদ্ধারের চেষ্টা করলেন না একেবারেই?

ঘটক মশাই বললেন, আমি তো আর মালিক নই। রাজাদের কাছে আমি কি আর বলতে কসুর করেছি? কিন্তু তাঁরা যদি কোনও ব্যবস্থা না করেন তবে আমি আর কি করতে পারি? তার পর তিনি আবার বললেন সেই ডাকাতির কাহিনী, যে কথা ইতিপূর্বে বলেছিলেন। হা রে রে রে চীৎকার করে একদল ডাকাতের আবির্ভাব, নিশু ঘোষালের মাথায় লাঠি মারা, তার পর মূর্ত্তি চুরি হওয়া।

আশ্চর্য্য! অথচ পাঁচুর মা নিশু ঘোষালের আর্ত্তনাদ শুনতে পেল, কিন্তু দলবদ্ধ ডাকাতদের চীৎকার শুনতে পেল না!

এইবার বললাম, আচ্ছা, ঘটক মশাই, বংশী চাটুয্যেকে চেনেন?

দু'টো ভ্রূ কুঁচকে উঠলো নীলাম্বর ঘটকের। বললেন, কি চাটুয্যে বললেন? বংশী? বংশী চাটুয্যে? কই, না তো! কেন বলুন দিকি নি?

বললাম, নিশু ঘোষালের ভাগনে তিনি। তিনি এসেছিলেন সেদিন রাত্রে। হঠাৎ এসেই আবার হঠাৎ চলে গেলেন। আপনাকে জানাতে বলেছেন তাঁর ফিরে আসার খবর।

হঠাৎ যেন ঘটক মশাইয়ের মুখখানা বেগুনি হয়ে উঠলো। একটু সামলে উঠেই বললেন, ওহো, ঘোষালের ভাগ্নে বংশী? তাই বলুন। এসেছিল নাকি? সে তো বহুকাল নিরুদ্দেশ তাই জানতাম। কোথায় ডাকাতি না খুন করে নিরুদ্দেশ হয়েছিল কিংবা দ্বীপান্তরে গিয়েছিল জানি না। সেই বংশী? হঠাৎ এখানে তার শুভাগমন হোল কেন? কবে এসেছিল?

তারিখটা বললাম এবং জানালাম যে তাঁর মামার খোঁজে এসেছিলেন।

ঘটক মশাই আর কোনও উত্তর দিলেন না। মুখখানা যেন তাঁর গম্ভীর হয়ে উঠলো।

(ক্রমশঃ)

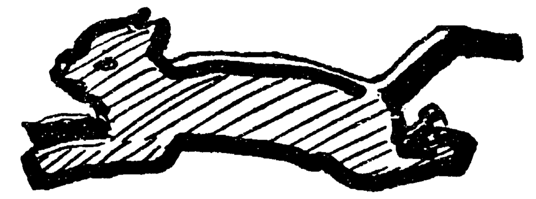

রায় বরুয়ার শিকার কাহিনী

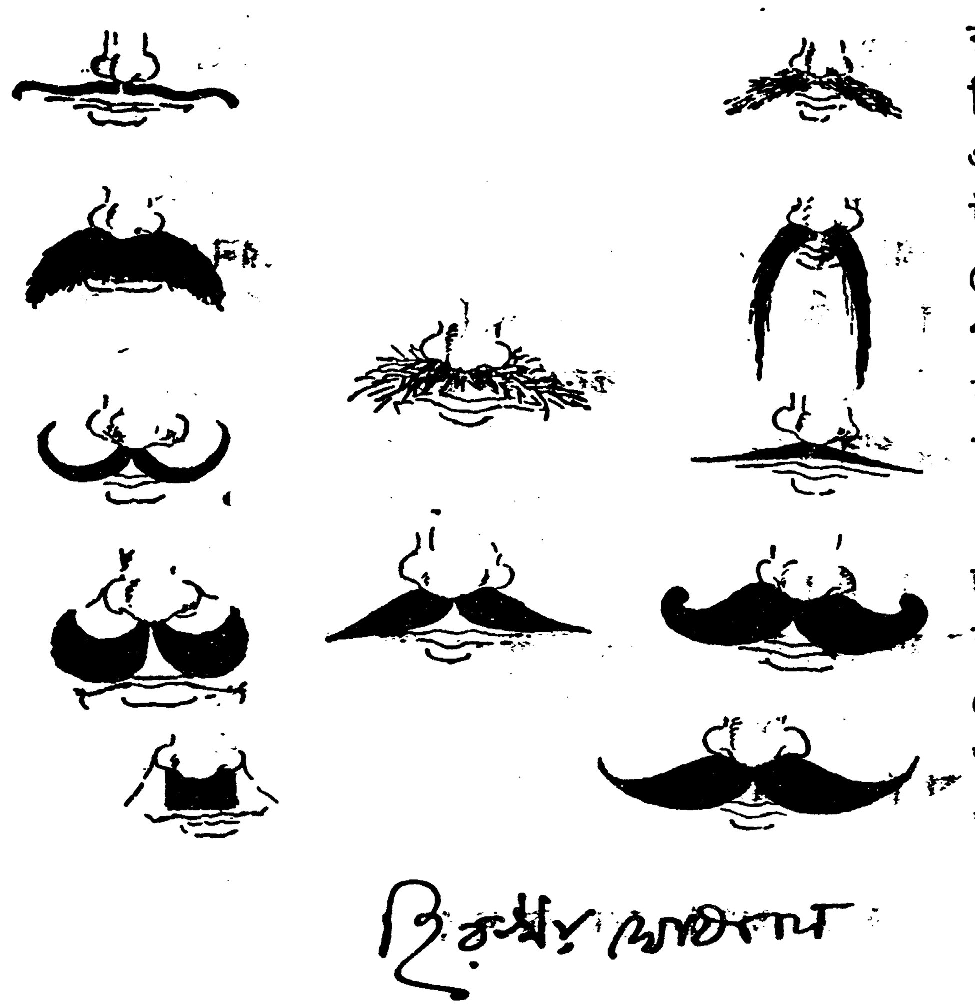

কপি-কড়াইশুঁটার পূর দেওয়া সিঙাড়া পাতে দেওয়া যায় বটে, কিন্তু খড়ের পূর দেওয়া হাতী ঘরে রাখা চলে না। রায় বরুয়ার হাতী শিকারের বিশেষ কোনো সাক্ষাৎ প্রমাণ নেই। আছে শুধু হাতীর দাঁতের দাবা-বড়ে, তাজমহল, দেব-দেবীর মূর্তি আর নানান্ রকমের পুতুল। মহীশূরে তৈরী। কোন্ হাতীর দাঁতের, তাতে গল্পের কিছু আসে যায় না।

নাহারকোটিয়া হয়ে জয়রামপুর ছাড়িয়ে আর একটু দূর গেলেই কতকগুলো জঙ্গলে-ঢাকা পাহাড় দেখা যায়। এখন সেগুলোর অনেকখানি তিরাপ্-সীমান্ত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জঙ্গলের আর একটু ভেতরে গেলে কিছু কিছু মানুষের বসতি পাওয়া যায়। ওদের বলা হয়, "নক্‌টে"। তাদের তিনটে ছোট ছোট রাজ্যও আছে। বরত্নরিয়া, নাম্‌সাং আর লাপ্‌তাং। বহু শতাব্দী পূর্বে এরা আসে হুকং উপত্যকা থেকে, নূনের খোঁজে। নূনের ঝরণা এখানে প্রচুর। তাই পশুপক্ষীও অজস্র সংখ্যায় আসে এদিকে নূনের সন্ধানে। নক্‌টেরা সাধারণতঃ করে পানের চাষ। এদের উদ্বৃত্ত অবসর কাটে শিকারে। বনের পথে প্রায়ই দেখা যায় নক্‌টে শিকারে চলেছে। পরিধানে যৎসামান্য বস্ত্র, কাঁধে বন্দুক, সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। তার ওপর এদের অনেকেই বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছে। মাথায় হৃষ্টপুষ্ট শিখার গুচ্ছ।

একবার এদেরই এক রাজা রায় বরুয়াকে শিকারে আমন্ত্রণ করেন। ব্যবসা সংক্রান্তে জয়রামপুরে সাক্ষাৎ হয়, সেই সামান্য পরিচয়েই নিমন্ত্রণ। আতিথেয়তা এদের মজ্জাগত। আসামের এক পরাজিত রাজা গদাধরকেও এদের এক রাজা আশ্রয় দিয়েছিলেন। "গদাধর ও জয়মতীর" কাহিনী আসামে সর্বজনবিদিত।

জয়রামপুর থেকে সাতালা (বা ছাতালা—এখানে এক সময়ে ছাতাওয়ালাদের বসতি ছিল)। তারপর পাহাড়ে চড়তে হয়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় গহন জঙ্গল। বিরাট বিরাট নাহার, মাকাই, হুলুং আর হলক্। তাদের আশ্রয় করে উঠেছে মোটা বেতের লতা,

বড় বড় কচুপাতার মত পাতা। বৃক্ষ-লতার আচ্ছাদনে বনতলের মধ্যাহ্ন মধ্যরাত্রে পরিণত হয়। তার সঙ্গে অবিরত পাহাড়ে ঝিঁঝির ডাক জঙ্গলগুলোকে যেন চিররাত্রির মোহে আবিষ্ট করে রাখে।

অন্ধকারের মোহে যুক্ত হয় নূনের লালসার মোহ। দুর্দমনীয় সে লালসা। পাখী আর নিরামিষাশী জীবের পক্ষে তা একেবারে অসম্বরণীয়। আসে সম্বর নূনের ঝরণার কাছে, দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্য হয়ে। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘ। আসে পাখী সচকিত সতর্কতায় একটি একটি করে পা ফেলে। অতি সন্তর্পণে খায় এক ঢোক নোনতা জল। দু' ঢোক। তখন তাকে পেয়ে বসে অদম্য তৃষ্ণা। বারংবার ঠোঁট ডুবিয়ে আশ মেটে না। ঝোপের আড়ালে ওৎ পেতে বসে আছে খাস্তো, পাটকিলে, ডোরা-কাটা, বাহারে-লেজ-ওয়ালা খেঁকশেয়ালী। চক্ষের নিমেষে পাখীটার টুঁটী টিপে ধরে বনের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। ঘন আগাছার তলায় হিংসায় মুহ্যমান বিষাক্ত বোড়া সাপ বিকৃতমস্তিষ্কের মত অবিরত জিহ্বা উদ্‌গার করে চলে। জঙ্গল তোলপাড় করে ফেরে বুনো হাতীর পাল,—যেন সচল অন্ধকারের উত্তাল তরঙ্গ,—সর্বগ্রাসী প্রলয়ের মত অনিবার্য।

রায় বরুয়া সঙ্গে এনেছেন তাঁর বিশ্বস্ত 455 মন্ত্রসঙ্গী হিসেবে। আসল ব্যবহারের, জন্যে আছে 22, কারণ তাঁর আসা শুধু পাখী শিকারের জন্যে, বড় জোর দু' একটা খাস্তো। জন্তুগুলো সত্যই বাহারে। তাঁর শিলঙের সুন্দর বাংলোটার বারান্দায় সাজিয়ে রাখবার এমন জিনিষ আর নেই।

রাজার বাড়ীতে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো। কচ্ছপের পিঠের মত পাশাপাশি কয়েকটা পাহাড়। লিলিপুট্‌রা যদি বড় একটা কচ্ছপের পিঠে উঠতে চেষ্টা করতো, তা হলে তাদের যে অবস্থা হতো, রায় বরুয়াকেও সেই ভাবে এক পা এগিয়ে দু' পা পিছলে আস্তে আস্তে শামুকের গতিতে চড়তে হয়েছে। জঙ্গল জ্বালিয়ে দিয়ে তারই ছাইয়ে ঝুম-রীতিতে এখানেও চাষ করার রেওয়াজ। সুতরাং যে পাহাড়গুলোর স্থানে স্থানে বসতি সেখানে হাতে-নাতে-ধরা-পড়া চোরের খোবলানো মাথা কামানোর মত অবস্থা। পা পিছলে গেলে হাকুপাঁকু করে ধরবার একটা অবলম্বন সচরাচর দেখা যায় না। দু'-এক জায়গায় বন্দুকের কুঁদো পাহাড়ে চড়া-লাঠি "আলপেন্‌ষ্টকে"র মত মাটীতে গেঁথে গেঁথে উঠতে হয়েছে। তাতে বন্দুক দু'টোর গায়ে লাগুক না লাগুক, রায় বরুয়ার হৃদয়ে বারংবার মোক্ষম চোট লেগেছে। তার ওপর জোঁক।

ওসব অঞ্চলে জোঁকের একেবারে স্বায়ত্তশাসন। তা ছাড়া গেরিলাযুদ্ধে তারা এমন পাকাপোক্ত যে কে কখন কোন্ দিক্ দিয়ে আক্রমণ করবে কিছু জানা যায় না। সব চেয়ে সাংঘাতিক চাল হচ্ছে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে টুপ করে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে কামিজের গলবেষ্টনীর ফাঁক দিয়ে ভারতনাট্যমের তাল ফেলে পিঠের মাঝখানে গিয়ে হাজির হওয়া। তাকে পাকড়ায় কার সাধ্যি? তার ওপর দোসর মিললে তো কথাই নেই। সারা পিঠময় পরস্পরকে অন্বেষণ করে বেড়াবে। তারপর সাক্ষাৎ হলে উভয়েই সমতালে ভারতনাট্যম্! কিছু পরে তোমার পিঠের সঙ্গে লয় হয়ে যাবে।

তখন খোলো জামা, সোয়েটার, কামিজ, গেঞ্জী। ততক্ষণে ওরা চামড়া ভেদ করে দু' সূতো ভেতরে চলে গেছে। তা ছাড়া এমন জায়গাটি মনোনয়ন করেছে যেখানে পিঠ চুলকোতে অপরের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। নগ্নগাত্রে যে মোষের মত গাছে গা ঘষবে, কিংবা ঘোড়ার মত চিৎ হয়ে মাঠে শুয়ে পড়ে হিঁহিঁ চিঁহিঁ করে পিঠ রগড়াবে তারও উপায় নেই। সর্বত্র ওরা। সম্মুখযুদ্ধতেও ওরা পেছপাও নয়। রায় বরুয়া বলেন, উনি যে কোনো দিন বিনা হাতীয়ারে দুর্দ্ধর্ষ ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত, কিন্তু পশ্চাদ্ধাবনরত জোঁকসেনা তাঁর কাছে এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। বনজঙ্গলে প্রায় মানুষ থাকে না, এবং জোঁকের কাছে নররক্ত একেবারে অমৃত সমান। ওর একবিন্দু পান করতে পারলে জোঁকের 'পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'। সুতরাং মানুষের সন্ধান একবার পেলে হয়! পালে পালে ছুটে আসে খানা, ডোবা, পচা পাতার আশ্রয় ছেড়ে। অনেকখানি পথ রায় বরুয়াকে রামদৌড় দিয়ে আসতে হয়েছে ওদের সংঘবদ্ধ আক্রমণ থেকে শরীর ও আত্মা দুইই রক্ষা করবার জন্যে। ওদের কবলে পড়লে আত্মাকেও ওরা চুষে ঝাঁঝরা করে দেয়।

রাজগৃহে পৌঁছনো মাত্র এলো অতিথিজনোচিত পাদ্য-অর্ঘ্য নয়, এলো আঁটি আঁটি তামাকের পাতা। দু'জন চাকর রায় বরুয়ার সর্বাঙ্গে তামাকের পাতা ঘষে জোঁক ছাড়াতে বসলো। মুঠো মুঠো ছিনে আর খুনে জোঁক।

ঘণ্টা দুই পরিচর্যার পর যখন রায় বরুয়া সম্বিৎ ফিরে পেলেন, তখন রাজা স্মিতহাস্যে তাঁকে জোঁক-শিকারে সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানালেন। ভাবার্থ—উনি যেন জোঁক শিকারের উদ্দেশ্যেই এ অঞ্চলে এসেছেন। উক্তিটায় একটু ঠেস দেওয়া আছে বৈকি! জোঁক যাদের কাছে ভয়াবহ জন্তু, তারা বাঘ বা বুনো হাতী দেখলে মূর্চ্ছা যাবে, নিশ্চয়। রায় বরুয়ার পক্ষে এমত অভিমত অপমানসূচক তো বটেই, পরন্তু রাজার প্রচ্ছন্ন শ্লেষ তাঁর শিকারীর আত্মসম্মানকে যুদ্ধে আহ্বান করলে। তিনি বীরদর্পে ঘোষণা করলেন, তাঁর শিকারে আসার প্রধান উদ্দেশ্য দুশ্‌মন্‌ হাতী সংহার করা। ধারে-কাছে কোনো দুশ্‌মনের সন্ধান পাওয়া গেছে কী?

দুশ্‌মন্‌? বিলক্ষণ! বুনো হাতী যেখানে অজস্র সেখানে দুশ্‌মনের অভাব নেই। এই তো সেদিন তাঁর হাতীধরার এক পুরোনো ওস্তাদকে ছাতু করে দিয়েছে এক দুশ্‌মন্‌। রাজা উত্তর দিলেন।

সে এক মর্মন্তুদ কাহিনী, রাজা বললেন। ইতোমধ্যে আহার্য ও পানীয় এনেছেন সুয়োরাণী স্বহস্তে। আদা ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে রাঁধা শূকর-মাংস, ভাত আর পানীয় "জূ"। ঘরের মাঝখানে অগ্নিকুণ্ডে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

ঐ আহার্য ও পানীয় রায় বরুয়ার শিকারী বেড়ালের গোঁফের মত বিরল ও আত্মচেতন গুম্ফরাজির অনুকূল নয়। কারণ ও-দুটোকে আত্মসাৎ করার পর খাড়া খাড়া গোঁফগুলোকে না চেটে উপায় নেই। ও দুটোর স্বাদের সবটাই যেন সেগুলোতে লেগে আটকে থাকে। জিহ্বা তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লেহনকার্যে ব্যাপৃত হয়। ঠিক এই সময়টিতেই "শিকারী বেড়ালের

গোঁফ দেখলেই চেনা যায়" এই প্রবাদ বচনটি যেন মূর্ত হয়ে ওঠে, যদিচ জিহ্বার তরফ থেকে বিচার করতে গেলে তার পক্ষে তা আদৌ প্রীতিপ্রদ নয়। রায় বরুয়া মাঝে মাঝে আপন অভ্যাস মত বুড়ো আঙ্গুলের পিঠ দিয়ে গোঁফ চুমরে ডাইনে এবং বাঁয়ে মোড় ফেরাবার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলেন—শার্দুল-মাতৃস্বসৃরা আহারান্তে যেমন করে থাকেন। রায় বরুয়ার অনুরূপ ভঙ্গীতে বড় তফাৎ এই যে তা তাঁর আভ্যন্তরীণ উত্তেজনার পারচায়ক।

দুশ্‌মন হাতীর এমন কী ভয়ঙ্কর কাহিনী হতে পারে যা রায় বরুয়া হেন সিদ্ধহস্ত, মাভৈঃ-বক্ষ, শীত-শোণিত শিকারীর মনে ভীতি উৎপাদন করতে পারে? রাজা আধা-অসমীয় আধা-নকৃটেতে যে বিবরণ দিলেন তা এই:

রাজার প্রচুর জমীজমা (যার কৃষিকার্যের তিনি স্বয়ং তত্ত্বাবধান করেন) থাকা সত্বেও সংসারের রাজোচিত ঠাট বজায় রাখবার জন্যে কিঞ্চিৎ উপরি আয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই প্রয়োজন মেটান তিনি হাতী-ধরা ব্যবসায়। রাজারাজড়ার সিংহদ্বারে হাতী বাঁধার রেওয়াজ উক্ত উষ্ণীষধারীদের অন্তর্ধানের সঙ্গে অন্তর্হিত হলেও দেশে হাতীর চাহিদা বিশেষ কমে নি। গভীর জঙ্গলে গাছ কেটে কাঠ সরাবার কাজ আজও সারসযন্ত্র দ্বারা সম্ভব নয়। কতকটা সংস্কার হেতু, যেমন শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে মস্তকমুণ্ডন আধুনিক চিরুণী-ক্ষুর দ্বারা সম্ভব নয়; কতকটা অনিবার্যতা হেতু, যেমন চালা বাঁধতে উঠতে লিফ্‌ট্‌ বা হেলিকপ্টার কাজে লাগে না, মই ছাড়া উপায় নেই। মোট কথা, হাতীর বাজারে এখনও মন্দা পড়ে নি। সরকারের কাছ থেকে হাতী ধরার সত্ব কিনে, যদি কপাল ভালো হয়, বেশ দু' হাজার দশ হাজার কামানো যায়।

হাতী ধরায় শুধু মুনাফা নয়, ও-অঞ্চলে হস্তীকুলকে নির্মূল করবারও তা প্রধান উপায়। হাতীর উপদ্রবে ওদিকে সবাই থরহরি-কম্প। হাতীদের মধ্যে কেমন যেন একটা দুষ্টুছেলেমি ভাব আছে। খামখা গ্রাম আক্রমণ ক'রে মাত্র খেয়াল মেটাবার জন্যে ওরা ঘরদুয়ার নিয়ে কখনো কখনো ফুটবল খেলে যায়—পাহাড়ের নীচে নদীতে নামবার পথে। পথের ওপর পড়ে-থাকা ইটপাটকেল দেখলে আমাদের যেমন পা নিস্‌পিস্‌ করে, ওদেরও তাই।

রাজার তাঁবেতে হাতী ধরাতে পোক্ত বেশ একটি বাহিনী আছে যারা বিরাট বিরাট পাল থেকে বহু হাতী হাতিয়েছে। রাজার হাতীধরা ওস্তাদ ঐ ব্যবসাতেই চুল পাকিয়েছিল। লোকটা কাচারী জাতীয়। রং কুচ্‌কুচে কালো, খুব লম্বাও নয় বেঁটেও নয়; গায়েতে অদ্ভুত শক্তি। যে কাটা-গাছের গুঁড়ি চারজনে নড়াতে পারে না তা সে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বেশ দু'-দশ কদম দূরে সরিয়ে রাখতে পারতো। একটু মোঙ্গলীয় মুখের ছাঁদ, তাতে সর্বদাই একটা অস্পষ্ট মৃদু হাসি লেগে থাকতো। অপর পক্ষের ধূর্ততা বুঝতে পারার স্বগত হাসি। সারা জীবন কাটিয়েছিল বনেজঙ্গলে। বন্যজন্তুর জীবনসংগ্রামে শত্রুর কপটতা খণ্ডন করবার জন্যে যে ছলকৌশলের প্রয়োজন তা তার ধাতগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর সে ছিল একেবারে অকুতোভয়। বাঘ, ভাল্লুক, বুনো মোষ, অজগর বা অন্য কোনো হিংস্র জীবের আচম্‌কা সাক্ষাতে সে একটুও বিচলিত হতো না। ওদের স্বভাব, রীতিনীতি,

চলাফেরা সম্বন্ধে তার ছিল প্রচুর অভিজ্ঞতা। অন্ধকার রাত্রিতে জঙ্গলের শুকনো পাতায় খস্‌খস্‌ আওয়াজ শুনে সে বলে দিতে পারতো—তা কোন্ জানোয়ারের চলার শব্দ।

বুনো হাতীকে সে পরোয়া করতো না। শুধু শিকারে শিক্ষানবিসদের কখনো কখনো বলতো—জঙ্গলের সব জন্তুর মধ্যে হাতী সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। হাতী সম্বন্ধে সে একটু সতর্ক ছিল এই পর্যন্ত। কিন্তু পালের সন্ধান আনা, ফাঁদ বানানো, হাতী ধরে তাকে পোষ মানানো, এ সব কাজে তার দ্বিতীয় ছিল না। রাজার সে ছিল বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং অভিযান-দলের সে ছিল দলপতি। পাহাড়ের গা বেয়ে সরীসৃপ-পথ ধরে সে চলতো সবার আগে।

কিছু দিন আগে সে এক বড় পালের সন্ধান এনেছিল। রাজার বাড়ী থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে এক জঙ্গলে ফাঁদ বানালে নাকি গোটা দশেক বাচ্চা ধরা যায়। মুনাফা কম-সে-কম্ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার। হাতীর দলপতি খুব হুঁশিয়ার বটে, কিন্তু একটু বুড়ো গোছের। সঙ্গে দু' চারটে নই-হাতিনী, বাদ বাকী বাচ্চা আর তাদের মা'রা। ছলে-কৌশলে বাচ্চাগুলোকে পোঁত-গাড়া গলির ভেতরে ঢোকাতে পারলে আর তারা বেরুতে পারবে না। কারণ মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারে এমন জায়গা নেই গলির ভেতর। আর যদি দু'-একটা গাভীনী বাচ্চার মায়ায় কোন রকমে ঢোকে তাদেরও ফেরার পথ নেই। দলপতির বপু এতই বিশাল যে ঐ গলির মধ্যে সে ঢুকতেই পারবে না। অবশ্য পোঁতগুলো বেশ শক্ত করে পুঁততে হবে। বড় বড় গাছের খোঁটা হাত পাঁচ-ছয় করে মাটীতে পোঁতা।

রাজার হুকুমে ফাঁদ বানানো হলো অতি সন্তর্পণে। তার মধ্যে পায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হলো একটা পোষা হাতী। তার কাছে প্রচুর হস্তী-মুখরোচক নানা খাদ্য, যথা—চাল, ছোলা, কলা। এমন ভাবে, যাতে পোষা হাতীটা তার নাগাল না পায় অথচ তার হাতীর ভাষায় জানান দেয় যে কাছেই অঢেল সুখাদ্য ঢের-দেওয়া।

এইবার রাজা, দলপতি এবং হাতীধরা সাঙ্গোপাঙ্গ সরু পাহাড়ে পথ ধ'রে, একে অপরের পিছে পংক্তি করে ধীরে ধীরে চললেন, পালের ও-পাশ দিয়ে বাচ্চাগুলোকে ঘেরোয়া করবার জন্যে। কারো মুখে রা'টি নেই। শুধু মাঝে মাঝে পেছন ফিরে চোখের ভাষায় একে অপরকে সতর্ক করে দেয়।

তখন রোদ পড়ে আসছে। পাহাড়ের গায়ে বাঁশঝাড়গুলোর কাশফুলের মত সাদা ফুলগুলোয় অস্তগামী সূর্যের গোধূলিমা ধরতে শুরু করেছে। সবার মনে আশা, আশঙ্কা ও মাঝে মাঝে খুসীর ঝলক। কাজ হাসিল হয়ে গেলে হবে ভোজ, মিলবে বক্‌শীস্‌। তারা কিছু দূর গেছে এমন সময়ে শুকনো পাতার ওপর খস্‌ খস্‌ শব্দ শোনা গেল। দলপতি কাচারী থম্‌কে দাঁড়িয়ে সঙ্কেতে অন্য সবাইকে এগোতে নিষেধ জানালে।

বেশীক্ষণ কান পেতে শুনতে হলো না। খস্‌খস্‌ শব্দ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো, এবং তার সঙ্গে মটমট করে আগাছা ভাঙ্গার শব্দ মিশে জানিয়ে দিলে কাছেই একটা হাতী হুড়মুড় করে এগিয়ে আসছে।

দলপতি কাচারী জানালে, "দুশ্‌মন্ হাতী, পালাও। পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে নীচে

পড়ো, সাপ-খোপের ভয় ক'রো না, গড়াতে গড়াতে হাত-পা ভাঙ্গে ক্ষতি নেই, একেবারে পাহাড়ের তলায় গিয়ে পড়ো ক্ষতি নেই। শীগ্‌গির, শীগগির! এসে পড়লো বলে!" হাতীর হাত থেকে রক্ষা পাবার পাহাড়ে অঞ্চলে আর কোনো উপায় নেই। সবাই তা জানে। দলপতিও তা জানে। অথচ সে নিজে?

সবাই পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়লো নীচের দিকে। এবং নানা গাছে আটকে পড়ে স্পন্দিত হৃদয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। আর দলপতি কাচারী? তার বহু বৎসরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা সত্বেও সে হঠাৎ আত্মসংযম হারিয়ে ফেলে যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে লাগলো। এরূপ নিবু্দ্ধিতার বিরুদ্ধে সে বহুবার শিক্ষানবিসদের সতর্ক করে দিয়েছে। বারংবার বলেছে, হাতীর সঙ্গে দৌড়ে নিস্তার নেই। হাতী ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার চেয়েও বেগে দৌড়তে পারে। বিশেষতঃ দুশ্‌মন্ হাতী। অথচ শেষ পর্যন্ত সে মাথা ঠিক না রাখতে পেরে বাতুল আতঙ্কে দিগ্বিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রাণপণে দৌড়তে লাগলো। আক্রান্ত জীবের আত্মরক্ষার বোধ হয় একমাত্র স্বতঃপ্রণোদিত রীতি পলায়ন।

নীচের লোকেরা দলপতির পায়ের দ্রুতবিক্ষেপ স্পষ্ট শুনতে পেয়ে চীৎকার করে ডাকতে লাগলো, "পাহাড়ের গায়ে নেমে পড়ো, নেমে পড়ো, দৌড়ো না।" দলপতির পায়ের শব্দ থামলো না। পেছু পেছু শোনা গেল মাটী-কাঁপানো, ক্ষিপ্র, চলন্ত ভূমিকম্পের গুম্ গুম্ আওয়াজ। নিমেষেই সে আওয়াজ পায়ের শব্দকে গ্রাস করে ফেললে। দূরে শোনা গেল কাচারীর করুণ আর্তনাদ, "মোল্লোই রে!" তারপর ভূমিকম্পের আওয়াজ থেমে গিয়ে শুকনো পাতার খস্‌খসানিতে পরিণত হয়ে আস্তে আস্তে বনভূমির বিরাট পাতা-ঝরা নিস্তব্ধতায় শব্দের বুদ্বুদের মত বিলীন হলো।

দলের লোকেরা পথে উঠে এসে দলপতিকে খুঁজতে লাগলো। তার-নাম-ধরে-ডাকা পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় প্রতিধ্বনিত হলো। কোনো উত্তর এলো না। কিছু দূর গিয়ে পাওয়া গেল দলপতির মৃতদেহ। শুধু ধড়। দুশ্‌মনের লাথিতে মাথাটা দেহচ্যুত হয়ে প্রায় বিশ গজ দূরে ছিটকে পড়েছে।

বিবরণ শেষ করে রাজা বললেন, দুশ্‌মন্ হাতীটাকে না মারলে এ অঞ্চলে বাস করা কঠিন হবে। কাচারী দলপতিকে হত্যা করার পর থেকে সে যেন একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। দু'-একটা গ্রাম এর মধ্যেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। নানা ক্ষেতের শস্য নষ্ট করে তছ্‌নছ্‌ করে দিয়েছে। তার জন্যে হাতী ধরাও অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

দুশ্‌মন্ হাতী দলে থাকে না। সে জন্মাবধি একক। জন্মায়ও একক হয়ে'। আকারে সে অন্য হাতী থেকে পৃথক্, যদিও সাধারণ গাভীনীর কোলেই তার জন্ম। একলা থেকে থেকে তার খামখেয়ালি কেবলই বেড়ে চলে। অবশেষে তার একাকিত্ব সর্বসংহারী ধ্বংসকারী উন্মত্ততায় পরিণত হয়। তার মস্তিষ্কের গহনকন্দরে ধ্বনিত হয় শয়তানের একটি মাত্র আজ্ঞা: "ধ্বংস।"

রায় বরুয়া শিকারী হলেও অকারণ প্রাণসংহারের পক্ষপাতী ন'ন। কিন্তু অত্যাচারী

হিংস্র জন্তুর খবর পেলে তিনি স্থির থাকতে পারেন না। কতকটা রাজার শ্লেষের প্রতিবাদে, কতকটা অত্যাচারের প্রতিকারে জানালেন, সেই মুহূর্তেই তিনি শিকারে যেতে প্রস্তুত। রাজা মৃদু হেসে বললেন, হাতী শিকারে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি ঠিক প্রশস্ত নয়; রাত্রির এবং জঙ্গলের অন্ধকারে তাদের খুঁজে পাওয়া কঠিন। স্থির হলো পরদিন ওঁরা শিকারে বেরুবেন।

সেই দিনই শেষ রাত্রে খবর এলো আর একখানা গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়েছে। ভোরের-আলোর-ফাটল-ধরা আকাশে তখনো কয়েকটা তারা জ্বল জ্বল করছে। যে লোকটা খবর এনেছে তার আবছা ছায়ামূর্তি—যেন আকাশের গায়ে লাগানো। সামনের শূন্যে প্রপাতের দিকে অঙ্গুলীনির্দেশ করে সে বললে, ঐ ওখানে নীচে ছোট্ট গ্রামখানা; তা নষ্ট করে দুশ্‌মন্‌ এখন মকাইয়ের ক্ষেত তছ্‌নছ্‌ করছে।

আর দেরী করা চলে না। রাজা ও রায় বরুয়া কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক ও কিছু রসদ সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন। (বাকীটা আগামী বারে।)

ভোম্বা মামার গল্প

শ্রীবিমল দত্ত

ভোম্বা মামার বয়স কত হবে?

কে জানে বাবা! কেউ বলতে পারে না। বাবার চেয়ে বড়ো, মার চেয়ে বড়ো, পিসেমশাইয়ের চেয়ে বড়ো, নন্তু খুড়োর চেয়ে বড়ো ..

বুড়ো ত' বুড়ো—থুত্থুড়ো, ঝুর্‌ঝুরো—
নাদুস-নুদুস থাপুস-থুপুস্‌—

শক্ত কিছু খেতে পারে না – একটাও দাঁত নেই। কিছু দিলে চট্‌কে ঝোল-পাৎলা করে খায়—হাপুস-হুপুস্‌ হপাৎ-কপাৎ…

বারান্দার ধারে ঈজিচেয়ারে রাতদিন শুয়ে থাকে। এক একবার রামকিষ্টকে ডাকে, "কিষ্টো রে, তামাক!"—ভুড়ুক ভুড়ুক গুড়ুক খায় আর মিড়মিড়ে ফ্যাল্‌ফেলে চোখে ঐ আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

কি দেখে? আকাশ পর্য্যন্ত দৃষ্টিই যায় না হয়তো। ঐ বোধ হয় গঙ্গারামদের পায়রা-ব্যোমের দিকে তাকায়—লক্কার ডিগবাজী দেখে ….

"ও ভোম্বা মামা, ভোম্বা মামা।"

"য়াঁ, কি রে বিল্টু? কি বল্‌ছিস্‌?"

"ভোম্বা মামা, ভোম্বা মামা, গল্প বল্‌বে—গল্প?"

"গল্প? কিসের গল্প? আমার গল্প কি তোদের ভাল লাগবে? তোরা একালের ছেলে, পাঁশগাদায় পুঁতলে আশমানে ফুটিস্‌—"

"ও ত' সাত ভাই চম্পার গল্প। ও গল্প কে শুনবে?"

"তাই ত' বল্‌ছি, সেকালের গল্প কি একালে ভাল লাগে? এ বেলা যা গরম ভাত ও বেলা তা পষ্টি – কাল তা পান্তা – পরশু পচা। ফেলে দিতে হয়।"

"গল্প কিন্তু পচে না, ভোম্বা মামা! ভোম্বা মামা, তোমার ছেলেবেলার গল্প বল্‌বে?"

"ছেলেবেলা? কোন্‌ ছেলেবেলা? পুট্‌পুটে চোখে যখন দুনিয়া দেখ্‌ছি—কোমরে ঘুনসী বাঁধা—নাকে সর্দ্দি ফোঁৎ ফোঁৎ – গলায় ঢোলকের মত একটা মাদুলী——সেই ছেলেবেলার গল্প?—না, যখন মালকোঁচা মেরে খেল্‌তে শিখেছি ভেল ডিগ্‌ ডিগ্‌,—গাব্বু খুঁড়ে মার্ব্বেল্‌ খেল্‌ছি থিরি, সিক্স, নাইন্‌—নট্‌ নড়নচড়ন, নট্‌ কিচ্ছু, নাথিং——সেই ছেলেবেলার গল্প? যখন গরমের ছুটিতে দেশে গিয়ে বাদায় ফড়িং মারি খেজুর-ডালের ছাট দিয়ে আর পিঁজরায় পুষি শালিখ বা বুলবুলি,—সেই ছেলেবেলা?"

"একেবারে গোড়া থেকে, যবেকার কথা প্রথম মনে পড়ে"—

"ওরে ব্বাপ্‌! বিল্টু বাবু বড় শক্ত ফরমাশ করেছ।"

ভোম্বা মামা আকাশের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চায়—কিন্তু আসলে ভোম্বা মামা কিছুই দেখে না। তার মন নেমে চলেছে মনের নীচের তলায় অন্ধকার চোরাকুঠরীর মধ্যে—খুঁজছে সেখানে মণি-মাণিক্য আঁধার আঁধার সে রাজ্য। আঁধার দিয়ে ঘেরা, আঁধার দিয়ে বাঁধা—উপরে আঁধার, নীচে আঁধার! সেই আঁধারে হাৎড়ে কি কেউ কিছু ঠাহর করতে পারে?

ভোম্বা মামা বলে ওঠে, "পেইছি, বিল্টু বাবু, পেইছি—

আঁধার কোলে আঁধার দোলে—দোলে গাছের পাতা,
আঁধার বনে হারিয়ে গেছে সেই সেদিনের কথা।
খুঁজতে হবে আঁতিপাঁতি
জ্বালিয়ে মনে স্মৃতির বাতি—

পেইছি রে বিল্টু বাবু, পেইছি। সেদিন বাদ্‌লা বড়, আকাশে মেঘ থম্‌ থম্‌—সজ্‌নে গাছের পাতা নড়ে না—জানলার ধারে বসে আছি আমাদের দেশের বাড়ীতে—সেই "ইষ্টি" গ্রাম—আহা কি মিষ্টি নাম!

"দোতলায় জানলার নীচে পায়ে-চলা পথ দেখা যায়—কাদায় কাদা—মানুষ-গরু চ'লে পচপচে কাদা—পা ডুবে যায় হাঁটু পর্য্যন্ত।

"দূরে—উত্তরে মখমল—শুধু মখমল—সবুজ আর সবুজ। তার পর শাড়ীর পাড়ের নক্সা-আঁকা তাল-বাবুলের সারি, তার পর মেঘের রাজ্য—

"বসে আছি জানলার পাল্লায় ঠেস দিয়ে, গুঁড়ি মেরে; হাতে ধরা আছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লোহার গরাদ···দাঁত ঝন্ ঝন্, কন্ কন্ করছে—দাঁতের পোকা দাঁতের মধ্যে কুরে কুরে সিঁধ কাট্‌ছে—গাল ফুলেছে একদিকে—ঠিক খুকুমণির ছড়ার গাল ফুলো গোবিন্দর মা'র মতন।

"পিসিমা নেয়ে এসেছে—মুখে তখনো পূজোর স্তব—কাপড় ছাড়ে নি তখনো। ঘরে ঢুকেই বলে উঠল, 'এখনো বসে যে! বলি সেলেট-বই নিয়ে কি একবারও বসতে নেই ?'

"দাঁতের ব্যথা যে!'

"হবে না? দাঁত মাজ্‌বি না, মুখ ধুবি না—খালি শোর-পেটে গিল্‌বি!—দাঁতের ব্যথা হবেই তো'!"

বিল্টু হাততালি দিয়ে উঠ্‌ল, "ও কি ভোম্বা মামা, সকালে উঠে তুমি মুখ ধুতে না, দাঁত মাজতে না? এ মা, ছি ছি!"

ফোক্‌লা দাঁতে হা-হা করে হেসে ভোম্বা মামা বলে, "সেই জন্যেই ত' দাঁতগুলো সব পালালো—বত্রিশটা দাঁত—সব ক'টাই গেছে।"

"তা যাবে না? এত বয়েস হ'ল তোমার!"

ভোম্বা মামা লাঠি ওঠালে—"ফের বয়েস বয়েস করলে এই লাঠির বাড়ি ঝাড়ব। বয়স কি রে? আমি বুঝি সেই আন্ডিকালের বদ্যি বুড়ো? আমি সাত বছরের ভোম্বা—গাল ফুলে জানলায় বসে, পিসিমা আমাকে বক্‌ছে।

"এই ধুই' ব'লে উঠে, গুলগুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজি। ঠাণ্ডা জলে দাঁতগুলোর মধ্যে শির শির করে—কন্ কন্ করে। উঃ আঃ করে মুখ ধুয়ে দেখি পিসিমার কাপড় ছাড়া হয়েছে। আসন পাতছে—এই রে! গঙ্গাজলের ঘটী ছুঁলে আর রক্ষে নেই—দুটি ঘণ্টার কমে যদি পূজো হয়! হঠাৎ ভীষণ চেঁচিয়ে উঠি—'পিঁসিঁমা—ওঁ পিঁসিঁমা'—!'

"কি রে? কি হ'ল আবার? হতভাগার জ্বালায় যদি কিছু করবার যো আছে! কি হ'ল?'

"খাবার দাও—পেট জ্বল্‌ছে'—

"দাঁড়া, দিচ্ছি। কিন্তু কি খাবি? ঘরে কি আর কিছু আছে? চাল ভাজা দিয়ে পাটালী খাবি?'

"চাঁল ভাঁজা চিঁবোবোঁ কিঁ কঁরে? দাঁতে যেঁ ভাঁষণ বঁ্যথা!'

"তবে কি খাবি? নে, চাল ভাজা হামানদিস্তেয় গুঁড়ো করে নে।'

"পিসিমা চাল ভাজা একবাটী আর এক টুকরো পাটালী বার করে দেয়। অমনি তড়াক্ করে উঠে, হামানদিস্তে না এনে, সেই দোতলার বারান্দায় সুরু হয়ে যায় ছাতু তৈরী—'দম্ দম্ ঘটাং ঘটাং টাং ঘটাং ঘটাং'···মাঝে মাঝে আধগুঁড়ো চাল ভাজা পাটালীর সঙ্গে মুখে ভরে দিই। "উঃ-হু-হু"—মিষ্টি লেগে আরো কন্ কন করে দাঁত—কিন্তু জিভ দিয়ে চুষে চুষে মুখের মধ্যে পাঠিয়ে দিই। আবার চলে পেষণ—'ঘট্ ঘটাং ঘট্ দম্ দম ঘটাং—উ-হুঁ-হুঃ, য়্যাঁ-য়্যাঁ-য়্যাঁ, গিছি গিছি গিছি! ওঁ পিঁসিঁ মা, সঁর্ব্বোনাশ হঁলো গোঁ'—

"পিসি গীতা উল্টে ফেলে, কোশাকুশি ছট্‌কে, গঙ্গাজলের ঘটী কাৎ করে ছুটে আসে। —'কি হ'ল? কি হ'ল?'

"আঙুল আঙুল—উহু—উ হু হু—ছেঁচে গেছে ছেঁচে গেছে—রক্ত—জ্বালা—য়্যাঁ য়্যাঁ য়্যাঁ'—

"পিসিমা ছুটে ন্যাকড়া আনে। কি সব দিয়ে বেঁধে দেয় আর গজ্ গজ্ করে—'আসুক তোর বাপ শনিবার। এ আমার আর সহ্য হয় না বাপু! কেন, একটু সবুর করলে আমিই তো গুঁড়ো করে দিই। না, সব তাতে তাড়া, ব্যস্ত! এত বড় হয়েছিস্, একটু বুদ্ধিশুদ্ধি পাকে না তোর? জুড়িয়েছে, সে সতীলক্ষ্মী, জুড়িয়েছে'।"

ভোম্বা মামা থামে। বিল্টুর দিকে তাকায়। "কার কথা বলছে বুঝেছিস্? ঐ দ্যাখ্, ভ্যাবা গঙ্গারামের মত চুক্করে বসে রইলো! এই ভ্যাদা বুদ্ধিতে গপ্প শুনবি?

"আমার মার কথা বল্‌ছে। মা, আমার চার বছর বয়স হতেই, মারা যায় কিনা!

"পিসির এই কথা শুনে সেদিন মার ওপর ভারী অভিমান হ'ল। আমার জ্বালায় মা মারা গেছেন—মরে বেঁচেছেন! কেন, আমি চার বছরে মাকে কি জ্বালা দিয়েছি? চার বছরে কি হামানদিস্তেয় হাত থেঁতো করেছি? চার বছর বয়সে কি দাঁতে পোকা হ'ত? চার বছর বয়সে মাকে আমি কী বিরক্ত করেছি! ঘরের মেঝেয় এসে চুপ করে বসি। চোখের কোণে জল আসে। দেয়ালে যশোদার পটের তলায় মায়ের পায়ের ছাপ বাঁধানো ছবিটা টাঙানো—ছোট্ট দুটো পা। ইচ্ছে করে গোটা মানুষটাকে দেখতে, কিন্তু কোথায় পাবো তাকে? সেই পুঁচকে বয়সে ভারী ভাবুক ছিলুম আমি।

প্রায়ই ভাবতুম কত হিজিবিজি কথা—এখন আবছা আবছা মনে আছে। ভাবতুম কোথায় গেল মা ?

"মায়ের মুখ মনে পড়ে না—ঐ পা দুটোর ছবি আর যশোদার ছবি—সামনে নাড়ুগোপাল। সব জড়িয়ে একটা মিষ্টি মিষ্টি ভালবাসার আমেজ যেন ঘরের মধ্যে কোল পেতে আছে। মা এই যশোদাকে হাঁটু গেড়ে পেন্নাম করতো—আঁচলের চাবি ঝনাৎ করে দেয়াল-আলমারী খুলতো—এটা গোছাতো, ওটা সরাতো—সেই মা কোথায় গেল ? মরে যাওয়াটা কি ? থাকে থাকে আর কোথায় যায় ? পুড়িয়ে দেয়—ছাই করে দেয়। মাকে ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে—ছাই করে দিয়েছে। সে ছাই ত' মাটিতে মিশেছে। —সেই মাটিতে ত' তবে মা আছে ! কোথায় মাকে পুড়িয়েছে ? সে মাটির ছোঁয়ায় যে মাকে পাওয়া যাবে ! প্রাণটা সেই মাটির স্পর্শের জন্যে আকুলিবিকুলি করে।

"হাতের যন্ত্রণা, দাঁতের যন্ত্রণা,—সেই সঙ্গে মার জন্যে আঁতের যন্ত্রণা সুরু হয়। বর্ষা আসে ঝেঁপে—মেঘডমরু বাজিয়ে, মেঘের হাতী সাজিয়ে, বৃষ্টিফোঁটা নাচিয়ে। আকাশ নেমে আসে মাটি মায়ের স্পর্শ পাবার জন্যে। আকাশ গলে যায় আর মাকেও গলায় —মৃত্তিকা মা। ইষ্টি গাঁয়ের মাটি বড় মিষ্টি রে ! মাটিকে কেন মা বলে সেই দিন আমি এই ভাবে বুঝেছি। শিশুমনের এ মায়াপুরীর গপ্প কি তোদের ভাল লাগ্‌বে ?"

"ও ভোম্বা মামা, থামলে কেন ? বলো না—তুমি বুঝি মার জন্যে খুব কাঁদলে ? তারপর ?"

"আকাশ অন্ধকার করে জল নাম্‌ল। ঝাপ্‌টা আসছে জানলা দিয়ে। পিসিমা পূজো সেরে উঠলো, জানলা দু'টো বন্ধ করে দিলে উত্তরের। তার পর বল্লে, 'আজ কোথাও যাস নি—এর উপর ভিজ্‌লে দাঁত কন্‌ কন্‌ করবে। আমি গরম সুজির পায়েস করে আনি।' এই কথার স্নেহের ঢেউ এসে আমাকে আরো স্পর্শ করে গেল ·...

"ঘরে আমি একা—আধো আলো আধো আঁধার ঘর। দেয়ালের ছবি থেকে যেন মা এসেছে নেমে—সারা ঘর ছেয়ে মায়ের ভালবাসা কোন্‌ পুরাতন দিনের অন্ধকার ডিঙিয়ে এসেছে বুঝি···আমার মনে হ'ল কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো দোলনায় আমি শুয়ে আছি আর বর্ষার সুরের মধ্যে থেকে স্পষ্ট বেরিয়ে আস্‌ছে একটা ঘুমপাড়ানী ছড়া—বর্ষার জল পড়ার শব্দ ছাপিয়ে তার সুর উঠছে :

'আজিডাঙা, কাজিডাঙা, জল থৈ থৈ মাঠ,
জল থৈথৈ কলমী ডোবা তিরপুর্ণীর ঘাট।
আকাশ ভাঙে মাথার উপর ডাঙায়-বহে বান,
চাষী রে, তোর স্বপন সফল—সোনায় সোনা ধান।'

মায়ের স্নেহের ধারা গড়িয়ে চলে—ভাসিয়ে নিয়ে যায় আমাকে। আমার দোলা যেন স্বপন দোলা—যেন হাওয়ার দোলা—যেন স্নেহের দোলা। এ দোলা দুলছে যেন মর্ত্ত্য থেকে স্বর্গ—আর স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্য···মর্ত্ত্যে স্বর্গে মেশামিশি, ঘেঁষাঘেঁষি—যেন দুই প্রতিবেশী। যেন মনে হয় মা হারায় নি, আছে। আকাশে, বাতাসে, মাটিতে—সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, সবকে জড়িয়ে আছে, সবকে ভরিয়ে আছ।···"

ভোম্বা মামা হঠাৎ থেমে গেল।

বিল্টু বাবু বল্‌লে, "থামলে কেন ভোম্বা মামা ?"

"বাঃ, থাম্‌ব না ?—রেলগাড়ীও তো থামে, ইষ্টিশান থাকে। ইষ্টিশানে মিষ্টি কুল, সখের বাদাম গোলাপফুল—একটু তামাখারাপের ব্যবস্থা কর্‌ দেখি—"

বিল্টু বলে, "সে আবার কি ? তামাখারাপ আবার কি ?"

হা হা করে ফোক্‌লা দাঁতে ভোম্বা মামা হেসে ওঠে। তামাখারাপ জনিস না—? তামাকু। তামাক রে, তামাক। রামকিষ্টোকে ডাক্‌।

তামাক এল। তারপর ভোম্বা মামা আর কথাই কয় না—কেবল হুঁকোর বাঁশি শোনা যায় ভুড়ুক ভুড়ুক ভুড়ুক ভুড়ুক—

তারপর বিল্টু বাবু কত সাধ্‌ল কিন্তু ভোম্বা মামা আর মুখ খুললো না।

শেষ কালে বল্লে, "আরেকদিন—আজ আর নয়। যাঃ—"

পশ্চিম দিগন্তে

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

ভেটদ্বারকা।

দ্বারকা থেকে সকাল সাতটায় বাস্ ছাড়ে।

আমরা আধ ঘণ্টা আগে গিয়েই আসন দখল করে বসলাম। তখনও ভালো করে সকাল হয় নি। ওখানে সূর্য্যোদয় হয় আমাদের এক ঘণ্টা পরে। তার উপর শীতের সকাল, মানুষের সাড়া জাগতে আরো কিছু দেরী হয়। অবশ্য দ্বারকায় শীত বলতে কিছু নেই, তবে ভোরের দিক্‌টায় ঠাণ্ডার একটু আমেজ থাকে মাত্র।

বাস্ অবশ্য ঠিক সাতটায় ছাড়লো না। যাত্রীপূর্ণ হতে আরো খানিকটা সময় লাগলো তারপর।

আমরা নগর ছাড়িয়ে মাঠে এসে পড়লাম। রুক্মিণী-মন্দির ছাড়িয়ে, ষ্টেশনকে পাশ কাটিয়ে, সিমেণ্টের কারখানা পিছনে ফেলে বাস্ ছুটলো। পিচ্‌ঢালা পথ, পথের দু'পাশে গাছের সারি, তার পরেই ধূ ধূ করছে রুক্ষ মাঠ। কিছুদূর গিয়েই একখানি গ্রাম পাওয়া গেল—মিঠা গাঁও। তার পরেই আবার বৃক্ষবিরল প্রান্তর। বাঁ-পাশে প্রান্তরের মাঝে সমুদ্রের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী জলাভূমি দেখা দিল, তার পিছনে দেখা গেল দিগন্ত-বিস্তারী জলরেখা। আমরা সমুদ্রের পাশ দিয়ে এগিয়ে চললাম।

আঠারো মাইল পথ।

ঘণ্টা দেড়েক পরে আমরা ওখা বন্দরে এসে পৌছলাম। বাস্ থামলো ষ্টেশনের সামনে। এক দিকে রেল লাইন, আরেক দিকে বন্দর। পশ্চিম ভারতের শেষ প্রান্তের শেষ বন্দর এটি। বহু প্রাচীন বন্দর। প্রভাসে অনিরুদ্ধের নামে একটি দুর্গ আছে, অনিরুদ্ধ-মহিষী ঊষার নামেই হয়তো এই বন্দরটির এক সময় নামকরণ হয়েছিল। পশ্চিমী য-এর উচ্চারণ খ-এর মত। আজ ঊষা হয়েছে ওখা।

সামনেই ঘাট। অসংখ্য পাল-তোলা নৌকা। আমরা ক'জন একখানি পাল-তোলা নৌকায় গিয়ে উঠলাম। ভেটদ্বারকার দূরত্ব দু'মাইলের মত, নৌকা ভাড়া মাথা পিছু দু'আনা মাত্র।

সাতজন যাত্রী নিয়ে নৌকা ছাড়লো। আমাদের পারের কাণ্ডারী হলো বছর ২০।২২এর একটি ছেলে আর তার সঙ্গী, বছর চৌদ্দর আরেকটি ছেলে। ঘাট থেকে একটু এগিয়ে গিয়েই ছোট মাঝি তর তর করে মাস্তুলের মাথায় উঠে গেল, সাদা পালখানি মেলে দিল। বিরাট পাল। বাতাসের ভারে পাল ফুলে উঠলো, নৌকা হেলে পড়লো একপাশে, আরেক পাশে আমরা সরে সরে বসলাম। তর তর করে নৌকা ছুটলো। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের উপর দিয়ে আমরা পিছলে চললাম। আমাদের দু' পাশে আরো কত পাল-তোলা নৌকা। শুধুই শাদা শাদা পালের সারি। যেন একঝাঁক শাদা হাঁস সাগরের বুকে ভেসে চলেছে। নীল সাগর, নীল আকাশ, মাঝে শাদা শাদা চলমান নৌকার পাল। পিছনে ওখা পোর্টের ছোট ছোট বাড়ীগুলি, সামনে একটি ছোট পাহাড়। ওই পাহাড়টি লক্ষ্য করেই আমরা চলেছি। ছোট ছোট ঢেউগুলি এসে লাগছে নৌকার গায়। সে ঢেউয়ে নৌকায় দোলা লাগে না। মনে হয় হাত বাড়িয়ে ভাঙা ঢেউগুলির সঙ্গে খেলা করি। সূর্য্যকরোজ্জ্বল নীলিমার মাঝে মন হারিয়ে যায়। মধুময় হয়ে ওঠে।

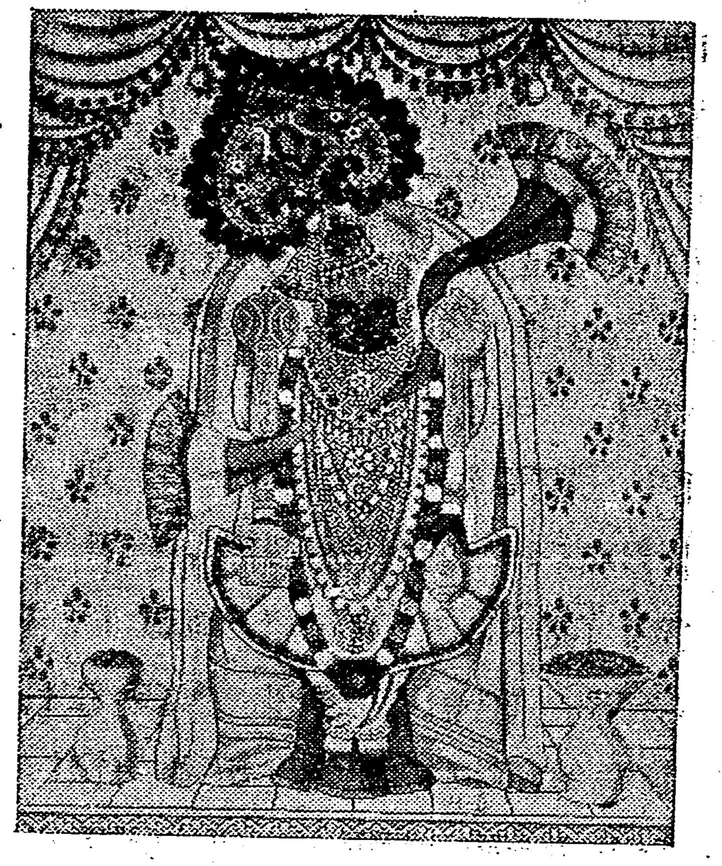

দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণমূর্তি

"কোন্ খেপামির তালে নাচে
পাগল সাগরনীর,
সেই তালে যে পা ফেলে যাই—
রইতে নারি স্থির।" [—ফাল্গুনী]

কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে আমরা এসে পড়লাম সেই পাহাড়টির কোলে। ঠিক পাহাড় নয়, সাগরের বুকে কিছুটা উঁচু একটি দ্বীপ। ছোট ছোট বাড়ী-ঘর অনেক। ঘাটের সামনে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি অনেক বাড়ী যেন জট পাকিয়েছে। ছোট নৌকা-

ঘাট। কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে আমরা উঠে এলাম। সামনেই পথের মুখে ট্যাক্স্ আপিস। বললো—বাবু, ট্যাক্স্ দিয়ে যান—যাত্রীকর।

মাথা পিছু দু'আনা দিয়ে তীর্থযাত্রীর টিকিট নিতে হলো। এটি এখানকার মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স্। অতি ছোট নগর, আয়ের ব্যবস্থা তেমন কিছু নেই। এখানকার পথঘাট ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হলে এই ধরণের আয়ের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

ভেটদ্বারকার শ্রীকৃষ্ণমূর্তি

এ পথ সে পথ দিয়ে এঁকেবেঁকে কিছুটা গেলেই মন্দির। দ্বারকার অনুরূপ মন্দির। তবে মন্দিরটি ছোট। মূল মন্দিরে দ্বারকাধীশেরই অনুরূপ কষ্টিপাথরের শ্রীকৃষ্ণমূর্তি। মন্দিরের সামনে সিল্কের একখানি পর্দা ফেলা থাকে। যাত্রী-সমাবেশ হলে পাণ্ডারা এসে পর্দাখানি ঠেলে সরিয়ে দেয় মিনিট খানেকের জন্য। তারপর আবার পর্দা টেনে ঢাকা দিয়ে দেয়। এই ভাবেই পর্দা খোলা ও ঢাকা দেওয়া চলে সারা দিন। যাত্রীরা এই ভাবেই দর্শন করেন। এ যেন রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য দেখা। এঁর নাম 'ঝাঁকি দর্শন'।

মূল মন্দিরকে ঘিরে চারিপাশে আরো কয়েকটি মন্দির। রাধা, সুদামা প্রভৃতি। মন্দিরের সৌকার্য বিশেষ লক্ষ্যণীয় নয়। এ হলো ভাবের রাজ্য। ভাবুকের অন্তর্লোক এখানে আপন ভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে।

অনেকের মতে এই ভেটদ্বারকাই ছিল আসল দ্বারকা। শ্রীকৃষ্ণ এইখানেই রাজ্য করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর সপ্তম দিনে এই অঞ্চলে এক প্রচণ্ড ভূকম্পন হয়। সেই ভূমিকম্পে দ্বারকার অনেকখানি ডুবে যায় সাগরগর্ভে। সেটি দ্বাপর যুগের সমাপ্তির সংকেত। সেই হলো মহাভারতের শেষ বড় ঘটনা। পাঁচ-ছ'হাজার বছর আগের ব্যাপার। তারপর কালস্রোতে যা ডুবে গেছে তাকে মানুষ স্বীকার করে নিয়েছে, মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে একদা যুক্ত এই স্থানটুকুতে নৌকা দিয়ে যোগাযোগ করেছে। নতুন করে ঘর-বাড়ী তুলেছে, মন্দির গড়েছে, মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। পুরোনো স্মৃতিকে স্মরণ করে কত ভক্ত এসেছে এখানে। তাদের পদস্পর্শে এই স্থান পবিত্র হয়েছে। কত ভাবুক সাধকের কণ্ঠে কত ভজন ও কীর্তনের সুর এখানকার বাতাসে মুখরিত হয়েছে।

বিচার

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

রাজপ্রাসাদ। দিনরাত চলছে ঘরে ঘরে আনন্দ, স্ফূর্তি, নাচ ও গান হঠাৎ সব থেমে গেল মন্ত্রমুগ্ধের মতন। খবর ছড়িয়ে পড়ল রাজপ্রাসাদের ঘরে ঘরে—রাজকুমারদের বিচার হবে। বিচার হবে কুমারদের মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ। কে এই রাজ্যের হবে অধীশ্বর মহারাজের অবর্ত্তমানে। তাই মহারাজ বিন্দুসার বিচার-সভা আহ্বান করেছেন। বিচার করবেন মহাপণ্ডিত পিঙ্গল। তিনিই স্থির করবেন রাজপুত্রদের মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই রাজবাড়ীতে পড়ে গেল হুলস্থূল। দাসদাসী, রাজকর্ম্মচারী সকলেই ব্যস্ত। রাণীরাও চুপ করে বসে নেই। তাঁরাও উদ্বিগ্ন। কারণ মহাপণ্ডিত পিঙ্গল ঘোষণা করেছেন, রাজকুমারদের মধ্যে যাঁর বসন, আসন, অশন শ্রেষ্ঠ হবে তিনিই ভবিষ্যতে রাজা হবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। রাণীরা তাই ব্যস্ত হয়ে লেগে গেলেন যাঁর যাঁর পুত্রদের সাজাতে।

মহারাজ বিন্দুসারের অনেক মহিষী,—অনেক পুত্র। কাজেই যাঁর যাঁর পুত্রদের উপযুক্ত করবার জন্য রাণীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেল। মহারাজ বিন্দুসার তাঁর কোষাগার উন্মুক্ত করে দিলেন—রাণীরা যাতে ইচ্ছা মতন তাঁদের পুত্রদের সাজাতে পারেন। তবে মহারাজ নিজে রইলেন নির্লিপ্ত—কোন রাণীর পক্ষেই তিনি যোগ দেবেন না।

প্রতিযোগিতার উপযোগী মালপত্র সংগ্রহের জন্য রাণীরা নূতন নূতন লোক নিযুক্ত করলেন, দেশ-বিদেশে লোক পাঠাতে লাগলেন। রাজবাড়ী কাপড়, জামায়, আসনের স্তূপে স্তূপাকার হয়ে উঠল। তবু রাণীদের মন ওঠে না।

সুভদ্রাঙ্গীও ছিলেন রাজমহিষী, কিন্তু তাঁর না ছিল অর্থ, না ছিল লোকবল। রাণী হয়েও তিনি থাকতেন দাসীর অধম হয়ে। রাজপ্রাসাদের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ঘরেই তিনি বাস করতেন। ছোটঘরের মেয়ে বলে মহারাজ বিন্দুসার তাঁকে অবহেলা করতেন। সেই জন্যই রাজবাড়ীর আর সকলের কাছ থেকেও তিনি অবহেলা পেয়ে এসেছেন। কেউ তাঁর সঙ্গে বড় একটা মিশত না, কথা বলতে চাইত না।

অশোক ছিলেন এই সুভদ্রাঙ্গীর একমাত্র সন্তান। যেমন বলিষ্ঠ তেমনি কুৎসিত। সুভদ্রাঙ্গীর পুত্র বলেই হোক বা দেখতে কুৎসিত বলেই হোক, মহারাজ বিন্দুসারও অশোককে দেখতে পারতেন না। অন্যান্য রাণীরা, এবং তাঁদের দেখাদেখি অন্যান্য আত্মীয়রাও সকলেই অশোককে তাচ্ছীল্য করতেন। এমন কি অন্য সব রাজকুমাররাও অশোকের সঙ্গে মিশতেন না। আসন, বসন ও খাদ্য কোনটাই অশোকের রাজপুত্রের মতন ছিল না। সাধারণ লোকের পোষাকই পরতেন অশোক, আহারও ছিল অতি সাধারণ। এই ভাবে সকলের নিকট হ'তে ঘৃণা ও অবহেলা পেয়ে পেয়েই তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন।

অশোক বললেন, মা, আমিও বিচার-সভায় যাব তো?

সুভদ্রাঙ্গীর চোখে জল এলো, বল্লেন, সে কি করে হবে বাবা? তোমার বসন, অশন, আসন কোনটাই রাজপুত্রদের মতন নয়। এতে যে মহারাজ বিন্দুসারের অসম্মান হবে!

অশোক দৃঢ়স্বরে বলেন,—সে আমি বুঝব, তুমি শুধু অনুমতি দাও মা!

সুভদ্রাঙ্গী চোখ মুছলেন, বললেন, সকলে বিদ্রূপ করবে, মহারাজও হয়তো রাগ করবেন—সে কি তুই সইতে পারবি বাবা?

দৃপ্তকণ্ঠে অশোক বললেন, তোমার আশীর্বাদ পেলে সবই পারব, মা!

সুভদ্রাঙ্গী পুত্রকে কোলে টেনে নিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন।

অবশেষে বিচারের দিন এল। রাজসভা লোকে লোকাকীর্ণ। মহারাজ বিন্দুসার সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট। তাঁরই ডানদিকে বসেছেন পণ্ডিত পিঙ্গল। বাঁ দিকে মহামন্ত্রী, সেনাপতি ও অমাত্যবর্গ যে যার আসনে এসে বসেছেন।

এমন সময় ঘণ্টাধ্বনি হ'ল। এবারে রাজপুত্ররা আসবেন। রাণীরা সোনা, মুক্তা, জহরৎ দিয়ে পুত্রদের সাজিয়ে দিয়েছেন। বহুমূল্যের আসন ও বহু প্রকার ভোজ্যদ্রব্য সঙ্গে করে দাসদাসী সহ রাজদরবারে প্রবেশ করলেন রাজপুত্রের দল। মহামন্ত্রী উঠে রাজপুত্রদের যার যার নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে দিলেন। রাজপুত্রেরা যার যার বহুমূল্য আসন পেতে বললেন, সম্মুখে রাখা হোল অপরূপ সব ভোজ্যসামগ্রী।

রাজসভার লোকদের চোখ ঝলসে গেল যেন। এমন সুন্দর মহামূল্য অলঙ্কার, আসন, ভোজ্যসামগ্রী তারা জীবনে দেখে নি। মনে হ'ল যেন স্বর্গ থেকে একসঙ্গে বহু ইন্দ্র নেমে এসেছেন। কার যে কোন্‌টা নিকৃষ্ট কেউ তা বুঝে উঠতে পারল না।

সহসা সব গুঞ্জন থেমে গেল। সকলে অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল একটি যুবকের দিকে। কে এই যুবক? দেখতে কুৎসিত, পোষাকও একেবারে সাধারণ লোকের মতন—একেবারে সাদা। হাতে শুধু জলের পাত্র। যুবকটী বীরের মতন এসে সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। ইনিই অশোক। তাঁর জন্য কোন আসন ছিল না। কাজেই তিনি এসে মাটিতে বসে পড়লেন। মহারাজ বিন্দুসারের চোখ কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। অশোককে তিনি এখানে আশা করেন নি। ইচ্ছা হ'লো এখনি অশোককে রাজসভা থেকে দূর করে দেন। কিন্তু এ বিচার-সভা; বহু গণ্যমান্য সামন্ত রাজা রয়েছেন, রয়েছেন মহাপণ্ডিত পিঙ্গল। কাজেই মহারাজ নীরব রইলেন। রাজপুত্রেরা ঘৃণা ও বিদ্রূপমিশ্রিত নয়নে চাইলেন অশোকের দিকে। অন্দর-মহলে মৃদু গুঞ্জন উঠলো। কিন্তু আশোকের কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই।

সভাগৃহে আবার গুঞ্জন উঠলো, কে? কে এই যুবক?

মহামন্ত্রী উঠে পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি রাজকুমার অশোক। মহারাজ বিন্দুসারের দাসীপুত্র। সভাগৃহ নীরব হ'ল।

মহারাজ বিন্দুসার চাইলেন মহাপণ্ডিত পিঙ্গলের দিকে। মহাপণ্ডিত, এবার বিচার শুরু হোক।

মহাপণ্ডিত পিঙ্গল উঠে দাঁড়ালেন। একে একে তিনি সকল রাজপুত্রের কাছে এসে

খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। সকলের শেষে এসে দাঁড়ালেন শুভ্রবসন-পরা অশোকের কাছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন অশোকের দিকে। চোখের পলক যেন আর পড়ে না। কি পেলেন তিনি অশোকের মধ্যে?

হঠাৎ সভার সকলকে বিস্মিত করে অশোকের হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেন মহাপণ্ডিত। উত্তেজনায় অশোক তখন থর থর করে কাঁপছেন। মহাপণ্ডিত বিন্দুসারকে লক্ষ্য করে বললেন,—মহারাজ, আপনার পুত্রদের মধ্যে আমার মতে অশোকই সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনার অবর্ত্তমানে এই কুমারই হবেন রাজ্যের কর্ণধার।

কথা শুনে অন্য রাজপুত্রেরা মাথা নত করলেন। মহারাজ বিন্দুসারও বিস্মিত হলেন। সভার সকলেই হতবাক্। মহাপণ্ডিত এ কি বলছেন! মাথা খারাপ হয় নি তো? অশোকের বসন, আসন, অশন কোনটাই অন্য রাজপুত্রদের সমকক্ষ তো নয়ই, এমন কি সাধারণ লোকের চেয়েও হীন। রাজসভায় আবার মৃদু গুঞ্জন সুরু হ'ল।

মহাপণ্ডিত পিঙ্গলের কথা শুনে মহারাজ বিন্দুসার এবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, অশোকেরই কি বসন, আসন, অশন সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হোল মহাপণ্ডিত?

নির্লিপ্ত কণ্ঠে মহাপণ্ডিত উত্তর করলেন, হ্যাঁ, মহারাজ! অশোকের বসন, আসন অশনই সর্বশ্রেষ্ঠ।

মহারাজ বিন্দুসার কিন্তু অত সহজে ব্যাপারটা গ্রহণ করতে পারলেন না। ক্রোধে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছে; কোন রকমে তা দমন করে ব্যঙ্গ-ভরা কণ্ঠে বললেন, শুধু মুখে বললেই আপনার কথা মেনে নিতে পারি না মহাপণ্ডিত, আপনার সিদ্ধান্ত প্রমাণ করুন। কিন্তু মনে রাখিবেন প্রমাণ যদি না দিতে পারেন—আপনার স্থান হবে কারাগারে।

মহাপণ্ডিত পিঙ্গল একবার মৃদু হাসলেন। পরক্ষণেই মহরাজ বিন্দুসারের দিকে স্থির নয়নে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন,—মহারাজ! আমি মানছি অন্য রাজপুত্রগণ বহুমূল্যের পোষাক পরেছেন; আসন অশন সবই তাঁদের বহুমূল্য—ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু মূল্য দিয়েই কি রাজার ঐশ্বর্য্য মাপা যায়? অশোক এসেছেন তাঁর মা'র দেওয়া শুভ্র বসন পরে। জগতে এর চেয়ে কোন পোষাকই শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। অন্য রাজপুত্রেরা দামী দামী আসন এনেছেন কিন্তু অশোক বসেছেন মাটিতে। মাটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ আসন কি আছে মহারাজ? অন্য রাজপুত্রেরা এনেছেন বহু প্রকার সুখাদ্য। কিন্তু অশোক এনেছেন পবিত্র জল। জীবনধারণের জন্য জলের চেয়ে উত্তম অশন আর কি হতে পারে মহারাজ?

মহারাজ বিন্দুসার নির্বাক্, সভাসদ্‌গণ উল্লসিত। সকলে মহাপণ্ডিত পিঙ্গলকে ধন্য ধন্য করে উঠলো। এই অকাট্য যুক্তির আর কি উত্তর দেবে? মহারাজ যে অশোকের উপর অন্যায় অত্যাচার করেছেন তাও আজ এত লোকের নিকট প্রচারিত হয়ে গেল। লজ্জায়, অপমানে মহারাজ বিন্দুসারের মুখ লাল হয়ে উঠলো—তিনি সভাগৃহ ত্যাগ করে চলে গেলেন। অশোক মহাপণ্ডিত পিঙ্গলের পদধূলি গ্রহণ করলেন। মহাপণ্ডিত আশীর্বাদ করলেন। রাজ-সভায় আবার জয়ধ্বনি উঠলো।

এর পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। এই ঘটনার, পর মহারাজ বিন্দুসার মনে মনে অশোকের উপর ক্রুদ্ধ হয়েই রইলেন। তিনি অশোককে শাস্তি দেবার জন্য তক্ষশিলায় পাঠালেন, কারণ তখন তক্ষশিলার প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। সকলেই মনে করল অশোক ওখানে গেলে আর ফিরে আসবে না। কিন্তু অশোক বীরত্বের সঙ্গে তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমন করে ফিরে এলেন। তরপর মহাপণ্ডিত পিঙ্গলের ভবিষ্যদ্‌বাণীই সফল হ'ল। মহারাজ বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোকই সিংহাসনে বসলেন। আজ পর্য্যন্ত সারা পৃথিবীতে তাঁর সমকক্ষ রাজা আর কেউ হয়েছেন কিনা সন্দেহ।

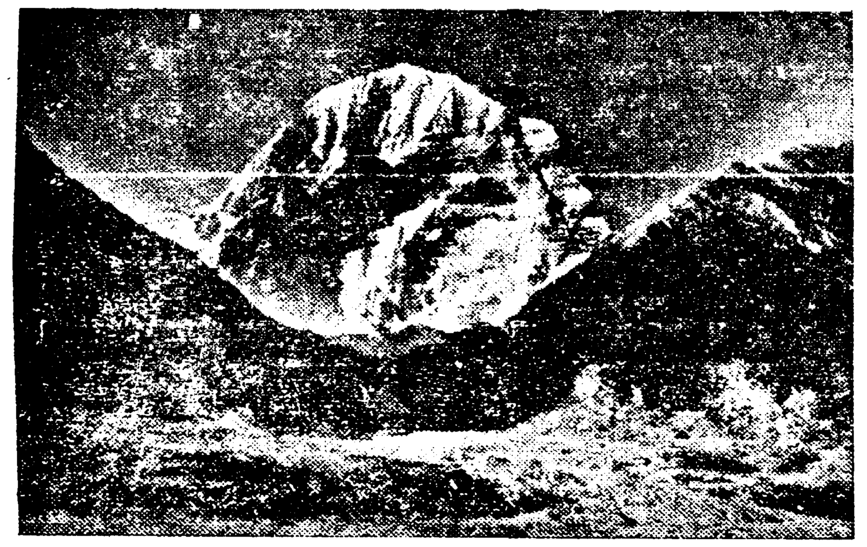

ফেরার পথে

তীর্থঙ্কর

তুষারতীর্থ কৈলাস দর্শন করে ফিরছি। ইতিমধ্যে তাকলাকোট পর্যন্ত এসে গেছি।

তাকলাকোট থেকে রওনা হয়ে প্রথমটা পড়ল আমাদের চড়াই। অনেকখানি এসে বিকেলবেলা নাগাদ আমরা একটা নিরাপদ জায়গা বেছে নিয়ে সেখানেই গাইডের কথা মত রাত্রিবাসের জন্য তাঁবু ফেললাম। লক্ষ্য আমাদের শেষ রাতে বেরিয়ে রৌদ্র উঠবার আগেই দুর্গম লিপুলেক পাস্ পার হওয়া।

রাত্রে ভাল ঘুম হ'ল না। মনে মনে একটা তাড়া ছিল যে শেষ রাত্রে উঠতে হবে। গাইড বলে রেখেছিল। লিপুলেক্ পাস্‌এর নামে সবাই ভয় পায়। কারণ লিপুলেক্ যে কত যাত্রীর প্রাণ নিয়েছে তার আর ইয়ত্তা হয় না। আমরা যখন লিপুলেকে আসবার আগে নদী পার হচ্ছি তখন ভোরবেলা। নদীটির উপর কাঠের সেতু আছে, তাই পার হ'তে কোন কষ্ট হয় নি। লিপুলেক এসে যখন পৌঁছলাম তখন পরিষ্কার সকাল। পথের মাঝে ঝড় উঠলো—বরফের ঝড়। ঝড় দারুণ বেগে বইতে লাগল। এমন অবস্থা হ'ল যে ঠেলেই ঝুঝি ফেলে দেয়! মনে মনে কৈলাসপতির নাম স্মরণ করতে লাগলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই মহাকালের রুদ্রমূর্ত্তি ভেঙ্গে বেরিয়ে এল

শান্ত শিবমূর্ত্তি, পেলাম অভয়। এর পর চলতে কষ্ট হলেও গাইডের কথা মত সবাই ধীরে ধীরে চড়াইয়ের পথে উঠতে লাগলাম।

এইবার আমাদের মাথার উপরে সূর্য্য, আর সেই গিরিসঙ্কটের পথে বইছিল হিমশীতল হাওয়া। সেই হাওয়ায় আমাদের ক্লান্তি অনেকখানি হরণ করে নিচ্ছিল। আমরা এইভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ক্রমশঃ এলো উৎরাইয়ের পথ। উৎরাইয়ের পথে চলার বেগ কিছুটা বাড়লো আগের মত আর শ্বাস-প্রশ্বাসের অত কষ্ট হচ্ছিল না। লাঠির উপর ভর দিয়ে চলেছি তো চলেইছি। অবশেষে আমরা লিপুলেকের তলায় সাংচামে এসে পৌঁছলাম।

আবার সেই লিপুলেক্ পাস্

একটু বিশ্রাম, তারপর আবার যাত্রা শুরু উঁচুনীচু রাস্তা ধরে। চলতে চলতে দেখি, পথের ধারে বরফের উপর একটি কাটামুণ্ড ভেড়ার ধড় পড়ে আছে। ব্যাপার কি?

গাইড বললে, কোন মেষপালের চালক ভূত-প্রেতের উপদ্রবের ভয়ে পালের একটি ভেড়াকে হত্যা করে ভূতপ্রেতদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে গেছে। তার বিশ্বাস বা ধারণা যে এমনি করেই ভূতপ্রেত বা দানবের কোপদৃষ্টি থেকে তার পালের অবশিষ্ট ভেড়াগুলিকে নিরাপদ করতে পারা যাবে। সে এখান থেকে যাওয়ার আগে ভেড়াটির কাটা মুণ্ডটি পুড়িয়ে উৎসর্গ করে গেছে। ধড়টা ফেলে গেছে বরফের উপর।

এরপর আমাদের সামনে আসছে কালাপানি। কালাপানিই হচ্ছে প্রথম ভারতীয় চেক পোষ্ট। এখনও পর্য্যন্ত আমরা পাহাড়ের পর পাহাড় পার হয়ে চলেছি। আমাদের আশেপাশে সর্ব্বত্র বরফের ছড়াছড়ি। সত্যি বলতে কি, রাস্তা বলে কিছু নেই। গাইডের নির্দ্দেশ মত এই বরফে-ঢাকা পাথুরে পথ (?) অতিক্রম করে চলতে হচ্ছে। চলতে চলতে মনে হয় এ পথেরও বুঝি শেষ নেই!

ক্লান্তিতে সারা দেহ অবশ হয়ে পড়ে। তবুও কোথাও থামবার বা দাঁড়াবার উপায় নেই। থামতে বা দাঁড়াতে গেলেই পড়ে যেতে হবে। যাই হোক, বহু কষ্টে অবশেষে আমরা কালাপানি চেক্ পোষ্টে এসে পৌঁছলাম।

তিব্বত পার হয়ে এসে ভারত সীমান্তে এই প্রথম চেক্ পোষ্ট। নিজের দেশে পা দিলাম ভেবে মনে মনে পরম স্বস্তি ও আনন্দ অনুভব করছিলাম। সফল প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষ্য ক'রে একটি প্রীতিভোজের সূচনা হ'ল। চেক্ পোষ্ট অফিসারের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাদের দেখে চা দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। এর পর ওয়ারলেস্ অপারেটার পাঞ্জাবী বংশীলালের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ হ'ল। আমরা তাঁকে আমাদের সঙ্গে একত্রে ভোজনের নিমন্ত্রণ করলাম, কিন্তু তাঁর খাওয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল। চেক্ পোষ্ট থেকে ফিরে আমরা যে যার ক্যাম্পে এসে শয্যায় আশ্রয় নিলাম।

পর দিন সকালে অত্যন্ত শীত পড়ল; তার কারণ কাল সারারাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে। মনে পড়ল বাংলা দেশের বর্ষা-দিনের কথা। কবির ভাষায়—

"স্নিগ্ধ সজল মেঘকজ্জ্বল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে।..."

এমন দিনে বাংলা দেশে খিচুড়িটা বেশ জমে। ভাবলাম এখানেও সেই আবহাওয়া আনা যায় না? তাই চালে-ডালে খিচুড়ী চাপিয়ে দেওয়া হ'ল। বেলা ১০টা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে নিয়ে আবার আমরা তাঁবু গুটিয়ে ফেললাম। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য স্থান হচ্ছে গার্বিয়াং।

যাবার আগে চেক্ পোষ্ট অফিসার ও ওয়ারলেস অফিসার বংশীলালজী এসে আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলেন। পথ চলতে চলতে তাঁদের মিষ্টি ব্যবহারের কথা বারে বারেই মনে হ'তে লাগল। এই বিদেশে এঁদের এই আত্মীয়সুলভ ব্যবহারের কথা কোন দিনই ভুলব না।

এক হাটে লও বোঝা

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

ভেবে ভেবে পুলিন ঠিক করল—গল্পটা "নবান্নতেই" দেবে।

নবান্ন হচ্ছে একটি বিখ্যাত কিশোর-পত্রিকা। বাজারে তার প্রচুর চাহিদা। এই পত্রিকায় লিখবার সুযোগ পাওয়া নতুন লেখকদের পক্ষে গৌরবের কথা।

এক ফাঁকে সম্পাদক মশাইকে সে টেলিফোন করে বসল: একটা গল্প আছে, দিতে পারি? বেশ ভালো গল্প।

কেন পারবেন না?—সম্পাদক মহাশয় জানালেন। বেশ হাসি-মাখা কণ্ঠস্বর।

তাড়াতাড়ি ছাপা হবে কি?

বলা শক্ত। যদি খু-ব ভালো গল্প হয়, তাড়াতাড়ি হবে। আর ভালো না হলে,... কি বলব? দেরী হতে পারে। ছাপা না-ও হতে পারে। তার পর একটু থেমে বললেন,—গল্প তো এখানে একজন দেখেন না, চার জন দেখেন। অতএব—

অতএব কি ভয় পাবে পুলিন? ভয় পাবারই কথা বটে! একজনের জায়গায় চারজন গল্প দেখবেন? চারজনের মত কি সমান?

পুলিনের ইচ্ছা করল, একবার চেঁচিয়ে ওঠে: মাত্র চারজন দেখবেন? চার শো জন দেখবেন না?

কিন্তু যা ভাবা যায়, বলা শোভন নয়। অগত্যা আচ্ছা, নমস্কার—বলে পুলিন টেলিফোন ছেড়ে দিল।

গল্পটা নিয়ে পর দিনই সন্ধ্যাবেলা পুলিন যাত্রা করল।

ইটের গাড়ি দেখে বেরুলে নাকি যাত্রা শুভ হয়, পুলিন শুনেছিল। কিন্তু হায়, এই সন্ধ্যাবেলা কে তার যাত্রাকে শুভ করবার জন্য পথে ইটের গাড়ি বার করবে? ইটের গাড়ি কোথাও—কোনো প্রান্তে নেই। তার বদলে, পুলিন দেখল, একটা ঠেলাগাড়ি চলছে। গাড়িটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে দু' জন মজুর। একজন সামনে, আর একজন পিছনে। উভয়েই ঘর্মাক্ত কলেবর। উভয়েরই পরনে এক চিলতে ময়লা কাপড়, হাঁটুর ওপর তোলা। একজনের গায়ে আবার এক ফালি গেঞ্জি। তাও কাঁধের দিক্‌টা তার ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। ঘামে দুটি লোকের দেহই পিচ্ছিল, কদাকার। ঠেলাগাড়ীতে ইট নয়, ছাল ছাড়ানো কয়েকটা বুড়ো বুড়ো পাঁঠা।

পুলিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ট্রামে চড়ল।

রিক্সায়, মোটরে, বাসে, মানুষের ভীড়ে কলকাতার সন্ধ্যা জম-জমাট। বড় রাস্তাগুলি মুখর। কিন্তু পুলিনের জানা কোনো শুভ ইঙ্গিতই তার নজরে পড়ল না।

ট্রাম এগিয়ে চলল। জানালার পাশেই পুলিন বসেছিল। সহসা দেখলে অদূরে কয়েকজন লোক একটি শবদেহ নিয়ে চলেছে। যাত্রাকালে শব ও শিবা দর্শন—উভয়ই নাকি সময় বিশেষে শুভ, পুলিন শুনেছিল। তবে সেটা কোন্ সময়—পরিষ্কার সে জানত না। অনেক সময় এসব দর্শনে অশুভ ফলও নাকি ফলে।

হঠাৎ ট্রামের যাত্রী একটি ছেলে তার পাশের বন্ধুকে ডেকে বলে উঠল, ওরে, কাকে নিয়ে যাচ্ছে, দেখেছিস?

না তো!

তাপসকে চিনতিস না? আমাদের চেয়ে দু' ক্লাস উঁচুতে পড়ত? ভালো ফুটবল খেলত?

তাকে তো কিছু দিন আগেও দেখেছি।

আজ তো দেখিস নি?

না।

গত কাল রাত্রে তাকে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছিল। অপারেশন হবে শুনেছিলাম। ঐ দেখ, এতক্ষণে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। ঐ দেখ, তার বুড়ো বাপ কি রকম বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চলেছেন। কাঁদছেন।

এরই নাম যাত্রা শুভ? পুলিনের একবার ইচ্ছা হ'ল, গল্পটা নিয়ে সে বাড়ী ফিরে যায়। কিন্তু না, মনকে শক্ত করতে হবে।

ট্রাম থেকে নেমে একটা শিবমন্দিরের ধারে গিয়ে পুলিন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।—"গল্প তো এখানে একজন দেখেন না, চারজন দেখেন।" ঘুরেফিরে সেই কথাটাই তার মনে বার বার জাগতে লাগল।

গল্পটা দিন পাঁচেক হ'ল দিয়ে এসেছে। নবান্ন-সম্পাদক মহাশয় তখন অফিসে ছিলেন না, ছিলেন একজন সহকারী। তিনিও একটু বাঁকা হাসি হেসে বলেছিলেন—দিয়ে যান, প্রচুর লেখা আসে নিত্য। চারজন দেখেন। যদি মনোনীত হয় তবে তো জানবেনই। বলে আবার সেই বাঁকা হাসি দিয়েই শেষ করেছিলেন কথা।

পুলিনও জানত। আরও জানত যে লেখা ভালো হলেই যে মনোনীত হবে—ছাপা হবে এমন কোনো কথা নেই। অনেক বাজে লেখাও চেনা কাগজে ছাপা হতে পারে। আবার অচেনা কাগজে ভালো লেখাও অমনোনীত হয়ে ছ'মাস পরে ভস্মস্তূপে পরিণত হয়।

কিন্তু এ যে বর্ষার ঝড়ের শেষে এক আকাশ নক্ষত্র! লেখা দেওয়ার ছ' দিন পরেই নবান্ন অফিস থেকে একখানা কার্ড এসে হাজির,—আপনার অমুক গল্পটি নবান্ন পত্রিকার নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক মনোনীত হয়েছে। তবে সঠিক কোন্ সংখ্যায় বেরোবে জানানো সম্ভব নয়। শেষের কথাটি যেন গোলাপ ফুলের নীচে ছোট্ট একটা কাঁটা। তা হোক্, পুলিন সবুর করবে।

দিন চারেক বাদে একটা লোক এসে বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়ল। পুলিন লোকটিকে দেখল। সাইকেল পিওন। হাতে তার কতকগুলি নূতন নবান্ন পত্রিকা। পুলিন গিয়ে পিওন-বইয়ে সই করল। একখানি নবান্ন ও একটি খাম পেল পিওনের কাছ থেকে। কিন্তু খামটি খোলার পর যেন তার দু' চোখের পলক আর পড়ে না। এমনই সে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। শুধু রাজকন্যা নয়—অর্দ্ধেক রাজত্বও।

হিং, লুচি ভাজার গন্ধ, ধোঁয়া ও অতিথি-অভ্যাগতের ভীড়ে একটি ছোট বাড়ী গিস গিস করছে।

গরীব পুরোহিত ব্রাহ্মণের মেয়ের বিয়ে। চাঁদা তুলে বিয়ে হচ্ছে।

পুরোহিত পুলিনকে খুব ভালোবাসতেন। তাই তার বাড়ীর অন্যান্য সকলকে নিমন্ত্রণ করবার ক্ষমতা না থাকায় রাস্তায় পুলিনকে একাকী পেয়ে তিনি দুটি হাতে ধরে তাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন আজ সকালে।

পুলিনের হাতে ধরা মোড়কের ভিতরে একখানি শাড়ী ছিল। মাতৃহারা এই মেয়েটির বিবাহের যৌতুকের জন্য সাত টাকা খরচ করে সে শাড়ীখানি সদ্য কিনে এনেছে। এই সাত টাকাই আজ সহৃদয় নবান্ন-সম্পাদক তার লেখার পুরস্কার স্বরূপ পিওন মারফৎ পাঠিয়েছিলেন খামে ভরে।

রূপকথা

শ্রীঅরুণিমা সেনগুপ্ত

"রাজপুত্র তো চলছেই আর চলছেই,
সে পক্ষিরাজও সাদা-ডানা মেলে উড়ছেই—।"
বাইরে বৃষ্টি ঝমাঝম্ সুরে রাত নিঝ্ঝুম—,
ঠাকুমার গলা বুজে আসে বুঝি,—চোখ ঘুম-ঘুম।

"—এত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় নাকি?
আরো আরো যাক্, যেয়ে নিক্ আগে,—।"
ভয়ে-বিস্ময়ে রাত-জাগা দুটি উজ্জ্বল আঁখি
কেঁদে ওঠে,—"এ কি, আর বলবে না? না না, আরও বলো।"
—"ঝুরি-নামা ওই বুড়ো বটগাছে কারা রাত জাগে?
জানো নাকি? রাত কত হ'ল শুনি? ঘুমোও এখন।"

ঠাকুমার চোখ বুজে আসে, তবু রং-ঝলোমলো
দুটি উৎসুক কালো চোখ, তারা কি করে ঘুমোবে?
ডানা-ওলা ঘোড়া, সে তো নিমেষেই লক্ষ যোজন
পথ চলে,—তবে রাজপুত্রের এত দেরী কেন?

এত ধীরে ধীরে পথ চলে বুঝি ? কখন সে ছোঁবে
সোনার কাঠিটা ?—বুড়ো বটগাছে দেখা যায় যেন
কার লাল চোখ ! ভয়ে দেহ হিম, বুক দুরু দুরু,
বৃষ্টি ! বৃষ্টি ! দারুণ !—আকাশে মেঘ গুরু গুরু ।

তবু দুটি কালো জ্বল্‌জ্বলে চোখে নামে না তো ঘুম !
কি ক'রে ঘুমোবে ? স্বপনপুরী যে নিসাড় নিঝুম !
রাজকন্যের চম্পাবরণ,—মাটি-ছোঁয়া চুলে
লাখো সাগরের ঢেউ ওঠে দুলে ।
চাঁপা-রঙ-মেয়ে !
কমলকলিকা-চোখ দুটি ছেয়ে
আর ঘুম নয় । তোমার কপালে এলোমেলো চুল
সরাও এবার । না হ'লে কি ক'রে অবাক্ ব্যাকুল
দুটো কালো চোখ ঘুমোবে বলো তো ?
সোনার কাঠিটা ঝিল্‌মিল্ হাসে, রাজপুত্র তো
এখনও আসে নি ! কি ক'রে আসবে ? ঘুমে ঢুলে পড়ে
ঠাকুমার চোখ । বুড়ো বটগাছ ফুলে ওঠে ঝড়ে ।

"ও ঠাকুমা, শোনো, আর ঘুম নয় ; না না, চোখ খোলো,
গল্প তোমার শেষ হয় নি তো ! তারপর ? বলো এখন কি হ'ল ?"

জুজু বুড়ো

শ্রীশিবনারায়ণ ঘোষাল

নয়কো বুড়ী—জুজু বুড়োর
রূপটি কেমন শোনো—
জগৎ জুড়ে জুড়িটি এর
মিলবে নাকো কোনো ।

এক গালে তার হলদে দাড়ি,
আর এক গালে সাদা,
ভোমরা-কালো গোঁফ জোড়াটি
নাকের তলায় বাঁধা ।

এক চোখে তার চশমা আঁটা,
আরেকটি সে ফাঁকা,
মাথার মাঝে একগোছা চুল—
চার পাশে টাক রাখা ।
এক ঠোঁটে সে হাসে যেমন
আর এক ঠোঁটে কাঁদে ;

কান্না-হাসির বীভৎসতায়
ফেলছে ভয়ের ফাঁদে ।
জুজু বুড়োর মুণ্ডুটি সার—
ধড়ের বালাই নেই,
স্পষ্ট তারে দেখতে পাবে
চোখ দুটো বুজলেই ।

মেঘনাদ

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

৯

লাল কেল্লার অনতিদূরে দরিয়াগঞ্জ । নতুন দিল্লীর মত অতটা জাঁকজমক নেই, কিন্তু পুরোনো দিল্লীর মত নোংরা বা ঘিঞ্জীও নয় । এখানে ওখানে খোলা জায়গা চোখে পড়ে, যমুনার শীর্ণ রেখাও বেশী দূর নয় এখান থেকে । এই দরিয়াগঞ্জেই রাস্তার ওপর একটি একতলা বাড়ীতে ছোট একটি অফিস । সেই অফিসের একটি ঘরে টেবিলের সামনে বসে একটি যুবক আপন মনে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছিল । এই যুবকটিকে আমরা আগেও দেখেছি ; তবে এখানে নয়, কলকাতায় । একটু ভাল করে ঠাহর করলেই চেনা যাবে—এ আর কেউ নয়, আমাদের পূর্বপরিচিত ইন্দ্রনীল ।

অফিসের কাজে দিল্লী এসে ইন্দ্রনীল কাজের ভিড়ে একেবারে ডুবে গেছে—পৃথার কাছে লেখা চিঠিতে আমরা আগেই তা জানতে পেরেছি । তা তুলনায় কাজটা বেশী বৈ কি, নইলে একেবারে আলাদা একটা অফিস খুলে বসবার দরকার হ'ত না নিশ্চয়ই ; তবে অফিস বলতে তেমন বড় গোছের কিছু নয়—জনা দুই সহকারী, একজন বেয়ারা বা পিওন আর ইন্দ্রনীল নিজে ।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ইন্দ্রজিৎ টেবিলের সামনে বসে নিবিষ্ট মনে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছিল। পশ্চিমী আবহাওয়ায় এরই মধ্যে যেন ইন্দ্রনীলের চেহারায় একটু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে—চলতি কথায় যাকে বলে 'গায়ে গত্তি লাগা'। দেখলে মনে হয় বেশ পেটা শরীর, দেহে কিছুটা শক্তিও বোধ হয় আছে লোকটির। হয়তো এখানকার চাপাটিরই মহিমা এটা, কে জানে!

হঠাৎ পায়ের শব্দে ইন্দ্রনীল মুখ তুলল। তার অন্যতম সহকারী হরবংশ সিং একতাল কাগজ নিয়ে এসেছে সই করাবার জন্য। হরবংশ সিং জাতে পাঞ্জাবী, কিন্তু কিছুদিন কলকাতায় ছিল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলাও বলতে পারে। বলতে পারে বললে হয়তো ঠিক বলা হবে না, বলা উচিত বলতে ভালবাসে। হয়তো পাঞ্জাবের বাসিন্দা হয়েও কলকাতার সঙ্গে এই যোগাযোগের জন্যই হেড অফিসের কর্তারা ওকে এখানে চাকরী দিয়েছেন ইন্দ্রনীলের সহকারী হিসেবে। অপর সহকারীর নাম শ্রীমন্ত রায়—তাকে ইন্দ্রনীলই এখানে এসে নিয়োগ করেছে বড় সাহেবের অনুমতি নিয়ে।

কাগজ সই করতে করতে ইন্দ্রনীল হরবংশের দিকে তাকাল। ভাবখানা, কত সই করাবে একদিনে? হরবংশ তার মনের ভাব আন্দাজ করে বলল, 'আর এহি কোটা সোহি কোরে দিলেই, বাস্, আপ্ ভি আপনার ডেরায় চলিয়ে যাবেন, হাম্ ভি চলিয়ে যাব নিজের ঘোর। শ্রীমোন্তো বাবু বাকী সোব কাজ বুঝে কোরে লিবেন।'

ইন্দ্রনীল হাসিমুখে বল্ল, 'আপনি কোথায় থাকেন সিংজী?'

'আপনার ডেরা থেকে যেয়াদা দূর হোবে না। আপনি তো ফেরোকশেয়ার—'

ইন্দ্রনীল চকিতে ভ্রূকুটি হেনে তাকাল হরবংশের দিকে। তার পর সামলে নিয়ে বল্ল, 'তুমি—আপনি জানলেন কি করে? ওদিকে গেছেন নাকি কখনও?'

'না—না—না, ওদিকে আমরা কেউ যাই না। কেনো তা নিশ্চয়ই আপনার মালুম আছে। শেষে কি জান্‌টা দিয়ে দেব বিলকুল?'

ইন্দ্রনীল এবার হেসে ফেলল। বলল, 'ও, আপনিও ভূত মানেন বুঝি? আপনাদেরও ভয়? আপনারা তো মিলিটারী জাত—মহারাজ রণজিৎ সিংএর দেশের লোক। লাহোরে বাড়ী না আপনার?'

'জী হাঁ। লেকিন গাঁওমে নেহি, আনাঃকোলিমে। রব্বানি রোডে হামার নানা—মানি—পিতাজীর পিতা মোকাম বনাইয়েছিলেন। কিন্তু সে তো আমরা সোব ছেড়ে দিয়ে এসেছি। হামার পিতাজী তো কলকত্তা চলে এসেছিলেন। তার পর ফির দিহ্‌লী—'

কথায় বাধা দিয়ে ইন্দ্রনীল বল্ল, 'ও, তাইতেই বুঝি এমন ভাল বাংলা শিখতে পেরেছেন?'

লাজুক ছেলের মত সলজ্জ হাসি হেসে হরবংশ বলল, 'জী হাঁ।'

'তা এখানে কোথায় থাকেন বললেন?'

'ঐ যে হিরণমণ্ডী। ফেরোকশেয়ারবাদ-সে যেয়াদা দুর হোবে না।' এবারে ভ্রূকুটি করে তাকাবার পালা হরবংশ সিংএর।

আসল কথাটা এই। দরিয়াগঞ্জে অফিস বসলেও ইন্দ্রনীল ওর কাছাকছি আড্ডা গাড়তে রাজী হয় নি, থাকবার জন্য সে বেছে নিয়েছিল ফেরকশেরবাদ,—যেটা নাকি হচ্ছে শহরতলী, দরিয়াগঞ্জ থেকে বেশ খানিকটা দুর। ওদিক্‌টায় লোকজনের বসতি খুব কম, জায়গায় জায়গায় এখনও ঘন জঙ্গল হয়ে রয়েছে। বোধ হয় সেই জন্যই ও-অঞ্চলটায় ভৌতিক উপদ্রবের জনশ্রুতি আছে—যদিও খুব কম লোকই তা পরখ করে দেখতে গেছে। এত জায়গা থাকতে ইন্দ্রনীল ওরকম জায়গা কেন বেছে নিল এটা হরবংশের মত অনেকেরই কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। হয়তো শহরের হট্টগোল থেকে দূরে থাকবার ইচ্ছাতেই তার এই রকম শখ হয়ে থাকবে। এমনিতেই তো তার হালচাল দেখে এখানকার লোকেরা তাকে কবি বলে সন্দেহ করেছে। কবির পক্ষে কোন রকম খেয়ালই অভাবনীয় নয়। বিশেষ করে ও জায়গাটা আবার যমুনা নদীর খুব কাছে। জল যতটুকুই থাকুক, নদী তো বটে! নদী, জঙ্গল, গাছপালার ভিড়—কবিরা তো এই সবই চায়! আর বাইরের লোক যাতে বিরক্ত না করে সেজন্যই বোধ হয় সে পারত পক্ষে কাউকে নিজের বাড়ীর ঠিকানা বলতে চায় না।

ইন্দ্রনীল আর কথা বাড়াল না, কাগজ টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে সই করে যেতে লাগল। তর্ তর্ করে সই করার মত হাতের অবস্থা তার এখনও হয় নি। কেন? ও, বলি নি বুঝি? আসবার সময় ট্রেনে জানলার ফাঁকে হাত রেখে ঝিমুচ্ছিলেন বাবু, হঠাৎ ঝাঁকি লেগে শার্শির কাচ এসে পড়ে হাতের আঙ্গুলে একেবারে রক্তারক্তি ব্যাপার! অবশ্য প্রায় তখন তখনই ওষুধপত্র দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ঘা এখনও ভাল করে শুকোয় নি—লিখতে গেলে এখনও আঙ্গুল বেশ টন্ টন্ করে, ধরে ধরে লিখতে হয়।

সই শেষ হ'লে ইন্দ্রনীল হাত দু'টো টান করে পিঠের আড়মোড়া ভাঙ্গল। তারপর সহকারীকে লক্ষ্য করে বল্ল, 'আজ আর কাগজপত্র আনবেন না সিংজী! আজ এখনই উঠব। একটু দরকার আছে।'

'জী, বহুৎ আচ্ছা।' বলে সিংজী ফাইল বাঁধতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁটের কোণে কেমন একটা বাঁকা হাসিও খেলে গেল। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল এড়িয়ে ইন্দ্রনীলের নজরে পড়ল না সেটা।

(ক্রমশঃ)

নতুন বই

কয়েকখানি ভালো ভালো নতুন বই আমাদের হাতে এসেছে।

এর মধ্যে আছে হাসির নাটক, গীতিনাট্য, কবিতায় লেখা জীবনী, হাসির কবিতা, গল্পসংগ্রহ ইত্যাদি। এর কয়েকখানির কথা আজ বলি।

প্রথমে হাসি দিয়েই সুরু করা যাক্‌। হাসির নাটক 'চার মূর্তি'। সুসাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়র লেখা ঐ নামে ছোটদের যে একখানা মজাদার উপন্যাস আছে এটি তারই নাট্যরূপ,—নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়। ইনিও হাসির গল্প লেখায় সিদ্ধহস্ত। কাজেই চার মূর্তি নাটকটিও যে মূল উপন্যাসের মত মজাদার হবে তাতে সন্দেহ কি? হয়েছেও তাই। নাটকের টেনিদা, প্যালা, হাবুল, ক্যাবলা এরা তোমাদের কাছে খুবই পরিচিত। তা ছাড়া আছে স্বামী ঘুটঘুটানন্দ, তাঁর চেলা গজেশ্বর, শেঠ ঢণ্ডুরাম ইত্যাদি। বইখানি পড়তে তো ভাল লাগবেই, অভিনয় করলেও জমবে চমৎকার। তবে, কেন জানি না, হয়তো নাটক বলেই, প্রকাশক মলাটটির ওপর তেমন নজর দেন নি।

'সাত ভাই চম্পা'ও একখানি নাটক—তবে গীতিনাট্য। লিখেছেন শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়। সাত ভাই চম্পা আর বোন পারুলের গল্প কখনও পুরোনো হয় না—লেখক তাকে ঢেলে সাজিয়েছেন ছন্দে, নাচে, গানে। শিশুরংমহলের উৎসবে একাধিক বার এই গীতিনাট্য অভিনীত হয়েছে এবং ছোটদের আনন্দ দান করেছে। এখন তা বইএর আকারে পেয়ে ছোটরা আরও খুসী হবে। এর ছাপা, ছবি ইত্যাদিও খুবই মনোজ্ঞ। বইএর পেছনে গানগুলির স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে। এগুলিও, যারা এই গীতিনাট্য অভিনয় করতে চাইবে, তাদের খুব কাজে আসবে।

'এক যে ছিল রাজা' আর 'গদাধর' দু'খানিই জীবনী—কিন্তু একেবারে নতুন ভাবে পরিবেশন করা—আগাগোড়া কবিতায়। দু'খানিরই রচয়িতা শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত। 'এক যে ছিল রাজা' হচ্ছে রাজা রামমোহন রায়ের কথা, আর গদাধর হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। দু'খানি বই-ই আগাগোড়া একই ছন্দে লেখা। সহজ, মিষ্টি ছন্দ—মিষ্টি কথায় মিষ্টি মিল। তবে লেখক এই ছন্দে কোন বৈচিত্র্য দেন নি, হয়তো ইচ্ছে করেই। আর কবিতা কিনা, তাই কিছুটা কল্পনারও সাহায্য নিয়েছেন—জীবনী হ'লেও। পড়তে বেশ ভাল লাগে, কথাগুলোও থেকে থেকে মনের ভেতর উঁকি মারে। বাংলা দেশের দুই মহাপুরুষকে জানবার পক্ষেও এ বই খুব উপযোগী।

'হাসির টেক্কা' একখানি কবিতার বই। লিখেছেন শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার। নাম শুনেই বুঝছ কবিতাগুলি সব হাসির। সেই হাসির সঙ্গে অনুপান হচ্ছে মজার ছবি—আগাগোড়া দু' রঙে ছাপা। চক্‌চকে মলাট আর বড় বড় অক্ষর। লেখকের যে সব কবিতা ইতিপূর্বে নানা সাময়িক পত্রে বেরিয়েছিল তারই থেকে বাছাই করে এই সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে।

'বিদেশী গল্পগুচ্ছ' একখানি গল্পসংগ্রহ। বিশ্বসাহিত্যের নামকরা তেরো জন লেখকের

গল্প নিয়ে বাংলা ভাষায় পরিবেশন করেছেন বিভিন্ন অনুবাদক। সম্পাদনা করেছেন শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী। মূল গল্পগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং প্রাচীন দুই-ই আছে—যেমন টলষ্টয়, আনাতোল ফ্রাঁস, ও হেনরি, এইচ, জি ওয়েল্‌স্‌, হান্‌স্‌ এ্যাণ্ডারসন, হাওয়ার্ড ফাষ্ট, চেকভ প্রভৃতির গল্প। বাংলায় এ ধরণের বইএর উপযোগিতা অনস্বীকার্য। ছাপা, মলাট সুরুচিসম্মত।

চার মূর্তি (নাটক)—দাম ১.২৫, এবং বিদেশী গল্পগুচ্ছ—দাম ৩.৫০। প্রকাশ করেছেন অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ৬, বংকিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। এক যে ছিল রাজা—দাম ২.০০—প্রকাশক ঈষ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী, ৬৪-এ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলকাতা-১৩। গদাধর—দাম ১.৫০, প্রকাশক শ্রীকল্যাণী দাশগুপ্ত, ক্লাসিক প্রেস, ৩।১এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২। সাত ভাই চম্পা—দাম ২.৫০, প্রকাশক—শিশুরংমহল, ২, তিলক রোড, কলকাতা-২৬। হাসির টেক্কা—দাম ১.৫০, প্রকাশক দ্বারকানাথ সাহিত্যসংসদ, ২৮।৪এ, বিডন রো, কলকাতা-৬।

[সমালোচনার জন্য ২ খানি করে বই পাঠাবেন।]

কৃষাণ বন্ধু

শ্রীবাসুদেব লস্কর

বিত্তবিহীন রিক্তজীবন
ও ভাই কৃষাণ, আজো
পরের অন্ন যোগাতে তুমি যে
নিজে ক্ষুধাতুর সাজো!
দৈন্যের দায়ে মাথা হেঁট করে
কত কাল রবে হেয় হয়ে প'ড়ে?
প্রাণের অন্ন বাঁটি দিয়া সবে
সব-হারা সম রাজো!

চপলা লক্ষ্মী,—লভিবারে তাঁরে
নিয়েছ কঠিন ব্রত,
হলের ফলকে তুলেছ তাঁহারে
জনক রাজার মত।
মাথার উপরে প্রখর কিরণ,
কভু বা সহেছ ভীম বরিষণ,
অমৃত ছানিয়া এনেছ তুলিয়া
করিয়া বক্ষ ক্ষত।

আজি এ ভারত—আমার ভারত,
তোমারও ভারত ভাই,
নিজের প্রাপ্য নিতে হবে চিনে—
নিজেরেও চেনা চাই।

মেঠো সুর

শ্রীগৌরকিশোর চৌধুরী

পাগল হাওয়া যাচ্ছে বয়ে তেপান্তরের পারে,
বসে আছি একলা আমি বকুল গাছের ধারে।
মেঘে ভাঙা জ্যোৎস্না হাসে গাছের ফাঁকে ফাঁকে,
কোন্ সে মাঝি গান ধরেছে ময়নামতীর বাঁকে।
আমার কানে আসছে ভেসে ভাটিয়ালির তান,
ছন্দে তারি দিচ্ছে দোলা—মুগ্ধ হ'ল প্রাণ।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

ব্যস্ত অবস্থায় চিঠি লিখতে বসলে কি রকম দুর্ভোগ পোহাতে হয় তা বেশ টের পাচ্ছি। মনের মধ্যে কত কথা ভিড় করে আসছে, কিন্তু কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা লিখি? এদিকে সামনে ঘড়ির কাঁটা হু-হু করে ছুটে চলেছে তুফান মেলের বেগে। রাত প্রায় দেড়টা বেজে গেল। শয্যার সস্নেহ আহ্বান তাচ্ছিল্যের হাসিতে উপেক্ষা করে কলম চালাতে হবে। তা হোক্।

তোমাদের অনেকেরই হয়তো এখন সামনে প্রচণ্ড অবসর। যারা স্কুলে পড় তারা পরীক্ষা-সাগর পার হয়ে গেছ এত দিনে। নতুন ক্লাসে ওঠার আনন্দে মশ্‌গুল হয়ে আছ। এ সময়েও যদি রামধনু সময় মত হাতে না এসে পৌঁছয় তবে তোমাদের সম্মিলিত অভিশাপে হয়তো ভস্ম হয়ে যেতে হবে। সুতরাং উল্কা-বেগে কলম ছোটানো চাই। ১৩৬৫র পত্রিকা কি শেষে সাল ছাড়িয়ে যাবে? উঁহুঃ, নেভার।

কলকাতায় ইষ্টারের ছুটীতে তিনদিন-ব্যাপী নিখিল বঙ্গ শিশুসাহিত্য সম্মেলনের তোড়জোড় চলছে—শিশুসাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে। দৈনিক খবরের কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছ। সুতরাং ওর জন্যও ছুটোছুটী করতে হচ্ছে প্রচুর। রামধনু কার্যালয় আর পরিষদ্ কার্যালয় একই জায়গায়, কাজেই সন্ধ্যার পরে জায়গাটি কি রকম সরগরম হয়ে থাকে বুঝতেই পারছ। তখন অন্য দিকে মন দেয় কার সাধ্য? এই সম্মেলন শিশুসাহিত্যিকদের জন্য

হলেও ছোটরাও এতে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। তোমরাও, বিশেষ করে যারা কলকাতায় বা কাছাকাছি থাক, নিশ্চয়ই যোগ দেবে। বারান্তরে এই সম্মেলনের কথা তোমাদের ভাল করে বলবার ইচ্ছে রইল।

এবারে কয়েকখানি চিঠির জবাব দিয়ে শেষ করি।

শ্রীপ্রণতি ভট্টাচার্য (চন্দননগর)—রামধনুর বিলম্বে আত্মপ্রকাশে তোমার মানসিক অবস্থা এমনিতেই বুঝতে পারছি, তার ওপর যদি বন্ধুবান্ধবরাও বিরূপ কথা শোনাতে থাকে তা হলে অবস্থা দুঃখজনক বৈ কি! তোমার দুঃখ-লজ্জার খানিকটা ভাগ আমাদেরই প্রাপ্য। প্রতিকারের চেষ্টা অবশ্যই করব। শ্রীরণেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (ঘৈরালী)—বারোয়ারী উপন্যাসটির জন্য মনের মত লেখা আসছে না এ কথা একাধিক বার জানিয়েছি। যার লেখা সব চেয়ে ভাল বিবেচিত হবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে এ কথা হয়তো সকলকার মনে নেই। যাই হোক, তোমরা এবারে সত্যি সত্যি বইটা শেষ করবার চেষ্টা করবে এই আশা করি। একবার যারা লিখেছ আবার তাদের লিখতে কোনই বাধা নেই। শ্রীঅসীমা পাল (কলকাতা-৬)—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় পাশ করে, কর্মজীবনে ঢুকেও তুমি যে রামধনু নিয়ে আগের মতই আনন্দ পাও—এটা একটা সুখবর সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে অল্প বয়সেই বুড়ো হয়ে যায় (মনের দিক্ থেকে) এমন লোকের সংখ্যাই বেশী। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে যদি তোমার মত এমন এক-একজনকে পাওয়া যায় যার মধ্যে চিরশিশু মনটি কখনও হারায় না তা হলে সত্যি আনন্দের কথা। এ যে কত বড় সম্পদ্, মনের দিক্ থেকে, তা সবাই বুঝবে না। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীরা এদিক্ দিয়ে আমাদের আদর্শ বলা যেতে পারে। শ্রীশুভেন্দুশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (হাওড়া)—মনোরঞ্জন-স্মৃতি পদক, একটু দেরীতে পেলেও, তোমার পছন্দ হয়েছে জেনে খুসী হলাম। ভ্রমণ-কাহিনী আপাততঃ অনেকগুলি হাতে জমে গেছে, সেগুলি নিঃশেষ হলে জানাব। শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় (গড়বেতা)—তোমার খুঁটিনাটি সংবাদ-পূর্ণ লম্বা চিঠিটা খুব ভাল লাগল। তবে কথা কি, যদি সমস্ত রকম তথ্য একটা প্রবন্ধে সরবরাহ করতে হয় তবে আর সেটা মাসিকের-পাতায়-আঁটা প্রবন্ধ থাকে না—মোটা বই হয়ে দাঁড়ায়। "লেখার চেয়ে না-লেখা কঠিন" শরৎচন্দ্রের এ কথাটি খুব বড় কথা।

আজ এখানেই ইতি। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। —ইতি রাঃ সঃ

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

এক মিনিট

(পাশাপাশি সাজালে ১ম খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠার পাশেই পড়বে ২য় খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠা। সুতরাং উইপোকাটির শুধু সিকি ইঞ্চি মাপের ২ খানি মলাট পার হলেই চলবে।)

উত্তরদাতাদের নাম ঃ শ্রীলা, দীপ্তেন ও সৌম্যেন (কলিকাতা-২৫); দিলীপ সমাজদার (কলিকাতা-১২); অসীমা, দীপ্তি, মায়া (কলিকাতা-৬); নীহারেন্দু বসু (নতুন দিল্লী); কল্পনা মৈত্র (এলাহাবাদ); সমীর ও নীলা (চুঁচুড়া) কমলা দত্তগুপ্ত (পাটনা); শশী, নিতু ও উজ্জ্বল (কলিকাতা--১২); ছায়া, চিত্রা ও গৌরী (বাঁকুড়া); শোভনা সোম (কাশী); হেনা বসু (জলপাইগুড়ি)।

নূতন ধাঁধা

সেজমামা অঙ্কের পরীক্ষা নিচ্ছেন। ফুল নম্বর ২৫, ১২ পেলে পাশ। সতু পেয়েছে ১১। খবর শুনে সে তো মুখভার করে রয়েছে। স্বপ্না তার হয়ে ওকালতী করছে—"দিন না আর একটা নম্বর ওকে। বেচারা!"

"কেন দেব?" সেজমামা বললেন গম্ভীর ভাবে। তার পর কি মনে করে বললেন, "আচ্ছা, তোরা যদি কেউ ওটাকে কেটেকুটে ফের যুড়ে দশ করতে পারিস তা হলে দেব। ইংরেজী, বাংলা, দেবনাগরী বা অন্য যে কোন হরফে হোক, লিখে—আমার আপত্তি নেই।"

কি অসম্ভব কথা! তা কি হয়?

তপন ছিল এক পাশে বসে। অঙ্কে ভারী মাথা তার, বুদ্ধিতেও। বললে, "বহুৎ আচ্ছা, এক্ষুণি করে দিচ্ছি।" তার পর, ও মা, তপন সত্যি ১১ লিখে সেটাকে দু'ভাগ করে নিয়ে ফের যোগ করল। ১১ দেখতে দেখতে ১০ হয়ে গেল। সবাই অবাক্। সতু তো ভারী খুসী। সে শুধু অবাক্ হয় নি, পাশও করে গেছে।

কিন্তু কেমন করে এটা সম্ভব হ'ল? তোমরা বলতে পার?

(রামধনু পাবার এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব পাঠাতে হবে।)

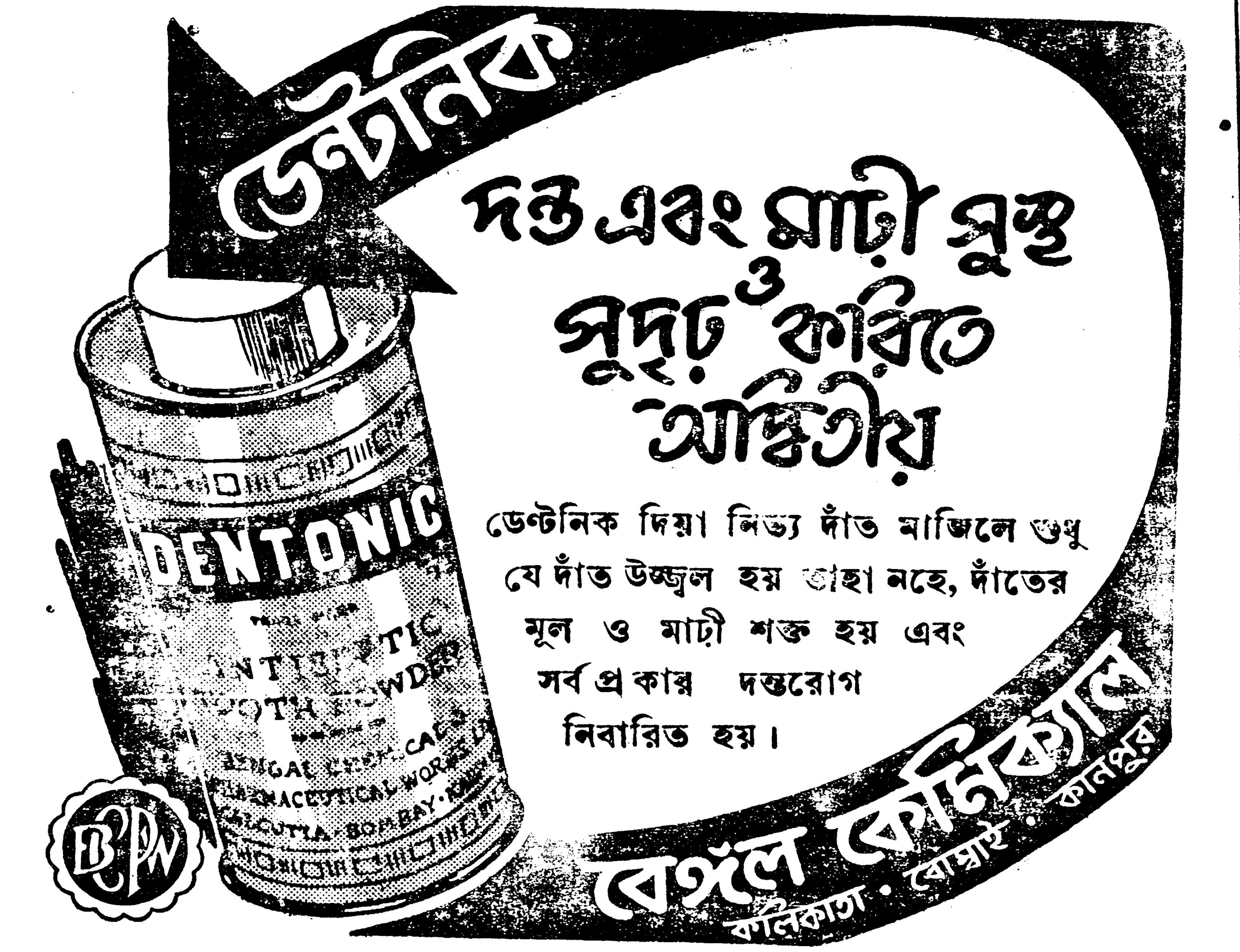

আজই গ্রাহক হও

শ্রীননীগোপাল মজুমদারের

শব্দ-ভারতী

ছোটদের অভিনব অভিধান
আনুমানিক ৫০ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে।

কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য যাহারা আগে নিজেদের নাম গ্রাহক তালিকাভুক্ত করিবে, শুধু তাহাদের কাছেই বিক্রয় করা সম্ভব হইবে।

গ্রাহক তালিকাভুক্ত হইতে কোন পয়সা লাগে না।

অভিজিৎ প্রকাশনী
৭২।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু-র
(অ-কৃ-ব)

খামখেয়ালী ছড়া

(ছোটদের হাসির কবিতা)

দাম—১'৫০ (দেড় টাকা)

প্রকাশ করেছেন
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭

শ্রীচরণেষু ফোন: ৫৫-৪০৪৬

• সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠাতা—গোরাচাঁদ দাশগুপ্ত

* নতুন আদর্শ এবং পরিকল্পনা নিয়ে প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই প্রকাশিত হয়।
* নীট্ আয় দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যয়িত হয়।
* 'বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর লেখা' এবং 'বিদ্যালয়ের খবর' বিভাগ দু'টি আমাদের সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পিত।
• প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকদের রচনায় প্রতিটি সংখ্যা সুসমৃদ্ধ।

বার্ষিক (সডাক) ৩৲ ষাণ্মাসিক (সডাক) ১।৹ প্রতি সংখ্যা ।৹

অন্যান্য বিষয়ের জন্য কর্মসচিবের সহিত পত্রালাপ করুন।

সম্পাদক
শ্রীননীগোপাল দত্ত

'শ্রীচরণেষু' কার্য্যালয়,
৪বি রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৫

জ্যোতির্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ॥৹ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা৹ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১॥৹ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য বি এ.

শুকতারা

ফাল্গুন মাসে দ্বাদশ বর্ষে পড়বে

—নীহার রঞ্জন গুপ্তের—

বিষের তীর—১৲ রাতের আতঙ্ক—১৲

রক্তমুখী ড্রাগন—১৲

প্রতি সংখ্যা আট আনা

বার্ষিক চাঁদা পাঁচ টাকা

ষাণ্মাসিক চাঁদা পূর্ব্বের মত

আড়াই টাকা

✻ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ✻

দেড়শো খোকার কাণ্ড

দাম এক টাকা চার আনা

অপরাজিতা-৪৲

ঠানদিদির থলে-৩৲

সুনির্মল বসুর

বরণ ডালা - ২৲

আশাপূর্ণা দেবীর

গল্প ভালো আবার বলো-২৲

—নরেন্দ্র দেবের বাছাই করা গল্প—

অনেক দিনের অনেক কথা —২৲

—আশাপূর্ণা দেবীর বাছাই করা গল্প—

শোনো শোনো গল্প শোনো —২৲

—দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত—

ভূত পেত্নী দত্যি দানা —৩৲

ঠাকুরমার ঝুলি —৩৲

পুরনো দিনের পুরনো গল্প —৩৲

Regd. No. C—1641

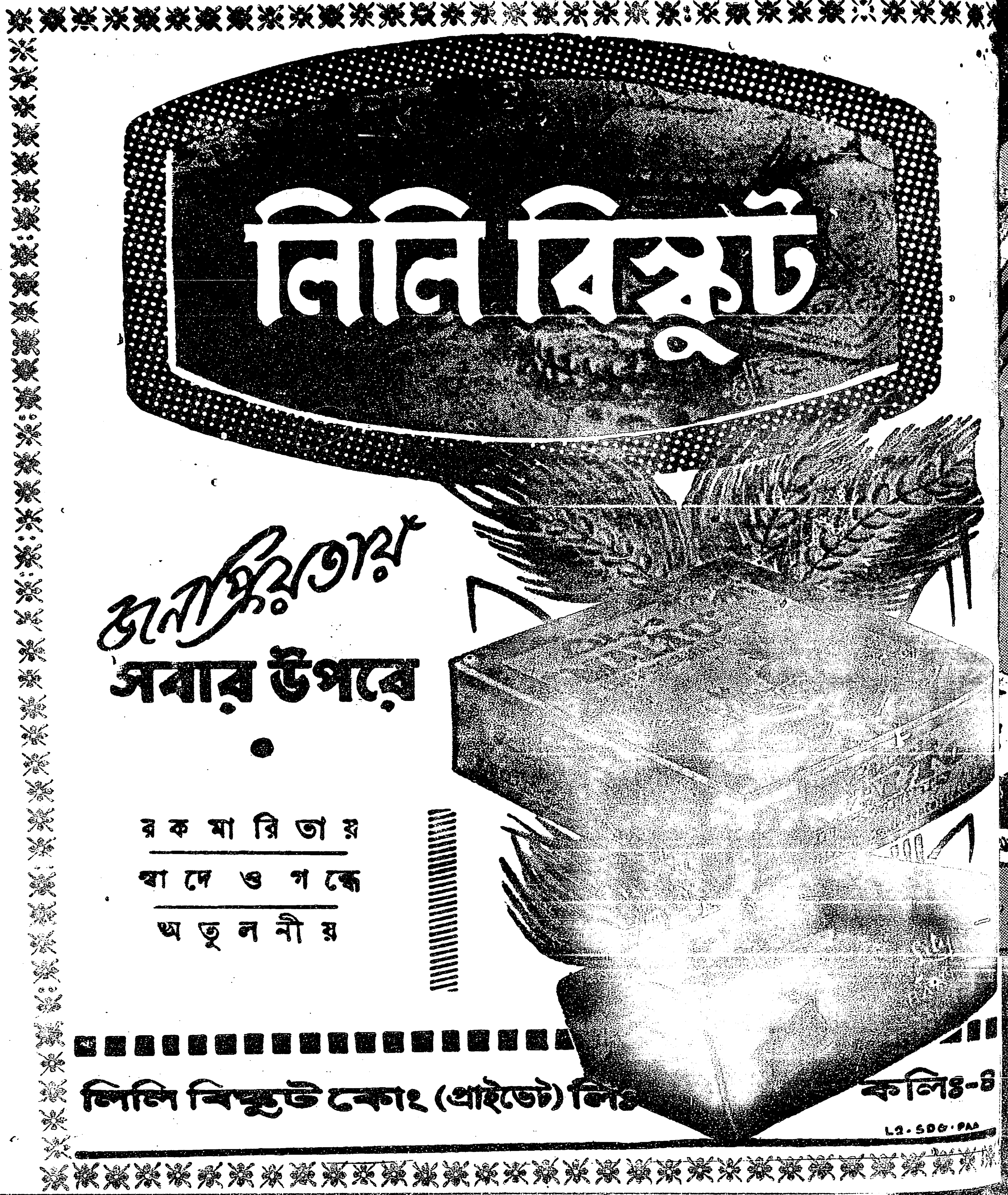

স্থাপিত – ১৩৩৭ ফোন–৩৫–২৭৭৪
ভারত অয়েল মিলের
আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পতাকা মার্কা
খাঁটী সরিষার তৈল
/২॥০, /৫, ।৮ সেরা ডাইস্ টীনে,
মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।
প্রোঃ– শ্রীঅমৃত লাল কুমার।
মিল ও অফিস – ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য সডাক ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২ টাকা ২৫ ন. প., প্রতি সংখ্যা ৩৭ ন প. ভি.পি তে নিলে আরও অতিরিক্ত ৭১ ন. প. লাগে। নমুনার জন্য ৩৯ ন.. প.র ডাকটিকেট পাঠাতে হয়। বিনামূল্যে নমুনা পাঠানো সম্ভব নয়। ভি পি.তেও নমুনা পাঠানো হয় না।

২। বৈশাখে বছর সুরু, যে কোনও মাসে চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যায়; কিন্তু পত্রিকা নিতে হবে বৈশাখ কিংবা কার্ত্তিক থেকে। তবে এতে অসুবিধা হলে মাঝের সংখ্যাগুলো খুচরা হিসাবে নিয়ে বৈশাখ বা কার্ত্তিক থেকে নিয়মিত ভাবে নেওয়া যেতে পারে।

৩। কোন মাসে পত্রিকা না পেলে ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে তাঁদের উত্তরসহ সেই মাসের মধ্যে আমাদের জানাতে হবে।

৪। পাকিস্তানের গ্রাহকেরা ব্যাঙ্ক মারফৎ (যে সব ভারতীয় ব্যাঙ্কের পাকিস্তানেও শাখা আছে) ড্রাফ্‌টএ চাঁদা পাঠাতে পারেন। এর নিয়মকানুন ব্যাঙ্কে খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। আমাদের লিখলে আমরা Proforma Invoice পাঠাতে পারি।

৫। গ্রাহকদের সব চিঠিতেই গ্রাহক নং দিতে হবে। চিঠির জবাবের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাকটিকেট দিতে হবে।

৬। লেখা, কপি রেখে, সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। সাধারণ বিভাগে যে কেউ লেখা পাঠাতে পারেন। তা ছাড়া গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখায় উৎসাহ দেবার জন্য একটি পৃথক্ বিভাগও আছে।

৭। বিজ্ঞাপনের হার চিঠি লিখলে জানানো হয়। টাকাকড়ি চিঠিপত্র প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা—
ম্যানেজার, রামধনু; ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫। (টেলিফোন : ৪৮-৩১৮১)

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

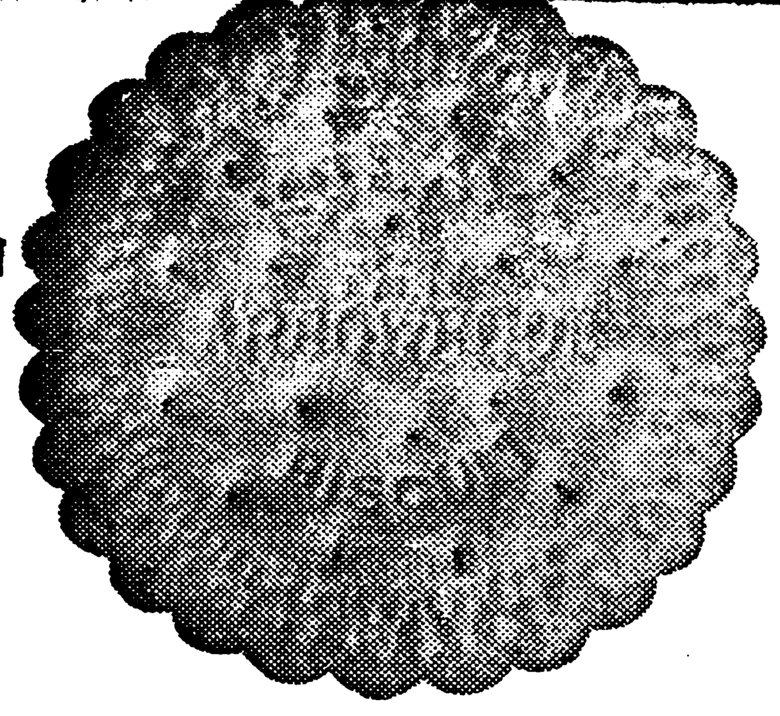

বিজ্ঞাপনের মতামতে
কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে ?
স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,
'থিনের' মধ্যে; গুণে, স্বাদে সবার সেরা "কোলে"
অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,
সবরকমের "কোলে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

ভিটামিন সমৃদ্ধ

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ

খবর কি!
আখর গুলি হয় না কালো,
বলে না কেউ দেখলে ভালো;
সবাই শুধু ধমক লাগায়,
করব আমি কি ?
দোয়াত কলম ছিবেয় তুলে
ভাবতে বসেছি।
খোকন মনি, খোকন মনি,
ভাবছ বসে কি ?
ইস্কুলেতে হাতের লেখায়
শূন্য পেয়েছি।
ভাবনা রাখো খোকন মনি
ভালো কালির খবর জানি,
কালির সেরা 'সুলেখা'তে
লেখাটি হয় কালো,
সেই কালিতে হাতের লেখা
লাগবে সবার ভালো॥
সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড, সুলেখা পার্ক
কলিকাতা-৩২ হইতে প্রচারিত।

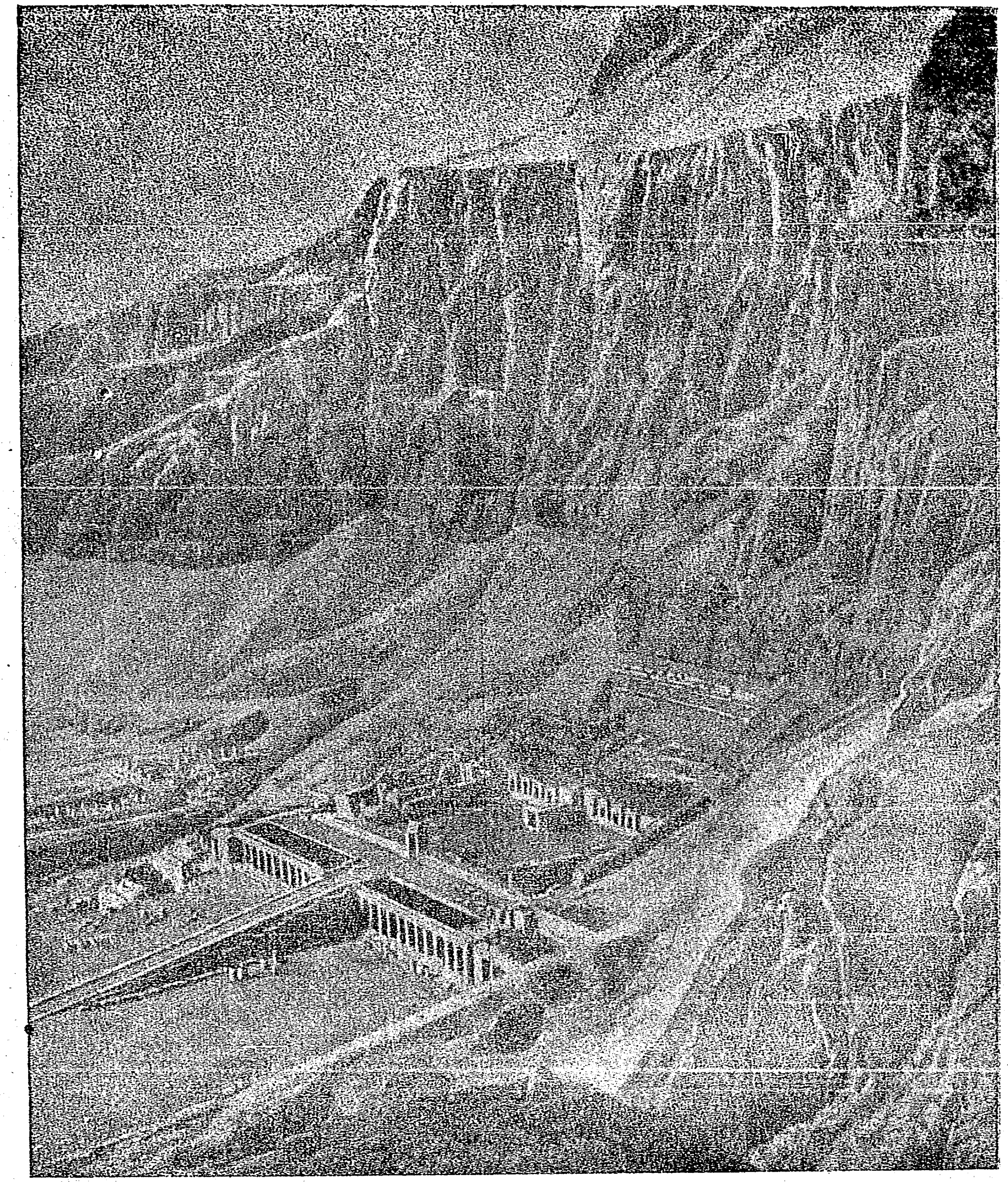

পিরামিডের দেশ

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩১শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৬৫ | ১২শ সংখ্যা

চৈতালি রাত

শ্রীবিমল দত্ত

চৈতালি রাত—চাঁদ উঠেছে, সন্ধ্যে যেন সব্‌জে ভোর,
সোনার আলোর ঝালর দোলে, চক্ষে লাগে স্বপন-ঘোর।
আল্‌তো হাওয়ায় তুলছে শাখা, কাঁপছে পাতা ঝম্‌-ঝমর্‌,
চুম্‌কি-আঁটা নীল আকাশে বইছে আলোর তুধ-সায়র—
সন্ধ্যে যেন সব্‌জে ভোর।

ঝিমিয়ে ঝিঁঝি তান তুলেছে, রাত্রি-চরা জোনাক্‌-দল
আশমানে ধায় ফুলকি সম—ভাসছে, ডোবে কোন্‌ অতল।
হু-হু হো-হো হাস্‌ছে হাওয়া, বইছে কভু বহার ছল্‌
নারিকেলের পাতায় পাতায় বাজিয়ে চলে জলদ্‌ মল।—
রাত্রি-চরা জোনাক্‌ দল।

এমনি রাতে প্রাণটি মাতে এলিয়ে দেহ, এলিয়ে মন
আশ্‌মানের ঐ সোনার শ্লেটে আঁকতে থাকে আলিম্পন।
ভাসতে থাকে, ডুবতে থাকে কোন্ অতলে, কোন্ গহন—
কোন্ গোপনের স্বপন-ঘোরে মজ্‌তে থাকে দুই নয়ন!
এলিয়ে দেহ, এলিয়ে মন।

বনের কালো বুকের 'পরে যে আলো আজ গড়িয়ে যায়
মনের কালো কষ্টিতে সেই আলোর হাসি ছড়িয়ে যায়
জ্যোৎস্না আলোয় সেতার বীণে আনন্দ-গান মূর্চ্ছনায়।
শুন্‌বি যদি, দেখ্‌বি যদি এই নিরালায় দৌড়ে আয়!
আলো যে আজ গড়িয়ে যায়।

নিরক্ষর বাদশাহ্

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

আকবর ছিলেন বাদশাহের সেরা বাদশাহ্। কিন্তু তিনি ছিলেন নিরক্ষর অর্থাৎ লিখতে পড়তে জানতেন না একেবারেই। আর তাঁর ছেলেবেলাটি ছিল ডানপিটেমিতে ভরা। সে সব গল্প ভারি মজার।

ছেলেবেলায় তাঁর কবুতরের সখ ছিল খুব। এ ছাড়া নানা রকম জন্তু-জানোয়ারের সখও ছিল বেজায়। হাতী, ঘোড়া, উট, নানা জাতের কুকুর—এই সব নিয়ে তিনি মেতে থাকতেন দিন-রাত। ফলে এই হয়েছিল যে কিশোর বয়সেই তিনি খুব সাহসী হয়ে উঠেছিলেন। তেজীয়ান ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে তাকে তীরবেগে চালিয়ে দেওয়া—এ তো সাধারণ কথা। এতে কী আর এমন মজা! সবচেয়ে তিনি মজা পেতেন বন থেকে ধরে-আনা হরিণের পিঠে চ'ড়ে। খোলা মাঠে হরিণটা তিড়িং বিড়িং লাফাতো, আর তিনি ধাঁ করে তার পিঠের উপর চড়ে বসতেন—হরিণটা ছুট দিতো তীরের মতো। তাঁর কানের পাশ দিয়ে হাওয়া বয়ে যেতো সাঁ সাঁ করে, আর সবল দেহের প্রতিটি শিরা উল্লাসে চন্ চন্ করে উঠতো।

বয়স একটু বাড়লে পর শিকারের আনন্দ তাঁকে পেয়ে বসলো। শিকারের আনন্দে তিনি হয়ে উঠলেন একেবারে বে-পরোয়া। পায়ে হেঁটেই তিনি বুনো জন্তুদের তাড়া করতেন। বুনো শুয়োর বা বাঘ আহত হয়ে ছুটে পালাতো, তিনিও ছুটতেন তার পিছু পিছু, একটুও দ্বিধা না করে, ঠিক যেন একটা ডানা-ভাঙ্গা পাখীর পিছনে ছুটে চলেছেন—এমনি সহজ ভাবে। এই রকম করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন দুর্দ্ধর্ষ সাহসী। বেশী বিপদের মাঝেই তিনি বেশী আনন্দ পেতেন। বুনো জন্তুদের শিকার করা যেমন ছিল তাঁর অতি প্রিয় কাজ, পরে তেমনি রাজ্যের ভার নিয়ে বুনো প্রকৃতির মানুষদের বিধিমত শিক্ষাদান করাও ছিল তাঁর পরম প্রিয় কাজ। এ সব গল্পও ভারি মজার।

খালিফ্ হারুন-অল্-রসিদের কথা তরুণ আকবরের খুব ভালো লাগতো। খালিফ্ রাত্রির অন্ধকারে নগরে বেড়িয়ে বেড়াতেন, আর নিজের চোখে সব দেখতেন—এই গল্প শুনে তাঁরও ইচ্ছে হোল, তিনিও এই রকম করবেন মাঝে মাঝে রাত্রি বেলা একা তিনি বেরিয়ে পড়তেন। লোকেরা কি ভাবে আছে, কে কোথায় কি করছে—আগরা সহরে ঘুরে ঘুরে এই সব দেখতেন। রাত্রিবেলা যখন বেরুতেন, কাউকে তিনি সঙ্গে নিতেন না। দড়ির একটা মই জানলা দিয়ে ঝুলিয়ে দিতেন, তাই ধরে নীচে নেমে যেতেন—এমন নিঃশব্দে যেতেন যে তাঁর দেহরক্ষীরা পর্য্যন্ত টের পেতো না যে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। এইভাবে বেরিয়ে তিনি অনেকবার অনেক বিপদে পড়েছেন। সে সব গল্পও ভারি মজার।

আসল কথা, তোমাদের মতো বয়সে আকবর এক ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। অবশ্য বড় বড় ওস্তাদ, পাকা পাকা মৌলবী অনেক ছিলেন তাঁকে তামিল দেবার জন্য। কিন্তু তাতে কি হয়? ফারসী হরফ্‌গুলোকে কায়দার মধ্যে আনা যায় কি করে সে দিকে মাথা না দিয়ে, এক ঝাঁক কবুতর আকাশে উড়িয়ে দিয়ে কি করে তাদের নানান্ কসরৎ শেখানো যায়, সেই দিকেই তিনি মাথা দিতেন ষোল আনারও বেশী। তাঁকে কেতাবী তামিলের ভিতর আনতে না পেরে মৌলবী সাহেবরা হতাশ হলেন। দুঃখ এই যে, বাদশাহ্‌জাদা কেতাবের সামনে বসতেই চাইতেন না। তবে একটি কথা। কেতাব নিয়ে বসতে তাঁর ধৈর্য থাকতো না বটে, কিন্তু যদি কেউ কেতাব পড়ে শোনাতো, তিনি তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে, মন দিয়ে তা শুনতেন। গল্প শুনতে তাঁর ভালোই লাগতো। নানা রকম বীরত্বের কাহিনী শুনতে তাঁর আরও বেশী ভালো লাগতো।

লেখাপড়ার দিকে যেতেন না, তবে কি তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল না? তাই বা কেমন করে হয়? কারণ, আকবর বাদশাহের মতো বুদ্ধিমান্-বিচক্ষণ ক'জন মেলে? নিজে

তিনি ছিলেন নিরক্ষর, অথচ তাঁর দরবারটিতে ছিল মহা মহা পণ্ডিত, বিদ্বান্ ও জ্ঞানী-গুণীর সমারোহ। আকবর ছিলেন সব দিকেই অসাধারণ। তাঁর পিতা সম্রাট্ হুমায়ুন যখন মারা যান, তখন তিনি একেবারেই তরুণ আর বিশেষভাবে অসহায়। রাজ্য তখন টলটলায়মান। এই তরুণ বয়সেই সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর করে দিয়ে ক্রমে ক্রমে তিনি কি করে অত বড় মোগল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন—তা অজানা নেই কারো।

রায় বরুয়ার শিকার কাহিনী

২

দুশ্‌মন্ হাতীটা যে গ্রাম বিধ্বস্ত করেছিল সেটা প্রায় হাজারখানেক পা নীচে। পাহাড়ের গায়ে সরু, শিশির-ভেজা পায়ে-চলার পথ ধরে তাঁরা হু হু করে নেমে চললেন। এদিক্‌টায় সাপ ছাড়া আর কিছুর ভয় নেই। স্থানে স্থানে ফুলন্ত বাঁশঝাড় আর আগাছা। ঝুম্-রীতিতে চাষ করার ফলে পাহাড়ের গায়ে কোনো বড় গাছ জন্মাতে পারে নি। সামনে দৃষ্টি রোধ করবার কোনো প্রতিবন্ধক নেই। এ পাহাড়টা ঢালু হয়ে খানিক দূর নেমে গিয়ে আবার যেন সহসা মত পরিবর্ত্তন করে ওপরে উঠে গেছে। মাঝখানে উপত্যকার মত খানিকটা সমতলভূমি, পাশ দিয়ে ছোট্ট একটি ঝির্‌ঝিরে নদী। সবেগ হলেও স্রোত খুব প্রখর নয়। অনায়াসে পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। উদীয়মান সূর্যের কিরণে ও অবলীয়মতী ঊষার প্রচ্ছন্নতায় সোণালী আর ফিকে নীলে মেশানো। সঙ্গের লোকটা নদীর ধারে বিধ্বস্ত গ্রামের দিকে আঙুল দিয়ে রাজা ও রায় বরুয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে কান্না চাপবার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলো।

ওপর থেকে রায় বরুয়া লক্ষ্য করলেন, কয়েকজন মাটীতে শুয়ে আছে, তাদের ঘিরে

উবু হয়ে বসেছে আরো কয়েকজন। বুঝতে বাকী রইল না, মাটীতে শোয়ানো লোকগুলি মৃতদেহ মাত্র। অন্যান্য গ্রামবাসীরা কিন্তু দুঃখে বিলাপে অভিভূত নয়। তারা দল বেঁধে আবার বাঁশের তৈরী দেওয়াল আর চালা সরিয়ে ফের ঘর বাঁধতে লেগে গেছে। অদ্ভুত এই সীমান্তপ্রদেশী উপজাতিরা। বনানীর সন্তান এরা। বনের নিষ্ঠুর ও কঠোর নির্দয়তায় এরা জীবনসংগ্রামে উৎসাহ বা ধৈর্য হারায় না। রাজা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে এদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগলেন। সমবেদনায় তাঁর চোখেও জল। সমগ্র ক্ষুদ্র রাজ্যটি যেন তাঁর স্বীয় পরিবার। ওদের দিকে নেমে সবার জন্যে একবার পা বাড়ালেন। তারপর যেন নিজের মনেই বললেন, "না, এখন গেলে ওদের সাহায্য করতেই দিন কেটে যাবে। দুশ্‌মন্‌টাকে আগে মারা চাই। না হলে সে আবার একখানা গ্রাম আক্রমণ করবে। জানোয়ারটার আজ খুন চেপেছে।"

পথপ্রদর্শকের পিছু পিছু ওঁরা মকাই-ক্ষেতের দিকে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চললেন। চললেন যতটা সম্ভব পাহাড়ের গা বেয়ে। একেবারে উপত্যকায় নেমে ক্ষেতে যাওয়া বুদ্ধির কাজ হবে না। খোলা জায়গায় যদি দুশ্‌মন্‌টা আক্রমণ করে তা হলে পালাবার উপায় নেই। সেখানে একটা বড় গাছও নেই যার ওপর উঠে পড়া যাবে। ছোট গাছে উঠলে রক্ষা নেই। দুশ্‌মন্ গাছ ও মানুষকে পায়ের চাপে পিষে ফেলবে।

ওঁরা মকাই ক্ষেতের ওপরে এসে দাঁড়ালেন। ক্ষেতের সব মকাই উপড়ে বা মাড়িয়ে দুশমন্ বর্‌বাদ্ করে দিয়ে আবার কোথায় উধাও হয়েছে। কিন্তু কোথায়? আবার হাহাকার-ধ্বনি না উঠলে বোঝা যাবে না সে কোন্ দিকে গেছে।

পথপ্রদর্শক নিবিষ্ট মনে, স্থিরদৃষ্টিতে চারিপাশের পাহাড়গুলোকে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। বেশীর ভাগ পাহাড়ই কচ্ছপের পিঠের মত খাড়াই। হাতীর গতর নিয়ে ওপরে ওঠা অসম্ভব। তবে কি দুশ্‌মন্‌টা নদীর ধার দিয়ে উপত্যকা ধরে যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ দিয়েই চলে গেছে? ক্ষ্যাপা দুশ্‌মন্ যখন আপন খেয়ালে ঘুরতে থাকে তখন সে সাধারণতঃ পেছন ফেরে না। এলোমেলো ভাবে এগিয়ে যাওয়াই তার রীতি। পথ-প্রদর্শক তাই ক্ষেতের ওদিক্‌টার পাহাড়টাকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করতে লাগলো চোখের ওপর কপালে হাতের ছাউনি রচনা করে। কিছুক্ষণ পরে সে বললে পাওয়া গেছে হদিস। পাহাড়ের অপেক্ষাকৃত সুগম গায়ের একদিক্‌টায় কয়েকটা গাছ ভেঙে হেলে পড়েছে। তার ওপরদিকের আগাছাগুলো যেন মাড়ানো। দূর থেকে ঠিক নজরে আসে না। তবু যেন মনে হয়, কী একটা প্রকাণ্ড ভারী জিনিষ তাদের ওপর দিয়ে চলে গেছে। হ্যাঁ, তাই তো! আর সন্দেহ নেই।

শিকারীর দল ক্ষেত পার হয়ে কাছে এসে স্পষ্ট দেখতে পেলে হাতীর পায়ের চাপে সব আগাছাগুলো মাটির সঙ্গে চেপ্টে গেছে। ওদিক্ দিয়ে পাহাড়ে ওঠা বিবেচনার কাজ হবে না। কারণ মানুষ দেখলে দুশ্‌মন্ ওপর থেকে ছুটে আসতে কণামাত্র দ্বিধা করবে না। তাই তারা পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। জোঁক? হ্যাঁ, জোঁক

আছে বৈকি! তবে জোঁকের শ্রীমুখে দেবার জন্যে সঙ্গে নূনও আনা হয়েছে। তামাক পাতাও।

পাহাড়ের ওপরে উঠে এসে রাজা ও রায় বরুয়া গজবরের পদচিহ্ন অন্বেষণে রত হলেন। কিন্তু মুস্কিল এই যে এদিকটার চারিদিকে পাথর। যেখানে যেখানে মাটীর অবসর সেখানে বড় বড় গাছ খাড়া হয়ে উঠে গেছে। আগাছা বা ঘাস যেটুকু জন্মেছে তা ঠিক গাছেরই তলায়। হাতীর পথে পড়ে না। পাথরগুলোও এমন শক্ত হয়ে মাটীর মধ্যে বসানো যে তার একটুও কোথাও খসে নি বা নড়ে নি। মনে হয় যেন সৃষ্টির আদি হতে এখানে কোনো জীব পদার্পণ করে নি।

সকাল তখন দুপুরের দিকে গড়িয়ে গেছে। একটু বিশ্রাম করা প্রয়োজন। সারাদিন হয়তো ক্ষ্যাপার সন্ধানে ফিরতে হবে। রাজা প্রস্তাব করলেন, কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার। সঙ্গে আনা হয়েছে শুকনো হরিণের মাংস, ধোঁয়ায় ঝলসানো। আর আছে পান্তা ভাত। এবং নাগাদের পানীয় "জ্‌"। ধেনো মদ জাতীয় পেয়। বড় বড় বাঁশের চোঙ্গায় শ্রান্তিদূরের প্রতিশ্রুতিতে টল টল করছে। রাজা আহার্য ও পানীয় সকলকে সমান ভাবে ভাগ করে দিয়ে খেতে বসলেন। অতিথি রায় বরুয়ার সৎকার অবশ্য পংক্তির বরাদ্দ হতে অন্য। অতিথি-সৎকার নাগাদের কাছে ধর্মের অঙ্গ। নকটেরা অবশ্য সাধারণতঃ বৈষ্ণব, কিন্তু আহার্য ও পানীয়তে তাদের আচার পরম বৈষ্ণবোচিত নয়। ধর্ম ও আচারকে এরা পৃথক্ রেখেছে।

রায় বরুয়ার ক্ষুধায় তখন তীক্ষ্ণধার। তিনি চক্ষের নিমেষে আপন অংশ সমাপ্ত করে রুমালে মুখ মুছছেন, এমন সময়ে—বিস্ফারিত নেত্রে আবিষ্কার করলেন, তাঁর খাদ্যের ও পানের পাত্র পুনরায় পূর্ণ হয়েছে। তাঁর জানা ছিল না, নাগাদের রীতিতে অতিথির পাত্র কখনো একেবারে খালি রাখতে নেই। সে রীতি তিনি বার তিনেক পাত্র শূন্য করার পর তবে উপলব্ধি করলেন। তখন তিনি রাজার উপরোধে প্রচুর আহার্য ও "জ্‌" উদরসাৎ করেছেন। শিলং হলে সে অবস্থায় তিনি বৈঠকখানায় সোফাস্থ হয়ে ঘণ্টা দুই-তিন দিবানিদ্রা দিয়ে নিতেন। কিন্তু শিকারে এসে ঐ আরামের কথা তুললে হাস্যাস্পদ্ হবেন বলে একটা উপায় চিন্তা করতে লাগলেন।

বুদ্ধির গোড়ায় "জ্‌" দিলে তা যে বাড়ে না, বরং অলসভাবে নেতিয়ে পড়ে তা বলাই বাহুল্য। তবু রায় বরুয়া তাঁর নিদ্রালু মন নিয়ে চিন্তা করতে করতে এক উপায় বের করলেন। যথা সম্ভব আত্মসংযম ঠিক রেখে বললেন, শিকারীরা বরাবর একসঙ্গে থাকলে দুশ্‌মন্‌টি হয়তো আওয়াজ পেয়ে দূরে চলে যাবে। সুতরাং দলটাকে ভেঙে কয়েকটা ছোট ছোট পাত্রোলে পরিণত করা হোক্। সবার কাছেই যখন বন্দুক আছে তখন দুশ্‌মনের সাক্ষাৎ পেলে গাছে উঠে পড়ে গুলি চালালে তাকে ঘায়েল করা যাবে। তবে দু'জন করে এক সঙ্গে থাকাই ভালো। তিনি অবশ্য একাই থাকতে চান। এবং এখানেই। দুশ্‌মন্ যদি আসে তো তাঁর 465-ই যথেষ্ট।

অতিথির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা নাগাদের রেওয়াজ নয়। সুতরাং দু'-একবার আমতা আমতা করে রাজা রায় বরুয়ার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে আপন দলবল নিয়ে চলে গেলেন।

ঠিক হলো সন্ধ্যার দিকে সবাই এসে মিলবেন পাহাড়ের তলায় ভাঙা গাঁ-খানিতে। দুশ্‌মন্‌কে মারা না গেলেও গ্রামবাসীদের সান্ত্বনা দেওয়া রাজার কর্তব্য।

রায় বরুয়া কেন যে এ প্রস্তাব করলেন তা নিজেই জানেন না। হয়তো তা তাঁর ভাগ্যদেবীর নির্দেশ। কিংবা হয়তো তখন তিনি এতই নিদ্রাতুর হয়ে পড়েছিলেন যে নিদ্রার দাবীর কাছে মৃত্যুর সম্ভাবনাও তুচ্ছ মনে হয়েছিল। ওঁরা চলে গেলে রায় বরুয়া একটা গাছের তলায় কিছু নূন ছড়িয়ে, 465-কে পাশে রেখে বর্ষাতি মুড়ি দিয়ে সাষ্টাঙ্গে ভূ-শায়িত হলেন।

গাছের ওপর কয়েকটা বুনো পাখী মধুর আলাপ ও সঙ্গীতে তাঁর তন্দ্রার আগমনী গাইতে লাগলো। দু'-একবার চোখ মেলে রায় বরুয়া দেখলেন, দ্বিপ্রহরের পীতাভ রৌদ্রে গোলাপীর আমেজ লেগেছে। তন্দ্রালুভাবে বিচার করে তাঁর গভীর বিশ্বাস জন্মালো এদিকে দুশ্‌মনের আগমন অসম্ভব না হলেও সুদূরপরাহত। তাঁর শিকারীর জীবনে ওটুকু ঝুঁকি তিনি বহুবার নিয়েছেন। তা ছাড়া ঝাঁ করে এক ঝাঁক ঘুমিয়ে নিলে তাঁর মনটা আবার সচল, কর্মনিষ্ঠ হয়ে উঠবে। আর এই গোলাপী রোদ্দুরে হাতী শিকার? ক্ষেপেসো? এ রোদ্দুরে পরীরা মণিপুরী নাচ দেখাতে আসতে পারে…আর দুশ্‌মন্ হাতী…এ রঙের সঙ্গে তার মেটে, গেঁয়ো রং একবারেই খাপ খায় না। প্রকৃতির কমন্ সেন্স্ থাকুক না থাকুক, সৌন্দর্যবোধ আছে। ঐ দেখ না পেরজাপতিগুলো রং-বেরঙের সূক্ষ্ম, ক্ষীণ আল্‌তো-আলতো পাখা মেলে কেমন গোলাপী আলোয় সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছে…তাদের পক্ষস্পন্দনে কী মধুর তন্দ্রার হাতছানি…বাই—বাই…টা—টা…

চোখ মেলে রায় বরুয়া দেখলেন রোদ্দুরের রঙ আবার হল্‌দে হয়ে উঠেছে। নেই রঙিন পেরজাপতি, নেই সুকণ্ঠ বুনো পাখী। ঘড়ি দেখে বুঝলেন ঘণ্টা দুই কে যেন বেমালুম সরিয়ে ফেলেছে। আর…আর গজ ত্রিশেক দূরে কয়েকটা গাছের পেছনে কে যেন একটা মাটীর দেওয়াল তুলে দিয়েছে। আস্তে আস্তে উঠে বসে, চোখ রগ্‌ড়ে উপলব্ধি করলেন তিনি স্বপ্ন দেখছেন না। মাটীর দেওয়ালটার চারটে থাম, একদিক্‌টা উঁচু ঢিপি করা, তা থেকে লম্বা একটা নল একটা গাছের ওপরে উঠে গেছে। দেওয়ালটা অচল বটে, কিন্তু ঢিপির কাছে যেন দুটো মাটী ও গোবর লেপা কুলো থেকে থেকে মাছি তাড়াচ্ছে, আর নলটার আগা একটা পাতাওয়ালা ডাল ভেঙে নেমে এসে ঢিপির ভেতর পূরে দিয়ে আবার ওপরে উঠে গেলো। মনে মনে সকল লক্ষণ মিলিয়ে রায় বরুয়া যে সমাধানে উপনীত হলেন তার রূপযুক্ত অস্তিত্ব হচ্ছে…দুশ্‌মন্।

এই সেই দুশ্‌মন্। গাছের আড়ালে রায় বরুয়াকে দেখতে পায় নি। দুশ্‌মন্ সন্দেহ নেই। কিন্তু সে একেবারে শান্তশিষ্ট, যেন চিড়িয়াখানার পোষা হাতী। একটু খেয়ে নিয়ে সে যেন একটু পরেই স্থির হয়ে দাঁড়াবে হাওদা পরবার জন্যে, তারপর ছেলেমেয়েদের পিঠে করে বেড়িয়ে আনবে। পরম নিশ্চিন্তা ও আলস্যে সে একটি একটি করে পাতাশুদ্ধ কচি ডাল ভেঙ্গে মুখে পূরে খেয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে একটু দুলছে, গুড়-তেঁতুল বা বেঙ্গল

চাটনী জিভে দিলে যেমন একটু স্বাদপরিতৃপ্তির দোলানী আসে। এই কি সেই দুশ্‌মন্‌ যে কয়েক ঘণ্টা আগে ধ্বংস-লীলায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল? ওর দিকে তাকিয়ে রায় বরুয়ার সে কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হলো না।

প্রকৃতির কোলে এ যেন নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক একটি শিশু। যেন জগদম্বার কোলে গণপতি। এরই সংহারের জন্যে যে আজিকার অভিযান তা স্মরণ করে রায় বরুয়ার মনে কেমন যেন মায়া হলো। রায় বরুয়া শিকারীর অভিজ্ঞতা নিয়ে বিচার করতে বসলেন। বুনো জানোয়ার খাদ্য শিকার ব্যতীত তো নিরর্থক ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে না! অথচ এই দুশ্‌মন অমন ক্ষেপে ওঠে কেন? হয়তো শ্যামল অরণ্যানীকে ঘেয়ো বস্তীতে পরিণত করার জন্যে মানুষের ওপর এ প্রকৃতির প্রতিশোধ, হয়তো বনদেবীর রাজত্বে মানুষের অধিকার বিস্তার করার বিরুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ প্রতিবাদ। দুশ্‌মন্‌ মানুষ ও জনপদের শত্রু। মানুষ ও তার কীর্তিকে সে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। এই তার ক্ষ্যাপামি।

দার্শনিক রায় বরুয়া স্থির করলেন, দুশ্‌মন্‌কে তিনি মারবেন না। শিকারী রায় বরুয়া তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলেন। এ কী কাপুরুষতা? কুতস্তে কশ্মলমিদম্? মাথাটা ঠিক করে নাও হে! ভণ্ডামি রাখো। ওকে তুমি মারবে কি ও তোমার মুণ্ডু নিয়ে ফুটবল্ খেলবে তার কোনো স্থিরতা নেই। যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, সেখান থেকে ওর ঠিক কানের নীচে চমৎকার টিপ করা যায়। নাও, বুজরুকী রাখো। তাগ করো আস্তে আস্তে। এখন ও অন্যমনস্ক, ওকে ঘায়েল করবার এ তোমার একমাত্র অবসর। ওর অত্যাচার থেকে অনেক গ্রাম ও মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারবে। তা ছাড়া রাজা না তোমায় কাল শ্লেষ করেছিলেন? তার উত্তর দেবার এই তো সুবর্ণসুযোগ! আর ঐ চমৎকার-দাঁতজোড়া। অমন দাঁত পাবে কোথায়? ও দিয়ে, চাও তো, গোটা একটা সিংহাসন বানানো যেতে পারে। ধরো বন্দুক, তাগ করো ঠিক করে। এক, দুই, তিন……

বনের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে গুলি ছুটলো। রায় বরুয়ার লক্ষ্যে ভুল হয়েছিল। গুলি কানের নীচে লাগলো না, লাগলো কাঁধের আর পেটের মাঝখানে। ফিন্‌কী দিয়ে রক্ত ছুটলো। তোড়ে খুলে দেওয়া কলের জলের মত! রায় বরুয়া এবার আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। দুশ্‌মন্‌টা নিশ্চয়ই গাছ ভাঙতে ভাঙতে তাঁর দিকে ছুটে আসবে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে রায় বরুয়া দেখলেন, দুশ্‌মন্‌ হতবুদ্ধির মত খানিকটা চারিদিকে তাকিয়ে শুঁড় তুলে আর্তনাদ করতে করতে পা টিপে টিপে পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে লাগলো উপত্যকার দিকে। হয়তো তার সন্দেহ হয়েছে, গ্রাম থেকে মানুষ এসেছে তাকে মারতে, তাই এবার ফিরে গিয়ে সব ক'টা মানুষকে খুন করতে হবে।

এ ভয়ঙ্কর কল্পনা। জীবন্ত অবস্থায় নীচে নেমে পড়তে পারলে দুশ্‌মন্‌ গ্রামবাসীদের একজনকেও রেহাই দেবে না। অথচ রায় বরুয়াকে যদি দেখতে পায় তা হলে তাঁর আর চিহ্ন থাকবে না। তবুও গ্রামখানাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতেই হবে, নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও। শিকারী রায় বরুয়া দৌড়ে গিয়ে পাহাড়ের ঢালুর এক পাশ থেকে আবার গুলি

করলেন। এবার গুলি লাগলো পেটে। আবার ফোয়ারার মত রক্ত ছুটলো। দুশ্‌মন্‌ কিন্তু ফিরেও তাকালো না, সটান নামতে লাগলো উপত্যকা লক্ষ্য করে। রায় বরুয়া বারম্বার—আরো কয়েকবার গুলি ছুঁড়লেন। দুশ্‌মনের শরীরের নানা অংশ ভেদ করে গুলিগুলো রক্তের ফোয়ারা ছোটালো। সে কিন্তু থামলো না। উপত্যকায় নেমে এসে মকাই-ক্ষেত ভেঙে সে সটান চললো। দৌড়ে নয়, সম্ভ্রান্ত গজেন্দ্রগমনে। কী তার লক্ষ্য কে জানে!

রায় বরুয়া চললেন পিছু পিছু, মরিয়া হয়ে। দুশ্‌মন্‌ যদি গ্রামের দিকে যায় তো তিনি বারংবার গুলি করবেন। সে যদি ফিরে দাঁড়িয়ে তাঁকে পিষে ফেলে তবু তিনি অন্তিম নিঃশ্বাসের সঙ্গে শেষ গুলি ছুঁড়বেন। দুশ্‌মন্‌ কিন্তু চললো একেবারে সোজা নদীর দিকে। রায় বরুয়া ভাবলেন, ও যদি নদী পার হয়ে বনে পালিয়ে যায় তা হলে ওকে রেহাই দেবেন। প্রতিবার গুলি ছোঁড়বার সঙ্গে তাঁর প্রাণ হাহাকার করে উঠছিল। তিনি যেন এক নিরীহ জীবকে উন্মত্তের মত খুন করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। দুশ্‌মন্‌ নদীর কাছে এসে পড়েছে। তার পা টলছে, তার বিরাট দেহ ছিন্নকাণ্ড বনস্পতির মত দুলছে। রক্তের ধারায় নদীর জল লাল হয়ে উঠলো। দুশ্‌মন্‌ পা টিপে টিপে নদীর জলের গভীরতা পরীক্ষা করছে। সব চেয়ে গভীর জায়গায় পোঁছে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। জল তার পেট পর্যন্তও পোঁছয় না। দুশ্‌মন্‌ এবার কাৎ হয়ে এক পাশে শুয়ে পড়ে জলের মধ্যে ডুবে যেতে চেষ্টা করলে। মাথাটা ডুবলো, কিন্তু পেট জলের ওপর চাঁই পাথরের মত জেগে রইলো। পরক্ষণেই জলের ভেতর থেকে একটা রক্তাভ ফোয়ারা উঠে জানিয়ে দিলে দুশ্‌মন্‌ তার পূর্বপুরুষের রীতি অনুসারে জলসমাধি গ্রহণ করেছে। মানুষ যেন তার হদিস্‌ না পায়।

আজও মনে পড়ে

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

* সত্যেন বাবু *

স্কুল-জীবনে 'বাঘের মতো ভয়' যদি কাউকে করে থাকি তো কর্‌তাম সত্যেন বাবুকে। তিনি আমাদের ইংরাজি পড়াতেন।

অত্যন্ত রাশভারি মানুষ। কেউ কেউ বলতেন তিনি রাসভারি অর্থাৎ রাসভের

অরি, মানে গাধার শত্রু। ছাত্রদের মধ্যে বুদ্ধিতে যারা গাধার সমতুল্য, তাদের মাঝে মাঝে সত্যেন বাবুর হাতে যে অবস্থা হ'ত তাতে মনে হ'ত 'রাসভরি' উপাধিটা তাঁর পক্ষে বেমানান নয়।

স্কুলের সব চেয়ে উঁচু ক্লাসের ছাত্রেরাও তাঁর কড়া শাসনের হাত থেকে রেহাই পেতো না। কয়েকজন ছাত্র বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, এ দৃশ্য তাঁর ক্লাসে প্রায়ই দেখা যেত। মুখে মুখে এ নিয়ে একটা প্রবাদ তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যে, যে দিন তিনি কোনো কারণে বা অজুহাতে কাউকে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করাতে না পারেন সেদিন রাত্তিরে তাঁর ঘুম হয় না, সারারাত তিনি বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কাটান।

বলিষ্ঠ গড়ন; শরীর পুরু আর চওড়া, কিন্তু লম্বা নয়। চুল ছোট করে ছাঁটা, গাল ভরা ছোট ছোট দাড়ি। গম্ভীর মুখমণ্ডল। পায়ে চটি, বিদ্যাসাগরী।

শিক্ষকরাও যাদের মনে মনে একটু ভয় করতেন এ ধরণের কয়েকজন বেপরোয়া ডানপিটে ছাত্রও ছিল আমাদের স্কুলে, কিন্তু সত্যেন বাবুর কাছে তারাও ঠাণ্ডা। তাদেরও তিনি মাঝে মাঝে বেঞ্চির ওপর দাঁড় তো করিয়েছেনই, বহুবার কান মলে লালও করে দিয়েছেন। মনে মনে খুশী না হলেও তারা সে শাস্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নি।

অত্যন্ত নির্মম, কাঠখোট্টা, রুটীন-পূজারী মানুষ বলে মনে হ'ত সত্যেন বাবুকে। কোনো কারণে, কোনো অজুহাতেই ক্ষমা নেই ক্লাসে পড়া না পারলে, ক্লাসের শৃঙ্খলার এতটুকু ব্যাঘাত ঘটালে, অথবা বাড়ীর কাজ (যাকে আমরা বল্‌তাম 'হোম টাস্‌ক্') করে না আনলে। রামশঙ্কর একদিন 'হোম টাস্‌ক' পূরো করে আন্‌তে পারে নি। সত্যেন বাবু ক্রুদ্ধ হয়ে কৈফিয়ৎ চাইলেন। রামশঙ্কর বল্‌লে বাড়ীতে একজন রোগীকে প্রায় সারারাত আগ্‌লাতে হয়েছে, তাই লিখে আনতে পারা যায় নি। সত্যেন বাবু বিশ্বাস করলেন বোঝা গেল; কিন্তু তবু শাস্তি থেকে পূরো রেহাই দিলেন না, বল্‌লেন, "দাঁড়িয়ে থাকো।" সে পিরিঅডটা দাঁড়িয়েই ক্লাস করতে হ'ল রামশঙ্করকে—অবশ্য বেঞ্চির ওপর দাঁড়াতে হয় নি। রুটীন মাফিক কাজ না করলে শাস্তি পেতেই হবে এম্নি কঠোর তাঁর বিচার। একেই বোধ হয় কবির ভাষায় বলে:

"অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান।"

বহুবার মনে মনে তাঁর ওপর চটেছি—ভদ্রলোক যুক্তি-না-মানা বেদরদী বে-আক্কেল মানুষ বলে। কল্পনায় বিদ্রোহ করেছি, কিন্তু বাস্তবে সাহস পাই নি। ওঁর ক্লাসের পড়া মরিয়া হয়ে তৈরি কর্‌তাম, ওঁর দেওয়া হোম টাস্‌ক্ কখনো অসম্পূর্ণ রাখ্‌তাম না।

প্রত্যেকটী লম্বা ছুটির (যেমন পূজোর ছুটী আর গ্রীষ্মের ছুটী) আগে তিনি হোম টাস্‌কের লম্বা ফর্দ্দ ক্লাসে লিখিয়ে দিতেন—অনুবাদ, প্রবন্ধ রচনা, ভাব সম্প্রসারণ,

কবিতার ব্যাখ্যা, গল্পের সংক্ষিপ্তসার ইত্যাদি; সব কিছু ছুটীর ভেতরে লিখে শেষ করে স্কুল খুলবার দিন পূরো খাতা তাঁর কাছে দিতে হ'ত। তখন প্রত্যেকটি খাতা তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখ্‌তেন আর ভুলগুলো শুধ্‌রে দিতেন। খাতা ফেরৎ দেবার সময় প্রত্যেককে হুঁশিয়ার করে দিতেন—যে ভুলগুলো তিনি শুধ্‌রে দিয়েছেন সে ভুল যদি আবার কারও হয় তাহ'লে তিনি ক্ষমা করবেন না, চাব্‌কে পিঠের চামড়া তুলে নেবেন। ও কাজটা যে তাঁর মতো রাশ্‌ভারি, কাঠখোট্টা আর একগুঁয়ে মানুষের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয় এ বিশ্বাস আমাদের প্রত্যেকেরি ছিল। তাই আমরা যে যার খাতায় তাঁর শুদ্ধীকরণগুলো খুঁটিয়ে দেখ্‌তাম বার বার—বহুবার, আর মনে গেঁথে নেবার চেষ্টা কর্‌তাম, যেন সত্যেন বাবুর চাবুকের পাল্লায় পড়ে পিঠের চাম্‌ড়া খোয়াতে না হয়।

প্রত্যেকের খাতা ধরে ধরে তিনি যে পরীক্ষা করেন নি তাঁর শুধ্‌রে দেওয়া ভুলগুলোই আবার কারও হয় কিনা, তার কারণ বোধ করি এখন আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। আমার মনে হয় তাঁর ভয় ছিল পরীক্ষা করতে গেলেই কারো না কারো ভুল ধরা পড়্‌বে, আর তখন হয় তাঁকে চাব্‌কে তাদের পিঠের চাম্‌ড়া তুল্‌তে হবে, অথবা কথার খেলাপ করতে হবে। তখন কিন্তু সবাই ওঁর চাবুকের ভয়ে মরিয়া হয়ে চেষ্টা কর্‌তাম যেন ঐ ভুলগুলো ভুলক্রমে আবার না করে ফেলি।

আশ্চর্য্য, ইনিই আমাদের ইংরাজি কবিতাও পড়াতেন। পড়াবার সময় ভাবের চাইতে ভাষার দিকেই তিনি বেশী জোর দিতেন, আর ভাষার সঙ্গে ব্যাকরণের। কবি একঝাঁক সোনালী রঙের ফুল হাওয়ায় দুল্‌তে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, বেশ করেছেন; ও নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যে কথা তিনি পদ্যে বলেছেন তাকে সরল গদ্যে পরিণত করো, যাকে বলে 'প্রোজ অর্ডার' করা। কবিতাটির সারাংশ লেখ। বাক্যগুলো বিশ্লেষণ করো। এই ভাবে আগে ভিৎ পাকা করো, শক্ত করো; কাব্য করবার সময় আর সুযোগ পরে অনেক পাবে। অনেকটা এম্নি ভাব নিয়েই তিনি কবিতা পড়াতেন।

একবার ছুটীর দিনে লক্ষ্যহীন ভাবে বেড়াতে বেড়াতে তাঁর বাড়ীর ধারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। তখন বিকেলবেলা। পথের ধারে মেহেদির বেড়া,' তার ওপাশে ছোট্ট বাগান, তার পরেই তাঁর বাড়ী। তিনি তখন বাগানের ওদিক্‌টায় খুর্‌পি দিয়ে মাটী খুঁড়্‌ছিলেন, আর সেই সঙ্গে গুণগুণিয়ে গাইছিলেন: "আমায় দে মা তবিলদারী, আমি নেমকহারাম নই শংকরী।" গানখানা রামপ্রসাদী, কিন্তু উনি যে ভাবে গাইছিলেন তাতে রামপ্রসাদ ঐ সুরকে তাঁর নিজের তৈরি বলে চিন্‌তে পারতেন বলে মনে হয় না।

বাগান, আর রামপ্রসাদী গান। সত্যেন বাবুকে এ এক অভাবনীয় নতুন রূপে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। মনে হলো তিনি যেন আর স্কুলের শিক্ষক নেই, কোনো মন্ত্রবলে একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে গেছেন।

পাছে তাঁর চোখে ধরা পড়ে যাই সেই ভয়ে সেখান থেকে পালালাম। পর দিন স্কুলে গেলাম। যথা সময়ে সত্যেন বাবু ক্লাসে এলেন। আমার মনের চোখে তখনো লেগে আছে তাঁর সেই গত কালের রূপের ঘোর, কানের পাশে গুঞ্জন করছে তাঁর বেসুরো "আমায় দে মা তবিলদারি।" কতক্ষণ আন্‌মনা হয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ প্রচণ্ড হুঙ্কারে জ্ঞান হলো। দেখ্‌লাম প্রাণহরির দিকে তর্জনী হেলিয়ে সত্যেন বাবু ভীম গর্জনে বল্‌ছেন, "স্ট্যাণ্ড্ আপ্ অন্ দি বেঞ্চ। দাঁড়াও, উঠে দাঁড়াও বেঞ্চির ওপর।"

২০

প্রতিদিন সকালে নদীতে স্নান করে দিলীপের সাত গণ্ডূষ জলপান এবং পূজা দেওয়ার ব্যাপারে গ্রামের কয়েকজনের যথেষ্ট কৌতূহল হয়েছিল কিন্তু দেশ যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, পল্লী অঞ্চলের লোকের এখনও ঠাকুর-দেবতার নামে অলৌকিক বা দৈব ঘটনার উপর বিশ্বাস আগেকার মতই আছে।

আমাদের এই ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করে গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তার মধ্যে একজন ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ, নাম জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী।

নীলাম্বর ঘটকের বর্ণিত ডাকাত দলের চীৎকার করে আক্রমণের কাহিনী, পাঁচুর মার বর্ণিত নিশু ঘোষালের আর্ত্তনাদ এবং ডক্টর রামশাস্ত্রীর অনুমান যে দেবমূর্ত্তির চোখের নীলা নেবার জন্য যারা আসবে তারা চুপি চুপি আসবে, চীৎকার করে আসবার সম্ভাবনা অবান্তর—এই তিনটে যুক্তি আমার মনের মধ্যে গভীর রেখাপাত করেছে এবং আমার কেবলই মনে হচ্ছে এর ভেতর একটা গূঢ় রহস্য আছে, আর সে রহস্যের মধ্যে নীলাম্বর ঘটক বিশেষ ভাবে জড়িত।

কাজেই ডাকাতি হওয়ার ঘটনাটার সম্বন্ধে একদিন জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তীকেই চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম, ঠাকুরের স্বপ্নাদেশ পেয়ে তাঁর শূন্য বেদীতে আমরা পূজা দিচ্ছি, কিন্তু তাতে কি মন ভরে ওঠে? শুনতে পাই ডাকাতের দল এসে মূর্ত্তি নিয়ে পালিয়েছে, কিন্তু আসল ঘটনাটা কি বলুন তো, চক্কত্তী মশাই?

চক্রবর্ত্তী বললেন, অনেক কথা মশাই! সে সব কি আর বলবার? ডাকাতের দলের ঘুম হচ্ছিল না তাই তারা পাথরের ঠাকুর লুঠ করতে এলো!

বললাম, শুনতে পাই হা রে রে রে করে ভীষণ চীৎকার করে ডাকাত দল এসেছিল?

কি জানি মশাই, কান দুটো তো এখনও সজাগ আছে। এইখানেই তো বাস করছি সারাটা জীবন। চীৎকার-টিৎকার তো শুনি নি, তবে বেচারা ঘোষালের মাথায় মেরেছিল লাঠি, এইটুকুই তো জানি! তার পর রাজাদের কাছে আমরা কতবার বলেছিলাম যে আবার নতুন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করব, কিন্তু তাঁরা বলেন যে দেবতা নিজেই যখন চলে গেলেন, তখন তাঁর জায়গায় আর একজনকে এনে আর দরকার নেই। থাকুক ওই মন্দির খালি অবস্থায়। আপনাদের এই স্বপ্নাদেশের কথা বোধ হয় তাঁরা শোনেন নি, তা হলে হয়তো তাঁদের মত বদলাতো এত দিন পরে।

অনেক কথা বলে গেলেন জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী। এইটুকু বেশ বোঝা গেল যে চীৎকার করে ডাকাতের দল আসে নি। অথচ দেবমূর্ত্তি চুরি হয়ে গিয়েছে সেই দুটি চোখের জন্য। নিশু ঘোষাল বাধা দিতে গিয়ে আহত হয়েছিলেন। সুতরাং নীলাম্বর ঘটকের বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে এই জায়গায় মস্ত একটা গরমিল।—তার প্রমাণ পেলাম পাঁচুর মা কাছে এবং এই বৃদ্ধ জনার্দ্দনের কাছে।

তার কারণ কি?

একখানা চিঠিতে রামশাস্ত্রাকে সব জানালাম।

দিন পাঁচেক পরেই তাঁর উত্তর পেলাম। আমাদের অবিলম্বে কলকাতায় আসবার জন্য লিখেছেন। আবার হয়তো বামুনগাছিতে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে,

সুতরাং হঠাৎ চলে আসবার একটা যুক্তিযুক্ত কারণ দেখিয়ে যেন আমরা আসি। ভবিষ্যতে ফিরে যাওয়ার পথ যেন বন্ধ না হয়।

নীলাম্বর ঘটককে বললাম, ঠাকুরের দয়ায় একটু উপকার বোধ হয়েছিল, শূল ব্যথাটা আগে যেমন রোজই কষ্টকর হয়ে উঠতো, ইদানীং তা আর হয় নি। হেঁচকি ওঠাও বন্ধ হয়েছে। সবই বাবার কৃপা। কিন্তু চিঠি এসেছে দিলীপের মাসিমার হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গিয়ে ডান হাতের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছে। হাসপাতাল থেকে প্লাষ্টার করে দিয়েছে। দিলীপকে তিনি দেখবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হয়েছেন, সে জন্য আপাততঃ কিছু দিনের জন্য একবার কলকাতায় যাওয়ার বিশেষ দরকার। পাঁচুর মাকেও সেই কথা বলে আমরা রওনা হলাম কলকাতায়।

ডক্টর রামশাস্ত্রী বললেন, নিশু ঘোষালের অনুসন্ধান ব্যাপারে তিনি সফল হয়েছেন। প্রায় পাঁচ-ছয় বছর আগে নিশু ঘোষালের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর ছেলে বারীন ঘোষাল পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করতেন, সম্প্রতি রিটায়ার করে দমদমের কাছে সিঁথিতে বাড়ী তৈরি করে সেখানেই বসবাস করছেন।

আমাদের তাড়াতাড়ি ডেকে আনার কারণ সম্বন্ধে তিনি বললেন যে কিছু কাল আগে একটা সভায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সে সভার সেক্রেটারী ছিলেন বারীন ঘোষাল। কাজেই তিনি ঘোষালের কাছে পরিচিত। এ অবস্থায় পরশুরাম শাস্ত্রবাচস্পতির বেশ নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হওয়া ঠিক সঙ্গত হবে না। সুতরাং বারীন ঘোষালের কাছে যতদূর জানতে পারা যায় তার চেষ্টা আমাকে এবং দিলীপকেই করতে হবে।

সুতরাং দিলীপকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলাম দমদম সিঁথিতে। আজকাল বাস্ সার্ভিসের কল্যাণে সহরতলীর কোনও জায়গায় যাওয়াই কষ্টকর নয়। শ্যামবাজারে এসে সিঁথির বাসের কথা জিজ্ঞাসা করায় এক ব্যক্তি বললেন, যে বাসের সাইন বোর্ডে 'উন্মাদ-আশ্রম' লেখা আছে, সেই বাসে উঠলেই ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে।

সে কি মশাই! উন্মাদ-আশ্রমে যাবো কি দুঃখে?

তিনি বললেন, আপনি যেখানে নেমে যাওয়ার দরকার সেইখানেই নামবেন। কিন্তু বাসের ড্রাইভার এবং কণ্ডাকটার—এদের শেষ পর্য্যন্ত উন্মাদ-আশ্রমে যেতেই হবে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর দেখা গেল সত্যই উন্মাদ-আশ্রম বোর্ড লেখা বাস্ এসে হাজির হোল। উঠে পড়লাম।

ঠিকানা মিলিয়ে বারীন ঘোষালের বাড়ী আবিষ্কার করতে বেশী অসুবিধা হোল না। বেঁটেসেটে গোলগাল চেহারা, মুখে দাড়ি এক ভদ্রলোক এসে জানালেন তাঁরই নাম বারীন।

আমাদের আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করায় সোজাসুজি তাঁকে বললাম যে বামুনগাছির মন্দিরের বিষ্ণুমূর্ত্তির ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করতেই আমাদের এই অভিযান। কোথা থেকে কি সূত্রে ঐ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ওই মন্দিরে, তার পর সে মূর্ত্তির পরিণতি কি হোল?

কিন্তু বারীন বাবু একটু ইতস্ততঃ করছেন সেটা বোঝা গেল। দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে তিনি বললেন, কিন্তু সে সব কথা শুনে আপনাদের কি লাভ হবে? আপনাদের পরিচয় তো ভাল করে জানতে পারলাম না, কাজেই বামুনগাছির মন্দির এবং তার মূর্ত্তি সম্বন্ধে আপনাদের কৌতূহল কেন এবং ঐতিহাসিক তথ্য জানবার জন্যই বা আপনারা এত ব্যাকুল কেন সেটা তো বুঝতে পাচ্ছি না মশাই!

রামশাস্ত্রীর কথা মনে হোল। কি একটা সভায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে সেক্রেটারী ছিলেন বারীন ঘোষাল, এবং সেই জন্যই রামশাস্ত্রী নিজে আসেন নি এ কথাটাও মনে হতে দেরী হোল না। সুতরাং তাঁর নামটা এইবার ব্যবহার করে দেখা যাক না!

বললাম, আপনি ডক্টর রামশাস্ত্রীকে জানেন কি? তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত লোক।

বারীন বাবু বললেন, জানি বৈ কি! তবে ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। আমাদের ক্লাবের বার্ষিক উৎসবে সেবার তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন, সেই সূত্রে তাঁর কাছে যেতে হয়েছিল। তাকে ঠিক পরিচয় বলা যায় না।

বললাম, সেই রামশাস্ত্রীই আমাদের পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। তিনি বহু প্রাচীন এক বিষ্ণুমূর্ত্তি নিয়ে গবেষণা করছেন। মূর্ত্তিটি প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরোনো, অর্থাৎ মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সময়ের। তার পর সেই মূর্ত্তি কোথায় কি সূত্রে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় সে সম্বন্ধেও তিনি অনেক গবেষণা করেছেন। শেষে জানতে পেরেছেন যে সেই মূর্ত্তিই কোনও সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বামুনগাছিতে। মূর্ত্তির চোখে ছিল দু'টি নীলা, সম্ভবতঃ তারই জন্য লুট হয়ে যায় সেই মূর্ত্তি, আপনার বাবা বাধা দিতে গিয়ে আঘাত পান এ সব খবর আমরা জেনেছি। কিন্তু যেটুকু জানি না সেইটুকুই আপনার কাছে জানতে চাই।

বারীন বাবুর চোখ দু'টি বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। (ক্রমশঃ)

পাঁচটি যমজ ছেলে

শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

পাঁচ ভাই তারা। পাঁচ জনই ঠিক এক রকম দেখতে। আশ্চর্য মিল তাদের কথায়, চেহারায়।

সংসারে তাদের আপনার বলতে মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। বাবা, কাকা, মামা, পিসে—কেউ না। থাকত তারা সমুদ্রের ধারে ছোট্ট এক গাঁয়ে।

পাঁচটি ভায়ের কিন্তু পাঁচটি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল।

প্রথম ভাই এক চুমুকে সমুদ্রের সমস্ত জল খেয়ে ফেলতে পারত।

দ্বিতীয় ভায়ের ঘাড়টা ছিল যেন ইস্পাতের মত কঠিন।

তৃতীয় ভাই পা দুটোকে ইচ্ছামত বাড়াতে পারত,—দূর-দূর-বহু দূর—যত দূর ইচ্ছা যায়।

চতুর্থ ভাইকে আগুনে কিছু করতে পারত না।

আর পঞ্চম ভাই যতক্ষণ ইচ্ছা দম বন্ধ করে থাকতে পারত। একদিন—দু' দিন—যত দিন ইচ্ছা যায়।

প্রথম ভাই প্রত্যেক দিন সকালে উঠে মাছ ধরতে যেত সমুদ্রে আর, যখন গাঁয়ে ফিরে আসত, ওর চুপড়ি ভরে থাকত সুন্দর সুন্দর রকমারি মাছে। এমন সব মাছ যাদের সচরাচর পাওয়া ত' দূরের কথা চোখেই দেখা যায় না। ঝড় হোক, জল হোক, অন্য কেউ মাছ পাক আর না পাক—ওর চুপড়ি কখনো খালি যেত না।

একদিন বাজারে মাছ বেচে যখন সে বাড়ী ফিরছিল ছোট্ট একটি ছেলে তাকে এসে ধরে বসল—সেও কাল তার সঙ্গে মাছ ধরতে যাবে সমুদ্রে।

তাও কি হয়? আপত্তি করতে লাগল সে। কিন্তু ছেলেটিও নাছোড়বান্দা। অনুনয় বিনয়—শেষ সম্বল কান্না জুড়ে দিল। তখন আর রাজী না হয়ে উপায় কি? কিন্তু একটি সর্ত করে নিল সে। সে যখন যা বলবে তক্ষুণি তা মানতে হবে। কোন প্রতিবাদ করা চলবে না।

তাতেই রাজী ছেলেটি।

পরের দিন খুব ভোরে প্রথম কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ভাই আর সেই ছেলেটি মাছ ধরতে গেল সমুদ্রে। যাবার আগে আবার সে ছেলেটিকে সর্তের কথা স্মরণ করিয়ে

দিয়ে বললে—'খবরদার, যা বলব তখুনি তা শুনতে হবে। যখনই ইঙ্গিত করব উঠে আসতে হবে সমুদ্র থেকে।'

তিন সত্যি করলে ছেলেটি।

সমুদ্রের তীরে এসে প্রথম ভাই বালিতে উবু হয়ে বসে চোঁ চোঁ করে এক নিমেষে সমস্ত জল শুষে নিলে। আর অমনি সমুদ্রের যত জীবজন্তু, মাছ কাদায় নাচানাচি—লাফালাফি সুরু করে দিল। সমুদ্রের বুকে যত ধনরত্ন আছে তাও বেরিয়ে পড়ল।

ছোট্ট ছেলেটির তো আনন্দ ধরে না! এমন দৃশ্য ও স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি। সে দু' পকেট ভর্তি করে ফেলল নানা দামী পাথরে। জলের নীচে কত বিচিত্র গাছপালা, কত রকমারি শামুক-ঝিনুক, মুক্তা-প্রবাল!

প্রথম ভাই তীরের কাছ থেকে টপাটপ কিছু মাছ ধরে চুপড়ি ভরে ফেলল। আর তাতেই বেশ হাঁপিয়ে উঠতে হোল তাকে।

কিন্তু সমুদ্রের জল আর কতক্ষণ মুখে আটকে রাখা যায়? বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। তাই সে হাত নেড়ে ছোট্ট ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসার জন্য ইঙ্গিত করলে। ছেলেটি মুখ ফিরিয়ে তাকাল বটে কিন্তু ফিরে আসবার কোন মতলব দেখা গেল না তার।

ও হাত নেড়ে নানা অঙ্গভঙ্গী করে ছেলেটিকে আসার জন্য বার বার তাগিদ দিতে লাগল। কিন্তু ছেলেটি যেন মশগুল হয়ে আছে নিজের খেয়ালে। কোন ভ্রূক্ষেপ নেই কোন দিকে।

এদিকে মুখের মধ্যে সমুদ্র আথাল-পাথাল সুরু করে দিয়েছে। ও শেষ বারের মত সাবধান করে দিল ছেলেটিকে। কিন্তু সে শুধু ওর মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে ছুটে পালিয়ে গেল।

ও যতক্ষণ পারলে সমুদ্রকে মুখে আটকে রাখলে, কিন্তু যখন বুঝলে আর দেরী করলে সমুদ্র মুখ ফেটে বেরিয়ে আসবে, ও সমুদ্রকে ছেড়ে দিলে তার ঘরে ফিরে যেতে। হুস করে সমুদ্রের জল ওর মুখ থেকে লাফিয়ে বের হয়ে চোখের পলকে নিজের জায়গায় ফিরে গেল। জলের তোড়ে ছোট্ট ছেলেটি কোথায় যে ভেসে গেল তার আর পাত্তাই মিলল না।

প্রথম ভাই একলা ফিরে এল গাঁয়ে। লোকেরা ভাবলে নিশ্চয়ই ও ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে। তাই সবাই মিলে ওকে রাজার সামনে এনে হাজির করলে।

বিচারে ওর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হোল।

আগামী কাল ঘাতকের এক আঘাতে দেহ থেকে ওর মুণ্ডু কেটে ফেলা হবে।

রাজার আদেশ শুনে প্রথম ভাই হাতজোড় করে বললে—'মহারাজ, মরবার আগে মায়ের সঙ্গে শেষ দেখা করবার অনুমতি দিন আমাকে।'

মঞ্জুর হোল ওর প্রার্থনা। প্রথম ভাই বাড়ী ফিরে এল। কিন্তু পরের দিন যে ফিরে এল সে দ্বিতীয় ভাই। কেউ চিনতে পারল না। যথা সময়ে বধ্যভূমিতে গাঁয়ের লোক ভেঙ্গে পড়ল। দ্বিতীয় ভাই মাথা হেঁট করে দাঁড়াল। আর ঘাতক মস্ত এক খাঁড়া তুলে সজোরে এক কোপ বসাল তার ঘাড়ে। খাঁড়া ভেঙ্গে দু'খান হয়ে গেল কিন্তু 'ওর গলায় একটা দাগও বসল না।

এ কি, ছেলেটি যে হাসছে ফিক ফিক করে। ছেলেটির ঘাড় যে ইস্পাতের সে কথা তো কেউ জানে না।

লোকেরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। ওকে জলে ডুবিয়ে মারা হবে।

রাজার আদেশ শুনে ছেলেটি হাতজোড় করে বললে—'আমাকে মায়ের সঙ্গে আর একবার দেখা করে আসার অনুমতি দেওয়া হোক।'

অতি তুচ্ছ এ প্রার্থনা। প্রার্থনা মঞ্জুর হোল।

দ্বিতীয় ভাই বাড়ী ফিরে গেল কিন্তু পরের দিন যে ফিরে এল সে দ্বিতীয় ভাই নয়—তৃতীয় ভাই।

একটি ডিঙ্গীতে করে তাকে মাঝসমুদ্রে নিয়ে গিয়ে টুপ করে ছেড়ে দেওয়া হোল জলে। ছেলেটি অমনি পা দুটোকে বাড়াতে লাগল। বাড়াতে বাড়াতে পা সমুদ্রের তলায় মাটি স্পর্শ করল। গাঁয়ের লোকেরা অবাক্ বিস্ময়ে দেখলে ছেলেটি মাঝ-সমুদ্রে হাসিমুখে নিঃশঙ্ক চিত্তে দাঁড়িয়ে আছে আর ওকে ঘিরে ঢেউগুলো ফেনার মুকুট প'রে খেলা করছে। ডুবিয়ে মারার চেষ্টাও ব্যর্থ হোল।

এবার ক্রোধান্ধ গাঁয়ের লোকেরা ছেলেটিকে পুড়িয়ে মারার জন্য দাবী করতে লাগল। সেই আদেশই দিলেন রাজা।

রাজ-আজ্ঞা শুনে ছেলেটি বলল হাতজোড় করে—'মহারাজ, আমাকে মায়ের সঙ্গে আর একটি বার দেখা করে আসার অনুমতি দেওয়া হোক।'

এবারও মঞ্জুর হোল প্রার্থনা।

তৃতীয় ভাই ফিরে এল ঘরে। পরের দিন তার বদলে চতুর্থ ভাই চলল রাজ-আজ্ঞা মাথা পেতে নিতে।

একটা খুঁটির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হোল ছেলেটিকে। তার পর চারিদিকে কাঠের পর কাঠ সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হোল তাতে। লাল আগুন সহস্র জিভ

লকলকিয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আর সেই আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছেলেটি বলতে লাগল—'আঃ, কী আরাম।'

এবারও ছেলেটিকে মারতে পারল না দেখে লোকের ক্রোধের আর সীমা পরিসীমা রইল না।

ঠিক হোল এবার ওকে দম আটকিয়ে মারা হবে। রাজার আজ্ঞা শুনে ছেলেটি হাতজোড় করে বললে,—'মহারাজ, আমাকে মায়ের সঙ্গে শেষ দেখা করে আসার অনুমতি দেওয়া হোক।'

'তথাস্তু।'—বললেন রাজা।

চতুর্থ ভাই বাড়ী চলে এল। পরের দিন পঞ্চম তাই গেল রাজ-আদেশ পালন করতে।

ছোট একটা ঘর তৈরী করা হোল। সেই ঘরে একটি মাত্র দরজা, আর চারিদিক্ বন্ধ। কোন ফাঁক-ফোকর দিয়ে বাতাস ভিতরে ঢোকার পথ রইল না। কিছু খাবার ভিতরে দিয়ে ছেলেটিকে সেই ঘরে পূরে চূণ-বালি-সুড়কি দিয়ে ঘরের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হোল। এমন কি ঘরে যে বাতাস ছিল সে বাতাসও বের করে নেওয়া হোল।

এবার আর বাঁচতে হবে না ছেলেটিকে। তিন দিন তিন রাত্রি কাটল। চতুর্থ দিন ঘরের মুখ খুলতেই কিন্তু ছেলেটি হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে বললে—'দিব্যি আরামে ঘুমোনো গেছে কয়েকটা দিন।'

ছেলেটিকে বেঁচে থাকতে দেখে গাঁয়ের লোকেরা ত অবাক্। এ ভোজবাজি জানে নাকি? বাতাস ছাড়া কি কেউ বেঁচে থাকতে পারে? রাজা স্বয়ং সিংহাসন ছেড়ে উঠে এসে বললেন—'তোমাকে অনেক ভাবে শাস্তি দেবার চেষ্টা করেছি আমরা কিন্তু পারি নি। তুমি নিশ্চয়ই নির্দোষ। তোমায় আমি মুক্তি দিলাম।'

রাজার বিচার শুনে গাঁয়ের লোকেরাও বললে—'ঠিক ঠিক। ছেলেটি নিশ্চয় নির্দোষ।'

মুক্তি পেয়ে হাসতে হাসতে ছেলেটি ফিরে গেল বাড়ীতে।

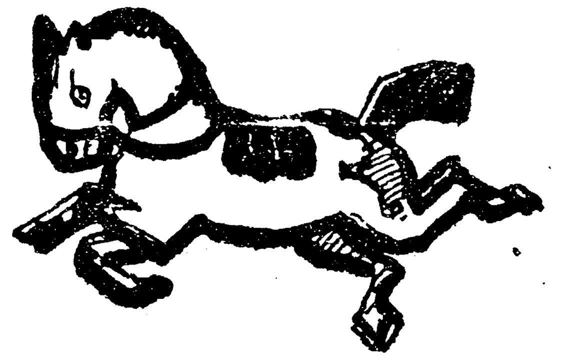

ফেরার পথে

তীর্থঙ্কর

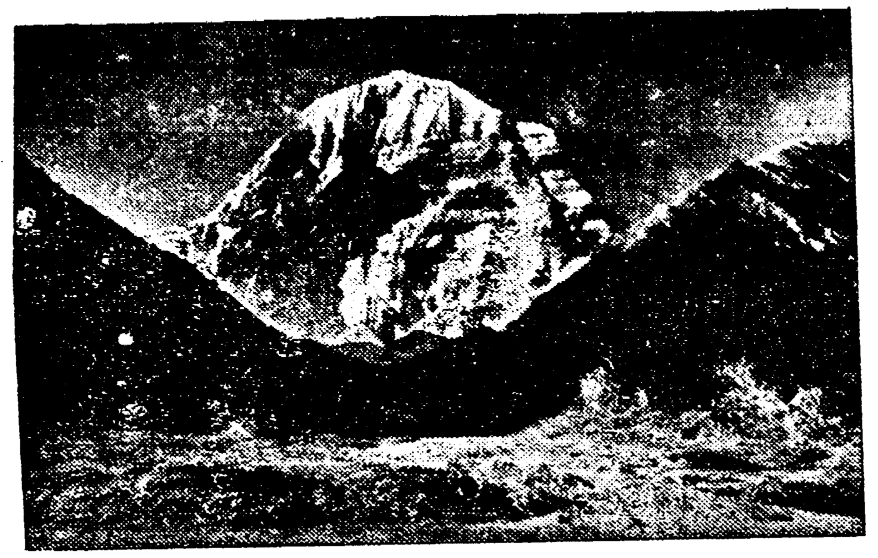

কৈলাস থেকে দেশে ফিরছি। তিব্বতের পথ শেষ করে ভারতভূমিতে পদার্পণ করেছি—সে কথাও তোমাদের আগে বলেছি। এবার আবার যাত্রা—পদব্রজে।

হঠাৎ সামনে দেখি একটা নদী। বেশী বড় নয়, জলও তেমন নেই। নদীর ওপর বড় বড় পাথর ফেলা রাস্তা, তাই ডিঙ্গিয়ে নদী পার হয়ে চলে এলাম। কিছু দূর গিয়ে আবার সামনে পড়লো আর একটা নদী। এটা বেশ বড়। নাম কালী নদী। আগের মত পাথরে পা দিয়ে দিয়ে এটা পার হওয়ার উপায় নেই। এর ওপর কাঠের সেতু আছে। সেতু তো পার হয়ে এলাম, কিন্তু তার পরেই ঘটল একটা অঘটন। আমাদের একজন সঙ্গী ঘোড়ায় চড়ে আসছিলেন, তিনি হঠাৎ তাঁর হাতের রাশ আলগা হ'তে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। আমরা দেখে খুব ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু দেখা গেল, বোধ হয় কৈলাসপতিরই দয়ায়, আঘাত তেমন গুরুতর নয়।

গাইডের মুখে শুনলাম যাবার সময় গার্বিয়াংএর পরে আমরা যে কাঠের সেতুটি পার হয়েছিলাম সেই সেতুটি জলের তোড়ে ভেঙ্গে গেছে। সুতরাং আমরা এখন যে সেতু পার হয়ে এলাম সেটা আগেরটা নয়, অন্য একটা। ফলে আমাদের গার্বিয়াংএ ফেরার রাস্তা একটু ঘোরালো হয়ে দাঁড়ালো। এই বিপাকের ফলে আমাদেরকে নেপাল রাজ্য হয়ে কয়েক মাইল ঘুরে যেতে হবে।

এবারে পথে মাঝে মাঝে নদী পড়তে লাগলো। নদীর পাশ দিয়ে দিয়ে চড়াই-উৎরাই ডিঙ্গিয়ে চলেছি ত' চলেইছি। এইভাবে অনেকটা পথ আসার পর এক জায়গায় সকলে মিলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। জায়গাটা বেশ নির্জ্জন। পাহাড়ের তলায় বড় বড় পাইন ও চীর, আর আছে কিছু ঝোপজঙ্গল। গাইডের মুখে শুনলাম এখান দিয়ে প্রাচীনকালে পাথর-বাঁধানো এক রাস্তা ছিল। সেই রাস্তা ধরে ভারত থেকে নেপাল রাজ্যে লোক চলাচল করত। কিন্তু কালী নদীর উৎপাতে সেই রাস্তা এখন জায়গায় জায়গায় ভেঙ্গে গেছে। গাইড আমাদের জলে ডোবা অংশটি পিঠে করে

পার করে দিল। এর পরও পড়লো একটি বড় কাঠের সেতু। বড় বড় পাথরের চাঁই দিয়ে এই সেতুটির ভিত্তি রক্ষিত হয়েছে।

সেতুটি পার হয়ে আমরা ওপার থেকে লক্ষ্য করলাম উচ্ছ্বসিত কালী নদীর তাণ্ডব লীলা। ভাবতে খুব ভয় হ'ল—এই এত বড় কাঠের সেতুটার অস্তিত্ব নির্ভর করছে এই উগ্রা কালী নদীর দয়ার উপরে। মনে করলেই নাকি এই রাক্ষসী নদী সেতুটিকে গ্রাস করতে পারে। যাই হোক, নদীর ধার দিয়ে পায়ে-চলার পথ ধরে আমরা চলতে লাগলাম। মাঝে মাঝে সারি সারি পাইন ও চীর গাছ পথের ধারে পড়লো। চড়াইএর রাস্তা অনেকখানি অতিক্রম করে এসে বিকাল নাগাদ আমরা গার্বিয়াংএ যে জায়গাটায় এসে পৌছলাম ঠিক সেইখানেই আমাদের গাইড কিচ্‌খাম্পার বাড়ী। অবশ দেহটাকে টানতে টানতে নিয়ে এসে আমরা তাঁর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালাম।

আবার গাইডের পিঠে চড়ে জল পার হলাম।

কিচ্‌খাম্পার মেয়েরা আমাদের পাথরের আসনে বসিয়ে চা দিয়ে আপ্যায়িত করলো। এখানে প্রচুর শীত থাকা সত্ত্বেও পথশ্রমে যে ক্লান্তি আমাদের পেয়ে বসেছিল তা দূর করতে হ'লে এখন রীতিমত বিশ্রামের প্রয়োজন এ সকলেই অনুভব করছিলাম। কিচ্‌খাম্পার বাড়ীর দোতলায় আমাদের সে দিনের রাত্রিবাস স্থির হ'ল। কোন মতে ক্লান্ত শরীর গুটিয়ে নিয়ে আমরা গিয়ে ঢুকলাম তাঁর দোতলায় এবং নিজের বাড়ীর মতই যত্ন ও ব্যবহার পেলাম। পরম আরামে এখানেই আমাদের রাত কেটে গেল।

পর দিন সকালে উঠে একটু বেড়ানো গেল। খানিকটা বেলায় আমাদের গাইড কিচ্‌খাম্পা কুলিদের নিয়ে এলেন। এবার ওদের পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে, এবং সেই সঙ্গে কিছু বখশিস্।

কুলিদের তো বিদায় দিলাম, কিন্তু তার পরেই বাধল মুশ্‌কিল। নতুন কুলি আর পাওয়া যায় না। গাইড আমাদের জন্য সারাদিন চেষ্টা করেও কুলি যোগাড় করতে পারলেন না। তার কারণ ভারত সরকারের যে নতুন রাস্তা তৈরী হচ্ছিল

সেখানেই সব কুলি কাজে লেগে গিয়েছিল। অবশেষে বহু কষ্টে সন্ধ্যার সময় একটি কুলির সর্দ্দারকে পাওয়া গেল। পাছে হাতছাড়া হয়ে যায় সে জন্য তখনই তাকে বায়না স্বরূপ কিছু টাকা দিয়ে রাখলাম।

পর দিন সকালেই কুলিরা এসে গেল। মালপত্র বেঁধে-ছেঁদে, ওজন করে, কুলির পিঠে চাপিয়ে দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সঙ্গের একদল যাত্রী ঘোড়া ইত্যাদির জন্য অপেক্ষা করে রইলেন। কিচ্‌খাম্পা আমাদের হাসিমুখেই বিদায় দিলেন। কথা রইল আবার দেখা হবে।

পথে যেতে যেতে রোদের তীব্রতা বাড়তে লাগল, ক্ষিদেও বাড়তে লাগল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু নাঃ, আশেপাশে কোথাও দোকানপাটের চিহ্ন নেই। বেলা ১১টা পর্য্যন্ত সমানে পা চালিয়ে অবশেষে একটা গ্রামে এসে থামলাম। গ্রামটির নাম বুঁদি। মনে একটু আশা হ'ল, গ্রাম যখন তখন খাবার নিশ্চয়ই মিলবে। কিন্তু, ও হরি, গ্রামের মধ্যে ঢুকে দেখি সব ফাঁকা! না আছে কোনও দোকান, না আছে কোনও খাবার। এখানে থাকে কয়েক ঘর পাহাড়ী চাষী, কিন্তু সবাই এখন যে যার খাবার সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের নীচে নেমে গেছে চাষ আবাদ করতে। কিন্তু কৈলাসপতি সহায়, হতাশ মনে এদিক ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আমরা একটা তাঁবুর সামনে এসে পড়লাম। দেখলাম তার সামনে চরছে ভেড়ার পাল। হাঁকডাক করতেই ভেড়াওয়ালা বেরিয়ে এল। তাকে আমরা বুঝিয়ে দিলাম আমরা সবাই তীর্থযাত্রী, কৈলাস ও মানস সরোবর দেখে ফিরছি। এখন আমাদের ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। সুতরাং সে যদি আমাদের কিছু খাওয়াতে পারে তবে তার ন্যায্য মূল্য দিতে আমরা রাজী আছি। দেখলাম লোকটার সঙ্গতি খুব সামান্য হলেও তার সরলতা ও উদারতা কম নয়। সে আমাদের প্রয়োজন বুঝে তখনই রাজী হ'ল। তার কাছে যেটুকু ভাল আটা ছিল তাই দিয়েই মোটা মোটা হাতে গড়া রুটি, ডাল ও তার সঙ্গে পেঁয়াজ সাজিয়ে দিল অল্প সময়ের মধ্যেই। আমরা পরম পরিতোষ সহকারে তার তাঁবুর মধ্যে বসে যে যা পারলাম খেয়ে নিলাম। তার পর প্রাপ্য মূল্য মিটিয়ে দিয়ে তাকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করতে করতে আবার যাত্রাপথে অগ্রসর হলাম।

আমাদের গাইড কিচখাম্পা বিদায় নিলেন।

কুঁজোর গান

৺কল্যাণী দেবী

নিদারুণ গ্রীষ্ম,
কাঠফাটা রোদ্দুর,
খট্‌খটে মাঠঘাট
চোখ যায় যদ্দুর।
ধরণীর শুখা বুক
পিপাসায় চৌচির,
খানা ডোবা খন্দে
পাখীদের মহা ভীড়।
পৃথিবীর বুক ফাটে,
ছাতি ফাটে মানুষের,
ফটিক-ফটিক-জল
ডাক শুনি চাতকের।
ঝলসায় চারদিক্
খরতর সূর্য্যে,
পথিকেরা ছায়াঘন
গাছতলা খুঁজ্‌ছে।
সারা দেহে ঘাম ঝরে—
আকণ্ঠ তেষ্টা,
কোথা গেলে জল পাবে
তারই দেখে চেষ্টা।

জল চাই? এসো এসো,
জল দেব ঠাণ্ডা,
পিয়ে নাও বুক ভরে
জুড়োবে যে প্রাণটা।
রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে
সারা দেহ ঝিম্ ঝিম্?
এসো এসো, জল খাও
বরফের চেয়ে হিম।
রেখেছি শীতল জল
তোমাদেরি জন্যে,
মিছে কেন হও তবে,
পিপাসায় হন্যে?
আমার এ ছোট বুকে
জল আছে মিষ্টি,
পৌষের মিঠে রোদ এ,
জ্যৈষ্ঠের বিষ্টি।
ভরা আছে মার স্নেহ,
ভগিনীর ও বৌদির
দরদ পরাণ ভরা—
প্রীতিবারি সুমদির।
এসো এসো, কে বা আছ
ওগো পথশ্রান্ত!
পিপাসায় জল পান
করে হও শান্ত।
তোমাদের জল দিয়ে
আমি হব শূন্য,
অঞ্জলি পেতে বস—
করে দিই পূর্ণ।

সোনা রূপা নই আমি,
মণি বা মাণিক্য,
নই হীরে-পান্না,
করবে যে লক্ষ্য।
জৌলুষ নেই মোর—
নেই সৌন্দর্য্য,
রূপের বাহার নেই—
নেই ঐশ্বর্য্য।
প্রত্যহ পায়ে দল
মাটি যে সামান্য—
তাই দিয়ে গড়া আমি,
অতীব নগণ্য।
অতিশয় দীন আমি
পোড়া মাটি বই না,
তাই তো গরম আমি
কিছুতেই হই না।
গরব নেই তো মোর
নই আমি দৃপ্ত,
জল খেয়ে "আঃ" বল,
তাইতেই তৃপ্ত।
মিটবে সবার তৃষা—
দূর হবে ক্লান্তি,
তাইতেই খুসী আমি,
তাইতেই শান্তি।
জল চাই ? এসো এসো,
জল আছে ঠাণ্ডা,
পিয়ে নাও বুক ভরে
জুড়াও গো প্রাণটা।

দরবারী কাহিনী

শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

হবুচাঁদ আমীর আর গবুচাঁদ তার উজীর। লবুচাঁদ তাদের নাপিত। হবুচাঁদ আর গবুচাঁদ একদিন দরবারে বসে আছেন। একটা লোকের দাড়িতে কতগুলো চুল থাকতে পারে—এই নিয়ে গবেষণা করছেন। এমন সময় লবুচাঁদ এসে হাজির।

হবুচাঁদ শুধোলেন, লবু, তোমার কি দরকার? এ অসময়ে তুমি দরবারে এলে কেন?

লবুচাঁদ মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, হুজুরের কাছে একটা দরবার আছে।

গবুচাঁদ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, হবুচাঁদ আমীর তোমাদের মত নাপিত-টাপিতের কথা শোনেন না। যা বলবার আমাকে বলতে পারো।

লবুচাঁদ নাক ফুলিয়ে বলল, আমরা নাপিত বলে কি লোক নই, হুজুর? চিরকাল আমরা সকলের পা ধরে নখ কেটে যাব? দেশের সব নাপিতরা আমাকে ধরেছে, যে,

লবু, তুমি এর একটা বিহিত কর। আমার মগজে ওসব কুলোল না, তাই হুজুরের দরবারে ছুটে এসেছি। এ তো ঠিক কথা বাপু, কেন আমরা চিরকাল সবার পা ধরে নখ কাটবো?

গবুচাঁদ শুনে হাঁ!

হবুচাঁদ শুনে হাসিতে ফেটে পড়েন। বলেন, এই হোল তোমাদের কথা? যাও—। চিরকাল যা হয়ে আসছে আজ আবার তার ভুল ধরছ তোমরা! আজকাল তোমরা কি হলে বল ত'?

লবুচাঁদ কি আর করে, বেরিয়ে গেল সে দরবার থেকে।

এদিকে বিকেলে দেশের যত নাপিত ছিল সবাই পথে মিছিল করে বার হোল। বলতে] লাগল, আমাদের দাবী মানতে হবে। একজন সর্দার গোছের নাপিত জোরে ঘোষণা করল, আমরা কারো পা—

সবাই একসাথে বলে উঠল, ধরব না,—ধরব না।

হবুচাঁদ আর গবুচাঁদ দরবারে বসে দাবা খেলছিলেন, হঠাৎ শুনলেন নাপিতদের চীৎকার। হবুচাঁদ শুধোলেন, গবু, কিসের চীৎকার?

গবুচাঁদ কান খাড়া করে খানিক শুনে বলল, এ তো শুনছি নাপিতদের চীৎকার। ওরা বলছে, কারো পা ধরবে না ওরা।

হবুচাঁদ বললেন, যাও গবু, ওদেরকে বলে এস কাল যেন সব নাপিত দববারে আসে।

পরের দিন সব নাপিত দল বেঁধে দরবারে এল।

হবুচাঁদ বললেন, তোমরা কি বলতে চাও?

লবুচাঁদ এগিয়ে এসে বলল, হুজুরকে তো বলেছি – আমাদের কি দরকার—

হবুচাঁদ দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে মুখ ভারী করে খানিক ভাবলেন। তারপর বললেন, হুম্। তোমরা যখন লোকের চুল কাট তখন তাদের কান ধর না তোমরা?

সব নাপিত একসাথে বলে উঠল, ধরি, হুজুর!

হবুচাঁদ বললেন, তবে? কান ধরার বেয়াদপি পা ধরে মাপ চেয়ে নিতে হবে না? তাই তো বিধান। তোমরা আমাদের পুরোনো পুঁথি-বই পড়বে না, জানবে কি করে? শুধু চীৎকার করতেই শিখেছ তোমরা।—তারপর ওদের জোরে ধমক দিলেন, যাও—

নাপিতরা মাথা নীচু করে দরবার থেকে বেরিয়ে গেল।

এবারকার শিশুসাহিত্য সম্মেলন

শ্রীকৌটিল্য

প্রতি বছর শিশুসাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কলকাতায় একটি শিশুসাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন হয়; এবারেও অল্প কয়েকদিন আগে এই সম্মেলন সমারোহের সঙ্গে শেষ হয়েছে—সুবর্ণবণিক সমাজ হলের রমণীয় পরিবেশে। বর্তমানে এই সম্মেলনের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে এই কারণে যে এ যাবৎ নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন নামে যে একটি সম্মেলন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে (এক-এক বছর এক-এক জায়গায়) অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল তাতে শিশুসাহিত্য বিভাগটি সব বছর থাকে না। জব্বলপুরের অধিবেশনে ছিল না, আগ্রা অধিবেশনেও এটিকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। অথচ বাংলা সাহিত্যের আসরে শিশুসাহিত্য যে মোটেই অপাংক্তের নয় তা বহুদিন হ'ল স্বীকৃত হয়েছে। এমন কি কেবল মাত্র শিশুসাহিত্য নিয়েই যে একটা ২।৩ দিনব্যাপী পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হতে পারে তাও শিশুসাহিত্য পরিষদের সদস্যেরা প্রমাণ করেছেন।

এবারকার অধিবেশনে মূল সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেছিলেন শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবী। এ ছাড়া অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন পরিষদ-সভাপতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, উদ্বোধক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং প্রধান অতিথি ছিলেন (১ম দিন) শ্রীযুক্ত গোপাল ভৌমিক। তা ছাড়া এই সম্মেলন উপলক্ষে যে শিশুসাহিত্যের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল তার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বসু। এঁরা সকলেই সময়োপযোগী ভাষণ দিয়ে শিশুসাহিত্যের বিভিন্ন সমস্যা ও গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন।

এবারে এই সম্মেলন উপলক্ষে কয়েকজন বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিককে সম্মানিত করা হয়। শিশুসাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ সম্মান ভুবনেশ্বরী পদক ১৩৬৪ সালের জন্য দেওয়া হয় প্রবীণ শিশুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তকে এবং ১৩৬৫ সালের জন্য দেওয়া হয় প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে। এ ছাড়া শিশুসাহিত্য-পরিষদ্ ৺কবি ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে প্রতি বছরের শ্রেষ্ঠ শিশুপাঠ্য বাংলা গ্রন্থের জন্য ফটিক-স্মৃতি পদক নামে যে পুরস্কারের প্রবর্তন করেছেন তাও প্রথম বছরের জন্য (১৩৬৩) এবার দেওয়া হয় সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)-কে, তাঁর 'স্বপনবুড়োর শৈশব' নামে বইখানির জন্য। এই সব প্রবীণ সাহিত্যিকরাও সম্মেলনে তাঁদের সুচিন্তিত ভাষণ দেন।

পরবর্তী অধিবেশনগুলিতে ছোটদের ছড়া ও কবিতা নিয়ে আলোচনা করেন সুকবি

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, শিশুদের স্বাস্থ্য ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার (ইনি একাধারে বিশিষ্ট শিশুচিকিৎসক এবং শিশুসাহিত্যিক) এবং শিশুশিল্প নিয়ে আলোচনা করেন শিল্পী শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী। তোমরা হয়তো জান, এ বছর ভারত সরকার ছোটদের শ্রেষ্ঠ বইএর জন্য যে ক'টি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দিয়েছেন তার একটি পেয়েছেন শৈল বাবু,—তাঁর 'গাড়ীঘোড়ার গল্প' বইটির জন্য।

ছোটদের গল্প-উপন্যাস, ছোটদের নাটক এবং ছোটদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য আলোচনা করবেন কথা ছিল, কিন্তু এঁরা শেষ পর্যন্ত যোগ দিতে পারেন নি। তবে শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র মল্লিক এবং আরো কেউ কেউ শিশুসাহিত্যের বিভিন্ন দিক্ নিয়ে আলোচনা করেন। যাঁরা প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী।

সাহিত্য আলোচনা ছাড়াও সমবেত দর্শক ও শ্রোতাদের আনন্দবর্ধনের জন্য সম্মেলন-কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন শিশুশিল্পীদের দিয়ে গান, আবৃত্তি, নৃত্য প্রভৃতি নানা বিচিত্র অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেছিলেন। এ ছাড়া সুলেখক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার তারণ তাঁর হাস্যকৌতুক দিয়ে এবং প্রফেসর কে. ডি. মুখুটি তাঁর অপূর্ব ম্যাজিক দেখিয়ে সকলকে আপ্যায়িত করেন। আর, সকলের শেষে, শিশুসাহিত্যিকরা মিলে আয়োজন করেন এক অভিনয়ের—সুকুমার রায়ের 'অবাক্ জলপান'। ছোটদের নাটিকা কিন্তু এতে প্রধানতঃ অংশ গ্রহণ করেন প্রবীণ শিশুসাহিত্যিকের দল। প্রধান ভূমিকায় (পথিক) নামেন শ্রীনরেন্দ্র দেব। অন্যান্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন—শ্রীঅখিল নিয়োগী (ঝুড়িওয়ালা), শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী (প্রথম বৃদ্ধ), শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য (দ্বিতীয় বৃদ্ধ), শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (কবি), শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক (বৈজ্ঞানিক মামা), শ্রীঅনিল দত্ত (ট্যাঁপা) ইত্যাদি। মন যাঁদের চিরশিশু, বয়সের বাধা যে তাঁদের কাছে বাধাই নয়,—এই সব প্রবীণ সাহিত্যিকরা তাঁদের উন্নত স্তরের অভিনয়ে তা প্রমাণ করেছেন।

বহু সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, শিক্ষাব্রতী ও শিশুসাহিত্য-অনুরাগী প্রবীণ ও শিশু-কিশোর প্রতিদিনকার অনুষ্ঠানে যোগদান করে এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন। শিশুসাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে এই উপলক্ষে একটি সুসম্পাদিত 'স্মরণী'ও প্রকাশ করা হয়।

পুরানো পাতা

একটী গোপনীয় কথা

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

—এক—

যাওয়ার দিন সুনীল অমন কাণ্ডটা করিয়া বসিল কেন? তুই আজ যাইতেছিস্, পাড়াগাঁ ছাড়িয়া সহরের স্কুলে গিয়া ভর্ত্তি হইতে, ভালমত পড়াশুনা হইবে বলিয়া, কোথায় আজ বাড়ীর সকলের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করিবি, তা না দিলি ভোর বেলাতেই লীলাকে চটাইয়া! যাওয়ার দিনে কাজটা কি বড় ভাল হইল? বেচারা অত খাটিয়া কবিতাটা লিখিয়াছে, না হয় একটু-আধটু দোষ-ত্রুটী থাকিলই, তাই বলিয়া অমন ঠাট্টা-তামাসা করিয়া এক বাড়ী লোকের সাম্‌নে ওকে অপদস্থ করাটা কেমন ধারা ব্যবহার তোর? লীলা চটিয়াছে, বাস্তবিকই চটিয়াছে। আজই না হয় ছোড়দা তার বিদেশে চলিয়াছে কিন্তু দিন তার আসিবেই। তখন লীলা দেখিবে শার্টের বোতাম লাগাইবার দরকার তার আর হয় কিনা! দেখিবে, লুকাইয়া লুকাইয়া চা খাওয়ার সময় লীলার খোঁজ পড়ে কিনা! হুঁ!

সুনীলের মনটা কিন্তু কিছুক্ষণ যাইতে-না-যাইতেই কেমন কেমন করিতে লাগিল। হাজার হোক্ ছোট বোনটা তো, যাওয়ার দিন মনে কষ্ট দিয়া যাইবে? তাই কাছে গিয়া চুলের উপর আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কি রে, চটে গেলি নাকি রে? আরে, কবিতা লেখা কি এতই সোজা রে? আগে দস্তুর-মত ভাব হওয়া চাই।"

ঠোঁট ফুলাইয়া লীলা জবাব দিল, "আমি বুঝি সব্বার সঙ্গে কেবল আড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছি?"

"আরে বোকারাম, সে রকম ভাবের কথা বলছি না।"

"তবে আবার কি রকম ভাবের কথা?"

'আচ্ছা, দাঁড়া, তোকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। মনে কর্ 'সীতার বনবাসের' বিষয়ে একটা কবিতা লিখতে হবে। তখন তোর মনে খুব দুঃখু হওয়া চাই, নইলে ভাল কবিতা বেরোবে না।"

ব্যাপারটা লীলা তখন খুব সহজেই বুঝিয়া ফেলিল,—ভাব হওয়া মানে মনে দুঃখ হওয়া,—এ আর কে না বোঝে? বলিল, "আচ্ছা ছোড়দা, সেই যে 'জ্ঞান-বিকাশ' পত্রিকায় তোমার কবিতাটা বেরিয়েছিল—সেই যে—

'পর্ব্বত-দুহিতা নদি, বারি-ভরা দেহ,
সম্মান করিনু তোমা আমি কিংবা কেহ।'

—সেটা লেখার সময় নিশ্চয়ই তোমার মনে খুব ভাব এসেছিল, না?"

সুনীল সগর্ব্বে হাসিয়া বলিল, "ভাব না এলে কি অমন কবিতা কলম দিয়ে বেরোয় রে?"

"আমি কিন্তু বলে দিতে পারি ছোড়দা, কবে তুমি ও কবিতাটা লিখেছিলে!"

"কবে বল্ তো?"

"সেই যে সেবার অঙ্ক না পারার জন্যে বাবা তোমাকে খুব ঠেঙ্গিয়েছিলেন, তুমি সারা দিন বসে কাঁদলে—নিশ্চয়ই সেদিন। নয় কি?" তারপর একটু গদ্‌গদ্ কণ্ঠে আবার বলিল, "মনে খুব ভাব এসেছিল বুঝি?"

একটা করে কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে নিস্

সুনীল ভীষণ চটিয়া গেল; বলিল, "তুই একটা গাধা, তুই একটা গো-ভূত!"

কি কথার উত্তরে কি কথা! লীলার মুখ কালো হইয়া গেল। দেখিয়া সুনীলের মনে আবার দুঃখ হইল। একটু ভাবিয়া বলিল, "কি রে, মুখটা অমন প্যাঁচার মত করে রইলি যে!"

"নাঃ, মুখ প্যাঁচার মত করবে না? ভারী তো উনি আমায় গাধা বলবেন!"

"আরে বোকা, এও বুঝ্‌তে পার্‌লি নে যে একটা কায়দা করে তোর মনে ভাব এনে দিলাম। নইলে তুই তো আর সত্যি সত্যিই গাধা নোস্! তোর কি চারটে পা আছে? যা, এবার একটা কবিতা লিখে ফেল্ তো!"

"ওঃ, তাই নাকি?" বলিয়া দাদার উদারতায় মুগ্ধ হইয়া একগাল হাসিতে হাসিতে লীলা চলিয়া গেল। খানিক পরেই ছোড়দাকে সে তার লেখা কবিতা শুনাইয়া দিল—

“একটি আকের গাছে ছিল মেলা কাক,
কাকগুলি রোজ রোজ নিয়ে যেত আক।
একদিন প্রভাতে কাকগুলি আক নিতে এসে দেখে,
গাছের গোড়ায় কে যেন ফোঁস্ ফোঁস্ ক’রে ডাকে।
‘ভাইও, ভাইও’ বলি’ কাকগুলি ধায়,
দেখিল একটি জীব কট্-মট্ চায়!”

সুনীল লাফাইয়া উঠিল, “বেড়ে, বেড়ে, বেড়ে কবিতা!—কোথায় লাগে রবি ঠাকুর?”

“কিন্তু ছোড়দা, সব সময় যে মনে এমন ভাব আসে না?”

“কবিতা লেখার আগে একটা করে কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে নিস্। চোখে জল আস্‌বে, মনে দুঃখু হবে, আর তর্ তর্ করে কবিতা লিখে যাবি।”

দুই—

পাড়াগাঁয়ের স্কুলে তেমন ভাল পড়াশুনা হয় না, তাই সুনীলের বাবা হরকিশোর বাবু ঠিক করিয়াছেন সুনীলকে এবার সহরে পাঠাইবেন। দিব্যি হোষ্টেলে সে আপন মনে পড়াশুনা নিয়া থাকিবে, কোন ঝঞ্ঝাটই নাই। সহরে ত’ অবিনাশ বাবুই রহিয়াছেন, (সম্পর্কে তিনি সুনীলের মামা হ’ন), খোঁজ-খবর করার লোকের আর ভাবনা কি? আর তা ছাড়া হেড্‌মাষ্টার মশায়ও তো তাঁরই ছেলেবেলাকার বন্ধু! হরকিশোর বাবুর দেখাদেখি গ্রামের আরও দুই জন ভদ্রলোক ঠিক করিলেন তাঁদের ছেলেদের—বিনোদ আর অভয়কেও—সুনীলের মত সহরে পাঠাইতে হইবে।

আজ যাত্রার দিন ঠিক হইয়াছে, তিনটি ছেলেই একসঙ্গে যাইবে। কতটুকুই বা পথ, রেলে যাইতে সবে তো লাগে তিন ঘণ্টা। তা’তে আবার ওঠা-নামা নাই। প্রথমটা অভয় আর বিনোদের সঙ্গে সুনীলকে পাঠাইতে হরকিশোর বাবুর তেমন ইচ্ছা ছিল না—ছেলে দুইটী বড়ই বখাটে। কিন্তু একটু পরেই ভাবিলেন, তুমিও যেমন, সারাটা বছর ওরা থাকিবে এক সঙ্গে হোষ্টেলে, আর এই তিন ঘণ্টা সময় গাড়ীতে একত্র গেলেই একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে?—ছাঃ!

রওনা হইবার সময় সুনীলের মা তাকে অনেক উপদেশ দিয়া দিলেন—“কারুর সঙ্গে গোঁয়ার্তুমি করিস্ নে, কাঁচা ফল না ধুয়ে খাস্ নে, দু’বেলা চা খাস্ নে,” ইত্যাদি।

রেলগাড়ীতে উঠিয়া তিন বন্ধু দেখিল সে কামরাখানায় থাকিবার মধ্যে আছে কেবল একটি বুড়োসুড়ো গোছের ভদ্রলোক। নিতান্ত অজ পাড়াগেঁয়ে সে, নইলে মাথায় অত বড় টিকি রাখে, আর বালাপোষ গায়ে দিয়া একপাশে অমন ‘জুবুথুবু’ হইয়া বসিয়া থাকে? ভট্‌চায্যি পণ্ডিত, নিশ্চয় কোথাও ফলার মারিতে গিয়াছিল। কী ফূর্ত্তি তখন তাদের! জীবনে এই প্রথম অভিভাবকহীন হইয়া রেলগাড়ীতে চড়িয়াছে, পারে তো নাচে! একটু

পরেই অভয় গান জুড়িল। উঃ, সে কি গান! শুনিলে তোমাদের জীবনে আর কখনও সঙ্গীত শুনিবার সাধ হইত না,—আওয়াজখানা বাস্তবিকই ‘দিল্লী হইতে বর্ম্মা’ পর্য্যন্ত হানা দিতেছিল। সে গান শুনিয়া কোন ভদ্রলোকই স্থির থাকিতে পারে না, বুড়ো ভদ্রলোকটিও পারিলেন না, বলিলেন, “ওহে ছোক্‌রারা, এ আরম্ভ করলে কি?”

অভয় চটিল, দারুণ চটিল। কেন রে বাপু, রেল কোম্পানীকে পয়সা তারাও দিয়াছে, তবে তোমার কেন এমন ফোঁস্-ফোঁসানি? মাথাটি ছিল তার বরাবরই খুব উর্ব্বর, নানা রকমের বুদ্ধি যখন-তখন গজাইত। চট্ করিয়া এক মৎলব মাথায় আসিয়া গেল। বিনোদ এবং সুনীলকে মিনিট কয়েক ফিস্‌ফিস্ করিয়া সে বুঝাইল এতটা সময় গাড়ীতে নিরর্থক নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তার চাইতে ভট্‌চায্যির পোকে নিয়া খানিকটা ‘রগড়’ করা যাক্। লোকটাকে গাড়ী-ছাড়া করিতে পারিলে একটা বড় রকমের য়্যাড্‌ভেঞ্চার হইবে।

অল্প কিছুক্ষণ যাইতে-না-যাইতেই ভদ্রলোক দেখেন অভয় বেঞ্চির উপর চিৎপাত হইয়া বুক চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে চীৎকার করিতেছে, “উঃ হু হুঃ, গেলুম গো, গেলুম!” তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “এ কি, এর শূলের ব্যথা আছে নাকি?”

অভয় গোঙাইতে গোঙাইতে বলিল, “না গো ঠাকুর মশাই, পাপী, বড় পাপী আমি—গেলুম গো গেলুম!”

বিনোদ কথাটা বিশদ করিয়া দিল, “শূলের ব্যথা নয় ঠাকুরমশাই, পাপের ব্যথা। সামান্য একটু পুণ্যি পেলে এখুনি থেমে যাবে। শাস্ত্রে আছে—

তাম্রকূটং মহাদ্রব্যং স্বেচ্ছয়া দীয়তে যদি
অশ্বমেধ-ফলপ্রদং টানে টানে চতুর্গুণম্।

—ওসবও একটু-আধটু পড়াশুনা আছে কিনা! মানে হচ্ছে, যে লোক তামাক খায় তাকে যদি না চাইতেই কেউ তামাক সেজে খাওয়ায় তবে সে হুঁকোয় যতগুলো টান দেবে প্রত্যেক টানে যে তামাক সেজে দিয়েছে তার চার-চারটে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্যি হবে। তা আপনি যদি, ঠাকুর মশাই, আদেশ করেন তবে ও আপনাকে এক ছিলিম তামাক সেজে দেয়। তাতে করে’ যদি বেচারার পাপের ব্যথাটা একটু কমে। দেখ্‌ছেন না কি রকম কষ্ট পাচ্ছে?”

“বাঃ ছোক্‌রা, বাঃ! বেশ কথা কইতে শিখেছ তো, বলি বয়েস কত হ’ল?”

বিনোদের ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ পড়া ছিল, জিজ্ঞাসা করিল, “ষ্ট্যাণ্ডার্ড না ক্যাল্‌কাটা?”

বুড়ো ভদ্রলোক সে কথার কোন উত্তর দিতেছেন না দেখিয়া অভয় বলিল, “বাংলা করে বল বিনোদ, নইলে ইংরিজি বল্‌লে ঠাকুরমশাই বুঝবেন কি করে?”

বিনোদ নিজের রিষ্ট্ ওয়াচ্ দেখিয়া বলিল, “ষ্ট্যাণ্ডার্ড অর্থাৎ রেলওয়ের সময় হ’লে বয়স হচ্ছে তের বছর, সাত মাস, ছ’ দিন, পনেরো ঘণ্টা, সাঁইত্রিশ মিনিট, এক-চল্লিশ সেকেণ্ড; আর ক্যাল্‌কাটা টাইম্ হলে তার সঙ্গে চব্বিশ মিনিট যোগ হবে।”

ভদ্রলোকটী বলিলেন, “বাঃ ছোক্‌রা, এঁচড়েই বেশ পেকে উঠেছ তো!”

খোঁচা খাইয়া ছোকরাদের রোখ আরও চড়িয়া গেল। তখন সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের

সঙ্গে তারা এমনই সব কাণ্ডকারখানা আরম্ভ করিল যে সে সবের হুবহু বর্ণনা দিতে আমার এ ষ্টিলের কলমটাও লজ্জা পাইয়া থামিয়া যায়। শুধু এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে পরের ষ্টেশনে বুড়ো ভদ্রলোক নামিয়া গিয়া অন্য গাড়ীতে চড়িলেন।

—তিন—

সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সকলে সহরে আসিয়া পৌঁছিল। হরকিশোর বাবু প্রথমে সকলকেই অবিনাশ বাবুর বাড়ী উঠিতে বলিয়াছিলেন—একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া স্থনীল, বিনোদ আর অভয় অবিনাশ বাবুর বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

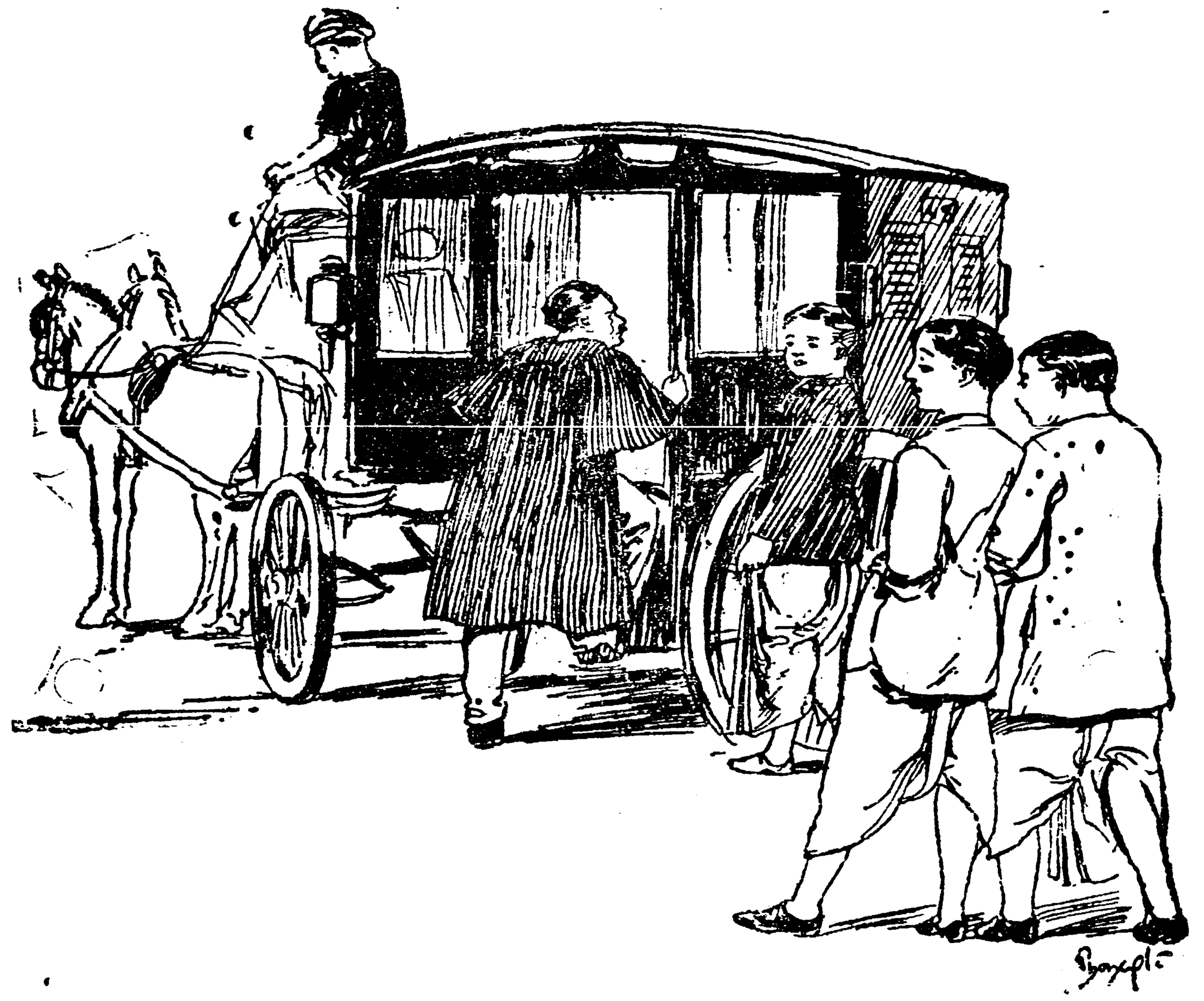

গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন

সেই রাত্রেই খাওয়ার আসরে ঠিক হইল কাল সাড়ে দশটায় কাছারী যাইবার পথে অবিনাশ বাবু সকলকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিবেন। তার পর ভাল দিন দেখিয়া ধীরেসুস্থে একদিন হোষ্টেলে গেলেই চলিবে।

পর দিন সাড়ে দশটার কিছু আগেই কাছারী যাইবার সাজ-পোষাক করিয়া অবিনাশ বাবু গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন, ছেলে তিনটীও তাঁর পেছন পেছন ভয়ে ভয়ে গাড়ীতে গিয়া চড়িল। পাড়াগাঁয়ের ছেলে সহরের স্কুলে ভর্ত্তি হইতে যাইতেছে, বুক তুরু তুরু করার কথাই তো! ছাত্রেরা হয়তো তাদের নিয়া কতই না ঠাট্টা-তামাসা করিবে, সব স্কুলেই তো এমনটা করে! তার উপর মাষ্টার মশাইরা হয়তো কত রকমের কঠিন কঠিন প্রশ্ন করিবেন, হয়তো বা ক্লাশের মধ্যে আঁকই কষিতে দিয়া বসিবেন!

স্কুলের চেহারা দেখিয়া বেচারারা আরও ভড়কাইয়া গেল। কী বিরাট্ বাড়ী! কোথায়

লাগে এর কাছে তাদের পাড়াগেঁয়ে স্কুল? ক্লাশগুলি গম্ গম্ করিতেছে—ছাত্রে ভরা। মাষ্টার মশাইয়া গম্ভীর মুখে পড়াইতেছেন।

চাপরাশী হেড্মাষ্টার মশায়ের বসিবার ঘর দেখাইয়া দিল। সামনে পর্দ্দা ঝুলিতেছিল, সরাইয়া অবিনাশ বাবু ঘরে ঢুকিলেন। তাঁর পেছনে স্থনীল, আরও পেছনে বাকী তুইজন।

ঘরে ঢুকিয়াই স্থনীল যে মাটীতে পড়িয়া গেল না তার কারণ বোধ হয় এই যে ঠিক তার পাশেই ছিল দেওয়ালটা। কিন্তু মুখ তার একেবারে কাগজের মত সাদা হইয়া গেল। কেন? কাল বালাপোষ আর টিকির দৌলতে ট্রেনের মধ্যে যিনি ভট্চায্যি ঠাকুর বনিয়াছিলেন, আজ চোগা-চাপ্কান পরা, সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে বসা সেই লোকটিকেই দেখিয়া স্থনীল বুঝিল, ইনিই এই স্কুলের হেড্মাষ্টার। আজ আর তাঁর 'জবুথুবু' ভাব নাই, বরং চশমার ভিতর দিয়া গম্ভীর ভাব আর রুক্ষ মেজাজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

অবিনাশ বাবু বলিলেন, "হেড্মাষ্টার মশায়, এইটি হচ্ছে আমার ভাগ্নে, হরকিশোর বাবুর ছেলে। স্থনীল, প্রণাম কর এঁকে।"

হেড্মাষ্টার মশায় চশমার ভিতর দিয়া প্রত্যেকের মুখের দিকেই একবার করিয়া তাকাইলেন, তারপর বলিলেন, "ওঃ, এই হরকিশোরের ছেলে? তা' এদের সকলের সঙ্গেই তো কাল ট্রেনে আমার আলাপ-পরিচয় হ'য়ে গেছে!"

"কই, সে কথা তো আমায় কেউ বল নি!" বলিয়া অবিনাশ বাবু ছেলেদের মুখের দিকে তাকাইলেন।

হেড মাষ্টার মশায় বলিলেন, "সে কি হে, সে কথা বল নি নাকি! তবে কি আমাকেই বলতে হবে?"

তোমরা শুনিয়া হাসিও না, চুপি চুপি একটা অত্যন্ত গোপনীয় কথা তোমাদের বলিতেছি। এ কথা শুনিবার পর স্থনীল একেবারে 'ভ্যাঁ' করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

হেড্মাষ্টার মশায়কে কিন্তু লোক ভালই বলিতে হইবে, তিনি হঠাৎ কথাটা চাপা দিয়া ছেলে কয়টিকে ভর্ত্তি করিয়া নিলেন। আজ পর্য্যন্ত অবিনাশ বাবু বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই স্থনীল সেদিন হঠাৎ অমন কাঁদিয়া উঠিল কেন। স্থনীলের মনে মনে বিশ্বাস তার যাত্রাটাই ভাল হয় নাই—রওনা হওয়ার দিন সকালে লীলার সঙ্গে ব্যবহারটা তার বাস্তবিকই খারাপ হইয়াছিল।

(১ম বছরের রামধনু থেকে পুনর্মুদ্রিত)

গালার গল্প

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

গোপনীয় বা মূল্যবান্ কোন কিছু ডাকে পাঠাতে হলে আমরা গালা দিয়ে সীল মোহর করে পাঠাই। সীল মোহর না ভেঙ্গে তা খোলা যায় না ; কাজেই সীল মোহর অক্ষত অবস্থায় আছে কিনা পরীক্ষা করলেই বোঝা যায় কেউ ওটা খুলেছে কিনা। এই ভাবে সীল মোহর করার পদ্ধতি বহু দিন থেকেই চলে আসছে।

যে জিনিষের ওপর এই সীল মোহর করা হয় তারই নাম গালা। গালা আগুনে গরম করলেই গলে যায়, আবার ঠাণ্ডা হলেই জমে শক্ত হয়ে যায়। কাজেই তরল অবস্থায় তাড়াতাড়ি তার ওপর কোন কিছুর ছাপ দিলে সে ছাপ, ঠাণ্ডা হলে, আর মুছে ফেলা যায় না। তোমরা, যারা নিজের হাতে সীল মোহর করেছ, তারা গালার এই গুণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। কিন্তু একমাত্র সীল মোহরের কাজেই গালার ব্যবহার হয় এ কথা যেন ভেব না। আরও হাজার রকম কাজে এর ব্যবহার আছে। যেমন ধর রং পালিশের কাজে, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজে, গ্রামোফোনের রেকর্ড বানাতে, এমন কি মেয়েদের গয়না তৈরীর কাজেও প্রচুর গালা ব্যবহার করা হয়। কাঠের আসবাবপত্রে রং করার জন্য আমরা যে বার্ণিশ লাগাই সেও তৈরী হয় স্পিরিটে গালা গুলে। দপ্তরীরা বই বাঁধাইএর কাজে গালা ব্যবহার করে। তা ছাড়া অয়েল-ক্লথ তৈরী, ওয়াটার-প্রুফ তৈরী, টুপি তৈরী, জুতো তৈরী, মোড়ক তৈরী, বোতলের ছিপি তৈরী, ছাপার কালি তৈরী, চকচকে কাগজ তৈরী, নখের পালিশ তৈরী, আরশী তৈরী দাবার গুটি, সখের কৌটো, বাক্স, লাঠি, খেলনা ইত্যাদি নানা টুকিটাকি জিনিষ তৈরী করতেও প্রচুর গালা ব্যবহার করা হয়। ফটোগ্রাফীতেও কম লাগে না।

এমন অজস্র ব্যাপারে যাকে কাজে লাগানো হচ্ছে সেই গালা জিনিষটা তা হলে কি? এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই তোমাদের মনে আসছে। কোথায় পাওয়া যায় এই গালা? কেমন করে পাওয়া যায়? জানি না তোমাদের মধ্যে ক'জনের এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা আছে।

বিজ্ঞানীদের ভাষায় গালা হচ্ছে এক জাতের 'রেজিন'—যাকে বাংলায় বলা হয় রজন। যারা গান-বাজনার চর্চা কর,—বিশেষ করে বেহালা বা এস্রাজ বাজাও তারা জান এই রজন জিনিষটা কি। কারণ ঐ বাজনা বাজাবার আগে ছড়ের গায়ে বেশ করে রজন মাখিয়ে নিতে হয়। তোমাদের অনেকের বাড়ীতেই সন্ধ্যাবেলা ধূপ-ধুনো জ্বালাবার রেওয়াজ আছে। হিন্দুদের পূজো-পার্বণ তো ও ছাড়া হয়ই না। এই ধুনোও

এক জাতের রজন, আর গালা হচ্ছে ওদেরই জাতভাই। তবে সাধারণ রজনের সঙ্গে গালার একটা বড় তফাৎ এই যে সাধারণ রজনগুলির প্রায় সবই পাওয়া যায় গাছপালা থেকে, কিন্তু গালা পাওয়া যায় এক রকম পোকার শরীর থেকে। এই জন্যই গুণের দিক্ দিয়েও গালার সঙ্গে অন্য রজনগুলোর তফাৎ অনেকখানি।

গালাকে কিন্তু খাঁটী স্বদেশী বলা যেতে পারে, কারণ ভারতবর্ষে প্রচুর গালা হয়। এমন কি গালাকে আমাদের দেশের একটি সম্পদ্ বললেও ভুল হবে না। ভারতের বাইরে এক ব্রহ্মদেশ আর থাইল্যাণ্ডে যা কিছু গালা জন্মায়, ব্যস্, আর কোথাও না। অথচ গালার চাহিদা আছে অল্পবিস্তর প্রায় সব দেশেই। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মেনী, জাপান, রাশিয়া প্রভৃতি অনেক দেশেই প্রতি বছর ভারত থেকে প্রচুর গালা চালান যায়। পশ্চিম বাংলার বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলা গালার জন্য বিখ্যাত। দস্তুরমত গালার চাষ হয় ঐ সব জেলায়। ছোট নাগপুর, রাঁচী, হাজারীবাগ প্রভৃতি জেলাতেও কম গালা তৈরী হয় না। এ ছাড়া আসাম, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলেও গালা পাওয়া যায়।

পোকার শরীর থেকে গালা পাওয়া যায় বলেছি। কি পোকা থেকে পাওয়া যায় আর কেমন ভাবে পাওয়া যায় বলি নি। এইবার তাই শোন।

সংস্কৃতে লাক্ষা বলে একটা কথা আছে। এই লাক্ষা মানে গালা। যে পোকা থেকে গালা পাওয়া যায় ভাল বাংলায় তাই তাকে বলা হয় লাক্ষাকীট। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন "কক্কাস্ লাক্কা"। এই লাক্ষাকীট বা কক্কাস্ লাক্কা কোথায় পাওয়া যায়? এরা বাস করে গাছে,—বট, অশ্বত্থ, মহুয়া, পলাশ, আশনা এই সব গাছে। বাস করে বললে ঠিক বলা হবে না, এই পোকা একবার যে গাছের ডালে আস্তানা গাড়ে সে গাছের আর বিশেষ কিছু বাকী রাখে না—আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ গাছটিই দখল করে নেয়। শূক অবস্থা থেকেই লাক্ষাকীট ঐ সব গাছের ডাল থেকে রস চুষতে সুরু করে দেয় ; সঙ্গে সঙ্গে ওদের শরীর থেকেও এক রকম লালচে রংএর রস বেরোতে থাকে। এই রস বাতাসের সংস্পর্শে এলেই জমে যায়, আর সেই জমাট রস দেখতে দেখতে ওদের সারা শরীর ঢেকে ফেলে। ঠিক যেমন গুটিপোকার শরীর গুটিতে ঢেকে যায় সেই রকম আর কি। এই জমাট রসই হচ্ছে গালা।

গুটিপোকার সঙ্গে এই সাদৃশ্য দেখে এগুলিকে গালার গুটি বলা যেতে পারে। যাই হোক, ক্রমে একটি গুটির সঙ্গে আর একটি—এমনি ভাবে সমস্ত গুটিগুলো একসঙ্গে যুড়ে যায়, কেবল মাঝে মাঝে ছোট ছোট ফাঁক থাকে—অনেকটা মৌচাকের মত। স্ত্রী-পোকাগুলো তার তলা থেকে আর কোন দিনই বেরোতে পারে না। তার পর পোকা

গুলো সংখ্যায় বাড়তে থাকে—একটি থেকে ছু'টি, ছু'টি থেকে চারটি,—চারটি থেকে আটটি। এই ভাবে ক্রমে হাজার হাজার—লক্ষ লক্ষ পোকা দেখা দেয়। গালার রসে গাছের সমস্ত ডালপালা ছেয়ে যায়। নিঃশেষ করে গাছের সমস্ত রস নিংড়ে নেয় পোকাগুলো। সমস্ত পাতা ঝরে পড়ে। তখন সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! মনে হয় গোটা গাছটাই বুঝি আগাগোড়া হলুদ-রাঙা গালার পোষাক প'রে দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষ লক্ষ পোকা—তাই হয়তো নাম হয়েছে লাক্ষা। কিংবা লাখ লাখ পোকা থেকে 'লাক্' নাম। ইংরেজরা প্রায় সমস্ত দেশী শব্দই একটু বিকৃতভাবে উচ্চারণ করে। তাই তারা 'লাক্' না বলে বলে 'ল্যাক্'।

আগেই বলেছি পশ্চিম বাংলা, বিহার আর ছোট নাগপুর হচ্ছে আসল গালার জায়গা। ওখানকার বহু লোক, বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটা মোটা অংশ, এই গালার ব্যবসা করে তাদের জীবিকা অর্জন করে। অবশ্য প্রাথমিক কাজ, অর্থাৎ গাছ থেকে গালা সংগ্রহ করাটাই এদের কাজ, পরবর্তী কাজগুলো আজকাল সাধারণতঃ বড় বড় ব্যবসায়ীরা করে এবং এজন্য বড় বড় কারখানাও বসায় তারা। অনেক ব্যবসায়ী আবার গালার চাষ করতেও ওস্তাদ। অর্থাৎ এক গাছের পোকা নিয়ে আর এক গাছে ছেড়ে দেয়—যাতে নতুন পোকারা নতুন গাছে গিয়ে সেখান থেকে নিজেদের খাদ্যরস যোগাড় করে নিতে পারে। কোন গাছে কোন্ পোকা ভাল ভাবে বাড়তে পারবে এ সব খবর অভিজ্ঞতার ফলে তাদের নখদর্পণে। কাজেই এই কৃত্রিম চাষের ফলে বিস্তৃত অঞ্চল—এমন কি বিরাট বিরাট বনভূমি লাক্ষাকীটে ভরে যায়।

সাধারণতঃ বছরে ছু'বার, একবার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে, আর একবার কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে গালা সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহ করা মানে, ঠিক মত 'তৈরী' হলে গালা ভর্তি ডালগুলোই কেটে নেওয়া হয়। এই ডালগুলো টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে নিয়ে ওজন দরে বিক্রী করা হয় হাটে।

এর পরের কাজ হচ্ছে ডাল থেকে খাঁটি গালা বার করে নেওয়া—সাধু ভাষায় যাকে বলে 'গালা নিষ্কাশন'। এ কাজটা হয় কারখানায়। কারখানা অবশ্য ছোট-বড় নানা জাতের আছে। বলা বাহুল্য গালার ডালগুলোর মধ্যে অনেকখানি অংশই থাকে অকেজো পদার্থ। এই সব ডালে গালার পরিমাণ একশ' ভাগে বড় জোর ষাট কি পঁয়ষট্টি ভাগ। ডাল থেকে কি করে গালা নিষ্কাশন করা হয় শোন।

প্রথমে ডালগুলোকে ভেঙ্গে আরও ছোট ছোট টুকরো করা হয়। তার পর সেগুলো জাঁতায় পিষে, কুলোয় ঝেড়ে, ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নেওয়া হয়। তার পর সেগুলো নিয়ে ভিজিয়ে রাখা হয় গরম জলে। গরম জলে লাল রংএর অনেকটা

গলে বেরিয়ে আসে, যা পড়ে থাকে সেগুলোকে আবার ভাল করে ধুয়ে ফের ছেঁকে নিলে পাওয়া যায় গুঁড়ো গুঁড়ো গালার দানা। এই দানা অল্প আঁচে গালিয়ে তার সঙ্গে খানিকটা রজন মিশিয়ে নিলে যে গালা পাওয়া যায় তাই হচ্ছে আমাদের বাজারের গালা। চলতি কথায় এর নাম চাঁচগালা,—ইংরেজীতে বলে 'শেলাক্'। এই শেলাক বা চাঁচগালাই দেশবিদেশে চালান যায় আমাদের দেশ থেকে।

গালার রং কি রকম? সাধারণতঃ ঈষৎ হলদে বা লালচে গালাই আমাদের চোখে বেশী পড়ে। কিন্তু প্রকার ভেদে গাঢ় কমলা, লাল, তামাটে, এমন কি স্রেফ কালো রংএর গালাও পাওয়া যেতে পারে। আবার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গালার রং উড়িয়ে দিয়ে একদম সাদা বা ইচ্ছেমত রং-বেরংএর গালা তৈরী করাও খুব কঠিন নয়।

গালা বার করার বিভিন্ন অবস্থায় যে সব 'ঝটতি-পটতি' মাল বেরোয় সেগুলোও কিন্তু ফেলে দেওয়া হয় না—বাজারে তারও দাম আছে, তবে অনেক কম দাম। এর কিছু কিছু নিয়ে খেলনা, পুতুল, মেয়েদের চুড়ি, কানের গয়না ইত্যাদি নানা রকম ছোটখাট কুটীরশিল্পে ব্যবহার করা হয়। আর গালা ভিজিয়ে যে লাল জল পাওয়া যায় তারও চাহিদা কম নয়। কারণ ঐ রঙ্গিন জল থিতিয়ে নিলে তলায় যে লাল গুঁড়ো জমে তাই শুকিয়ে চমৎকার লাল রং পাওয়া যায়। এরই নাম অলক্তক বা আলতা (ল্যাক্ ডাই)। আগে, যখন আলকাৎরা থেকে সস্তা, নকল রংএর আবিষ্কার হয় নি, তখন লাল রং বলতে এই আলতাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ, আর এই রংএর লোভেই লোকে গালার চাষ করত,—চাঁচগালাটা পাওয়া যেত ফাউ হিসেবে। এখন ব্যাপারটা উল্টে গেছে। চাঁচগালাটার জন্যই এখন ওর চাষ হয়, আর রংটা সংগ্রহ করা হয় ফাউ হিসেবে। এই আলতাই হচ্ছে আসল আলতা যা মেয়েরা পায়ে পরে। তাই তো কবি মেয়েদের সখ মেটানোর বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন—"চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তার।" খাঁটি আলতা লাক্ষাকীটের দেহ থেকেই আসে কিনা! বাজারে পাতা-আলতা বলে যে লুচির মত গোল গোল লাল লাল তূলোট কাপড়ে ছোপা আলতা বিক্রী হয়,—যা নিংড়ে আলতা বার করা হয়,—তাও কিন্তু এই আসল আলতা।

আলতাকে সংস্কৃতে বলে অলক্তক; গালার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাই অলক্ত বললে গালাকেও বোঝায়। অবশ্য আরও কতকগুলো গালভরা সংস্কৃত নাম আছে ওর। যেমন ধব, পলঙ্কষা, দ্রবরসা, মুদ্রিণী, দ্রুমব্যাধি, পলাশী, জতু ইত্যাদি। 'জতু' নামটা তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই। মহাভারতের সেই জতুগৃহদাহের গল্প মনে নেই? জতু অর্থাৎ গালা দিয়েই তো সেই ঘরটা বানানো হয়েছিল পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবার

উদ্দেশ্যে! এ থেকে বোঝা যায় গালার ব্যবহার সেই পৌরাণিক যুগেও অজানা ছিল না।

লাক্ষাকীটের রস ছাড়াও নকল উপায়ে বিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরীতেও আজকাল গালার মত রঞ্জন তৈরী সুরু হয়েছে—বিভিন্ন রকমের রঞ্জন, যাকে নাকি বলা হয় 'সিন্‌থেটিক রেজিন'। এই নকল গালা ভারতীয় গালা-শিল্পের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। তা ছাড়া থাইল্যাণ্ডের গালাও নাকি অত্যন্ত উঁচুদরের, এবং ভারতীয় শিল্পের আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী।

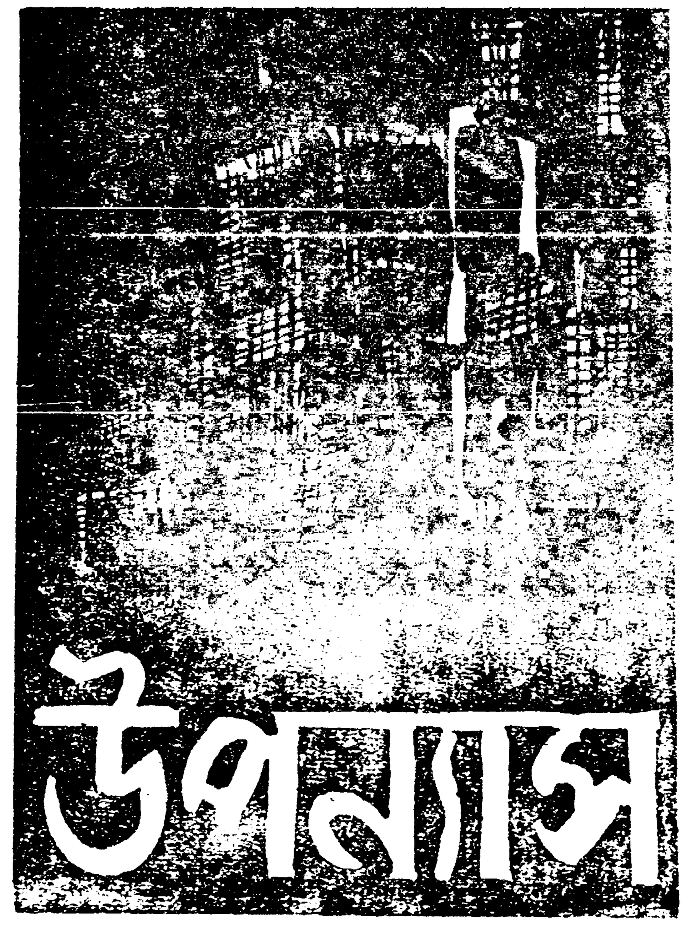

মেঘনাদ

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য

১০

ফেরকশেরবাদকে দিল্লীর একটি সহরতলী বলা চলে। সহরতলী হলেও সহরের ছাপ এখানে খুব বেশী নেই। পাশেই যমুনা। দিল্লীর যমুনা অনেক জায়গায়ই শুকিয়ে গেছে,—চওড়া বালির খাতের ওপর দিয়ে ঝির ঝির করে একটা ক্ষীণ স্রোত বয়ে চলে মাত্র। খরার সময়, একটু কাপড় গুটিয়ে নিলে, পায়ে হেঁটেই পার হয়ে যাওয়া যায়। ফেরকশেরবাদের কাছে কিন্তু নদী অতটা অগভীর নয়। নদীর তলাটা ঢালু হয়ে হয়ে অন্যান্য অংশের চেয়ে বেশ খানিকটা নীচু হয়ে গেছে, তাই এখানে সব সময়েই খানিকটা জল থাকে। এখন তো বর্ষার সময় জল আরও খানিকটা বেড়েছে। নৌকা যাতায়াত করতে পারে, এবং করেও।

নদীর পাড়েই কতগুলো বড় বড় গাছ। অশ্বত্থ, পাকুড়, পিপুল, আর ঝুরি-নামা বট, প্রাচীনত্বের প্রতীক্ হয়ে দাঁড়িয়ে। এই সব গাছের আড়ালে পড়ায় নদীর দিক্

থেকে পাড়ার ভিতরটা ঠিকমত নজরে আসে না,—কেমন একটা আবছা অন্ধকার,—একটা আজানা রহস্যের আভাস দেয় মাত্র।

অতি প্রাচীন নগরী এই দিল্লী। যুগ যুগ ধরে কত রাজা এখানে রাজত্ব করে গেছেন,—কেউ বা ইতিহাসের পাতায় নাম রেখে গেছেন, কেউ গেছেন বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে। গড়ে উঠেছে কত বড় বড় সাম্রাজ্য—পরাক্রমে জনগণের মধ্যে ত্রাস জাগিয়ে আবার তা একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এরই ধূলোয়। দিগ্বিজয়ীর দল বারে বারে হানা দিয়েছে এই সহরের দরজায়। কখনও বাধা পেয়েছে, কখনও পায় নি। মানুষের তাজা রক্তে কত বার লাল হয়ে গেছে এর পথঘাট, আবার তার ওপর গজিয়েছে সবুজ ঘাস। দেশের ভাগ্য, বিদেশীর ভাগ্য,—মানুষের ভাগ্য কত বার পরীক্ষা হয়ে গেছে এরই প্রান্তে। অনন্ত কালের হিসেবে হয়তো এই সব ঘটনা এক একটা বুদ্‌বুদ্‌ ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু বুদ্‌বুদের কি ছাপ থাকে? স্মৃতি থাকে? দিল্লীর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ালে সেই কথাই মনে হয় বার বার।

যখনই কোন রাজা বা সম্রাট্‌ দিল্লীর শাসন-দণ্ড হাতে পেয়েছেন তখনই তিনি চেষ্টা করেছেন অনাগত যুগের জন্যও তাঁর নিজের হাতের কিছুটা চিহ্ন রেখে যেতে, লোকে যাতে তাঁর কথা ভুলে না যায়। কেউ সফল হয়েছেন, কেউ হন নি। কিন্তু এরই জন্যে বারে বারে রাজধানীর স্থান বদল হয়েছে, নাম বদল হয়েছে। বেশী দূরে নয়—কাছাকাছি, ২। ৪ ক্রোশের মধ্যেই হয়তো, নতুন নতুন নগরীর পত্তন হয়েছে—নতুন নতুন নামে। ইংরেজ মহাপ্রভুরাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নি,—তৈরী করে গেছেন নিউ দিল্লী। হ্যাঁ, তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেও ঐ নয়া দিল্লীর চেহারা ছিল একেবারে অন্য রকম!

কিন্তু নয়া দিল্লীর কথা নয়, আমরা বলছি ফেরকশেরবাদের কথা। দিল্লীর চাঁদনী চক্‌ বা জুম্মা মসজিদ বা রামলীলা ময়দানকে কেন্দ্র করে যদি দশ কি বারো ক্রোশ ব্যাসার্দ্ধ নিয়ে একটা বৃত্ত আঁকা যায় তা হলে এই বৃত্তেরই ভিতর এখানে ওখানে কত যে পরিত্যক্ত রাজধানীর চিহ্ন পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই। বিরাট বিরাট ভাঙ্গা অট্টালিকা, ভাঙ্গা গম্বুজওয়ালা মসজিদ, কচিৎ বা মন্দির, এবড়ো-খেবড়ো পাথরের দেয়াল আর বড় বড় ভগ্ন, অর্দ্ধভগ্ন স্বল্পভগ্ন তোরণ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে আছে অতীতের সাক্ষী হয়ে। যে সব অঞ্চল—পথঘাট, ঘরবাড়ী এক সময় রাজা-বাদশাহের পরাক্রমে তটস্থ হয়ে থাকত, জনকোলাহলে গম্‌ গম্‌ করত,—আজ তা আগাছা আর জঙ্গলে, শ্যাওলায় আর কাঁটাঝোপে ভর্তি হয়ে আছে। কোনটার ওপর বড় বড় গাছ গজিয়ে ফাটিয়ে

চৌচির করে দিয়েছে। তারই আশেপাশে আশ্রয় নিয়েছে পোকামাকড়, বিষাক্ত সাপ, চামচিকে, শেয়াল—আরও কত ছোটবড় বন্য জন্তু! কবির ভাষায়—

"যেথা মন্ত্রী-সাথ নরনাথ বসিতেন ধীর—
সেথা ফেরুপাল ফিরে ফিরে ফুকারে গভীর।"

এর কোন কোনটার ওপর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নজর পড়ে নি এমন নয়। প্রয়োজন মত সংস্কার করে, কার বাড়ী, কার দরজা—অনুমান কোন্ সালে কি উপলক্ষে তৈরী হয়েছিল এটি—কে থাকতেন—কোন্ ঘটনা ঘটেছিল এখানে ইত্যাদি নানা খবর সাইন বোর্ডে লিখে লটকে রেখেছেন তাঁরা। দর্শকেরা দেখতে আসে, থমকে দাঁড়ায়; কেউ সবটা পড়ে দেখে, কেউ পড়ে না, কিন্তু বিস্ময় বোধ করে প্রায় সকলেই। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তো আর সবজান্তা ন'ন, আর অর্থভাণ্ডারও তাঁদের অফুরন্ত নয়। কাজেই পুরোনো ধ্বংসাবশেষ মাত্রেরই ঠিক ঠিক পরিচয় দেওয়া বা যথামত সংস্কার করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও তাই অজ্ঞাত—অবজ্ঞাত—পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। পথিকের সম্ভ্রমই শুধু উদ্রেক করে তারা, আর কিছু নয়।

ফেরকশেরবাদও এই রকম একটা অবজ্ঞাত বা পরিত্যক্ত অঞ্চল। নাম শুনে অনুমান করা যায় সম্রাট্ ফেরকশেরই হয়তো এখানে নতুন সহরের পত্তন করে তাঁর রাজধানী উঠিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। সত্যি তাঁর রাজধানী এখানে উঠে এসেছিল কিনা, উঠে এসে থাকলে কতদিনের জন্য এসেছিল,—নাকি এ অঞ্চলটা তাঁরই আমলে বিশেষ কোন প্রয়োজনে তৈরী হয়ে শুধু সম্রাটের নামচিহ্ন নিজের নামে ধারণ করে গৌরবান্বিত হয়েছিল তা ঠিক জানা নেই। তবে এ অঞ্চলের কয়েকটি বিরাট বিরাট অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, স্বল্পভগ্ন পুরু পাথরের পাঁচীল আর অর্দ্ধভগ্ন সুউচ্চ তোরণ বা ফটক অতীত যুগে জায়গাটি যে নেহাৎ হেলাফেলার ছিল না তার প্রমাণ দেয়। ফেরকশের নামেও একাধিক বাদশাহ্ থাকা কিছু বিচিত্র নয়; কেননা দিল্লীর সিংহাসনে, অল্পকালের জন্যও, যে কত রাজা-বাদশাহ্ বসে গেছেন তার হিসেব পাওয়া কঠিন। তবে ফেরকশের বলতে সাধারণতঃ যে বাদশাহ্‌র কথা আমরা জানি শিখবিরোধী হিসেবে ইতিহাসের পাতায় তিনি নাম রেখে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'বন্দীবীর' কবিতার অন্যতম নায়ক বাদশাহ্ ফেরকশের বা ফেরকশায়ারের কথাই বলছি—যিনি শিখগুরু বান্দা বা বন্ধুকে বন্দী করে নৃশংস ভাবে হত্যা করিয়েছিলেন। শুধু বান্দাকেই নয়, তাঁর শত শত শিখ অনুচরকেও। এই শিখের সংখ্যা কত ছিল সে সম্বন্ধে সব ঐতিহাসিক একমত ন'ন। বন্দীবীরে এর সংখ্যা লেখা আছে সাত শ'।—

"সম্মুখে চলে মোগল সৈন্য উড়ায়ে পথের ধূলি,
ছিন্ন শিখের মুণ্ড লইয়া বর্শা-ফলকে তুলি;
শিখ সাতশত চলে পশ্চাতে, বাজে শৃঙ্খলগুলি।"

কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে এদের সংখ্যা ছিল সাতশ' চল্লিশ। আবার কারো কারো মতে আরও বেশী। প্রবাদ, মৃত্যুদণ্ড দেবার আগে এই বিপুলসংখ্যক বন্দী শিখকে এই ফেরকশেরবাদেই এক বন্দীশালায় আটকে রাখা হয়েছিল; এবং এখানেই ছোট একটা ঘরে, কলকাতার অন্ধকূপ হত্যার যেমন গল্প শোনা যায় তেমনি, একটা ঘটনা ঘটেছিল। ছোট্ট একটি আলো-বাতাসহীন বন্ধ ঘরে দারুণ গ্রীষ্মে শতাধিক বন্দীকে স্তূপীকৃত বস্তার মত করে ফেলে রাখা হয়েছিল। কতক জলের অভাবে, কতক গুমোট আবহাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে তারা ঐ ঘরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। এই শতাধিক বন্দীকে ঐ সাতশ' চল্লিশের মধ্যে গণনা করা হয়েছিল কিনা তা জানা নেই এবং গল্পটিও কতখানি সত্য তা গবেষণার বিষয়। তবে সে যুগে এ ধরণের ব্যাপার হামেশাই ঘটত, কাজেই অবিশ্বাস্য নাও হতে পারে;—যদিও এ যুগের অন্ধকূপ হত্যার গল্প অবিশ্বাস্য এবং মিথ্যা ব'লেই প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু সে প্রবাদ আজও প্রচলিত আছে। ফেরকশেরবাদের এই ভাঙ্গা বাড়ীগুলির ভিতর আজও নাকি মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে সেই সব বিদেহী আত্মার আর্তকণ্ঠ শোনা যায়। বন্দুকের গুলি বা তীরের আঘাতে যন্ত্রণাকাতর বুনো পশুর আর্তনাদের মত তীব্র অর্থবিহীন চীৎকার। কিন্তু বড় ভয়ানক! নিস্তব্ধ আকাশের বুক চিরে মরণপথযাত্রীর সেই ভয়ার্ত কণ্ঠ যখন আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে তখন তা স্বভাবতঃই লোকের মনে প্রচণ্ড ভীতির উৎপাদন করে। অতি সাহসীরাও তাই পারতপক্ষে এ অঞ্চলে আসতে চায় না। রাত্রের দিকে তো নয়ই। কাজেই ইন্দ্রনীলের সহকারী হরবংশ বা হর্‌বন্‌স্ সিংকেও হয়তো বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। জাতে পাঞ্জাবী হলে হবে কি, সেও তো মানুষ!

কিন্তু দিল্লীতে নাকি অধুনা গৃহ-সমস্যা অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়েছে। নতুন করে ভারতের রাজধানী হওয়ায় ভারতের নানা অঞ্চল থেকে দলে দলে লোক এসে জমায়েৎ হচ্ছে দিল্লীতে। তার ওপর আছে উদ্বাস্তুর দল—পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে, সিন্ধু থেকে, সামান্য কিছুটা পূর্ব বাংলা থেকেও। এত লোক আঁটে কোথায়? খোঁজ খোঁজ এদিক্ ওদিক্, কোথায় পাওয়া যায় খালি জায়গা? ফলে পরিত্যক্ত অঞ্চলগুলিতেও কিছু কিছু লোকসমাগম আরম্ভ হয়েছে। ফেরকশেরবাদেও সেই অবস্থা। আর, যেখানে কেউ যেতে চায় না, সেখানে অল্প ভাড়াতেই যে বাড়ী জুটবে এ তো স্বাভাবিক! বর্তমান অর্থ-সমস্যার দিনে, যাদের মনে একটু সাহস আছে, তাদের পক্ষে এতে প্রলুব্ধ হওয়া তেমন আশ্চর্যের কিছু নয়। একা থাকতে ভয় হতে পারে, কিন্তু দল বেঁধে গেলে ভয় কি?

যাই হোক, যে সব দল এই ভাবে এ অঞ্চলে এসে আড্ডা গেড়েছিল তাদের মধ্যে হয়তো ইন্দ্রনীলের পরিচিত কেউ কেউ ছিল। কাজেই ইন্দ্রনীলকেও টেনে আনা তাদের পক্ষে কষ্টকর হয় নি। অবশ্য, অফিস থেকে ইন্দ্রনীল রাহা খরচা বাবদ যা পাচ্ছিল তাতে দিল্লীর কোন একটা ভালো হোটেলেও সে আনায়াসে থাকতে পারত। কিন্তু পয়সার টান বড় টান। যদি ওরই মধ্যেকার কিছু পয়সা বাঁচানো যায় তো মন্দ কি?—এও হয়তো তার এখানে বাসা নেওয়ার একটা কারণ হতে পারে। আর, একটা অ্যাডভেঞ্চারের লোভও নির্জনতা-প্রিয় ইন্দ্রনীলকে আকৃষ্ট করে থাকতে পারে। মোট কথা, কারণ যাই হোক, ইন্দ্রনীল তার পরিচিত কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে এই ফেরকশেরবাদেই তার ডেরা বাঁধল। প্রথমে ভেবেছিল এ সপ্তাহখানেকের ব্যাপার। কিন্তু এসে দেখে কাজ অনেক এবং তা সময় সাপেক্ষ। তাই সে অফিসে লিখে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সময় বাড়িয়ে নিয়েছে।

নতুন বাড়ী নয়,—বাদশাহী আমলের বিরাট একটা বেওয়ারীশ অট্টালিকা। হঠাৎ দেখলে গা ছম্ ছম্ করে আজও। অগুণতি ঘর, গুণে যেন শেষ করা যায় না। তারই খানিকটা অংশ দখল করে নিয়ে, লোক লাগিয়ে সাফ করে, মেরামত করে স্থানীয় একজন চালাক লোক ভাড়াটে বসিয়েছে। অনেকটা কলকাতার আশেপাশে উদ্বাস্তুদের জবর-দখলের মত আর কি। তা দিক্, ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে তাকে এ জন্য অনেক। তার মূল্য বাবদ তাকে কিছু দিতে হবে বই কি।

কিন্তু সত্যিই কি বাড়ীটা রহস্যময়? শতাধিক বিদেহী আত্মার আর্তকণ্ঠ কি আজও এর কোণে কোণে প্রতিধ্বনিত হয়ে বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর সেই সঙ্গে বাড়ীটাকেও করে তুলেছে অভিশপ্ত পুরী?

ইন্দ্রনীলই হয়তো এর জবাব দিতে পারবে। নিয়তিই হয়তো তাকে টেনে এনেছে এখানে। দেখা যাক্ কি বলে সে! (ক্রমশঃ)

চিঠিপত্র

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

শেষ পর্যন্ত কথার খেলাপ হয়েই গেল। অতি-বিশ্বাসীদের হয়তো এই রকমই হয়। আমরা সংকল্প নিয়ে কাজ করে যাই, কিন্তু সকলের আগচরে নেপথ্যে থেকে বিধাতাপুরুষ যে কি কলকাঠি নাড়ছেন তা তো জানি না। ফলে কত অঘটন ঘটে যায়। তাই ঘটল শেষ পর্যন্ত। আবার দেরী করে ফেলল রামধনু আত্মপ্রকাশে।

কিন্তু তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার, এ নিতান্তই সাময়িক। যে পত্রিকা ৩১ বছর ধরে সুষ্ঠুভাবে নিয়মিত বেরিয়ে এসেছে তার ভিৎ যথেষ্ট পাকা। কাজেই নতুন বছরের রামধনু

সম্বন্ধে কোন রকম চিন্তাগ্রস্ত হবার কারণ নেই—এ ভরসা রাখতে পার। চৈত্রের সঙ্গে বৈশাখ সংখ্যার কাজও সুরু হয়ে গেছে ইতিপূর্বেই।

হ্যাঁ, ৩২ বছরে পড়ছে এই বৈশাখে রামধনু। নতুন বছরের মলাট কি রকম হবে সে বিষয়ে অনেকেই কৌতূহল প্রকাশ করেছ। মলাট তৈরী হয়েছে—নামকরা শিল্পীর আঁকা, তোমাদের পছন্দ হবে নিশ্চয়ই। আর ভিতরের রচনাসম্পদ্? রামধনুর বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে এ কথা বলাই বাহুল্য। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকেরা তাঁদের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সকলেই, এবং কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতা সত্বেও, রামধনুর অঙ্গসজ্জার দিকে কার্পণ্য করা হবে না।

আর একটা সুখবর বলি। এত ব্যয়বাহুল্য সত্বেও অন্যান্য বেশীর ভাগ পত্রিকার মত আমরা রামধনুর দাম আপাততঃ বাড়াবো না ঠিক করেছি। এ বছরও বার্ষিক মূল্য চার টাকাই থাকবে। গ্রাহকদের—পাঠকদের দিক্‌টাও দেখতে হবে বই কি! কেমন না?

কিছুদিন যাবৎ ডাকে চিঠিপত্র পেতে বড় গোলমাল হচ্ছে। খবরের কাগজে এ নিয়ে লেখালেখিও হচ্ছে খুব। আমরাও এর ভুক্তভোগী। খুব ভাল করে পরীক্ষা করে ঠিকানা মিলিয়ে পত্রিকা ডাকে দেওয়া সত্বেও মাঝে মাঝে পত্রিকা হারিয়ে যাচ্ছে—এ রকম অভিযোগ পাচ্ছি। তোমরা যদি কেউ কোন মাসের কাগজ না পাও তা হলে আগে স্থানীয় ডাকঘরে ভাল করে খোঁজ নেবে, তার পর তাঁরা কি বলেন জেনে আমাদের জানিয়ে দেবে। চিঠি পেলেই আমরা যথারীতি ব্যবস্থা করব।

চিঠির জবাব ঃ—শ্রীমালবিকা দত্ত (দ্বারবান্ধ—কাছাড়)—তোমার নিজের শিকারে যাওয়ার কথা শুনে বেশ মজা লাগল। আরও ভাল করে লিখে পাঠাও না—রামধনুর পাঠকদের জন্য! আমার কিন্তু ও ব্যাপারে একেবারেই অভিজ্ঞতা নেই। তবে ওর গল্প পড়তে ভাল লাগে—ইংরেজী করে বললে বলা যায় ভারী 'থ্রীলিং'। শ্রীযমুনা ও শ্রীশুক্লা গঙ্গোপাধ্যায় (ধুবড়ী)—তোমাদের পাঠানো নববর্ষের শুভেচ্ছার সঙ্গে ছবিটি ভারী ভাল লাগল। খাস রাশিয়ায় ছাপা ছবি, কোথায় পেলে? শ্রীপ্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় (গড়বেতা)—তোমার বিতর্কমূলক চিঠির জবাব ছোট্ট কথায় দেওয়া যায় না, পরে সুযোগ পেলে এ নিয়ে আলোচনা করব। একটা কথা মনে রেখ, কালের বিচারে যে সাহিত্য স্থায়িত্ব লাভ করেছে তাকে কথার তোড়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কবিসভায় যে কবিদের ডাক পড়েছিল তাঁরা এই কালের বিচারেই নিজেদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন, কাজেই তাঁদের এই সন্মান অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে আমার ধারণা তোমার সঙ্গে হয়তো মিলবে না। গদ্যকবিতা সত্যি করে লিখতে পারা খুব প্রতিভাশালী হাতের প্রয়োজন—খুব কম কবিই সে প্রতিভা দেখাতে পেরেছেন। সাধারণতঃ এই ধরণের যে সব কবিতা (তোমার উল্লিখিত কবিদের লেখাও তা থেকে বাদ যায় না) আজকাল চোখে পড়ে তার বেশীর ভাগই শুধু ছন্দ-হীন নয়—প্রাণহীন, রসহীন এবং অর্থহীনও বটে। অতি অক্ষম রচনা। আমার মনে হয় কালের বিচারে এদের কোনটাই টিকবে না—এবং সেদিনের খুব বেশী দেরীও নেই। এখনই তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীবিজলী সরকার (শ্যামপুর)—তোমার লিখিত দুঃখজনক

ঘটনাটি খবর-কাগজে আগেই পড়েছি। তবে পরীক্ষা-হলের ঐ আহত গার্ডটি যে তোমাদের প্রতিবেশী তা জানতাম না। এই সব সমাজ-বিরোধীদের সম্বন্ধে কঠোর সামাজিক শাসনের প্রয়োজন অনুভব করি, কিন্তু পথ দেখাবে কে? শ্রীসৃষ্টিধর মুখোপাধ্যায় (চাঁদবাটী)—তোমার কৌতূহলপূর্ণ চিঠি পেয়ে ভাল লাগল। বাউল সম্বন্ধে সুবিধামত পরে একদিন আলোচনা করব। শ্রীরুনঝুন্ দাশগুপ্ত (কলিকাতা-২৬)—তোমার নববর্ষের বলিষ্ঠ সংকল্প রামধনুকে নিশ্চয়ই প্রেরণা যোগাবে। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন সবাই। —ইতি তোমাদের সম্পাদক মশাই।

বসন্তের আভাস

শ্রীসুচেতা ভট্টাচার্য

কী কথা জানালো কানে কানে প্রজাপতি,
কী খবর দিল ফুলে?
কোথা যেতেছিল—ফিরিল প্রকৃতি দেবী,
এলো হেথা পথ ভুলে?
কেন সবুজের এত জমকালো রূপ,
হঠাৎ কে তারে করিল নিমন্ত্রণ?
ফুটে ফুটে ওঠে নামহারা যত ফুল,
পাখী গাহে গীত—এ নহে চিরন্তন।

মনোরঞ্জন-স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের স্মরণে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতার বিষয়ঃ ১৩৬৫ সালে প্রকাশিত যে সব রচনা (মাসিকের পাতায়) কিংবা বই তোমরা পড়েছ তার মধ্যে কোন্‌টি তোমার সব চেয়ে ভাল লেগেছে এবং কেন? এই নিয়ে একটি ছোট্ট সরস প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে হবে (১০০০ শব্দের বেশী না হয়)। লেখার সঙ্গে প্রতিযোগীর নাম, ঠিকানা, বয়স এবং প্রবন্ধে আলোচিত বইটির বা রচনাটির (কোথায় বেরিয়েছিল উল্লেখ করে) নাম (লেখকের নাম সহ) স্পষ্ট করে লিখে দেবে। লেখা আগামী ২৫শে আষাঢ়ের মধ্যে রামধনু কার্যালয়ে পৌঁছান চাই। যার লেখা সব চেয়ে ভাল বিবেচিত হবে সে-ই পাবে পুরস্কার। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে।

—ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক—

পরীক্ষার আগের দিন

শ্রীমদনমোহন চক্রবর্তী

ধিক্ ধিক্ ধিক্ জ্বলছে আগুন মনের কোণে আজ,
ভাল আমার লাগছে নাকো
করতে কোন কাজ।
ঝাপসা সবই মেঘে মেঘে,
শাসাচ্ছে কে থেকে থেকে—
সারা বছর কেবল তুমি আসছ দিয়ে ফাঁকি!
কাল পরীক্ষা, আজকে তোমার খেয়াল
হ'ল নাকি?

'আজ নয়, কাল পড়ব' বলে দিন কেটেছে যার
সারা বছর খেলা করে, আড্ডা দিয়ে আর।
পরীক্ষারই আগের রাতে
ভাবনা এল ভয়ের সাথে,,
যেদিকে চাও সবই দেখি ধোঁয়ার মত লাগে,
হায় হায় হায়, এ সব কথা হয় নি মনে আগে?

দোহাই মাগো সরস্বতী, বলছি তোমায় ডাকি,
এবার থেকে আর দেব না—
আর দেব না ফাঁকি।
পাশ নম্বর মাথায় মাথায়
পাই যেন, মা, তোমার কৃপায়,
এই নাকে খৎ, এবার থেকে সত্যি ভালো ছেলে
হবই আমি, এবারটা, মা,
ভালোয় ভালোয় গেলে।

কি লিখি

শ্রীগোপালচন্দ্র মল্লিক ঠাকুর

কবিতা লিখিতে বসেছি যখন
ছন্দ আসে না প্রাণে,
খাপছাড়া কথা বুনেছে স্বপন—
মিল নেই কোনোখানে।
রূপ নেই কোনো, রস নেই দেখি
রাতের অন্ধকারে,
উজল আকাশ কালো হয়—সে কি
কলের ধোঁয়ার ভারে?
গাছের ওপরে নাচে না তো ফিঙে,—
গায় না তো বুলবুল,
মাধবী-কেয়ার মত্ত কানন—
ফোটে না তো সেথা ফুল!
চাঁদখানি—তাও মেঘে ঢাকা দেখি,
আলো নেই তারকার।
কবিতা লিখিব?—কাকে নিয়ে লিখি?
কিছুই যে নেই আর!

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

তপন এই ভাবে ১১ কে ১০ করেছিলঃ—

XI (১১) $= \frac{\mathrm{VI}}{\Lambda\mathrm{I}} = \mathrm{VI} + \mathrm{IV} =$ X (১০)

উত্তরদাতাদের নামঃ- রণেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (ঘৈরালী); অশোক, দিলু, মণ্টু, সণ্টু, ঝণ্টু, ফুটিদি, জামাইবাবু, কাকা (নিউদিল্লী); জয়া চক্রবর্তী (চাইবাসা); শ্যামলী গুপ্তা (কলিকাতা-২৯); স্নেহময় রায় (পাটনা); অজিত ও অজয় (কলিকাতা-২৬); নিতু ও ঝরণা রায় চৌধুরী (বাঁকুড়া); অমিতাভ বসু (লখনৌ); মমতা বসু (কলিকাতা-১২); দীপ্তেন ও সৌম্যেন (কলিকাতা-২৫)।

নূতন ধাঁধা

(সংগ্রহ)

শ্রীঅমিতাভ ভট্টাচার্য

শৈলেশ বাবু থাকেন দেশের বাড়ীতে, কিন্তু কাজ করেন কলকাতায়—বেশ মোটা মাইনের চাকরী। বাড়ী থেকে রেল-ষ্টেশন অনেক দূর, মোটরে যেতেই একঘণ্টা লেগে যায়। সোজা কলকাতায় যাবার ভাল রাস্তা নেই, তাই মোটরে ষ্টেশন পর্যন্ত এসে বাকিটুকু তিনি ট্রেনেই যাতায়াত করেন। ফিরবার সময় তাঁর ছেলে কমলেশ রোজ গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে অপেক্ষা করে।

শৈলেশ বাবু ঠিক পাঁচটার সময় ষ্টেশনে এসে নামেন, আর তাঁর ছেলে ঠিক ৪টের সময় বাড়ী থেকে মোটর নিয়ে রওনা হয়ে ঠিক পাঁচটায় ষ্টেশনে পৌঁছয় এবং মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে তক্ষুণি বাপকে তুলে নিয়ে বাড়ীর পথে রওনা হয়। ঠিক ৬টার সময় তারা বাড়ী এসে পৌঁছয়।

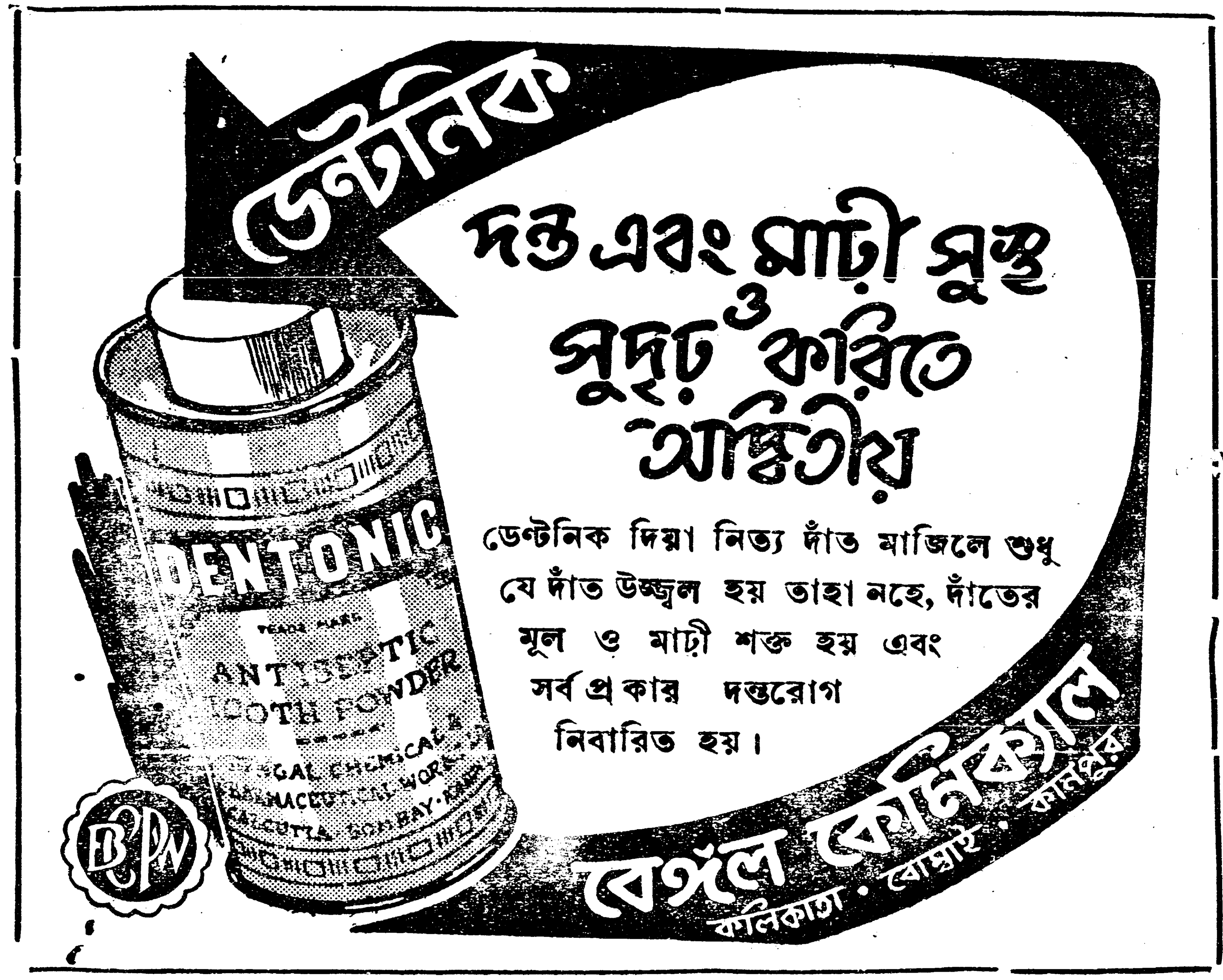

একদিন, হ'ল কি, শৈলেশ বাবু তাড়াতাড়ি আপিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন, এবং ষ্টেশনে গিয়েই একটা ট্রেন পেয়ে গেলেন। ফলে, যখন দেশের ষ্টেশনে পৌঁছলেন, তখন ঘড়িতে মাত্র ৪টে। কমলেশের আসতে পূরো এক ঘণ্টা বাকি। শৈলেশ বাবু আর তার জন্য অপেক্ষা না করে পায়ে হেঁটেই বাড়ীর দিকে রওনা দিলেন। এদিকে কমলেশ যথারীতি ৪টের সময় গাড়ী নিয়ে বেরোল, এবং খানিকটা পথ গিয়ে বাপের দেখা পেল। বাপকে তুলে নিয়ে সে যখন বাড়ী ফিরে এল তখন ঘড়িতে ৬টা বাজতে ১০ মিনিট বাকি আছে।

তা হলে শৈলেশ বাবুকে কতটা সময় হাঁটতে হয়েছিল?

(রামধনু পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে উত্তর পাঠাতে হবে।)

নতুন বছরের রামধনু

এই চৈত্র সংখ্যার সঙ্গে রামধনুর ৩১শ বছর শেষ হ'ল, আসছে বৈশাখে রামধনু ৩২শ বছরে পড়বে। রামধনুর পুরোনো গ্রাহক-গ্রাহিকারা সকলেই আগামী বছরও রামধনুর গ্রাহক-তালিকাভুক্ত থাকবেন এই আমরা আশা করি। কোন বিশেষ কারণে কারও পক্ষে তা সম্ভব না হলে এই সংখ্যা পাবার সাত দিনের মধ্যে তাঁদেরকে একটা চিঠি দিয়ে আমাদের তা জানিয়ে দিতে অনুরোধ করছি।

যাঁরা গ্রাহক থাকবেন তাঁদেরকেও ঐ সময়ের মধ্যে অনুগ্রহ করে আগামী বছরের বার্ষিক চাঁদা চার টাকা বা ষাণ্মাসিক (বৈশাখ-আশ্বিন) চাঁদা ২ টাকা চার আনা (২·২৫ টাকা) মনি অর্ডারে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি। মনি অর্ডারে চাঁদা পাঠানই সুবিধাজনক, কারণ ভি. পি. তে নিলে চাঁদার ওপরে আরও ৭১ নয়া পয়সা অতিরিক্ত দিতে হয় ভি. পি. মাশুল হিসাবে। অর্থাৎ মনি অর্ডারে যেখানে লাগে ৪ টাকা বা ২·২৫ টাকা, ভি.পি. তে নিলে সেখানে লাগে ৪·৭১ টাকা কিংবা ২·৯৬ টাকা। এ ছাড়া ভি.পি. তে কাগজ পেতেও অনেক দেরী হয়। এ সত্ত্বেও যদি কোন গ্রাহক ভি.পি. তে রামধনু নেওয়াই পছন্দ করেন তা হলে তাঁর জন্যে সেই ব্যবস্থাই হবে। অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে কোন গ্রাহকের চাঁদা বা নিষেধজ্ঞাপক চিঠি না পেলে আমরা বুঝব যে তিনি ভি.পি.-তেই রামধনু নিতে চান। আমরা তাঁকে ভি. পি.-তেই রামধনু পাঠাব। আশা করি তা ফেরৎ দিয়ে তিনি অযথা আমাদের অর্থদণ্ড করাবেন না।

যাঁরা কলকাতায় থাকেন তাঁরা লোক পাঠিয়ে হাতে হাতেও চাঁদার টাকা জমা দিতে পারেন।

মনে রাখবেন: কাগজের দুর্মূল্যতা, দুষ্প্রাপ্যতা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ প্রচুর বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও রামধনুর চাঁদার হার অন্যান্য অনেক পত্রিকার মত বাড়ানো হয় নি। ১৩৬৬ সালেও রামধনুর বার্ষিক চাঁদা চার টাকা এবং ষাণ্মাসিক চাঁদা ২·২৫ টাকাই থাকবে।

রামধনুর চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা:

ম্যানেজার, রামধনু। ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫

আজ যে শিশু কাল সে হবে দেশের নেতা

আজ যে অসহায় শিশু একদিন তাকেই নিতে হবে দেশ শাসনের সুমহান দায়িত্ব। কাজেই শিশুদের সবল ও সুস্থ করে গড়ে তুলুন।

সাধনা বালামৃত

রুগ্ন ও শীর্ণ শিশুদের সুস্থ, সবল ও সুদৃঢ় করে গড়ে তোলে।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা, ফার্মাসিউটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট, ৫৬, এস, কে, দেব রোড, কলিকাতা-

S.B. 2

আজই গ্রাহক হও

শ্রীননীগোপাল মজুমদারের

শব্দ-ভারতী

ছোটদের অভিনব অভিধান
আনুমানিক ৫০ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে।

কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য যাহারা আগে নিজেদের নাম গ্রাহক তালিকাভুক্ত করিবে, শুধু তাহাদের কাছেই বিক্রয় করা সম্ভব হইবে।

গ্রাহক তালিকাভুক্ত হইতে কোন পয়সা লাগে না।

অভিজিৎ প্রকাশনী
৭২।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু-র
(অ·কৃ-ব)

খামখেয়ালী ছড়া

(ছোটদের হাসির কবিতা)

দাম—১·৫০ (দেড় টাকা)

প্রকাশ করেছেন
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭

শ্রীচরণেষু

ফোন : ৫৫-৪০৪৬

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা
প্রতিষ্ঠাতা—গোরাচাঁদ দাশগুপ্ত

* নতুন আদর্শ এবং পরিকল্পনা নিয়ে প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই প্রকাশিত হয়।
* নীট্ আয় দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যয়িত হয়।
* ‘বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর লেখা’ এবং ‘বিদ্যালয়ের খবর’ বিভাগ দু’টি আমাদের সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পিত।
* প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকদের রচনায় প্রতিটি সংখ্যা সুসমৃদ্ধ।

বার্ষিক (সডাক) ৩৲ ষাণ্মাসিক (সডাক) ১।৷০ প্রতি সংখ্যা ।০

অন্যান্য বিষয়ের জন্য কর্মসচিবের সহিত পত্রালাপ করুন।

সম্পাদক
শ্রীননীগোপাল দত্ত

‘শ্রীচরণেষু’ কার্য্যালয়,
৪বি রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৫

জ্যোতির্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ৷৷০ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১৷৷০ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য বি এ.

শুকতারা

ফাল্গুন মাসে দ্বাদশ বর্ষে পড়বে

প্রতি সংখ্যা আট আনা
বার্ষিক চাঁদা পাঁচ টাকা
ষাণ্মাসিক চাঁদা পূর্ব্বের মত
আড়াই টাকা

— নীহার রঞ্জন গুপ্তের —

বিষের তীর — ১৲ রাতের আতঙ্ক — ১৲
রক্তমুখী ড্রাগন — ১৲

✱ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ✱

দেড়শো খোকার কাণ্ড

দাম এক টাকা চার আনা

অপরাজিতা-৪৲

ঠানদিদির থলে-৩৲

সুনির্মল বসুর
বরণ ডালা-২৲

আশাপূর্ণা দেবীর
গল্প ভালো আবার বলো-২৲

— নরেন্দ্র দেবের বাছাই করা গল্প —

অনেক দিনের অনেক কথা — ২৲

— আশাপূর্ণা দেবীর বাছাই করা গল্প —

শোনো শোনো গল্প শোনো — ২৲

— দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত —

ভূত পেত্নী দত্যি দানা — ৩৲
ঠাকুরমার ঝুলি — ৩৲
পুরনো দিনের পুরনো গল্প — ৩৲

Regd. No. C—1641